মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

ত্রিংশ খণ্ড—১৩১৯।

কলিকাতা,

৩০/৫ মদন মিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০।৪ নং
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদক
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

বিষয়। লেখকের নাম। পৃষ্ঠা।

নব্যভারত।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

বিংশ খণ্ড—১৩০৯।

মায়া।

মায়া, নববর্ষের প্রথম দিনে তুই একটু দাঁড়া, আমি তোর ভোলা দাস, আজি তোর সুধা-মাথা স্বর্গীয় শান্তি একবার দেখি, একবার পূজি; একবার [illegible] তুই একবার দাঁড়া, আমি বুঝিয়া লই, তুই কে, এবং তুই কি?

কোথা হইতে তোর আগমন, কোথায় তোর স্থিতি, কোথায় তোর পরিসমাপ্তি, আমি জানি না। কেন তুই আসিস্, কেন তুই থাকিস্, কে জানে? আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, নদীতে তরঙ্গ খেলে, সমুদ্রে বুদ্বুদ উঠে,—ফুল হাসে, পাখী গায়, রমণী সৌন্দর্য্যে জগৎ মাতায়, আমি কার ইঙ্গিতে এসব দেখিয়া, শুনিয়া স্তম্ভিত হই? দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারা হই? তুই কেন দরিদ্রের হৃদয়-ঘরে আগমন করিয়া এমনই করিয়া আমাকে মাতাস্ বল্ ত?

পৃথিবীর আদান-প্রদান, মাথামাখি, কোলাকুলি বড়তে বড়তে। আমি দরিদ্র, নিয়মে ঘুমাই, [illegible] মাতি, নীরবে জাগি, জাগিয়া [illegible]। কিসের স্বপ্ন? স্বপ্ন—[illegible] আছি, কেন আছি, কি করিতেছি, কোথায় চলিয়াছি? তুই বড় ঘরের সন্তান, কেন দরিদ্রের কাছে আসিস্? বড় আশ্চর্য্য, তুই এক দিনও আমাকে পরিত্যাগ করিলি না! তুই প্রাণের ঘরে আজীবন এমনই ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিস্ যে, আমি সর্ব্বক্ষণই তোর উত্তেজনায় অস্থির। দরিদ্র ও নরাধম পাপী বলিয়া সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিল, তুই কেন ছাড়িলি না?

আহা, এই বঙ্গদেশের কত ঘরে হাহাকার,—কত ঘরে অনশন, উৎপীড়ন, অত্যাচার, অবিচার! তুই কেন আমাকে সঙ্গে করিয়া সে সকল স্থানে লইয়া যা'স্। বালবিধবার চক্ষের জল এ বঙ্গে কত যুগ ধরিয়া পড়িতেছে, বিদ্যাসাগর গিয়াছেন, আর কেহ সে দিকে তাকায় না! কত কুলীন কুমারী কত কষ্টে যৌবন যাপন করিতেছেন, রাসবিহারী গিয়াছেন, আর কেহ সে কথা ভাবে না! আমাদের কুলীগণ পেটের দায়ে কত অত্যাচার সহ্য করিতেছে; হায়, মহামতি কটন যাইতেছেন, কে আর তাহাদের কথা ভাবিবে? কৃষক সারাদিন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে খাটিয়া খাটিয়াও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। তাতে আবার জমীদারের অত্যাচারে নিষ্পেষিত! দরিদ্র ব্যবসা বাণিজ্য করিতে চায়, মহাজনের এবং ইনকমটেকস্-হাকিমের তাড়নায়

অবসন্ন! শেষে সংগ্রামে পরাজিত হইয়া, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিতেছে! ভারতসভা এখন বড়লোকের সভা হওয়ার জন্য লালায়িত, কেহ আর দুঃখীর জন্য অশ্রু ফেলে না! তুই কেন দিবারাত্রি আমাকে এই সকল চিত্র দেখিতে উত্তেজিত করিস, বল্ত? কত কত পরিবার অনশনে অবসন্ন, কত কত মহিলা পাষণ্ড-হস্তে নিগৃহীত, কত কত লোক রোগে শোকে জর্জ্জরিত, তুই কেন আমাকে এ সকল দেখিতে মাতাইয়া তুলিস্? মরণের পথে চলিয়াছি,—সংগ্রামে পরাজিত, অবসন্ন, ক্লান্ত, শ্রান্ত; নিত্যই বুঝিতেছি, আমার শক্তিতে আর কুলায় না; তবুও, কেন আমাকে এমন করিয়া নিত্য ধরিস? আমি সকলের হাত এড়াইয়া শেষে, অবশেষে বুঝি বা তোর নিকট পরাজিত হইলাম!

আমি, জীবনের এই শেষাংশে কাহারও দুঃখের কথা ভাবিব না মনে করি, তুই প্রাণে কেবলই সেই সব কথা জাগাইয়া দিস্। আমি জন্মভূমির দুঃখের কথা, ভারতের জাতি সংগঠনের কথা, মানবের ধর্ম্মলাভের কথা, জাতীয় ভাষার উন্নতির কথা ভুলিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছি, তুই কিছুতেই আমাকে ভুলিতে দিলি না! আমার শক্তিতে কুলায় না, আমি এখন করি কি বল্? লোকের নিকট সাহায্য চাই, দয়া দুর্ঘট, সাহায্য পাই না; সহানুভূতি চাই, ঘোর ব্যবসাদারির রাজত্ব, সহানুভূতি পাই না; ভালবাসা চাই, লোক বড় কৃপণ, অথবা আমি নিতান্ত অযোগ্য, ভালবাসা পাই না; এখন করি কি বল্? সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন এদেশ জাগিবে কি?—কিন্তু সম্মিলন এখন ঝগড়া বিবাদের আগুনে দগ্ধীভূত,—পরনিন্দা, বিদ্বেষ, এমন মিলনের ঘোর অন্তরায়! এখন করি কি? মায়া, তুই, প্রাণে আগুন জ্বালিলি যদি, তবে উপায় বলিয়া দে, এখন করি কি?

বুঝিয়াছি, তুই কোন কথাই শুনিবি না। বুঝিয়াছি, যত দিন দেহে প্রাণ এবং প্রাণে শক্তি আছে, ততদিনই তুই কামনার আগুন প্রজ্বলিত করিয়া আমাকে দগ্ধ করিবি! তোর কঠোর ইঙ্গিত, বড় কঠিন আদেশ। আমি বড় দুর্ব্বল, আমি বড় অসহায়, আমি ঐ আদেশ প্রতিপালনে প্রতিনিয়ত অসমর্থ। তুই নিত্য বলিতেছিস্, "সে তোকে ভালবাসে না, তাতে তোর কি, তুই তাকে ভালবাসিতে অকুণ্ঠিত থাক্;—সে তোর সেবা চায় না, তাতে কি, তুই অম্লান চিত্তে খাটিয়া খাটিয়া তার জন্য মরিতে প্রস্তুত থাক্;—তুই কিছুই করিতে পারিলি না, তাতে তোর কি, আমার আদেশ এই, তুই সকল কামনা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল অন্যের জন্য খাটিতে, অন্যের জন্য ভাবিতে শিক্ষা কর্; এবং যে তোকে তুচ্ছ করে, ঘৃণা করে, দূরে যাইতে বলে, তাহারও ধারে ঘেঁসিয়া সেবা কর্, এবং স্বর্গীয় প্রেমে আলিঙ্গন কর্। ইহাতেই তোর বৈকুণ্ঠ এবং স্বর্গ মিলিবে।" আমি তোর এই আদেশ প্রতিনিয়ত শুনিতেছি, কিন্তু আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি কই? দিনে দিনে গণা দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, কবে ভবের লীলা সমাপ্ত হইবে, কে জানে; কিন্তু ঐ আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলাম কই? কর্ত্তব্যের অনন্ত ভাণ্ডার চিরদিন অফুরান্ত রহিয়া গেল। দেখি দেখি, ধরি ধরি, করি করি করিতেই দিন ফুরাইয়া গেল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটি,

এক কাজের পর আর এক কাজ, এক ব্রতের পর আর এক ব্রত, এক সাধনার পর আর এক সাধনা, এক সত্যের পর আর এক সত্য—এইরূপ ক্রমাগত অফুরান্ত শ্রেণীর পর শ্রেণী আসিতেছে। কে কবে অনন্ত কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিয়াছে? কেহ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া নিবৃত্তিতে পৌছিয়াছে কিনা, জানি না; কিন্তু আমার বাসনার আরম্ভ আছে, শেষ নাই;—কর্ত্তব্য-দিনের উষা দেখিয়াছি, কিন্তু সন্ধ্যা দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আমি, ক্ষুদ্র বস্তু, সামান্য জিনিস ধরিতে যাই, ধরিয়াই দেখি, সে ক্ষুদ্র নয়, খুব বড়। একটী বালুকণারও পরিমাণ করিতে আমার শক্তিতে কুলাইল না। দূর হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বতকে অতি কাছে দেখায় কিন্তু হাটিতে হাটিতে প্রাণান্ত হইলেও পর্ব্বতের দূরত্ব ঘুচে না; সে যেন আরো দূরে, আরো দূরে সরিয়া যায়। সামান্য কর্ত্তব্য, সামান্যত্ব দেখাইয়া, ঐ পর্ব্বতের ন্যায় আমাকে আকর্ষণ করিল, কিন্তু কত দিন খাটিলাম, আমার কর্ত্তব্য যেন চির অসমাপ্ত। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম—সকল সাধনাই অসমাপ্ত।

কেহ বলেন, তিনি খুব প্রেমিক, প্রেমের অকূলে তিনি ডুবিয়াছেন। কেহ বলেন, তিনি বড় জ্ঞানী, জ্ঞানের অতল গর্ভ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; কেহ বলেন, তিনি বড় কর্ম্মী; সকল কর্ত্তব্য শেষ করিয়া তিনি এখন কৃতিত্বে পৌছিয়াছেন। তাঁহারা এখন মুক্তপুরুষ,—মহা সম্মানে ভূষিত। তাঁহারা এখন জীবজগতের উপরে আধিপত্য [illegible] কিন্তু আমি, হায়, আমি আমিত্বের মূলেই ডুবিতে পারিলাম না, তোমার প্রেম, জ্ঞান ও কর্ম্মের মর্য্যাদা আমি কি বুঝিব? আমি-রূপ অকূল সাগরের পরপারে যদি পৌছিতে পারিতাম, অথবা, আমি-সর্ব্বস্ব-সাধনা যদি ভুলিতে পারিতাম, তবে হয়ত, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিতাম; পর-তত্ত্ব কি, জানিতে পারিতাম। আমার সকল সাধন, সকল কথা কেবল "আমিত্বেই" যেন নিবদ্ধ। "আমিত্বের" বোঝা বহিতে বহিতে, আমিত্বের খাটুনি খাটিতে খাটিতে আমার দিন গেল! আমিত্বকে জগতত্বে বিসর্জ্জন দিতে পারিলাম কই?

লোকে বলে, তাঁহার কত কতিত্ব,—তাঁহার লেখা ভাল, কথা ভাল, গান ভাল, তাঁহার চেহারা ভাল, আকৃতি ভাল, তাঁহার সেবা ভাল, তাহার কর্ম্ম ভাল। ইত্যাদি ইত্যাদি রূপ লোকে তাঁহার কত প্রশংসা করে। ভালোর প্রশংসা করিবে না ত কাহার প্রশংসা করিবে? মায়া আমাকে কিন্তু ভালোরও কি এক আভাস দেয়, মন্দের ভিতরেও কি এক শোভা দেখায়। মায়া দেখাইয়াছে, পরিত্যক্তা, নিঃস্বিতা ভিখারিণী পথে পড়িয়া অনাহারে কাঁদিতে কাঁদিতেও আবার অন্য ক্ষুধিতকে খাওয়াইবার জন্য অস্থির। দেখাইয়াছে, কুৎসিৎ কদাকার নারী অম্লান চিত্তে অপরাধীর শত অপরাধ ভুলিয়াও কোল দিতেছে,—প্রাণের মমতা ছাড়িয়া কত রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে। যখন এ সকল দেখি, তখন, তুমি যাহাকে ভাল বল, কেবল তাহার প্রশংসা-কীর্ত্তনে মায়া আমাকে মত্ত থাকিতে দেয় না, ঐ কুৎসিতার গুণ কীর্ত্তন না করিলে ছাড়ে না। মায়া বলে, চক্ষে বিশ্বাসের অঞ্জন লেপিয়া দেখিলে, দেখিতে দেখিতে সব যে ভাল হইয়া যায়; মন্দ বা কুৎসিৎ কোন বস্তু থাকে না, সব সুন্দর দেখায়। বন্ধু, তুমি কি বল? ভালও যাহার, মন্দও তাঁহারই

নয় কি? মন্দ ভালোরই রূপান্তরিত অবস্থা।— এক প্রকৃতির দুই দিক। বন্ধু তুমি কি বল?

সে বলে, আমি তাহাকে ভালবাসি না,—ইহাকে, তাহাকে, উহাকে ভালবাসি। সে জানে না যে, আমি যাঁহাকে দেখি, তাহার সহিত তুলনা করিয়াই তাঁহাকে কম বেশী আদর করি। তুলনার বস্তু যে আমার "সে", সে তাহা বুঝে না। মন্দকে বুঝিলে ভালোর গৌরব করা, ও ভালোকে বুঝিতে পারিলে মন্দের নিন্দা করা সম্ভব। কিন্তু সে একথা বুঝে না, সে বড় অবোধ। সে মনে করে, আমি তাহাপেক্ষা অন্যকে অধিক ভালবাসি। এই সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা প্রকৃতি যে আমার নিকট 'সে' ময় হইয়া গিয়াছে, সে ইহা বুঝিয়াও বুঝিল না। জীবনের শেষাংশে এ কথা আর তাহাকে বুঝাইয়া কাজই বা কি? মায়া, তবুও তাহাকে বুঝাইতে বলে। কি কঠোর আদেশ! কত কোটী ২ "সে" এই জগতে আছে; কত সে-কে মনের কথা বুঝাইব?

মায়ার আদেশে তবু আমি দ্বারে দ্বারে বুঝাইতে যাই, কিন্তু ভাষা সরে না, বুঝাইতে পারি না। অবাক্ হইয়া কেবল চাহিয়া থাকি। জানিই বা কি, বুঝাইবই বা কি? সে যদি না বুঝিয়া অবিচার করে, তাহাতেই বা আমার কি? সে না বুঝিয়াও যদি আমাকে প্রহার করে, তাহাতেই বা আমার কি? আমি কিছু প্রত্যাশা না করিয়াও যদি তাহাকে ভালবাসিতে পারিতাম, তবে বুঝিবা প্রতিদান না পাইলেও আমার কষ্ট হইত না। আমার প্রার্থনা যদি সে পূর্ণ না করে, তাহাতে কি, আমি অবিরত তার মঙ্গল প্রার্থনা করি না কেন? রোগের দিনে বা শোকের দিনে, দুঃখের দিনে বা বিপদের দিনে, সে যদি কাছে নাও আসে, তবুও আমি কেন কাতর হই? জানি না কি যে, "সে" আমারি;— জানি না কি যে অনন্ত "সে"ময় জগৎকে "আমার"জ্ঞান করিবার জন্যই আমার সৃষ্টি!

কঠোর সাধন, আমি আজ সরল ভাবে বলিতেছি, মায়া-প্রদর্শিত এই কঠোর সাধনায় আমি অসিদ্ধ। অন্যান্য সাধন সহজ, যশ নিন্দার অতীত হওয়া রূপ সাধন যেরূপ কঠিন, প্রতিদানের প্রত্যাশা না রাখিয়া, অবিভেদে সকলকে আত্মদান করা তেমনি কঠিন। আত্মদান করি নাই, তবুও কেন জগতে আছি? আমার জয়, না মায়ার জয়?—সে বিচারের দিন আসিতেছে।

প্রতি মুহূর্ত্ত সংগ্রাম চলিয়াছে;— ভালবাসা না পাইয়াও কখন ভালবাসি, আবার কখনও ভালবাসিয়া প্রতিদান না পাইয়া বিরক্ত হই। এইরূপ আসক্তি এবং বিরক্তির ভিতর দিয়া, অনন্ত সংগ্রাম করিতে করিতে অনন্তের পথে চলিয়াছি। কত দিন ধরিয়া এইরূপ ভাবে হর্ষ বিষাদ, আশা নিরাশা, আসক্তি বিরক্তি, পুণ্য পাপ, ভাল মন্দের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহা কে জানে? শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হইয়া ছাড়িতে চাই, কিন্তু প্রকৃতি ছাড়ে না। ইহা মহামায়ার জয় ভিন্ন আর কি? স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন কেহই আমার নয়, তবুও তাহাদিগের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির। এই সংসার মানবের পরিণাম নয়, তবুও এই সংসারের জন্য খাটিয়া খাটিয়া আত্মদানে-অসমর্থ-মানব অবসন্ন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সব ফাঁকি, তবুও তাহার জন্য মানুষ দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত। ইহা মায়া নয় ত আর কি? মায়া, দেবধামের দেবদূত,

সংসার-শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক। কে ইহার হাতে পরাজয় স্বীকার করে নাই?

মায়ার হস্তে ভারার্পণ করিয়া মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবকে মহামায়া এই সংসারে পাঠাইয়াছেন;—এই মায়ার বন্ধন বা কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন না হইলে ভবলীলা শেষ হয় না। যিনি যতই চেষ্টা করুন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অতীত হইতে কেহই পারিবেন না। দুঃখ এই,—সময় থাকিতে থাকিতে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ডুবাইতে পারিলাম না। যখন পারিব, বুঝি বা তখনই, মায়ার জাল এবং কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইবে, ভবলীলা সাঙ্গ হইবে। কিন্তু তাহা কবে হইবে, কে জানে?

১লা বৈশাখ, ১৩০৯।

দৃশ্যকাব্য বিভাগ।

রঙ্গশালাগুলির কৃপায় আজি কালি নানা শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য সৃষ্ট হইতেছে। সকল বিষয়েও যেমন, এখানেও তেমন; ইংরাজি আদর্শ এবং ইংরাজী ছাঁচেই আমরা সকল জিনিস গড়িতেছি। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও দৃশ্য কাব্যের নাম অপেরা, কাহারও নাম গীতি-নাট্য, কাহারও বা নাম মেলোড্রামা। ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে নূতন গড়ায় লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই; কিন্তু গঠিত বস্তুটী দেশীয় নাম এবং দেশীয় প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ না করিলে জোহন্ বাগ্দী এবং মেরী ডোমের মত নর-কেরও অগ্রাহ্য হইবে। নামটা পরিচয়ের প্রথম কথা এবং পরিচিতের নিত্য সম্ভাষণের শব্দ।

প্রাচীন সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের বহুবিধ শ্রেণীবিভাগ আছে; নূতন নূতন আদর্শে কাব্য লিখিলেও কিয়ৎ পরিমাণে সেই প্রাচীন কাঠাম বজায় রাখা রাখা যাইতে পারে। তাহাতে নবসৃষ্ট কাব্যের পূর্ণ-বিকাশে বাধা পড়িবে না, বরং সেই নবসৃষ্ট সাহিত্য একটু স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে।

প্রাচীনেরা প্রতি শ্রেণীর লক্ষণাদি লইয়া অনেক বাঁধাবাঁধি করিয়া গিয়াছেন। এ কালের রচনায় সে সকল নিয়ম রক্ষিত হয় না; হইবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল মৌলিক ভাব বা বিশেষত্ব লইয়া শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নবসৃষ্ট কাব্যগুলির বিভাগ এবং নামকরণ করা যাইতে পারে।

দৃশ্যকাব্যের সাধারণ নাম রূপক। নাটক, রূপকের অন্তর্গত একটী শ্রেণী হইলেও, প্রাচীন কালেও সকল শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যই নাটক নামে অভিহিত হইত; কাজেই রূপক শব্দটী অত্যন্ত উপযোগী হইলেও, প্রচলিত নাটক নামে দৃশ্যকাব্যের নামকরণ হইলে ক্ষতি হইবে না।

দর্পণকারের বিভাগ অনুসারে রূপক দশভাগে, এবং উপরূপক ১৮ভাগে বিভক্ত।

নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী এবং প্রহসন, এই দশটী রূপক শ্রেণীয়। নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ এবং ভণিকা এই ১৮টী উপরূপক।

ইংরাজিতে যাহাকে ঐতিহাসিক ড্রামা বলে, নাটক জিনিসটী তাহাই। পাঁচটীর অধিক অঙ্ক হইলে নাটকের নাম মহানাটক হয়। মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠা, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের অহল্যা এবং মনোমোহন বসুর রামাভিষেক নাটক এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত।

খ্যাতবৃত্তাদি লইয়া রচিত ক্ষুদ্র নাটক একালে নাটিকা নামে অভিহিত হইতে পারে। যথা হরিনাথ মজুমদারের সাবিত্রী।

নাটকের আখ্যান বস্তু কবিকল্পিত হইলে প্রকরণ বলে। দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী, রামনারায়ণের নবনাটক, প্রভৃতি এই শ্রেণীর।

"ভাণঃ স্যাৎধূর্ত্ত চরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ," ইত্যাদি। মৌলিক লক্ষণের হিসাবে মাইকেলের বুড়া শালিকের ঘাড়ের রোঁ, ভাণ শ্রেণীয়। বুড়াশালিকে একটীই নায়ক, এবং তাহার চরিত্র ধূর্ত্ত চরিত্র বটে; কাজেই এখানি প্রহসন শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে না।

ব্যায়োগের বিশেষত্ব এই গুলি; যথা— খ্যাতেতিবৃত্ত, প্রখ্যাত বীরনায়ক, স্বল্প স্ত্রী যুত, বহু নরাশ্রিত, কৌশিকী বৃত্তি রহিত (অর্থাৎ মুখ্যতঃ শৃঙ্গার রস বর্ণিত নহে) এবং অঙ্গীরূপে হাস্য বা শৃঙ্গার অথবা শান্তরস প্রদর্শিত। ইহা একাঙ্ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকি প্রতিভা ব্যায়োগ শ্রেণীস্থ বলা যাইতে পারে। দেবাসুরাশ্রিত বলিয়া সমবকারের মত বিশেষ শ্রেণীর আবশ্যকতা নাই।

একালে "ডিম" নামটী বড় সুবিধার নয়। কিন্তু এই শ্রেণীর একটু বিশেষত্ব ছিল। "মায়েন্দ্র জাল সংগ্রাম ক্রোধোৎ ভ্রান্তাদি চেষ্টিতৈঃ, উপরাগৈশ্চ ভূয়িষ্টোডিমঃ খ্যাতেহতিবৃত্তকঃ" ইত্যাদি। তাহার উপর আবার "নায়কা দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ মহোরগাঃ"। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর কাব্য হয়ত সৃষ্ট হয় নাই।

"নায়কো মৃগবদলভ্যাং নায়িকাং ঈহতে (বাঞ্ছতি) ইতি ঈহামৃগঃ।" একালে এই শ্রেণীটী রক্ষিত হওয়া প্রার্থনীয়। কাব্যরসিকেরা দেখিবেন. যে, ইহাতে বিলক্ষণ রোমান্স্ আছে। এই শ্রেণীর একখানি কাব্য আছে; কিন্তু অপ্রসিদ্ধ বলিয়া নাম করিলাম না।

একটী অঙ্কের কারাগার হইতে মুক্ত করিলে 'অঙ্কঃ' নামক রূপকটীও একালে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেখানে নায়ক নায়িকার বিশেষ মিলন গল্পের মূল অভিপ্রায় নহে, অথচ যে নাটকে করুণরস স্থায়ী, একালের সমাজে সে শ্রেণীর অনেক নাটক রচিত হইতে পারে, এবং হইয়াছে। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অবস্থার পীড়ন বর্ণনায় 'অঙ্ক' যথেষ্ট উপযোগী বলিয়া মনে হয়। 'নীলদর্পণ' অঙ্ক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

শৃঙ্গাররস বহুল একাঙ্কের রোমান্স পূর্ণ নাটককে একালে 'বীথী' বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর কাব্য আছে; কিন্তু অপ্রসিদ্ধ বলিয়া নাম করিলাম না।

প্রহসন বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত। সাধবার দশী, একেই কি বলে সভ্যতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

নাটিকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ত্রোটকের বিশেষত্ব "দিব্য মানুষ সংশ্রয়" লইয়া; নচেৎ অন্যান্য বিষয়ে নাটকের লক্ষণ যুক্ত। গোষ্ঠীর কোন বিশেষত্ব নাই বলিয়া বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না।

মাইকেলের পদ্মাবতী ত্রোটক নামে অভিহিত হইতে পারে।

প্রাচীন কালে সকল কাব্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত; সেই জন্যই বোধ হয় প্রাকৃত বহুল বলিয়া সট্টক বলিয়া নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রাম্যভাষার প্রচুরতার হিসাবেও একালে এই শ্রেণী রাখিবার প্রয়োজন হইবে না।

একটী অঙ্কের সীমা ভাঙ্গিয়া দিলেই, যাহাকে একালে গীতি-নাট্য বলি, তাহা নাট্যরাসকের অন্তর্ভূক্ত হয়। শৃঙ্গার এবং হাস্যরস যুক্ত বহু তাললয় সংযুক্ত, অনেক নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে; সে গুলি নাট্য-রাসক নামে চলিলে ক্ষতি কি?

"প্রস্থানে নায়কো দাসো হানঃ স্যাৎউপ-নায়কঃ; দাসী চ নায়িকা, বৃত্তিঃ কৌশিকী ভারতী তথা," এই সংজ্ঞার নাটক বঙ্গ ভাষায় অনেক সৃষ্ট হইতে পারে। প্রেঙ্খনের স্বাতন্ত্র্য না রাখিয়া প্রস্থানের অন্তর্গত করিয়া দিলেই চলে।

উল্লাপ্য, নানা রকম বাঁধা বাঁধি নিয়মে নিয়মিত। একালে উহার ব্যবহার হইবে, আশা নাই।

বীররসহীন হাস্যসঙ্কুল ক্ষুদ্র নাটক, একালে "কাব্য" সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রহসনের কাছাকাছি হইলেও কিছু প্রভেদ আছে। প্রহসন শ্রেণীর দৃষ্টান্তে যে গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিরহ' গ্রন্থের তুলনা করিলে কাব্যের বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। এই স্বাতন্ত্র্য টুকু রক্ষা করিলে 'বিরহ' কে কাব্য শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়। হয়ত এত বিভিন্ন বিভাগের ততটা প্রয়োজনীয়তা নাই। বিরহ, অংশতঃ প্রস্থানের অনুরূপ।

রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক এবং বিলাসিকা বিশেষত্ববিহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে।

দুর্ম্মলিকার বিশেষত্ব আছে। কৌশিকী বৃত্তি বাঙ্গালার অধিকাংশ কাব্যেরই প্রাণ। শৃঙ্গাররস বর্ণনার বৃত্তিকে কৌশিকী বৃত্তি বলে।* বিটক্রীড়াময়, কৌশিকী ও ভারতী বৃত্তি যুক্ত দুর্ম্মল্লিকা রক্ষিত হওয়া উচিত। "নাগরনরা-ন্যূন নায়ক ভূষিতা" একালের সামাজিক চিত্র অঙ্কনে বিশেষ উপযোগী। অমৃতলাল বসুর সামাজিক নক্সা গুলি প্রায়ই দুর্ম্মল্লিকার অন্তর্গত।

নায়িকা সমান বংশজা হইতেও পারেন না, হইতেও পারেন। ক্ষুদ্র নাটককে যেমন একালে নাটিকা বলি, ক্ষুদ্র প্রক-রণকেও সেই রূপ প্রকরণিকা নামে অভি-হিত করা যাইতে পারে।

নাট্যরাসক যেমন এক শ্রেণীর গীতি-নাট্য, হল্লীশ তেমনি অন্য শ্রেণীর। একালের অধিকাংশ 'অপেরা' হল্লীশ শ্রেণীর মধ্যে। হল্লীশে, নাট্য রাসকের মত serious প্রসঙ্গ থাকিত না। বহু নায়ক নায়িকা পূর্ণ, বহু তাললয়াদি যুক্ত, এবং নানা রসাশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্য কাব্য হল্লীশ নামে প্রচলিত হইলে মন্দ হয় না। অমৃতলাল বসুর বিবাহ-বিভ্রাট এবং বাবু হল্লীশের দৃষ্টান্ত।

ভাণিকার অন্যান্য প্রাচীন লক্ষণ পরি-

* যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্য বিশেষ চিত্রা
স্ত্রী সঙ্কুলা পুষ্কল নৃত্যগীতা
কামো পভোগ প্রভবোপচারা
সা কৌশিকী চারু বিলাস যুক্তা।

ত্যাগ করিয়া "উদাত্ত নায়িকা মন্দ পুরুষাঃ" প্রভৃতি রক্ষা করিলে এই শ্রেণীটী হয়ত বজায় রাখা যাইতে পারে। নাটক-রচয়িতা এবং রঙ্গালয়ের নেতা-দিগের উপর বিচারের ভার রহিল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কর্ম্ম-ফল।

"কর্ম্মফল" হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠদণ্ড স্বরূপ। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, যে সকল চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সকলই কর্ম্মফল সূত্রে গ্রথিত। উহা রজত রেখার ন্যায় ঘটনাবলীর প্রতি স্তরে বিদ্যমান। 'কর্ম্মফল' জন্মান্তরবাদের সহিত বিশেষ রূপে সংশ্লিষ্ট, উহারা পরস্পর আপেক্ষিক। জীবনের অনেক জটিল সমস্যার উহা উৎকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক। মনুষ্য নিজ সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে। তুমি এ জীবনে যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহা কথঞ্চিত পরিমাণে তোমার ইহ-জীবনের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল, এবং কথঞ্চিত পরিমাণে পূর্ব্ব-জন্মকৃত পাপপুণ্যের ফল। নিয়তিও কর্ম্মফল সাপেক্ষ। তুমি যে সকল অসাধারণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা প্রাক্তন-সংস্কার-সম্ভূত; এবং নিজ কর্তৃত্ব ভিন্ন যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহাই তোমার নিয়তি বা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফল। ইহা ভিন্ন যদি আর কিছু নিয়তি থাকে, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। জীবনে অনেক ঘটনা এরূপ দেখা যায়, যাহাতে আমাদিগের কর্তৃত্ব আরোপিত হইতে পারে না। যাহাতে আমার কর্তৃত্ব নাই, যে সকল কার্য্যের জন্য আমি দায়ী নই, তাহার দ্বারা আমার সুখ দুঃখ বৃদ্ধি হওয়া অস্বাভাবিক এবং বিধি-বিরুদ্ধ। সদ্যজাত অপাপবিদ্ধ শিশু রোগের অরুন্তুদ যন্ত্রণায় ছটফট করে, দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়! তাহার পাপ কোথায়? এ অবস্থায় তাহার কি কর্তৃত্ব রহিয়াছে? সে প্রাকৃতিক কি নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, যাহাতে সে এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করে? তাহার ত হিতাহিত এবং পাপপুণ্য জ্ঞান এখনও বিকসিত হয় নাই; তবে তাহার এ ভোগ কেন? তবে কি সে বিনা পাপে এই ক্লেশ ভোগ করে? পিতা মাতার পাপে সন্তানের এ দুর্ভোগ হইবে কেন? একের পাপের নিমিত্ত অন্যের দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ইহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্ট জগতে নিয়ম, বিধি ও কারণ ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না। (Accidental) (দৈব) নামক কোন ঘটনা পৃথিবীতে নাই। হঠাৎ বা অকস্মাৎ অনেক ঘটনা হইতে পারে; কিন্তু তাহাও কারণ ভিন্ন হয় না। যদি কারণ ভিন্ন কার্য্যের নাম দৈব (accident) হয়, আমরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি না। সদ্যজাত শিশু নিজ কর্ম্মবলেই ঐ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এ জীবনে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই; সুতরাং তাহার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল স্বরূপই ঐ দুঃখ ভোগ। সে তাহার নিজ কর্ম্মবলে তদোপযোগী গর্ভে এবং ঔরসে জন্মলাভ করিয়াছে। আবার এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত নয়ন-

গোচর হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াও তদনুরূপ কোন ফল এ জীবনে পায় না; কিন্তু কর্ম্ম মাত্রেরই ফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কোন কোন কার্য্যের ফল হাতে হাতে, কোন কোন কার্য্যের ফল সময় সাপেক্ষ। সুতরাং যে ব্যক্তি গর্হিত কার্য্য করিয়াও এ জীবনে তদনুরূপ ফল পায় নাই, তাহার পর জন্মে তজ্জন্য শাস্তি পাইতে হইবে, ইহা অবধারিত। সৎকার্য্য সম্বন্ধেও পুরস্কার তদ্রূপ। তুমি সৎপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, উদারচেতা, নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দয়াবান, সরল, পরদুঃখকাতর, তুমি সুখে থাকিবে, উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে, ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই প্রাণের অব্যক্ত আশা—অন্তরের অস্ফুট ভাষা। অপর পক্ষে, তুমি অহিতকর কার্য্য দ্বারা নিজ-জীবন কলুষিত করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে—ইহাই স্বভাবিক। যদি পাপের শাস্তি না থাকে, যদি পুণ্যের পুরস্কার না থাকে, তবে এ জগৎ কি অন্ধ নিয়মের অধীন? এখানে কি পিশাচ স্বর্গে যায়, দেবতা নরকে পতিত হয়? যে পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া নিজের উদর পূর্ণ করে, তাহারও যে পরিণাম, আর যে নিজের আহার্য্য অন্যকে দিয়া তাহার জীবনরক্ষা করে, তাহারও কি সেই পরিণাম? মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল নাই, থাকিতেও পারে না।

"যাদৃশম বপতে বীজম, ফলম ভবতি তাদৃশম
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধু কর্ম্মানুশীলয়।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে কর্ম্ম-ফল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥
অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিত ফলরূপ্যন্য কর্ম্মণাম।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হিসঃ।
কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্ব স্ব কর্ম্মানুবর্ত্তিনাম।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাব বিহিতং নৃণাম॥
স্বভাব তন্ত্রোহি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুর মানুষম॥
দেহানুচ্চাবচান জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বর॥
তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থ স্বকর্ম্মকৃত।"

"জন্তু কর্ম্মবশেই জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মবশেই লয় পায়, এবং কর্ম্মবশেই সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। আর যদি অন্যের কর্ম্মের ফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনিও কর্ম্মকর্ত্তাকে ভজনা করেন; কারণ যে কর্ম্ম না করে, তিনি তাহাকে ফলদান করিতে পারেন না। অতএব জীবগণকে যখন কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিতে হইতেছে, তখন তাহাদের ইন্দ্রে প্রয়োজন কি? প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে মনুষ্যদিগের ভাগ্যে যাহা বিহিত হইয়াছে, তিনি তাহার কখনই অন্যথা করিতে পারেন না। মনুষ্য স্বভাবের অধীন, স্বভাবেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। দেবতা, অসুর ও মনুষ্য সকলেই স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। জীব কর্ম্মবশে উচ্চ, নীচ দেহলাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মবশেই শত্রু মিত্র বা উদাসীন হইতে দেখা যায়। সুতরাং কর্ম্মই ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ, স্বকর্ম্মকারী জীব কর্ম্মেরই পূজা করিবে।" ধর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ম্মের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য কর্ম্মে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তুমি যদি ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বরপরায়ণ হইতে চাও, তোমার প্রত্যেক কার্য্য

ধর্ম্মানুমোদিত হওয়া আবশ্যক। তুমি মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বল, কিন্তু তোমার কার্য্য সকলই তাঁহার বিধি-বিরুদ্ধ ; তোমার ধর্ম্ম কোথায়? যে কর্ম্মদ্বারা জগতের মঙ্গল হয়, সেই কর্ম্মই প্রশস্ত,—তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত। যিনি সর্ব্বদা তাদৃশ সদনুষ্ঠানে ব্রতী, তিনিই ধার্ম্মিক ; ভগবান তাঁহাতেই প্রীত। ধর্ম্মই জগতকে ধারণ করে, অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পৃথিবীতে যত প্রকার অশান্তি অত্যাচার ও পাপ আছে, তাহা প্রশমিত হয়। সৎ কর্ম্মই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান। তুমি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছ, কিন্তু তথাপি তোমার চৈতন্য হয় না। পাপের শাস্তি নিজে ভোগ করিতেছ, তথাপি বিন্দু মাত্র স্বার্থের ইঙ্গিতে তোমার মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিতে তুমি প্রস্তুত। তুমি আপাত-মধুর প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গের ন্যায় তাহাতেই ঝাঁপ দিয়া পড় ; যখন মৃত্যুমুখে পতিত হও, তখন তোমার ব্যথিত প্রাণ বলিয়া উঠে "দোষ কার নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।" এ অনুতাপে তোমার ভাবী জীবনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া উদ্ধার নাই।* মনুষ্যজীবন এক ঘোর সমস্যা। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কাহারও নিস্তার নাই। স্বর্ণপর্য্যাঙ্কশায়ী লোকপাল হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র কৃষক এই কর্ম্মবিধির অধীন। তাই শিহ্লন মিশ্র বলিয়া ছিলেন—"নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি"।

* "Answer her (Sphinxe's) riddle it is rwell with thee. Answer it not, pass on oegarding it not, it will answer itself ; the s lution for thee is a thing of teeth and claws. Nature is a dumb lioness, deaf to thy pleadings, fiercely dervouring." Carlyle.

জীবন বৃক্ষ সুকৃতি-পবিত্র-বারি সিঞ্চনে পত্রপুষ্প সুশোভিত হইয়া মুক্তি ফল প্রদান করে ; দুষ্কৃতি-নিদাঘ-তাপে মুঞ্জরিত বৃক্ষও শুষ্ক হইয়া যায়। শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরিচালনা দ্বারা যাহা বিহিত হয়, কেবল তাহাই কর্ম্মনামের বাচ্য নহে ; চিন্তা ও মনোভাবও ইহার অঙ্গীভূত। উহার দ্বারা জীবনের উন্নতি বা অবনতি, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয়। সংসার বা দৃশ্যমান জগৎ কেবল ভাবেরই অভিব্যক্তি!

জীব মাত্রেই ভিন্ন প্রকৃতি এবং ভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট। কেহ বা শৈশব হইতেই জ্ঞানবৃদ্ধের ন্যায় কথা বলে, কার্য্য করে ; কেহ বা পরিণত বয়সেও অর্ব্বাচিনের ন্যায় ব্যবহার করে ; কেহ বা আজন্ম ধর্ম্মপিপাসু, কেহ বা ধর্ম্ম-বিরোধী ; কেহ সরল, কেহ কুটিল, কেহ সাহসী, কেহ ভীরু ; কেহ দয়াবান, কেহ নিষ্ঠুর ; কেহ প্রেমিক, কেহ অপ্রেমিক ; কেহ অত্যন্ত সংসারাসক্ত, কেহ বিরাগী ; কেহ দাম্ভিক এবং উদ্ধত, কেহ নম্র এবং বিনয়ী। এই ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন শক্তির মূলে কি কোন কারণ নাই? অনুশীলন দ্বারা প্রকৃতি এবং শক্তির বিকাশ হয়, ইহাই জগতের নিয়ম। এই অনুশীলনই কর্ম্ম ; বিকাশ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। যদি একইরূপ অনুশীলন দ্বারা একই ফল না হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক শক্তির প্রভেদ বুঝিতে হইবে; ঐ স্বাভাবিক শক্তিও পূর্ব্ব জন্মের অনুশীলনের ফল। পিট পঞ্চম বর্ষেই তাহার পিতার ন্যায় বাগ্মী হইতে চাহিয়াছিলেন ; জনসন চতুর্থ বৎসরেই তাহার প্রিয় পাতিহংসের বিষয়ে এক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ;

থিওডোর পার্কার চতুর্থ বৎসরেই এক কূর্ম্মককে আঘাত করিতে যাইয়া বিবেক-বাণী উপলব্ধি করিয়াছিলেন; নেলসন অতি শৈশবেই বলিয়াছিলেন, "ভয় কাহাকে বলে, আমি জানি না"; বালক নেপোলিয়ন্ দুর্গ নির্ম্মাণ এবং কামান লইয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন; প্রহ্লাদ 'ক' বলিতে কৃষ্ণ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন; পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব মাতার বাক্যানুযায়ী পদ্মপলাশলোচনকে দুঃখহারী ভাবিয়া তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; বালক নিমাই ঠাকুর দোলায় উঠিয়াই আপনাকে কৃষ্ণ ভাবিতেন। এই সকল পুণ্যশ্লোক কি বিনা কর্ম্মে, বিনা তপস্যায়, বিনা অনুশীলনে এইরূপ জন্মলাভ করিয়াছিলেন? এই জন্মলাভ তাঁহাদের পূর্ব্ব সুকৃতির ফল। সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরে বিধিনিয়ম, পূর্ণতা, জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। ঈশ্বর নিরপেক্ষ। তিনি বিনা কারণে কাহাকেও ছোট, কাহাকেও বড় করেন না। সকলেই আপন কর্ম্মবশে জন্মান্তরের সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পাপ প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই মনুষ্যের অধঃপতন। যাহাতে অধঃপতনের সম্ভাবনাও আছে, এরূপ প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহার অভাব হইলে সৃষ্টির কি সার্থকতা হইত? ঈশ্বর যেমন পাপ প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সেইরূপ জ্ঞান এবং বিবেকও দিয়াছেন। তুমি বিবেকানুযায়ী কার্য্য কর, পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। পৃথিবীতে আলো থাকিবে, অন্ধকার থাকিবে না, সুখ থাকিবে দুঃখ থাকিবে না, ইহা অস্বাভাবিক। যদি অন্ধকার না থাকে, আলোর উৎকর্ষ কোথায়? যদি দুঃখ না থাকে, সুখের উৎকর্ষ কোথায়? দুঃখ না থাকিলে সুখ কি অনুভূত হইত? ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়; ঈশ্বর সক্রিয়। সৃষ্ট জগৎ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক সূত্রে শৃঙ্খলিত; তদন্তর্গত সকল জীবই এক মহা বিবর্ত্তনের (Evolution) অধীন—এই বিবর্ত্তন কর্ম্ম-যোগ-সাপেক্ষ। মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—মুক্তি। বৃত্তি নিচয়ের সমসাময়িক এবং যথাযথ অনুশীলন দ্বারা সেই মুক্তি প্রাপ্য। বৃত্তি সমূহের যথাযথ অনুশীলন দ্বারা পূর্ণ জ্ঞান জন্মে। পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে ভৌতিক চিত্ত-বিকৃতি এবং অজ্ঞানজনিত ভ্রম প্রমাদ দূরীভূত হয়; পাপ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মার নির্ম্মল, নিষ্পাপ, শুদ্ধ এবং অবিকৃত অবস্থারই নামান্তর মুক্তি। তখন আত্মার পৃথকত্ব থাকে না; উহা বিশ্বাত্মায় নিমজ্জিত হয়। এক জীবনে এই পূর্ণতা লাভ সম্ভব হয় না, এই জন্য জন্মান্তরের আবশ্যকতা। প্রত্যেক জীবনের কর্ম্মদ্বারা, পর জন্মের পথ প্রসারিত হয়। কখন বা কর্ম্মদোষে সঙ্কুচিত হয়; মুক্তি ততই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। সৎ মনুষ্য মাত্রেই উচ্চতর আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজ জীবনকে গঠিত এবং পরিচালিত করে; কর্ম্মবশে সেই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হয়। পার্থিব সকল আদর্শই অপূর্ণ; তাহাতে আত্মার পরমা তৃপ্তি হয় না। পূর্ণাদর্শ স্বয়ং ব্রহ্ম। সদাত্মা স্বতঃই সেই পূর্ণাদর্শের দিকে ধাবিত হয়। সেই আদর্শ প্রাপ্তি, আর মুক্তি একই কথা। ইহাই বৌদ্ধের নির্ব্বাণ, এবং সাংখ্যের পুনঃজন্ম-রাহিত্য-রূপ প্রকৃতি-বিমুক্ত পুরুষ। আত্মা শুদ্ধ এবং নির্ম্মল হইলে জগত্তত্ত্ব তাহাতে প্রতিভাত

হয়। যোগ-সিদ্ধ ঋষি মুনিগণকে এই অবস্থায় ত্রিকালজ্ঞ বলা হইত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না; আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। এই জন্য তাঁহারা বর্ত্তমান জীবনে কেবল ভৌতিক সুখের জন্যই লালায়িত। তাঁহাদের এই আদর্শ নির্ম্মল নহে। মুক্তি কি? তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেতে পারেন না—উহা যেন ভারতবাসীদিগেরই নিজস্ব। যথা-বিহিত কর্ম্ম দ্বারা অন্য দেশীয়গণ মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবেন না—আমরা একথা বলি না। কার্লাইল (Carlyle) কর্ম্মফল মানিতেন।* ওয়ার্ডসওয়ার্থ(Wordsworth) জন্মান্তর মানিতেন।† মনুষ্য মাত্রেই উদ্দেশ্য-বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই আদর্শ পূর্ণ না হইলেও কর্ম্ম-প্ররোচক। মুক্তি প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা যায়—তাহা পূর্ণ আদর্শ, তাহা ভিন্ন আর সকল আদর্শই অপূর্ণ। কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ; উদ্দেশ্য সাধিত না হইলেও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হন না। উহাকেই নিষ্কাম ধর্ম্ম বলে। স্বার্থের আবিলবর্ত্মে কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনও বিচরণ করেন না। তিনি সকল কর্ম্মই পূর্ণাদর্শ ব্রহ্মে সমর্পণ করেন—উদ্দেশ্য মুক্তি বা আত্মশুদ্ধি।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তকিরোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা॥" গীতা।

যিনি ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

জীবমাত্রেরই প্রকৃতি বশে কর্ম্ম করিতে হইবে; অকর্ম্মা হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং যে কর্ম্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়, সেই কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম করা যায়,তাহাতেই আত্মার উন্নতি হয়। আমি আমার কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতেছি—ইহাতেই আমার আত্মার তৃপ্তি। যাহা কর্ত্তব্য,তাহা ধর্ম্মানুমোদিত—সুতরাং ভগবানের অভিপ্রেত। আমি ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য করিতেছি—তিনি মঙ্গলনিদান, ফল কি হইবে,তাহা আমার বিচার করিবার আবশ্যক নাই। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন! ফল-কামনা এবং আসক্তির সহিত যদি কর্ম্ম কর, আদর্শ খর্ব্ব হইয়া যাইবে। ছিল যাহা সমুদ্রের ন্যায় উদার এবং সুবিস্তৃত, হইবে তাহা গোষ্পদের ন্যায় সংকীর্ণ এবং পরিমিত। তুমি জ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ করিলে—উদ্দেশ্য অর্থসঞ্চয়। অর্থসঞ্চয় হইতে লাগিল, কিন্তু তোমার তৃপ্তি নাই; কেন না তুমি কর্ত্তব্য বোধে জ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ কর নাই। ক্রমে তোমার সকল জ্ঞান লোপ হইয়া, কেবল মাত্র অর্থ সঞ্চয় রূপ জ্ঞান বর্ত্তমান রহিল। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অর্থসঞ্চয় কর; কিন্তু জ্ঞান বিসর্জ্জন দিও না—অর্থ তোমার সঙ্গে যাইবে না; জ্ঞান তোমার চিরসহচর। তুমি কর্ত্তব্যবোধে জ্ঞান চর্চ্চা কর নাই—অর্থাসক্তি-প্রণোদিত, হইয়া তাহাতে ক্ষণেকের তরে লিপ্ত হইয়াছিলে, তাই তোমার শান্তি নাই, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। অপর পক্ষে, তোমার আত্মা উদার; বিশ্বাত্মার কিছু ছায়া তাহাতে পড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীর দীন এবং জীর্ণ শীর্ণ

* "You could no evil, you could no good, but a God would repay it to you. It was as certain as that when you shot an arrow from the earth, gravitation would bring it back to the earth." Carlyle.

† Our birth is a but sleep and a forgetting
The soul that rises with us, our life's star.
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar * *
Wordsworth.

দেহ-কঙ্কাল দেখিয়া, তাহাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়া, তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তাহাদের অনশন-জনিত ক্লেশ তুমি আত্মায় অনুভব করিলে। তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তুমি অন্নছত্র খুলিয়া দিলে। যেমন তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি, তেমন সঙ্গে সঙ্গে তোমার আত্মার শান্তি। কিন্তু যাহারা উপাধি পাইবার জন্য অর্থদান করিলেন, তাহাদের তৃপ্তি কোথায়? গেজেটে নাম উঠিল, উপাধী হইল না; উপাধী হইল, মনোমত হইল না, কিছু বাকী রহিল। এই আসক্তি, এই কামনাই তাহাদের সমস্ত কর্ম্মকে কলুষিত করিল। কেন না, ইহা কর্ত্তব্যবোধ-বিরহিত নিষ্কাম-প্রসূত, নহে। এরূপ স্থলে মুক্তি সুদূরপরাহত।

প্রত্যেক মনুষ্য যেরূপ নিজ সুকৃতি দুষ্কৃতি বশে উন্নতি এবং অবনতি প্রাপ্ত হয়, প্রত্যেক জাতিও তদ্রূপ। ইতিহাস ইহার প্রমাণ। কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচার পান এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নারদ তাহাদিগকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাহারা লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর উল্লাস এবং প্রমত্ততার পরিচয় দিয়াছিল। এই পাপে তাহারা পরজন্মে বৃক্ষজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যমলাজ্জুন বৃক্ষনামে আখ্যাত হইয়াছিল; পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে পুনরায় নরজন্ম প্রাপ্ত হয়। রাজা দশরথ পূর্ব্বজন্মে একটী তপস্বীবালককে ভ্রম বশতঃ বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার বৃদ্ধ পিতা দশরথকে পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। পরজন্মে দশরথের তাহাই ঘটিল। যে রাবণ স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার প্রভাবে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বকেও তুচ্ছ করিতেন; যাহার ভয়ে দেবতাগণ পর্য্যন্ত সন্ত্রাসিত হইয়াছিলেন; পতিপ্রাণা রামময়জীবিতা সীতার উষ্ণ নিশ্বাসে তিনিও সবংশে নিধন হইয়াছিলেন, তাহার সোণার লঙ্কা ছার খার হইয়াগিয়াছিল। পূর্ব্বজন্মে এক ঋষিকন্যা কর্ত্তৃক রাবণ অভিষপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনিই পরজন্মে অগর্ভ-সম্ভবা নারী রূপে তাঁহার নিধন সাধন করিবেন। এই ঋষিকন্যা সতীত্ব রক্ষার জন্য রাবণভয়ে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। রাম বালীকে অকারণ বধ করিয়াছিলেন, পরজন্মে এই বালী ব্যাধরূপে রামাবতার কৃষ্ণকে বধ করিয়াছিল। টারকুইন বংশের জনৈক রাজা লুক্রেসিয়ার (Lucretia) ধর্ম্মনাশ করেন; তাহার পর হইতে রোমরাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসিরাজ্যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শাসনপ্রণালীতে বর্ণ বৈষম্য এবং জাতি-বৈষম্য অপ্রতিহতরূপ চলিতেছিল। সাধারণ লোক এই সকল অত্যাচারে অত্যন্ত ব্যথিত এবং মর্ম্মাহত হইয়াছিল। ফরাসি-রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রবল স্রোতে সেই বর্ণবৈষম্য এবং জাতিবৈষম্য বিধৌত হইয়া সাম্যভাব-প্রবণ প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। বৈদিক-ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইয়া কেবল যাগযজ্ঞে যখন পর্য্যবসিত হইল, তখন বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র কর্ম্মযোগ-প্রচার করিলেন। ধর্ম্মব্যপদেশে যখন ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বঙ্গবাসীর শুষ্ক প্রাণে ভক্তি ও প্রেমের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মের

জীবন্ত ছবি দেখাইয়াছিলেন এবং স্বার্থ-প্রণোদিত বিকৃত ধর্ম্মের গতি ফিরাইয়াছিলেন! গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যখন পরস্পর বিদ্বেষানল এরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল যে, সেই প্রদেশবাসিগণ শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া প্রতিবাসীর সর্ব্বনাশ এবং স্বদেশের স্বাধীনতা লোপ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত; অন্তর্দ্রোহিতা প্রযুক্ত যখন তাহাদের স্বদেশহিতৈষণা প্রবৃত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখনই উহা প্রথমে ফিলিপ এবং আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ও তৎপর রোম কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। রোমের রাজ্যাধিকার অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় শাসন-প্রণালীর শৈথিল্য ঘটিয়াছিল। যে সকল জাতি উহার শাসনাধিকৃত, কালে তাহাদের নৈতিক শিথিলতা রোমকদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল। স্বার্থপরতা ক্রমে স্বদেশ-হিতৈষণার স্থান অধিকার করিল; সম্রাটগণ নিজ নিজ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যোদ্ধৃগণ এবং বীরদিগকে দুর্ব্বিনীত করিয়াছিলেন; পাছে তাহারাই সম্রাটদিগের স্থান অধিকার করিয়া বসে। এই সকল কারণে রোমের সৌভাগ্য-রবি ক্রমে হীন প্রভ, এবং অবশেষে একেবারে অস্তমিত হইল। আজ যে বোয়ারগণ (Boers) স্বদেশ রক্ষার জন্য অমিত তেজে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, তাহারা এক সময়ে ট্র্যানসভ্যালের (Transvaal) আদিম অধিবাসিদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে উৎখাৎ করিয়াছিল। পাপ এবং দুষ্কৃতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। বিশ্ব জগৎ এই কর্ম্মফল সূত্রে বাঁধা। ভারতবাসি! তুমি এক সময় পৃথিবীকে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলে! আজ তোমার সকল কর্ম্মই স্বার্থ-বিজড়িত। তুমি মুখে যাহা বল, তোমার কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তোমার সকল অনুষ্ঠানই অন্তঃসারশূন্য। ধর্ম্মের গ্লানি কি এখন হইতে বাকী আছে? হে নারায়ণ! তোমার আসিবার কি এখনও সময় হয় নাই? পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, ভারতবাসী আবার নিষ্কাম ধর্ম্ম কবে শিখিবে? কবে বলিবে—

"অনন্ত উন্নতি
প্রকৃতির নীতি, প্রভো নহে অবনতি।
মানব অপূর্ণ, মাত্র পূর্ণ নারায়ণ!
পূর্ণব্রহ্ম মহাদর্শ রাখিয়া সম্মুখে,
অপূর্ণ আমরা, প্রভো, যাইব ভাসিয়া
সেই পূর্ণতার দিকে নিব ভাসাইয়া
সমস্ত মানবজাতি উন্নতির পথে।"

শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ভাষাতত্ত্ব। (২)

সংস্কৃতে ষষ্ঠীর একবচন—ঙস্। প্রয়োগে তাহা স্য বা বিসর্গ হয়। শ্রীনাথ বাবুর মত, এই স্য বা বিসর্গ হইতেই বাঙ্গালা ষষ্ঠীর 'র' আসিয়াছে। তাঁর যুক্তি এই। "স, ঃ এবং র একজাতীয় বর্ণ, উহারা অনেক সময় একে অন্যর স্থানে বসে"। যেমন, বহিস্+ভাগঃ=বহির্ভাগঃ। সংস্কৃত পাথস্=প্রাকৃত পাথার। বহিঃ=বাহির। আরো একটা যুক্তি আছে। এ যুক্তি দীনেশ বাবুর। কেন না, নিজের স্বতন্ত্র মত থাকিলেও এ মতও তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। দীনেশ বাবু বলেন, "এই

মতের সাপেক্ষে (?) বলা যাইতে পারে যে, 'স' এবং 'র' উভয়ই বিসর্গে পরিণত হয়"।

যেমন আছে, তেমনই ধরিয়া লইলাম। দেখিয়াছি, সংস্কৃতে বিসর্গ বা স' এর স্থানে বিরামে কখনও র হয় না। অকার বা আকারের পরে বিসর্গ বা স, অন্য বর্ণ পরে থাকিলেও, র হয় না। মানস্ বা মনঃ, রামাস্ বা রামাঃ কখনও মনর্ বা রামার্ হয় না। তবে স্বর বা হশ্ পরে থাকিলে, অ আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত পদান্ত বিসর্গ বা স' এর স্থানে র হইতে পারে বটে। যেমন মুনিরাসীৎ, মুনের্বাক্যম্, সাধুরিচ্ছতি, সাধোর্হৃদয়ম্, আশীরস্ত, ধনুর্ভ্রিয়তে। কিন্তু এই কারণেই যদি মুনেঃ সাধোঃ প্রভৃতি ষষ্ঠ্যন্তপদ হইতে বাঙ্গালার ষষ্ঠীতে মুনির সাধুর প্রভৃতি পদ আসিল, তবে মুনিঃ সাধুঃ আশীঃ ধনুঃ প্রভৃতি প্রথমান্তপদ হইতেই বা বাঙ্গালার প্রথমায় মুনির সাধুর আশীর ধনুর প্রভৃতি পদ আসিল না কেন? বিসর্গ মুনিঃ প্রভৃতিতেও যেমন, মুনি প্রভৃতিতেও তেমনই। সে বিসর্গ মুনেঃ প্রভৃতিতে যে কারণে র হয়, মুনিঃ প্রভৃতিতেও ঠিক্ সেই কারণেই র হইয়া থাকে। বিরামে বিসর্গ কখনও র হয় না—মুনিঃ প্রভৃতিতেও না, মুনেঃ প্রভৃতিতেও না। তবে প্রথমাতেই বা মুনির সাধুর আশীর বা ধনুর হইল না কেন? প্রমাণান্তরে শ্রীনাথ বাবুর মত সমর্থিত না হইলে এ আপত্তির অবকাশ থাকে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বে আর কোনও প্রমাণ নাই। প্রাকৃতে এ বিসর্গবাদের নজীর নাই, পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কি প্রাচীন কি অর্ব্বাচীন, কোনও প্রাকৃতে সংস্কৃতের বিসর্গ র হয় না।

তবে বহিঃ হইতে 'বাহির' হইল কিরূপে? শ্রীনাথ বাবুর এই এক কথা আছে। আপাততঃ কথাটা অমূলকও নয়। হেমচন্দ্রও বলেন, বহিরর্থে প্রাকৃতে বাহিং ও বাহিরং হয়। * কিন্তু তাহাতে এমন প্রমাণ হয় না যে, বহিঃ হইতেই 'বাহির' আসিয়াছিল। হেমচন্দ্র খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তখন তিনি প্রাকৃতে ঐ দুইটা শব্দ পাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রের জন্মের বহুপূর্ব্বে—ন্যূনকল্পেও ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে—বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশ রচিত হয়। সেই প্রাকৃত-প্রকাশে বাহির শব্দ নাই। প্রাকৃত-প্রকাশের মতে বাহিং † হয়, কিন্তু বাহিরং হয় না। ইহাতে আমার এই বোধ হয় যে, বররুচির কাল পর্য্যন্তও প্রাকৃতে বাহির শব্দ ছিল না। থাকিলে, এমন একটা আটপৌরে শব্দের এত বড় একটা উচ্ছৃঙ্খল বিকার তিনি অবশ্য লিপিবদ্ধ করিতেন। বাহি বাহি বা বাহিং অতি প্রাচীন প্রাকৃতেও ছিল, কিন্তু বাহিরং প্রাকৃত প্রকাশেরও পরে জন্মিয়াছে। জন্মের পৌর্ব্বাপর্য্যে আগে বাহিং, পরে বাহিরং। এক আপত্তি হইতে পারে। পালি মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতে না হউক, আর কোনও পুরাণে প্রাকৃতে হয়ত বহিঃ হইতে বাহির শব্দই হইয়াছিল। হেমচন্দ্র তাহাতেই ঐ বাহিরং পাইয়াছেন। এরূপ বুঝিতে বাধা কি? প্রমাণ পাইলে বাধা নাই। কিন্তু সে পুরাণ প্রাকৃতটার প্রমাণ কই? এই জন্য আমার বিশ্বাস, বাহি হইতেই 'বাহির' আসিয়াছে, বহিস্ বা বহিঃ হইতে আসে

* হেমচন্দ্রের প্রাকৃতব্যাকরণ, ২।১৪০। ভুলে আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইঁহকে প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী বলিয়াছি। হেমচন্দ্র কৃত শব্দানুশাসন নামক বিস্তীর্ণ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় মাত্র।

† প্রাকৃত প্রকাশ ৪।৬, ১২।

নাই। ইহাতে কিছু অসম্ভবও নাই। অন্তর বাহির, বা ভিতর বাহির—ভাবমিথুন। একে অন্যের নিত্যসংসর্গী। সকল প্রাকৃতেই অন্তরশব্দ আছে। অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে অন্‌ভন্তর হইতে 'ভিতর' শব্দও জন্মিয়াছিল। অন্তর বা 'ভিতর' এর দেখা দেখি বাহি'ও কালে 'বাহির' হইয়া থাকিবে। ইংরেজ শাব্দিকেরা ইহাকে Analogy বলেন। Analogy ধ্বনিবিকারের অন্যতম হেতু। আর কোথাও প্রাকৃতে * স বা বিসর্গের স্থানে র হইতে না দেখিয়া, আমার এ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে মাত্র।

কিন্তু এক বিসর্গের উপরই শ্রীনাথ বাবু নির্ভর করেন নাই। তাঁর মতে, রামস্য হইতেও রামর বা রামের আসিতে পারে। যেমন সংস্কৃত পাথস্ হইতে আধুনিক পাথার। 'স' যে কোথাও র হয় না, আমিও এমত বলি না। লাটিনে দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তী s অনেক সময়ে r হয়। গ্রিমের সিদ্ধান্তে সংস্কৃতের 'স' ও লাটিন, অস্কান্, ইংরেজী বা আধুনিক হাইজর্ম্মাণে অনেক স্থলে r হয়। কিন্তু তাহাতে শ্রীনাথ বাবুর কোনও উপকার নাই। ধ্বনিবিকারের ধারা এক এক ভাষায় এক একদিকে বয়। এক ভাষায় একরূপ বলিয়া সকল ভাষায়ই সেই রূপ হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। † সংস্কৃতেও অনেক সময়ে স' এর স্থানে র হয়। তাহাতে নির্ভর করিলে কি দোষ হয়, বিসর্গবাদের বিচারে বলিয়াছি। অতএব রামস্য হইতে রামর আসিয়াছে, দেখাইতে হইলে আগে শ্রীনাথ বাবুকে দেখাইতে হইবে যে, সংস্কৃতের স প্রাকৃতে বা অপভ্রংশেও র হয়। প্রাকৃত বা অপভ্রংশের কথা এইজন্যও বলিতেছি যে, ইহারা সংস্কৃতের অধিকতর সন্নিকৃষ্ট, অথচ বাঙ্গালা আবার ইহাদেরই বংশধর। যদি দেখি যে, সংস্কৃতের স প্রাকৃতে, অথবা প্রাচীন প্রাকৃতের স বা শ অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে অনেক সময়েই র হয়, তবে রামস্য রামস্স বা রামশ্‌শ † হইতেও রামর হওয়া অসম্ভব বোধ করি না। কিন্তু শ্রীনাথ বাবু তাহা দেখাইতে পারেন নাই। এক আধটা দৃষ্টান্তেই ভাষাতত্ত্ব নির্ণীত হয়, স্বীকার করিলেও, শ্রীনাথ বাবুর দৃষ্টান্তে তাহা হয় না। নিজেরই যার প্রমাণ চাই, সে অপরের প্রমাণ হইতে পারে না। পাথার শব্দ পাথস্ হইতেই আসিয়াছে, এ কথাটারই যে প্রমাণ চাই। প্রাকৃতে দেখি, হলন্ত শব্দই নাই। পাথস্ এরও স থাকে না। পালিতে প্রথমা ও দ্বিতীয়ায় থাকে না, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে কোনও বিভক্তিতে থাকে না। ‡ পাথস্‌শব্দ প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে পালিতে পাথং, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতে পাহো ও পাহং § হয়। পালিতে যে যে বিভক্তিতে স থাকে, সেখানেও তাহা র হয় না। তবে পাথস্ এরই স পাথারে র হইয়াছে বলি কিসে? ধ্বনিতে অর্থে উভয়তঃ সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু দুই শব্দে জন্যজনকভাব না থাকিতে পারে। এখানে পূর্ণ সাদৃশ্যও নাই। বাহির শব্দের র'ও বহিস্ হইতে আসে নাই, এমন বিবে-

* শনৈঃশব্দও প্রাকৃতে সণিঅং হয়।

† Sayce, Introduction to the Science of Language, Ed. 1880, Vol 1., P. 321.

† স্য মাগধীতে 'শ্‌শ', অন্যান্য প্রাকৃতে 'স্স' হয়।

‡ অন্ত্যস্য হলঃ। প্রাকৃতপ্রকাশ, ৪।৬।

§ সসান্ত প্রাবৃট্‌শরদঃ পুংসি। ঐ, ৪।১৮।

চনা করিবার কারণ কি দেখাইয়াছি। দীনেশ বাবুর যুক্তির উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, সংস্কৃতে চ ও হ উভয়ই ক'এ পরিণত হয়, তবু কোনও প্রাকৃতে চ'এর স্থানে হ বা হ'এর স্থানে চ হয় না। এমন প্রত্যুদাহরণ আরও আছে।

কিন্তু মূলকথাটা শ্রীনাথ বাবুও ভুলিয়াছেন, দীনেশ বাবুও ভুলিয়াছেন। সংস্কৃতে বর্ণ বিশেষের অত্যন্ত সান্নিধ্যহেতু উচ্চারণে তার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণবিশেষ বিকৃত হয় বটে। শুধু পূর্ব্ববর্ণ কেন, অনেক সময়ে পূর্ব্ব পর দুইই বিকৃত হয়। বর্ণ দ্বয়ের এইরূপ সন্নিকর্ষকে সংস্কৃত ব্যাকরণে সংহিতা বা সন্ধি বলে। পূর্ব্বে মুনিরাসীৎ মুনের্বাক্যম্ প্রভৃতি যত দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহা এই সন্ধিরই দৃষ্টান্ত। শ্রীনাথ বাবুর 'বহির্ভাগঃ' বা দীনেশ বাবুর 'বহির্গত'ও তাই। আমার কথা এই যে, বাঙ্গালার ব্যুৎপত্তি বুঝাইতে সংস্কৃতের এই সমস্ত সন্ধিঘটিত ধ্বনিবিকারের উপর নির্ভর করা যায় না। উচ্চারণে এই সকল বিকার সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক বা অবশ্যম্ভাবী কি না, সে বিচার এখানে তুলিব না।(১) বলিয়াছি, প্রাকৃতই সংস্কৃতের প্রথম বিকার। এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে, সেই প্রথম বিকারেই সন্ধির জঞ্জালটা কাটিয়া গিয়াছিল। প্রাকৃত সে দিক্ই মাড়ায় নাই। মুনিরাসীৎ বা সাধুরিচ্ছতি প্রকৃতে মুনী আসি বা সাহু ইচ্ছই হয়। মুনের্বাক্যম্ প্রাকৃতে মুনিনো বা মুনিস্স বাক্কং হয়। স্য-স্থানে র হইবে দূরে থাকুক, ইকারান্ত উকারান্ত শব্দেও মুনিস্স সাহুস্স! ধনুর্দ্ধরতি বা ধনুর্ভিঃ প্রাকৃতে ধণুং ধরই বা ধণুহিং হয়। যেখানেও বা সন্ধির একটু গন্ধ পাই, সেখানেও তাহা সংস্কৃতের অনুকারী নহে। আশীর্ব্বাদঃ ধনুর্ধরঃ বহির্ভাগঃ বা বহির্গত প্রাকৃতে আসির্বাদো ধণুব্ধরো বহিব্‌ভাও বা বহিগ্‌গঅ হয়। প্রাকৃতে স্বরহীন র'ই নাই। সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, বাঙ্গালা—সে পারম্পর্য্যধারাটা পাঠককে আবার স্মরণ করাইয়া দিই। যে নজীরের বলে বিসর্গ বা স হইতে র করিতে চাই, পাঠক দেখিবেন, বাঙ্গালার মাতামহী বা প্রমাতামহীই সে নজীরটা রদ্ করিয়া লইয়াছিলেন। সংস্কৃতকে সম্মুখে করিয়া বাঙ্গালা জন্মে নাই। বাঙ্গালা যখন জন্মিয়াছিল, তখন সংস্কৃত প্রেত। সম্ভবতঃ যাহাদের মুখে বাঙ্গালা জন্মিয়াছিল, সংস্কৃতের তারা ধারও ধারিত না। র' এর ব্যুৎপত্তি বুঝাইতে বহির্ভাগঃ বা বহির্গত প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এই কারণে অসঙ্গত।

একটা বিশ্ববিশ্রুত নামের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়াই এ মতটা এত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলাম। কিন্তু এ পথই নয়। বাঙ্গালার জন্মরহস্য জানিতে হইলে আগে প্রাকৃতের কাছে খুঁজিতে হইবে, সরাসর সংস্কৃতে তাহা পাইবার সম্ভাবনা অল্প। ইহাকেই আমি আরোহি-প্রণালী বলিয়াছিলাম। হর্ণলের প্রণালীও সেই। র' এর ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত হর্ণলের। ইংরেজীবিৎ পাঠক বঙ্গদেশীয় আসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৭২ সালের জর্নালে সে মত সবিস্তার পাঠ করিবেন। কিন্তু আমার সকল পাঠক ইংরেজী জানেন না, অতএব এখানেও তার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, প্রাকৃতে অনেক

(১) Whitney's Sanskrit Grammar, §§ 103, 115, &c.

শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বনামশব্দে উহা ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরেই বসে। যথা মম কেলকাইং গোণাইং (মম গাঃ), অম্হ কেলকে গেহদুআরং (অস্মাকং গেহদ্বারম্), কস্স কেরকং এদং পবহণং (কস্য এতৎ প্রবহণম্)। অন্য শব্দে ষষ্ঠ্যন্তের পরেও বসে, সমাসবৎ মূল শব্দেও যুক্ত হয়। যথা অপ্পণো কেরিকং জাদিং (আত্মনঃ জাতিম্) শালকাহ (১) কেলকে উজ্জাণে (শ্যালকস্য উদ্যানম্) পড়িবেসি অগহবই-দারঅকেরিআএ সুবগ্গসআড়আএ (প্রতিবেশিগৃহপতিদারকস্য সুবর্ণশকটিকয়া)। লাঅশালঅশণ্ঠাণকেলকে পবহণে (রাজশ্যালকসংস্থানস্য প্রবহণম্। কথাগুলি মৃচ্ছকটিকের। মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতেই এই কেরক প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ দেখি। অন্যান্য সংস্কৃত নাটকেরও কোন কোন খানাতে আছে, কিন্ত খুব কম। যেমন অভিজ্ঞানম শকুন্তল রত্নাবলী বা মালতীমাধবে। অনেক নাটকে একেবারে নাই। যেমন, বোধ হয়, উত্তররামচরিতে।

বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশে এই কেরক প্রভৃতির কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রের কালে শব্দটার ভূয়ঃপ্রচার হইয়াছিল বোধ হয়। তাঁর প্রাকৃত ব্যাকরণে এ বিষয়ে এক পৃথক্ সূত্রই আছে। (২) সেখানে ইহার রূপ—কের। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, হেমচন্দ্রের মতে অপভ্রংশে ঐ শব্দই কেরউ হইত। অপভ্রংশ নামে তিনি সেকালের লৌকিক ভাষাই বুঝিতেন না কি, বলিতে পারি না। কেন না তাঁরই প্রায় সমকালিক চাঁদ বর্দাই এর কাব্যেও শব্দটা আছে—

দৌরৈ গাজ অন্ধং চাহুবান কেরৌ।

চৌহানের হাতী অন্ধ হইয়া ছুটিতেছে। এ তিরৌরী না থানেশ্বর? চাঁদের প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে কবীর। কবীরের পদেও আছে—

কো তেরা পুত্র পিতা তুঁ কাকো
মিথ্যা ভ্রম জগকেরো।

কেরউ কেরৌ বা কেরো একই শব্দ।

কবীরের শতবর্ষ পরে তুলসীদাস। তুলসীদাসেও কেরো আছে। তা ছাড়া, কের কেরা কেরে কেরি এবং কেরী আছে। প্রাকৃতে যেমন লিঙ্গভেদে বা বচনভেদে রূপভেদ হইত, এখানেও তাই। পুংলিঙ্গের একবচনে কের বা কেরা, বহুবচনে কেরে। স্ত্রীলিঙ্গে কেরি বা কেরী। আর একটা পরিবর্ত্তন তুলসীদাসের পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল,কেন না কবীরেও তাহা দেখিতে পাই। কের স্থানে কর হইয়াছে। কাশীর সন্নিকটে প্রচলিত গঁবারী ভাষায় এই 'কর' এখনও পাওয়া যায়। যেমন কেরর' বা কেকৈ, একর বা এৈক। অর্থাৎ কার, এর।

পশ্চিম ছাড়িয়া এখন প্রাচীতে যাই। আমাদের বিদ্যাপতি মৈথিল। বিদ্যাপতি তুলসীদাসেরও পূর্ব্বে, কবীরেরই প্রায় সমকালে। বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদে কের, কেরা প্রভৃতি নাই। কর'ও আমি তিনটা শব্দ মাত্র পাইয়াছি—যাকর, তাকর, পিয়াকর। মিথিলায় প্রচলিত অন্যান্য পদে এই সকল কি পরিমাণে আছে, বলিতে পারি না। তবে বিদ্যাপতির কালে মৈথিলীতে 'ক'ই ষষ্ঠীর প্রধান বিভক্তি হইয়া

(১) শালকাহ—শ্যালকস্য। ঙসো হো বা দীর্ঘত্বং চ। প্রাকৃতপ্রকাশ, ১১।১২। এইরূপ শুধু মাগধীতে হয়। অন্যান্য প্রাকৃতে—সালকস্স।

(২) ইদমর্থস্য কেরঃ। ২।১৪৭।

দাঁড়াইয়াছিল,* এ কথা নিশ্চিত। কের'ও ছিল, বোধ হয়। মিথিলা পর্য্যন্ত কের কর দুইই পাই।

উড়িয়াতে কের নাই, কিন্তু কর আছে। উড়িয়াতে ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি—মানঙ্কর। যেমন ঘরমানঙ্কর (ঘরগুলির)।

তার পর, বাঙ্গালা। বিদ্যাপতিকে আমাদের বলিতে প্রমাণ দিতে হয়। বিদ্যাপতি বাঙ্গালার আদিকবিও নহেন। কেন না, তাঁরও শতাব্দী পূর্ব্বে কৃত্তিবাস। দীনেশ বাবুর অনুমান সত্য হইলে, সেই কৃত্তিবাসেরও প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মাণিকচাঁদের গীতটার অধিকাংশ গ্রথিত হয়। কিন্তু এ দুয়েতে কোথাও কের বা কর নাই। ইহাদের প্রায় সর্ব্বত্রই ষষ্ঠীর চিহ্ন—র। কম পক্ষেও তবে সাতশত বৎসর হইল, বাঙ্গালায় এই র বিভক্তিটা আসিয়াছিল। আজিও তাই আছে। উড়িয়াতেও ষষ্ঠীর একবচন—র। যেমন ঘরর (ঘরের)। মাণিকচাঁদের গীতেও এইরূপ পদ আছে। যেমন রূপর, চরণর। বিদ্যাপতির মৈথিলীতেও মোর হামার তোর তোহর তোহার প্রভৃতি র যুক্ত ষষ্ঠ্যন্ত পদ পাওয়া যায়। তা ছাড়া পিয়ার হিয়ার সখীর প্রভৃতিও আছে। কিন্তু সে গুলি খাঁটি বিদ্যাপতির হইলে বাঙ্গালারই দেখা দেখি গড়া হইয়াছিল মনে হয়। কেন না, খাস্ মৈথিলীতে সর্ব্বনাম ছাড়া অন্য শব্দে ষষ্ঠীর এই র বসিত, বোধ হয় না। সব সর্ব্বনামেও বসিত কি না সন্দেহ। হিন্দী বা উর্দ্দুতেও এই ষষ্ঠীর র আছে। এখন তাহা বারটা পদে মাত্র পাওয়া যায়—মেরা-রে-রী, হমারা-রে-রী, তেরা-রে-রী, তুম্হারা-রে-রী। কিন্তু প্রাচীন উর্দ্দুতে অন্যত্রও বসিত। মেঘরাগের এক প্রসিদ্ধ ধ্রুপদে আছে—

* সলিতা গহর ভয়ে যেন প্রমাণ
উছল চলত তীথে বারপার মগমুদে
পাতি সন্দেহরা উপজত জনতাহি।

আধুনিক উর্দ্দুতে 'সন্দেহরা' র স্থানে সন্দেহকা হইত।

প্রকৃত বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বাঙ্গালায় এই ষষ্ঠীর র ত্রিবিধ যোগে দেখিতে পাই। প্রথম, এর। যেমন কুলের, বংশের, মায়ের, ভাইএর, বউএর। দ্বিতীয়, অরবার। যেমন মাণিকচাঁদের গীতে জীবর, রঙ্গর, পুরুসর, সিন্ধার, পাথার; অন্যত্র বিদ্যার, সরস্বতীর, সাধুর, মেঝোর, গোকুলোর। তৃতীয়, আর। যেমন সবার, আপনার, আমার; মাণিকচাঁদের গীতে পরার। হর্ণলের মত, কের ও কর হইতেই এই এর ও অর আসিয়াছে। কের ও কর দুই বিভিন্ন ধারায় বিকৃত হইয়াছিল। এক, র'এর লোপে। (১) তাহাতে কেঅ এবং কঅ হয়। কেঅ হইতেই সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দী ও আধুনিক গ্নঁ-বারীর কে বা কৈ এবং কঅ হইতে মৈথিলী ও আধুনিক হিন্দীর ক কা' প্রভৃতি আসিয়া থাকিবে। ষষ্ঠীর এই ক কচিৎ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও (২) পাওয়া যায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। বিকা-

(১) কর্পূরমঞ্জরী হইতে হর্ণলে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, "অকলি অপইরন্তবিবভমাইং"। পাইরন্ত—পরিরন্ত। কিন্তু কের বা কর হইতে কে বা ক হইবার আরও একটা সম্ভবপর কারণ আছে। এখানে আর তাহা বলিলাম না।

(২) বাঙ্গালা বৈষ্ণবকাব্যের ক বোধ হয় ব্রিন্দবোলি বা মৈথিলীর নকল। কিন্তু তা ছাড়াও ক আছে। দীনেশ বাবুর ধৃত "ভীষ্মক ভয়ে যত সৈন্য যায় পলাইয়া" দেখুন।

রের দ্বিতীয় ধারা, ক'এর লোপে। তাহাতে এর বা অর হয়। হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া বা বাঙ্গালার র'এর বীজ সেই।

কের বা কর হইতে ক'এর লোপ অসম্ভব নহে। সংস্কৃত শব্দের মধ্যগত অসংযুক্ত ক প্রাকৃতে প্রায়ই লুপ্ত হয়। (১) যেমন নউলং (নকুলম্), মহুঅরো (মধুকরঃ), সহআরো (সহকারঃ। মৃচ্ছকটিকে আছে, অহং চন্দণও চম্মারও (অহং চন্দনকঃ চর্ম্মকারঃ)। প্রাকৃতের ক'ও অপভ্রংশে এইরূপে লুপ্ত হইয়া থাকিবে, বিচিত্র নহে। হর্ণলের সাতশত বৎসর পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের মনেও কথাটা জাগিয়াছিল বোধ হয়। কেন না, তাঁর মতে প্রাকৃত অম্হ কেরো এবং তুম্হ কেরো অপভ্রংশে অম্হহং কেরউ বা অম্হারা এবং তুম্হহং কেরউ বা তুম্হারা হয়। (২) অম্হ কেরো = অম্হ করো = অম্হ অরো = অম্হারো বা অম্হারা, বা বঙ্গালাতে আমার উড়িয়াতে অম্হর। অথবা, অম্হ কেরো = অম্হ কারো = অম্হ আরো = অম্হারো বা অম্হারা, বাঙ্গলাতে আমার। সেইরূপ তুম্হ কেরো হইতে তুম্হারো বা তুম্হারা এবং বাঙ্গালাতে তোমার। (৩) কের হইতে কার সহজেই জন্মিতে পারে। 'এ' হইত 'অ্যা'—'অ্যা' হইতে আর একটু সরিলেই 'আ' হয়। কার হইতে 'আর'। বাঙ্গালার ষষ্ঠীতে যে শুধু 'র' ব্যবহৃত হয়, তাহাও এর বা অর'এরই অবশেষ। 'র' কেবল স্বরান্তশব্দের পরেই বসে। এক স্বরের অব্যবহিত পরে আর একটা স্বর উচ্চারণ করিতে একটু বাধো-বাধো ঠেকে। এই স্বরপ্রশ্লেষ (৪) দূর করিবার জন্যই কালে স্বরান্ত শব্দের পরস্থিত এর বা অর'এর এ বা অ লুপ্ত হইয়াছে। অনেক স্থলে এখনও তার চিহ্ন পাই। যেমন মাএর বা মার, ঝিএর বা ঝির। দুই রূপই প্রচলিত।

তা হিন্দী প্রভৃতিতে কের কর আছে, সেখানে নয় তো হর্ণলের মত মানিয়া লইলাম। কিন্তু বাঙ্গালার ষষ্ঠীও যে কের হইতে আসিয়াছে, তার প্রমাণ কি? তারও প্রমাণ আছে। আজকের, কালকের, কতকের, যতকের প্রভৃতি এখনও প্রচলিত। মাণিকচাঁদের গীতে কের বা কর নাই, কিন্তু কার আছে। যথা কোটেকার (কোথাকার)। (৫) মৃচ্ছকটিকের 'অপপণো কেরিকং এবং বাঙ্গালার 'আপনকার' মিলাইয়া দেখুন। আপনকার হইতেই আবার 'আপনার' হইয়াছে। কবেকার, কখনকার, কোন্ খানকার, কোথাকার, সেখানকার, সেদিনকার, গেলবছরকার, উপরকার, নীচেকার প্রভৃতিও দেখাইতে পারি। এ সকল যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনই আবার এখানের, সেদিনের, উপরের প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে কবের কোন্খানের'ও বলে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও দোঁহাকার দোঁহার, সবাকার সবার, দুইই পাই। শেষ হিন্দী মৈথিলী উড়িয়া বাঙ্গালা সহোদর না হইলেও সপিণ্ডা, পাঠক সে কথাটা ভুলিবেন না।

(১) কগচজতদপযবাং প্রয়োলোপঃ। প্রাকৃতপ্রকাশ, ২।২।

(২) ৪।৪৩৪।

(৩) আমার তোমার, মূলে দুই ই বহুবচন।

(৪) Hiatus.

(৫) কোটে = কোনটে = কোন্ঠে = কোন্ ঠাঁএ। প্রাকৃতে স্থানশব্দ ঠাণ হয়। ঠাণে = ঠাঁএ। এখনও বলি—আমার ঠেঁ, তার ঠেঁ। অর্থাৎ আমার কাছে বা আমার কাছ থেকে, তার কাছে বা তার কাছ থেকে। 'ঠেঁ'র স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে ডে হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার ঠাঁ'ক্রি ছিল।

এখন এ সকলের যাহা মূল, সেই কেরক বা কের কোথা হইতে আসিল? হর্ণলে বলেন, 'কৃত' হইতে। কৃত প্রাকৃতে কিদ কিঅ কদ কত কঅ বা কড় (১) হয়। কড় হইতে কের হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মনোরম নহে। কৃত হইতে কের আসিয়াছে বলিলে অর্থেও বড় কষ্টকল্পনা করিতে হয়। বস্তুতঃ এ মতে ১৮৭২ সালে হর্ণলের যে দাঢ্য ছিল, ১৮৮১ সালে (২) আর যেন সে দাঢ্য দেখি না। তখন তিনি ভারতবর্ষীয় পুরাতন জনবাদের উপরও নির্ভর করিয়াছেন! কেরক'এর মূল এখনও অনিশ্চিত।

কিন্তু তাহাতে প্রধান সিদ্ধান্তের হানি নাই। বলিয়াছি, এ আরোহিপথে যতটুকু উঠিতে পারি, ততটুকুই লাভ। আর কয়েকটা পদের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া হর্ণলের মত সম্পূর্ণ করি। অস্মদ্ এবং যুষ্মদ্'এর ষষ্ঠীর একবচনে প্রাকৃতে মহ এবং তুহ হয়। মহ চাঁদের কাব্যেও আছে—

মহ সগগন সা করিহি সু কেমং। আমার সখীত্ব সে করিবে কিরূপে? বিদ্যাপতিতে মোহি আছে। অন্ত্য অকার লুপ্ত হইলে মহ্ ও তুহ্ হয়। বিদ্যাপতিতে মো এবং তো আছে—

তৈখনে হরব মো চেতনে।
* * *
রামা হে তো বড়ি কঠিন দেহ।

বিদ্যাপতিতে তু'ও আছে। 'তুয়া' তো কত আছে, তার সংখ্যা নাই। প্রাকৃতে মহ ও মহ্ কেরো, দুয়েরই এক অর্থ। মহ কেরো = মহ্ কর = মহ অর = মহর। কবীন্দ্রের মহাভারতে মোহর এবং সঞ্জয়ের মহাভারতে মোহোর আছে। ইহা হইতেই হকারলোপে (৩) 'মোর'। এইরূপে তুহ কেরো হইতে তুহর। বিদ্যাপতিতে তোহর আছে। তা হইতেই 'তোর'। প্রাকৃতে তদ্‌শব্দ ষষ্ঠীর একবচনে তস্স তাস বা তাহ (৪) হয়। তাহ কেরা = তাহা কর = তাহ আর = তাহর বা তাহার। পক্ষান্তরে হকার লোপে, তাহকর = তাকঃ। তাহর বা তাকর হইতে 'তার'। এইরূপে যাহার যার, কাহার কার। প্রথমার একবচনে অদস্ শব্দ প্রাকৃতে তিন লিঙ্গেই অহ(৫) হয়। তাহ জাহ প্রভৃতির দেখাদেখি প্রথমান্ত অহ হইতেও বোধ হয় অহর বা আহার এবং অকর জন্মিয়াছিল। আহার হইতে ওহার বা উহার, এবং অহর বা অকর হইতে অর বা ওর আসিয়াছে। 'অস্য' হইতে অর হইতে পারে না। ওহার বা ওআর এবং অর পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। এতদ্ শব্দ পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে এসো বা এস হয়। ক্রমদীশ্বরের মতে অপভ্রংশে তাহা তিন লিঙ্গেই 'এহ' হয়। (৬) এহ হইতেও এহর বা এহার এবং একর। এহার বা এআর পূর্ব্ববঙ্গে ও একর গঁবারী ভাষায় প্রচলিত আছে। এহার হইতে

(১) কৃষমৃগগমাং গুস্য ডঃ। প্রাকৃত-প্রকাশ, ১১।১৫।

(২) সেই বৎসর হর্ণলের Comparative Grammar প্রকাশিত হয়।

(৩) Spiritus asper প্রথম হয়ত Spiritus lenis হইয়াছিল। কালে তাও গিয়াছে।

(৪) যেমন, শালকাহ। শালকাহ পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

(৫) হশ্চ সৌ। প্রাকৃত-প্রকাশ, ৬।২৪।

(৬) এহাদিস্ত্রেতদস্ত্রিসমঃ। সংক্ষিপ্তসার, প্রাকৃতপাদ, অপভ্রংশারম্ভ, ৮ সূঃ।

'ইহার' এবং এহর বা একর হইতে 'এর'। অথবা ইহার' এর মূল ইদম্‌শব্দও হইতে পারে। অহ এহ'র দেখাদেখি 'ইহ' ও চলিয়া থাকিবে।

তৃতীয় মত দীনেশ বাবুর। প্রাকৃতে ষষ্ঠী বহুবচনের বিভক্তি ণং বা ণ। দীনেশ বাবুর মতে, এই ণই বাঙ্গালায় 'র' হইয়াছে। এরূপ ধ্বনিবিকার অসম্ভব নয়। ণকার রকার, উভয়ই মূর্দ্ধন্য। ণএর ধ্বনিতে ড় বা র' এরও একটু আমোদ আছে। ণ হইতে প্রথম বোধ হয় ড়ঁ, ড়ঁ হইতে পরে ড় বা র। উড়িয়াদের মুখে এখনও ঐ ড়ঁ ধ্বনি শুনা যায়। চরণ বলিতে তারা চড়ঁর বলে। বাঙ্গালায়ও দৃষ্টান্ত আছে। রণ (১) = রড় = লড়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 'রড়ে' পাওয়া যায়। মাণিকচাঁদের গীতে লহড় এবং পূর্ব্ববঙ্গে এখনও লড় শব্দ আছে। তার অর্থ—দৌড়। হিন্দীতে লড়না ধাতুর অর্থ দৌড়ান নয়, যুদ্ধ করা। যুদ্ধবাচী রণশব্দও গত্যর্থক বা শব্দার্থক রণ ধাতু হইতেই আসিয়াছে। ছিন্ন = ছিন্ন = ছিণ্ণ = ছিঁড়া। মহাভাষ্যকার বলেন, গোশব্দের একটা অপভ্রংশ গোণী। (২) মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতে ঐ শব্দটাই পুংনপুংসক লিঙ্গে আছে—প্রথমার একবচনে গোণা, দ্বিতীয়ার বহুবচনে গোণাইং। মূলশব্দটা তবে বোধ হয়—গোণ। ক্রমদীশ্বরের মতে গোণশব্দ অপভ্রংশে প্রথমার এক বচনে'গোণু'হয়। (৩) গোণু হইতেই 'গোরু'। অন্ন = অন্ন = আণ = আন বা আর। আর'এর এই ব্যুৎপত্তি শ্রীনাথ বাবুও মঞ্জুর করিয়াছেন। ণ হইতে র হওয়া অসম্ভব নয়।

কয়েকটা পদের ব্যুৎপত্তি এই মতেই বুঝা যায়, হর্ণলের মতে তাহা বুঝাইতে পারি না। পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, প্রাকৃতে যদ্‌ ও তদ্‌ ষষ্ঠীর বহু বচনে জাণ ও তাণ হয়। এই জাণ হইতেই জাঁর অর্থাৎ যাঁর এবং তাণ হইতে তাঁর আসিয়াছে। চন্দ্রবিন্দুটা 'কাহারও মনগড়া নহে। উহা ঐ বিলুপ্ত অনুনাসিকেরই অবশেষ। যেখানে যেখানে অনুনাসিক বিকৃত হইয়াছে, তার সর্ব্বত্রই বোধ হয় প্রথমে এইরূপ চন্দ্রবিন্দু ছিল। কালে অনেক শব্দেই তাহা ক্ষীণ বা বিলীন হইয়াছে। কেবল যেখানে নিশানা না থাকিলে সদৃশ শব্দের সহিত গোল হয়, সেখানে কিছু পরিস্ফুট আছে। যেমন হাস হাঁস, সাজ সাঁজ। সেইরূপ যার যাঁর, তার তাঁর। যাঁর তাঁর'এর অর্থ পূর্ব্ব প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। ইহাদের রূপান্তর যাঁহার তাঁহার। এই হা'এর উৎপত্তি তিন প্রকারে বুঝান যায়। প্রথম, হয়ত ইহা আস্থানিক মাত্র—স্বরের অস্বাভাবিক বল বৃদ্ধিতে জন্মিয়াছে। (৪) যেমন,' এথা'হইতে হেথা, প্রাচীন বাঙ্গালায় কখন কখন 'কোন' হইতে কোহ্ন, 'বিনে' হইতে বিহনে। বিন্দুহীন যাহার তাহার'এর হা'ও বিন্দুহীন যার তার হইতে এইরূপে জন্মিয়া থাকিবে, বিচিত্র নহে। অথবা পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, বিন্দুহীন যাহার তাহার যদি সেইরূপেই জন্মিয়া থাকে, তবে হয়ত তারই দেখাদেখি বিন্দুযুক্ত যাঁর তাঁর'ও যাঁহার তাঁহার হইয়াছে। অথবা প্রাকৃতে দেখি,

(১) কণ রণ গতৌ। ভ্বাদিঃ।

(২) মহাভাষ্যে ১ অ. ১ পা. ১ আ.।

(৩) অতো ঘমোরুদ্ধা। সংক্ষিপ্তসার, প্রা. অপ. ২২ সূ.।

(৪) স্বরের সঙ্গে প্রথম প্রথম বোধ হয় Spirittus lenis পরে Spiritus asper.

ষষ্ঠ্যেক বচনন্তে পদের পরেও ষষ্ঠী বহু বচনের বিভক্তি বসে। যেমন মহাণ, মজ্ঝাণ, তুহাণ, তুজ্ঝাণ। মহ, মজ্ঝ, তুহ, তুজ্ঝ—এ সকলই ষষ্ঠীর একবচন। ইহাদের দেখাদেখি ষষ্ঠ্যেকবচনান্ত জাহ তাহ হইতেও ষষ্ঠীর বহুবচনে জাহাণ তাহাণ হইয়া থাকিবে। জাহাণ=জাহাঁর, তাহাণ=তাহাঁর। কালে চন্দ্রবিন্দুটা মধ্য হইতে আদিতে গিয়াছে। এখানেও র'এর বীজ 'ণ', বিন্দু অণুনাসিকের প্রতিনিধি। এ পক্ষেও দীনেশ বাবুর শরণ লইতে হয়। যাঁর যাঁহার তাঁর তাঁহার—হর্ণলের মতে এ চন্দ্রবিন্দু বুঝাইতে পারি না।

কোথায় দীনেশ বাবুর মত অবশ্যগ্রাহ্য, দেখাইলাম। কিন্তু সকল স্থলে তাহা সমীচীন বোধ হয় না। না হইবার প্রধান কারণ এই যে, ণ বহুবচনের বিভক্তি। হিংতো যেমন গোড়ায় বহুবচন হইলেও অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে (১) এক বচনেও বসিতে দেখি, ণ'এর সম্বন্ধে আমি সেরূপ কোনও প্রমাণ পাই নাই। তা না পাইলে দীনেশ বাবুর মতও সর্ব্বত্র গ্রহণযোগ্য হয় না। 'আমার' 'তোমার' মূলে বহুবচন হইলেও এখন একবচন বটে। কিন্তু ইহাদের কথা স্বতন্ত্র। অস্মদ্ শব্দে একবচন বা দ্বিবচনের স্থানে সংস্কৃতেও বহুবচন হইত।(২) প্রতিযোগিভাবে অস্মদ্এর সহিত নিত্যসংসৃষ্ট বলিয়াই বোধ হয় যুষ্মদ্এও পরে ঐরূপ প্রয়োগ চলিয়াছে। কিন্তু সকল স্থলে Analogy ধরিলে বড় কল্পনাগৌরব হয়। হর্ণলের মতে তাহা আবশ্যক নহে। যাঁর তাঁর প্রভৃতি ছাড়া অন্যত্র হর্ণলের মতই শ্রেয়ঃ।

(১) আর্ষপ্রাকৃত ও অর্দ্ধমাগধীতে।
(২) অস্মদো দ্বয়োশ্চ। পাণিনি, ১।২।৫৯।

দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি বাঙ্গালায় একরূপ—কে, রে, বা এ। অনেক স্থলে কর্ম্মে বিভক্তিই নাই। প্রাকৃতে দ্বিতীয়ার একবচন ছিল অনুস্বার। তার লোপেই বাঙ্গালা কর্ম্মের এই নগ্ন রূপ। কালে বিভক্তিশূন্য কর্ত্তা হইতে এই বিভক্তিশূন্য কর্ম্মকে পৃথক্ করিবার জন্যই ঐ 'এ' বিভক্তিটা (৩) জন্মিয়া থাকিবে। সংস্কৃতের ঙে বিভক্তির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। ঙে প্রাকৃতেই উঠিয়া গিয়াছিল। রে'র এ'ও এইরূপে আসিয়াছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ষষ্ঠীর র দ্বিতীয়া বা চতুর্থীতেও বসিত এবং কচিৎ এখনও বসে। ষষ্ঠীর সাধারণ অর্থ হইতে এই সকল বিভক্তির অর্থ বিশিষ্ট করিবার জন্য এখানেও 'এ' আসিয়াছে। কে'র এ'ও এইরূপ। মাণিক চাঁদের গীত, সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন রচনায় দ্বিতীয়া বা চতুর্থী অনেক স্থলেই শুধু 'ক'। ক আবার ষষ্ঠীরও বিভক্তি। তা শুধু হিন্দী বা মৈথিলীতে নয়, কচিৎ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও আছে, দেখিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে এখনও ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি ক বা গ। যেমন আমাক (গ), তোমাক (গ), তাক (গ), ব্রাহ্মণক (গ)। (৪) অর্থাৎ আমাদের, তোমাদের, তাদের, ব্রাহ্মণদের।

(৩) দীনেশ বাবুর ধৃত জনার্দ্দন কবির দুইটা চরণ এই—

ব্রতের বিধান সর্ব্ব ব্রতীএ কহিল।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাধুএ তুষিল।

জনার্দ্দনে কে, রে'ও আছে।

(৪) আর এক রূপ—আমারক্ (গ), তোমারক্ (গ) তারক্ (গ), ব্রাহ্মণেরক্ (গ)। ঐ সকল স্থানে দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীরও ঠিক্ এই দুই রূপ।

এখানেও তবে দ্বিতীয়া চতুর্থীর নির্দ্ধারণ চাই। অথবা 'কে' ই আদিম রূপ। তাও অসম্ভব নয়। (১)

কিন্তু পূর্ব্ব মতে কে'র ক কোথা হইতে আসিল? দীনেশ বাবু ও শ্রীনাথ বাবুর মত, সংস্কৃতের স্বার্থিক ক প্রত্যয় হইতে। প্রমাণ-চ্ছলে দীনেশ বাবু বলেন, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে বৌদ্ধগাথায় এবং প্রাকৃতে এই স্বার্থিক ক'এর ভূরি প্রয়োগ হইত। কিন্তু তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় না। এই ক যে কেবল দ্বিতীয়াতেই প্রযুক্ত হইত, এমত নহে। দীনেশ বাবুর ধৃত ললিতবিস্তরের গাথায়ই ক যেমন দ্বিতীয়াতে আছে; তেমনই আবার প্রথমা বা সপ্তমীতেও আছে। আর নিজেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, " 'ক' পূর্ব্বে বিভক্তি-বোধক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা শুধু শব্দের অন্ত্যবর্ণ ছিল।"

বীমস্ ও হর্ণলের মতে, 'কক্ষে' হইতে কে আসিয়াছে। কক্ষে—কক্খে—কক্খহঁ—কহাহঁ—কহি—কহে এই রূপে নাকি সম্ভবতঃ শেষে বাঙ্গালায় 'কে'। এরূপ ধ্বনি-বিকারই অসম্ভব, এমত বলি না। কিন্তু চাঁদ ও তুলসী দাসের কতকগুলি সংদিগ্ধ পদ ছাড়া এ মতের কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণও নাই।

ভাষাতত্ত্বে অনেক আন্দাজ চলে। আমিও একটা আন্দাজ করিতে পারি।

(১) মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতে একটা 'কে' দেখিয়া দীনেশ বাবু বুঝিয়াছেন, প্রাকৃতেও আমাদের দ্বিতীয়ার 'কে' টা ছিল। কিন্তু সেখানে 'চারুদত্তাকে' দ্বিতীয়ান্ত নহে, প্রথমান্ত। বাচ্যও সেখানে কর্ম্ম নয়, কর্ত্তা। যে প্রাকৃতে ঐ কথাটা রচিত, তার নাম মাগধী। মাগধীতে অকারান্ত শব্দের পরে প্রথমার একবচনে 'এ' হয়। প্রাকৃত-প্রকাশ, ১১। ১০। চারুদত্তাকে = চারুদত্তকঃ। পুত্তে = পুত্রঃ।

সংস্কৃতে সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। তার অর্থ এই। ক্রিয়ার সহিত কারকের সম্বন্ধ আছে। সকল কারকেই আছে বলিয়া এ সম্বন্ধ সাধারণ। কিন্তু ক্রিয়ার সহিত কর্ম্মকরণ প্রভৃতি এক এক কারকের এক একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধও আছে। এ সম্বন্ধ সাধারণ নহে, কেন না, এরূপ সম্বন্ধ সেই একটা কারকেই আছে, আর কোনও কারকে নাই। ভাষায় এই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন বিভক্তি বসিয়া থাকে। যেমন সংস্কৃতে কর্ম্ম বুঝাইতে দ্বিতীয়া, করণ বুঝাইতে তৃতীয়া, ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে ক্রিয়ার সহিত কিছুর সম্বন্ধ আছে, এই টুকু মাত্র বুঝাইতে চাই—কিন্তু কি সম্বন্ধ, তা আর অত খুলিয়া বলিতে চাই না, কেন না, না বলিলেও তাহা বুঝা যাইবে, সেখানে সকল কারকেই ষষ্ঠী হইতে পারে। কর্ম্ম বুঝাইতে মাতরং স্মরতি না বলিয়া মাতুঃ স্মরতি, বা ভজে শম্ভোশ্চরণৌ না বলিয়া ভজে শম্ভোশ্চরণয়োঃ বলিতে পারি। বেদের অসংখ্য স্থলে চতুর্থীর স্থানে ষষ্ঠী আছে। (২) সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষায় কর্ম্ম প্রভৃতিতেও ষষ্ঠী হয়।

ইহাতে ভাষা কিছু সোজা হইল। ভাষা যখন বিকৃত হইতে থাকে, তখন সোজা পথটাই বাছিয়া লয়। প্রাকৃত এইরূপে সংস্কৃতের চতুর্থী বিভক্তিটা একেবারে তুলিয়া দিয়াছিল। পালি, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি কোনও প্রাকৃতে চতুর্থী নাই। চতুর্থীর স্থানে ষষ্ঠী বসে। ব্রাহ্মণায় ধনং দদাতি প্রাকৃতে বম্হণস্স ধনং দেই হয়।

বলিয়াছি, ষষ্ঠীর অর্থে প্রাকৃতে

(২) এজন্য পাণিনিকে একটা পৃথক্ সূত্র করিতে হইয়াছে—চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি (২।৩।৬২)।

কেরক বা কের হইত। অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে এই কেরটার ভূরি প্রচার হইয়াছিল, এইরূপ বিবেচনা করিবারও কারণ আছে। আমার বোধ হয়, কালে অবশেষে সর্ব্ববিধ ষষ্ঠীর স্থানেই কের প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে বহ্মণস্স ধনং দেইর স্থানেও বহ্মণকেরং ধনং দেই হইত। বহ্মণকেরং— বহ্মণকেরঃ—বহ্মণকে—এইরূপে ক্রমে বাঙ্গালার চতুর্থীতে 'বামনকে' হওয়া অসম্ভব নহে। আর যেখানে কেঃ হইতে কর হইয়াছিল, সেখানে চতুর্থীর রূপও কে নহে, ক। সঞ্জয়ের মহাভারত প্রভৃতিতে এই ক'ই বেশী, কে কম। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে ষষ্ঠী চতুর্থী দুয়েরই বহুবচনের বিভক্তি ক বা গ। যেমন আমাক (গ) বাড়ী, আমাক (গ) দিবে। অর্থাৎ আমাদের বাড়ী, আমাদিগকে দিবে। আমাক (গ) ইহার আর একরূপ আমার্ক (গ)। বোধ হয়, আমাকর্ বা আমাগর্ হইতেই বর্ণবিপর্য্যয়ে আমারক্ বা আমার্গ হইয়াছে। বামনকে দেয় বা বামনকে বলে যদি হইল, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে 'বামনকে মারে' 'বামনকে ধরে' প্রভৃতিও আসিতে পারে। কালে সম্প্রদানকেও কর্ম্ম ভাবিয়া বিশুদ্ধ কর্ম্মেও সম্প্রদানের মত বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃতে যে ধাতুগুলিকে দ্বিকর্ম্মক বলি, তাহাদের অনেকের অপ্রধান কর্ম্মটা বস্তুত: সম্প্রদান মাত্র।

কিন্তু দ্বিতীয়ার কে বা ক প্রকারান্তরেও বুঝান যায়। প্রাকৃতে সম্প্রদান ছাড়া অন্যত্রেও সম্বন্ধ মাত্র বিবক্ষয়ে ষষ্ঠী হয়। যথা—

আব সুহেইদে ণলিনী পওবাও
(অপি সুখয়তি স্বাং নলিনীপত্রবাতঃ)।
প্রণম ভঅবদীণং
(প্রণাম ভগবতীঃ)।
ণ সে বিসসসোমি
(ন তৎ তস্মিন্ বা বিশ্বসিমি)।
বা তস্স দংসইসসাদিত্তি
(সা তং দর্শয়িষ্যতীতি)।
ণহু সো উবরদো জসস বল্লহো সুমরোদি
(নহি স উপরতো যং বল্লভঃ স্মরতি)।

অতএব এ সকল স্থলেও ষষ্ঠীর অর্থে কের প্রযুক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে কে বা ক আসিতে পারে। আবার কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। ভানোঃ সেবা— এখানে ভানু কর্ম্ম। ভানোঃ প্রাকৃতে ভাণুস্স্ ভাণুণো বা ভাণুকেরা হইত। ভাণুকেরা হইতে ভাণুকেঃ বা ভাণুকর। প্রথমার বিকারে ভানুকে, দ্বিতীয়ার বিকারে 'ভানুক'। দুইই কর্ম্ম। ভানুকে সেবা বা ভানুক সেবা হইতে শেষে ক্রিয়াপদও জন্মিতে পারে। * বিদ্যাপতিতে আছে—

কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুক সেবি।

বিদ্যাপতির ভাষায় ষষ্ঠী ও ক। দীনেশ বাবুর ধৃত সঞ্জয়ে আছে—

সে সে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক সেবয়।

বাঙ্গালায় ষষ্ঠীতে ক আছে। অথবা, ভানুকে সেবা বা ভানুক সেবা প্রভৃতির সহিত কৃ ধাতু যুক্ত হইতে পারে। আমরা বলি ভানুকে সেবা করি, পতিকে সেবা করে। এ সকল স্থলে কর্ম্মত্ব পরিস্ফুট। পক্ষান্তরে আবার ভানুর সেবা করি, পতির সেবা করে, এরূপও বলিয়া থাকি। এখানে কর্ম্মত্ব কিছু ম্লান। কিন্তু যখন বলি, ভানুরে, সেবা করি, পতিরে সেবা করে, তখন আবার তাহা পরিস্ফুট হয়। ভানুর বা ভানুরে,

* Sayce, l. c. Vol. II. p. 331 দেখুন।

পতির বা পতিরে—বস্তুতঃ কিন্তু একই, কোনও প্রভেদ নাই। কবীন্দ্রের "ভীষ্মক ভয়ে"=ভীষ্মের ভয়ে। ক্রিয়াযোগে কবীন্দ্রই বলিতেন, ভীষ্মকে ভয় করে। তখন কর্ম্মত্বে (১) সংশয় থাকিত না। আমরা বলি, ভীষ্মকে ভয় করে, ভীষ্মের ভয় করে, ভীষ্মেরে ভয় করে। দ্বিতীয় বাক্যটায় কর্ম্মত্ব কিছু প্রচ্ছন্ন, আর দুইটায় পরিস্ফুট। এইরূপ অন্যত্রে বাঙ্গালার চতুর্থী ও দ্বিতীয়া মূলে ষষ্ঠীরই রূপ মাত্র। তিনেরই মূল প্রাকৃতের কের।

এ ধারণা আমার আরও এক কারণে জন্মিয়াছে। সংস্কৃত মূলক অনেক আধুনিক ভাষায়ই দেখি, ষষ্ঠী চতুর্থী ও দ্বিতীয়ার রূপ এক অথবা প্রায় এক। যেখানে বিসদৃশ, সেখানেও তার সমস্তই হয় ণ নয় কের হইতে বুঝান যায়। হিন্দী বা মৈথিলীতে ঐ তিন বিভক্তিই এখন ক-যুক্ত—কা, কে, কী কো বা ক বলিয়াছি, প্রাকৃতে অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ ষষ্ঠীর একবচনে মহ বা মজ্ঝ এবং তুহ বা তুজ্ঝ হয়। বিদ্যাপতিতে মোহি মোহে মোয় মো বা মঝু, এবং তুয়া তু বা তো আছে। বিদ্যাপতির দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীও মোহে মোয় বা মুঝে, এবং তোহে (২) তোয় বা তোই। হিন্দীতে তুঝেও আছে। সকলেরই মূল মহ বা মজ্ঝ, তুহ বা তুজ্ঝ। উড়িয়ার ষষ্ঠী র এবং কর, দ্বিতীয়া কু। কু, হিন্দীর কো এবং মৈথিলীর ক মূলে একই। মরাঠীতে ষষ্ঠী চা, দ্বিতীয়া ও চতুর্থী লা বা লৈ। ণ=ড়=ল। হর্ণলে দেখাইয়াছেন, হিন্দী কা'এরই ধ্বনি বিকারে চা। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী প্রাচীন হিন্দীতে নেঁ বা নেঁ, গুজরাটীতে নে, মারবারীতে নৈ, পাঞ্জাবীতে নূঁ। এ সকলেরই বুনিয়াদ্ বোধ হয় প্রাকৃত ষষ্ঠীর ণ। বাঙ্গালার ষষ্ঠী—র। বাঙ্গালায় দ্বিতীয়া বা চতুর্থীরও একটা রূপ র (৩) বা রে। হিন্দী ও মৈথিলীর মত বাঙ্গালায়ও ষষ্ঠীর আর একটা বিভক্তি—ক। খুব সম্ভব যে, দ্বিতীয়া চতুর্থীর কে বা ক আর এই ক'এও মূলতঃ কোনও প্রভেদ নাই।

বাঙ্গালায় আর একটা কে আছে, সেটাকে 'নিমিত্তার্থক কে' বলিতে পারি। এখন আর তা প্রচলিত আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। যথা দীনেশ বাবুর কৃত ডাকের বচনে

> রৌদ্রে কাঁটাকুঁটায় রাঁধে
> খড়কাট বর্ষাকে বাঁধে।
> ... ...
> কাখে কলসী পাণিকে যায়।

রবীন্দ্রনাথ পুরাণ বিভক্তিটা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন—

> "বেলা যে পড়ে' এল, জলকে চল্।"

বর্ষাকে অর্থাৎ বর্ষার জন্য। পানিকে, জলকে অর্থাৎ জলের জন্য। হিন্দীতেও এইরূপ স্থলে বরসাৎকো পানীকো প্রভৃতি প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃত কৃতে শব্দের বিকারে এই কে বা কো জন্মিয়াছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে আছে—

> ণং ভণাহি ইমশ্শ কএ মচ্ছি আভত্তুণো ত্তি
> (ননু ভণ অস্য কৃতে মাৎস্যিক ভর্ত্তুরিতি)।
> ইমস্স কএ সউন্তলা কিলম্মই
> (অস্য কৃতে শকুন্তলা ক্লাম্যতি)।

(১) অপাদান না বলিয়া কর্ম্মই বলিলাম। বাঙ্গালায় 'ভয় করা'ই একটা ধাতু। তাহা অকর্ম্মক।

(২) তোঁহে পৃথক্ শব্দ। তার মূল তুম্হে।

(৩) সপ্তমের "সিংহের বোলাও" দেখিয়াছি। দীনেশ বাবুর ধৃত কবিকঙ্কণে আছে—

> একের করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থান।
> সে ধনী বাসবে মোর প্রাণের সমান॥

এখানেও, মোর=মোরে।

কৃতে=কএ=কে। কৃতে একারান্ত অব্যয়। ইহার অর্থ নিমিত্তে। সংস্কৃতে সুবন্তের সহিত কৃতে শব্দের সমাসও হইতে পারে। জলস্য কৃতে, জলকৃতে—দুইই হয়। পোশ্‌তু ও সিন্ধীভাষার ব্যাকরণকার ট্রুম্প সাহেবের মতে, হিন্দীর সমস্ত কো এবং বাঙ্গালার সমস্ত কে'রই ব্যুৎপত্তি এইরূপ। এ কথা ঠিক্ নহে। কোথায় ট্রুম্পের মত সমীচীন, দেখাইলাম। ঘরকে গমন, মথুরাকে পাঠাইল—এখানেও সাধারণ কে, কৃতের সহিত কোনও সংস্রব নাই। (১)

তৃতীয়ায় শ্রীনাথ বাবু এক 'দ্বারা'র নাম করিয়াছেন। এইটাই সোজা বটে। কিন্তু খাঁটি তৃতীয়া বিভক্তি এ এবং তে। সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের পরে তৃতীয়ার এক বচনের চিহ্ন—এন। পালিতেও তাই। মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতেও তাই, কেবল ন'এর স্থানে ণ। "সংস্কৃত 'রামেণ' স্থলে প্রাকৃতে 'রামএ' ব্যবহৃত হইত"—দীনেশ বাবু ইহা কোথায় পাইলেন? 'এ' এখনও দূরে। এন অপভ্রংশে এং হইয়াছিল। (২) যেমন রামেং, বণেং। মরাঠীতে তৃতীয়ার বিভক্তি—এঁ। মৈথিলী ও বাঙ্গালায় শুধু 'এ' অবশিষ্ট আছে। যেমন বিদ্যাপতিতে—

বিদ্যিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট।

দীনেশ বাবুর কৃত কবিকঙ্কণে—

মিথ্যা হৈলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা।

আয়ুধে, চোয়াড়ে—উভয়তঃ করণে তৃতীয়া। এ'র আর একটা বুনিয়াদ্ আছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, প্রাকৃতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পরে তৃতীয়ৈক বচনের একটা বিভক্তি এ। বাঙ্গালায় তাও আছে। যেমন দীনেশ বাবুর ধৃত—

শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ।
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।

কিন্তু ঈকারান্ত প্রভৃতির পরে এখন আর এ বসে না, তে বসে। তে'র মূল সংস্কৃতের তঃ—বৈয়াকরণেরা বলিবেন, সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিল্। এ, তে—এখনও দুইই প্রচলিত। বাঙ্গালায় 'দ্বারা' বিভক্তি তুল্য হইলেও, মূলে উহা বিভক্তি নহে। বহুত্ববাচী গণসমূহ প্রভৃতি শব্দও তাই। প্রাকৃতের কেরও তদ্রূপ। ভাষা নির্ব্বিভক্তিক হইতে আরম্ভ করিলে এই সকল শব্দে বিভক্তির কাজ হয়। তৃতীয়ার অর্থে এই রূপে দিয়া, বোলে, ও কোরে শব্দও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তিনটাই মূলে ক্ত্বান্ত। (১) কোরে আবার তে'র সঙ্গেই বসে। যেমন, তাতে কোরে। ডবল বিভক্তির আরও দৃষ্টান্তে আছ। যেমন ঔষধের দ্বারাতে, উকীলের দ্বারাতে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তিনটাও বসান। যেমন, তদ্দ্বারাতে কোরে। উচ্ছৃঙ্খল হইলে সবই সম্ভবে।

ভাষাতত্ত্বের সর্ব্বনামাধ্যায়টাও অপদার্থ। বলিবার কিছু না থাকিলে যেমন হয়, তেমনই। কতকগুলি সর্ব্বনামপদের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছে। এখানে আর কয়েকটা দেখাই। অসৌ=অহ=ওহা বা উহা, হকার

(১) এং টা। সংক্ষিপ্তসার, প্রা০ অপ০ ২৪ সূ০।

(২) আর একটা 'কে' আছে? সেটা বিভক্তি নহে, তদ্ধিত। যেমন শতকে হাজারকে বিদ্যাপতির "কোটিকে গুটিক পাই"। ইহারই রূপান্তর বোধ হয়—কড়া। যেমন শতকড়া, মণকড়া, হিন্দীতে, সৈকড়া। কে কড়ার মূল কৃত্বস্থচ প্রত্যয় না কি?

(১) দ্বারা'র বিকারে দিয়া হইয়াছে, দীনেশ বাবুর এ উক্তি অমূলক। দ্বারা তেমন বেশী দিনের নহে। হর্ণলের মত আরও দুর্ব্বোধ।

লোপে 'ও'। পূর্ব্ববঙ্গে ওআ বলে। অহ হি=অহি=হলোপে, অই বা ঐ। শ্রীনাথ বাবুর ব্যুৎপত্তি ঠিক্ নহে। অমী প্রাকৃতেই উঠিয়া গিয়াছিল। এইরূপ, এহ হি=এহি(১)=এই। এষঃ—এস=এহ=এহা বা ইহা, হলোপে 'এ'। পূর্ব্ববঙ্গে এআ বলে। এখন ও এবং এ পুং স্ত্রী, উহা ইহা ক্লীবলিঙ্গ। ইহাদেরই দেখাদেখি বোধ হয় যাহা ও তাহা পূর্ব্ববঙ্গে যেআ এবং তএর স্থানে হ করিয়া হেআ বলে। এইরূপ হলোপেই বোধ হয় যা ও তা। (২) অথবা যাহা ও তাহার মূল মাগধীর ষষ্ঠ্যন্ত জাহ ও তাহ। হিন্দীতে ইহার নজীর আছে, দেখিয়াছি। যিনি তিনির মূলও বোধ হয় প্রাকৃতের ষষ্ঠীবহুবচনান্ত জাণ বা জীণ, তাণ বা তীণ। (৩) হিন্দীতে জিণকা জিণকার অর্থও যাঁর তাঁর। যিনি তিনির দেখাদেখি ইনি ও উনি। অনেন প্রাকৃতে ইমিণা বা ইমেণ হয়। ইমেণ হইতে স্বরবিপর্য্যয়ে ইমণে বা এমনে। এমনে মূলে ক্রিয়ার বিশেষণ। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও বলে, এমনে করে। অন্যত্র বলে, এমনই করে। কিন্তু এখন ইহা অধিকাংশ স্থলেই বিশেষ্যনিঘ্ন। যথা এমন পুরুষ, এমন নারী। এমনএর দেখাদেখি অমন, কেমন, যেমন, তেমন। এখানেও শ্রীনাথ বাবুর ব্যুৎপত্তি অসঙ্গত। প্রাকৃতে অমুষ্মিন্এর নকারই থাকে না, তার স্থানে অনুস্বর হয়। প্রাকৃতে অমন প্রভৃতি শব্দও নাই। অপভ্রংশে আর এক প্রকার বিকারও হইয়াছিল। যথা জিম, তিম, কিম বা কেমু ইত্যাদি। (৪) চাঁদ বর্দ্দাইএর কাব্যে জেম, তেম, কেম বা কেমং আছে। প্রাকৃতে কিম্‌শব্দ ষষ্ঠীতে বিকল্পে কীস বা কীশ হয়। মৃচ্ছকটিকে আছেঃ—

তা কীশ এশে ইধ আগতে
(তৎ কস্মাদ্ এষ ইহাগতঃ)।
জই অম্মাণং জননী তা কীস নণীঅলংকিদা
(যদস্মাকং জননী তৎকস্মাদ্ অলঙ্কৃতা)।
ধলণীএ কীশ পড়িদে দালুণকে অশণিশাণ্নিহে খগ্‌গে
(ধরণ্যাং কস্মাৎ পতিতো দারুণোঽশনিসন্নিঃভ খড়্গঃ।

এ সকল স্থলে কীস বা কীশ=কস্মাৎ। পঞ্চমীর স্থানে ষষ্ঠী। বাঙ্গালা কিসে শব্দেরও মূল এই। আমারাও বলি, কিসেঁ বুঝ্‌লে? কিসে এমন হোলো? কিসে কি হয়! কালে কিসে একটা পৃথক শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন কিসে খায়, কিসের জন্য। (৫) কতি=কই=কয়=ক। যেমন কজন? পূর্ব্ববঙ্গে বলে, কয়জন? হিন্দিতে, কই আদ্‌মী? কিয়ৎ, এতাবৎ, যাবৎ, তাবৎ =কেত্তিঅ, এত্তিঅ, জেত্তিঅ, তেত্তিঅ=

(১) যেমন দীনেশ বাবুর ধৃত—
মৃগলব্ধ পুঁথি এহি হরগৌরীর পায়।
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
বিদ্যাপতিতেও এহি আছে।

(২) তৎ ও প্রাকৃতে তা হয়। কিন্তু সে তৎ বা তা অব্যয়। অর্থ অনেকটা তবে'র মত। আমরাও বলি, তা নিতান্তই যাবে ত আমিও সঙ্গে যাই। এই তো শব্দের মূলও প্রাকৃত। তো—তস্মাৎ। প্রাকৃতপ্রকাশ, ৬।১০।

(৩) অথবা, তৃতীয়ান্ত জিণা তিণা? প্রাচীন বাঙ্গালায় তিনি'র স্থানে তিঁহ আছে। হিন্দীতে তিন্‌হোঁক'র অর্থ—তাহাদের। তিন্‌কাও তিম্‌হোঁকা বোধ হয় মূলে একই। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

(৪) সংক্ষিপ্তসার, প্রা০ অপ০ ১১, ১২ সূ০।

(৫) শ্রীনাথ বাবুর ব্যুৎপত্তিটী বেশ মজার। কিসে খায়—অর্থাৎ "সে কি, যে খায়?"।

কত, এত, যত, তত। ইহাদেরই দেখা দেখি—অত। কস্মিন্ = কহিং = কহি = কই বা কৈ। অর্থাৎ কোথা। কুত্র, অত্র, যত্র, তত্র = কথ, এথ, জথ, তথ = কোথা, এথা, জেথা, তেথা। এথা বা তেথা না বলিয়া হেথা বা সেথা বলি। হেথা'রই সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয়—হোথা। যাবৎ, তাবৎ = জাব, তাব = হিন্দীর জব তব, বাঙ্গালার যবে তবে। তাহারই দেখা দেখি হিন্দীর কব্, বাঙ্গালার কবে এবং হিন্দীর অব্, বাঙ্গালা পদ্যের এবে। কোন্, কঃ পুনঃ = কোণ্, কোউণ = হিন্দীর কৌন্, বাঙ্গালার কোন।

বাঙ্গালার সংখ্যা শব্দের সহিত পালি ও অন্যান্য প্রকৃত সংখ্যা শব্দের খুব সাদৃশ্য আছে। প্রাকৃত জানিলে শ্রীনাথ বাবু তাহা দেখাইতে পারিতেন। তাহাতে সিদ্ধান্তও দৃঢ় হইত। শ্রীনাথ বাবুর মতে সহস্র হইতে বাঙ্গালায় হাজার শব্দ আসিয়াছে, যেমন ইদানীং হইতে প্রাকৃতে দাণীং। আমি আরও একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি—যেমন অরণ্যম্ হইতে রণ্ণং। তবু এ ব্যুৎপত্তি সমীচীন বোধ হয় না। কেন না, পালি প্রভৃতিতেই সহস্র শব্দ 'সহস্‌সা হয়, র'টা থাকে না। বিদ্যাপতিতেও 'সহস' আছে। যথাঃ—

অবসর দেলৈ সহস হোলাম।

এই পরিণামই স্বাভাবিক। হিন্দুস্থানী ও পার্শী উভয় ভাষার উৎকৃষ্ট ব্যাকরণকার প্লাট্‌স্ সাহেবের মত, হিন্দুস্থানীর হাজার শব্দ পার্শী হইতে গৃহীত। বাঙ্গালা সম্বন্ধেও আমার সেই মত। মুসলমান সংসর্গের নিশ্চিত পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা বা হিন্দী প্রভৃতিতে হাজার শব্দ না দেখিলে শ্রীনাথ বাবুর মত গ্রহণ করিতে পারি না। তবে সংস্কৃত সহস্র ও পারসীক হাজার বা হাজাঁরা, এ দুয়েতে জ্ঞাতিসম্পর্ক থাকিতে পারে। সে কথা স্বতন্ত্র।

ভাষাতত্ত্বের নামভাগ শেষ করিলাম। তিন কারণে আমি এ পুস্তকের এত বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছি। প্রথম, বিষয়টা বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও তেমন পরিচিত নহে। দ্বিতীয় ভাষাতত্ত্বে প্রমাণ বড় সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয়। কেন না, অনেক স্থলেই তাহা সম্ভবানুমান মাত্র। এ পুস্তকে সে সাবধানতা নাই। যথাস্থানে তাহা খুলিয়া দেখান আবশ্যক বোধ করিয়াছি। তাহাতে কিছু উপকার হইতে পারে। শেষ, এ ক্ষেত্রে কেবলধ্বংসিনী সমালোচনায় কোনও লাভ নাই। খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে তাই আমি স্থাপনও করিয়াছি। যেখানে পুস্তকের মত অগ্রাহ্য, প্রায়ই তাই, সেখানে সমীচীন মত কি, দেখাইয়াছি। দীনেশ বাবুর পরিশ্রমে প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক নমুনা এখন একাধারে পাই। তার আলোকে বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের যে যে দিক্ একটু পরিষ্কার হইতে পারে, সেখানে তাও ধরিয়া দেখাইয়াছি। এ সকল কারণেও প্রবন্ধ বড় হইয়াছে। বিষয়-গৌরবে সমালোচনা বাড়িয়াছে। নহিলে পুস্তকখানির এমন কোন্‌ও গুণ নাই, যাহাতে বিশিষ্ট সমালোচনার যোগ্য হয়।

ভাষাতত্ত্বের আখ্যাতভাগের সমালোচনা এখনও বাকী। শীঘ্র তাহা করিয়া উঠিতে পারি, এমন সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

যদি দেখা হয়।

১

যদি দেখা হয়—
নবীন বরষ আজি,
ভূতলে আসিল সাজি,
চির পুরাতন আজি নবীনতা ময় ;
নূতন উদ্যম আশা,
নবীভূত ভালবাসা,
পুরাতনে পড়ে মনে সমস্ত সময়—
তাই আমি ভাবিতেছি যদি দেখা হয় !

২

যদি দেখা হয়—
কি ভাবিনু হরি ! হরি !
আপনি সরমে মরি,
কত যে নবীন বর্ষ হতেছে বিলয়।
নীরব নিশ্বাস সনে,
শত ঘুম জাগরণে,
বহিতেছে জীবনের অমূল্য সময়—
তবু কেন ভাবি হেন যদি দেখা হয় !

৩

যদি দেখা হয়—
এত অশ্রু এত হাসি,
জমিছে যে রাশি রাশি,
এত যে আকাঙ্ক্ষা আশা কহিবার নয় ;
এত কথা এত গাথা,
এত ফুল এত পাতা,
কেন হেন তুলে রাখি কে রাখিতে কয় ?
কেন আসে পোড়া মনে যদি দেখা হয় ?

৪

যদি দেখা হয়—
হা ধিক অবোধ মন !
সে শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণ
গিয়াছে—সে পুণ্যবল হইয়াছে ক্ষয় ;
সে নিশা হয়েছে ভোর,
ভেঙ্গেছে সে ঘুম ঘোর,
ফুরায়েছে সত্য যুগ চিরানন্দ ময় !—
আজো কেন আসে মনে যদি দেখা হয় !

৫

যদি দেখা হয়—
আর কি এ বসুন্ধরা,
আছে প্রীতি পুণ্যভরা,
আর সে শশী কি হাসে, সে জ্যোছনাময়
আর কি মলয়ানিলে,
তেমন অমিয় মিলে,
আর কি পাপিয়া কণ্ঠে সেই গীতি বয়,
আর কি দেখাব তারে যদি দেখা হয় !

৬

যদি দেখা হয়—
নির্ম্মল দর্পণ সম,
কোথা সে হৃদয় মম,
সোণার কৈশোর সেই সরলতা ময় !
দেবের আশীষ সম,
সে শুভ জীবন মম—
কত আদরের সে যে, স্বতঃ মৃত্যুঞ্জয় !
আজি কি দেখাব তারে যদি দেখা হয় !

৭

যদি দেখা হয়—
সে যে গেছে যুগ শত,
জনমি মরিনু কত,
কত বিপ্লাবন ঝড়ে গেছে সে হৃদয়।
দ্বেষ, হিংসা, হা হুতাশ,
অভিমান, অবিশ্বাস,
শোক, রোগ, সর্ব্বনাশ, নিত্য পরাজয় !

সারা বিশ্ব নিরানন্দ,
নাহি সে পবিত্র গন্ধ !
নাহি সেই রবি শশী তারকা নিচয় !
প্রকৃতি ভুলেছে হাসি,
নিকুঞ্জে নীরব বাঁশী,
বসন্তে জাগে না ফুল নব কিশলয় !
শত ব্রহ্মশাপ সম,
এ পোড়া জীবন মম,
ফিরে দিব সে চরণে, তা'কি প্রাণে স'য় ?
কি দিব এখন তারে—যদি দেখা হয় !

৮

যদি দেখা হয় !—
আ ছি ছি ! কিসের তরে,
লাজ ভয়ে হিয়া মরে !
মুমূর্ষু অমৃত পানে করে কিরে ভয় ?
সে বিনা অধম হীন—
এহেন সর্ব্বস্ব হীন,
সে যে রাজ রাজেশ্বর চির স্নেহময় !
আমার তাহার কাছে,
ডরিবার কিবা আছে ?—
রোগ শোক পাপ যার দরশনে ক্ষয় !

জানি না মীমাংসা যুক্তি,
সাধিয়া আসিবে মুক্তি,
যোগ-বল পুণ্যফল পাব সমুদয়,
মহা সুখে ম'রে র'ব যদি দেখা হয় !

৯

যদি দেখা হয়—
পূত মন্দাকিনী ধারে
জগতের পর পারে,
নন্দনের গন্ধ-মাখা বায়ু যথা বয়,
সদাস্নাতা সুরবালা,
গলায় মন্দার মালা,
বিতরে, আনন্দ-প্রেম, শান্তি, বরাভয় ;
সেই খানে দুইজন,
এক হিয়া এক মন,
(তটিনী জলধি সনে যেমতি বিলয় !)
সে মহা মিলন আহা !
মরতে মিলে না তাহা,
মনে মনে, প্রাণে প্রাণে সমস্ত সময় !
আমার নবীন সাধ, যদি দেখা হয় !

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

রজনীনাথ।

জন্ম—ঢাকা, বিক্রমপুরের অধীন গাওদিয়া গ্রাম। ১লা পৌষ, ১২৫৬ (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৪৯)।
মৃত্যু—রিট্রিট, ভবানীপুর। ২রা বৈশাখ, ১৩০৯। (১৫ই এপ্রেল, ১৯০২)।

কলিকাতা হইতে একখানি পত্র পাইলাম।

"—এ জগতে আর নাই। গতকল্য (১৫ই এপ্রেল) বেলা ১০—৪৫ মিনিটের সময় স্ত্রী-পুত্র সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধু-বান্ধবদিগকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। গত রবিবার হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়েন, তাহার পর বহু চেষ্টাতেও আর জ্ঞান হইল না। এই তিন দিবস যে তিনি কি কষ্ট পাইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। মনের ভাব জ্ঞাপন করিবার আর অবসর পাইলেন না। কাহাকেও কিছু বলিয়া যাইতে পারেন নাই। সোমবার রাত্রিতেই অতি খারাপ ভাব হইল। মঙ্গলবার প্রাতঃকাল হইতেই সকলে বুঝিল, আজি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা সহিবে না। ক্রমে বেলা দশটার সময় সমস্ত শেষ হইয়া গেল। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ছয়টার সময় ভীষণ ক্রন্দনরোলের মধ্য হইতে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া বাহির হইলাম। সন্ধ্যা সাতটার সময় কালীঘাটের শ্মশানে তাঁহার শেষকার্য্য করা হইল। চিতায়

আরোহণ করাইবার সময়েও তাঁহার দেহলাবণ্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যেন মহাপুরুষ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। রাত্রি দশটার সময় সেই সোণার শরীর চিতাভস্মে পরিণত হইল।"

সকল মানুষেরই পরিণাম এইরূপ। ইহাতে নূতনত্ব নাই। কিন্তু তা বলিয়া হৃদয়ের ব্যথা কখন পুরাতন হয় না। যে দিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম হইয়া মেডেল লইয়া বিনয় নম্র ধীর পদে টাউন হল হইতে বাহির হইয়া আসেন, সে দিন রজনী নাথের সঙ্গে আমিও ছিলাম। যে দিন বরমালা পরিয়া, আপনাকে দায়িত্বের গুরুভারে অবনত ভাবিয়া, সাহায্যের জন্য বিবাহ-বাসরে একাকী বসিয়া তারস্বরে ভগবানের নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সে রাত্রিও আমি এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম। সুখে দুঃখে সঙ্গী আমি—আজ রজনী নাথ স্বর্গে, আমি একাকী।

রজনীনাথ বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। বাল্যকালে বড় মধুর সঙ্গীত করিতে পারিতেন। আমাদের সম্মাননীয় পিতৃসম বাবু হরলাল রায় রজনী নাথের মুখে এই গানটী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন।

গর্ভ হইতে যেমন ধরায় ধরা হতে পুনরায়
লয়ে স্নেহে রাখ সবে এতে কি আছে সংশয়।
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন
পরকালে স্নেহকোলে রবে তব সমুদয়,

ভগবান সুন্দর, ভগবান আশ্রয়দাতা, তিনি সুন্দর শিব, রজনীনাথের ধর্ম্মবিশ্বাসের বীজ মন্ত্র এই খানে। তিনি পীড়িত হইবার পরে কয়েক দিনের জন্য আমার সঙ্গে মধুপুরের Retreat এ বাস করিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের পর আমার পুত্রকন্যাগণকে লইয়া উপাসনা করিতেন। কয়েকটী গান তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন,—গানে আরম্ভ, গানে মধ্য, গানে শেষ তাঁহার উপাসনা।

এমন নিরহঙ্কার, কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিলাসশূন্য নির্লিপ্ত জীবন অতি অল্পই দেখা যায়। দরিদ্রের সন্তান, যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ভোগে কখন আসক্তি দেখি নাই। নিজের শক্তি যথেষ্ট বুঝিতেন, তবু ভগবানের নির্ভরতা কখন কমে নাই। মিতভাষীকে লোকে অহঙ্কারী মনে করিয়াছে, কেহ নির্ম্মম ভাবিয়াছে, কিন্তু নারিকেল জঠরের স্নিগ্ধ সলিল যে ভাগ্যবান ভোগ করিয়াছে, সেই তাহার মধুর আস্বাদ বুঝিয়াছে। হাতে যখন পয়সা ছিল না, ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বন্ধুকে দেখিতে গিয়াছেন। অতুল সম্পত্তির অধিকারী, সহস্র কুটুম্ব পরিবেষ্টিত, রোগশয্যায় শায়িত, কন্যার বিবাহ দিনে দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে রজনীনাথ দরিদ্র বন্ধুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। অন্যে রাজা রাজড়াকে ডাকিতে ব্যস্ত হইয়া তাঁহার দরিদ্র বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়াছিল।

লোকে বলে, মনীষীগণ নিজের শক্তি অনুভব করিতে পারেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববাঙ্গালার লোকের প্রতি কলিকাতা অঞ্চলের লোকের কত ঘৃণা ছিল, এখন তাহা অনুমান করা যায় না। আনন্দ মোহন বসু, চন্দ্রমাধব ঘোষ, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি মহানুভবগণের চরিত্র-সুগন্ধে এখন উভয় প্রদেশীয় লোকের মধ্যে ভাবান্তর আছে বলিয়াই বুঝা যায় না। গতায়াতের সুবিধা, শিক্ষা বিস্তার ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রাদুর্ভাবও ভিন্ন প্রদেশকে এক করিতে সামান্য সহায়তা করে নাই। ঢাকা হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া রজনীনাথ,অঘোরনাথ,

সারদানাথ ও শ্রীনাথ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আসেন (১৮৬৮)। প্রতিদিন ক্লাশে যাইয়া দেখিতাম, বাঙ্গালেরা আগে আসিয়া প্রথম আসন অধিকার করিয়াছে। সৎপথে যাহাদের আঁটিতে না পারি, কৌশলে তাহাদের পরাভব করার রোগ আমার যথেষ্ট আছে। আসনে বই রাখিয়া তাঁহারা বাহিরে যাইতেন, আমরা বই গুলি স্থানান্তর করিয়া তাঁহাদের আসন দখল করিয়া বসিয়া থাকিতাম। একদিন এই উপলক্ষে বিবাদ হয়। আমি বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালের প্রথম আসনে প্রয়োজন কি—মুখস্থ করিয়া তৃতীয় বিভাগে পাশ হইলেই তাহারা কৃতার্থ। গম্ভীর ভাবে রজনীনাথ বলিয়াছিলেন—"If not the first I shall be one of the first." দুই বৎসর পর এ-লে ও চারি বৎসর পরে বি-এ পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আসন অধিকার করিয়াছিলেন। আজি কলিকাতার সমাজে কি কর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরাই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা রজনীনাথের অকাল মৃত্যুর কারণ। পীড়িত হইয়া বিদায় লইয়া শরীর সারিতে গিয়াছেন, সেখানেও রাশি রাশি কাগজ পত্র। তিন চারি ঘণ্টা প্রতিদিন আফিসের কাজ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরামর্শ অতি মূল্যবান জ্ঞান করিতেন। তাঁহার পরামর্শ চাহিয়া রাজমন্ত্রী পত্র লিখিয়াছেন; রজনীনাথ তুচ্ছ শরীরের জন্য কি রাজকার্য্য অবহেলা করিতে পারেন? রাজার ভৃত্য হইলেও উচিত কথা বলিতে রজনীনাথ কখন কুণ্ঠিত হন নাই। সে দিন কনভোকেশনের বক্তৃতায় উপদেশ স্থলে লর্ড কর্জ্জন দেশীয়দিগের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছিলেন। মুমূর্ষু সিংহ অমনি মৃত্যুশয্যায় উঠিয়া বসিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য পেন্সন লইয়া ভগ্নশরীরে শয্যাগত হইয়া সর্ব্বদা বন্ধুদিগের নিকট আক্ষেপ করিতেন "হায়, যখন জগতের কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, তখন ভগবান তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন কেন? বড় আশা করিয়াছিলেন, পেন্সন লইয়া দেশের কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিবেন—সকল আশা বিফল হইল"—এই বলিতেন, আর দরদর ধারে জলধারা নয়নযুগলে প্রবাহিত হইত। প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয় বিকল হইলে, সংসার অবাধ্য হইলে মনুষ্য ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সুখী হইতে পারে। রজনীনাথ বলিতেন, "আমার মত পাপী এ উপদেশ অনুসরণ করিতে পারে না।"

রজনীনাথের অসাধারণ সংযম ছিল। ভাব ও ভাবনা যুগপৎ সমবলশালী মানবচরিত্রে প্রায় দেখা যায় না। ভাবের উচ্ছ্বাসে ভাবনাকে পদাঘাত করিয়া আমরা কত সময় লাঞ্ছিত হইয়াছি। কি নিজ কার্য্যে, কি পর কার্য্যে ভাবের উচ্ছ্বাসে রজনীনাথ কখন বিচলিত হন নাই। রজনীনাথের কোর্টশিপ অনেক দিন চলিয়াছিল—বিবাহ স্থির, তবুও বিবাহ করা হয় নাই। এজন্য তাঁহার সঙ্গে কতবার ঝগড়া করিয়াছি। রজনীনাথ ভাবী পরিণীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দুজনে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দুঘণ্টা বসিয়া থাকিলেও দুজনে দুটা কথা হইত না। তাঁহাকে গণিতের

সমস্যা পূরণ করিতে দিয়া নিজে অপর প্রান্তে বসিয়া নীরবে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিতেন। আমার মত নর্ম্ম-সচীবও কখন তাঁহাকে স্ত্রীর সহিত তামাসা করিতে দেখে নাই। সকল সময়ে, সকল অবস্থায় গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইয়া রজনীনাথ, যাহারা সংজ্ঞা মত ব্রাহ্ম নহে, তাহাদিগকেও ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছিলেন। তিনি লোককে "ব্রাহ্ম" হইতে বলিতেন না, বলিতেন ধার্ম্মিক হও। অথচ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে যাহা সাধ্য করিয়াছেন। নিজের বিশ্বাস পরের মনোরঞ্জন করিতে নিমেষের জন্য ক্ষুণ্ণ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কতগুলি প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি নব্যভারত উঠাইয়া দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের ধর্ম্মমত অক্ষত রাখিবার জন্য তিনি যে সকল ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, এখনও তাহা প্রকাশ করিবার সময় হয় নাই।

রজনীনাথ বড় ভাবুক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা গ্রন্থবিশেষে মুদ্রিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহাকে মনোমত পত্নী দিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র ও কন্যাগণ শিক্ষিতা ও গুণবতী। তাঁহার মনীষা তাঁহার এক কন্যা উত্তরাধিকার করিয়াছেন। পুত্র কন্যা পরিজনের সেবায় তাঁহার তত আনন্দ হইত না, বৃদ্ধা জননীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া দেশের কথা গল্প করিতে, বাল্যকাহিনী শ্রবণ করিতে যত আনন্দ হইত। সৌভাগ্যের বিষয়, রজনীনাথের মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তাঁহার জননীর স্বর্গারোহণ হইয়াছিল। কয়েক মাস গত হইল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। উভয় সংবাদ মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছিলেন। রোগীর শরীর, মন তাহাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার দৈব দুর্ব্বিপাকে মৃত্যু হয়। রজনীনাথ তাহাতে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। ভ্রাতার বিধবা ও কন্যাকে বিশেষ যত্নে পালন করিয়াছিলেন, এবং সে বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই ভ্রাতার বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে সহস্র জনের সমক্ষে কোলে লইয়া আদর করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভ্রাতার কন্যার সম্পত্তি আপন সম্পত্তির ন্যায় রক্ষা করিয়াছেন ও উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা ভগিনী ও ভাগীনেয়গণ ভ্রাতৃজায়াদের মত চিরদিন তাঁহার নিকট আশ্রয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘাতকের হস্তে অপহৃত হইলে রজনী নাথের বুক ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সঙ্গে দেহও ভাঙ্গিয়া পড়ে। এত সুখের মধ্যে এত দুঃখ সাধু চরিত্রে কেন ঘটে, কে বলিবে। গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে রজনীনাথ যে চাকরী পাইয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ কখন তেমন চাকরী পায় নাই। কিন্তু রাজপদে, কি বিদ্যা-গৌরবে রজনীনাথ কখন সৌজন্য হারান নাই। তাঁহার নাম সংবাদ-পত্রে ঘোষিত হয় নাই। তিনি চির দিন অজ্ঞাত থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার চরিত্রের বিমলতা, হৃদয়ের উদারতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ভাবের কোমলতা, সৌজন্য ও সরলতা তাঁহাকে বন্ধুদিগের আদর্শ করিয়াছিল। তাঁহাদের হৃদয়পটে তাঁহার মধুর চিত্র চিরদিন জাজ্জল্য রহিবে। তাঁহাকে হারাইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালা একটী

রত্ন হারাইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের একটী স্তম্ভ খসিয়াছে— বন্ধুগণের মন্ত্রী, দরিদ্র বারিষ্টারের সহায়, যুবাগণের আদর্শ, গবর্ণমেণ্টের প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী, সন্তানগণের দেবতা ও অভাগিনী বিধবার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে।

সমাজসংস্কারে রজনীনাথের তীব্র উৎসাহ চিরদিন দেখা গিয়াছে। গণেশ সুন্দরী খ্রীষ্টিয়ান হইয়া ব্রাহ্ম হইবার মত করিলে যে দুইজন সাহস করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করিয়াছিলেন, রজনীনাথ তাঁহার অন্যতর। যাঁহারা প্রথম বঙ্গমহিলাকে প্রকাশ্য সভায় টাউন হলের কনভোকেশনে লইয়া গিয়াছিলেন, যাঁহাদিগকে সভায় উপস্থিত দেখিয়া কেশব চন্দ্র সেন সভাগৃহ হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করেন, রজনীনাথ তাঁহাদের অন্যতম। কুলিনকুমারী বিধুমুখীকে কৌলীন্যের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে যাঁহারা প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছিলেন, রজনীনাথ তাঁহাদের অন্যতম। ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, রজনীনাথ তাঁহাদেরও অন্যতম। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সকল সমাজ-সংস্কারে রজনী ছিলেন। অথচ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রমাধব ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীর স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ হইতে কখন বঞ্চিত হন নাই। ব্রাহ্মমহিলাকে সমাজে প্রকাশ্য আসন দিবার আন্দোলনে রজনীনাথ অগ্রণী ছিলেন। "The broken glass of the Indian Mirror deemly reflects Babu Keshav Chandra sen and his satellites" সে তীব্র প্রতিবাদ রজনীনাথের। যখন মহিলার আসন উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ বৌবাজারে স্থাপিত হয়, রজনী নাথ তাহার একজন কর্ত্তা। যখন কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ সমাজ গঠিত হয়, রজনীনাথ তাহার উদ্যোগকারী। যখন দুর্গামোহন দাস বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষার জন্য মিস আক্রয়েডকে লইয়া বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, রজনীনাথ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনকারীর মধ্যে তিনি একজন। প্রেসিডেন্সী কালেজে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সমান আসনে পড়িবার অধিকার লইতে যে দুই জন যুদ্ধ করেন, তিনিই তাহার অন্যতর। তাঁহার কন্যাগণের মত সুশিক্ষিতা কন্যা ব্রাহ্মসমাজে, সুতরাং বাঙ্গালা দেশে অল্পই আছে।

ভাই, তোমার কার্য্য এ পৃথিবীতে সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহার আদেশে অন্য ক্ষেত্রে খাটিতে চলিলে। তুমি চিরদিন অগ্রসর ছিলে—আগে আগে চল, পিছনে আসিতেছে তোমার চিরদিনের

ক্ষীরোদচন্দ্র।

আমার কোলে আয়।

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
জীবনভরা যত্ন গেল রক্ত-পিপাসায়!
নানান্ তীর্থ গয়াকাশী,
ঘুরে ফিরে ঘরে আসি,
পেলেম তোরে পুণ্যরাশি অনেক তপস্যায়
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

মোহন মধুর শীতল আলা,
তারা দিব আকাশ ঢালা,
চকোর-চুমো চন্দ্র দিব চুম্‌কি-চুনি গায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
আমার স্নেহে হাসে ধরা,
চাঁদের চেয়ে সুধা ভরা,
দগ্ধ জগৎ মুগ্ধ আমার স্নিগ্ধ মমতায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
বনভরা বসন্ত দিব,
ফুলের মুকুট পরাইব,
দোলাইব ঢুঢুল্‌ ঢুঢুল্‌ মৃদুল মলয়ায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
আমার প্রেমে বিশ্ব ভাসে,
নন্দনে মন্দার হাসে,
চিরপুণ্য মধুমাসে কল্প করুণায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
নীল্‌ জলে বিল ভরা ঘাসে,
দেখবি কেমন মরাল ভাসে,
আশে পাশে মুচ্‌কি হাসে কমল কুমুদ চায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
মায়াসিন্ধু আমার বুকে,
মগ্ন বিশ্ব মহা সুখে,
মঙ্গল জল শান্তি কমল শোভা করে তায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
আদর যতন কর্ব্ব কত,
চুমো দিব শত শত,
পর্শে তোর হর্ষে সুধা বর্ষে সারা গায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
রাঙ্গা চুমো যদি খাবি,
আমার কাছে কেবল পাবি,
এমন চুমো তুই থাক্‌ তোর * * পেলে খায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
কুমুদ ফুলের রূপার বাটী
রূপার ঝিনুক পরিপাটি,
চাঁদ মুখে তোর চাঁদের সুধা ঢেলে দিব তায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!
সুধার সুধা আমার বুকে,
জগৎ বাঁচে খেয়ে সুখে,
এমন সুধা তুই থাক্‌ তোর *** ** খায়!
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সাধু ত্রিগুণাচরণ সেন।

"Chill penury repressed their noble zeal
And poze the genial current of their soul."

অনেক ফুল্ল বিকশিত কুসুম প্রথমে সৌরভে জগৎ আমোদিত করে, কিন্তু সংসার-মরুর নিদাঘ বায়ুতে তাহার কোমল দেহ বিশুষ্ক করিয়া দেয়, জগৎ যে আশা তাহাদের জন্য পোষণ করিয়াছিল, তাহা আর পূর্ণ হয় না। অকালে সে পবিত্র কুসুম ঝরিয়া পড়ে।

আমি তখন ২১নং চুণাগলীর বাসায় থাকিয়া পড়িতাম। এক্ষণে লোকে বলে 'মেস', তখন বলা হইত কালীয়া কোম্পানি। তখন সেনহাটী মেস শোভারাম বসাকের লেনে। উভয় মেস অতি সন্নিকট। আমার একটী কিশোর বন্ধুর সহিত আমি প্রায়ই সেনহাটী মেসে যাইতাম। তখন একটী মাত্র যুবকের চরিত্র আমার হৃদয় আকর্ষণ করিত, জগতে এমন কোমল, এমন মধুর, এমন সাধু ও সুশীল আর আমার চক্ষে পড়ে নাই। কেবল একজনকে জানিতাম। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, আমি সেইরূপ সেই পবিত্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলাম। ইনি ধর্ম্মজগতে, রাজনৈতিক পথে, সাধুতার বর্ত্মে আমাকে পরিচালিত করিতেন। নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন যশস্বী ছাত্র, অথচ বিনয় ও শিষ্টাচারে যেন জগতে আদর্শ। মনে হইত, এই যুবক যখন জগতে পূর্ণ বিকাশিত রূপে বিরাজ করিবেন, তখন জগৎ ইহার গুণে মুগ্ধ হইবে। পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে, এমন সাধু জগতে পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইল না।

যে সমস্ত গুণ থাকিলে লোকে নেতৃস্থানীয় হয়, ত্রিগুণাচরণের সে সকল গুণ বেশ ছিল। সেনহাটী মেসের প্রায় অধিকাংশ ও কালীয়া মেসের কয়েকজন তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেন। তখন ব্রাহ্মসমাজ এই নির্জ্জীব বঙ্গদেশে নবজীবন আনিয়াছিল। কেশবচন্দ্র মধ্যাহ্ন গগনে প্রতিভা বিস্তার করিতেছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম তখন ছাত্রগণের প্রধান আকর্ষণ ছিল। সে সময়ের ন্যায় আদর্শ ছাত্রমণ্ডলী এক্ষণে নয়নগোচর হয় না। সেই উচ্চ আদর্শ ত্রিগুণাচরণের স্বচ্ছ হৃদয়ে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তিনি সহযোগী ছাত্রগণকে লইয়া অনেক শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। যশোহর-সম্মিলনী নামক স্ত্রীশিক্ষা ও বালকগণের ব্যায়াম ও নীতি শিক্ষা বিধানের সমিতি তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুগণের উদ্যোগে সংস্থাপিত হয়। সেই সময়ে তাহার উন্নতিকল্পে তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহার বাগ্মীতা ও যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া নড়াইলের প্রবল প্রতাপ জমিদার বাবু চন্দ্রকুমার রায় বলিয়াছিলেন, এই বাবুটী কালে একজন বড় উকীল হইবেন। এ হতভাগ্য দেশে পার্লিয়ামেণ্ট নাই, তখন কাউন্সিলে প্রতিনিধি নিয়োগ ছিল না, সুতরাং আদালতই লোকের প্রতিভা-বিকাশের কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। ত্রিগুণাচরণের উৎসাহ ও হস্তের বিরামের সঙ্গেই যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী অন্তর্হিত হইয়াছে;

আর তাহার স্থলে লোক আসিল না। এক্ষণে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত যুবকগণ স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধী ও সুখান্বরক্ত বিলাসী। স্বদেশের মঙ্গল চিন্তা অপেক্ষা তাহারা আপনার অর্থ বৃদ্ধিতেই অধিক মনোযোগী। ত্রিগুণাচরণ কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি বন্ধুদিগকে বলিতেন, কখনও অত্যাচার দেখিলে নীরবে তাহা সহ্য করিবে না। অবশ্য তাহার প্রতিবিধানের জন্য যত্ন করিবে।" একদিন সুরাপানে উন্মত্ত এক গোরা এক নিরীহ বাঙ্গালীকে অপমান করিতেছিল,ত্রিগুণাচরণ তাহাকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং তাহার দ্বন্দযুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিলেন। গোরাপুঙ্গব তাঁহার ঘুসী-সেবনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ১০৲ টাকার এক খানা নোট উপহার দিলেন। ত্রিগুণাচরণ তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি টাকা চাহি না, আর নিরীহ লোকের প্রতি অত্যাচার করিও না।" ত্রিগুণাবাবুর সহিত তখনকার অনেক বড় লোকের আলাপ ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে লইয়া অনেক সময় কেশব বাবু, প্রতাপ বাবু,সুরেন্দ্র বাবু, আনন্দমোহন বাবু, শিবনাথ বাবু ও অন্যান্য ব্রাহ্ম-প্রচারক ও স্বদেশানুরাগী মহাত্মাগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিতেন। উদ্দেশ্য, বন্ধুগণের জীবন তাঁহাদের আদর্শে উন্নত হয়। বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ও পল্লীগ্রামে অনেক উদ্যোগ করিতেন। একবার ক্রিকেট খেলিতে গিয়া সাহেবের ছেলেদের সহিত তাহাদের বিবাদ ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়,ত্রিগুণাচরণ তাহাতে বিশেষ সাহস প্রদর্শন করেন। আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়িতাম। মেডিকেল কলেজে তখন মিথ্যার প্রাদুর্ভাব ও ছাত্রগণের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন ছিল। তিনি বলিলেন, আপনারা একদল সাহসী ছাত্র এই অসত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউন। এইরূপে যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, তখনই তিনি এক এক সাধুকার্য্যের জন্য আমাদিগকে উত্তেজিত করিতেন। সকলের প্রতি এমন ভালবাসা, সহানুভূতি ও সমবেদনা আর কাহারও আমি দেখি নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে এমন মহাত্মা জয়লাভ করিলেন না, দুর্ভাগ্যের শোচনীয় অঙ্কে, দারিদ্র্য-নিষ্পেষণে ও রোগে সে জীবন-কুসুম শুষ্ক হইয়া অকালে সংসার-মরুতে ঝরিয়া পড়িল!

ছাত্র-জীবনেই ত্রিগুণাচরণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহার পাঠের তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী হইতেই ভয়ঙ্কর মস্তিষ্ক-রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে। অনেকে মনে করেন, তাঁহার ভ্রাতা এসিষ্টাণ্ট সারজন মোক্ষদাচরণ সেনের অকাল মৃত্যুই তাঁহার রোগের কারণ। এই রোগের জন্য তাঁহার শেষ পরীক্ষা ভাল হয় নাই। তাহার বন্ধুগণ তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নাই। অনেক সময়ে তাঁহার বন্ধুগণের ঈর্ষা-প্রদীপ্ত বিপক্ষতায়ও তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইত। হায়, জগতে ভালবাসাই যাঁহার চরিত্র, এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহারেই তাঁহাদের কষ্ট পাইতে হয়। নতুবা মহাত্মা ঈশা ক্রুশাঘাতে মৃতবৎ হইতেন না। এই সমস্ত কারণে মর্ম্মবেদনায় ত্রিগুণাচরণের ভাবী জীবনের উন্নতির পরম বিঘ্ন মস্তিষ্ক-রোগ উৎপন্ন হইল, সে শক্তি আর প্রৌঢ়জীবনে জগৎকে মোহিত করিল না। তথাপিও তাঁহার রমণীয় চরিত্রের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। বন্ধুগণের সহিত ব্যবহার তেমনই রহিল। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইবার পরে অনেক বৎসরান্তে ত্রিগুণা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার রচিত কোন পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা হয়। তখন মনে হইল, সেই বালকবৎ সরলতা, সেই বন্ধুর উন্নতিতে আনন্দ ও অকৃত্রিম বন্ধুতা ত্রিগুণা বাবুর তেমনিই ছিল। আজিও তাঁহার স্নেহমাখা মধুর কথা ভুলিতে পারি নাই। বিদায়ের শেষ দিনে— হায়, তাহার পরে আর উক্ত মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই,—ত্রিগুণা বাবু যেরূপ গদ্‌গদ্‌ ভাবে হাত ধরিয়া বলিলেন, "এবার তৃপ্ত হইলাম না, আর কবে দেখা হবে?" আর এ জীবনে সাক্ষাৎ হইল না। আর উভয়ের সে বাসনা তৃপ্ত হইল না। আর হইবে নাকি? ত্রিগুণাচরণের অমর আত্মা সেই অমরধামে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমরাও সেইরূপ পবিত্র জীবন লইয়া সেই জগতে গমন করিতে পারিলে তাঁহার স্বর্গ রাজ্যের ভূয়োদর্শন কাহিনী শুনিয়া ও আমাদের দুঃখ ও নৈরাশ্যের বর্ণনা করিয়া সে বাসনা তৃপ্ত হইবে, ইহাই ঈশ্বরের বিধান।

ত্রিগুণাচরণের পবিত্রতার দিকে এত দৃষ্টি ছিল যে, তিনি এম-এ পাশ করিয়া বি-এল দিয়া ব্যবহারজীবী হইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া optional mathematics গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ ইংরেজ দার্শনিকগণ অধিকাংশ সংশয়বাদী। এই প্রকারে ধর্ম্ম পথে থাকিবার চেষ্টা শৈশব হইতে তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ছিল। ত্রিগুণা বাবুকে যখন সাট্‌ক্লিফ সাহেব হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা দিতে চাহেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, ছাত্রজীবনে এইরূপ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। হায়, পরে গ্রাণ্ট-ইন-এড্‌ স্কুলের শিক্ষকতাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি কলিকাতায় কোন কালেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েন, তদ্বিষয়ে অধিক বলিতে চাহি না, ইহাই যথেষ্ট যে, তথায় তিনি নিরপেক্ষ সদ্ব্যবহার পান নাই। ভক্তিভাজন লোকের নিকট ঈদৃশ ব্যবহার তাঁহার নিকট সাঙ্ঘাতিক হইল। দুই এক বৎসরের মধ্যেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

ত্রিগুণা বাবুর নিম্নলিখিত গুণগুলি প্রত্যেক যুবকেরই অনুকরণীয়।

১। কখনও তিনি পরনিন্দা করেন নাই, বা অন্যের দোষ আলোচনা করেন নাই।

২। তাঁহাকে কখনও রাগ করিতে বা কাহারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিতে দেখি নাই।

৩। প্রত্যেক সৎকার্য্যের অগ্রণী মধ্যে ছিলেন, অথচ নাম চাহিতেন না।

৪। মধুর সত্য ব্যবহার।

৫। ঈশ্বরে ভক্তি।

৬। বিনয় ও শিষ্টাচার।

৭। পরোপকারী ও দেশানুরাগী।

এইরূপ যে সমস্ত গুণ থাকিলে অনেকে পুরুষসিংহ হইতে পারে, সকলই তাঁহার ছিল। কিন্তু বাঙ্গালার প্রধান শত্রু স্বাস্থ্যহীনতা রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আর সে পবিত্র জীবন মধ্যাহ্ন গগনে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল না, অকালে সেই মধুর জীবনকে সংসার বিদায় দিল! আর সে সুমধুর ভাষা, সেই আদরের সম্ভাষণ জীবনে শুনিব না! দয়াময়, এই দুঃখতাপদগ্ধ পবিত্র জীবনকে স্বর্গরাজ্যে তাঁহার শান্তিময় পবিত্র কোলে স্থান দিন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ।

জন্মকালীন গ্রহব্যবস্থা বিচারাদে শুস্মিন্ কালেচ দুঃখমিতি জ্ঞানংস্যাৎ তচ্চ ন পুরুষার্থঃ। তদেব নিষ্প্রয়োজন ত্বাৎ বিচার নারম্ভনীয়। সুখ দুঃখ কালজ্ঞানমপি ন সম্ভবতি ।।

অর্থাৎ জন্মকালীন গ্রহব্যবস্থা বিচারে একালে সুখ, একালে দুঃখ হইবে এই যে জ্ঞান ইহা পুরুষার্থ নহে ॥

গণেশ দৈবজ্ঞের নিবাস দৈবগ্রাম। ১৪৪২ শকাব্দে গ্রহলাঘব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার পিতার নাম কেশব দৈবজ্ঞ। এই কেশব দৈবজ্ঞ হোরাষট্ পঞ্চাশিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ন্যায় ইয়রোপখণ্ডেও ফলিত গ্রন্থমতানুযায়ী শুভাশুভ গণনার বিশেষ সমাদর ছিল। এইরূপ আদর ছিল যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্রাঙ্কদেশের কোন প্রধান পণ্ডিত শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইতে পারে না বলিয়া তত্রত্য রাজকুমারের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। স্থলবিশেষে গণিতফলিতজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ শুভাশুভ গণনাফল অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রের সহিত মানব শরীরের এমন কি সম্বন্ধ আছে যে, তাহাদিগের দ্বারা মনুষ্যগণের শুভাশুভ সংঘটিত হইতে পারে? এ বিষয়ে আমরা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাই, তাহাতে গ্রহদিগের সহিত পৃথিবীস্থ মানবগণের সম্বন্ধ নাই, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। আকাশস্থ চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র জলের জোয়ার ভাটা ও তিথি বিশেষে মানুষের পীড়া বিশেষের বৃদ্ধি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ভারতবর্ষীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র অতি প্রাচীন; ইহা কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শাস্ত্রে ইহা বেদাঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

> বেদাস্তাবৎ যজ্ঞকর্ম্ম প্রবৃত্তা
> যজ্ঞাঃ প্রোক্তাস্তেতুকালাশ্রয়েণ।
> শাস্ত্রাদস্মাৎ কালবোধো যতঃ স্যাৎ
> বেদাঙ্গত্বং জ্যোতিষস্যোক্তমস্মাৎ ॥
> শব্দ শাস্ত্রং মুখং জ্যোতিষং চক্ষুষি
> শ্রোত্রমুক্তং নিরুক্তঞ্চ কল্পঃকরৌ।
> যাতুশিক্ষাস্য বেদাস্য সানাসিকা
> পাদপদ্মদ্বয়ং ছন্দ আদৈর্ব্বুধৈঃ ॥
>
> (গণিততাধ্যায়)

অতএব ইহাকে বেদেরতুল্য প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। বলভদ্র প্রণীত সধ্যায়ণ রত্নধৃত কশ্যপ বচনানুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে অষ্টাদশ জন জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক ছিলেন, যথা;—

> সূর্য্যঃপিতামহ ব্যাসো বসিষ্ঠাত্রি পরাশরাঃ।
> কশ্যপোনারদোগর্গো মরীচির্ম্মনুরঙ্গিরাঃ ।।
> লোমশঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো জবনো গুরুঃ।
> শৌনকঽষ্টাদশাশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রবর্ত্তকাঃ ।।

অর্থাৎ সূর্য্য, ব্রহ্ম, ব্যাস, বসিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, পৌলিশ, চ্যবন, জবন, বৃহস্পতি এবং শৌনক এই সকল ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ যথা ক্রমে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নামে বিখ্যাত। জবন মুনি ভারতবর্ষে ঋষি মধ্যেপরিগণিত। ইঁহার কৃত জাতকস্কন্ধ বিষয়ক গ্রন্থের ন্যায় তাজিক পূর্ব্বোক্ত

সাধ্যায়ন রত্নের প্রমাণ অনুসারে জানা যায়,—"জবনচার্য্যেণ পারস্তভাষয়া প্রণীতম্ জ্যোতিঃশাস্ত্রৈক দেশরূপং বার্ষিকাদি নানাবিধ ফলাদেশ ফলকং শাস্ত্রতাজিক শব্দবাচ্যং।" ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব সমরসিংহ বর্ত্তমান রাজপুতনার অন্তর্গত মিবার প্রদেশের প্রসিদ্ধ রাণা সংগ্রাম সিংহ ওরফে সমর সিংহ ব্রহ্মণের দ্বারা সরল সংস্কৃত ভাষায় টীকা টিপ্পনি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রোমক সিদ্ধান্ত নামে একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত তাজিক গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা সূর্য্যকে, সূর্য্য জবন মুনিকে যাহা উপদেশ করেন, তাহার নামই তাজিক। এতদ্বারা আরো জানা যাইতেছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রকাশক ময়দানব এবং তাজিক-প্রণেতা জবন ঋষি,ইঁহারা উভয়ই অগ্রপশ্চাৎ এক সূর্য্যের নিকট জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করেন। এই সূর্য্য যে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম, সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি মহাত্মা কশ্যপ মুনির ঔরসে কশ্যপপত্নী দনুর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং দানব মধ্যে দানব রাজ্যেশ্বর হন। ইনি সূর্য্যোপাসক্ ছিলেন। আমাদের বেদব্যাস যেমন বিষ্ণুর অংশে জাত, ইনিও সেইরূপ সূর্য্যাংশ সম্ভূত হইবেন। ব্যাসদেব যেমন সাক্ষাৎ বিষ্ণু নন, ইনিও সেইরূপ যে, আকাশস্থ দিবাকর নহেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহের কারণ নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের হিন্দুগণের লক্ষ্য স্থির না থাকায়, তাঁহারা নিজেদের কি ছিল, বা কি আছে, তাহার তত্ত্ব লয়েন না, বিজাতীয় ম্লেচ্ছ ভাষায় গণিত জ্যোতিঃগ্রন্থ পাঠ করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত হিন্দুগণকে বলিয়া বেড়ান যে, ভাই সকল,ইংরেজ,জর্ম্মান ফ্রান্স, আমেরিকাবাসীগণ হইতে আমরা গণিত শাস্ত্র শিক্ষা পাইতেছি। বিশেষতঃ ইহা ঠিক কথা যে, ভারতবর্ষে যে সময়ে জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রচারিত হয়, গ্রীস্ ও রোম রাজ্যে সে সময় উহার নাম মাত্রও পরিজ্ঞাত ছিল কি না সন্দেহ। পৃথিবীর আদি পুস্তক ঋগ্বেদ-সংহিতা আমাদিগকে একথা বলিতে সাহসী করিতেছে।

উরুং হি[illegible] বরুণশ্চকার
সূর্য্যা[illegible]ন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবে[illegible]
রুতাপবক্তা হৃদ
(ঋগ্বেদ [illegible] মণ্ডল, ২৪ সূক্ত)
উত্তরায়ণ-দক্ষি[illegible] মার্গ[illegible] প্রসিদ্ধঃ।
(সায়ণভাষ্য)

চন্দ্রমা অপ্‌স্বন্তরা সুপর্ণোধাবতে দিবি
(প্রথম মণ্ডল, ১০৬ সূক্ত)

সূর্য্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, চন্দ্রের জলময়ত্ব ও সূর্য্যরশ্মি দ্বারা আলোক প্রাপ্তি প্রভৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলোর গতি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রতিদণ্ডে ৩৪২০০০০০ ত্রিকোটী-দ্বিচত্বারিংশ লক্ষ যোজন পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রথমতঃ ভারতবর্ষ হইতে গ্রীস ও আরব দেশে, তৎপশ্চাৎ গ্রীশ ও আরব হইতে ক্রমশঃ ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছে। রোম নগর বিনষ্ট হইবার পরে, মুসলমানেরা যে সময়ে আরবী ভাষার বিদ্যালয় স্পেন দেশে সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের জ্যোতির্ব্বিদ্যা আরবী ভাষার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ইউরোপখণ্ডে বিস্তৃত হইয়াছিল। ৭০৯ সম্বতে ওয়ালিদ নামক খলিফার অর্থাৎ মহাম্মদের প্রতিনিধির তারিস্ক নামক সেনাপতি স্পেন দেশ জয় করেন। তারপর

ওয়ালিদ খলিফা স্পেন দেশে আরবী ভাষার এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনন্তর ৭৬৩ সম্বতে অল্‌মানসুর নামে যে ব্যক্তি খলিফা পদ প্রাপ্ত হন, তিনি বগ্দাদ নগরে রাজধানী করিয়া কেবল জ্যোতির্ব্বিদ্যা নহে, ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুত গ্রন্থ পর্য্যন্ত আরবী ভাষাতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। অলমানসুর গ্রীক্ ভাষার পুস্তক হইতে যে সুশ্রুত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা আরবী ভাষাতে অনুবাদ করেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, ভারতের জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ প্রথমতঃ গ্রীশ ও রোমদেশে, তারপর আরবী ভাষা দ্বারা ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ নব্যভারত মাসিক পত্রিকায় গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় সাধারণের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীগঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ন।

প্রকৃতি ও চরিত্র।

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, মানুষ দুইবার জন্মলাভ করে; একবার স্বাভাবিক জন্ম, পুনরায় সংস্কারলব্ধ জন্ম। এই দ্বিবার জন্ম হেতু ব্রাহ্মণাদি উন্নত ব্যক্তিকে দ্বিজ বলা হইত। বস্তুতঃ এই কথাটীর মূলে অতি সুন্দর যুক্তি এবং উপদেশ নিহিত রহিয়াছে, একটু চিন্তা করিলে আর্য্য ঋষির এই গভীর তত্ত্বের মর্ম্ম উপলব্ধি হয়। দ্বিবার জন্মলাভ না করিলে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, ইতর জন্তু অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্য লাভ হয় না। প্রথমতঃ মানুষের প্রকৃতিগত জন্ম, তৎপর চরিত্রগত জন্ম হয়। প্রকৃতির নিয়মাধীন হইয়া মানুষ প্রথমতঃ ইতর প্রাণীর ন্যায় জন্মগ্রহণ করে এবং প্রকৃতিসিদ্ধ প্রবৃত্তি সমূহের পরিচালনাধীন হয়। এ পর্য্যন্ত মানুষ ও ইতর প্রাণী এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। ইতর প্রাণী জন্মাবধি স্বাভাবিক সংস্কারের বশীভূত, মানুষও তদ্রূপ। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সৃষ্টির অন্তরালে মানবের এক অভিনব সৃষ্টি হয়, এবং এই দ্বিতীয় সৃষ্টির উপরে মানুষের মনুষ্যত্ব সৃষ্টি নির্ভর করে। দ্বিতীয়বার জন্ম হইলে মানুষ মনুষ্যরূপে জাত হয়, ইতিপূর্ব্বে কেবল মাত্র সাধারণ প্রাণীরূপে জাত হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় জন্মটী কি? ইহা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জন্ম। স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয়বিধ জন্মের পরস্পর তুলনা ও সুসাদৃশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা প্রবন্ধশেষে পুনরায় আলোচিত হইবে। সম্প্রতি, জন্মাবধি ইতর প্রাণীর ন্যায় প্রকৃতির যে দাসত্ব-শৃঙ্খলে মানুষ আবদ্ধ, তাহা হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারে ও স্বাধীনভাবে চরিত্র গঠন করিতে পারে, তাহা দেখা যাউক।

আমরা যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমূহের অধীনতায় উহাদের উত্তেজনাতে ইতর প্রাণীর ন্যায় নানা কার্য্যে সঞ্চালিত হইতে থাকি, সে কাল পর্য্যন্ত আমাদের সাধারণ প্রাণী জন্ম; আবার যখন আমরা স্বায়ত্ত ইচ্ছা (free will) ও আত্মসংযমের (self-control) বলে প্রকৃতির আকর্ষণী শক্তিকে দমন করিয়া উহা হইতে নিজকে মুক্ত করিতে পারি, তখন আমাদের মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। শিক্ষা প্রভৃতির আনুকূল্য

সংযম সাধনাদি দ্বারা যথেচ্ছগামী প্রাকৃতিক শক্তির উপরে আমরা কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারি এবং উচ্ছ্বসিত মনোবৃত্তি সমূহের যথেচ্ছ প্রসারিতা রোধ করিতে পারি। স্বায়ত্ত ইচ্ছা ও সংযমাদি দ্বারা প্রকৃতির যথেচ্ছ গতি শাসন করিয়া, আমাদের কার্য্য-কলাপ স্বরচিত ব্যবস্থার অধীন করিতে পারিলে, চরিত্রের উন্মেষ হয়। চরিত্র গঠন অতি কঠোর সাধনার ফল। এই কঠোর সাধনাতে নৈতিক জীবনের উৎপত্তি। মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে এই কঠোর সাধনা একান্ত প্রয়োজনীয়, যে হেতু চরিত্র-হীনতায় মানুষ একটী সাধারণ প্রাণী মাত্র। চরিত্ররত্নের মহদধিকার লাভ করিলে মানুষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খলভাবে সঞ্চালিত হয় না, তখন তাহার প্রত্যেক কার্য্য নিয়ম ও শৃঙ্খলানুসারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতিলব্ধ উপাদান সমূহ লইয়া চরিত্রনীতির (ethics) সাহায্যে মানবের চরিত্র সংগঠিত হয়, এবং এই চরিত্রগঠনই মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া দেয়। এইক্ষণ দেখা যাইতেছে, মনুষ্যকে ইতর প্রাণীর অবস্থা হইতে মনুষ্যের অবস্থায় পরিণত করিবার প্রধান উপায় চরিত্রনীতি। সুতরাং, চরিত্রনীতিই মানব সাধারণের প্রধান বিজ্ঞান এবং চরিত্র রক্ষাই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। * চরিত্রনীতির মূলমন্ত্র আত্মসংযম, ইচ্ছার স্বায়ত্ততা উহার অবলম্বন। ইচ্ছার স্বায়ত্ততাই মানব ও মানবেতর জন্তু, এই দুইয়ের প্রভেদের মূল কারণ। ইচ্ছা শক্তির প্রক্রিয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, স্বাভাবিক মনোবৃত্তি ও গতি এবং সযত্ন-গঠিত চরিত্র এই উভয়ের পার্থক্য কি। একটী মূল প্রকৃতিসিদ্ধ অনায়াস-লব্ধ অধিকার, অপরটী ইচ্ছালব্ধ, বহুশ্রমায়াসার্জ্জিত ফল। পূর্ব্বোক্ত অধিকার লাভে, মানুষ স্বাভাবিক নীতিবিহীন জীবী মাত্র; শেষোক্ত সম্পদ-গৌরবে, মানুষ আত্মসম্পন্ন, গঠিত, নীতিমান্ মনুষ্য। চরিত্র কিম্বা চরিত্রগঠনের সম্ভাবনাহীন, কেবল মাত্র স্বাভাবিক গুণ-সম্পন্ন প্রাণীর পক্ষে, তাহার সমস্ত কার্য্যই বাহ্য বস্তুর উত্তেজনার উপর নির্ভর করে; এইরূপ জন্তুর জীবন বাহ্য প্রকৃতির সহিত উহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র। প্রথম অবস্থাতে মানুষও কেবল একটী স্বাভাবিক প্রাণী, সহজাত প্রবৃত্তি ও সংস্কারের বশীভূত মানুষও প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির অংশ মাত্র, প্রকৃতিই উহার অভ্যন্তরে কার্য্য করে এবং উহাকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করে। † মানুষের অন্তরে প্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর শক্তি যদি বিদ্যমান না থাকিত, তবে মানুষও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি প্রকৃতির দাস থাকিত, এবং তাহার জীবন ইতর প্রাণীর জীবন অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ হইত না। চিরকাল এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় রহিয়া গেলে, মনুষ্য-জীবন নিয়ম শৃঙ্খলাবিহীনভাবে কোন প্রবৃত্তির সাময়িক উত্তেজনায় নানা বিষয়ে প্রধাবিত ও সঞ্চালিত হইত। কিন্তু মানুষের পক্ষে মহত্তর সম্ভাবনা আছে, সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্তির উদ্দাম গতি রোধ করিতে সমর্থ। ইতর প্রাণী স্বাভাবিক শক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, উহার সমস্ত কার্য্যকলাপ প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে শাসিত, কিন্তু মানুষ ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা প্রকৃতির কর্তৃত্ব দমন করিতে

* Locke mentions morality "as the proper science and business of mankind in general."

† See S. S. Laurie, *Ethics*, p 22.

পটু। প্রকৃতি কতকগুলি নিত্যবিধানে যেরূপ সমস্ত জগৎ পরিচালিত করে, প্রত্যেক মানুষ স্বায়ত্ব ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রভাবে সেইরূপ আত্মজগৎ চালিত করে। †

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানুষে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণ প্রাণীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার এই অবস্থা ভালও নয়, মন্দও নয়, নীতি-সংযুক্তও নয়, নীতি-বিরুদ্ধও নয়, কেবল মাত্র নীতিবিহীন। ইতর প্রাণীসুলভ সাধারণ নীতিবিহীন অবস্থা হইতে মানুষ স্বীয় স্বাধীন চেষ্টায় উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, বাসনা এবং কাম-ক্রোধাদি স্বাভাবিক মানসিক শক্তির অধীনতায় মানুষের জীবনতরী বিশৃঙ্খলভাবে নানা বিঘ্নময় সংসার-সমুদ্রে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে ; কিন্তু মানুষ অসংযত প্রবৃত্তির বশে থাকিয়া এরূপ ক্লিষ্টভাবে জীবন যাপন না করিয়াও পারে। মানসিক প্রবৃত্তির উত্তেজনা অনুভব করিবামাত্রই, মানুষ উহাকে স্ববশে আনয়ন করিতে সক্ষম। সাধারণ প্রাণীর ন্যায় মানুষ, স্বাভাবিক শক্তির কর্তৃত্ব আছে, এই মাত্র যে অবগত, এমত নহে, পরন্তু সে, ঐ শক্তির কিরূপ কার্য্যকারিণী ক্ষমতা, তাহা জানে, এবং মানুষকে কোথায় কি ভাবে পরিচালিত করে, তাহা বুঝে। মানুষের অধিকারে, এক পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাব, অপর পক্ষে চিন্তা ও বিচার করিবার ক্ষমতা। মানুষের চিন্তা ও বিচার শক্তি আছে বলিয়াই, সে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে ও উহাদিগকে স্বায়ত্ত করিতে ক্ষমতাবান্। আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ প্রাণীর যে মৌলিক সুখ দুঃখানুভবের বোধ হয়, তদ্দ্বারাই তাহারা কার্য্যে প্রণোদিত হয়, কিন্তু মানুষ উহা হইতে নীতি ও যুক্তির অবলম্বনে এক নৈতিক আদর্শ রচনা করিয়া লয়, এবং তাহার যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান উহারই শাসনাধীন হয়। এই নৈতিক আদর্শই নীতিমান্ মানবের চিরসহচর ও নিত্য পরিচালক। এইরূপে মানুষ এক হস্তে মূল প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি গ্রহণ করে, এবং অপর হস্তে নৈতিক স্বাধীনতা (Freedom of will) ও ইচ্ছাশক্তির (volition) সাহায্যে উহা হইতে চরিত্র নির্ম্মাণ করে। প্রকৃতির পরস্পর সম্পর্করহিত উচ্ছৃঙ্খল উপাদান গুলি পরস্পর সংযুক্ত এক সূত্রে বিধিনিবদ্ধ হয়। প্রকৃতি চরিত্রে পরিণত হয় ; মানুষ প্রকৃতির দাসত্বাধীনতা পরিহার পূর্ব্বক স্বেচ্ছা-গঠিত চরিত্রের অনুবর্ত্তী হয়। সুতরাং মানুষ অন্য জন্তু অপেক্ষা ভিন্ন ইচ্ছা করিলে, উহাদের ন্যায় কেবল মাত্র প্রকৃতির আজ্ঞাবহ না থাকিয়া স্বীয় স্বাধীনতার উপর দণ্ডায়মান্ হইবে এবং ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে প্রকৃতিকে চরিত্রে পরিণত করিবে, তাই বলা যায়। প্রকৃতি সাধারণ প্রাণীর অবস্থা, চরিত্র মানুষের বিশেষ চিহ্ন।

আমরা দেখিয়াছি, চরিত্রের প্রথম উন্মেষ, প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্নতা ; কিন্তু চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, উহাকে আবার প্রকৃতির সন্নিহিত করিতে হয়। প্রকৃতির গতি সহজ, আয়াসবিহীন ; চরিত্রলাভ আয়াস সাধ্য, বহু পরিশ্রমের ফল। চরিত্রলাভ প্রথমে আয়াসসাধ্য ব্যাপার হইলেও, যখন উহার প্রতি কার্য্য প্রকৃতির ন্যায় সহজে

† Professor Laurie says, man has to do for his own organism what nature through necessary laws does for all else.

বিঘ্ন বিনা সাধিত হইতে থাকে, তখনই উহার উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে, প্রকৃতি হইতে চরিত্রে সমাগম অতি দুরূহ শ্রমসাধন ব্যাপার। কারণ, প্রকৃতিসিদ্ধ প্রবৃত্তির (impulsive and instinctive tendencies) প্রতিরোধই (inhilbition) নৈতিক বা চরিত্রগত জীবনের সার। স্বাভাবিক গতি হইতে ভিন্ন গতিতে মনকে নিয়োগ এবং মূলতঃ কোন সঙ্কীর্ণ বিষয়ে সঙ্কুচিত জ্ঞানকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিস্তার করিয়া উহার প্রসার করিবার চেষ্টাই নীতি জীবনের বা স্বাধীন জীবনের প্রধান কার্য্য। স্বভাবতঃ আমাদের মনোযোগ কিম্বা মানসিক কার্য্যের মূলে কোন ইচ্ছা বিদ্যমান্ থাকেনা, কিন্তু আমরা উহাকে স্বেচ্ছাধীন করিয়া ইচ্ছানুরূপ পথে প্রবর্ত্তিত করি। তখন প্রাকৃতিক শক্তি পরাভূত হয়, এবং আমাদের ইচ্ছা শক্তি প্রবল হয়। স্বাভাবিক বা যদৃচ্ছ প্রবৃত্তির (instinct) নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতে আমাদের কোন বাঁধা পাইতে হয় না, কিন্তু বিচার ও আত্মানুস্মৃতি পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হইলে অর্থাৎ চরিত্রানুযায়ী পথে চলিতে হইলে, আমাদের প্রথমতঃ অত্যন্ত প্রবল বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। ইতর প্রাণীর কার্য্যপ্রণালী বহির্জগতের সহিত যে উহার সম্বন্ধ, তাহার উপরে নির্ভর করে, সুতরাং উহাদিগের কর্ম্মশীলতার কারণ উহাদিগের বাহিরে অর্থাৎ বহির্জগতে, কিন্তু মানুষের কর্ম্মশীলতার কারণ আত্মার ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া পাই, বাহিরে যাইতে হয় না। * ইহার কারণ এই যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে আত্মদৃষ্টি ও বিচারক্ষমতা আছে, কিন্তু ইতর প্রাণীর তাহা নাই। বাস্তবিক ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়াই মানুষ চরিত্রবান্ হইতে সক্ষম। ইচ্ছাশক্তির (volition) প্রক্রিয়া একটু বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে, উহা কিরূপে মানুষকে প্রকৃতির যদৃচ্ছ কর্ত্তৃত্ব হইতে রক্ষা করে ও স্বাধীনভাবে চরিত্রগঠনের সহায়তা করে। ইচ্ছাশক্তির প্রধানতঃ তিনটী অবস্থা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে :—(১) স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সাময়িক উত্তেজনা নিরোধ। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ কোন দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়াও, উপস্থিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিছু কাল মাত্র বিরত থাকিয়াই সাময়িক উত্তেজনার হাত হইতে পরিত্রাণ পায় এবং জীবন কলঙ্কিত না করিয়া পারে। সাময়িক উত্তেজনাতে কিছু কাল বিরত থাকা অত্যন্ত শুভ ফলপ্রদ †। (২) দ্বিতীয়তঃ, উপস্থিত কর্ম্মানুষ্ঠানের বিবিধ উপায় চিন্তন, ও উহাদের পরস্পর তুলনা ও সমালোচনা এবং অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ভাবী ফলদর্শন। (৩) তৃতীয়তঃ, পরস্পর বিরোধী ভাবীফলোৎপাদক পন্থাসমূহের কোন একটী মনোনয়ন ও গ্রহণ। এইরূপে সাময়িক উত্তেজনা নিরোধ পূর্ব্বক উপস্থিত কার্য্যের বিবিধ পথ ও ভাবী ফল তুলনা করিয়া, কোন একটী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবলম্বন করিতে ইচ্ছাশক্তি আমাদিগকে সমর্থ করে। এইরূপে দেখা গেল, মনুষের ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়া মনুষের যুক্তিপূর্ণ আত্মদৃষ্টি ও বিচারক্ষমতা আছে, এবং এই হেতু মানুষ নিজেই নিজেই নিজের কর্ম্মানুষ্ঠানের কারণ। তাই মানুষ

* See J. Seth, *A Study of Ethical Principles*. p. 51.

† See James, *Principles of Psychology*. Vol II. Ch. XXVI.

জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সাধারণ প্রাণীগুণ ব্যতীত ইতরপ্রাণীদুর্ল্লভ আধ্যাত্মিক বা নৈতিক সম্পদের অধিকারী। এই নীতিমার্গের প্রথম যাত্রা অতিশয় ক্লেশপূর্ণ ও নিরাশা-সূচক। শিশু যেরূপ অবলম্বন ব্যতীত প্রথম পাদচালনা করিতে পারে না, তাহার হাঁটিতে হইলে অপরের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়, নীতিরাজ্যে প্রবেশ করিতে মানুষেরও তদ্রূপ প্রথমতঃ কিছু অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। মানুষ প্রথমেই প্রাকৃতিক শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া উহাকে স্বায়ত্ত ইচ্ছাতে দমন করিতে পারে না। প্রথম অবস্থাতে আমাদের ইচ্ছাশক্তির তত দৃঢ়তা হয় না, তখন উহা অনেকটা স্বাভাবিক সংস্কারের অবলম্বনে কার্য্য করে। ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি হয়, তখন প্রকৃতির আকর্ষণ তুচ্ছ করিতে ও স্বাভাবিক সংস্কারের বিরুদ্ধে আচরণ করিতে আমাদের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে। স্বাভাবিক সংস্কারের বিরুদ্ধে চলিতে ও যুক্তি বিচার পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে আমাদের প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও যাতনা সহ্য করিতে হয়। প্রকৃতির সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিলে আমরা যথা সময়ে জয় ও মুক্তি লাভ করিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পূর্ব্বকথিত মানবের দ্বিতীয় জন্ম পরিষ্কার রূপে বুঝিতে অবসর হইবে, অনুমান করি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মানবের দুইটী জন্ম, প্রথম কেবল মাত্র সাধারণ প্রাণীরূপে জন্ম, দ্বিতীয় প্রকৃত মনুষ্যরূপে জন্ম। প্রথম স্বাভাবিক জন্মের লক্ষণ এই যে, জন্মিবার পূর্ব্বে জাত প্রাণীর দুর্ব্বিসহ জন্মযাতনা ভোগ করিতে হয়, এবং জন্মিবার পরে কতকগুলি প্রকৃতি-সিদ্ধ অভ্যাস বশতঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জীব কার্য্য করিতে থাকে ও তদ্দ্বারা জীবনধারণ করে। দ্বিতীয় নৈতিক জন্মেরও লক্ষণ তদনুরূপ। এখানেও জন্মিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্লেশকর জন্মযাতনা ভোগ করিতে হয়, এবং জন্মিবার পরে কার্য্যানুষ্ঠান সহজসাধ্য ও অভ্যাসগত হয়। স্বাভাবিক জন্মের পর, প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষ বিবেকের অনুরোধে প্রকৃতির বিবেক-বিরোধী আদেশ অমান্য করিতে বাধ্য হয় এবং প্রকৃতির উপরে স্বায়ত্ত ইচ্ছার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লালায়িত হয়। এই বাহ্য প্রকৃতি সহ আভ্যন্তরীণ বিবেকের তুমুল সংগ্রামই দ্বিতীয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জন্মলাভের ভয়ঙ্কর যাতনা। দ্বিতীয় বার জন্মিতে হইলে, দ্বিজ হইতে হইলে, প্রত্যেক মানুষেরই এই অসহ্য জন্ম যাতনার অধীন হইতে হয়। এই গেল জন্মের পূর্ব্ব-লক্ষণ, পরলক্ষণও যথাযথ। একবার জন্ম হইলে, যাতনা কমিয়া যায়, তখন জাত প্রাণী অভ্যাস বশতঃ কার্য্য করিতে থাকে। আমাদের নৈতিক জীবন লাভের নিমিত্ত অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে বিবেকের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতি আমাদিগকে কোন দুষ্কার্য্যে সঞ্চালিত করিলে, তন্মুহূর্ত্তে স্বায়ত্ত ইচ্ছাতে বিরুদ্ধপথ অবলম্বন করি এবং সর্ব্বদা অসদুপায় পরিত্যাগ করিয়া সদুপায় গ্রহণ করি। এইরূপে বিভিন্ন কার্য্যে বিবেকের বশ্যতা স্বীকার করিতে করিতে পরিশেষে বিবেকের অজ্ঞানুবর্ত্তিতা আমাদের অভ্যাসগত হয়, তখন প্রকৃতির অসৎ প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমাদিগের কোন ক্লেশ পাইতে হয় না। পূর্ব্বে কোন সাধু কার্য্য

করিতে আমাদের বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সহিত ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত, এখন আমরা উহা অনায়াসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করি। পূর্ব্বে যে সদনুষ্ঠান কেবল কর্ত্তব্যবোধে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও করিতে হইত, এখন উহা সুখপ্রদ ও আরামদায়ক মনে করিয়া অভ্যাসবশতঃ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া করি। প্রকৃতির যথেচ্ছ শাসনের উপর স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব জন্মিলে এবং বিবেকের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা অভ্যাসগত হইলে, নৈতিক জীবন লাভ হইল বুঝিতে হইবে। এই জীবন লাভের পূর্ব্বাবস্থা ভয়ানক সংগ্রাম, অসহনীয় যাতনাভোগ; পরবর্ত্তী অবস্থা, যাতনার উপশম, অভ্যাসগত কর্ম্মশীলতা। এই দ্বিতীয় জন্মই চরিত্র-সৃষ্টি। ইতর প্রাণীর চরিত্র নাই, দ্বিতীয় জন্মও নাই। চরিত্র-সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম লাভ না হওয়া অবধি, মানুষও ইতর প্রাণীবৎ থাকে। সুতরাং মানুষের জীবনে চরিত্র-সৃষ্টি না হইলে, মানুষ দ্বিজ না হইলে, মানুষ প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য নহে।

এই দ্বিজত্ব প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মভাব পরিশেষে আমাদের অভ্যাসগত হয়; আমরা স্বেচ্ছানুক্রমেই তখন নিজ ভুলিয়া পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করি এবং উহাতে মধুর তৃপ্তি উপভোগ করি। বাস্তবিক ধর্ম্মজীবন গঠিত হইলে, সাধুতা মনোরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু বলিয়া বোধ হয়; এবং প্রকৃতির পাপ প্রলোভন ও আপাত মধুর আহ্বান বিষবৎ পরিত্যজ্য বলিয়াই মনে হয়। * যে ধর্ম্মপথ গ্রহণ পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্লেশকর ছিল, পরে উহার পরিহারই তদতিরিক্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। অতএব নৈতিক জীবনের প্রারম্ভে প্রকৃতি সহ দুরূহ সংগ্রাম, উহার ক্রমিক উৎকর্ষে পুনরায় সহজ প্রাকৃতিক অবস্থা-লাভ। সুতরাং যেমন মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম অবস্থা,বহু আয়াসে প্রকৃতি (nature) হইতে চরিত্র (character) গঠন, সেইরূপ মনুষ্যত্ব বিকাশের পরবর্ত্তী অবস্থা, আবার চরিত্রকে পুনরায় অভ্যাস (habit)বা গৌণ প্রকৃতিতে (second nature) পরিবর্ত্তন। অতএব মানুষের নীতিরাজ্যে প্রথম প্রবেশ, বহুযত্নে প্রকৃতি হইতে চরিত্র গঠন; উহার উপভোগ, যত্নসাধ্য চরিত্রকে পুনরায় সহজ প্রাকৃতিক অবস্থাতে পরিণতি।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (৫)

পুরাতন ভদ্র বংশীয়দিগের মধ্যে নিজ কলিকাতা পরগণার অধিবাসী আমরা এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। যাঁহাদিগকে পুরাতন অধিবাসী ভাবিয়া অনুসন্ধান করিলাম, তাঁহাদিগের অনেকেই বলেন, তাঁহারা গড়গোবিন্দপুর হইতে ইংরাজের দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া আসিয়াছেন। বাগুয়া পরগণার মধ্যে সুতানুটী ডিহিতেই কয়েক ঘর পুরাতন মাত্র বাসিন্দা পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে ঘোষ বংশকে অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেক মহাত্মা পুরুষ অপানাপন কৃতিত্ব রাখিয়া গিয়াছেন, যথা হরি ঘোষ, তুলসীরাম ঘোষ, শান্তিরাম ঘোষ, বারাণসী ঘোষ, রামধন ঘোষ, শঙ্কর

* See Aristotle *Nicomacleean Ethics*, Book. II, ch 3.

ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ,প্রভৃতি। পাথুরীয়া ঘাটার ঘোষ বংশ, ও সুবাবাজারের কালী-শঙ্কর ঘোষেরা এই পুরাতন ঘোষ বংশীয় নহেন; ইহাঁরা ইংরাজাগমনের বহু পরে আসিয়াছিলেন।

বিডন ষ্ট্রীটের কিয়দ্দূরে নয়ান চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে গ্রে ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে লম্বমান রাস্তার নাম হরি ঘোষের ষ্ট্রীট। ইহার কোন স্থানে তাঁহার বাসবাটী ছিল কি না, তাহা বলা যায় না। অর্ম্মি সাহেবের ১৭৫৭ সালের কলিকাতার মান-চিত্রে অনেকগুলি পুরাতন রাস্তা ও তাহার উপর সে সময় যে সকল অট্টালিকা ছিল, তাহার চিহ্ন আছে। এক্ষণে যেখানে হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে সেখানে কোন বাড়ী বা রাস্তার চিহ্নও দেখা যায় না, কিন্তু যেখানে মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট হরি ঘোষের ষ্ট্রীটের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই চৌরাস্তার উত্তর-পশ্চিম কোণে আমরা বাল্যকালে একখানি পুরাতন বাটীর ভগ্না-বশেষ দেখিয়াছি। অর্ম্মির ম্যাপেও উহার চিত্র আছে, কিন্তু পরিসরে অনুমান এক বিঘা হইতে পারে। ইহাই হরি ঘোষের বাটী কিনা, তাহারও কোন স্থিরতা নাই, কারণ নিকটস্থ এখনকার কোন বৃদ্ধের নিকট কিছু শুনিলাম না। কেবল শুনা গেল, এ হরি ঘোষ কায়স্থ ছিলেন না, সদ্গোপ। অর্ম্মি সাহেবের উপরোক্ত মান-চিত্রের মধ্যে গোবিন্দরাম মিত্রের নন্দন বাগানের পশ্চিমে মহারাষ্ট্র খালের পাড়েরও পশ্চিমে পূর্ব্বমুখী একটী সুপ্রশস্ত অট্টা-লিকার যে চিহ্ন আছে, অত বড় বাড়ী ঐ মানচিত্রে আর নাই। যে "বনমালী সর-কারের বাড়ী" প্রবাদ বাক্যে বৃহত্বের জন্য বিখ্যাত, সে বাড়ী তখনও নির্ম্মিত হয় নাই। ইংরাজেরা কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করিলে বনমালী সরকার তাহার দেওয়ানী করিয়া বড় লোক হন এবং বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করেন। উপরোক্ত মহারাষ্ট্র খালের ধারের বাড়ী খানি উত্তর দক্ষিণে লম্বমান, বাটীর চারিদিকেই সাধারণ রাস্তা; পশ্চিম দিকের রাস্তাটী দক্ষিণে আসিয়া হাতীবাগানের রাস্তায় (যাহা এক্ষণে গ্রে ষ্ট্রীট হইয়াছে) মিশিয়াছিল। এই পথের পশ্চিম দিকে এবং হাতীবাগান রাস্তার উত্তরে নবাব বহুদূরব্যাপী পিলখানা করিয়া-ছিলেন, ঐ পিলখানা হইতেই স্থানের নাম হাতীবাগান হইয়াছে। যে বাড়ীখানির কথা বলিতেছি, তাহা এতবড় যে, ক্ষুদ্র মান-চিত্রে তাহার ফাটক চারিদিকের প্রাচীর এবং মধ্যস্থ বড় বড় দালানের চিহ্ন উত্তম রূপে বুঝা যায়। অনেকে বলে, ইহা রাম-হরি ঘোষের বাটী। আমরা ঐ স্থানে এক-খানি বৃহৎ পুরাতন বাটী দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার ইষ্টক ও গঠন দেখিয়া খুব পুরাতন বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই, এমন কি শত বৎ-সরের অধিক পুরাতন হইবে না। বোধ হয় রামহরি ঘোষের পুত্র আনন্দমোহন ঘোষ কাবুল যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, দশ পনর বৎ-সর হইবে, ঐ বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার জমী এখন হাটখোলার কোন মহাজনের সম্পত্তি। এই বাটীর কিছু উত্তরে বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট নামক রাস্তাটী অতি প্রচীন। ১৭৮২ সালেও ঐ নাম ছিল। বোধ হয় রামহরি ঘোষের পিতার নামেই নাম-করণ হইয়াছিল।

"হরি ঘোষের গোয়াল" বলিয়া একটী

প্রবাদ বাক্য অনেকেই জ্ঞাত আছেন, বাস্তবিক তাহা গরুর গোয়াল নহে, হরি ঘোষের গৃহে একটী সুপ্রশস্ত দালান ছিল, শত শত নিষ্কর্ম্মা লোক দিবারাত্র সেই থানে বসিয়া খোসগল্প, তামাক ও গঞ্জিকা সেবন করিয়া জীবনযাপন করিত। অন্নের কোন চিন্তা ছিল না, হরি ঘোষের ভোজনাগারের অবারিত দ্বার, যে যখন আসিত, তখনই অন্ন প্রাপ্ত হইত। সেই জন্য সে সময়ের লোকে উহাকে "হরি ঘোষের গোয়াল" বলিয়া উপহাস করিত। ইহাঁর পূর্ণনাম শ্রীহরি ঘোষ। ইহাঁরা বালিসমাজ ভুক্ত, আদি পঞ্চ কায়স্থ মধ্যে মকরন্দ ঘোষের ১৯শ অধস্তন পুরুষ মহাদেব বা মনোহর ঘোষ ১৬শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বালি হইতে চন্দন পুকুরে (১) আসিয়া বাস করেন। তথা হইতে তিনি রাজা টোডরমলের অধীনে গোমস্তার কার্য্য পাইয়া খাজানা বন্দোবস্ত উপলক্ষে সুবর্ণ রেখার তীরে গমন করেন, এবং তথায় একজন সমৃদ্ধিশালীরূপে বাস করেন। মোগল মারির যুদ্ধে উড়িষ্যার আফগানেরা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলে তিনি কোন রূপে কিছু কিছু মূল্যবান সম্পত্তি লইয়া সপরিবার বাঙ্গালায় পলাইয়া আসেন এবং চিত্রপুরে বসবাস করিতে থাকেন। এখানে তিনি জয়মঙ্গলার এবং চিত্রেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া নরসিংহ নামক জনৈক মোহান্তের হস্তে সমর্পণ করেন। (২) অনুমান ১৬৩৭ খ্রীঃ মনোহর ঘোষ পরলোক গমন করেন। কথিত আছে, এই সময় দস্যুরা সর্ব্বদাই চিত্রেশ্বরীর নিকট নরবলি প্রদান করিত, মনোহরের পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ এই নিষ্ঠুর দৃশ্য অসহ্য বোধ করায় চিত্রপুরের বাস উঠাইয়া বর্দ্ধমানে বাস করেন। তিনি বিদ্বান লোক ছিলেন, অতি সহজে পর্টুগীজ ভাষা শিক্ষা করিয়া ইউরোপীয় বণিকদিগের কুঠীতে চাকুরী করিতেন। প্রথমে তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী ডচদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, পরে ফরাসী ও ইংরাজ কুটীতেও কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিপুল ধনবান বলিয়া বর্দ্ধমানে একদিন তাঁহার গৃহে দস্যুতা হয়, তাহাতেই তিনি ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র বলরাম ঘোষ জননী সহ পলায়ন করিয়া চন্দন নগরে আগমন করেন এবং তথায় ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা বিস্তর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তথাকার শাসনকর্ত্তা মুসে ডুপ্লেক্স বলরামের বুদ্ধি-বিদ্যার পরিচয় পাইয়া অনেক কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া পিতার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ থাকায় বলরাম ধনবান হইয়াও আপনি সামান্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় কালযাপন করিতেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ ৯৫বৎসর বয়সে তিনি রাম হরি ও শ্রীহরি নামক দুই পুত্র রাখিয়া পর-

(১) জব চার্ণক হুগলিতে থাকিবার সময় এখানে একটা হাট বসান উদ্যান প্রস্তুত করেন, তাহা হইতে দেশীয়েরা প্রথমে ঐ স্থানকে চার্ণক বলিত, পরে ১৭৭২ সালে চার্ণকে সৈন্যাবাস স্থাপিত হইবার পর উহা বারাকপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। বারাকপুরের উত্তরপূর্ব্ব পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র স্থানকে এখন চন্দন পুকুর বলে।

(২) বাবু লোকনাথ ঘোষ তাঁহার Indian Chiefs নামক গ্রন্থে সর্ব্বমঙ্গলা লিখিয়াছেন, কিন্তু সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধীয় যে কয়খানি কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকল গুলিতেই জয়মঙ্গলা বলিয়া উল্লেখ আছে, এবং তাঁহার উচ্চ মন্দির বহুদূর হইতে দেখা যাইত। বোধ হয় মনোহর ঘোষ ঐ মন্দির সংস্কার করিয়া দিয়া থাকিবেন।

লোক যাত্রা করেন। ইংরাজেরা চন্দননগর জয় করিলে তাঁহার পুত্রদ্বয় কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই বংশের ২৫ পুরুষ বাবু লোকনাথ ঘোষ নিজ বংশাবলী মধ্যে লিখিয়াছেন, কাঁটাপুকুরে আসিয়া শ্রীহরি ঘোষ সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করেন। রাম হরি ঘোষ রাজা গোপীমোহন দেবের সহোদরাকে পঞ্চমবারে ও বাহির সিমলা শিবনারায়ণ দাসের লেনের বিনোদরাম দাসের কন্যাকে ষষ্ঠ বারে বিবাহ করেন। ইহাঁরই গর্ভে আনন্দমোহনের জন্ম হয়, ইনি প্রথম কাবুল যুদ্ধে কমিসরিয়েট গোমস্তা হইয়া যান ও বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার কোন সন্তান নাই।

ইংরাজেরা মীর কাশিমের নিকট মুঙ্গের জয় করিলে শ্রীহরি ঘোষ উক্ত সহর ও দুর্গ-রক্ষকের দেওয়ান হইয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে দেওয়ান হরি ঘোষও বলিত।

উপরে তাঁহার যে অন্ন বিতরণের কথা লেখা হইয়াছে, তাহা কাঙ্গালী-ভোজনের মত নহে। আপনি ভাল রকম খাইয়া আশ্রিতদিগকে সামান্য ভাবে খাওয়াইলে, পূর্ব্বকালের লোকদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দার কথা হইত, সুতরাং হরিঘোষ নিজের মত তাঁহার "গোয়ালের সমস্ত গরু" গুলি-কেও খাইতে দিতেন। আমাদের সময় ইহা বিশেষ গৌরবের কথা! এই সকল গরু গুলি যে কেবল হরি ঘোষের জাব খাইয়াই আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহা নহে, ইঁহাদের পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যা পুত্র দায় সমস্তই তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া যাইত। তিনি এমন অদ্ভুত দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, অকাতরে এই সকল ভার বহন করি-তেন। পরিশেষে এই দয়াই তাঁহার সর্ব্ব-নাশের কারণ হইয়াছিল। তিনি জনৈক আত্মীয়ের জামীন হন, উক্ত আত্মীয় গা ঢাকা দেওয়ায় দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের যথা-সর্ব্বস্ব কোম্পানিতে বাজেয়াপ্ত হয়, তিনি মনোদুঃখে কাশীধামে যাত্রা করেন, তথায় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রাপ্ত হন। চোর-বাগানের সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ভারতের প্রধান প্রধান অনেক প্রাচীন বংশের বিবরণ-লেখক বাবু লোকনাথ ঘোষও ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের পৌত্র।

পূর্ব্বে যে বারণসী ঘোষের নাম উল্লেখ হইয়াছে, তিনিও ইহাঁদেরই জ্ঞাতি। মনো-হর ঘোষের নিজ কনিষ্ঠ সহোদর গণেশচন্দ্র ঘোষের পুত্র রাধাকান্ত ঘোষ। বারাণসী ঘোষ তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি ইংরাজীতে দক্ষ থাকায় ২৪ পরগণার কালেক্টর আইন আকবরি প্রভৃতির অনুবাদক গ্লাড়ুইন সাহে-বের দেওয়ান থাকিয়া অনেক অর্থ উপা-র্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষ শান্তিরাম সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সিংহ মহাশয়ের বাটীর নিকট বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে তাঁহার বাটীর সম্মুখে রাস্তাটী বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হয়। বেলি সাহেব কৃত ১৭৮৪ সালের ম্যাপে এই রাস্তাটী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত খোলা ছিল না, দেখিলে অনুমান হয়, শান্তিরাম সিংহের বাটী হইতে চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত খোলা ছিল। সে সময় উহা প্রাণকৃষ্ণ বাবুর রাস্তা বলিয়া নাম ছিল। বোধ হয়, বারাণসী বাবু কাঁসারীপাড়ার দিকে খরিদ করিয়া দিয়া রাস্তাটী খুলিয়া

দেওয়ায় তাঁহারই নামে রাস্তার নাম হইয়াছে।

সে সময় কলিকাতায় দস্যুদল নির্ভয়ে সদলে মশাল জ্বালিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ, এই তিন জন প্রসিদ্ধ দস্যুদলপতি ছিল। বিশ্বনাথের নিবাস ডুমুরদহ, তাহাকে লোকে বিশ্বনাথ বাবু বলিত। সে পাল্কী চড়িয়া ডাকাতী করিতে যাইত এবং গৃহস্থকে পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া কখন সে উপস্থিত হইবে, তাহা পূর্ব্বে জানাইয়া রাখিত। বারাণসী ঘোষকেও ঐরূপ জানান হইয়াছিল, বারাণসী ঘোষ দস্যুপতির পত্র পাইয়া বিষম চিন্তায় ও ভয়ে ব্যাকুল হইলে তাঁহার খানসামা বলিল, আপনার কোন ভয় নাই, আপনি বাটীর সমস্ত লোক জন লইয়া অন্যত্র গমন করুন, আমি একাকী সমস্ত দস্যু তাড়াইবার ভার লইলাম। ঘোষ মহাশয় অগত্যা তাহারই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। ভৃত্য সুশিক্ষিত তীরন্দাজ ছিল, সে কতকগুলি তীর এবং একটী ধনু লইয়া সদর দ্বার খুলিয়া দস্যুদিগের অপেক্ষায় রহিল। যথাকালে বিশ্বনাথ বাবুর পাল্কী আসিয়া নামিল, অসংখ্য দলবল মশাল জ্বালিয়া মালসাট মারিতে লাগিল, সদর দ্বার খোলা দেখিয়া বিশ্বনাথের কিছু ভয় হইয়াছিল। সে একটু চিন্তিত হইয়া কি করা উচিত, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার জন্য নিজ ভৃত্যকে তামাক সাজিতে আজ্ঞা করে। পাল্কীর মধ্যে আলবোলার উপর কলিকাটি বসিবা মাত্র একটী তীর আসিয়া কলিকাটি কাটিয়া ফেলিয়া দিল। বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল, ও বুঝিয়াছি, আচ্ছা আর একটী কল্কে দে। সেটা আসিলে বলিল, বাবা আরবারে বুঝিতে পারি নাই, তুমি লক্ষ করিয়া কল্কে কাটিলে, কি হঠাৎ লাগিল, এবার কল্কে কাটিতে পারিলে বুঝিতে পারিব। তৎক্ষণাৎ আর একটী তীর আসিয়া কলিকাটির সেই স্থানটী কাটিয়া দিল। তখন বিশু বাবু তাহার তীর শিক্ষাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, যেখানে এমন সুশিক্ষিত লোক আছে, সে খানে আমি ডাকাতী করি না। তুমি বাহিরে এস, তোমার সহিত আলাপ করিব। কিন্তু ভৃত্যের বাহিরে যাইতে সাহস হইল না, তখন বিশ্বনাথ তাহাকে অভয় দিয়া আপনার চিৎপুরের বাগানের আড্ডায় যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। কথিত আছে, তাহার পর হইতে বারাণসী ঘোষের সহিত বিশ্বনাথ বাবুর খুব সদ্ভাব হইয়াছিল। (১)

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সচিত্র সরল ধাত্রী-শিক্ষা।— প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি প্রণীত, মূল্য ১৲।

সুন্দরী মোহন বাবু কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার অসাধারণ শক্তি ধারণ করেন; পূর্ব্বে তিনি যে সকল পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। এই পুস্তকে কথা বার্ত্তার ছলে কঠিন বিষয়কে সরল করিয়া বুঝাইয়াছেন; বুঝাইবার জন্য অনেকগুলি চিত্র সন্নিবেশ

(১) সে কালের ডাকাতীর অনেক গল্প আছে, সময়ান্তরে তাহা প্রকাশিত হইবে।

করিয়াছেন। পরিশিষ্টে ইংরেজি কথার পরিভাষা দিয়াছেন। পুস্তক খানির সর্ব্বত্র আদর হইবে, আমরা আশা করি। প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে ইহার এক একখানি রাখা উচিত।

২। হরিনাথ-গ্রন্থাবলী।—প্রথম ভাগ, কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার প্রণীত, শ্রীজলধর সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাঙ্গাল হরিনাথের নামান্তর ফিকির চাঁদ। এই নাম জানে না, পূর্ব্ব বঙ্গে এরূপ লোক বিরল। সকল দেশে শিক্ষিত লোকের নিকটই কবিগণ সর্ব্বাগ্রে পরিচিত হন, কিন্তু ফিকির চাঁদ সর্ব্বাগ্রে পরিচিত বা পূজিত হন, নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে। এমন দরিদ্র বন্ধু একালে এদেশে বুঝিবা আর জন্মে নাই। তাঁহার "গ্রামবার্ত্তা" দরিদ্র-প্রীতির অক্ষয় কীর্ত্তি।

হরিনাথ যখন নিরক্ষর শ্রেণীর মন প্রাণ কাড়িয়া লইয়া বাউল বেশে সোণার বঙ্গে প্রেম-ভক্তির ঢেউ তুলিতেছিলেন, আমরা তখন তাঁহাকে দর্শন করিতে কুমারখালি গিয়াছিলাম। যে কুমারখালিতে হরিনাথের জন্ম, সেই কুমারখালি এক সময়ে কি তীর্থের ন্যায় পরিগণিত হইবে না?

বিজয় বসন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডবেদ পর্য্যন্ত—তাঁহার অমৃতময় লেখনী হইতে যত গ্রন্থ, যত সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে, সকলই অমূল্য; সকলই গৌরবে রক্ষা করার জিনিস। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই অমূল্য জিনিস রক্ষা করার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তাঁহার ন্যায় হরিনাথ-ভক্তের পক্ষেই সম্ভব। মহাজনের ন্যায় তাঁহার জীবনও ধন্য হউক।

আমরা বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পরমহংস রামকৃষ্ণ ও শিবনারায়ণ, ঋষি রামতনু ও রাজনারায়ণ প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষের চরণরেণু স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছি, তন্মধ্যে হরিনাথ একজন প্রধান। দরিদ্র বলিয়া তিনি কি চিরদিন এদেশে উপেক্ষিত হইবেন? তাঁহার পরিবার চিরদিন কি এদেশে অনাদৃত, অপরিচিত থাকিয়া দারিদ্র্য-সংগ্রামে পরাজিত হইবেন? যে দেশের ধনীরা টাকার সংব্যবহার জানে না, সে দেশে ধনীর টাকা না থাকিলে বুঝিবা ভাল হইত! এই গ্রন্থ কুমারখালি বাবু সতীশচন্দ্র মজুমদারের নিকট পাওয়া যায়; নব্যভারতের গ্রাহকগণ এক একখানি অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া রাখুন, আমরা অনুরোধ করি। এই রোগ শোক সন্তাপপূর্ণ পৃথিবীতে ফিকির চাঁদের এক একটী সঙ্গীতে তাঁহাদিগকে স্বর্গে তুলিয়া দিবে। আমরা অভক্ত এবং অধম, আমাদের সাধ্য নাই যে, এই ভক্তের গুণ সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করি।

৩। SOME REASONS for believing in Immortality. The substance of discourse delivered in the Brahmo Samaj Library Hall in october, 1899.

পুণ্যশ্লোক সাধু ফ্রেস্টার-উইলিয়মস্ ২।৩ বৎসর ভারতবর্ষে কাজ করিয়া এদেশে অমর হইয়াছেন। ভারতে পীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি ভারতের উন্নতির জন্য প্রাণ দিয়াছেন। জীবনের শেষাংশে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,তাহা অবলম্বনে এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অমূল্য জীবনের অমূল্য তত্ত্বের অমূল্য কাহিনী। এই একটী বিষয় পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন,

ফ্লেচার উইলিয়মস্ কিরূপ পণ্ডিত, বিশ্বাসী, ভক্ত ও মানবের হিতকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

৪। নেড়া হরিদাস।—মডেল-ভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস-চরিতামৃত প্রভৃতি উপন্যাস প্রণেতা কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ১৲।

পুস্তক খানি আগ্রহ সহকারে পড়িলাম। গ্রন্থকারের সাহসের না লেখার প্রশংসা করিব, বুঝিতে পারিতেছি না।

নিজ সম্প্রদায় বা জীবনের উন্নতির কথা ভুলিয়া যিনি এইরূপ অন্য সম্প্রদায়ের মর্কট-বৈরাগ্য-মূলক ধর্ম্মের কথা বলিতে প্রয়াসী, তাঁহার সাহসকে ধন্যবাদ দিতে হয়; কিন্তু ইহা সৎসাহসের পরিচয় নয়। এইরূপ ভাবে যাঁহারা নির্ভীকতার সহিত লেখনী চালনা করিতে পারেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশের অনেক পরিবর্ত্তন আশা করা যায়; কিন্তু তাঁহারা যদি আত্মদৃষ্টিহীন হন, তবে এরূপ লেখাতে কোন উপকার হয় বলিয়া মনে হয় না; লোকেরা এ কথা সে কথা তুলিয়া কত কি বলাবলি করে। অন্যের প্রশংসা এবং নিজ দোষ কীর্ত্তন করা মহত্ত্ব লাভের সোপান; অন্যের নিন্দা বা ভণ্ডামী প্রচারে আত্মা বা সমাজ কলুষিত হয়। পাপের চিত্র এ সংসারে অনেক দেখিয়াছি, এখন আদর্শ পবিত্রতা ও পুণ্যের চিত্র দেখিতে চাই। পাপীর মন, পাপের চিত্রে আরো কলুষিত হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থকার সম্প্রদায়-বিশেষের কালিমা-কীর্ত্তনে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, নিজ সম্প্রদায়ের কলঙ্ক সেইরূপ দেখাইতে পারিলে, তাঁহার প্রশংসা করিতে পারিতাম। হরিদাস কথায় কথায় যেরূপ ধর্ম্মের দোহাই দিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইয়াছে।

গ্রন্থকারের গল্প-রচনা-কৌশলের পরিচয় এ পুস্তকে মোটেই পাইলাম না, তবে তাঁহার বর্ণনা করিবার শক্তি অসাধারণ, বাঙ্গালা ভাষার উপর ক্ষমতাও অসাধারণ। তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী লেখকের নিকট আমরা এইরূপ একদেশদর্শী কলঙ্ক-কাহিনী অপেক্ষা অনেক সারবান লেখা প্রত্যাশা করি। কিন্তু তাহা কি কখনও হইবে, পরনিন্দা যে বড় মধুর !!

৫। মঞ্জীর।—শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী। মূল্য ১.০। মঞ্জীরে অনেকগুলি কবিতার সমাবেশ হইয়াছে, যথা চিত্রে ১৫টী, রোয়েলায় ৩৯টী, ভাববিলাসিনীতে ৫৪টী, ভাববৈচিত্র্যে ২৪টী এবং পুষ্পপতি। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। এরূপ সাজসজ্জা দেখিলে কাহার না মন ভোলে? নূতন কিছু করিবার জন্য গ্রন্থকারের বিশেষ আগ্রহের পরিচয় পাইলাম, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াও এমন কিছু পাইলাম না, যাহাতে আজ কালকার প্রণয়-মাতোয়ারা, উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত সাধারণ কবিদিগের অপেক্ষা ইহার বিশেষত্ব দেখাইতে পারি।

আমাদের দেশের অনেক কবি প্রণয়-চিত্র-অঙ্কনে অধিকতর প্রয়াসী। ১৩০৮—চৈত্রের প্রদীপে "মিলন" কবিতা ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রকাশক এই কদর্য্য কবিতাটীকে আবার ছবির দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া মা বোনদিগের হাতে উপহার দিয়াছেন! দুষ্কার্য্যের চিত্র দেখাইতে এ দেশের লোকের এত সাধ কেন, কে জানে? চিত্র দেখিলে লজ্জাও লজ্জা পায়। অতি কষ্টে এই মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইল। বাঙ্গালার অধোগতির আর বাকী কি? রাশি রাশি

গল্প পাঠ কর, কেবল স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কদর্য্য প্রণয়ের চিত্র, কবিতা পাঠ কর, কেবল প্রণয়ের চিত্র! দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছি। সাধারণকে নরকের পথে লইয়া যাওয়ার জন্য যেন সকলে এক-যোট হইয়াছেন। মঞ্জীরের গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রমত্ত-প্রণয়-চিত্র আঁকিবার জন্য আগাগোড়া চেষ্টা পাইয়াছেন।

"অমনি সরম রাঙ্গা ফুটিবে আননে,
আদরে বাঁধিব বুকে তোরে আলিঙ্গনে।"
"আমার এ মুক্ত বুকে, আয় বালা। আয় আয় সুখে
উভয়ে মিশিয়া যাই ছায়ায় ছায়ায়
নিশি যায়, যায়।
"নীলালক গুচ্ছ কটি আলসে লালসে
অরুণিম স্তনকলি আধ-বিকশিত
মধুলুব্ধ অলি সম করিছে চুম্বন।"
"একবার রাখি আমি! নয়নে নয়ন,
শেষ ভিক্ষা দাও মোরে—একটি চুম্বন।"
"তেমনি ছুটিয়া দোঁহে ভুলিয়া বিষাদে
মিশিলাম বুকে বুকে বিটপি চরণে।
কেমনে বিচ্ছিন্ন র'বে অভিন্ন হৃদয়?
একটি চুম্বন ফুটি' দু'অধরে রয়।"

নানা কবিতার নানা স্থান হইতে এই স্থানগুলি উদ্ধৃত করিলাম। "কেমনে" "তনু" "আমার তরে" প্রভৃতি কবিতায় এ সকল কথার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি—লজ্জায় উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গদেশ বিলাসিতা এবং প্রণয়ে ডুবিয়া গিয়াছে—দেশ-হিতৈষণা, পবিত্রতা, শান্তি, ভক্তি, প্রীতি, সব ডুবিয়া যাইতেছে। নচেৎ কোন্ সাহসে অভিভাবকহীন নবীন লেখক এ সকল চিত্র আঁকিতে প্রয়াসী?

প্রণয়-মদিরা পানে কবি বিভোর, বুঝিবা এইজন্য কবির নিকট "উরস" কথাটী বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। কত কবিতার কত স্থানে যে ইহা দেখিলাম, সংখ্যা করা যায় না।

লেখক নবীন, কিন্তু তিনি পণ্ডিত, কিন্তু তিনি ভাবুক ও রসিক। নবীনত্ব, পাণ্ডিত্য, ভাবুকতা এবং রসিকতা মিলিয়া মিশিয়া সুন্দর শিল্প-নৈপুণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিলে আনন্দ হয়, কিন্তু যদি প্রণয়-কলঙ্কের বাড়াবাড়ি না থাকিত! এই কলঙ্ক পুস্তকের সকল শোভা মাটী করিয়াছে। মনে হয় যেন সুসজ্জিত আবরণে পচা পুরীষ রাশি ঢাকা রহিয়াছে।

৬। রাখাল রাজা।—মূল্য।॰; খ্রীষ্টের পবিত্র জীবনী সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে চিত্র আছে। পড়িয়া সুখী হইলাম।

৭। যোগেন্দ্র।—শ্রীললিতকুমার মহিন্তা প্রণীত, মূল্য ৷৷॰। নিরাশ এবং ব্যর্থ প্রণয় কাহিনী, এই উপন্যাসের মূল কথা। এই কলঙ্ককাহিনী আমাদের নিকট ভাল লাগিল না। পুত্রহন্তা মাতার চিত্র চিত্রিত না হইলেই ভাল হইত।

৮। ঝাঁশীর রাজকুমার।—শ্রীসখারাম গণেশদেউস্কর প্রণীত, মূল্য ।৵॰। ঝাঁশীররাণী লক্ষ্মীবাঈর দত্তক পুত্র দামোদর রাওর সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

বাঙ্গালার পরম সৌভাগ্য যে, সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় ভিন্ন দেশীয় লোক হইয়াও বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বদ্ধ-পরিকর। তাঁহার গবেষণা এবং শক্তি অসাধারণ। বাঙ্গালা ভাষা তাঁহা দ্বারা অনেক উপকৃত।

দামোদর রাওর জীবন-কথা তাঁহার আত্মকাহিনী হইতে বিবৃত হইয়াছে। আমরা পড়িবার সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গবর্ণমেণ্টের যে দুরপনেয় কলঙ্কের কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহা

পাঠ করিলে বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হয়। বিধাতার বিধানে এরূপ ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত কি নাই? আমরা আশা করি, পুস্তকখানি সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আদৃত হইবে।

৯। বাজী রাও।— শ্রীসখারাম গণেশ-দেউস্কর প্রণীত; মূল্য ৸৹। যে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বর্গীর অত্যাচার কাহিনী এক সময়ে বিষবৎ প্রতীয়মান হইত, সেই দেশে বাজী রাওর ন্যায় ন্যায়বান বীরের কাহিনী প্রচারিত হইলে বাস্তবিকই প্রভূত উপকার হয়। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালার বিশেষ উপকার করিলেন। ভারতের অগণিত জাতি-সাধারণের মধ্যে, মহারাষ্ট্রীয়, পার্শী, বাঙ্গালী এবং শিখ প্রধান। কেহ ধনে, কেহ কাজে, কেহ বুদ্ধিতে এবং কেহ শারীরিক বলে জগতের উন্নতির দ্বারে আজ দণ্ডায়মান। এই জাতি-চতুষ্টয়ের মিলনও একাত্মক ভাব ভিন্ন ভারতের উন্নতি অসম্ভব। অহল্যা বাঈর পুণ্য কাহিনী লিখিয়া যোগীন্দ্র নাথ, এবং বাজী-রাওর জীবনী লিখিয়া এই গ্রন্থকার, এই মিলনের অন্তরায় দূর করিতে প্রয়াসী হইয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

গ্রন্থকার বহুদিন যাবত ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয়ে নিযুক্ত আছেন। আমরা রজনীকান্ত গুপ্তকে হারাইয়া গভীর শোকে নিমগ্ন, এই সময়ে এই গ্রন্থকারের এইরূপ প্রয়াসে বিশেষ পুলকিত। গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া এই উভয় জাতির মিলনের কারণ রূপে সর্ব্বত্র আদৃত হউন।

১০।—সেক্সপিয়র চতুর্থ ভাগ বা শেষ। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত অনূদিত, মূল্য ১৷৹।

৮ বৎসরের অসামান্য চেষ্টা ও পরিশ্রমে মহা কবির মহাকাব্য বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া হারাণ বাবু ধন্য হইয়াছেন। ভারতে যেমন ব্যাস বাল্মীকি, ইংলণ্ডে তেমনি মিল্টন সেক্সপিয়র। রামায়ণ অনুবাদিত করিয়া কৃত্তিবাস,এবং মহাভারত অনুবাদিত করিয়া কাশীরাম, বাল্মীকি ব্যাসকে বাঙ্গালার সাধারণের হৃদয়ে অমর করিয়া নিজেরা অমর হইয়াছেন; হারাণ বাবু মহাকবি সেক্সপিয়রের গ্রন্থ সমূহকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিয়া এই বঙ্গে অমর হইবার যোগ্য কাজ করিয়াছেন। আমরা আগ্রহ সহকারে অনুবাদ পড়িলাম। ভাষান্তরিত হইলে যে কোন মহাকবির কাব্যের শিল্প-সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, আমাদের বিশ্বাস। আজ পর্য্যন্ত কেহই একার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। হারাণ বাবু সে চেষ্টাও করেন নাই। তিনি মোটামোটি ভাবে, সরল এবং মধুর বাঙ্গালায় এই মহাকবির গল্প সমূহের সার সঙ্কলন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন,তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। যাঁহারা নাটক ও কাব্যগত শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে এখানে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতে হইবে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহাদের নিকট এ গ্রন্থ যে কিরূপ উপাদেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, লেখা অসাধ্য। হারাণ বাবুর লেখনী সার্থক হইয়াছে,জীবন ধন্য হইয়াছে। বিধাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১১। ইন্দু।—ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকার ক্ষুদ্র জীবনরচিত। মূল্য ৵৹।

এই পুস্তক খানিতে একটী অপার্থিব চিত্রের প্রতিবিম্ব দেখিলাম। ইন্দু, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী কন্যা।

শশিপদ বাবুর নাম শিক্ষিতমণ্ডলীর অনেকেই জানেন। তাঁহার ঘরে মাতৃরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে যাহারা অবতরণ করিয়াছে বা করিয়াছিল, তাহাদের কোন্‌টী যে মন্দ, আমরা জানি না। যেমন বনলতা, যেমন ইন্দু, তেমনি উষা। তাহারা আজও সংসারে আছে, তাহাদের কথা এখন বলা ঠিক নয়। যাহারা গিয়াছে, তাহারা যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। কি পবিত্রতা, কি প্রতিভা, কি মধুরতা, কি কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কি ভালবাসা—সব বিষয়ে যেন তাহারা আদর্শ। তাহারা যেন দেব-ধামের দেবশিশু; তাহারা দেবধামের দেব ভাষায় দেব-তত্ত্বের আভাস দিয়া স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমরা সংসারে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, তাহারা মানবী না দেবী?

১২। আভাস।—কুমারী শান্তিময়ী দেবী প্রণীত; মূল্য।৵০। শান্তি, ইন্দু, বনলতা এবং উষার ছোট ভগ্নী। শান্তির নামে ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত পাগল। কি শোভা, কি সৌন্দর্য্য তাহারা বালিকা শান্তিতে দেখে, কে জানে? শান্তির বয়স অধিক হয় নাই, এখনই সে পবিত্রতায় সকলকে আকর্ষণ করিতেছে। কেমন পবিত্রতা, পাঠক দেখুন।

"সবিত দিয়াছ তুমি মোরে ওহে প্রাণময়!
আকুল হৃদয় তবু, কেন তৃপ্ত নয়?
প্রাণের মরম স্থানে, কে যেন গো সঙ্গোপনে
ক্ষীণকণ্ঠে অভাবের দুঃখগীতি গায়;
আর কিছু নয়, শুধু তোমারে সে চায়।"

"আমি চাই ওগো চিরতরে জাগো
তুমি আমার হৃদয়ে,—
আমি চাই তব চরণেতে রব
চির আকুলতা লয়ে।"

"চাহনাত তুমি দেব জীব বলিদান
চাহনা চন্দন ফুল পূজা আয়োজন,
তুমি চাও মানবের ভক্তি উপহার,
নিরমল হৃদি আর কৃতজ্ঞ অন্তর।"

"আঁধারে উজ্জল হেরি জোনাকির ভাতি
শূন্য-প্রাণ, ক্ষীণ-বিভা, সরি তার ঠাঁই,
মোহের আঁধারে নিজে নেহারি উজ্জ্বল,
ও পুণ্য প্রভাব কাছে আপনা হারাই।"

"সূর্য্যমুখী বনে ফোটে তবু থাকে চেয়ে
অনন্ত নীল গগনে উজ্জল রবির পানে,
পাবে না রবিরে জানে, তবু প্রেমী হয়ে
তাহারি কিরণে ফুল যায় শুখাইয়ে।
অনন্ত মহান্ তুমি, তোমারে কি পাব?
তবুও তোমার তরে সারাটি জীবন ভরে
আকুল হৃদয় নিয়ে চাহিয়া রহিব।
তোমারি কিরণে দেব! শেষে মিশে যাব।"

কি সুন্দর, কি পবিত্র ভাব। আমাদের দেশের পুরুষ-কবিগণ কিন্তু "প্রণয়" ছাড়া আর যেন কোন বিষয় পান না! তাঁহারা এই বালিকা-কবির পবিত্রতা দেখুন। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। যিনি এইরূপ পবিত্র কবির প্রসবিণী, মাতৃরূপিণী সেই দেবীকে বার বার প্রণাম। তাঁহারই পবিত্রতার ছায়া তাঁহার কন্যা সকলে প্রতিবিম্বিত।

আর্য্য-সাহিত্যের অধ্যয়ন-ফল।

আমাদিগের পুরাণপাঠে পরিদৃষ্ট হয়, প্রতি পুরাণের শেষে সেই পুরাণের শ্রুতি-ফল প্রদত্ত হইয়াছে। এমন কি, তদন্তর্গত কোন কোন ইতিহাস বা উপকথার শেষে, বিশেষ বিশেষ স্তুতি বা স্তবের শেষে, বিশেষ বিশেষ খণ্ডের শেষে সেই সেই বিষয়ের শ্রুতিফল দেওয়া আছে। ইহার কারণ এই, আমাদের পৌরাণিক আলঙ্কারিকেরা এইরূপ ফল দ্বারা সমগ্র-কাব্যের বা কাব্য-বিভাগের বিশেষ বিশেষ অংশের কবিত্ব পরীক্ষা করিতেন। কবিত্ব পরীক্ষা করিবার এরূপ উৎকৃষ্ট রীতি আর কোন দেশীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে দেখা যায় না। এইরূপ শ্রুতিফল দিবার কারণ এই যে, যদি সেরূপ ফল না জন্মিয়া থাকে, তবে শ্রুত বিষয়ের সম্পূর্ণ মর্ম্মাবগত হয় নাই, বুঝিতে হইবে। যদি গীতা পড়িয়া গীতার শ্রুতিফল না জন্মিয়া থাকে, যদি নারায়ণের সহস্র নাম পড়িয়া সেই স্তবের শ্রুতিফল উৎপাদিত না হইয়া থাকে, যদি সীতা সাবিত্রীর কথা পড়িয়া, সেই কথা-শ্রবণের ফলোৎপত্তি না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, গীতার প্রকৃত মর্ম্ম, নারায়ণ-স্তোত্রের দার্শনিক তত্ত্ব, সাবিত্রী-কথার এবং রামায়ণ-পাঠের ফল কিছুই জ্ঞানগোচর হয় নাই। তখনই কাব্য যথারীতি পঠিত হইয়াছে, যখন তাহার শ্রুতিফল জন্মিয়াছে। পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিয়া সেই নীতিদ্বারা সামান্ত সাহিত্যের বিচার করিলে আমরা কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি, এই শ্রুতি-ফলই সকল সাহিত্যের পরীক্ষা।

পৌরাণিক কালে সর্ব্ববিষয়ই শ্রুত হইত বলিয়া পুরাণে শ্রুতিফলের বর্ণনা আছে। অধুনা যখন শ্রবণের পরিবর্ত্তে সর্ব্ববিষয়েরই অধ্যয়ন হইয়া থাকে, তখন শ্রুতিফলকে অধ্যয়ন-ফল বলিয়া অভিহিত করা উচিত। সুতরাং কাব্য বল, নাটক বল, সাহিত্যের যে কোন অঙ্গ বল, এই অধ্যয়ন-ফল ধরিয়া তাহার বিচার। যাহার অধ্যয়ন-ফল ভাল, তাহাই ভাল গ্রন্থ, যাহার অধ্যয়ন-ফল মন্দ, তাহাই মন্দ গ্রন্থ, যাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই হয় না, তাহা গ্রন্থই নহে।

এই অধ্যয়ন-ফল কিরূপে উৎপাদিত হয়? সমস্ত গ্রন্থ-পাঠের পর চিত্তে তাহার যে অঙ্কন পড়ে, যে ফলোদয় হয়, তাহাই তাহার অধ্যয়ন-ফল। গ্রন্থ বড় হইলে হয় না, ছোট হইলেও হয় না। নল-দময়ন্তীর বিস্তৃত কথার ফল অপেক্ষা ক্ষুদ্র সাবিত্রী-চরিত-কথার ফল অধিকতর। শুধু নল-দময়ন্তীর কথা কেন, পৌরাণিক সাহিত্যে, যত সতী-চরিত বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয়, সে সমুদায় চরিত-কথার শ্রুতি বা অধ্যয়ন-ফল অপেক্ষা সাবিত্রী-চরিতের অধ্যয়ন-ফল গুরুতর। তাই, সাবিত্রী-কথা ব্রতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে স্ত্রীজাতি ভূতপ্রেতের এবং আরব্যোপন্যাসের গল্প-কথা বিশ্বস্ত চিত্তে শ্রবণ করে; শ্রবণ করে কি? হাঁ করিয়া অবাক্ হইয়া শুনে, তাহাদের চিত্তে সাবিত্রী-চরিতের রূপকথার ফল যে অত্যন্ত গুরুগম্ভীররূপে সুদৃঢ়বদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বাস্তবিক,

হিন্দু-জাতি-মধ্যে সেই ফলোদয়ই ঘটিয়াছে এবং ঘরে ঘরে সতীরত্নের উৎপাদন করিয়াছে।

আর্য্যসাহিত্যের অনেক কাব্য-নাটকের অধ্যয়ন-ফল এই সাবিত্রী-চরিত্রের মত উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট কেন? তাহার প্রধান কারণ এই, আর্য্যসাহিত্যের অনেক স্থলেই পাপচিত্র অপেক্ষা পুণ্যময় পবিত্র চিত্রের গৌরব সমধিক; এত অধিক যে, সেই পুণ্যময় পবিত্রতার ফলে পাপছবি ডুবিয়া পড়ে, তাহা আর তত গৌরব লাভ করিতে পারে না। কাজেই, অধ্যয়ন-ফল অতি পুণ্যময় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বিলাতী অনেক কাব্য-নাটকের ফল ঠিক ইহার বিপরীত হয়। তাহাতে পাপের গৌরব এত অধিক যে, তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুণ্যচিত্র সকল ডুবিয়া পড়ে, কাজেই অধ্যয়ন-ফলে পাপেরই সমধিক গৌরববৃদ্ধি হয়।

বিলাতী Realistic এবং ট্র্যাজিডি ধাতুর নাটক-নভেল লিখিয়া অনেকে উৎকৃষ্ট স্বভাব-চিত্রকর বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন। বিড়াল-কুকুরকে, চোর-ডাকাতকে পিশাচ-নরাধমকে, ঐন্দ্রিয়িক ও ঘোর রিপু-পরতন্ত্র পাপীকে যথাযথ চিত্র কর, তাহাতে তুমি উত্তম চিত্রকর বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিতে পারিবে। উত্তম চিত্রকর হইলেই যে তোমার চিত্রিত বিষয়-সকলও উৎকৃষ্ট হইতে হইবে, এমত কিছু কথা নাই। তুমি যদি বিড়াল-কুকুর কিম্বা চোর-ডাকাত যথাযথ চিত্রিত করিয়া থাক, তবে তাহা সেই বিড়াল-কুকুর এবং চোর-ডাকাত বলিয়া গণ্য হইবে, তদপেক্ষা অধিক কিছু হইবে না। বিলাতী বড় বড় নাটক-নভেলে এইরূপ বড় বড় দুর্ব্বৃত্ত, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, শঠ, লোভী আসুরিক দুষ্কর্ম্মের চিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হয়। পরিণামে, পাপের দণ্ড ও ধর্ম্মের জয় যে সেরূপ সকল গ্রন্থে আছে এমত নহে। কারণ, বিলাতী সমালোচকেরা বলেন, সংসারক্ষেত্রে সকল সময়ে পাপের পরিণাম যে নরকভোগ ও দুঃখ ক্লেশ, এমতও দেখা যায় না। তজ্জন্য সংসারের যথাযথ চিত্রময় গ্রন্থেরও পরিণাম তদ্রূপ হয়। সংসারের ঘটনাবলীর আপাততঃ এইরূপ পর্য্যবসান সচরাচর না হইলেও, সেই প্রকার পরিণামী চিত্রের স্বরূপ-অঙ্কন গ্রন্থবদ্ধ করা উচিত কি না, তাহা বিচার্য্য। এরূপ পাপছবি লিপিবদ্ধ হইলে কি সমাজে সুনীতির পরিচয় হয়? না, সমাজের কল্যাণ-সাধন হয়? জগতে সেরূপ গ্রন্থ কি নীতি প্রচার করে? স্থূলদর্শীর নিকট পাপের পরিণাম অশেষ যন্ত্রণা ও নরক-ভোগ না হইলেও, ধর্ম্মজ্ঞ ডাক্তার পার্ণেলের মত সূক্ষ্মদর্শী জনগণের নিকট ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্মরূপেই প্রতীত হয়। তাই পার্ণেলের "সন্ন্যাসী"-নামক খণ্ডকাব্যে এই তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্র বলেন, ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, সে গতি কেবল সূক্ষ্মদৃষ্টিতেই উপলব্ধি হয়। আপাততঃ অধর্ম্মের জয় হইলেও পরিণামে তাহার পরাজয় হইবেই হইবে। ভগবানের সূক্ষ্ম-শক্তির আবির্ভাবে বা অবতরণে পাপের অত্যন্ত প্রাবল্যের ধ্বংস-সাধন হয়। গীতা এইরূপই শিক্ষা দিয়াছেন। এই সংসার ব্যাপার যে ভগবানের হাতে, তিনি চক্রধারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার দৈববলের নিকট পরিণামে সকল বলই পরাজিত। রামায়ণ ও মহাভারতের বৃহৎ ব্যাপার সেই চক্রে নীয়মান হইয়া দৈববলের জয় শতমুখে ঘোষণা

করিতেছে। যাহা কাব্যকার ও ধর্ম্মাত্মাগণের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রতীত, তাহা যদি সর্ব্বসাধারণ-জনগণের স্থূলদৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এ সংসার পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হইত। স্থূলদৃষ্টি জনগণের চক্ষে যাহা যেরূপে ভাসমান, সূক্ষ্মদৃষ্টি কবিও কি তাহাকে সেই-রূপেই দেখাইবেন? তবে কবি ও জ্ঞানীর সহিত সামান্য লোকের প্রভেদ কোথায়? সংসারের সামান্য ঘটনাবলীর পটোত্তোলন করিয়া কবি যদি তন্মধ্যে নারায়ণের হস্ত না দেখাইতে পারেন, তবে তিনি কবি কি? তাঁহার কাব্য লিখিবার প্রয়োজন কি? সামান্য লোকে যাহা দেখিতেছে, তাহাত পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু কাব্যের ঘটনা-বলী ও রসের এরূপ প্রবৃদ্ধি, পরিপাক ও পরিণতি হওয়া চাই, যেন তাহা সূক্ষ্মগতি-ক্রমে ধর্ম্মে ও সৎপথে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়। সেইরূপে পর্য্যবসিত হইলে তবে কাব্য-বর্ণিত ব্যাপারের শেষ পর্য্যন্ত দেখান হয়। এরূপ মধুরতায় গ্রন্থ পর্য্যবসিত না হইলে তাহা সহৃদয় জনগণের প্রীতি-প্রদ হয় না, গ্রন্থ-অধ্যয়নের ফল শুভদায়ক হয় না। তা বলিয়া আমরা এমত কথা বলিতে চাহি না যে, সমুদয় গ্রন্থকে পাপরসে ডুবাইয়া রাখিয়া শেষে একটু ধর্ম্মের মধুর রস দিয়া পর্য্যবসান করিলেই সুনীতি বজায় রহিল। তাহাতে সুনীতি বজায় থাকা দূরে থাকুক, সেইরূপ গ্রন্থাধ্যয়নের ফল ঠিক বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। যে গ্রন্থের সমুদয় অবয়ব প্রগাঢ় পাপরসে পরিপূর্ণ, তাহার মুখে একটু মধু দিলে কি সে মধু পাপরসে ভাসিয়া যায় না? বিলাতী অনেক ট্র্যাজিডি ও ট্র্যাজিডি ধাতুর নাটক-নভেলে এই রস বর্ত্তমান। তাহার প্রধান রসের প্রবাহে পাপ, পাপের উপর পাপ—সেই প্রবাহে মারামারি, কাটাকাটি, আত্মহত্যা, রক্তা-রক্তির স্রোতে ধর্ম্ম আসিয়া দেখা দিয়া সেই রক্তারক্তিতেই গ্রন্থ পর্য্যবসিত করিয়া দেয়। ম্যাকবেথ নাটকের পরিণাম এই-রূপ নয় কি? তন্মধ্যে যে সকল ভাল চিত্র আছে, লেডি ম্যাকবেথের চিত্র সে সমস্তই নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া আপনি অতি উজ্জ্বল বর্ণে পাঠকের হৃদয়াধিকার করে; তাহার গৌরবে হৃদয় পূর্ণ হয়। একদা পাঠিকা হয় ত সেইরূপ গৌরব লাভা-র্থিনী হইতে চাহেন। যদি বল, ম্যাকবেথ নাটকে কি শেষে পাপ-মূর্ত্তি ম্যাকবেথের নিধন-সাধন হয় নাই? অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় হয় নাই? হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে চিত্র তত উজ্জ্বল নহে, যত পাপ-চিত্র সমুদয়। গ্রন্থে পাপ পুণ্য এই দুই দিকই আছে বটে, কিন্তু কোন্ দিক ভারী হই-য়াছে? পাপ চিত্রের পরিমাণ অধিক, না পুণ্য চিত্রের পরিমাণ? কোন্ চিত্র উজ্জ্বল-তর? পাপ পুণ্যের ন্যূনাধিক্য লইয়াই সকল গ্রন্থ-কল্পনার কবিত্ব। ম্যাকবেথের কবিত্ব কিরূপ? ম্যাকবেথের সমুদয় গ্রন্থ প্রায় পাপ-প্রগাঢ়তায় পরিপূর্ণ; শেষে একটু ধর্ম্মালোক। সেরূপ ক্ষুদ্রালোকে কি সমুদয় পাপপ্রগাঢ়তার ঘন অন্ধকার বিনষ্ট করিতে পারে? সেই গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফল স্বরূপ কাহার স্মৃতি অন্তরে জাগিতে থাকে? আজ দশ বৎসর হইবে তুমি ম্যাকবেথ নাটক পড়িয়াছ; বল দেখি, এক্ষণে কাহার স্মৃতি মনে মনে জাগিতেছে? সকল স্মৃতিকে ডুবাইয়া দিয়া এখন কোন্ স্মৃতি মনে প্রবল হইয়াছে? সে স্মৃতি কি রাক্ষসী লেডি ম্যাকবেথ নহে? মিল্টনের মহা-কাব্যের

অধ্যয়ন-ফল স্বরূপ যেমন সন্তানের মহা স্মৃতি মনে জাগিতে থাকে, লেডি ম্যাকবেথের স্মৃতি তদ্রূপ। এইজন্ম বলি, লেডি ম্যাকবেথকে নিষ্প্রভ করিতে পারে; এ রূপ চিত্র শেক্সপিয়ার দিতে পারেন নাই, ট্র্যাজিডিতে দিবার যো নাই। বিলাতী ট্র্যাজিডি ধাতুর নভেলেরও দোষ এইরূপ। তাহাদের অধ্যয়ন-ফল অতি গর্হিত।

পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি ও ভীষণ পরিণাম দেখাইয়া পাপ-পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করিবার বিশিষ্ট উপায় বলিয়া ইউরোপীয় সমালোচকগণ ট্র্যাজিডির আসুরিক সৃষ্টির সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু এ যুক্তি সঙ্গত নহে। পাপের মূর্ত্তি দেখাইতে গিয়া সেই পাপকে এত অসামান্য আকারে ভয়ঙ্কর করা কেন, যে তাহা খুনে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়? লোকের সামান্য পাপ-প্রবৃত্তি সচরাচর তত ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে না। ট্র্যাজিডিতে যে পাপ অঙ্কিত হয়, তাহা ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর, ভয়ানক হইতে অতি-ভয়ানক হইতে থাকে—এত ভয়ানক যে, অবশেষে তাহার পরিণামে খুন আসিয়া উপস্থিত হয়; কারণ, সেই রূপ করাই ট্র্যাজিডির অভিপ্রেত। পাপের এত ভয়ানক মূর্ত্তি কি সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায়? সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে কয়টা খুন ঘটে? তবে পাপের এই ভয়ানক মূর্ত্তি আঁকিয়া মানবের কল্পনাকে পূর্ণ করা কেন? সেরূপ পাপ-মূর্ত্তির সর্ব্বদা আলোচনা করিলে কি কল্পনা হইতে তাহার ভীষণতা ক্রমে ক্রমে অপনীত হয় না? হইলে তাহার ফলাফল কি হয়? তদ্রূপ খুনে ক্রমে মতি হয়। কিন্তু সংসারের বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে সেরূপ খুনের চিত্র সর্ব্বদা অঙ্কিত হয় না বলিয়া লোকসমাজের কল্পনাক্ষেত্র তদ্রূপ চিত্রে কলঙ্কিত হইবার অল্পই সম্ভাবনা ঘটে। তাই যদি হয়, তবে খুনের চিত্রকে সাহিত্য-মধ্যে সুরক্ষিত করিয়া চিরকাল সে চিত্রকে স্থায়ী করিবার আবশ্যকতা কি? সাহিত্য-মধ্যে সেরূপ চিত্র চিরদিনের জন্ম পরিস্থাপিত হইলে তাহার ফল এই হয় যে, মানুষের কল্পনায় সেই সাহিত্যের খুন এবং বাস্তবিক কর্ম্মক্ষেত্রের খুন, এই দ্বিবিধ খুন-চিত্র সমুদিত থাকিয়া সেই কল্পনাকে সর্ব্বদা খুন-চিত্রে পূর্ণ করে। প্রতি কবি বা উপন্যাসকার যদি দুই চারি খানি ট্র্যাজিডি ধাতুর চিত্র আঁকিয়া যান, তবে জাতীয় সাহিত্য-মধ্যে কত খুন-চিত্রের একত্র সমাবেশ হয়? তাহার উপর আবার সংসারের বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রের খুন এবং রঙ্গালয়ে নাটকাভিনয়ের খুন। বিলাতী কাব্য, ইতিহাস, নাটক এবং উপন্যাসাবলী এইরূপ অশেষ খুনময় চিত্রে পরিপূর্ণ হইয়া দেশ-শুদ্ধ খুনে প্লাবিত করিয়াছে। তদ্রূপ সাহিত্যের অনুকরণ বাঙ্গলাভাষায় কেন? অনুকরণ করিবার আর কি সামগ্রী নাই?

ম্যাকবেথ প্রভৃতি ট্র্যাজিডির উপদেশ এই যে, কোন কারণ বশতঃ মানুষ যদি একবার খুন করে, সেই খুন হইতে তাহার সাহস বাড়ে এবং খুনের দিকে সে আরও অগ্রসর হয়। এক খুন মানুষকে আর এক খুনে টানিয়া আনে। তাই লোকে কথায় বলে যে, যে সর্ব্বদা মনে মনে করে আমি গলায় দড়ী দিব, তাহাকে গলায়-দড়ী দেওয়া ভূতে ধরে। এ কথা সত্য। তাই বিলাতী সমালোচকগণ বলেন, প্রথম খুনে যাহাতে লোকের প্রবৃত্তি না জন্মে, এমত

উপায় অবলম্বনীয় এবং সেই উপায়ই ট্র্যাজিডি। যদি বল, ট্র্যাজিডি লোককে প্রথম খুন হইতে বিরত ও সতর্ক করে, সে কথার উত্তরে আমরা বলি, সমাজস্থ যে ভদ্র-জনগণ সেই ট্র্যাজিডির পাঠক, তাঁহারা কি কেবল খুন করিতেই অহরহ প্রবৃত্ত যে, সেরূপ খুনের প্রবৃত্তি যাহাতে নিবারিত হয়, এরূপ উপায় করাই উচিত? লোকে হাজার পাপী হইলেও খুন করিতে কেহ সহসা প্রবৃত্ত হয় না। খুন, অধিকন্তু বদ্-রাগী ইতরলোক-মণ্ডলী মধ্যে এবং কখন কখন রাজ-সংসারে পরিদৃষ্ট হয়; ভদ্রসমাজে খুনের দৃষ্টান্ত খুব কম। ভদ্রসমাজ-মধ্যে কিন্তু বিদ্যালোচনার আধিক্য-বশতঃ সেই সমাজস্থ লোকমণ্ডলী মধ্যে ট্র্যাজিডি ধাতুর সাহিত্যের বিস্তর পাঠক। তাই যদি হয়, তবে ট্র্যাজিডি ধাতুর সাহিত্য বহুল সৃষ্টি করিয়া সেরূপ লোকের কল্পনাকে কলঙ্কিত করা কেন? সেই জন্ত বলি, খুনে পর্য্যবসিত হইতে পারে, এরূপ ভয়ানক পাপ-চিত্র সাহিত্য মধ্যে সুরক্ষিত না করাই ভাল। খুনের প্রতি লোকের স্বাভাবিক ঘৃণা আছে, সেই ঘৃণাই যথেষ্ট। সর্ব্বদা খুন-চিত্র দেখাইয়া সে ঘৃণা অপনয়ন না করাই উচিত। যে সর্ব্বদা কসাইখানায় বেড়ায়, সে ক্রমে কসাই হইয়া পড়ে। সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে ত পাপ পুণ্য উভয়ই বিদ্যমান আছে, তবে পুণ্য-চিত্র ফেলিয়া ঘোর নারকী পাপ-চিত্র এত ঘোর বর্ণে অঙ্কিত করা কেন? লোকে কি পাপ-চিত্র দেখিবার জন্ত এত লালায়িত যে, পাপকে বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া সমুজ্জ্বল করিয়া দেখান উচিত? শুধু দেখান নহে, তদ্রূপ পাপ-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া পাপকে অহরহ চিরদিন স্থায়ী মূর্ত্তিতে সুরক্ষিত করা উচিত? যে পাপ-চিত্র ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে, একবার চক্ষু খুলিবার অপেক্ষা, তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পাপকে এত আদর করিয়া বড় বড় গ্রন্থ মধ্যে স্থাপন করিবার আবশ্যকতা কি? পাপের মূর্ত্তি এত প্রলোভনীয় যে, তাহার দণ্ড ও ফলাফল অতি উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়া রাখিলেও মানব সে ফলাফল মনে করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় না। বেশ্যাসক্তি বা পানাসক্তি হইতে যে অশেষ দুঃখ, সন্তাপ ও শাস্তি হয়, কয় জন লোক তাহা না জানে? জানিয়া শুনিয়াই বা কয় জন লোক সেইরূপ পাপাসক্তি হইতে বিরত হয়? খুনের যে অশেষ সন্তাপ ও নরক-ভোগ, তাহা কি আরঞ্জীব কিম্বা রণবীরকে তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিল? সংসারে কয় জন রণবীর বা আরঞ্জীব জন্মিয়াছে? তাই যদি হয়, তবে সেরূপ ঘোর পাপের ফলাফল দেখাইবার প্রয়োজন কি? আমরা এমত কথা বলিতে চাহিনা যে, একেবারেই পাপ চিত্র আঁকিবে না; আঁকিবে বৈকি। পুণ্যময় চিত্রকে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত পাপের কলঙ্ক-রেখা-পাত করা উচিত; পুণ্যের সঙ্গে পাপকে দেখাও। পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে পাপকে দেখাইতে হইলে যেন পুণ্য দিকই গুরুতর এবং অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়, এমত করিয়া চিত্র আঁকা চাই। পাপকে চিত্রিত করা যেন মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়, পুণ্যকে সমুজ্জ্বল করাই যেন গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়।

যদি মানব-প্রকৃতির চিত্র আঁকিতে হয়, তবে প্রধানতঃ পাপময় মানব-প্রকৃতির চিত্র কেন? প্রকৃতি কি শুদ্ধ পাপময়ী? না তদ্রূপ পাপময়ী প্রকৃতির উজ্জ্বলতা ও গৌরব

দেখিতেই লোক লালায়িত? প্রকৃতির পুণ্যময়ী মূর্ত্তিও কি মানব-প্রকৃতি নহে? কি পাপময়ী প্রকৃতি, কি পুণ্যময়ী প্রকৃতি, উভয়ই মানব-প্রকৃতির চিত্র বটে, কিন্তু কোন্ প্রকৃতির গৌরব দেখিলে মানবের আনন্দ হয়? তোমার গ্রন্থ মধ্যে যদি দ্বিবিধ প্রকৃতিরই সমাবেশ ও চিত্র থাকে, তবে কোন্ ভাগের গৌরব বাড়ান উচিত? গৌরব এরূপে বাড়াইবে, যেন পাপময়ী প্রকৃতি পুণ্যালোকের গৌরবে ডুবিয়া পড়ে। চিত্র-শিল্পের গুণপনা সেই খানে, যেখানে আলোক-অন্ধকার পরিমাণানুযায়ী পড়ে। আলোকের উজ্জ্বলতা দ্বিগুণ বাড়াইবার জন্য অন্ধকার আন। যতটুকু অন্ধকারে আলোকময় চিত্র দ্বিগুণ উজ্জ্বলতা লাভ করে, তত টুকুই অন্ধকারের কালিমাপাত কর। সেই কাব্যেরই গুণপনা, যাহাতে মানব প্রকৃতির গৌরব এরূপ ভাবে দেখান, যেন সেই প্রকৃতির পশু-ভাব অপেক্ষা দেবত্বই অধিকতর সমুজ্জ্বল। সেইরূপ প্রকৃতি-চিত্র দেখিলেই মানবের আনন্দ জন্মে। সেই কাব্যই লোক-হিতকর এবং সর্ব্বজন-আদরণীয়। সেইরূপ প্রকৃতি-চিত্রই সহস্র পৃষ্ঠাপূর্ণ গ্রন্থে সুরক্ষিত করিবার উপযুক্ত চিত্র। সেইরূপ প্রকৃতি-চিত্র কবির ও চিত্রকরের তুলিকাযোগ্য। আর্য্যকাব্য-সাহিত্য এইরূপ মানব-প্রকৃতি-চিত্রে পরিপূর্ণ। তাই, আর্য্যকাব্য-সাহিত্য পাঠের অধ্যয়ন-ফল অতি সুন্দর।

ঐ দেখ, আর্য্যচিত্রকর-পানে একবার চাহিয়া দেখ। বিলাতী চিত্রকর তোমার সমক্ষে হয় একটী কুকুর, না হয় একটী বিড়াল চিত্র করিয়া বলিলেন, দেখ, প্রকৃতি এই বিড়াল-কুকুরে কেমন যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। আর্য্যচিত্রকর শুধু বিড়াল-কুকুর, সাপ-ব্যাঙ, আঁকিয়া ক্ষান্ত নহেন। তিনি সেই বিড়ালের পার্শ্বে ষষ্ঠীদেবীকে, পেঁচকের পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীকে, কুকুরের পার্শ্বে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে, সর্পের পার্শ্বে নারায়ণকে বা মহাদেবকে অতি উজ্জ্বল বর্ণে ও বৃহৎ আকারে আঁকিয়া বলিলেন, এই দেখ, প্রকৃতির এক দিকে বিড়াল ও কুকুর, অন্য দিকে সেই পশুদ্বয় যে দেবত্বের বাহন বা ভক্তিরূপ, সেই দেবত্ব অধিকতর উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। দেখিতে চাও, তবে দেখ, ঐ ক্ষুদ্র মূষিকের পার্শ্বে অতি উজ্জ্বল লোহিত বর্ণে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মহাজ্ঞানী গণপতি কেমন চিত্রিত! মহিষাসুরের বিক্রম মহিষমর্দ্দিনী ভগবতীর পাদস্পৃষ্ট দেবসঞ্চারিত সিংহবলে কেমন বিধ্বস্ত! ঐ দেখ তদুপরি দশভুজা বিরাজিতা। এই সকল চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে, লোকের দৃষ্টি স্থির হয় কোন্ চিত্র দর্শনে? এমন যে সুন্দর ময়ূর, তাহার প্রতি হইতে লোকের দৃষ্টি ফিরিয়া পড়ে সেই দেববীর সুন্দরতর কার্ত্তিকেয়র পানে। মানুষে শুধু পশুত্ব নাই, সেই পশুত্বের সহিত মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব মিশিয়া তবে মানুষ সম্পূর্ণ। যে মানুষে পশুত্ব প্রবল, সে নরাধম,পামর—তাহাকে সকলেই ঘৃণা করে। সে ঘৃণা স্বাভাবিক। সে মানুষের চিত্রও অতি ঘৃণাকর। কিন্তু যে মানুষে দেবত্ব প্রবল অথচ যিনি একেবারে পশুত্ব বিরহিত নহেন, যে মানুষে পশুত্ব দেবত্বের প্রভাবে নিস্তেজ, সেই লোকই যথার্থ মনুষ্যযোগ্য, তাঁহাতে মনুষ্যত্ব দেদীপ্যমান। পশু হইলে কি হইবে? হনুমান বুক চিরিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় সিংহাসনে শ্রীরামচন্দ্র বিরাজিত। কয় জন নরাকার মানুষ সেরূপ দেখাইতে পারেন? অনেকের

গাত্রে রামাবলী ও রামাবলির ছাব, কিন্তু হৃদয়ে কি সেই রামচন্দ্র বিরাজিত? না সে হৃদয়-সিংহাসনে পশুত্বের অসুর বসিয়া রাজত্ব করিতেছে? তাই সে মানুষ মহিষাসুরবৎ নরাকার পশু—অর্দ্ধ মনুষ্য, অর্দ্ধ পশু। কিন্তু যে মানবে দেবত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে দেবতুল্য পবিত্র করিয়াছে, সেই মানবের মূর্ত্তিই জগতের পূজনীয়া ও আরাধ্যা। তাঁহাকে সীতার মত স্বর্ণ মূর্ত্তিতে গড়িয়া চিরকাল সমাজের নয়ন-সমক্ষে স্থাপিত কর,—সকলে এক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিবে, চাহিয়া মোহিত হইয়া যাইবে। আর্য্য-সাহিত্যে মানব-প্রকৃতির এইরূপ আরাধ্যা মূর্ত্তিই চিত্রিত হইয়াছে। তাই, তাহাতে বিলাতী ট্র্যাজিডি ধাতুর কাব্য স্থান-লাভ করিতে পারে নাই।

রামায়ণ, মহাভারত এবং অপরাপর আর্য্য সাহিত্যে কি খুন নাই, না পাপ-চিত্র নাই? খুন আছে, পাপ চিত্রও আছে। কিন্তু সে খুনের ও পাপ-চিত্রের গৌরব নাই। সমগ্র কাব্যের প্রধান রসে সে খুন ও পাপ চিত্র ডুবিয়া গিয়াছে। কাব্যে যে রস প্রধান, তদনুযায়ী অধ্যয়ন-ফল উৎপাদিত হয়। সেই অধ্যয়ন-ফলের উদয়ে কি খুন, কি পাপ চিত্র সকলই অধস্তলে পতিত হয়, জাগিয়া উঠে কেবল পুণ্যময় ভাস্বর চিত্র। কারণ,কাব্যের সেই অঙ্গই অধিকতর ভারী, অধিকতর সমুজ্জ্বল। মুখের গৌরবে যেমন সমগ্র দেহের গৌরব হয়, তদ্রূপ সেই উত্তমাঙ্গের গৌরব আর্য্য সাহিত্যে। রঘুকুলের গৌরব রামায়ণে এবং পাণ্ডব-গৌরব মহাভারতে। সেই সেই অঙ্গ তাহাদের আস্তদেশে। আর্য্যকবিগণ পাপ পুণ্য উভয়ই প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কাব্যে পুণ্যের ভাস্বরতায় পাপের চিত্র দ্বিগুণ কলঙ্কিত এবং ঘৃণিত দেখায়। নরকের ভীষণতা এবং ঘৃণিত মূর্ত্তি দেখান বটে, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর বর্ণে স্পষ্টাক্ষরে স্বর্গের শান্তি এবং পবিত্রতার গৌরব চিত্রিত করেন। পুলিশ-রচনার সঙ্গে শান্তিময় পুণ্যাশ্রম রচনা করেন। আর্য্য সাহিত্যের বিশেষত্ব ও গৌরব এই গুণে। এই গৌরবে সংসারের সামান্য দৃশ্য ঢাকিয়া পড়িয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে সামান্য লোকের চক্ষে এ সংসার যেরূপে প্রতীয়মান, সে চিত্র কাব্য, অলঙ্কার-শাস্ত্রে ধৃত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু বিলাতী বাস্তবিকের সামান্য আদর্শের (Realislic) নাটক-নভেল এবং ইতিহাস সেইরূপ আদর্শ-চিত্রে পরিপূর্ণ। সামান্য আদর্শের চিত্র সকল স্থূল-দৃষ্টি লোক-লোচনের সমক্ষে পাপোজ্জ্বল দেখায়। তজ্জন্য বিলাতী বাস্তবিক সামান্য-আদর্শের নাটক-নভেলে এবং ইতিহাসে কেবল পাপময়ী প্রকৃতি-চিত্রই অধিক। এক এক বৃহৎ লাইব্রেরী সেইরূপ চিত্রময় ইতিহাস, নাটক-নভেলে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক, সংসারক্ষেত্রে যেমন পাপছবি সকলই উজ্জ্বল ও সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান, একটী বিলাতী সাহিত্যের লাইব্রেরীর গ্রন্থালয়ে, ইতিহাস নাটক ও নভেলের সংসারক্ষেত্র তদ্রূপ। কেবলই পাপ,—ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, বিলাসিতা, রিপুপরতন্ত্রতা সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান। পাপের উপরে পাপ, লোভের উপরে লোভ, দ্বেষহিংসার উপরে দেষ হিংসা। কোথায়ও একটু পুণ্যালোকের অস্ফুট বিকাশ সেই প্রগাঢ় পাপের ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন। এরূপ গ্রন্থপাঠের ফল কি? সেরূপ ঘৃণিত পাপচিত্র কি সংসারে লোকে সচরাচর দেখিতে পাইতেছে না? দেখিয়া

কি ফললাভ করিতেছে? অন্যদিকে, সংসারে ত সামান্য সামান্য সাধুচিত্রও আছে। সে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য সাধুচিত্র সেই পাপময় উজ্জ্বল চিত্রাবলির সহিত মিশিয়া কি লোক-লোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে? পুণ্যচিত্র অসাধারণ না হইলে কাহারও চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে না। কাব্য-সংসারে সেইরূপ অসাধারণ পুণ্যচিত্রের সৃষ্টি চাই। সংসার-ক্ষেত্রের সকল চিত্রই যে সুরক্ষনীয় এমত নহে? যে চিত্র অতি পবিত্র ও সাধু, তাহা সুদুর্ল্লভ;এবং সুদুর্ল্লভ বলিয়া সুরক্ষণীয়। পাপ পক্ষে যাহা অসামান্য এবং সুদুর্লভ, তাহা রক্ষণীয় নহে, কিন্তু পুণ্য পক্ষে যাহা অসামান্য, এবং সুদুর্ল্লভ, তাহাই সুরক্ষনীয়। হিন্দু-সংসারে—শুধু হিন্দুসংসারে কেন—সর্ব্বদেশীয় লোকসমাজে যে সকল অতুলনীয় এবং মহার্ঘ পুণ্য-চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়—যে সকল পুণ্যচিত্র সংসারে অতি সুদুর্ল্লভ ও অসামান্য—দেবদেবীর আবির্ভাবে ও অধিষ্ঠানে আজিও হিন্দুসংসার যেরূপ অসামান্য পুণ্যময় লোকচরিত্রে পরিপূত হইতেছে—সেই অসামান্য এবং দুর্ল্লভচিত্র সকল কি সহস্রপৃষ্ঠা পূর্ণ গ্রন্থাবলীতে সুরক্ষিত করা উচিত নহে? এইরূপ অসামান্যচিত্রে আর্য্যসাহিত্যের ইতিহাস, কাব্য, নাটক এবং আখ্যান সকল পরিপূর্ণ। শুধু পরিপূর্ণ নহে, তাহাদেরই গৌরব ও ঔজ্জ্বল্য অধিকতর। তাই আর্য্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা কাব্যমধ্যে মন্থরা, কৈকেয়ী এবং সূর্পনখা চিত্রিত করিতে নিষেধ করি না; কিন্তু তৎপার্শ্বে সীতা, কৌশল্যা এবং মন্দোদরীর পুণ্যময় পবিত্র চিত্র এরূপ দেখাইতে বলি, যেন সেই মন্থরা, কৈকয়ী এবং সূর্পনখার চিত্র ঢাকিয়া পড়ে এবং সেই দেবীচিত্র সকলই মনে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যায়। যদি শকুন্তলাকে আঁক, তবে দুষ্মন্তকে চিত্রিত কর; যদি উমার সৌন্দর্য্য দেখাও, তবে শিবের প্রশান্ত দেবমূর্ত্তির গৌরব দেখাও—যে মূর্ত্তির দেবাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের পার্শে যুধিষ্ঠিরকে বসাও, ততই উজ্জ্বল করিয়া বসাও,যত উজ্জ্বল ভারতে; রাবণ আঁকিবার পূর্ব্বে রামের মনোহর চিত্র অঙ্কিত কর, যেন পাঠক অগ্রে সেই দেবসৌন্দর্য্যে এত মোহিত হইয়া থাকেন যে, রাবণের মূর্ত্তি উঠিবা মাত্র তাহা অতি ঘৃণিত বোধ হয়। অসুরের সমকক্ষ দেবতাকে বসাও, এবং অসুরীর সমকক্ষ দেবীচিত্র আঁক। পুরুষের সমকক্ষ পুরুষ, স্ত্রীর সমকক্ষ স্ত্রী-চিত্র,—তবে ত বৈপরীত্য প্রতিভাত হইবে।

সংসারের সামান্য ব্যাপার চিত্রিত করাতে তত কবিত্ব নাই—যেমন অসামান্য ব্যাপার চিত্রিত করাতে কবিত্ব। কিন্তু সে কোন্ সামান্য? অসামান্য দুষ্কৃতি না সুকৃতি? অসামান্য পাপকে চিত্রিত করা কবিত্ব নহে, অসামান্য পুণ্যচিত্রকে বর্ণগৌরবে প্রদর্শন করাই কবিত্ব। যদি অসামান্য পাপচিত্র আঁক, তবে তাহার প্রতিযোগী অসামান্য পুণ্যচিত্র এরূপ রাগে রঞ্জিত কর, যে পাপচিত্রের বর্ণরাগ নিষ্প্রভ ও অতি ঘৃণিত বোধ হয়। এরূপ অধ্যয়নফল গ্রন্থের রসের প্রগাঢ়তায় উৎপাদিত হওয়া চাই। গ্রন্থের প্রধান রসের প্রবাহ যদি এরূপ স্রোতে না বহে, তবে তাহা সুকাব্য নহে, তাহা সহৃদয় জনগণের আনন্দজনক হইবে না। আমারা এমত কথা বলি না, কেবল অসামান্যকে চিত্রিত করিলেই কবিত্ব হয়,

তবে তাহা কবিত্বের এক অঙ্গ বটে। কাব্যের চিত্র সমুদয় অসামান্য হইবে, অথচ তাহা পুণ্যরসের প্রগাঢ়তায় পর্য্যবসিত হইবে। কাব্যের অধ্যয়ন ফলে তাহার পুণ্যচিত্রের স্মৃতি যেন হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়। সেই স্মৃতিই যেন হৃদয়ে সীতা দেবীর মত ও রামচন্দ্রের মত চিরদিন জাগিতে থাকে। রসের এইরূপ পরিপাক ও পরিণতি আর্য্য-কাব্যে। এইরূপ কবিত্বের আদর্শ আর্য্যসাহিত্যে। তাই,আর্য্য সাহিত্যের অধ্যয়ন ফল এত উৎকৃষ্ট।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শান্তনু

(নারীরূপিনী গঙ্গার প্রতি)

সৈকতে একাকিনী
কে তুমি বিনোদিনি ?
রমণীমণি এহি ভুবনে!
কে গো, গঙ্গার মত বিজনবাহিনী, ললনে ?
যৌবন, কূলভরা ;
ভ্রুভঙ্গ, স্রোতধারা ;
তরঙ্গ অঙ্গ ছাপি উথলে !
কে গো,গঙ্গার মত কল কল্লোলিনী, ভূতলে ?
মানস-প্রভাসিনী,
হৃদয়-প্রসাদিনী,
অঙ্গে আলসরসদায়িনী !
কে গো,গঙ্গার মত ত্রিপথগামিনী, ভামিনি ?
বিশদ হাসিরাশি
অধরে খেলে ভাসি,
ভাতিছে জ্যোতি যেন স্বরগে।
কে গো, গঙ্গার মত পুণ্যসলিলা, সুভগে ?
গভীর হৃদিতল
প্রেমেতে টলমল,
অকূলে নাচে জল, আমরি !
কে গো, গঙ্গারমত গভীর সলিলা, সুন্দরি ?
স্বচ্ছ, নিরমল,
স্নিগ্ধ, সুশীতল,
তরঙ্গ চঞ্চল রূপ সলিলে,
আনি ঢালিব তনু—অতনু তাপিত, চঞ্চলে !

(২)

নয়নে উন্মাদন,
অধরে সম্মোহন,
তাপন শোষণ বক্ষে উদিত,
গুরু নিতম্বে স্তম্ভন শর অতি নিশিত।
এহি বিজন বনে,
কুসুম শরাসনে
মদন আয়ুধ রূপিনী ;
কে গো, বিঁধিছ মম হৃদয়-মৃগ, কামিনি ?

(৩)

যৌবন কুঞ্জে তব
ফুটেছে নব নব
কুসুম সুষমা জড়িত ;
কে গো, বসন্তসম ভুবনগহনে উদিত ?
মথিয়া চারুদল
লভিতে পরিমল,
হৃদয় অলি মম লুব্ধ।
কে গো, সুষমা বিকাশি কর মম মন মুগ্ধ ?

(৪)

তুমি তাপ-বিনাশিনী, গঙ্গে !
তুমি স্মর-শর মম অঙ্গে।
তুমি বসন্ত, ঋতুভঙ্গে, সুখদে !
কে গো, সৈকতভূমে হৃদয়মোহিনী প্রমদে?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কুকিদিগের বিবরণ।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তে—আসাম ও মণিপুর, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার মধ্যে যে অরণ্যানী সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেই বিস্তৃত অরণ্যে কুকিজাতির বাস। এই জাতির স্বভাব অতিশয় ভয়ঙ্কর। ইহারা নগ্ন দেহে বিচরণ করে, সেই জন্য নেংটা কুকি বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। কোন কোন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী ইহাদিগকে ভারতের আদিম অসভ্য অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সভ্যতালোক প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতভূমি এইরূপ অসভ্য বর্ব্বর জাতির আবাসভূমি ছিল, ইহাও বলিতে অনেকে কুণ্ঠিত নহেন!

এই কুকিজাতি অনেক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, রংকুল, (Rangkul) খেলমা, বেচ, ছোটি, আইমোন, বংশং, পুরুম, মন্তক, কোম, কোইরে, চংসেন, (changsen) শিমন, চুৎল, পই, শক্তি, তৌতি, লুসাই, খোংজই ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, পার্ব্বত্যহিংস্র কুকিদিগের সহিত কলহ বিবাদে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহারা নিম্ন ভূমিতে আসিয়া বাস করিতেছে। আসাম, শ্রীহট্ট, এবং ত্রিপুরার জঙ্গলবর্জ্জিত সমতল ভূমিতে এই সকল কুকির সংখ্যা বিরল নহে। ইহারা কাপড় পরিতে জানে এবং কতকটা প্রাদেশিক শাসনের অনুগমন করিয়া থাকে।

কুকিদিগের এক এক শ্রেণীতে বহুসংখ্যক দল বা সমাজ আছে। দলের কর্ত্তাকে "লাম" বলে এবং সমস্ত দলের অধিনায়ককে 'প্রথম' বলে। তিব্বতীয়েরা তাহাদিগের দলের অধিনায়ককে 'লামা' বলে। সম্ভবতঃ এই "লাম" শব্দ 'লামা' শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র।

কুকিরা মগদিগকে তাহাদের এক পিতার সন্তান বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে, তাহাদিগের আদিপুরুষের দুই স্ত্রীর গর্ভে মগ ও কুকি নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। কুকি-জননী, কুকির শৈশবকালেই কালগ্রাসে পতিতা হয়, এবং তাহারা বিমাতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে থাকে। বিমাতা সকল জাতিরই একরূপ। সে মগকে কাপড় পরিতে, ভাল খাইতে, ও থাকিতে দিয়াছিল, কুকিকে নেংটা বলে তাড়াইয়া দিয়াছিল। ইত্যাদি।

বিগত লুসাই যুদ্ধের পর হইতে, কুকিদিগের দুর্দ্ধর্ষতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার এই ভয়ঙ্কর জাতির আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি আলোচনা করিলে, মনে যুগপৎ ভয়ের সঞ্চার হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই প্রাচীন কাহিনীরই আলোচনা করিব।

কুকিগণ, এই বিশ্বসংসারের একজন স্রষ্টা আছেন, ইহা স্বীকার করে। এবং সেই স্রষ্টা প্রতি বৃক্ষে, সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করে, ইহাও তাহাদিগের বিশ্বাস। চন্দ্র, সূর্য্যকেও তাহারা দেবতা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ক্ষুদ্র দেবতা। ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনাতেও যে

জগৎপিতা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা তাহারা বিশ্বাস করে।

ইহারা হিংস্র বন্য পশুর ন্যায় একে অন্যকে হিংসা করিয়া থাকে। যদি কোন কুকি অপর কোন কুকির প্রাণসংহার করে, তবে দলের প্রধান ব্যক্তি, বা মৃত ব্যক্তির নিঃসম্পর্কীয় কেহ উক্ত অপরাধের জন্য হত্যাকারীর দণ্ডবিধান করিতে পারে না। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা বা ওয়ারিশ হত্যাকারীর দণ্ডবিধান করিতে অধিকারী। তাহার ইচ্ছানুযায়ী দণ্ডবিধান উদ্যোগে কাহারও বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।

যদি কোন ব্যক্তি চৌর্য্য অপরাধে বা অন্য কোন দোষজনক অপরাধে অপরাধী হয়, তবে প্রধান বা 'প্রথম' ব্যক্তি তাহার যথোপযুক্ত অর্থদণ্ড করিয়া দণ্ডিত অর্থদ্বারা বাদীকে সন্তুষ্ট করতঃ উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করাইয়া দেন। অবশ্য এরূপ ব্যাপারে প্রধান ব্যক্তিও তাঁহার প্রাপ্যস্বরূপ দণ্ডিত মুদ্রা হইতে অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। বাদী বিবাদীর মীমাংসার পর উভয় পক্ষের সমাজও উভয় হইতে দণ্ড ও পুরস্কার স্বরূপ দুইটী ভোজ পাইয়া থাকে। বরাহ মাংস এবং অন্যান্য অভিলষিত মাংস ও মদিরা দ্বারাই সে নিমন্ত্রণ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শত্রু পক্ষীয় রমণীর প্রতি কুকিদিগের ক্রোধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শত্রু পরিবারের রমণীদিগের শিরচ্ছেদন তাহারা জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করে। অতি প্রাচীনকালে কুকিদিগের মধ্যে এরূপ নারী-হত্যার জঘন্য রীতি প্রচলিত ছিল না। ঘটনা ক্রমে তাহা প্রচলিত হইয়াছে।* নারী হত্যার ও ইতর বিশেষ আছে। রমণী যদি গর্ভবতী হয়, তবে তাহার হত্যাকার্য্য আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। অনেক সময় গর্ভবতী রমণীকে আটক করিয়া রাখা হয় এবং সন্তান প্রসব হইলে, প্রসূত সন্তানের সহিত জননীর একত্রে শিরোশ্ছেদন করা হইয়া থাকে। এইরূপ হত্যা ও গর্ভবতী রমণী হত্যাতে একেবারে দুইটী শত্রু নিপাত হয় বলিয়া কুকিগণ অধিকতর আমোদিত হয়। যদি কোন কুকি শত্রুগৃহ আক্রমণ করিয়া সন্তান সহ একটী রমণীর মস্তক আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে একাধিক শত্রু নষ্ট করিয়াছে বলিয়া সমাজে বিশেষ সম্মান লাভ করিতে পারে।

কোন কুকি-যুবকের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে, সে তাহার ভাবী শ্বশুর শাশুড়ীকে নিজ বাড়ীতে আনয়ন করে এবং ৪।৫টী গয়াল † উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করে। পাত্রীর পিতা মাতা ঐ গয়াল গুলি বধ করে এবং পাত্রের পিতা মাতা ও আত্মীয় কুটম্বকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ গয়াল-মাংস দ্বারা ও অন্যান্য চব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়

* প্রবাদ আছে, কোন রমণী ক্ষেত্রে আসিতে বিলম্ব হওয়ায় অপরা তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করে। রমণী উত্তরে বলে, তাঁহার স্বামীর যুদ্ধগমনের উদ্যোগ করিয়া দিতে ও তাহার আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হইয়াছে। এ উভয় রমণীর কথোপকথন ঘটনা ক্রমে শত্রুপক্ষের কর্ণগোচর হয়। ইহা হইতেই তাহারা শত্রু-রমণী হত্যাকে শত্রু-দমনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করে।

† গয়াল এক জাতীয় বন্য গরু। আকৃতি অনেকটা মহিষের ন্যায়। সাধারণ গরু হইতে বৃহৎ। দুগ্ধ গাঢ় এবং সুমিষ্ট। আজকাল চট্টগ্রামে পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সামগ্রী, প্রধানতঃ মদিরা দ্বারা আমোদ আহ্লাদ সহকারে বৈবাহিক ভোজন সমাপন করে। এখানে পাত্রের অবস্থানুসারেই পান ভোজনের তারতম্য হইয়া থাকে।

নিজ গর্ভধারিণী ব্যতীত যে কোন রমণী কুকিরা বিবাহ করিতে পারে। যদি কোন বিবাহিত দম্পতি সৌহৃদ্য ভাবে একত্র বাস করিতে থাকে ও তাহাদের একটী পুত্র সন্তান প্রসূত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী অপরিত্যজ্যা হইল। কিন্তু যদি তাহাদিগের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দও না জন্মে, তবে সেই স্থলে স্বামী সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারে।

কুকিগণ স্বর্গ ও নরক বিশ্বাস করে না। তাহাদের বিশ্বাস, মৃত্যু হইবা মাত্র কোন আত্মা (Spirit) আসিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। এবং সমাগত আত্মার ইচ্ছানুযায়ীই মৃত ব্যক্তির আত্মা ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্মান্তরে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার হইতে পারে, ইহা তাহারা স্বীকার করে না।

কুকিরা হস্তী, শূকর, হরিণ প্রভৃতি যাবতীয় জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে। বন মধ্যে কোন জন্তুর মৃতদেহ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত হইলে তাহা সযত্নে আহরণ করিয়া আনিয়া গৃহে শুষ্ক করে এবং প্রায়োজনানুসারে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

যখন কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার আবশ্যক হয়, তখন যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই তাহারা শত্রুর গতিবিধি, অবস্থান ও শক্তিসামর্থ্য পর্য্যবেক্ষণ এবং পথঘাটের পরিচয় জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করে। তৎপর সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া রজনী যোগে শত্রুর অনুসরণ করে। যদি শত্রুপক্ষ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হয়, তবে তাহারা অমনি শত্রুগৃহে প্রবেশ করিয়া পরিত্যক্ত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, সকলকে হত্যা করে এবং ঘর, দরজা, জিনিস পত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। আক্রমণের পূর্ব্বে যদি প্রতিযোগী পক্ষকে বলবান ও পরাক্রান্ত বলিয়া মনে করে, তবে শান্তভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করে, কিন্তু সুযোগ অন্বেষণে বিরত থাকে না।

যদি কোন দিন কোন নক্ষত্রকে তাহারা চন্দ্রমণ্ডলের অতি সন্নিকটে অবলোকন করে, তবে তাহারা সেদিন কোন না কোন শত্রু কর্ত্তৃক অবশ্যই আক্রান্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং সেই রজনী সকলে অতি সাবধানে সশস্ত্র প্রহরায় অতিবাহিত করে।

কুকিগণ ভয়ঙ্কর শত্রুনির্য্যাতন-প্রয়াসী। শত্রুনির্য্যাতন মানসে তাহারা শত্রুর গন্তব্য পথের পার্শ্বে অতি গোপনভাবে লুক্কায়িত থাকে। এবং অবসর পাইলেই শত্রু-শোণিতে ধরাতল অভিষিক্ত করে। ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত থাকাকালে যদি বিষধর সর্পও তাহাদিগকে দংশন করিয়া যায়, শত্রু মস্তকের লালসায় তাহাও তাহারা নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করে।

যদি কোন বিগ্রহে বা বিবাদে উভয়পক্ষ তুল্য বলশালী বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে উভয়পক্ষ হইতেই শান্তি সংস্থাপন-সূচক চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এবং একপক্ষ অপর পক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধির সর্ত্তাদি নির্দ্ধারণ করে। সর্ত্তাদি উভয় পক্ষের মনোনীত হইলে গয়াল বংশধরদিগের ধ্বংশ-সাধন দ্বারা চন্দ্রসূর্য্যের পূজা দিয়া তাহাদিগকে সাক্ষী স্বরূপ রাখিয়া

সন্ধিকার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু উক্ত বিগ্রহে যদি কোন পক্ষ পরাজিত হয়, তাহা হইলে, জেতৃপক্ষ বিজিত পক্ষকে নিজ শাসনাধীনে আনয়ন করে। বিজিত পক্ষও বিনা আপত্তিতে জেতার করতলগত হইয়া থাকে এবং অধীনতার চিহ্ন স্বরূপ বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গয়াল ও অস্ত্র শস্ত্র কররূপে প্রদান করিয়া থাকে।

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তাহারা গৃহ হইতে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। এই সকল খাদ্য আলু ভাজা, চাউলের গুড়ি এবং বাসি ভাত। বাঁশের চুঙ্গা ভরিয়া এই সকল আহারীয় সামগ্রী এবং চামড়ার বড় বড় কোষ ভরিয়া মদিরা সংগ্রহ করিয়া লয়। অভিযান কালে তাহারা এত দ্রুত গমন করে যে, একদিনে তাহারা ডাক বাহকের ৩।৪ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া যায়। তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাত্রিকালে উপস্থিত হয়। এবং রাত্রিতেই শত্রু শিবির অবরোধ করিয়া থাকে। প্রভাতে আক্রমণ করে এবং হত্যাকার্য্য সম্পাদন করিয়া শত্রুশিরে চর্ম্মকোষ পরিপূর্ণ করে। যদি শত্রুশোণিতে কাহারও হাত রঞ্জিত হয়, তাহা হইলে, যাহাতে গৃহে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সেই রক্ত-চিহ্ন বিদূরিত বা ধৌত না হইয়া যায়, তাহার জন্য বিধিমতে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

এইরূপ হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যখন তাহারা আহার করিতে উপবেশন করে, তাহারা আহারীয় সামগ্রীর কতক অংশ লইয়া সেই কর্ত্তিত মস্তক মুখে প্রদান করে এবং তৎপর আপনারা ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ভ্রমণ কালে কুকিগণ দুইবার করিয়া আহার করিয়া থাকে। এবং প্রতি দুই ঘণ্টায় নিজ নিজ কার্য্য বিবরণ দূতদ্বারা গৃহে প্রেরণ করিয়া থাকে। যদি কেহ কোন শত্রুর শির কর্ত্তন করিয়াছে বলিয়া গৃহে সংবাদ পৌঁছে, তাহা হইলে তাহার গৃহে প্রচুর আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিবারের সকল লোক যথা সম্ভব অলঙ্কার পত্রে ভূষিত হইয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া সেই বিজেতা বীরপুঙ্গবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করে। যখন উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হয়, তখন উভয়েই আমোদে উন্মত্ত হইয়া যায় এবং স্ত্রী, পুরুষ সকলে একত্র নৃত্য, গীত, ও পান আহার করিয়া থাকে। যদি সে পুরুষ বিবাহিত হয়, তবে তাহার স্ত্রী অলঙ্কার পত্রে সুসজ্জিত হইয়া অপরাপর সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া স্বামী সম্ভাষণে আগমন করে এবং স্বামীর মুখে মদিরা ঢালিয়া দিয়া ও স্বামীর হস্ত প্রদত্ত মদিরা নিজ মুখে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করে এবং অবশেষে মদিরা দ্বারা স্বামীর শত্রুশোণিতসিক্ত হস্ত বিধৌত করিয়া দেয়। এইরূপে তাহারা সকলে অত্যধিক আমোদে প্রমোদে গৃহে প্রত্যাগমন করে। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কর্ত্তিত মস্তক সমূহ দলপতির আঙ্গিনায় স্তূপাকারে রক্ষা করে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে সকলে মিলিয়া নাচিতে ও গাইতে থাকে, অতঃপর কতকগুলি গয়াল ও শূকর বধ করিয়া তাহাদিগের মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে ও মদিরা পান করে।

অবস্থাপন্ন কুকিরা শত্রুশির বংশদণ্ডে বন্ধন করিয়া তাহাদের পিতা মাতার কবরের উপর রক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের প্রচুর সম্মান লাভ হয়। যে সকল দলপতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিবে, তাহারা

গৃহে আনীত বন্দীদিগের শিরোশ্ছেদ করিতে পারিবে।

কুকিদিগের অস্ত্রশস্ত্র তাহাদিগের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সকলে উহা প্রস্তুত করিতে পারে না। কুকিদিগের গৃহস্থালী সম্বন্ধে রমণীগণ সম্পূর্ণ রকমে দায়ী, পুরুষগণ জঙ্গল আবাদ, গৃহনির্ম্মাণ, ক্ষেত্রকর্ষণ, যুদ্ধ, শিকার, ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

কুকিরা কোন মাস বা বৎসরের হিসাব রাখে না। তাহাদের কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহার পঞ্চম দিবসে এবং কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তৃতীয় দিবসে আত্মীয়স্বগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া উপরোক্ত মত আমোদ প্রমোদের সহিত পান আহার করিয়া থাকে। উৎসব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আঙ্গিনার মধ্যে একখণ্ড বংশযষ্টি পোতে, তাহার সম্মুখে আনিয়া একটী গয়াল বা শূকর বধ করিয়া দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে এবং তৎপরে তাহার মাংস দগ্ধ করে ও আমোদ প্রমোদে পান আহার আরম্ভ করে।

কুকিদিগের মধ্যে যাহারা খঞ্জ বা অন্ধ হয় তাহারা গৃহবাসের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। এই প্রকারের কোন ভিক্ষুক কোন অবস্থাপন্ন উদারচেতা কুকির গৃহে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী তাহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে গ্রহণ করে এবং সেই অতিথির আগমন উপলক্ষে ভক্তিভাবে দেবতার পূজা করে, তৎপর অতিথি-সৎকার করিয়া সামাজিক ব্যক্তিদিগকে লইয়া পান আহার করে। এই কার্য্যের জন্য সমাজ তাহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে।

কোন কুকির মৃত্যু হইলে সকলে আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া উপবেশন করে। মৃতদেহ একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়। সেই সময় একটী গয়াল ও একটী শূকর বধ করিয়া তাহার মাংস ও মদিরা শবের মুখে প্রদান করে। তৎপর অবশিষ্ট মদিরা ও মাংস মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রসাদ বলিয়া সকলে পান ও ভোজন করে। মৃত্যুর পর এইরূপ অনেক দিন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। তাহার পর মৃতদেহকে কোন উচ্চ মঞ্চে স্থাপন করিয়া নীচে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহা অগ্নি উত্তাপে দগ্ধ বা শুষ্ক করে। ভাল রকমে ছাজা ভাজা হইলে মোটা বস্ত্রে তাহা আবৃত করিয়া একটী ক্ষুদ্র পাত্রে পূরিয়া সিন্ধুকে রক্ষা করে এবং ঐ সিন্ধুক মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখে। কবর দিবার পর পূর্ণ এক বৎসর তাহারা ঐ গোর প্রতিনিয়ত ফলপুষ্পে সুশোভিত করিয়া রাখে। কেহ কেহ অন্যান্য নিয়মেও কবর দিয়া থাকে। মৃতদেহ প্রথমতঃ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে, তৎপর কাঠের বাক্সে ভরিয়া উচ্চ বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখে, মাংস খসিয়া পড়িলে হাড়গুলি ধৌত করিয়া পৃথক পাত্রে শুকাইয়া রাখে;—আকস্মিক বিপৎপাতে তাহা উন্মোচন করিয়া অস্থি সমূহের নিকট বিপদুদ্ধার জন্য পরামর্শ গ্রহণ করে। অস্থি সমূহ অবলোকন করিয়া তাহাদের মনে যে যুক্তি উদয় হয়, তাহাই তাহারা মৃত ব্যক্তির আত্মার আদেশ বলিয়া স্বীকার করতঃ আনত মস্তকে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পত্নী এক বৎসর কাল গোরস্থানে বাস করে। তৎকালে প্রত্যহ তাহার খাদ্যাদি তপায়

প্রেরিত হয়। যদি সম্বৎসরের ভিতর তাহার মৃত্যু হয়, তবে সেই রমণী পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচিত হয়। জীবিত থাকিলে সম্বৎসরান্তে সকলে আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যায় ও গৃহে যাইয়া আত্মীয়স্বগণ লইয়া ধূমধামের সহিত মৃতের সাম্বৎসরিক ক্রিয়া সমাপন করে।

মৃত ব্যক্তি তিনটী পুত্র রাখিয়া গেলে ১ম এবং ৩য় পুত্রই পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হয়। মধ্যম পুত্র পিতৃ সম্পত্তি দাবি করিতে পারে না। যদি নিঃসন্তান মৃত্যু হয়, তবে সম্পত্তি ভ্রাতার উপর বর্ত্তে। ভ্রাতার অভাবে দলপতিই মৃতব্যক্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

ভাষা ও সাহিত্য।

৩। ভাষার শব্দ।

মানসিক ক্রমাভিব্যক্তির সময় মন যেমন বাহ্যজগতের দৃশ্যমান বস্তু সমূহ দর্শনে অন্তর্জগতে তাহার তুলনা করিয়া নানাবিধ মানসিক চিত্র অঙ্কিত করে, তেমনি ভাষাও সর্ব্ব প্রথমে এই পরিদৃশ্যমান জগতের দ্রব্য নিচয়ের নাম করণ করিতে থাকে। তাহার পর উপমা সংযোগে কল্পনার রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বাহ্যজগৎ হইতে কল্পনার রাজ্যে গমন করিবার কাল অতিশয় দীর্ঘ।

যখন একটী শিশু তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, তাহার শব্দভাণ্ডার কত দরিদ্র। সামান্য কয়েকটী উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারাই শিশু তাহার জীবনের অধিকাংশ কথা বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু যখনই তাহাতে আর কুলায় না,সে তখনই অঙ্গভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করে। কেবল মাত্র কথোপকথন করিয়া ও শুনিয়া কোন একটী বিজাতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, শিক্ষিত মনুষ্যেরও সেই একই বিপদে পড়িতে হয়—তাহার অবস্থাও শিশুর তুল্য হয়। মনের ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় না—মনে হয়, কি যেন একটা থাকিলে ভাল হইত, তাহা না থাকিবার জন্য যেমন করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলাম, যেন তাহার কিছুই বলিয়া উঠিতে পারিলাম না।

কেবল মাত্র অঙ্গভঙ্গী বা মুখভঙ্গী বা কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও পরিবর্ত্তনেই সকল সময়ে কাজ চলে না। মনে কর, একটী শিশু মার্জ্জার কর্ত্তৃক আহত হইয়াছে; অঙ্গভঙ্গী, মুখভঙ্গী এবং ক্রন্দন দ্বারা শিশু তাহার বেদনা বুঝাইয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহা কর্ত্তৃক তাহার উক্তরূপ ব্যথা লাগিয়াছে, সে যদি তাহার নাম না জানে, তাহা হইলে তাহার সেই ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সঞ্চালনে মার্জ্জারকে নির্দ্দেশ করিয়া শিশু বলিয়া উঠে "মিউ মিউ"—অর্থাৎ ঐ যে জন্তুটী "মিউ মিউ" করিতেছে বা করে, উহাই তাহাকে বেদনা দিয়াছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, অঙ্গভঙ্গী দ্বারাই শিশু তাহার বেদনা বুঝাইয়া দিল এবং আর একটী onomatopœic শব্দ ব্যবহার করিয়া সে সেই বেদনার আদি কারণ অর্থাৎ সেই মার্জ্জারকেও নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইল।

সুতরাং এতদুভয়ের সংযোগে একটী সম্পূর্ণ মনোভাব সূচিত হইল।

কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এই onomatopœic শব্দের উৎপত্তি হইল কেমন করিয়া? এ সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি তর্ক আছে। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্য বড়ই অনুকরণ প্রিয়। কথিত ভাষা সৃষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষ আপন আপন সুখ দুঃখ, সন্তোষ বিরাগ, ক্রোধ বিরক্তি, স্নেহ মমতা, ঘৃণা প্রভৃতি উপযুক্তরূপ ধ্বনি এবং কখনও কখনও তাহার সহিত আবশ্যকমত বদনমণ্ডলের মাংসপেশীগুলির সঞ্চালন দ্বারাই প্রকাশ করিত। একজনের দেখিয়া আর একজনও প্রায় তদ্রূপ করিতে পারিত। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে মাংসপেশীগুলির আকুঞ্চন বিস্ফারণ প্রভৃতি বন্ধ হইয়া কেবল মাত্র সেই ধ্বনিটীই বর্ত্তমান রহিল। সেই ধ্বনি বিশেষই onomatopœic শব্দ। অনেক সময়ে এইরূপ একটী শব্দ ভিন্ন আমরা ইপ্সিত ভাব প্রকাশ করিতেই পারি না। আমরা বলি "ছল ছল কল কল"—কিন্তু বাস্তবিক "ছলছল" বা "কল কল" এর কোন অর্থ নাই, উহা প্রবাহিত জলস্রোতের শব্দানুকৃতি মাত্র।

লেজেরস্ গিগার সাহেব বলেন যে, এইরূপ অনুকৃত ধ্বনিই onmatopœic শব্দ সর্ব্বপ্রথমে সকল কার্য্যের চিহ্ন বা আকার স্বরূপ ছিল। অনুকৃত শব্দে প্রকৃত শব্দ বা ধ্বনির অনুরূপ অবিকৃত অনুকৃতি আবশ্যক হয় না। নকল শুনিয়া আসলের কথা মনে পড়িলেই হইল। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিয়া থাকে। বন্দুকের শব্দ বুঝাইতে হইলে আমরা বলি, "গুড়ুম্" করিয়া শব্দ হইল; ইংরাজগণ "গুড়ুমের" পরিবর্ত্তে বলেন "ব্যাং" (Bang); কিন্তু জর্ম্মানগণ আবার বলেন "পাফ্" (Puff or paff)

অনুকৃত শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি ভিন্নও আমরা হর্ষবিস্ময়াদিসূচক ধ্বনি দ্বারা মনোভাব কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে পারি। সেই সকল ধ্বনি আমাদিগের মানসিক উত্তেজনাই ব্যক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার মনোভাব প্রকাশ করাই ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং কথিত ভাষার সৃষ্টিকার্য্যে হর্ষবিস্ময়াদিসূচক ধ্বনির ক্রিয়া বড় বেশী নহে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, অঙ্গভঙ্গী, অনুকৃত শব্দ এবং হর্ষবিস্ময়াদি সূচক ধ্বনি এই তিনের সহযোগে এবং সংমিশ্রণেই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। শেষোক্ত দুইটী দ্বারা বাহ্যতঃ যাহা সূচিত হওয়া উচিত, তাহা না হইয়া অন্যভাব সূচিত হইয়া থাকে। "মিউ" বলিলে আমরা "মিউ" শব্দটী বুঝি না, যে "মিউ মিউ" শব্দ করে (অর্থাৎ মার্জ্জার), তাহাকে বুঝি। তেমনি "উঃ" বলিলে আমরা সেই শব্দটাকে বুঝি না—কোন একটা যন্ত্রণার কথাই আমাদিগের মনে হয়; সুতরাং উহাদিগের দ্বারা কর্ত্তা এবং কার্য্যের ফলটী বুঝি আর অঙ্গভঙ্গী ব্যাকরণ সম্মত ক্রিয়াপদের কার্য্য করিয়া থাকে। বেদনা-সূচক একটী চীৎকার করিয়া যদি কেহ তাহার হস্তস্থিত একখানি শাণিত ছুরি ভূমিতে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সে বলিতেছে—'ইহাই আমার হাতে ব্যথা দিয়াছে; এতগুলি কথা আর তাহার বলিবার আবশ্যক

হয় না। ভাষা আবার পদ হইতে উৎপত্তি লাভ করে—শব্দ হইতে নহে। ইহার কয়েকটী প্রমাণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে :—

(১) কোন একটী পদ পাঠ করিবার সময় আমরা কোন কোন শব্দের উপর একটু অধিক জোর দিয়া থাকি, আর কোন কোন শব্দ বা অতিশয় ধীরে পাঠ করি। কিন্তু একই পদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থানুসারে সেই শব্দ বিশেষের স্থান অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং পদের অর্থ সহজ ও সরল হইয়া বক্তার মনের ভাব ব্যক্ত না করিলে শব্দ বিশেষের কোন মূল্য নাই। পদের অর্থেই ভাষা—শব্দের অর্থে ভাষা নহে।

(২) পদ খুব দীর্ঘও হইতে পারে এবং খুব ক্ষুদ্রও হইতে পারে। একটী শব্দেও পদ হয়, যথা—"যাও" "এস", "যাব না" ইত্যাদি। আবার কতকগুলি শব্দের একত্র সমাবেশেও পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যথা—"আমি যাইতে পারিব না"। কিন্তু যেমনই হউক, এক কথাতেই হউক, আর দশ কথাতেই হউক—মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত না হইলে তাহা পদ নহে।

(৩) সন্ধির নিয়মানুসারে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ একত্রিত করিয়া তাহাকে একটী বিশেষ শব্দে পরিণত করা হয়। তখন তাহাই একটী পদ। যথা,—

"অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

বর্ত্তমান শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, "তৃণৈঃ" "গুণত্বম্", "আপন্নৈঃ" এবং বধ্যন্তে" এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন শব্দ একত্র গ্রথিত হইয়া "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে" হইয়াছে।

পদ হইতেই যখন ভাষার উৎপত্তি, তখন এক কালে প্রত্যেক শব্দই যে এক একটী স্বতন্ত্র পদ ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নহে। * কারণ যখন সেই সকল শব্দ সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের প্রত্যেকেই এক একটী ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল। পাঠক অথবা অভিধানপ্রণেতা কোন একটী শব্দ বিশেষের অর্থ নির্ণয় না করা পর্য্যন্ত সেই শব্দটী অর্থহীন প্রলাপ মাত্র—তাহার কোনই মূল্য নাই। সুতরাং কেবল অর্থযুক্ত শব্দমাত্রই এক একটী পদ।

ভাষা এবং শব্দ সম্বন্ধে এ ত গেল অতি সাধারণ কয়েকটী কথা। কিন্তু ভাষা দুই প্রকার—লিখিত এবং কথিত। † "লিখিত ভাষা ব্যাকরণ-শুদ্ধ এবং অবিকৃত, আর কথিত ভাষাতে ব্যাকরণ-ভুল থাকে এবং শব্দ সকল কুঞ্চিত ও বিকৃত হইয়া উচ্চারিত হয়। যে ভাষা যত আধুনিক, তাহার লিখিত ও কথিত ভাষায় পার্থক্য তত অল্প, আর যে ভাষা যত প্রাচীন, তাহার লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য তত অধিক। কথিত এবং লিখিত ভাষায় বিভিন্নতার কারণ এই যে, লোকে যখন অশাসিত ভাবে যার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ লিখিতে এবং বলিতে আরম্ভ করে, তখন ব্যাকরণ সৃষ্ট হইয়া সেই স্বেচ্ছাচারিতাকে শাসন করে।"

"শব্দের উচ্চারণ কথিত ভাষায় কুঞ্চিত হয়, কারণ সর্ব্বদা যে সকল শব্দ ব্যবহৃত

---

* "If the sentence is the unit of significant speech, it is evident that all individual words must once have been sentences ; that is to say, when first used they must each have implied or represented a sentence."
Introduction to the Science or Language.

† ভাষাতত্ত্ব।

হয়, তাহা স্বভাবতঃ লোকে সংক্ষেপ করিয়া বলে।”

*   *   *   *

“আর্য্যদের ভাষার একটী বিশেষ নাম ছিল না। ইহাকে ভাষাই বলিত এবং ভাষা শব্দেই আর্য্য-ভাষা বুঝাইত।

"ব্রাহ্মীতু ভারতী ভাষা
গীর্ব্বাগ্‌বাণী সরস্বতী।"

অমরকোষ।

পরে যখন ব্যাকরণ সৃষ্ট হইয়া ভাষার সংস্কার হয়, তখন ইহার নাম সংস্কৃত ভাষা হইল, এবং সাধারণ লোকে ব্যাকরণ দ্বারা অনুশাসিত না হইয়া যেরূপ ভাষাতে কথা বলিত, তাহার নাম ভাষা অথবা প্রাকৃত ভাষা হইল।”

ভাষা ও সাহিত্য।

৪। ভাষার পরিবর্ত্তন।

"ধর্ম্ম-বিপ্লবে প্রাচীন ভাব ও ভাষার সংস্কার এবং নবভাব ও ভাষার প্রতিষ্ঠা হয়। রোমান যাজকদিগের প্রভুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিনের একাধিপত্য নষ্ট হয়। বুদ্ধদেব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, স্বীয় শিষ্যগণকে তাঁহার বাক্য ও কার্য্যাবলি পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করেন। ভারতের ভাষার ইতিহাসে সেই দিন এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। যদিচ বৌদ্ধগণও মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তথাপি সেই অনুজ্ঞা প্রচারের সময় হইতে সংস্কৃতের অখণ্ড প্রভাব তিরোহিত হয়। দেবভাষা, দেব ও ঋষিগণের জন্য সেই দিন স্বর্গারোহণ করেন।"*

সকল দেশেই রাষ্ট্রবিপ্লব এবং ধর্ম্ম-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও একটী বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিজেতা নূতন, তাহাদিগের আচার ব্যবহার নূতন অথবা কতকাংশে স্বতন্ত্র, তাহাদিগের ভাষাও নূতন। যাহারা বিজিত, তাহারা বাধ্য হইয়া নূতন প্রভুদিগের ভাষা শিক্ষা করে; কারণ সকল প্রকার কাজকর্ম্ম তখন সেই ভাষাতেই হইয়া থাকে—তাহাই তখনকার রাজভাষা, সুতরাং আপন ভাষার শব্দভাণ্ডারে সকলের অজ্ঞাতে কতকগুলি নূতন নূতন শব্দ স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সেই ভাষার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে।

বিজেতৃগণও বিজিত জাতির ভাষা কতকাংশে শিক্ষা করে। কিন্তু প্রভু হইয়া দাসের ভাষা শিক্ষা করিবার তেমন আগ্রহ তাহাদিগের হয় না। তাই তাহারা যাহা শিখে, তাহা অসম্পূর্ণ ও স্থানে স্থানে ভ্রমাত্মক। কিন্তু তখনকার নূতন সমাজে তাহাদিগেরই একাধিপত্য—তাহারাই তখন সকল বিষয়ের কর্ত্তা, সুতরাং তাহাদিগের যাহা অভিরুচি, তাহারা যেমন পছন্দ করে, তাৎকালিক লেখকগণও তদ্রূপই লিখিয়া থাকেন। স্বাধীন চিন্তার অভিব্যক্তি তখন হ্রাস হইয়া যায়। তাই ভাষার আকার ও তৎসঙ্গে সাহিত্যের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জাতি বিশেষের ভাষা সেই জাতির অবিকৃত চিত্র। অনেক সময় এমনও হয় যে, বিজেতৃগণের সভ্যতা ও সামাজিক রীতিনীতি অবলম্বনে বিজিত জাতির প্রভূত সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই পরিবর্ত্তনের ফলেও ভাষার পরিবর্ত্তন হয়। সকল দেশের ইতিহাস হইতেই ইহা দেখান যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতের তেজস্বী, ধর্ম্মনিরত আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ যখন আপনাদিগের জন্মভূমি পঞ্চনদ পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকলত্রাদি সহ শান্তসলিলা পুণ্যবতী ভাগীরথী ও যমুনার শস্য-শ্যামল তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন বিদেহ ও কোশল এবং কুরু ও পাঞ্চাল রাজ্যের

* দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"।

রাজভাষা, ঋগ্বেদের কঠোর সংস্কৃত উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণের ললিত কোমল শ্রুতিসুখকর সংস্কৃতে পরিণত হইয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হয়।

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব ও মগধরাজ্যের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারতের পালীভাষা কথা কহিবার ভাষারূপে প্রচলিত হইয়াছিল—গৌতম সেই কথিত ভাষাতেই ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষা পালীতে পরিবর্ত্তিত হইল এবং বেদের সংস্কৃত আরও কোমলতা প্রাপ্ত হইল। ইংরাজ পণ্ডিতগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সংস্কৃত বিবর্ত্তিত ভাষার মধ্যে পালীই সর্ব্বপ্রথম ভাষা। তারপর ক্রমে ক্রমে পালীভাষাও আবার প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছিল।

পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে প্রাকৃতের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই মনে হয়, সংস্কৃতের অনেক দিন পরেই প্রাকৃত লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তখনকার সেই পুরাতন ভারতে প্রাকৃত ভাষায় কোন প্রকার গ্রন্থই যে রচিত হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। প্রাকৃত ব্যাকরণের অস্তিত্ব অনেক দিন পর দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, বররুচিকৃত "প্রাকৃত প্রকাশই' প্রথম প্রাকৃত ব্যাকরণ। বররুচি ভিন্ন শাকল্য, ভরত, কোহল, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের রত্নসভা আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসরের কথা। বররুচি সেই সভার নবরত্নের মধ্যে একটী ছিলেন। তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণে তিনি মহারাষ্ট্রী, মাগধী, পৈশাচী ও শৌরসেনী, এই চারি প্রকার প্রাকৃতের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কালিদাসের শকুন্তলা ও তাঁহার সুকুমারী সুন্দরী প্রিয়সখী অনুসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা—এমন কি, শকুন্তলা-প্রেমবিহ্বল রাজা দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত প্রাকৃতে কথাবার্ত্তা কহিয়া গিয়াছেন—প্রেমালাপ করিয়াছেন।

উল্লিখিত চারি প্রকারের প্রাকৃতই আধুনিক ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কথিত ভাষার আকারে পরিবর্ত্তিত। বোধ হয়, মাগধী প্রাকৃতই খ্রীষ্টজন্মের পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষায় পরিণত হইয়াছে। "কেহ কেহ বলেন, বঙ্গভাষা প্রাকৃত হইতে আসে নাই; কিন্তু একবারে এক সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। আমরা বাঙ্গালাকে গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত মনে করিলেও উক্ত মত কখনই সমর্থন করিতে পারি না। দেখা যাইবে, ডাক ও খনার বচনের ভাষা ও পরাগলী মহাভারতের ভাষাই স্থলে স্থলে এত কঠোর যে, তাহার অর্থ পরিগ্রহ করা সহজ নহে। এই সকল রচনা হইতে ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা অবশ্য সংস্কৃত ছিল না, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। তাহা বর্ত্তমান ভাষা হইতে এত দূরবর্ত্তী ছিল যে, তাহাকে বঙ্গভাষা আখ্যা প্রদান করাও সঙ্গত নহে; সুতরাং প্রাকৃত ছাড়া কি বলা যাইতে পারে?" *

প্রাকৃত ও বাঙ্গ শব্দগত অনেক মিল আছে। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি;—

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

প্রাকৃত	বাঙ্গালা	সংস্কৃত
পত্থর	পাথর	প্রস্তর
লোণ	লুন বা নুন	লবণম্
বাড়ী	বাড়ী	বাটী
ঘর	ঘর	গৃহম্
দুআর	দুয়ার	দ্বারম্
লট্‌ঠী	লাঠী	যষ্টিঃ
ঘিঅ	ঘি	ঘৃতম্
থম্ভ	থাম্বা	স্তম্ভঃ

ইত্যাদি।

বাঙ্গলাও প্রাকৃতের সান্নিধ্য দেখাইতে হইলে "আহ্মি" (অর্থাৎ অহং, আমি) এবং "তুহ্মি" (অর্থাৎ ত্বং, তুমি") এই দুইটী শব্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে ১২০ শত বৎসরের পুরাতন যে সকল পুরাতন গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্তই হস্তলিখিত। কিন্তু তাহাতে "আমি" ও "তুমি" স্থলে সর্ব্বত্রই "আহ্মি" এবং "তুহ্মি" দেখিতে পাওয়া যায়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সুবৃহৎ পুস্তকাগারে সঞ্জয়রচিত মহাভারত, পরাগলী মহাভারতাদি গ্রন্থেও এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ক্রিয়ার নৈকট্যে যদি ভাষার নৈকট্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলা এবং প্রাকৃতের ক্রিয়ার নৈকট্য দেখান বড় কঠিন নহে। বাঙ্গালার পড়ে, কেনে, করে ইত্যাদি, যে প্রাকৃতের পড়ই, কিনই, করই ইত্যাদি, তাহা বেশ বুঝিতে পায়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু দেখাইয়াছেন—"করসি, খারসি, করোন্তি, জানোন্তি ইত্যাদি প্রাকৃতের অনুযায়ী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে বিস্তর পরিমাণে প্রচলিত ছিল।" যথা—

(১) "ভিক্ষুকের কন্যা তুমি কহসি আমারে।
দেবযানী পলাইল কূপের ভিতরে॥"
সঞ্জয়—আদিপর্ব্ব।

(২) "সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥"
কবীন্দ্র—ভীষ্মপর্ব্ব।

(৩) "প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥"
ইত্যাদি।

এখন দেখা যাইবে, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা-ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের সম্বন্ধ অতি কৌতুহলাত্মক। "প্রাকৃত, বৌদ্ধজগতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল; বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের অবাধ্য সন্তান, বৌদ্ধাধিকারে প্রচলিত প্রাকৃত ও সংস্কৃতের অবাধ্য সন্তান; সংস্কৃতের বিরাট শব্দের ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত উপেক্ষা করিয়াছে, কি গৌড়ীয় ভাষাগুলি তাহা গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃতের পুনরুদ্ধার হেতু তদীয় বৈভবে গৌড়ীয় ভাষাগুলি গৌরবান্বিত হইল; প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াও ঐ সব ভাষা প্রাকৃতের ঋণচিহ্ন স্খালন করিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কেহ ভিন্ন দেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বর্ণ, কথা, ভাবভঙ্গী তাহাকে চিনাইয়া দেয়। পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অতি স্থূল চক্ষেই হইয়া থাকে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ গৌড়ীয় ভাষাগুলি অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দে ধনী করিলেন। লাম, চন্দ, লাখা লেখা দূরে থাকুক, এখন আর কেহ মুখেও বলে না। তবে যে সকল শব্দ বৎসরে একবার মাত্র ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে উপচার্য্যের অনুরোধ ও প্রয়াস বৃথা। ক্রিয়াগুলি, বিভক্তি চিহ্নগুলি সংস্কৃত হইতে অনেক ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর সংশোধন হইল না। প্রতি ছত্রের গঠনে প্রাকৃতের ভাব মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। শুধু নাম শব্দ পরিবর্ত্তনে এ ঋণ হইতে

অব্যাহতি অসম্ভব। গৌড়ীয় ভাষাগুলির রুচিগ্রাবহার শব্দের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কৃতের সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক, কিন্তু প্রতি ছত্রের গঠনগত, ক্রিয়াগাত, বিভক্তি চিহ্নগত এবং নিত্যব্যবহৃত শব্দগত সাদৃশ্য প্রাকৃত হইতে অল্প। বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা যে প্রাকৃতের অধিকতর সন্নিহিত, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (৬)

আর এক জন পুরাতন অধিবাসী রামধন ঘোষের নিবাস ছিল শ্যাম বাজারে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নাম জানি না, কিন্তু বহু পুরুষ ঐ খানে বাস করিতেন। এক্ষণে যে রাস্তাকে বাগবাজার ষ্ট্রীট বলে, প্রথমে তাহা গন্ পাউডার ফ্যাক্টরী রোড অর্থাৎ বারুদখানার রাস্তা বলিয়া পরিচিত ছিল। এখন বাগবাজার ষ্ট্রীট চিৎপুর রোডে গিয়া মিশিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। পেরিং সাহেবের বাগানের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত সাধারণ রাস্তা ছিল, উহা বর্ত্তমান হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত, তাহার পর বাগানের দক্ষিণ দিয়া একটী সুড়ি পথ মাত্র চিৎপুর রোডে গিয়া মিশিয়াছিল। ১৭৫২ সালের ১১ই ডিসেম্বর কোম্পানি উহা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করেন, হলওয়েল সাহেব দুই হাজার পাঁচ শত টাকায় উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ স্থানে বারুদখানা নির্ম্মিত হয়। বৃদ্ধেরা বলেন, ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা বারুদখানার ভগ্নাবশেষ এবং কলের বড় বড় লৌহখণ্ড দেখিয়াছেন। উহার মধ্যে একটী সুবিস্তীর্ণ দীঘি ছিল, রামধন ঘোষের চড়ক গাছ তন্মধ্যে সমস্ত বৎসর নিমগ্ন থাকিত। বাবু নন্দলাল বসুর বাটীর পূর্ব্বাংশে রাস্তার ধারে এই চড়ক হইত, আমরা বাল্যকালে ইহাতে উপর উপর চারিটী মাচা বাঁধিয়া ১৬ জন লোককে পিট ফুঁড়িয়া ঘুরিতে দেখিয়াছি, ইহাকে ১৬ চড়কী বলিত আর কোথাও ১৬ চড়কী হইত না। সেই পেরিংস্ গার্ডেন বা বারুদখানার ভূমিতে আমরা বাল্যকালে বাহাদুরী শালকাঠের গোলা সমস্ত দেখিয়াছি। এখন সেই স্থানে মিউনিসিপ্যালিটীর মেটাল ইয়ার্ড অর্থাৎ খোয়া রাখিবার মাঠ হইয়াছে। শ্যামবাজারের কাছে, বাগবাজার ষ্ট্রীটের উত্তর দিকে ৫৫ নম্বর একটী প্রান্তর দেখা যায়, তাহাই রামধন ঘোষের বাস্তুভিটা। রাস্তার উপর এখনও ফটকের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রায় সমস্ত জমি তাঁহারই ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আত্মীয়স্বজনদিগকে অনেক ভূমি দান করিয়া বাস করাইয়াছিলেন, গঙ্গার ধারেও তাঁহার অনেক জমি ছিল। পূর্ব্বোক্ত বলরাম ঘোষের পুত্রদিগকে ইনিই কলিকাতায় আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন। শান্তিরাম ঘোষ ইহাঁরই জ্ঞাতি। ইহাঁর আর এক জ্ঞাতি ছিলেন বাবু মতিলাল ঘোষ। উক্ত রাস্তায় ২৫ নম্বর তাঁহার বাটী, এখনও তাহার কতক অংশে সেকালের ক্ষুদ্র ইটের গাঁথনি দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের লোক কিরূপ রহস্যপ্রিয় ছিলেন, তাহার দু একটী দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা মতি বাবুর উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাকে আমরা বাল্য-

কালে অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। মতি ঠাকুর দাদা বলিয়া ডাকিতাম, আমাদের প্রতি তাঁহার সাদর আমোদের উপদ্রবে অনেক সময় না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতাম না। একদিন পথে ধরিয়া বলিলেন, ওরে তুই কোন্ স্কুলে পড়িস্? কম্বুলেটোলার বাঙ্গালা পাঠশালে পড়ি, শুনিয়া বলিলেন, আচ্ছা দেখ্, যখন হিন্দু কলেজে পড়িবি, তখন তার মেজে সুঁকিয়া দেখিস্, তোর্ মতি ঠাকুর দাদার প্রস্রাবের গন্ধ পাবি। আমরা বলিলাম, ঠাকুরদাদা সে কি রকম? উত্তরে বলিলেন, "একদিন রাত্রে ঐ পথ দিয়া আসিতেছিলাম, তখন হিন্দু কলেজের বনিয়াদ খোঁড়া হইতেছে, সেই খানে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়া ভাবিলাম, বেশ করিলাম, এর পর যখন ছেলেরা এখানে পড়িয়া বিদ্বান হইবে, বড় লোক হইবে, তখন তাহাদের এই কথা বলিব। এখন কবে মরিব তাহার ত ঠিকানা নাই, তাই তোকে বলিয়া রাখিতেছি।" একদিন মতি বাবু কুটী যাইতেছেন, (পূর্ব্বে আফিসে যাওয়াকে কুটী যাওয়া বলিত) মুসলমানদের মহরম উপলক্ষে চিৎপুর রোড লোকে লোকারণ্য। বর্ষাকাল, বৃষ্টি হইতেছে, চিৎপুর রোডের কাদা, এক শত বৎসরের উপরের কথা বলিতেছি, তখন এর দশা দশগুন বা তদধিক ছিল বলিলেও বলা যায়। কারণ সে সময় রাস্তাটী পাকা হয় নাই, কাঁচা ছিল। মতি বাবু দেখিলেন, এ বৃষ্টি কাদায় লোকের ভীড় ঠেলিয়া যাওয়া বড় কঠিন, মহরমের তামাসাটাও ভাল করিয়া দেখা চাই। একটী ঝাঁকামুটে ডাকিলেন, সে মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে বন্দোবস্ত হইল। তিনি খর্ব্বাকৃতি, ক্ষীণাঙ্গ, গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন, মুখাকৃতি অতিসুন্দর ছিল, মুটে তাঁহাকে মাথায় লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। মতি বাবু গোলপাতার ছাতাটী হাতে লইয়া ঝাঁকায় বসিলেন, পথের লোক এই নূতন সং দেখিয়া নানা জনে নানা প্রকার বিদ্রূপ ও আমোদ করিতে লাগিল, কত পরিচিত লোক নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, বরং মধ্যে মধ্যে স্থান বিশেষে অঙ্গ ভঙ্গি করিতেও ছাড়িলেন না। এই অবস্থায় কুটী গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেবেরাও একটু আমোদ সম্ভোগ করিয়া লইলেন। মতি বাবুর পুত্র ক্ষেত্রমোহন ঘোষ। তাঁহার বাটীর পাশ দিয়া ড্রেন পাইপ বসিবে। দরজীপাড়ার কুমুদ মিত্রের নিকট সুশিক্ষা পাইয়া মিউনিসিপালিটীর চেতনা লাভ হইয়াছে। তাই যে যে রাস্তায় ড্রেন পাইপ বসান, তাহার দুই পাশের বাটীর বনিয়াদ অগ্রে পরীক্ষা করেন। মতি বাবুর বাটীর বনিয়াদ খুলিয়া চক্ষু স্থির! মাটীর নীচে এক হাত বা দেড় হাত মাত্র বনিয়াদ, মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ক্ষেত্র বাবুর উপর তম্বি করিয়া বলিতেছেন, তোমার বাড়ীর বনিয়াদ এত কম কেন? ক্ষেত্র বাবু উত্তর করিলেন, সাহেব, আমার উপর রাগ কর কেন, নির্ব্বোধ প্রপিতামহ এই বোকামী করিয়া গিয়াছেন। যদি পার ত তাঁহাকে সেখান থেকে ধরে এনে ফাঁসী দাও, আর সাহেব একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত একজন মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, বল দেখি, কখনও কাহারো বাড়ী গাছের মতন শিকড় শুদ্ধ উপ্ড়ে পড়েছে দেখেছ বা শুনেছ? আজ তোমরা তাঁহাদের বনিয়াদ ঘেঁসিয়া খাল কাটিবে, এ যদি তাঁরা

জানিতেন, তাহলে সেই রকম বুঝিয়া কাজ করিতেন।

রামধন ঘোষের পুত্র, গোবিন্দরাম মিত্রের সহকারী ছিলেন। কোম্পানি যখন কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী স্থানের জমীদারদিগের নিকট নানা কৌশল ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করেন বা হস্তগত করেন, তখন গোবিন্দরাম মিত্র হুগলির দেওয়ান মহারাজা নন্দকুমারের নিকট, "কালীঘাট কেন কোম্পানির দখলে আসিবে না" বলিয়া যে পত্র লেখেন, তাহা রামধন ঘোষের ছেলের মারফতে পাঠান হইয়াছিল। রামধন ঘোষের দুই পুত্র ছিলেন, দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহাদের কাহারও নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। উহঁাদের একজনেরও পুত্র জন্মে নাই, একজনের একটী অপরের দুইটী মাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল। সুবিখ্যাত বাবু রামদুলাল সরকার জ্যেষ্ঠের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করায় রামধনের অর্দ্ধেক সম্পত্তি সাতু লাটু বাবু লাভ করিয়াছিলেন। জলেই জল বাধে! ঘোষমহাশয়েরা এত বাবু ছিলেন, যে ঘৃত ভিন্ন সর্ষপ তৈল কখন ব্যঞ্জনাদিতে দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ সর্ষপ তৈল খাইতেছে, ইহা কাণে শুনিতে পারিতেন না। শুনা যায়, সাতু লাটু বাবুর এক মাসী একদিন যেমন শুনিলেন, সাতু সর্ষপতৈল মাখিয়া আলুভাতে খায়, তিনি অমনি সেই স্থানে বমন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

যে শঙ্করঘোষের লেন, তাঁহাকে আড়পুলীর শঙ্করঘোষ বলিত, সে সময় এস্থানকে আড়পুলি বলিত, আড়কুলী নামে আর একটী স্থান পটলডাঙ্গার দক্ষিণে ছিল। এই শঙ্করঘোষের পিতামহ ১৭৫৮ সাল গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া আসিতে বাধ্য হন।

কাঁটাপুকুরের বসু বংশও অতি প্রাচীন। যে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে চিৎপুর রোডে মিশিয়াছে, তাহার উত্তর দিকে ইহঁাদিগের বৃহৎ বাটী উদ্যান এবং বাটীর সম্মুখে পূর্ব্বদিকে চারিদিক সানবাঁধা গজগীরি পুষ্করিণী ছিল। অর্ম্মির ম্যাপে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নির্ম্মিত অট্টালিকার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। বাগবাজার ষ্ট্রীট বাবু নন্দলাল বসুর বাটীর দক্ষিণ হইতে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত যে কাঁটাপুকুর লেন হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ অংশ উহঁাদের বাগানের উপর দিয়া গিয়াছে। কাঁটাপুকুর লেনের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে উক্ত বসু মহাশয়দের পুষ্করিণী প্রায় ১০।১২ বৎসর ভরাট হইয়া এখন খালি আছে। কলুটোলার শোভারাম বসাকের লেনের বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক উক্ত পুষ্করিণী খরিদ করিয়া ভরাট করিয়াছেন, পুষ্করিণীর চারি পাড়ে সুন্দর ছোট ছোট ইমারত নির্ম্মিত হইয়াছে। কাঁটাপুকুর লেনের পূর্ব্বদক্ষিণে যে পুষ্করিণী ও পুরাতন অট্টালিকা দেখা যায়, যাহার দ্বার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটের উপর, তাহাও বসু মহাশয়দের বাটী, এক্ষণে ইহঁারাই আপনাদিগকে কাঁটাপুকুরের বসু বলিয়া পরিচয় দেন, কারণ বাবু রামকান্ত বসুর সহিত পুরাতন কাঁটাপুকুরের বসু বংশের পুংবংশ লোপ হইয়াছে। রামকান্ত বসু অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। বর্ত্তমান কাঁটাপুকুর ও বসুপাড়ার বসুবংশ ইংরাজ আগমনের অনতিপরে দেউলপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহঁাদের পূর্ব্ব পুরুষ ২১ পর্য্যায় কৃপারাম বসু ও বিনোদরাম বসু, দুই সহো-

দর বসুপাড়ায় এবং তাঁহাদের খুল্লতাত দয়ারাম বসুর পুত্র রামানন্দ বসু কাঁটাপুকুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইহাঁদের ছয় সাত পুরুষ চলিতেছে। শ্যামবাজারের কৃষ্ণরাম বসুর লেন, যাহা শ্যামবাজার ট্রামডিপোর পার্শ্বে রহিয়াছে, এই কৃষ্ণরাম বসু ও অতি পুরাতন অধিবাসী। উক্ত ট্রাম আস্তাবলের পশ্চিমে তাঁহার বাটীর সুবিস্তীর্ণ ভিটা পড়িয়া আছে। অনুমান ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাইত।

ইংরাজদিগের অনতিকাল পূর্ব্বে ভদ্রকালী গ্রাম হইতে আর একজন বসু মহাশয় সপরিবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন, তাঁহারও নাম কৃষ্ণরাম বসু। তিনি শেঠ বসাকদিগের সুতানুটীর ইজারাদার ছিলেন। বর্ত্তমান সুবাবাজার ষ্ট্রীটের নাম পূর্ব্বে কেটোহাটার রাস্তা ছিল, এই রাস্তার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে এখন যে স্থানকে দরমাহাটা বলে, তাহার সম্মুখে বেনেটোলার উত্তর বহুদূর দীর্ঘ প্রস্থ তাঁহার বাটীর সীমানা ছিল। রাস্তা হইতে কিয়দ্দূর দক্ষিণে তাঁহার চারিখানি গৃহ এবং একটী বৃহৎ পুষ্করণী ছিল। উহার একখানি ঠাকুর বাটী, একখানি কাছারী, একখানি বৈঠকখানা, আর একখানি পারিবারিক বাস বাটী। অর্ম্মির ম্যাপে উক্ত পুষ্করণী এবং চারিখানি বাটীরই চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এখন সে পুষ্করণী নাই বটে, কিন্তু সেই স্থানকে আজিও বৃদ্ধেরা বোস পুকুর ও ভিটাকে বোসের পোড়ো বলিয়া থাকেন। উক্ত ভিটার উত্তরে সোভাবাজার ষ্ট্রীটে ৩৭ নম্বরে যে একখানি প্রকাণ্ড বাটী দেখা যায় যাহাতে এক্ষণে "এরিয়ান ইনস্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয় রহিয়াছে উক্ত বাটী কৃষ্ণরাম বসুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ প্রপৌত্র নয়নচাঁদ বসু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, হলওয়েল ডেপুটী সুবিখ্যাত গোবিন্দরাম মিত্র এই কৃষ্ণরাম বসুরই এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। গোবিন্দরামের অদৃষ্ট ফিরিবার গল্প এইরূপ শুনা যায়;—একদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণরাম গঙ্গাস্নান করিয়া পুষ্পাদি হস্তে ঠাকুরবাড়ী পূজা করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দুই মুসলমান স্ত্রী পুরুষ বিবাদ করিতে করিতে জমীদারের নিকট মোকদ্দমা করিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছিল, পুরুষের উপদ্রবে স্ত্রীলোকটা লজ্জা সম্রম হীন হইয়া আসিতেছিল, কৃষ্ণরাম কোথায় দেবদর্শন করিবেন, না প্রাতঃকালে এই বীভৎস দৃশ্য দেখিতে হইল, ইহাতে তিনি নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া জমীদারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দরামকে উহা প্রদান করেন। পরে চার্ণক আসিলে তিনি গোবিন্দরামকে বিশেষ উপযুক্তবোধে আপন কার্য্যে নিয়োগ করেন। গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনী লেখকের সহিত এ কথার কিছুই মিল হয় না। কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র লালবিহারী, তাঁহার পুত্র জগন্নাথ, তাঁহার তিন পুত্র ভবানীচরণ, হলধর, ও নয়নচাঁদ, ভবানীর পুত্র মধুসূদন, হলধরের পুত্র বেণীমাধব ও গোপাল। নয়নচাঁদের তিন পুত্র, রামনারায়ণ, শ্রীনারায়ণ ও শিবনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও নবীন, শ্রীনারায়ণের পুত্র গোপালদাস বসু। ইনি বহুকাল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ের একজন উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন। শিবনারায়ণের তিন পুত্র ব্রজজীবন, বিহারীলাল ও শ্যামলাল বসু, ইহাঁরা জীবিত আছেন।

বাগবাজারের দে সরকারেরাও অতি প্রাচীন পরিবার, ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। যদিও আমরা বহুদূর পর্য্যন্ত ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই, ইঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে ঐ স্থানে থাকিয়া গঙ্গাতীরে গুড়ের ব্যবসায় করিতেন। আমরা রাজারাম দে পর্য্যন্ত নাম পাইয়াছি, ইঁহার পুত্র গুপীচরণ, তিনি যখন অতি বৃদ্ধ, তখন রাজা নবকৃষ্ণ সুতানুটীর জায়গীর প্রাপ্ত হন, গুপীচরণের নামেই খাজানার দাখিলা ছিল। তাঁহার পুত্র গোরাচাঁদ দে সরকার; এখনও লোকে ঐ বাটীকে গোরাচাঁদ সরকারের বাটী বলিয়া থাকে। গোরাচাঁদ বাংসালের অর্থাৎ প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণের ডকের দেওয়ান হইয়াছিলেন। ঐ কারখানা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত এবং ১৮০৮ খ্রীঃ বন্ধ হয়। অর্ম্মির ম্যাপে গোরাচাঁদ দের বাটীর চিত্র অঙ্কিত আছে। তাঁহার চারি পুত্র, রাধানাথ, পঞ্চানন, রামগোপাল ও রসিকলাল। রামগোপালের পুত্র বাবু ক্ষেত্রমোহন দে সরকার মহাশয় এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বয়ক্রম এক্ষণে ৮৫ বৎসর। রাধানাথের পুত্র বৃন্দাবন, তৎ পুত্র শম্ভুনাথ, তৎপুত্র বাবু কালাচাঁদ দে কলিকাতার একজন পুরাতন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার, এখন বাগবাজার ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব সীমায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

ইংরাজ আগমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর এক জন বসু মহাশয় মাইনগর হইতে বাগুয়া বাজারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। শুনা যায়, ইঁহার দ্বারায়ই বসু পাড়ার সৃষ্টি। ইঁহার নাম নিধুরাম বসু, ইঁহাকে দেওয়ান বলিয়া সম্বোধন করিত। কোথায় কাহার দেওয়ান ছিলেন, তাহা আমরা শুনি নাই। তিনি যেমন ধনবান, তেমনি ক্ষমতাবান লোকও ছিলেন। জ্ঞাতিদিগকে নানা স্থান হইতে কলিকাতায় বাস করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। হাফ আক্‌ড়াই নামক উচ্চ সঙ্গীত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মোহনচাঁদ বসু এই নিধিরাম বসুরই প্রপৌত্র ছিলেন। আমরা শৈশবকালে মোহনচাঁদ বসু মহাশয়কে দেখিয়াছি, তখন তাঁহার বয়স ৬০।৭০ বৎসরের কম হইবে না। তিনি প্রফুল্ল-চিত্ত লোক ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দৃঢ় গঠন, ঘোরাল মুখ, মস্তকে বাবরী কাটা চুল ছিল। আমরা যখন দেখিয়াছি, তখন পিনেসে তাঁহার নাক বসিয়া গিয়াছিল, সঙ্গীত করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তখনও ছাত্রদিগকে সুর বুঝাইয়া দিতেন। তিনি গাহনার স্থলে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার ছাত্রেরা অপর পক্ষকে কিছু মাত্র গ্রাহ্য করিত না, তিনি প্রথমে দলের ধর্ত্তাকে গানটী একবার গাইতে বলিতেন, সমস্তটী শুনিয়া যেখানে যে খোঁচ খাঁচ থাকে, নিজে নাকীসুরেই সে গুলি এমন বুঝাইয়া দিতেন যে, লোকে শুনিয়া যেন আপ্যায়িত হইত। আমাদের বাড়ীতে রথ হইত, তদুপলক্ষে হাফ আক্‌ড়াই ওয়ালা গায়কেরা মোহনচাঁদী সুরে সংকীর্ত্তন করিতেন, জ্যেষ্ঠতাত বাদক-শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় অভয়চরণ দত্ত মহাশয় এবং স্বয়ং মোহনচাঁদ বসু উপস্থিত থাকিবেন জানিয়া কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী স্থানের সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রিয় ভদ্রলোকেরা আদ্যোপান্ত পথে গায়কদিগের সহিত বর্ত্তমান থাকিতেন।

বলরাম মজুমদার।—ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে আকনার রামচন্দ্র ঘোষ বাগুয়া

মৌজার তহশীলদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসেন, সভাবাজারের সম্মুখে বর্ত্তমান কুমার টুলির দক্ষিণে তিনি বাস করিয়াছিলেন। কার্য্যসূত্রে তিনি নবাব সরকার হইতে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। রামচন্দ্র নিজে নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের পৌত্র বলরাম মজুমদার ইংরাজদিগের নিকট কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন হন। কেটোঘাটার রাস্তা অর্থাৎ বর্ত্তমান সভা বাজার ষ্ট্রীট হইতে বনমালি সরকারের ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত একটী অতি প্রাচীন পথ, যাহা ১৭৫৭ সালের ম্যাপেও দেখা যায়, বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বংশীয়েরা এক্ষণে নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেছেন।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।—বাবু গৌরদাস বসাক কলিকাতার প্রায় যাবতীয় পুরাতন বাজার, বাগান ও দীঘি সেট বসাকদিগের কীর্ত্তি বলিয়া দাওয়া করিয়াছেন শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর, সুতাবাজার তাঁহাদের বলিয়া থাকেন, শ্যামবাজারটী শ্যামসুন্দর ঠাকুরের, শ্যামপুকুরটীও তাই, সুতাবাজারের নাম শোভাবাজার, তাহা শোভারাম বসাকের স্থাপিত বলিয়াছেন। কিন্তু অর্ম্মির ম্যাপে শ্যামবাজারের স্থান এবং শ্যামপুকুরটী অতি পরিষ্কার দেখা যায়। বেলী সাহেবের ম্যাপে শ্যামবাজারের স্থানটী হাতিবাগানের মোড়ে, সভাবাজার রাজবাটীর স্থানে সভাবাজার এবং যেখানে এখন সভাবাজার সেই স্থানে নবকৃষ্ণের বাজার বলিয়া লিখিত আছে। আপজন সাহেবের ১৭৯২ খ্রীঃ ম্যাপে কম্বলিটোলার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটের দক্ষিণে শ্যামবাজার এবং বর্ত্তমানে চিৎপুর রোডে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ের দক্ষিণে সুতাবাজারের স্থান দেখা যায়। এই স্থানে অতি পূর্ব্বে একটী বাজার ছিল, তাহা আমরা বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি, আমরা বাল্যকালে এখানে কাপড়ের হাট, সেকেলে বেতের ছাতি নির্ম্মাণের দোকান প্রভৃতি দেখিয়াছি। ভগবতীচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী জগন্নাথ শুড়ীর লেন বলিয়া পরিচিত, তিনি শুড়ী নন, সুরুই, জাতিতে তাঁতী, উপরোক্ত বাজারে তাঁহার বৃহৎ দোকান ছিল। পূর্ব্বে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার বাটীর নিকটস্থ তাঁহার খোদিত দীঘিই শ্যামপুকুর, শ্যামবাজারও তাঁহারই। তাঁহার পুত্র মনোহর মুখোপাধ্যায় একটী সুদীর্ঘ বালাখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বালাখানার অপর নাম বৈঠকখানা। অর্ম্মির ম্যাপে উক্ত বালাখানার চিত্র অঙ্কিত আছে। গরাণহাটার রাজেন্দ্র মল্লিকের নূতন বাজারের উত্তরে পুরাতন একহারা সুদীর্ঘ একটী দ্বিতল গৃহ, তাহা আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনোহর মুখুর্য্যের বালাখানাও তদ্রূপ ছিল। এখন যে রাস্তাটী রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের লেন নাম হইয়াছে, ঐ রাস্তাটী অতি প্রাচীন, উহার পশ্চিমদিকে উত্তর দক্ষিণে লম্বমান মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বালাখানাবাটী, ঐ বালাখানা হইতে উক্ত স্থানের নামও বালাখানা হইয়াছে। রাজা নবকৃষ্ণের বাটীর পূর্ব্বদিকে যে বাটী তাঁহার পিতা রামচন্দ্র ব্যবহর্ত্তা ১৭৩৭ সালের বন্যায় গোবিন্দপুরের বাটী গঙ্গায় পড়িবার পর নির্ম্মাণ করেন, সে স্থানটীকে পবনের বাগান বলিত। নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের দক্ষিণে যে রাজ

বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, সেখানে একজন মা গোঁসাই ছিলেন, রাজা তাঁহার বাটী ক্রয় করিলে তিনি ঐ স্থানের আর একটু দক্ষিণে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটের উপর বাটী নির্ম্মাণ করেন। গোস্বামীদিগের সেই বাটী আজিও আছে বটে, কিন্তু ক্রমাগত দৌহিত্র বংশের অধিকার হওয়ায় বর্ত্তমান অধিবাসিরা পূর্ব্ব-কথা কিছুই জানেন না।

স্থলভাগে কলিকাতায় আসিবার চারিটী প্রধান পথ ছিল, একটী উত্তরে চিৎপুর পাইকপাড়ার ভিতর দিয়া বরাহনগর, আড়িয়া-দহ, আগড়পাড়া, পানিহাটি, খড়দহ চন্দন-পুকুর (বারাকপুর), মনিরামপুর, নবাব-গঞ্জ হইয়া গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছিল। আর একটী নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগরের ভিতর দিয়া নারায়ণপুর, জাগুলি, বারা-শত ও দমদমা হইয়া দক্ষিণ পাইকপাড়ার ভিতর দিয়া শ্যামবাজারে মিলিয়াছে। তৃতীয়টী পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বাদার উপর দিয়া সুড়া (সায়পল্লী) বালিয়াঘাটা ও সিয়ালদহ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বৈঠকখানায় মিলিত হইয়াছে। চতুর্থটী সাগর দ্বীপ হইতে কুল্পী, হাজিপুর, বজবজীয়া, বরিষা, সুরসুনা, সীতারামপুর, মুরদপুর, বেহালা, কালীঘাট, ভবানীপুর, চৌরঙ্গী, কসাইটোলা হইয়া লালবাজারে চিৎপুরের রাস্তায় মিশিয়াছিল।

এই চারিটী পথের প্রবেশদ্বারে চারিটী বিশিষ্ট বাজার ছিল দেখা যাইতেছে। ১ম বাগুয়াবাজার বা বাগবাজার, উত্তর সীমা গুল্পাউডার ফ্যাকটরী রোড। (বর্ত্তমান বাগবাজার ষ্ট্রীট) পূর্ব্ব সীমা বসুপাড়া লেন, দক্ষিণ সীমা রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, পশ্চিম সীমা চিৎপুর রোড। ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্নপূর্ণার বাটীর বাহিরে ২।৪ খান ফল তরকারির দোকান সেই পুরাতন বাজারের কঙ্কাল স্বরূপ দেখা গিয়াছে, এখন উক্ত স্থানের মধ্যে আর একটী বাজার হইয়াছে।

২য়। শ্যামবাজার, বর্ত্তমান শ্যামবাজারের দক্ষিণস্থ রাস্তার দক্ষিণ দিকে ছিল। সার্কিউ-লার রোড প্রস্তুতের সময় ১৮০০ খ্রীঃ বর্ত্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। হলও-য়েল সাহেবের ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে পুরাতন বাজার গুলির তালিকা মধ্যে ঐ শ্যামবাজারকেও নূতন শ্যামবাজার বলা হই য়াছে, ইহাতে অনুমান হয়, ১৭৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বে কম্বালয়াটোলাতেই পুরাতন শ্যামবাজার ছিল।

৩য়। বৈঠকখানা বাজার। এই বাজারটীই কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী হইবার প্রধান আকর্ষণ। যে ফটক দিয়া ট্রাম গাড়ী সিয়ালদহ ষ্টেসনে যাতায়াত করে, সেই দক্ষিণ ফটকের সম্মুখে সার্কিউলার রোডের চৌমাথার মধ্যস্থলে একটী বহু বিস্তীর্ণ বট বৃক্ষ ছিল। তাহার একটী শাখার নিম্নে থানা ছিল, আর একটী শাখার নিম্নে একখানি ৭০ ফুট উচ্চ বৃহৎ রথ থাকিত। এ রথ খানি অবশ্য সে সময়ের কোন ধনাঢ্য অধিবাসীর হইবে, তাহার সন্দেহ নাই, আমরা এপর্য্যন্ত যাঁহার কোন সন্ধান পাই নাই। সিয়াল-দহ, সুড়া ও বালিয়াঘাটা তিনটীই যখন অতি প্রাচীন জনপদ, তখন বোধ হয় উহারই কোন স্থানে রথাধিকারীর নিবাস ছিল। বাদা পূর্ব্বে সুগভীর থাকায়, পূর্ব্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল হইতে বড় বড় নৌকায় নানাবিধ দ্রব্য আসিয়া বালিয়াঘাটায় পঁহুছিত, তথা হইতে বংদযোগে গোবিন্দপুর, চেতলা, সুতানুটী ও বাটোয়ের হাটে চলিয়া যাইত। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র নৌকা ও তালডোঙ্গায় নিম্নশ্রেণীর বিক্রেতারা আসিয়া বালিয়াঘাটায় নামিত।

এই সমস্ত বিক্রেতাদিগের সম্মিলন স্থান ছিল উপরোক্ত বৃহৎ বটবৃক্ষ। ইহার নিম্নে তাহারা দ্রব্যাদি নামাইয়া বিশ্রাম করিত, রন্ধনাদি করিত এবং সঙ্গীদিগের অপেক্ষা করিত। এত লোকের যেখানে সমাগম, সেখানে একটী সুন্দর বাজার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জব চার্ণক যখন হুগলিতে ছিলেন, তখনও মধ্যে মধ্যে এই বটমূলে আসিয়া দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানী দেখিতেন এবং পাইপ খাইতেন। বেলী এবং আপজন উভয়ের মানচিত্রেই উক্ত বটবৃক্ষের চিত্র ও বৈঠকখানা বাজারের স্থান উল্লিখিত আছে। বটবৃক্ষের অনুরোধে মহারাষ্ট্র খালকেও সরলরেখা ছাড়িয়া ঐখানে একটু বক্র হইতে হইয়াছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস ওয়েলেসলি সার্কিউলার রোড নির্ম্মাণার্থ ঐ বৃহৎ বটবৃক্ষ কাটিতে আদেশ দেন।

৪র্থ। লালবাজার। ইহা পূর্ব্বে তেমন বড়বাজার ছিল না, কারণ প্রাচীনকালে এদিকে ভদ্র লোকের বাসস্থান ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কেবল পথিকদিগের সুবিধার জন্য একটী সামান্য রকম বাজার ছিল মাত্র। ইংরাজদিগের আগমনের সহিত ইহার শ্রীবৃদ্ধি যথেষ্ট হইয়াছিল। টিরেটা সাহেব সুন্দর ও সুবিধা মত বৃহৎ বাজার ইহার উত্তরে নির্ম্মাণ করিয়া লালবাজার উঠাইয়া দেন। এই বাজার হইতে টিরেটা প্রতি মাসে দুই হাজার টাকার উপর উপসত্ব প্রাপ্ত হইতেন, প্রথমে যখন বাজারটী নির্ম্মিত হয়, তখন ১০ বিঘা জমী প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া কতকগুলি খড়ের চালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণে চাউল প্রভৃতি শস্যের বড় বড় গোলা, উত্তরে কয়েকটী চুরটের কারখানা ও মাখনের দোকান, পূর্ব্বদিকে মাংসের বাজার, মধ্যস্থলে মাছ, তরকারি, ফল মূল, মসলা, তামাকু প্রভৃতি এবং হাঁস মুর্গি ইত্যাদি বিক্রয় হইত। ১৭৮৮ খ্রীঃ টিরেটা সাহেব বিলাত যাত্রা কালে আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন, বাজারটী লটারি দ্বারা বেচিয়া এক লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। পরে উহা ওয়েষ্টন সাহেবের সম্পত্তি হয়। সেই জন্য আমরা বেলি সাহেবের ১৭৮৪ সালের ম্যাপে বাজারটীর নাম টিরেটা বাজার এবং আপজন সাহেবের ১৭৯২ সালের ম্যাপে ওয়েষ্টন সাহেবের বাজার নাম দেখিতে পাই। উক্ত বাজারের বর্ত্তমান গৃহগুলি ১৮২৭ খ্রীঃ নির্ম্মিত হইয়াছে। সিমলা বাজারটীও অতি প্রাচীন, কিন্তু এখন মাণিকতলা ষ্ট্রীটে যেটীকে সিমলা বাজার বলে সেটী নয়, ঝামাপুকুর লেনের মাথায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের উপর রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটীর সম্মুখে যে বাজারটীকে টিকটিকির বাজার বা পোড়া বাজার বলে, সেইটী পুরাতন সিমলা বাজার। অর্মির ম্যাপে ঠিক এই স্থানে একটী বড় জায়গা পাকা ইমারত ও প্রাঙ্গণের চিহ্নে বাজার বলিয়া বুঝা যায়। বেলির ম্যাপেও ঐস্থানে পুরাতন সিমলা বাজার এবং বর্ত্তমান সিমলা বাজারের স্থানে নূতন সিমলা বাজার বলিয়া লিখিত আছে। হলওয়েল সাহেবের ১৭৫২ খ্রীঃ রিপোর্টে কলিকাতায় নিম্নলিখিত বাজার গুলির উল্লেখ আছে:—"সুবাবাজার, ধোবা পাড়া বাজার, হাটখোলা বাজার, বাগুয়া বাজার, চার্লস্‌ বাজার, নূতন শ্যামবাজার, বেগম বাজার, গাছতলার বাজার, জাননগর বাজার।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান সভাবাজার, যাহা রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃ-

শ্রাদ্ধের সভা স্থলে স্থাপিত অথবা গৌরদাসের কল্পিত "শোভারাম বসাকের বাজার" ছাড়া একটী পুরাতন বাজার ছিল, তাহারই নাম সুবা বাজার।

জোড়াসাঁকোর পূর্ব্বে চাষাধোবাপাড়া, এথানে কোন বাজার কথন ছিল কি না, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চার্লস বাজার এবং বেগম বাজার কোথায় ছিল, এথনও জানা যায় নাই। উপরোক্ত বৈঠকথানার বাজারের নাম গাছতলার বাজার এবং তাহারি কিয়দ্দূর দক্ষিণে জাননগর, সেখানেও একটী বাজার ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

সুমিত্রা।

(মিশ্র উপরূপক)

প্রস্তাবনা ও নান্দী।

[স্থান—স্বর্গ; দেবগুরু বৃহস্পতি এবং অরুন্ধতী দেবীর প্রবেশ।]

অরুন্ধতী—দেবগুরু বৃহস্পতি! নমস্কার।

বৃহস্পতি—দেবী অরুন্ধতী; অভিবাদন করি।

অরু—আপনার ধ্যানদীপ্ত চক্ষু বড় আনন্দময় দেখ্‌ছি যে?

বৃহ। পৃথিবী নামে একটা নূতন সৃষ্টি হ'ল; তাই দেখে এলাম।

অরু—আপনার মুখে সেই সৃষ্টি-মহিমা শুনতে বড় কৌতুহল হচ্চে।

বৃহ—সূর্য্য থেকে একটা বাষ্পগোলক বেরিয়ে ক্রমাগত আকাশপথে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল; তারপর ঠাণ্ডা হতে হতে, তা থেকে জল হল, পাথর হল, মাটী হল, নূতন নূতন জীব জন্তু হল, মানুষ হল।

অরু—সেটা কি তা হলে সূর্য্যের সৃষ্টি?

বৃহ—তা নয়; অনাদি স্বয়ম্ভুর জ্ঞানসূত্র, বিশ্বকর্ম্মার চর্কার কলের সূতার মত ক্রমাগতই বেরুচ্চে; তারই একটা অংশ, জড়িয়ে জড়িয়ে এই কাণ্ডটা হল। কিন্তু একটা লৌকিক ভাব আছে জানেন ত? সেই লৌকিক ভাবে সূর্য্য থেকেই সৃষ্টি হল মনে হয়।

অরু—আপনি গুরু; কিন্তু একটী কথা বলি। প্রথমেই সূর্য্য হতে সৃষ্টি হল, একথা বলা ভাল হয় নি। আপনার নিঃশ্বাসে পৃথিবীতে বুদ্ধির সঞ্চার হয়, আপনার এই কথায়, নূতন পৃথিবীতে জগদীশ্বরের প্রতি অনাস্থা জন্মাতে পারে। বিধাতার কথা, বিকল্পে শেষে বলাতে, সন্দেহ প্রবণ হবার কথা।

বৃহ—একেই ত সে রাজ্যের শাসনভার ইন্দ্রের হাতে পড়েছে; তিনি বিবেচনা করে, শাসন না কল্লেই অন্নকষ্টে লোকের পীড়া হবে; সূর্য্যের পুত্র যম আবার সেখানে গিয়ে খেলা কচ্চেন; তার উপর অবিশ্বাস!

অরু—অবিশ্বাসের ছেলে পাপের সঙ্গে যমের বড় বন্ধুত্ব।

বৃহ—আমার মনে হয় যে, যমের কুকীর্ত্তির মধ্যেও বিধাতার গূঢ় মঙ্গল লুকিয়ে আছে। কিন্তু অনেক ধ্যান করেও তার তত্ত্ব আবিষ্কার কত্তে পারি নি।

অরু—অনাদিদেব পৃথিবীর মঙ্গল বিধান করুন।

বৃহ—স্বস্তি।

(উভয়ের গান)
খট্—ঝাঁপতাল।

জগত তব কৃপার কণা জীবন তব করুণা ;
নিখিল মাঝে অখিলপতি সকলি তব মহিমা।
বিচারে কেন মরণ ব্যাধি   কেন বা পাপ কামনা
কেন গো সুখ উপরে দুঃখ   কেন তা প্রভু জানি না।
বরিষ নাথ শান্তি সুখ   নিবার যত যাতনা।
মঙ্গলময় তোমার নাম মঙ্গল তব রচনা ?

প্রথম দৃশ্য।

[নরেশ এবং তাঁহার পত্নী সুমিত্রার প্রবেশ]

নরেশ—কোথা গিয়াছিলে সুমিত্রা ? আমি তোমাকে খুঁজ্‌ছিলাম।

সুমিত্রা—বড় পাহাড়ের মাথা থেকে, যেখানে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল প'ড়্‌ছে জান ? সেখানে মাথা পেতে নাইতে গেছিলাম। তুমি একদিন যাবে ?

নরেশ—ঐ ঝরণাটা তোমার এত ভাল লাগে কেন ?

সুমিত্রা—ওখানকার জল, যেন পরমেশ্বরের দয়ার মত ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়ে।

নরেশ—(সুমিত্রার চোখের দিকে তাকাইয়া) বল দেখি, আকাশের রং ভাল, না তোমার চোখের রং ভাল ?

সুমিত্রা—আকাশের রং।

নরেশ—হেরে গেলে, তোমার চোখের রং ভাল।

সুমিত্রা—ইঃ (সতৃষ্ণে নরেশের চক্ষুদর্শন)।

নরেশ—তুমি বোসো ত ; ফেলারাম বুঝি আমার বনে ফল খেতে এসেছে। দেখে আসি।

সুমিত্রা—তোমার বন কি করে হল ?

নরেশ—বটে ! আমি আগে দেখেছিলাম !

সুমিত্রা—তা ঝগড়া কোরো না। দু চারিটী ফল খেয়েছে ত খেয়েছে।

(নরেশের প্রস্থান)

সুমিত্রা—ঐ কি গোলমাল শুনা যাচ্চে ; কি হ'ল ! না জানি কতক্ষণে ফিরে আস্‌বেন। (পরিক্রমণ)

(নরেশের পুনঃ প্রবেশ)

নরেশ—উঃ উঃ, গায়ে, হাত বুলিয়ে দে ! বড় জ্বালা।

সুমিত্রা—(গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া) কি হল ?

নরেশ—(ছুটিয়া দূরে গিয়া) উঃ, আরও জ্বালা করে—সহ্য হয় না।

সুমিত্রা—কি হয়েছে ?

নরেশ—ফেলারামকে তাড়াতে গেলাম ; তা সে বল্লে আমি যাব না। তাই নিয়ে খুব ঝগড়া হল ; একখানা লাঠি দিয়ে যাই তাকে মেরেছি, অম্‌নি গায় বাণ বিঁধলে হরিণ যেমন মরে যায়, তেমনি মরে গেল।

সুমিত্রা—হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ করেছ !

নরেশ—কথা বলিস্‌নে, জ্বালা করে।

সুমিত্রা—পরমেশ্বর তোমাকে ভাল করুন।

নরেশ—বলিস্‌নে বলিস্‌নে, আরও জ্বালা করে। পরমেশ্বর নেই, মিথ্যা কথা।

সুমিত্রা—অমন কথা বোলো না, কাছে এস।

নরেশ—দূরে যা—যা বল্‌ছি—যাবিনে ? আর তোর মুখ দেখ্‌ব না—আমি চলে যাচ্চি।

(বেগে পলায়ন)

সুমিত্রা—কোথা যাও—কোথা যাও ? সর্ব্বনাশ হল যে ! কোথায় গেলেন কে জানে ? আর মুখ দেখ্‌বেন না বলেছেন (রোদন)। চারিদিকে পাহাড় আর বন। সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে। ফির্ব্বেনা বলেছেন, বড় ভয় হচ্চে। যা বলেন তাই করেন। কখনও

কারো কথা শুনেন না। আমি যাই—চেঁচিয়ে ডাক্‌তে ডাক্‌তে যাই। (প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথে।

নরেশ—আমি ত ফল মূল খাচ্চি, হরিণ মেরে খাচ্চি, পাখী পুড়িয়ে খাচ্চি। সুমিত্রাকে কে খেতে দিচ্চে? কে দেখ্‌ছে? তাকি জানি। ঘরে ফেরা হবে না। বেশ আছি। সুমিত্রাকে এত ভালবাসি; তবুও সে দিন তার চোখের দিকে তাকাতে পাল্লেম না। সব আগুন; ভাবতে গেলেও গা পুড়ে যায়। আর মানুষের মুখ দেখ্‌ব না। কেঁলারাম যখন মাটীতে পড়ে যায়, তখন বলেছিল যে, বড় খিদে লেগেছিল ভাই—উঃ বড় জ্বালা করে! আগে সে কথা বল্লে না কেন? সুমিত্রা যদি গায়ে হাত বুলিয়ে দিত! না—ছুটে বেড়াই (তথাকরণ) স্থির হয়ে বসে থাক্‌লেই গা জ্বালা করে। পাখী মারিগে, হরিণ মারিগে। খুব পরিশ্রম হলে, এসে শুয়ে থাক্‌ব। বসে থাক্‌লেই মাথা ভোঁ ভোঁ করে। ঐ একজনা কে যাচ্চে। পাহাড়ের তলা দিয়ে লুকিয়ে যাই। যারা ঘরে থাকে, তারা বাঘের ভয় করে; আমি দেখ্‌ছি মানুষের ভয়ই বেশী। ঐ একটা হরিণ যাচ্চে; ছুটে যাই মারিগে।

(দৌড়াইয়া প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন না করিয়া সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমিত্রা—আজি ছটি মাস বনে বনে; কৈ কোথাও ত সন্ধান পাই নে? মা তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। বড় শ্রান্ত হয়েছি; মাগো হাত ধরে নিয়ে যাও।

গান।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

ঐ আসিছে রজনী দিনমণি ডুবিল।
থাকহে নয়ন পথে নয়নের আলো।
একাকিনী অনাথিনী কোথা পথ না জানি;
এসগো এস কাছে, স্নেহময়ী জননী;
ভীষণ গহন বন আঁধারে ভরিল।

ঐ গুহটার ভিতর গিয়ে আশ্রয় নি। (প্রবেশ করিয়া) আঃ এখানেই আজি রাত কাটাব। না জানি তিনি এখন কোথা। (হাত জোড় করিয়া) আমাদের চিরদিনের মা, তুমি তাঁকে রক্ষা কর।

(অন্যদিকে নরেশের প্রবেশ)

আজি এই পাহাড়ের উপরেই শুয়ে থাকি; বড় পরিশ্রম হয়েছে। হয়ত শীঘ্রই ঘুম হবে। (শয়ন ও নিদ্রাবেশ)

(অন্যদিকে সুমিত্রার গান।)

কীর্ত্তনের সুর।

ওমা, চিরদিন তাঁরে দেখো
কে আছে সহায়, সতত তাঁহায়
চোখে চোখে তুমি রেখো (ওমা দয়াময়ী),
প্রেমের আলোকে যখন পুলকে
(মোরা) নিচরিনু সুখে ভাসি;
সে হাসে তখন আনন্দ বদন
(তুমি) রেখেছিলে পরকাশি;
আজি মা জননী অভয়রূপিনী
প্রাণ মাঝে তাঁর জাগো (জাগো জাগো গো মা)
যখন জননী বিষাদ রজনী
আসিবে পরাণে আঁধারে;
(তখন) মা হয়ে এস শিয়রেতে বোসো
তুষো প্রেমভরে তাঁহারে—
কোলে তুলি নিয়ে প্রেমামৃত দিয়ে
স্নেহের অঞ্চলে ঢেকো (ওমা প্রেমময়ী)।

তৃতীয় দৃশ্য।

(পাহাড়ের উপর)

নরেশ—এখনও সূর্য্য উঠেনি। আঃ

আবার ঘুমুতে ইচ্ছা কচ্চে। (শয়ন) —আর ঘুম হবে না। এমন স্বপ্ন আবার কবে দেখ্‌ব? রোজ ঘুমুতে ভয় হত; চোখ্‌ বুজ্‌লেই ফেলারামের মুখ দেখতাম। কাল আমার এমন ঘুম কি করে হল? সুমিত্রা যেন শিয়রে বসে গান গাচ্ছিল; আর ফেলারামের ভাবনা পুঁছে ফেলে দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে ঝরণার জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল। সুমিত্রা! সুমিত্রা! আর তাকে পাব না; কোথায় যে এসেছি, তাও জানিনে। আজি নুতন ইচ্ছা হচ্চে। পাহাড়ের উপর থেকে হরিণ যেমন পড়ে মরে যায়, তেমনি করে পড়ে মরতে ইচ্ছা কচ্চে। মরে গেলে ফেলারামকে ভুলে যাব, আর স্বপ্নে সুমিত্রার গান শুন্‌তে পাব। পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়িগে। (উত্থান) চমৎকার সূর্য্য উঠেছে। সরস্বতীর কূলে দাঁড়িয়ে ঐ কে স্তব পাঠ কচ্চেন।

নেপথ্যে—মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ। মা হৃণানস্য মন্যবে।

(নিষাদ বালকের প্রবেশ)

নিষাদ বালক—ওগো, পাহাড়ের মাথায় উঠেছ কেন? কে তুমি? নীচে এস, নীচে এস। ওখানে আমার পাখীর বাসা আছে, পাখীগুলো উড়িয়ে দিও না।

নরেশ—(স্বগত) কি চমৎকার মুখখানি; কেবলই আনন্দ মাখা। (প্রকাশ্যে) নিষাদ বালক, সরস্বতীর তীরে কে উনি?

নিঃ বাঃ—উনি ঋষি হিরণ্যগর্ভ। ওঁর সর্ব্বাঙ্গে আগুন। শুনেছি, যে ছোঁয় সেই পুড়ে মরে। আমরা কেউ ওদিকে যাইনে।

নরেশ—(স্বগত) এখানে মরিবার সুবিধা হল না; ওঁকে গিয়ে ছুঁই; চট্‌ করে শুক্‌না ঘাসের মত পুড়ে যাব। (প্রকাশ্যে) এই পথ দিয়ে সরস্বতীর কূলে যাওয়া যায়?

নিঃ বাঃ—যায় বই কি? তুমি যাবে? ঋষিকে দূর থেকে দেখো; কাছে যেও না। এই পথ দিয়ে নেমে যাও। হাঁ—ঐ পথে।

(নরেশের অবতরণ ও প্রস্থান)

নিষাদ বালকের গান।

আলেয়া—খেম্‌টা।

পিঁজরে করে রাখব পুরে তিন্‌টি পাখী ময়না।
তুড়ি দিয়ে পড়িয়ে নেবো যেটা কথা কয়না॥

চন্দনা আর টিয়ের বাসায় ডিম হয়েছে খাসা খাসা,
ফুট্‌লে পরে আন্‌ব ধরে বেশী দিন যে রয় না।
বাহাবা কি মাথায় ঝুঁটি উড়ে গেল বুল্‌বুলিটি,
ঐ পাখীটি আন্‌ব লুটি দেরী যে আর সয় না।

চতুর্থ দৃশ্য।

সরস্বতী তীরে।

ঋষি হিরণ্যগর্ভ ধ্যান স্তিমিত লোচনে দণ্ডায়মান; এবং পদতলে যুক্ত করে নরেশ উপবিষ্ট।

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—(ভজন)

আদি অনন্ত অনাদি অন্ত
অপার অদ্ভুত শম্ভু।
অসীম গগনে অকথিত ভুবনে
অখণ্ড অচ্যুত অধিভূ!
পূর্ণ পরাৎপর পূর্ণ বিভাকর
পরম মনোহর সৌম্য!
প্রেম পরায়ণ তুমি নারায়ণ
পরম পুরাতন ব্রহ্ম।
দুঃখ বিঘাতক মোক্ষ বিধায়ক
লক্ষ্য সুদর্শক ধাতা!
ভব ভয় বিহ্বল দুর্ব্বল সম্বল
সর্ব্ব সুমঙ্গল দাতা!
সত্য সনাতন তাপ বিনাশন
বিঘ্ন বিমোচন কর হে!
হে হর সুন্দর নিত্য মনোহর
চিত্ত-কলুষ ভয় হর হে!

নরেশ—(স্বগত) ইনি আগুনও বটেন; জলও বটেন। যখন এলাম, তখন ওঁর গা থেকে আগুন বেরিয়ে গা পোড়াচ্ছিল। এখন যেন আবার ঠাণ্ডা জল পড়্‌ছে।

হিরণ্যগর্ভ—(চক্ষুখুলিয়া) কে তুমি, কি চাও?

নরেশ—ঠাকুর, মর্ত্তে এসেছিলাম, প্রাণ পেয়ে গেলাম। তুমি যাঁকে ডাক্‌ছ, তাঁকে ডাক্‌তে শিখিয়ে দাও; ফেলারামের দুঃস্বপ্ন দূর হোক্।

হিরণ্য—শান্তিঃ—চল আমার আশ্রমে

(উভয়ের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন না করিয়া সুমিত্রার প্রবেশ)

সুমিত্রা—কি চমৎকার যায়গা! হে চির-সুন্দর, আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। মানুষের মন, ঐ পুণ্যসলিলা সরস্বতীর জলের মত পবিত্র কর। দূরে ধূঁয়া উঠছে। কাছেই মানুষের ঘর বাড়ী আছে। যিনি পথ দেখাচ্চেন, তাঁরই সঙ্কেতে যাই। আজি লোকালয়ে একটু বিশ্রাম করি। বালিতে মানুষের পায়ের দাগ দেখ্‌তে পাচ্চি। এই পথেই যাই।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

সরস্বতী তীরে—নব কুটীরে।

নরেশ—ক্রমাগত এই তিন মাস ভেবেছি যে, হিরণ্যগর্ভ আমার পরমেশ্বর; আর তুমি আমার পরমেশ্বর। ঋষি হিরণ্যগর্ভ আমাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন; আর তুমি আমার সে পথের একমাত্র সহায়। কিন্তু আজি উষালোকে আমি নূতন তথ্য পেয়েছি। তোমরা যে পরমেশ্বরের কথা বলিতে, তিনি আজ আমার সাম্‌নে স্বপ্রকাশ। সুমিত্রা, আজি আমার নবজীবন লাভ হ'ল।

সুমিত্রা—যিনি নবজীবনদাতা, আমরা তাঁরই নাম ক'রব; এখানে এই কুটীরে থাক্‌ব।

(হিরণ্যগর্ভের প্রবেশ)

হিঃ—নরেশ, তুমি এখন ঋষি, তোমাকে নমস্কার করি। সুমিত্রা দেবি, তুমি ঋষি-পত্নী, তোমাকে নমস্কার করি।

নরেশ ও সুমিত্রা। ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমরা আপনার দাসদাসী। আপনার চরণে প্রণত হই। (উভয়ের প্রণাম)

হিঃ—এস, যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, আমরা তাঁর চরণে সকলে প্রণাম করি।

(সকলের সমবেত স্তোত্র গান)

স্তোত্র।

ভৈরবী (ভজন)—একতালা।

নরেশ—জীবন শুধু দুঃখ
জীবন শুধু যাতনা
সংসারে নাহি সুখ হে
সংসার শুধু কল্পনা—
সুমিত্রা—তুমি জীবন দুখত্রাতা!
সংসারে তুমি সত্য!
তুমি পাতা সুখদাতা
তুমি আদি তুমি নিত্য!
হিরণ্যগর্ভ—জীব তব করুণা
সংসার তব লীলা।
জীবন নহে ছলনা,
সংসার নহে খেলা।
সকলে—তাতে তব প্রেম ভুবনে
তুমি মঙ্গল প্রেম মুরতি
জাগে তব প্রেম জীবনে
প্রেমে করি তব আরতি।

পটক্ষেপণ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

উপনিষদের উপদেশ। (২)

(ছান্দোগ্য-উপনিষদের ৬ষ্ঠ প্রপাঠক হইতে গৃহীত)।

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে অরুণি নামে একজন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ছিলেন। তাঁহার শ্বেতকেতু নামে দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক একটী পুত্র ছিল। অরুণি একদিন শ্বেতকেতুকে নিকটে ডাকিয়া, সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৌম্য! আমাদের এই কুলে সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ; সুতরাং তোমারও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য! সেই বিদ্যা শিক্ষা করিবার বয়স তোমার উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি, আমাদের কুলের যোগ্য আচার্য্যের নিকটে কিছুকাল বাস করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন কর।" শ্বেতকেতু পিতার এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গুরুকুলে বাস করিতে লাগিলেন এবং চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে, সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, পিতার নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্বেতকেতু সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া এতকাল পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু পিতা দেখিতে পাইলেন যে,—শ্বেতকেতু বড় অভিমানী ও অবিনীত হইয়া আসিয়াছে। সে যে, সমগ্রবিদ্যা শেষ করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছে,—এইরূপ একটা দারুণ অভিমান তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে;—অরুণি পুত্রের এই ভাব অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি দুঃখিত-চিত্তে, একদিন পুত্রকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সৌম্য! তোমাকে অধীতবিদ্যার গৌরবে বড় গৌরবান্বিত বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমি আচার্য্যের নিকট হইতে কি কি বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছ, আমার নিকটে তাহার একটী পরীক্ষা দেও। আমি তোমায় একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর। যাহার বিষয় একবার শুনিলে, জগতের কোন বিষয়ই অশ্রুত থাকে না,—যে বিষয়টী একবার তর্কদ্বারা বুঝিতে পারিলে, জগতের সমস্ত বিষয়ই বোধগম্য হইয়া পড়ে,—যাহা জানিলে আর কিছুই জানিবার ইচ্ছা থাকে না;—জিজ্ঞাসা করি, এরূপ বস্তু বিশ্বে কি আছে, তাহা আমায় বলিয়া দাও।" শ্বেতকেতু পিতার এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া, বিস্মিতচিত্তে উত্তর করিলেন—"পিতঃ! এ কিরূপ বলিতেছেন? কৈ, আমি এরূপ কোন বস্তুর বিষয়ে ত শিক্ষা লাভ করি নাই।" পিতা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হে সৌম্য! তুমি যে ইহা বলিতে পারিবে না, তাহা আমি তোমার অভিমান দেখিয়া, পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। তুমি পার্থিব-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছ, কিন্তু যাহা সকলের সার, সে বিদ্যার জ্ঞানলাভ তোমার ঘটে নাই! মনোযোগ দাও; আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

কার্য্য (Effect) এবং কারণ (Cause), বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন নহে বলিয়া, কারণটীকে যদি উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই কারণ হইতে যে কার্য্যটী উৎপন্ন হয়, তাহার স্বরূপ বুঝিতেও বিলম্ব হয় না। মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতেই,

ঘট-শরাবাদি উৎপন্ন হয়; এই মৃত্তিকার স্বরূপ অবগত হইলে, উহা হইতে উৎপন্ন ঘট-শরাবাদি যাবতীয় পদার্থের স্বরূপও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এইরূপে কার্য্য ও কারণ একই পদার্থ হইলেও, লোকে যে কার্য্য ও কারণের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকে,—ঘটকে মৃত্তিকা বলে না,—তাহার হেতু এই যে, বাস্তবিক পক্ষে কার্য্য কারণ হইতে নামে মাত্র পৃথক্; স্বরূপতঃ উভয়ই এক এবং অভিন্ন। ঘটকে ঘটই বল আর যাহাই বল না কেন, উহা মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। উহার আকৃতি বা সংস্থানটী ভিন্ন বলিয়াই কেবল, লোকে উহাকে মৃত্তিকা না বলিয়া ঘট বলিয়া থাকে। এই ভাবে দেখিতে গেলে, বিকার বলিয়া কোন পদার্থই পৃথিবীতে নাই,—একথা বুঝা যায়। যাহাকে তুমি বিকার বলিতেছ, উহা কারণেরই রূপান্তর মাত্র; কারণই উহাতে অনুস্যূত রহিয়াছে। যেমন এক সুবর্ণের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, উহার বিকার-ভূত হার, বলয়, মুকুট প্রভৃতির স্বরূপও যে সেই সুবর্ণমাত্র, ইহা বুঝিতে পারা যায়; যেমন একটী মাত্র লৌহ-পিণ্ড বুঝিলে, তাহা হইতে উৎপন্ন অস্ত্রাদি যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ বুঝা যায়;—এরূপ কোন বস্তুর বিষয়ে হে পুত্র! তুমি কোন উপদেশ কি পাও নাই? আমি এইরূপ বস্তুর কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।”

পিতার বাক্য শুনিয়া, শ্বেতকেতু পুনরায় গুরুকুলে প্রেরিত হইবার ভয়ে পিতাকে বলিলেন যে, “নিশ্চয়ই আমার আচার্য্যেরা এরূপ কোন বস্তুর তথ্য অবগত নহেন, নতুবা তদ্বিষয়ে তাঁহারা আমায় কোন উপদেশ দেন নাই কেন? অতএব পিতঃ! আপনিই আমায় এ বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন্। এ উপদেশ পাইলে, আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যাইতে পারিব।” পিতা বলিতে লাগিলেন:—

“নাম ও রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ-ব্রহ্ম বর্ত্তমান ছিলেন *। উৎপত্তির পূর্ব্বে কোনও বস্তু, কোনও রূপে বা নামে পরিচিত ছিল না। উৎপত্তির পরেই, বস্তু নানাবিধ নাম, আকার এবং গুণাদিবিশিষ্ট হইয়াই, আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে; অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে (অভিব্যক্তির পূর্ব্বে), নামরূপাদি কিছুই ছিল না; কেবল মাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন। যেমন কোন কুম্ভকার প্রাতঃকালে ঘট নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া, অন্য কোন কার্য্যের জন্য গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়া সেই কার্য্য সমাপনান্তে সন্ধ্যার সময়ে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সেই প্রাতঃকালের সংগৃহীত মৃত্তিকা দ্বারা ঘটাদি প্রস্তুত করিয়া মনে করে যে, এই ঘটাদি প্রাতঃকালে মৃত্তিকামাত্র ছিল, এখন সেই মৃত্তিকা হইতেই এই ঘটাদি-আকার-বিশিষ্ট বস্তু উৎপন্ন হইল; এইরূপ এই নামরূপময় বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই যে কুম্ভকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহাতে ও বিশ্ব-সৃষ্টিতে একটা মহৎ পার্থক্য আছে। কুম্ভনির্ম্মাণকালে যেমন মৃত্তিকা ব্যতিরিক্তও, কুম্ভকার এবং দণ্ড-

* নিরাত্মক (Negative), স্বরূপ বিবর্জ্জিত, একান্ত অভাবাত্মক যাহা, তাহাকে “অসৎ” বলে। যাহা তদ্বিপরীত, তাহাই “সৎ”। ব্রহ্মবস্তু নিরাত্মক, অভাবাত্মক, নিঃস্বরূপ হইতে পারেন না; জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ।

চক্রাদি নানারূপ সহকারী কারণ বর্ত্তমান থাকে, বিশ্ব-সৃষ্টিতে ব্রহ্মের সেরূপ কোন সহকারী কারণ থাকে না। এইরূপ কোন সহকারী কারণ ছিল না বলিয়াই, তাঁহাকে "অদ্বিতীয়" * বলা হইয়াছে। হে বৎস! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই অভাবাত্মক শূন্য বা "অসৎ" ছিল।+ কিন্তু বৎস! তাহা ঠিক্ নহে। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। একান্ত অভাব (Negative) হইতে ভাবাত্মক (Positive) পদার্থ প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না।

বৎস! একান্ত অসৎ হইতে কি কারণে বিশ্ব বা সৎবস্তু প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না, তাহা আবার আর একদিন বলিব। বিষয়টী কঠিন। তুমি পণ্ডিত হইলেও, পরমার্থ বিষয়ের সমস্ত যুক্তি ও তত্ত্ব একদিনে ধারণা করিয়া উঠিতে পারিবে না। আজ্ যাহা যাহা বলিয়া দিলাম, তাহাই মনে মনে পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর। আবার, আর একদিন বিষয়ের অন্যান্য অংশ বলিয়া দিব"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

প্রমথনাথ

সমালোচ্য কে, কবি না কাব্য? কবিকে ছাড়িয়া যাঁহারা কাব্য সমালোচনা করিতে পারেন, তাঁহারা বৃক্ষ না দেখিয়া ফলের জাতি নির্ণয় করিতে পারেন। যে ভাবটী বর্ণনা করিতে কবি প্রবৃত্ত, সে ভাবের ভাবুক না হইলে তাঁহার কাব্য শব্দাড়ম্বর মাত্র।

প্রমথনাথ ধনবান যুবক, অথচ ভাবুক ও বিদ্যামোদী। কালীপ্রসন্ন সিংহের পঁচিশ বৎসর পরে রামদাস সেন, রামদাসের পঁচিশ বৎসর পরে প্রমথনাথ। ধনীসমাজে অন্তঃপুষ্ট গ্রন্থকার অনেক জন্মিয়াছে। অর্থের গৌরবে তৃপ্ত না হইয়া গ্রন্থকার-যশে তাঁহারা লালায়িত হইয়াছিলেন, গ্রন্থকারদের এই টুকু সৌভাগ্য। কৃষ্ণদাসের রচিত প্রবন্ধ মুখস্থ করিয়া যেমন কেহ কেহ বক্তৃতা করিবার সুখ্যাতি পাইয়াছেন, নটনারায়ণ ও কবিরত্ন-রহস্য প্রকাশ করিলে, অনেক ধনবান গ্রন্থকারের গ্রন্থ রচনার রহস্য বুঝা যায়। দারিদ্র্যের তিমির কুটীর কবিতার

* সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের কোন সহকারী কারণান্তর ছিল না, তিনিই সৎপদার্থ, সেই সৎপদার্থ হইতেই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই কথা বলাতে বৈশেষিক ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ,—এই উভয়ের মত খণ্ডিত হইল। বৈশেষিকের মতে, ঈশ্বর সৃষ্টির কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ। যাহা ছিল না (অসৎ) তাহা হইতে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাণুপুঞ্জ পূর্ব্বে মোটেই ছিল না, ঈশ্বর তাহা সৃষ্টি করিলেন। অতএব ঈশ্বর নিমিত্তকারণ রূপে বর্ত্তমান ছিলেন মাত্র, আর কিছুই তখন ছিল না। ইঁহারা ঈশ্বরকে সৃষ্টির উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তমতে এরূপ 'অসৎ' হইতে 'সৎ' সৃষ্টি স্বীকৃত হয় নাই।

+ শূন্যবাদী বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে একেবারে শূন্য ছিল। ঈশ্বরও ছিলেন না, তাঁহাকে কিছু সৃষ্টিও করিতে হয় নাই। ইঁহাদের মতে কিছুরই সত্তা তখন ছিল না। ন্যায়মতে বস্তু দুইটী—সৎ ও অসৎ। এক সৎ (ঈশ্বর), যাহা ছিল না, তাহা হইতে বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়াছেন; সৃষ্টির পর সেই অসৎই সৎ হইয়াছে। শূন্যবাদীমতে, সৎ ও অসৎ কিছুই ছিল না; কেবল শূন্য বা অভাব ছিল। অতএব বেদান্ত মতে এরূপ একান্ত 'অসৎ'ও স্বীকৃত হয় নাই, দেখা যাইতেছে।

চির স্তূতিকা। দেশান্তরের ন্যায় বঙ্গেও তাহার ব্যতিক্রম আছে।

সংবাদ-পত্রের সমালোচনা পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম, প্রমথনাথ বাগদেবীর গর্ভ হইতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মকালের অতি-ভৌতিক ঘটনা পরন্তন প্রসাদপ্রিয় পরিজনগণের আরোপণা, নববঙ্গে বীরপূজার অপেক্ষা করিতে হয় না। গ্রন্থ জন্মিবার পূর্ব্বে কখন কখন, সচরাচর গ্রন্থ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে চাটুকারের দুন্দুভি-ঘোষণা আরম্ভ হয়।

প্রমথনাথের পদ্মার সমালোচনায় বড়ই ঔৎসুক্য হইয়াছিল। এখন পদ্মা পড়িয়াছি, দুন্দুভি-ঘোষণার আবশ্যকতা বুঝিলাম না। পদ্মা অনাদরের পদার্থ নহে, কিন্তু পদ্মার গায় মেদরক্তমলা বিস্তর আছে। দ্বিতীয় সংস্করণেও যথেষ্টরূপে ধৌত হয় নাই। প্রমথনাথ প্রমথনাথ না হইলে পদ্মার জন্মে এত কোলাহল উঠিত না।

তবে পদ্মা পড়িয়া বুঝা যাইত, প্রমথের প্রতিভা সামান্য নহে। পদ্মার পরে গীতিকা, দীপালী ও গান প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরোত্তর প্রমথের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখনও সে প্রতিভা উর্দ্ধমুখী। আরও জ্বলিবে আশা আছে। অনুরোধ, তোষামোদে প্রমথনাথ ফুলিয়া না উঠেন, এবং অসংযত উদ্গারে শক্তির অপচয় না করেন। সে সম্বন্ধে আমাদের একটু আশঙ্কা জন্মিয়াছে।

অসঙ্গ সঙ্গম বঙ্গকবির অসাধ্য নহে। যিনি এক মূর্ত্তিতে হরগৌরী রচনা করিতে পারেন, তিনি মায়ের স্তনযুগলের পীনতা কেন বর্ণনা করিবেন না, আবার তাঁহার উত্তরাধিকারী মাকে উলঙ্গিনী দেখিতে কেন বা সাধ না করিবেন? গোল্ডস্মিথ শীতের সহিত শরতের সমাবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া কি তিরস্কার না সহ্য করিয়াছেন! বাঙ্গালী কবি একই মুহূর্ত্তে ষড়ঋতুর সমাবেশ করেন, একই সময়ে, একই কাননে সকল ফুল ফুটান, সকল পাখীকে গান করান। বাঙ্গালা কাব্যে লিঙ্গবর্ণরূপ ভেদের আবশ্যকতা নাই। জামের পাকা ফল খাইতে খাইতে শাদা কোকিলা কুহুরবে বিরহিণীর পুলক-সঞ্চার করে। (বাঙ্গালী শুনিয়া কবি, দেখিয়া নহে। প্রতিভা তাহার ধার করা।)

প্রমথনাথ অনেক স্থলে এ সকল অপরাধ বাঁচাইয়াছেন। কিন্তু "এক কোমর কাদায় দণ্ডায়মান হইতে" রৌদ্ররসের সহিত হাস্যরসের, শান্তরসের সহিত বীভৎসরসের সমাবেশ করিতে একসময় কুণ্ঠিত হন নাই। সে বালকত্বের দোষ। পদ্মায় এ দোষ যথেষ্ট ঘটিয়াছিল, পরবর্ত্তী কাব্য সকলে এ দোষ লঘুতর হইয়াছে।

তাঁহার রচিত গান গাহিতে শুনিয়াছি। দু একটী গানে মুগ্ধ করিয়াছে, বারবার শুনিতে চাহিয়াছি। তাঁহার কবিতার মাত্রা ও ধ্বনি সাধারণতঃ মধুর। মন্দিরার ঝিনি ঝিনি নহে, মৃদঙ্গের জলদ নির্ঘোষ। অথচ দুই এক স্থলে মাত্রা দোষও দেখিলাম। সে গুলি অবশ্য অনবধানতা বশতঃ ঘটিয়া থাকিবে।

এখন গানে রুচি ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব বা শাক্ত-সঙ্গীত ভাবে ভরা, শব্দের দিকে লক্ষ্য করিত না। কবি গানে ভাবের সঙ্গে শব্দলাবণ্যের সংযোগ করিয়াছিল। শ্রীধর কথক সঙ্গীত রচনায় ভাব ও শব্দনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

গোবিন্দ অধিকারী শব্দযোজনার নিকট ভাবের বলিদান করেন। রবি বাবু শব্দের শৃঙ্খল হইতে ভাবকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এখন ভাবের যত অভাব হইতেছে, শব্দের শৃঙ্খল ততই নির্ম্মাণ করিতেছেন। আগে কাঁচা ব্রাণ্ডী চলিত, শেষে জল ঢালিতে ঢালিতে একেবারে ফিকা হইয়া পড়ে, তবু যাহা হউক, কিছু পানীয় ছিল, এখন পানীয় উঠিয়া গিয়া কেবল গ্লাশের ঠন্‌ঠনানি সার হইয়াছে।

প্রমথ বাবুর প্রতিভা এখনও পূর্ণতেজে উঠিতেছে, তাঁহার চারিখানি পুস্তকের মধ্যে পঞ্চাশ ষাটটী এমন কবিতা আছে, যাহা চিরস্মরণীয় কবিগণের যশোবর্দ্ধন করিতে পারে। আমরা পড়িয়া ভাবে পুলকিত হইয়াছি। তাই তাঁহাকে সাবধান করিতেছি, পতনোন্মুখ কবিগণের আদর্শে আপনার শৃঙ্খল আপনি রচনা করিবেন না। তাঁহাকে পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ যেন জ্ঞাপন করিতে না হয়। এ দুর্ভাগ্য কয়েকবার ঘটিয়াছে। (বাঙ্গালী নাকি বড় স্ত্রৈণ, তাই পুরুষকে মেয়ে করিয়া লইতে বড় সাধ হয়। কিশোরী সেবায় পুরুষ নারী সাজিয়া নারীভাবের সাধনা করে। রৌদ্র ও বীর রস আদি রসে পরিণত করিতে পারিলে বাঙ্গালী কবি তৃপ্ত হয়। রামলক্ষ্মণের বীরত্ব অপেক্ষা বিলাপের বর্ণনায় কীর্ত্তিবাসের কৃতিত্ব। বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল সাগরকে "আদিজননী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অন্যে হিমালয়ের রাঙ্গা পায় আলতা মাখাইয়া "অয়ি বালে" বলিয়া সম্বোধন করিলে আমি চমকিত হইব না।) প্রমথ নাথের বিশেষত্ব পুরুষকারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার ছন্দে মন্দিরার রুণুঝুনু অপেক্ষা মৃদঙ্গের নির্ঘোষ অধিক শুনা যায়। তাঁহার ভাবে গাম্ভীর্য্য ও প্রাণ আছে। ময়নাকে পিঞ্জরে পুরিয়া বাঙ্গালী শিশুর আনন্দ, তরুতলে সিংহশিশুর কেশর কর্ষণে শক্র-দমনের। হেমচন্দ্রের বাল্যকালে এই বীরভাব এক দিন দেখিয়াছিলাম। ঠুংরীর তালে টপ্পা শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়াছে। প্রমথের সঙ্গে আকাশ পাতাল, সাগর গিরি ঘুরিয়া বুকের পাটা বাড়িয়াছে, একদিন প্রমথ বলিয়াছিলেন, যাহা সসীম, তাহা ত মুষ্টিমেয়, তাহাতে আনন্দ কি? জীমূতমন্দ্রে ও সাগর-কল্লোলে প্রমথের আনন্দ। বিজলীর আলোকে বৈঠকখানায় বসিয়া যাঁহারা ফনোগ্রাফে আনন্দ অনুভব করেন, প্রমথনাথ তাঁহাদের কবি নহে। পবন-হিল্লোলে সরোবরের লহরী-লীলা যাঁহাদিগকে পুলকিত করে, প্রমথনাথ তাঁহাদের নহে। চাঁদের আলোকে চাতকের নাচে যাঁহাদের সুখ হয়, প্রমথ নাথ তাঁহাদের নহে। আটলাণ্টিক মাপকাটীতে মাপা যায় না। প্রমথনাথের উশৃঙ্খলতা পানের চুণ খসা নহে, মহত্ত্বের ব্যাকুলতা। ভীমকান্ত যাদোরত্ন প্লম্বায় তাহার উন্মেষ, অমানিশার মেঘসঙ্কুল অন্ধকারে তাহার বিজলীলীলা, হিমাচলের শিখর হইতে সাগরের গহ্বর পর্য্যন্ত তাহার কুরুক্ষেত্র। বস্তুতঃ তাঁহার নিকট আশা হয়। কিন্তু এমনি আশা আরো কতজনের নিকট করিয়াছিলাম! যে হাতে গৌতমের মহাচিত্র দেখিয়া একদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, সে হাতে এখন বানর নাচ দেখিয়া লজ্জা ও ঘৃণায় মরিয়া যাইতেছি। আর কাহার কাছে আশা করিতে ইচ্ছা হয় না। না মরিলে কোন কবির কাব্য সমালোচনা করিতে এখন সাহস হয় না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বিবর্ত্তবাদ এবং ব্রহ্ম ও জগৎ

গত চৈত্রমাসের 'নব্যভারতে' কোকিলেশ্বর বাবু তাঁহার 'ব্রহ্ম ও জগৎ'শীর্ষক প্রবন্ধে বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি অযৌক্তিক ও ভ্রমাত্মক কথা বলিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ কথা জনপ্রিয় হইলেও কোন দেশে কখন স্থায়ী শুভফল প্রসব করিতে পারে না। সময়ের নিতান্ত অভাব সত্ত্বেও আমরা কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দুই চারিটী কথা এ প্রবন্ধে বলিব। এখানে অগ্রেই আমরা কোকিলেশ্বর বাবুকে অনুরোধ করিতেছি যে, যদি বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদিগকে দুই একটী অপ্রিয় কথা বলিতে হয়, তাহা হইলেও তিনি জানিবেন, তিনি অগ্রেও যেমন আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় স্বদেশবাসী ভ্রাতা ছিলেন, পশ্চাতেও ঠিক তাহাই থাকিবেন।

প্রথম কথা, কোকিলেশ্বর বাবুর লেখার ধরণে মনে হয়, তিনি বিবর্ত্তবাদ (evolution theory) ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ (natural selection theory) এক মনে করিয়াছেন। বাস্তবিক উহারা ঠিক একই বিষয়, একই জিনিস নহে। এ সম্বন্ধে একটী স্পষ্ট ধারণা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কোকিলেশ্বর বাবুর বড় দোষ নাই, অনেক শিক্ষিত ও পণ্ডিত লোক অভিব্যক্তিবাদ (=বিবর্ত্তবাদ=ক্রমবিকাশ বাদ) ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধটী ঠিক কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝেন না। অভিব্যক্তি (=বিবর্ত্তন =ক্রমবিকাশ) হইল কার্য্য, আর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হইল তাহার একটী সম্ভাব্য কারণ বা প্রণালী। না, এখনও ঠিক বলা হইল না। কেবল জীবরাজ্যে যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, সেই অভিব্যক্তির একটী সম্ভাব্য কারণ বা প্রণালী প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তিতে (cosmic evolution এ) অনেক মহা মহা পণ্ডিত বিশ্বাস করেন। তা এই ব্রহ্মাণ্ড-অভিব্যক্তির একটী সম্ভাব্য কারণ কি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন? না, তাহা নহে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কেবল জীবরাজ্যের অভিব্যক্তির অন্যতম সম্ভাব্য কারণ।

এখানে জীবরাজ্যে উক্ত অভিব্যক্তি কিরূপ,সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। একটী বৃক্ষের গুঁড়ী যেমন ক্রমে দুই বা ততোধিক শাখায় পরিণত হয়; তারপর প্রত্যেক শাখা হইতে এক, দুই বা ততোধিক প্রশাখা উদ্ভূত হয়; আবার ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক প্রশাখা হইতে এক, দুই বা ততোধিক বাল-প্রশাখা (প্রশাখার শাখা) প্রসূত হয়; সেইরূপ ক্রমবিকাশবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, জীবন-বৃক্ষের মূলদেশে স্থিত আদি জৈবনিক-পদার্থ (Protoplasm)) বা এক অতি নিকৃষ্ট জাতীয় জীব ক্রমে শাখা স্বরূপ দুই বা ততোধিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে; আবার এই শাখা-স্বরূপ এক একটী জাতি দুই বা ততোধিক প্রশাখা স্বরূপ জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; আবার প্রশাখা স্বরূপ এক একটী জাতি বাল-প্রশাখা স্বরূপ দুই বা ততোধিক জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ স্পঞ্জ, কেঁচো, গেঁড়ী,

মশক, রুইমাছ, গরু, বানর, মানুষ প্রভৃতি নানা জাতি যে পৃথিবীতে অধিবাস করিতেছে, ইহাদের প্রত্যেকটী যেন জীবন-বৃক্ষের এক একটী বাল-প্রশাখা। একটী জাতি হঠাৎ অন্য একটী বা ততোধিক জাতিতে পরিবর্ত্তিত বা পরিণত হয় নাই,—শত শত বৎসরেও নহে; কিন্তু সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসরে। ক্রম-বিকাশবাদীর মূলকথা হইতেছে এই যে, কেঁচো, গরু, হস্তী, বানর, মানুষ প্রভৃতি জাতিগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্টি কার্য্যের (special creation এর) ফল নহে; অর্থাৎ স্রষ্টা এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া তাহাতে ফুৎকার দিয়া বলিলেন, এই মৃত্তিকাটুকু একটী কেঁচো হউক, আর ঐ মৃত্তিকাটুকু একটী কেঁচো হইল, আবার একটুকু মৃত্তিকা লইয়া বলিলেন, এইটুকু একটী হস্তী হউক, আর একটী হস্তী হইল—এইরূপে বা এইরূপ কোন প্রকারে—মাটী হইতেই হউক আর বায়ু হইতেই হউক, অত্যন্ত শূন্য হইতেই হউক, আর সৃষ্টির কল্পনা হইতেই হউক—একবারেই কেঁচো সম্পূর্ণরূপে কেঁচোবৎ, গো সম্পূর্ণরূপে গোবৎ, হস্তী সম্পূর্ণরূপে হস্তীবৎ পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হয় নাই। কিন্তু প্রোটোপ্লাজম্ বা জাতীয় জীবই ক্রমে ক্রমে, অতি ধীরে ধীরে,একটু একটু করিয়া নানা জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী বৎসরে ঐ সকল জাতিতে পরিণত হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ক্রমবিকাশবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমানের ট্যাপির, রাইনোসারস্, ঘোটক, গর্দ্দভ, জেব্রা, কোয়াগা এই সকল বিষম-অঙ্গুলি-যুক্ত (এক বা তিন অঙ্গুলি যুক্ত) খুর-বিশিষ্ট (odd toed, hoofed) ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলি (species) এক পঞ্চ অঙ্গুলিযুক্ত খুরবিশিষ্ট ফেনাকোডস্ (Phenacodus) জাতীয় জীব, যাহা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবীবক্ষে বিচরণ করিত, যাহা আকারে বা গঠনে না ট্যাপির, না রাইনোসারস্, না ঘোটক, কিন্তু মোটামুটি রকমে এই সকল জীবেরই মত; যাহা বহুকাল পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অধুনা যাহার প্রস্তরীভূত কঙ্কালমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ফেনাকোডস্ জাতীয় জীব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। পঞ্চ-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট ফেনাকোডস্ এক লম্ফে ত্রি-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট ট্যাপির ও রাইনোসারস্ বা এক অঙ্গুলি বিশিষ্ট ঘোটক হয় নাই; কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া, ক্রমে ক্রমে, একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানের ঐ জাতিগুলিতে পরিণত হইয়াছে। ফেনাকোডস্ জাতীয় কতকগুলি জীব সহস্র সহস্র বৎসরে এওহিপসে (Eohippus এ) পরিণত হইল। এই এওহিপস্ জাতি ফেনাকোডস্ হইতে অধিকতর অশ্ববৎ; ইহার প্রত্যেক পদে পঞ্চ-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট ফেনাকোডসের ন্যায় পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি ছিল না; কেবল চারটী করিয়া অঙ্গুলি ছিল; আর লুপ্ত প্রথম অঙ্গুলির চিহ্ন স্বরূপ একটী অতি ক্ষুদ্র অস্থি চর্ম্মের নীচে লুকায়িত থাকিত। এই চতুরাঙ্গুলি-বিশিষ্ট এওহিপস্ সহস্র সহস্র বৎসরে ক্রমে ক্রমে ইহার চতুর্থ অঙ্গুলিটীও হারাইয়া ত্রি-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট হিরাকোথিরিয়ম্ (Hyracotheriam) নামক জীবে পরিণত হইল। হিরাকোথিরিয়ম্ এওহিপস্ হইতে অধিক-

তর অশ্ববৎ। ত্রি-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট হিরাকোথিরিয়ম্ আবার ত্রি-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট কিন্তু অধিকতর অশ্ববৎ আঙ্কিথিরিয়মে পরিণত হইল। পাঠক মহাশয়, আর এই বিট্‌কিলে নামের জ্বালায় আপনাকে জ্বালাতন করিব না। সংক্ষেপে,—ঐ যে আঙ্কিথিরিয়মের প্রত্যেক পায়ে তিনটী করিয়া অঙ্গুলি ছিল, ঐ তিনটী আমাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলির স্থানীয়; তবে আঙ্কিথিরিয়মে ঐ তৃতীয় অঙ্গুলিটী তাহার দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলি অপেক্ষা বৃহত্তর। আঙ্কিথিরিয়মের সুদূর বংশধরেরা এক-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট, প্রায় সম্পূর্ণরূপে অশ্ববৎ প্লিওহিপসে (Pliohippas এ) পরিবর্ত্তিত হইল। এই প্লিওহিপস্ হইতেই এক-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট বর্ত্তমান অশ্ব-গতি ধীরে ধীরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ফেনাকোডস্ জাতীয় কতকগুলি জীব এবং তাহাদের বংশধরেরা যেমন সহস্র সহস্র বৎসরে ধীরে ধীরে সহস্র সহস্র বংশের ভিতর দিয়া এওহিপস্, হিরাকোথিরিয়ম প্রভৃতি পরস্পর হইতে অল্প ভিন্ন চল্লিশ পঞ্চাশটী বিলুপ্ত (Extinct) মধ্যবর্ত্তী জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে বর্ত্তমানের ঘোটকে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ উক্ত ফেনাকোডস্ জাতীয় আর কতকগুলি জীব ও তাহাদের বংশধরেরা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া, সহস্র সহস্র বংশপরম্পরায় য়্যামিনোডন (Amynodon) য়্যাকেরাথিরিয়ম (Aceratherium) প্রভৃতি অনেকগুলি বিলুপ্ত মধ্যবর্ত্তী জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে বর্ত্তমানের রাইনোসারসে পরিণত হইয়াছে। ট্যাপির সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ; তবে ট্যাপির, ঘোটক ও রাইনোসারস্ অপেক্ষা অধিকতর ফেনাকোডস বৎ, অর্থাৎ ট্যাপিরের দিকে পরিবর্ত্তন তত অধিক হয় নাই। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, ফেনাকোডস্ যেন জীবনবৃক্ষের একটী প্রশাখা, আর উহা হইতে উদ্ভূত ট্যাপির, রাইনোসারস্ ও ঘোটক যেন এক একটী বাল-প্রশাখা। (ঘোটকের পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবন-স্রোত যখন পূর্ব্বোক্ত প্লিওহিপসে আসিয়া পৌছিল, সম্ভবতঃ সেই সময়ে বা তার কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ ঘোটক বাল-প্রশাখা হইতেই যেন দুই তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেঁকড়ি বাহির হইয়া বর্ত্তমানের গর্দ্দভ, জেব্রা, কোয়াগা রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল।) আমরা জীবনবৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগের একটী অতি ক্ষুদ্র অংশের অভিব্যক্তি ঠিক কিরূপে হইয়াছিল, অতি সংক্ষেপে দেখাইলাম। পাঠক এখন মনে করুন, ফেনাকোডস্ জাতি যেন আর পাঁচটী প্রশাখার মধ্যে একটী; আর মোটামুটী ঐ প্রশাখাগুলি যেন জীবনবৃক্ষের একটী বড় শাখা (মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীব = (Vertebrata) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আরও মনে করুন, গেঁড়ী, গুগলি, ঝিনুকাদি জাতি যেন মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আর একটী বৃহৎ শাখার (mollusca) এক একটী বাল-প্রশাখা। সেইরূপ কাঁকড়া, মাকড়সা, আরসোলা প্রভৃতি জাতিগুলি যেন আর একটী বৃহৎ শাখার (Artheropoda) এক একটী বাল-প্রশাখা। কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি জাতি যেন আর একটী বৃহৎ শাখার (Vermes) এক একটী বাল-প্রশাখা, এইরূপ যেন আরও দুই তিনটী বৃহৎ শাখা আছে। এখন মনে করুন, এই বৃহৎ শাখাগুলি মূল স্বরূপ আদি জৈবনিক পদার্থ (protoplasm) হইতে যে গুঁড়ী উঠিয়াছে, সেই গুঁড়ী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপ ভাবে দেখিলে

জীবজগতের অভিব্যক্তির একটা মোটামুটী অথচ ঠিক্ ধারণা হইবে। বিষয়টী অতি দুর্ব্বোধ্য; সহজে স্পষ্ট ধারণা করা যায় না, আর স্পষ্ট ধারণা করিতে জীবন-বিজ্ঞান ভাল করিয়া জানা চাই। যাহা হউক, অভিব্যক্তিবাদ কি, তাহা লেখা আজ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক বোধে ইহার একটা আভাস মাত্র আমরা দুই চারটী কথায় দিলাম; সাতকাণ্ড রামায়ণ সাত কথায় শেষ করিলাম।

জীবজগতে অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ ত এইরূপ। এখন অভিব্যক্তিরূপ কার্য্যটী কি প্রণালীতে, কি কারণে সাধিত হইয়াছে? ডারউইন বলেন, প্রধানতঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা। ডারউইনের প্রায় ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত লামার্ক বলিয়াছিলেন এবং আজও অনেক মহা মহা পণ্ডিত তাহা আংশিকরূপে বিশ্বাস করেন যে, ব্যবহার-উত্তরাধিকারী (use-inheritance)ঐ অভিব্যক্তির একটী প্রধান কারণ। কিছু দিন পূর্ব্বে রোমানিস্ (Romanis) আর এক কারণ,(Physiological selection) আনিয়া হাজির করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও দুই চারিটী অল্লাধিক পরিমাণে সম্ভাব্য কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চতুর্দ্দিকের অবস্থার অব্যবহিত প্রভাব (direct influence of the environment) এবং দেশান্তর গমন ও পৃথকীকরণ (migration and isolation)কে প্রধান বলা যায়।

এখন কোকিলেশ্বর বাবু উক্ত অভিব্যক্তিবাদ ও ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বাদকে এক জিনিস মনে করিয়া অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে চারিটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া অভিব্যক্তিবাদকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহেন। আমরা দেখিব, এই আপত্তিগুলির মধ্যে চতুর্থটী একটী আবদার মাত্র। প্রথম তিনটী সাক্ষাৎসম্বন্ধে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকে সেগুলি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তুলিয়াছেন বটে। ঐ আপত্তিগুলি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদের বিরুদ্ধেই কতদূর কার্য্যকর, তাহা আমরা এখনি দেখিব। কিন্তু তাহা দেখিবার পূর্ব্বে আমরা বলিতে চাই যে, অভিব্যক্তিবাদ আজ এরূপ পদবীতে আরূঢ় যে, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ আজ যদি বিনষ্ট হইয়াও যায়, তাহা হইলেও অভিব্যক্তিবাদে অর্থাৎ জীবরাজ্যের ক্রমবিকাশে (organic evolution এ) বিশ্বাস অটল থাকিয়া যাইবে। আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জীবন-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতই (Biologists) অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করেন; কিন্তু এই অভিব্যক্তিবাদী পণ্ডিতদের মধ্যেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে জীবরাজ্যে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির কারণ বা প্রণালী বলিতে প্রস্তুত নহেন। এই শেষোক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে দুই চারিটী পণ্ডিত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ন্যায় অন্য নৈসর্গিক কারণ বা প্রণালীকে জীব রাজ্যের ক্রমবিকাশের কারণ বা প্রণালী বলিয়া মনে করেন; আর কতকগুলি আবার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে একটু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে চাহেন;—কিন্তু ইহারা সকলেই অভিব্যক্তিবাদে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন। আরও দেখুন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বাদ আবির্ভূত হইবার অনেক পূর্ব্বে অভিব্যক্তিবাদ অনেক চিন্তাশীল মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়াছিল এবং তাঁহারা উক্ত

অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করিতে বাধ্যও হইয়াছিলেন। যখন পৃথিবী প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনের নামও শুনে নাই, তখন ডি মেইয়ে (De-maillet) পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ লামার্ক, ডারউইনের বিখ্যাত পিতামহ ডাক্তার ইরাস্মস্ ডারউইন (Dr. Erasmus Darwin) আর দার্শনিক জগতের শিরোভূষণ হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) জীবরাজ্যের ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানে আরও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ যে সকল যুক্তি বা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, অভিব্যক্তিবাদ নিজের অস্তিত্ব সে সকল যুক্তির উপর সংস্থাপিত করে নাই। অভিব্যক্তিবাদ আজ কতকগুলি স্বতন্ত্র অখণ্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এ কথাও বলি যে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডারউইন যখন বিবিধ দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দ্বারা প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন-তত্ত্ব জগৎকে বুঝাইলেন, তখন ক্রমবিকাশের একটী সহজে বোধগম্য সুন্দর প্রণালী বা কারণ মানব-চক্ষু সম্মুখে নিপতিত হওয়ায় অভিব্যক্তিবাদ অধিকতর ঘনীভূত, স্পষ্টীকৃত ও প্রাঞ্জলতর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, অভিব্যক্তিবাদ ও ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, উক্ত প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবাদে বিশ্বাস টলাইতে পারিলেই অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস টলিবে।

এখন দেখা যাউক, কোকিলেশ্বর বাবুর পূর্ব্বোক্ত প্রথম তিনটী আপত্তি প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবাদের বিরুদ্ধেই কতদূর কার্য্যকর। তারপর তাঁর চতুর্থ আপত্তিটী কিরূপ, তাহা দেখিব। এই পুরাতন আপত্তিগুলি অনেকে অনেকবার উত্থাপিত করিয়াছেন; অনেকে অনেকবার তাদের খণ্ডনও করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আমরা অতি সংক্ষেপে বলিব।

কোকিলেশ্বর বাবুর প্রথম আপত্তিটী এই;—"মনুষ্য দ্বারা যে পরিবর্ত্তিত নূতন প্রাণী অভ্যুদিত করান যায়, তাহা এবং প্রাকৃতিক অনুকূলতায় (প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন দ্বারা) যে নূতন প্রাণী অভ্যুদিত হয়, তাহা, এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। অপেক্ষাকৃত বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদ্বয়কে একত্র করিয়া দিলে, সেই সংযোগফলে যে সন্তান জন্মে, ঐ সন্তানদিগের আর সন্তান উৎপাদন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু প্রাকৃতিক অনুকূলতায় যে নূতন জাতীয় জীব অভ্যুদিত হয়, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সংযোগে, ঐ প্রকারের সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, দেখা যায়। কেন এরূপ হয়, বিবর্ত্তবাদ ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই।" প্রিয় পাঠক, আপত্তিটী যে কি, তাহার কিছু কি বুঝিতে পারিলেন? বোধ হয়, না। আমরা বলিতে বাধ্য, হয় কোকিলেশ্বর বাবু নিজেই আপত্তিটী ঠিক্ কি, বুঝিতে পারেন নাই, নয় তাঁর লেখায় কোথাও গলদ আছে। যাই হউক, আমরা অগ্রে আপত্তিটী কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদীরা মানব-নির্ব্বাচনের (artificial selection এর) দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নিজেদের মতকে দৃঢ়ীভূত করেন। তাঁরা বলেন, মানুষ যখন নির্ব্বাচন (selection) দ্বারা এক গোলা জাতীয় (Rock pigeon) পায়রা হইতে লক্কা, লোটন, পাউটার (গলাফুলো) ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অন্তর্জাতি *

* আমরা ইংরাজীতে যাহাকে (Race) বা

উদ্ভূত করিতে পারে, তখন প্রকৃতি কেন সেইরূপে এক জাতি (species) হইতে দুই বা ততোধিক অন্তর্জাতি (race বা variety) উদ্ভূত করিতে পারিবে না। তাঁরা বলেন, প্রকৃতি তাহা পারেন। তাঁহারা বলেন, বন্য গোলা পায়রা ও ঘুঘু, এই দুই জাতি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একটী জাতির দুইটী অন্তর্জাতি স্বরূপ ছিল। মানুষ যেমন নির্ব্বাচন দ্বারা গোলা পায়রা হইতে লক্কা ও লোটন এই দুই অন্তর্জাতি (Variety) উদ্ভূত করিয়াছে, প্রকৃতি ও সেইরূপ নির্ব্বাচন দ্বারা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একই জাতি হইতে ক্রমে ক্রমে দুইটী অন্তর্জাতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে একটী আধুনিক গোলা পায়রার পূর্ব্বপুরুষ, আর অপরটী বর্ত্তমান কালের ঘুঘুদের পূর্ব্বপুরুষ। ঐ দুইটী অন্তর্জাতিই (variety ই) সহস্র সহস্র বৎসর বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে থাকিয়া বিশেষ রূপে ও স্থায়ীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াই অবশেষে বর্ত্তমানের পায়রা ও ঘুঘু নামক দুইটী স্বতন্ত্র জাতিতে (species এ) পরিণত হইয়াছে। এখন আপত্তিকারী বলিবেন,—"আচ্ছা, তাই যদি হইল, তাহা হইলে মানব-নির্ব্বাচন দ্বারা উদ্ভূত লক্কা ও লোটন ইহাদের সংযোগ হয় কেন, আর এই সংযোগের ফল স্বরূপ

(Variety) বলে, তাহাকেই "অন্তর্জাতি" বলিলাম। "শ্রেণী" "বংশ" "বর্ণ" ইত্যাদি শব্দ ঠিক্ race এর অর্থ প্রকাশ করে না। গোলা-পায়রা Rock pigeon একটী জাতি (Species); ঘুঘু আর একটী জাতি। কিন্তু গোলা-পায়রা হইতে মানুষ যে নির্ব্বাচন দ্বারা লক্কা, লোটন, গলাফুলো ইত্যাদি নানা রকমের পায়রা উদ্ভূত করিয়াছে, তাহারা হইল এক একটী "অন্তর্জাতি"। গোলা, ঘুঘুর ন্যায় অশ্ব একটী জাতি, আর গর্দ্দভ আর একটী জাতি। সেইরূপ মানুষের দৃষ্টান্ত লউন। মানুষ হইল একটী জাতি, বন-মানুষ আর একটী জাতি। কিন্তু মনুষ্য জাতির(Species)এর মধ্যে নিগ্রো, চীন, হিন্দু ইত্যাদি যে সব অবান্তর জাতি আছে, ইহাদের প্রত্যেকটী একটী একটী "অন্তর্জাতি"(race বা variety); নিগ্রো একটী অন্তর্জাতি, চীন একটী অন্তর্জাতি, হিন্দু একটী অন্তর্জাতি। ব্যক্তি সমষ্টি লইয়া অন্তর্জাতি। রাম, শ্যাম, মোহিনী, হরিদাসী ইত্যাদি ব্যক্তি লইয়া হিন্দু অন্তর্জাতি। অন্তর্জাতির সমষ্টি লইয়া জাতি। নিগ্রো, চীন, হিন্দু, ইত্যাদি অন্তর্জাতির সমষ্টি হইল মনুষ্য জাতি। দুইটী অন্তর্জাতির মধ্যে যে ভিন্নতা দেখা যায়, দুইটী জাতির মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ভিন্নতা দেখা যায়। হিন্দু ও চীনের মধ্যে যে ভিন্নতা দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক ভিন্নতা মানুষ ও বনমানুষের মধ্যে দেখা যায়। "অন্তর্জাতি" ও "জাতি" এই দুইটীর মধ্যে সাধারণতঃ আরও একটী বিভিন্নতা দেখা যায়। দুইটী অন্তর্জাতির বিশেষতঃ গৃহপালিত অন্তর্জাতির প্রায়ই সঙ্গম হইতে পারে, আর এইরূপ সঙ্গমের ফল স্বরূপ যে সন্তান সন্ততি হয়, তাহারাও প্রায় বংশবিস্তার করিতে পারে। একটী লক্কা পুরুষ ও লোটন স্ত্রীর সঙ্গম হইতে পারে এবং ইহাদের সন্তান সন্ততিও বংশ বিস্তারে সক্ষম; কিন্তু দুইটী ভিন্ন জাতির (Species এর) পুরুষ ও স্ত্রীর ফলদায়ক সঙ্গম হইতেও পারে কিম্বা নাও পারে, আর ওরূপ সঙ্গম হইলেও সেই সঙ্গমের ফল স্বরূপ সন্তান সন্ততি প্রায়ই বংশ বিস্তারে অল্পাধিক পরিমাণে অক্ষম। যেমন গোলা পায়রা ও ঘুঘুতে সঙ্গম না হওয়া সম্ভব। আর তাহা সম্ভব হইলেও তাহাদের সন্তান সন্ততি সম্ভবতঃ বংশ বিস্তারে অক্ষম। সেইরূপ গর্দ্দভ ও অশ্ব এই দুই বিভিন্ন জাতিতে সঙ্গম হইলেও ইহাদের সন্তান সন্ততি (mules) বংশ বিস্তারে অক্ষম।

আর এক কথা;—গোলা ও ঘুঘু এই দুইটী জাতি নিকট সম্বন্ধীয় বা নিকট সম্পর্কীয় জাতি, ইহারা এক পরিবারের (Family র) দুইটী জাতি। গোলা ও হংস এই দুইটী জাতি দূর সম্পর্কীয় জাতি—ইহারা দুই বিভিন্ন পরিবারের জাতি। গোলা ও ঘুঘুর মধ্যে যে বিভিন্নতা, গোলা ও হংসের মধ্যে বিভিন্নতা তদপেক্ষা অধিক।

যে সন্তান সন্ততি হয়, তাহারাও আপনাদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সন্তানোৎপাদনে সক্ষম হয় কেন, আর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা উদ্ভূত গোলা ও ঘুঘু, এই দুই জাতির (সম্ভবতঃ) সংযোগ হয় না কেন, আর সংযোগ হইলেও তার ফল স্বরূপ যে সন্তান সন্ততি হইবে, তাহারা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সন্তানোৎপাদনে (সম্ভবতঃ) অক্ষম কেন? তবেই তোমার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। তাহা হইতেই মনে হয়, যদি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিয়া কোন প্রণালী থাকে, তাহা ঠিক্ মানব নির্ব্বাচনের ন্যায় কার্য্য করে না। একই ভাবে কার্য্য করিলে ফলে তফাৎ হইবে কেন?”

অপত্তিটীতে একটু যুক্তি থাকিলেও যিনি বিষয়টী ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবেন, তিনি কখনও ইহাকে একটী সাংঘাতিক আপত্তি মনে করিবেন না। প্রথমতঃ সুবিজ্ঞ পাঠক আপনা আপনিই বলিবেন যে, মানব-নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন একই প্রণালীতে কার্য্য করে বটে, কিন্তু প্রথমতঃ উহারা ঠিক সমান সময় ব্যাপিয়া কার্য্য করে না, অর্থাৎ মানব-নির্ব্বাচন-লব্ধ একটী অন্তর্জ্জাতি অপেক্ষাকৃত অল্পকাল ব্যাপী কার্য্যের ফল, আর প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন-প্রসূত একটী জাতি অপেক্ষাকৃত বহুকাল ব্যাপী কার্য্যের ফল; দ্বিতীয়তঃ উহারা ঠিক এক প্রকার অবস্থার মধ্যে কার্য্য করে না, অর্থাৎ মানব নির্ব্বাচন গৃহ-পালিত জীব জন্তুর উপর কার্য্য করে, আর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বনে অথবা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে অবস্থিত জীব জন্তুর উপর কার্য্য করে; এরূপ স্থলে ফলে যে সামান্য এক বিষয়ে একটু তফাৎ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; বরং ফলে কিঞ্চিৎ তফাৎ না হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। পাঠক আপনাকে আপনার এ কেল্লা হইতে নড়ায় কার সাধ্য? সুবিজ্ঞ পাঠকের দ্বিতীয় আনুমানিক কারণটী যে পূর্ব্বোক্ত ফলের তফাতের আংশিক কারণ, তাহা আমরা পশ্চাতে দেখাইব। এখন তাঁর প্রথম আনুমানিক কারণটীও যে অযৌক্তিক নহে, তাহা দেখা যাউক। লক্কা ও লোটনে যে সম্বন্ধ, গোলা ও ঘুঘুতে ঠিক সেই সম্বন্ধ নয়। লক্কা ও লোটন দুইটী “অন্তর্জ্জাতি” আর গোলা ও ঘুঘু দুইটী “জাতি”। পুরুষ লক্কা ও স্ত্রী লোটনে সংযুক্ত হইয়া বংশবিস্তারক্ষম পুত্র কন্যা (Fertile offspring) উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া যে পুরুষ গোলা ও স্ত্রী ঘুঘু সেইরূপ করিতে পারিবে, তার কোন অর্থ নাই। একটী “অন্তর্জ্জাতি” অবশেষে একটী “জাতিতে” পরিণত হয় বটে, কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে সম্ভবতঃ বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ সহস্র বা ততোধিক বৎসর লাগে। এই সুদীর্ঘ কাল-স্রোতের সঙ্গে অন্তর্জ্জাতি যেমন ধীরে ধীরে জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে উক্ত অন্তর্জ্জাতির জননেন্দ্রিয়ও যে একটুও পরিবর্ত্তিত হইবে না, তা কে বলিতে পারে? বরং তাহা হওয়াই সম্ভব; কেন না, আমরা জানি যে, অবস্থান্তর দ্বারা জননেন্দ্রিয় অতি সহজে বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়। লক্কা ও লোটন অধিক দিন উদ্ভূত হয় নাই; কে বলিতে পারে কালে লক্কা ও লোটনের জননেন্দ্রিয় এরূপ বিভিন্ন হইবে না যে, তখন আর উহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া

বংশবিস্তারক্ষম পুত্র কন্যা উৎপাদনে সক্ষম থাকিবে না?

কেন দুইটী নিকট-সম্পর্কীয় বন্য জাতি অনেক স্থলে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বংশবিস্তারক্ষম সন্তান উৎপদনে অক্ষম, তাহা খুব সম্ভব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সাধিত হইয়াছিল। (এই প্রণালীটী আর উপরে যে প্রণালীর কথা বলিলাম, উহা প্রায় একই।) আকারগত, বিশেষতঃ বর্ণগত পার্থক্যের সহিত অনেক স্থলে ধাতুগত (Constitutional) পার্থক্য সংযুক্ত (Correlated)। এক জাতীয় শূকরের কতকগুলি শুভ্রবর্ণের আর কতকগুলি কৃষ্ণ বর্ণের। এরূপ দেখা যায় যে, যে গাছড়া খাইলে শুভ্র শূকর বংশ ধ্বংস হয়, সেই গাছড়া কৃষ্ণ শূকর খাইলে তার কিছুই হয় না; বর্ণের পার্থক্যের সহিত ধাতের পার্থক্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এখান কি সুন্দর রূপে প্রতিভাত! আরও একটী দৃষ্টান্ত দেখুন:— শাদা ঘোঁড়া যে চর্ম্ম রোগে আক্রান্ত হয়, অন্য রংএর ঘোঁড়া তদ্দারা আক্রান্ত হয় না। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এখন কথা হইতেছে, রংএর বিভিন্নতার সহিত যদি ধাতুগত বিভিন্নতা সংযুক্ত থাকিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত বর্ণগত বিভিন্নতার সহিত জননেন্দ্রিয়েরও অল্পাধিক বিভিন্নতা সংযুক্ত থাকিতে পারিবে না কেন? সংযুক্ত থাকাই সম্ভব। শুদ্ধ সম্ভব নহে। উদ্ভিজ্জগতে কোন কোন স্থলে এরূপ দেখাও যায়। এখন মনে করুন, একটী বৃহৎ অরণ্যে শাদা রংএর এক জাতীয় জীবের মধ্যে কতকগুলি কোন কারণে একটু কাল রংএর হইল, আর এই অল্প কৃষ্ণবর্ণের জীবগুলির এই কাল রং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বা অন্য কারণ দ্বারা বংশ-পরম্পরায় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ স্থলে প্রথমেই যেমন অল্প কাল রংএর কতকগুলি জীব আবির্ভূত হইল, অর্থাৎ কতকগুলি জীব মূল শুভ্র জীবগুলি হইতে বর্ণে একটু পৃথক হইল, তেমনি উহাদের জননেন্দ্রিয়ও মূল শুভ্র বংশের জননেন্দ্রিয় হইতে একটু পৃথক রকমের হইবে; কেন না, আমরা এই দেখিলাম, বর্ণগত পার্থক্যের সহিত জননেন্দ্রিয়গত পার্থক্য সংযুক্ত। আর উক্ত অল্প কৃষ্ণবর্ণের জীবগুলির অল্প কৃষ্ণবর্ণ যেমন বংশ-পরম্পরায় অধিকতর কৃষ্ণ হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে ইহাদের জননেন্দ্রিয় ও মূল শুভ্র বংশের জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে পার্থক্যও অধিকতর হইতে থাকিবে। এইরূপে বহু সহস্র বৎসর পরে নূতন একটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণের জাতি অভ্যুদিত হইবে; আর উক্ত জননেন্দ্রিয়গত পার্থক্যের নিমিত্ত এই নূতন কৃষ্ণ জাতি নিকট সম্বন্ধীয় উক্ত শুভ্র জাতির সহিত স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে সম্মিলিত হইয়া বংশবিস্তারক্ষম সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, গৃহপালিত বিভিন্ন বর্ণের দুইটী অন্তর্জ্জাতির মধ্যে উক্তরূপ অক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত হয় না কেন? হয় না কেন, তার নানা কারণ আছে। তার মধ্যে একটীতে কাহারও সন্দেহ নাই। সেটী এই যে, প্যালাসের সিদ্ধান্ত (Pallas' law) অনুসারে বহু কালব্যাপী গৃহ-পালন উক্ত অক্ষমতা দুরীভূত করে। আমরা এখানে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি ও প্রমাণ আছে। সে সব এখানে বিবৃত করা অসম্ভব। স্থানাভাবের নিমিত্ত আমরা তাহা পারিলাম না। যাহা বলা হইল, তাহা

হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, কোকিলেশ্বর বাবুর আপত্তিটী কাজের আপত্তি নয়। তৃতীয়তঃ ডারউইন তখনই কোকিলেশ্বর বাবুর ঐ আপত্তিটীর দন্তচূর্ণ করিয়াছেন, যখন উনি দেখাইয়াছেন যে, অনেক স্থলে গোলা ও ঘুঘু কিম্বা ঘোটক ও গর্দ্দভের ন্যায় দুইটী জাতি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বংশ বিস্তারক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। খরগোস্ ও র‍্যাবিট, ইহারা দুইটী জাতি, যেমন গোলা ও ঘুঘু, কিম্বা ঘোটক ও গর্দ্দভ। ঘোটক ও গর্দ্দভ বংশ-বিস্তারক্ষম সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, অর্থাৎ ঘোটকীর গর্ভে গর্দ্দভের ঔরসে যে অশ্বতর অশ্বতরী উৎপন্ন হয়, সেই অশ্বতর অশ্বতরী সংযুক্ত হইয়া সন্তান উৎপাদনে অক্ষম; কিন্তু খরগোস্ ও র‍্যাবিট পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বংশ-বিস্তারক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। এইরূপ চিলি প্রভৃতি দেশে ছাগ ও মেষের সংযোগে বংশ-বিস্তারক্ষম সন্তান সন্ততি উৎপাদিত হইতেছে। জান্তব জগতে এরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। উদ্ভিদ্ জগতে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। বাহুল্য ভয়ে, বিশেষতঃ স্থানাভাবে আমরা সে গুলির উল্লেখ করিলাম না। কেবল একটী মাত্র দৃষ্টান্ত আমরা এস্থলে দেখাইব। পেটুনিয়ার (এক প্রকার গাছ) ক-জাতি ও খ-জাতি দুইটী বিভিন্ন "জাতি"। উহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া অতি সহজে অশ্বতরবৎ এক সঙ্কর জাতি উৎপাদন করে। এই সঙ্কর জাতি যে কেবল বংশ-বিস্তারে সক্ষম, তাহা নহে, ইহা ক-জাতীয় কিম্বা খ-জাতীয় পেটুনিয়া অপেক্ষা অধিকতর বীজ প্রসব করে; অর্থাৎ উদ্ভিদ্ জগতের এই বিশেষ স্থলে যেন দেখা যাইতেছে যে, অশ্বতর, ঘোটক ও গর্দ্দভ হইতে অধিকতর জননশীল। তবেই সকল স্থলে ইহা বলা যায় না যে, অশ্ব ও গর্দ্দভের মত দুইটী জাতি বংশবিস্তারক্ষম সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। আবার অন্য দিকে দেখুন, লঙ্কা ও লোটনের ন্যায় দুইটী অন্তর্জাতি হইলেই যে তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বংশ বিস্তারক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হইবে, তাহাও নহে। ক-পিম্পারনেল্ ও খ পিম্পারনেল্, লঙ্কা ও লোটনের ন্যায় দুইটী অন্তর্জাতি; কিন্তু ইহাদের মধ্যে ফলদায়ক সংযোগ একবারেই সাধিত হয় না। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। অতএব বলিতে হইবে, অন্তত কোন কোন স্থলে মানব-নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনের ফলে তফাৎ নাই।

চতুর্থতঃ—ভবিষ্যতে যদি পরীক্ষা-লব্ধ প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে স্থিরীকৃত হয় (আজও যাহা হয় নাই) যে, কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহা সাধারণ নিয়ম যে, দুইটী নিকট সম্বন্ধীয়, জাতির ফলদায়ক সঙ্গম হয় না, আর তাহা হইলেও উহাদের সন্তান অশ্বতরের ন্যায় বংশবিস্তারে অক্ষম, যদি ইহাই শেষে স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলেও এ সাধারণ নিয়ম কিরূপে আসিল, তাহা বুঝিবার জন্য নৈসর্গিক কারণজালের বহির্দ্দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে অনেক জানিবার বুঝিবার আছে, এখনও এনেক পরীক্ষার (experiments এর) প্রয়োজন; তাহা হইলেও ডারউইন দেখাইয়াছেন জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন-অসহিষ্ণুতা sensitiveness) হইতে কিরূপে উক্ত সাধারণ নিয়ম আসিতে পারে। জননেন্দ্রিয় যে সাধারণতঃ অত্যন্ত পরিবর্ত্তন-অসহিষ্ণু (sensitive) অর্থাৎ এক টু অবস্থান্তরে পড়িলেই যে উহা আর

ঠিক পূর্ব্বের মত থাকে না এবং পূর্ব্বের মত কার্য্য করিতেও পারে না, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই বন্যহস্তী হস্তিনীকে তাহাদের স্বাভাবিক বন্য অবস্থা হইতে লোকালয়ে (তাহাদের নিজের দেশেই) আনিয়া রাখিলে তাহারা বংশ বিস্তারে অক্ষম হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের সহিত এ অক্ষমতার কোন সম্বন্ধ নাই—কেন না উক্ত হস্তী হস্তিনী লোকালয়ে সুস্থ ও সবল থাকে। মানসিক বিকারের সহিতও হস্তী দম্পতীর এ অক্ষমতার সম্বন্ধ নাই,—কেন না অনেক বন্য বৃক্ষকেও (যাদের সম্বন্ধে মানসিক বিকার কল্পনা করা অসম্ভব) লোকালয়ে আনিলে তাহাদের বীজ হয় না, যদিও এদিকে বেশ সুস্থ ও সবল থাকে। তবেই বলিতে হইবে, হস্তীর জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন অসহিষ্ণুতাই (seuaitireeness) উক্ত অক্ষমতার কারণ। এইরূপ একটী বন্যজাতি বনে সহস্র সহস্র বৎসর একই প্রকার অবস্থা নিচয়ের মধ্যে অবস্থিতি করায়, সেই জাতীয় জীবের জননেন্দ্রিয় যে বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন অসহিষ্ণু হইবে, তাহা বেশ বুঝা যায়।* এখন এই জাতিটীকে যখন এই জাতিটিকে যখন তুমি অপর জাতির সহিত স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে সংযুক্ত করিতে চেষ্টা কর, তখন তুমি যেন পূর্ব্বোক্ত জাতিটীকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে কেন উহার পরিবর্ত্তন অসহিষ্ণু জননেন্দ্রিয় অবস্থান্তরে পড়িয়া আর ঠিক পূর্ব্বের মত কার্য্য করিতে পারে না; কাজেই বংশ বিস্তারে অক্ষম হয়। অন্যদিকে সত্যবটে যে, আমাদিগকে বলিতে হইবে, কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম সত্ত্বেও ইহা সাধারণ নিয়ম যে, লক্কা ও লোটনের ন্যায় দুইটী অন্তর্জাতি (Varieties) পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বংশ বিস্তারে সক্ষম থাকে। কিন্তু এ সাধারণ নিয়মও কিরূপে আসিল, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথমতঃ লক্কা ও লোটন এই দুই অন্তর্জাতির পূর্ব্বপুরুষ গোলার (rock-pigeon এর) জননেন্দ্রিয় নিশ্চয়ই তেমন পরিবর্ত্তন-অসহিষ্ণু ছিল না, অর্থাৎ একটু অবস্থান্তরে পড়িলেই অমনি উহা বিগড়াইয়া যাইত না;—কেন না তাহা হইলে মানব গোলাকে প্রকৃত গৃহপালিত (domesticated and not simply confined) জীব করিতে পারিত না, অর্থাৎ লোকালয়ে আনিয়া তাহাকে বংশ-বিস্তারক্ষম রাখিতে পারিত না। গোলার জননেন্দ্রিয় যখন পরিবর্ত্তন-অসহিষ্ণু ছিল না, তখন তাহারই বংশোদ্ভূত লক্কা ও লোটনের জননেন্দ্রিয়ও পরিবর্ত্তন-অসহিষ্ণু না হইবারই কথা। মোটামুটী "বাপকো বেটা"ইত নিয়ম। লক্কা কিম্বা লোটনকে দেশ দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে, পারস্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষ হইতে ইংলাণ্ডে লইয়া গিয়াছে;

* মানুষ যেমন একই প্রকার অবস্থার মধ্যে বহুদিন থাকিলে পরিবর্ত্তন-অসহিষ্ণু হয়। এইরূপ মানুষকে চলিত কথায় "সুখী" বলে। সাধারণতঃ পয়সাওয়ালা সহরে ভদ্র লোকদের মধ্যে এইরূপ "সুখী" লোক দেখা যায়। ইহারা চিরকাল একই প্রকার সুপথ্য খাদ্য খাইয়াছেন, একই প্রকার (ভাল) জল পান করিয়াছেন; একই প্রকার বাটীতে বাস করিয়াছেন; ইহাঁদের সবই মোটের উপর এক ঘেয়ে রকমের। এখন এরূপ "সুখী" লোককে আপনি যদি অবস্থান্তরে ফেলেন, অর্থাৎ হটাৎ পাড়াগাঁয়ে লইয়া গিয়া মোটা, রাঙ্গা চালের ভাত, কলায়ের ডাল আর পাট শাক সিদ্ধ খাওয়ান, তাহা হইলে তাঁর পাকস্থলী নিশ্চয়ই পূর্ব্বের মত কার্য্য করিতে অস্বীকার করিবে।

নানাবিধ আব হাওয়ার মধ্যে ফেলিয়াছে; নানাবিধ খাদ্য খাওয়াইয়াছে; তথাপি লক্কা কিম্বা লোটনের জননশীলতা (fertility) অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, লক্কা বা লোটনের জননেন্দ্রিয় একটু অবস্থান্তরে পড়িলেই অমনি বিগড়াইয়া যায় না। তাই আমরা দুই দিক হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, লক্কা কিম্বা লোটনের জননেন্দ্রিয় পরিবর্ত্তন-অসহিষ্ণু নহে। কাজে কাজেই যখন লোটন-কপোতীকে লক্কা-কপোতের সহিত সংযুক্ত করা যায়, তখন উক্ত কপোত ও কপোতীকে একটু অবস্থান্তরে ফেলিলেও উহাদের জননেন্দ্রিয় বিগড়াইয়া যায় না, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ জননশীল থাকে। * সেই জন্যই এরূপ কপোত কপোতী—এরূপ দুই অন্তর্জাতি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বংশ-বিস্তারে সক্ষম। এই সক্ষমতার আরও একটী বিশিষ্ট কারণ আছে; সেটী আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্যালাস্ (Pallyas) দেখাইয়াছেন যে, দুইটী ভিন্ন অথচ নিকট সম্পর্কীয় বন্য জাতি,—যাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বংশবিস্তারে অক্ষম অর্থাৎ যাহাদের এক জাতির পুরুষ অপর জাতির স্ত্রীর সহিত সংযুক্ত হইয়া বংশ-বিস্তারে অক্ষম, তাহাদের এই অক্ষমতা বহুকালব্যাপী গৃহপালন (long continued domestication) দ্বারা বিদূরিত হয়। ইহাকেই প্যালাসের সিদ্ধান্ত (Pallas's doctrine) বলে। সেই জন্য যদি লক্কা ও লোটন গোড়া থেকেই দুই বিভিন্ন জাতি (species) ছিল, এরূপও মনে করা যায়, আর যদি ইহাও ধরা যায় যে, মানুষ উহাদিগকে গৃহ-পালিত করিবার পূর্ব্বে (বন্য) লক্কা কপোত (বন্য) লোটন কপোতীর সহিত সংযুক্তা হইয়া বংশ-বিস্তার করিতে অক্ষম ছিল, তাহা হইলেও উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা বলিতে হইবে যে, বহুকালব্যাপী গৃহপালন দ্বারা উক্ত অক্ষমতা বিদূরিত হইয়াছে। সেইজন্য আজ লক্কা কপোত ও লোটন কপোতী (বা লোটন কপোত ও লক্কা কপোতী) বংশ-বিস্তার-ক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। এইরূপে আমরা একদিকে বুঝিতে পারিতেছি, লক্কা ও লোটনের ন্যায় দুইটী অন্তর্জাতি কেন নানা কারণে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বংশ বিস্তার-ক্ষম সন্তান জননে সাধারণতঃ সক্ষম; আর অপরদিকে বুঝিতে পারিতেছি, কেন নানা কারণে দুইটী নিকট-সম্পর্কীয় ভিন্ন জাতি (যেমন গর্দ্দভ ও অশ্ব) ওরূপে বংশ-বিস্তারে সাধারণতঃ অক্ষম। এখানে আমরা এক একটী কার্য্যের দুই তিনটী করিয়া কারণ দেখাইলাম। দুই তিনটী কারণ সমবেত হইয়া একটী কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে; আবার কোন কোন স্থলে স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিয়া একই প্রকারের ফল উৎপাদন করিতে পারে।

আমরা নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা কোকিলেশ্বর বাবুর প্রথম আপত্তিটী খণ্ডন

* মনে করুন, একটী মানুষ দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন, নানাবিধ খাদ্য খাইয়াছেন, তাঁকে দারুণ রৌদ্র এবং দারুণ শীত সহ্য করিতে হইয়াছে; এইরূপ নানাবিধ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে; আর এরূপ করিয়াও তিনি সুস্থ সবল আছেন; এরূপ মানুষকে চলিত কথায় "শক্ত" বলে। ইনি যদি আবার এরূপ শক্ত পিতা মাতার পুত্র হন, তাহা হইলেত সোণায় সোহাগা। এরূপ "শক্ত" লোককে একটু অবস্থান্তরে ফেলিলে উহার পাকস্থালী কি অন্য কোন যন্ত্র সহজে বিগড়াইয়া যায় না।

করিলাম, আর আমরা বেশ শুনিতে পাই-তেছি, পাঠক মহাশয়ও বলিতেছেন;— "আমরাও অব্যাহতি পাইলাম।" বাস্তবিক বিষয়টী নিতান্তই দুর্বোধ্য। যাহা হউক, ফল কথা:—এ বিষয়টী সম্বন্ধে এখনও অনেক বিষয় জানিবার, বুঝিবার, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আছে; কিন্তু আপত্তিটী এরূপ নহে, যাহার নিমিত্ত কোন অলৌকিক শক্তি আহ্বান করিতে হইবে, অথবা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বাদ বা অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাস করিতে হইবে। আর হার্বার্ট স্পেন্সারের সহিত আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, গভীর ভাবে দেখিলে প্রতীত হইবে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদের বা অভিব্যক্তি-বাদের মূল প্রশ্ন হইতেছে, কোন একটী জাতি পঞ্চাশ সহস্র বৎসরেই হউক, আর লক্ষ বৎসরেই হউক, নৈসর্গিক কারণমালা দ্বারা কতকটা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কি না। কতক-গুলি জীব আর কতকগুলির সহিত পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া বংশবিস্তার করিতে পারে কি না—এ প্রশ্নের গুরুত্ব তত অধিক নহে, আর মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে এ প্রশ্নটী কতকটা অপ্রাসঙ্গিকও বটে।

কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর দ্বিতীয় আপ-ত্তিটী নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন; "কোন কোন অসভ্য বর্ব্বর জাতিতে এরূপ কোন হাড় বা পেশী আদি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা উঁহাদের কোন প্রকার প্রয়োজন বা ব্যব-হারে আইসে না। সুতরাং উহারা যে প্রাকৃতিক অনুকূলতায় (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা) স্থায়ী জীবে পরিণত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না।" আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে,এইরূপ লেখা হইতে কেবল একটী স্থির সিদ্ধান্ত হয়। সেটী এই যে, এরূপ বিষয়ে লেখকের নিজের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট, অপরিষ্কার এবং নিতান্ত কুজ্ঝটিকা-পূর্ণ। এখানে কোকিলেশ্বর বাবুর মনে তিন চারিটী সত্য মিথ্যা ধারণার খিচুড়ী হই-য়াছে। উপরের উদ্ধৃতাংশ পড়িলেই প্রথমে এই প্রশ্ন উঠিবে যে, "কোন্ কোন্ অসভ্য বর্ব্বর জাতিতে" কিরূপ হাড় বা পেশী আছে, যাহা সভ্য জাতিতে নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এরূপ "হাড় বা পেশী" ত কিছু দেখিতে পাইলাম না। দ্বিতীয়তঃ যদিও সমস্ত মনুষ্য জাতিতে এরূপ হাড় বা পেশী আছে, যাহাদের কোন ব্যবহার নাই (যেমন মানুষের অতি ক্ষুদ্র চর্ম্মের নীচে লুক্কায়িত, লুপ্ত-প্রায় লেজ অর্থাৎ ঐ লেজের হাড় ও পেশী), তথাপি সে গুলিকে কেহ প্রাকৃ-তিক নির্ব্বাচনবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি স্বরূপ খাড়া করিতে পারেন না। 'খাড়া করিতে পারেন না;—কেন না, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বাদ বলে না। যে উক্ত নির্ব্বাচন কোন অকেজো হাড়, পেশী বা এরূপ অন্য কোন লক্ষণকে (useless charactersকে) উদ্ভূত করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কেবল প্রয়োজনীয় কোন ক্ষুদ্র বৈলক্ষণ্যকে (varia-tionকে,) ক্রমে ক্রমে বংশ-পরম্পরায় সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন করিতে করিতে অবশেষে জাতিবাচক লক্ষণে পরিণত করিতে পারে। অকেজো অপ্রয়োজনীয় বৈলক্ষণ্যের উপর ইহার কোন হাত নাই।

এখন এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "জীব-রাজ্যে মানুষের বিলুপ্তপ্রায় লেজের মত অকেজো গঠন বা লক্ষণ অনেক আছে। যদি প্রকৃতিক নির্ব্বাচন সে গুলি উদ্ভূত করিতে

না পারিল, তবে ইহারা কিরূপে কোথা হইতে আসিল?" প্রশ্নটী সঙ্গত প্রশ্ন। আমরা এক্ষণে অতি সংক্ষেপে ইহার উত্তর দিব। উক্ত লেজের দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমরা আমাদের উত্তরটীকে বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। অভিব্যক্তিরবাদ বলেন যে, ঘোর অতীত কালে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ হনুমানের মত লাঙ্গুলধারী ছিল। লাঙ্গুল অবশ্য একটী খুব উপকারী যন্ত্র। সুদূর অতীতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও উহার দ্বারা উপকৃত হইতেন। মানুষের যেরূপ গঠন ও অবস্থা, তাহাতে লাঙ্গুলের প্রয়োজন নাই; কাজেই পূর্ব্বপুরুষের বৃহৎ লাঙ্গুলটী অব্যবহার (disuse) ইত্যাদি কারণ দ্বারা ক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এখন কেবল একটু চিহ্নস্বরূপ অতীত লাঙ্গুলের দুই এক খানি অতি ক্ষুদ্র হাড় ও পেশী মাত্র অবশিষ্ট আছে। (পূর্ব্বপুরুষের কেজো বড় লাঙ্গুল অবশ্য আরও ঘোর অতীতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদ্ভূত হইয়াছিল)। অভিব্যক্তি-বাদ ভিন্ন অন্য কোন্ বাদ বা মত এই অতীতের সাক্ষী-স্বরূপ মানুষের বিলুপ্তপ্রায় লেজের মত গঠনগুলির সৎ ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা (explanation) দিতে পারে?

এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে—"এই অতীত সাক্ষী স্বরূপ মানুষের বিলুপ্তপ্রায় লেজের মত অকেজো গঠনগুলি ভিন্ন আরও ত অনেক অকেজো গঠন বা লক্ষণ (এমন কি অনেক জাতিবাচক লক্ষণ; দেখা যায়, যাহাদের শুদ্ধ বর্ত্তমানে কেন, সুদূর অতীতেও কোন উপকারিত্ব বা ব্যবহার সম্ভবতঃ ছিল না। উক্ত লেজের মত গঠনগুলির যদিও আজই কোন ব্যবহার নাই, তথাপি ঘোর অতীতে তাহাদের ব্যবহার ছিল বুঝিলাম; কিন্তু ঐ শেষোক্ত গঠনগুলির কথা বলিলাম, তাদের ত কোন কালে কোন ব্যবহার অনুমান করা যায় না;—তাহারা কিরূপে কোথা হইতে আসিল?" এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই। সাধারণতঃ কোন জন্তু বা উদ্ভিদের চাল চোল, ধরণ ধারণ, তার অবস্থা, নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জীব জন্তু, বৃক্ষ লতার সহিত তার কি সম্বন্ধ,—এ সকল বিষয়ে আমরা এত অজ্ঞ যে, উক্ত জন্তু বা বৃক্ষের কোন লক্ষণকে আপাততঃ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক যে তাহা অপ্রয়োজনীয়, তাহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। জীবনবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে আমরা নিত্য দেখিতেছি যে, কা'ল যে অতি সামান্য গঠন বা লক্ষণের প্রয়োজন স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারি নাই, আজ তার অতি অদ্ভুত, অতি বিস্ময়কর প্রয়োজন আবিষ্কৃত হইল। একটী ফুলের পাঁচটী পাপড়ির মধ্যে একটী পাপড়ির উপর কতক শুঁয়োর (hairs) বা দাগের (marks) যে কি ব্যবহার হইতে পারে, কাল তাহা কল্পনাতেও ভাবিতে পারি নাই, আজ বিজ্ঞান দেখাইলেন, সে গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় লক্ষণ। এইরূপ এ ফুলটী এ প্রকাণ্ডে ঝুলিতেছে কেন; এটী এ প্রকারে ফুটিল কেন, এ ফুলটীর এ বর্ণ হইল কেন; ও ফুলটীর এ পাপড়িটী এ দিকে কেন; ফুলের এ অঙ্গটী দুই ইঞ্চি দীর্ঘ কেন,—আড়াই ইঞ্চি হইল না কেন; এ ফলটীর এরূপ আকার কেন; এ ফলটীর এরূপ রং কেন; ও ফলটীর গায়ে কাঁটা কেন; এ

প্রজাপতিটী এ বর্ণের কেন; এ প্রজাপতিটীর ডানার উপরে এ দাগটী কেন; ও জীবটীর লেজের গোড়ার নীচের দিকটী শাদা কেন;—ইত্যাদি শত শত সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষণ, যাহাদের প্রয়োজনীয়তা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় বৈজ্ঞানিক স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই, আজ তাহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া সকলে বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইতেছেন। (পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত গুলি কল্পনা-প্রসূত নয়; এ গুলি সবই স্বভাবে দেখা যায়)। এরূপ স্থলে কোন একটী লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আজ দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া তাহাকে বাস্তবিক অপ্রয়োজনীয় বা অকেজো লক্ষণ মনে করা কতদূর সঙ্গত, তাহা বিজ্ঞ পাঠক আপনিই বিবেচনা করুন। যাহা হউক, আমাদের এই অজ্ঞতার জন্য কতকগুলি অকেজো (আমরা আজ যাহাদের 'অকেজো' মনে করি) লক্ষণ বাদ দিলেও সম্ভবতঃ কতকগুলি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই অবশিষ্ট অকেজো লক্ষণগুলি কোথা হইতে কিরূপে আসিল ?

এগুলির মধ্যে কতকগুলি (যেমন ময়ূরের সুন্দর পুচ্ছ—এগুলিকে অবশ্য সম্পূর্ণরূপে একবারে অকেজো ঠিক্ বলা যায় না) সম্ভবতঃ দম্পতী-নির্ব্বাচন (Sexual selection) দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতীতকালে যে ময়ূরের ক্ষুদ্র পুচ্ছটী একটু অধিক শোভাজনক, সেই ময়ূরটীই ময়ূরীকে মোহিত করিয়া তাহাকে লাভ করিতে পারিত; সেই ময়ূরটীই সন্তান-সন্ততি রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইতে পারিত। বংশ পরম্পরায় পুচ্ছ অতি অল্প শোভন অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে শোভনতর হইয়া শেষে এরূপ সুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে।

আর কতকগুলি অকেজো লক্ষণ সম্ভবতঃ নিম্নলিখিতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। জীবরাজ্যে একটী নিয়ম আছে যে, কোন জীবের কোন একটী অঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইলে তার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটী বা ততোধিক অঙ্গ অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন পায়রার ঠোঁটটী লম্বা হইলে, তার সঙ্গে পায়ের অঙ্গুলি লম্বা হয়। এখন মনে করুন, কতকগুলি পায়রা এমন অবস্থায় পড়িল যে, তাদের মধ্যে যাদের ঠোঁট অপেক্ষাকৃত বড়, তারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া অধিকতর সন্তান-সন্ততি রাখিয়া যাইতে পারে। উক্তরূপ অবস্থার মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় অঙ্গুলির কোন বিশেষ আদর নাই। এরূপ স্থলে প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন ধীরে ধীরে বড় ঠোঁটওয়ালা এক নূতন পারাবত জাতি উদ্ভূত করিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে এই জাতিটীর বড় ঠোঁটের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের অঙ্গুলিগুলিও বড় বড় হইবে। এস্থলে বড় অঙ্গুলি এই যে লক্ষণটী, এটী অকেজো লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইবে; অর্থাৎ অঙ্গুলির কাজ আছে বটে—সব জাতির পায়রারই অঙ্গুলির প্রয়োজনীয়তা আছে;—কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোক্ত বড় ঠোঁটওয়ালা জাতিটীর পায়ের অঙ্গুলির এই যে অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য, ইহার ত কোন প্রয়োজন নাই। এখন মনে করুন, কোন প্রভু, যিনি জীব জগতে জাতি (Species) নিরূপণ করাকেই মস্ত কাজ মনে করেন; জিনি "জাত" "জাতি" করিয়াই অস্থির, এইরূপ কোন প্রভু পায়রাদিগের জাতি নির্দ্ধারণ করিতে বসিলেন। এঁর হয় ত জানিবার উপায়

নাই, বড় ঠোঁট একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় লক্ষণ, না বড় অঙ্গুলি। ইনি সহজে মনে করিতে পারেন, বড় অঙ্গুলিই অধিকতর প্রয়োজনীয় লক্ষণ। ইনি আমাদের পূর্ব্বোক্ত (বড় ঠোঁটওয়ালা) পায়রাগুলিকে 'বৃহদাঙ্গুলি' পারাবত জাতি নাম দিয়া এক জাতি ঠিক্ করিলেন। এঁর নিকট বৃহৎ অঙ্গুলি একটী জাতিবাচক লক্ষণ (Specific character) হইল। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এ লক্ষণের অর্থাৎ উক্ত পারাবতগুলির অঙ্গুলির অতিরিক্ত দৈর্ঘের বাস্তবিক কোন প্রয়োজন ছিল না এবং নাই। এক্ষণে আমরা শুধু যে দেখিলাম, কিরূপে একটী অকেজো লক্ষণ আবির্ভূত হইতে পারে, তাহা নহে; কিরূপে একটী অকেজো জাতিবাচক লক্ষণ উদ্ভূত হইতে পারে, তাহাও দেখিলাম।

কোন বিশেষ অবস্থা (environment) এক জাতীয় কতকগুলি জীবের উপর স্থায়ী রূপে কার্য্য করিয়া উহাদের সকলের মধ্যে একটী বিশেষ নূতন লক্ষণ আবির্ভূত করিতে পারে—আর ঐ লক্ষণটী অকেজোও হইতে পারে।

এরূপ আরও কয়েকটী কারণ আমরা দেখাইতে পারি, যাহা দ্বারা বুঝা যায় অকেজো লক্ষণ জীবরাজ্যে কোথা হইতে কিরূপে আসিল। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট বলিয়াছি। বিজ্ঞ পাঠক ইহা হইতেই ঠিক করিবেন যে, কোকিলেশ্বর বাবুর দ্বিতীয় আপত্তিটী কাজের আপত্তি নয়।

কোকিলেশ্বর বাবুর তৃতীয় আপত্তি এই,—"একই দম্পতীর পাঁচটী সন্তানের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দুইটী মাত্র সন্তানের কেন এরূপ অঙ্গবৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল, বিবর্ত্তবাদ এ কথার উত্তর দিতে কিছুতেই সক্ষম নহে।" আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, কোকিলেশ্বর বাবু এ আপত্তিটী বুঝিয়াছেন। আপত্তিটী, কিন্তু নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ইহা দেখাইবার পূর্ব্বে আপত্তিটীকে আরও বিশদ করা আবশ্যক।* পাঠক এখানে স্মরণ রাখিবেন, আপত্তিটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হইয়াছে ও হইতে পারে। মনে করুন, একটী ব্যাঘ্র দম্পতীর পাঁচটী সন্তান। একটীর পা গুলি আর চারিটীর পা গুলি অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ। একটীর চর্ম্মের উপরিস্থ ডোরাগুলি (stripes) অন্য চারিটীর ডোরার অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। একটী সন্তান সরু আর একটী অপেক্ষাকৃত মোটা। একটীর কাণ অপর চারিটীর এবং পিতা মাতার কাণ অপেক্ষা ছোট। ইত্যাদি। এই যে সব বিভিন্নতা বা বৈলক্ষণ্য, ইহাদিগকেই ব্যক্তিগত বিভিন্নতা বা বৈলক্ষণ্য (individual variations or dfferences) বলে। এইরূপ সব বৈলক্ষণ্যের মধ্যে আবার যে গুলি অবস্থার বৈচিত্রের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তাহারাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আদি মাল মসালা (raw materials)। এইরূপ প্রয়োজনীয় বৈলক্ষণ্য না থাকিলে প্রাকৃতিক

---

* আজ প্রায় ১৭ বৎসর হইল ডিউক্ অব আর্গাইল (Duke of Argyll) বিলাতের কোন সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে (Nineteenth Century) ই, হউক বা Contemporary Review ই হউক) এই আপত্তিটী প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে তুলিয়াছিলেন। আমরা বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "নেচারে (Nature এ) তাহার উত্তর দিই। পরে শুনিয়াছিলাম, উত্তরে অনেক বিজ্ঞান-সেবী প্রীত হইয়াছিলেন।

নির্ব্বাচন কিছুই করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মনে করুন। এক দেশে দুই সহস্র ব্যাঘ্র বাস করে। কোন কারণে ইহাদের খাদ্যের বড় টানাটানি পড়িয়া গেল; হরিণ ভিন্ন অন্য খাদ্য নাই। সুতরাং উক্ত ব্যাঘ্র মহাশয়দিগের মধ্যে যাহাদিগের পা গুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, তাহারাই অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রুতগামী হইবে; আর ইহারাই হরিণ শীকার করিয়া খাদ্য পাইয়া জীবিত থাকিবে ও বংশবিস্তার করিবে। যে সকল ব্যাঘ্রের পা ছোট, তাহারা তত দ্রুতগামী হইবে না, আর তেমন শীকার করিতে পারিবে না; যথেষ্ট খাদ্যের অভাবে তারা মরিয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পদ বিশিষ্ট ব্যাঘ্রগুলির সন্তানের পা স্বভাবতঃ মোটের উপর প্রথম বংশের দুই সহস্র ব্যাঘ্রের পা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। এখন আবার এই সন্তানদিগের মধ্যে নির্ব্বাচন (selection) চলিবে; অর্থাৎ ইহাদিগের মধ্যে যাহাদের পা অপেক্ষাকৃত অধিকতর দীর্ঘ, তাহারাই জীবিত থাকিবে ও বংশবিস্তার করিতে পারিবে। তৃতীয় বংশের সন্তানদিগের পা দ্বিতীয় বংশের সন্তানদিগের পা অপেক্ষা কাজে কাজেই মোটের উপর অধিকতর দীর্ঘ হইবে। এইরূপে বংশপরম্পরায় পা দীর্ঘতর হইতে থাকিবে। অবশেষে শত সহস্র বংশের পর দেখা যাইবে যে, উক্ত দেশের ব্যাঘ্রগুলির পা প্রথম দুই সহস্র ব্যাঘ্রের পা অপেক্ষা বিলক্ষণ দীর্ঘ হইয়াছে। তখন উক্ত ব্যাঘ্র মহাশয়েরা "দীর্ঘ-পাদ" নামক এক স্বতন্ত্র জাতির ব্যাঘ্র হইলেন। এখন আপত্তিকারী বলিবেন "বুঝিলাম, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যরূপ মাল মসলা লইয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কিরূপে ধীরে ধীরে বংশের পর বংশ উক্ত বৈলক্ষণ্যকে পুঞ্জীভূত অর্থাৎ সম্বর্দ্ধিত করিয়া উহাকে অবশেষে এক জাতি বাচক লক্ষণে পরিণত করিতে পারে, —একটী স্বতন্ত্র জাতি উদ্ভূত করে। কিন্তু ঐ যে ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য গুলি, যা তোমার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আদি মাল মসলা, তাহারা কোথা হইতে কিরূপে আসিল? তোমার বিবর্ত্তবাদ একথার উত্তর দিতে কিছুতেই সক্ষম নহে।"

যদি একটু ভাবিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে কোকিলেশ্বর বাবু এ আপত্তিটী কখনও উত্থাপিত করিতেন না। একই মা বাপের পাঁচটী সন্তান পাঁচ রকম কেন হয়, তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। আর ইহাও আদৌ সত্য নহে, "যে বিবর্ত্তবাদ একথার উত্তর দিতে কিছুতেই সক্ষম নহে।" আধুনিক বিজ্ঞানের যে সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধান্ত —যে একটু তিল মাত্র শক্তির সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই—সেই সিদ্ধান্ত (The principle of conservation of energy) হইতেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে পূর্ব্বোক্ত রূপ বৈলক্ষণ্য হইতেই হইবে। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যের (every individual variation এর) কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না বটে—, ব্যাপারটী এত জটিল যে বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অসম্ভব—কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখাইতে পারি যে, উক্তরূপ বৈলক্ষণ্য না আসিয়া থাকিতে পারে না; আর অনেক স্থলে প্রত্যেক বিশেষ বৈলক্ষণ্যেরও কারণ দেখান যাইতে পারে। ডারউইন নিজে প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; ব্যক্তিগত

বৈলক্ষণ্যের কারণ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, সব ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যই নৈসর্গিক কারণের ফল, আর তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, উক্ত সকল বৈলক্ষণ্যই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ফল *। যাহা হউক, আজ আমরা ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যের কারণ সম্বন্ধে তত অজ্ঞ নই, যত কোকিলেশ্বর বাবু মনে করেন। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলেই উনি বুঝিতে পারিবেন, ওঁর আপত্তিটী কত অকিঞ্চিৎকর। প্রথমে আমরা একটী সহজ দৃষ্টান্ত দেখাইব। পাঠক মহাশয় একটী পাকা পেঁপে বাজার হইতে ক্রয় করুন। খুব সম্ভব দেখিবেন, (আমরা যেমন সেদিন দেখিলাম) যে পেঁপেটীর যে দিকটী সূর্য্যের দিকে ছিল এবং তজ্জন্য সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক অধিক পরিমাণে পাইয়াছিল, সেই দিকটী অপেক্ষাকৃত অধিক পীত বর্ণের, অধিকতর পক্ব; আর যে দিকটী গাছের দিকে ছিল, সে দিকটী তত পীতও নহে, আর ঠিক তত পক্বও নহে। পেঁপেটী দুইভাগে বিভক্ত করুন, দেখিবেন যে যে দিকটীতে সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক অপেক্ষাকৃত অধিক পড়িয়াছিল, সেই দিকের বীজগুলি গাছের দিকের বীজ হইতে আকারে বড় আর অপেক্ষাকৃত অধিক কৃষ্ণ বর্ণের। এখন উক্ত দুই দিক হইতে দুইটী বীজ লউন। এ দুটী বীজ আমরা দেখিলাম, সর্ব্বতোভাবে সমান নয়। ইহারা আকারে, ওজনে, বর্ণে বিভিন্ন। শুধু তাহাই নহে। যে পরাগ-রেণু (Pollen grain) একটীকে উর্ব্বরীকৃত (fertilized) করিয়াছে, আর যেটী অন্য বীজটীকে উর্ব্বরীকৃত করিয়াছে, এ দুটী রেণু ওজনে আকারে অবিকল এক রকম ছিল না; এই কারণ হইতেও উক্ত বীজ দুইটীর মধ্যে একটু বিভিন্নতা আসিবে। পরে যদি এই বিভিন্ন দুইটী বীজ অবিকল একই প্রকারের অবস্থার মধ্যে পড়িত, তাহা হইলেও ওরূপ দুইটী বিভিন্ন বীজ হইতে অবিকল একই প্রকারের দুইটী পেঁপে গাছ হইত না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধান্ত—শক্তি সংস্থিতির নিয়ম, মিথ্যা হইত। কিন্তু ঐ দুইটী বীজ পরে অবিকল একই প্রকার অবস্থার মধ্যে নাও পড়িতে পারে। মনে করুন, উহাদের একই উদ্যানে ছড়াইয়া দিলাম। বড় বীজটী উদ্যানের এরূপ একটী অংশে পড়িল, যেখানে পূর্ব্বে কলাই শুঁটীর চাস করা হইয়াছিল; আর ছোটটী এরূপ অংশে পড়িল, যেখানকার মাটীতে বালির ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক। আজকাল সকলেই জানেন যে, যে মাটীতে কলাই শুঁটীর চাস করা যায়, সেই মাটীতে যবক্ষারজানের (Nitrogen এর) ভাগ বাড়ে। বড় বীজটী এমন স্থানে পড়িল, যেখানে যবক্ষারজানের ভাগ অধিক। যদি অন্য বাধা না থাকে, তাহা হইলে কি এ কারণটীর কার্য্য হইবে না? অবশ্য হইবে। বড় বীজটী যথেষ্ট যবক্ষারজান পাইয়া অপেক্ষাকৃত সতেজ ও সবল গাছ উদ্ভূত করিবে—ইহার গুঁড়ী ও পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা ও বড় হইবে। শুদ্ধ তাহাই নহে। যেখানে বড় বীজ পড়িয়াছিল, মনে করুন, সে স্থানটী অপেক্ষাকৃত খোলা, ফাঁকা,

* "Variations all kinds and degrees are directly or indirectly caused by the conditions of life to which each being or more specially its ancestors have been exposed."
Animals and Plants Vol. II. p. 240.

সেখানে রোদ বেশ আসে; আর যেখানে ছোট বীজটী পড়িয়াছিল, সেখানে অন্যান্য বড় গাছ আছে, সুতরাং রোদ বেশী আসে না। এ কারণটীরও কার্য্য অবশ্য হইবে। বড় বীজটী হইতে যে গাছটী হইয়াছে, সে গাছটীর পাতার বর্ণ সুন্দর হরিৎ বর্ণ হইবে; আর ছোট বীজটী হইতে যে গাছটী হইয়াছে, সেটী আওতায় হওয়াতে তার পাতার রং অপেক্ষাকৃত অল্প হরিৎ বর্ণ হইবে। ইহাই যথেষ্ট নহে। মনে করুন, বড় বীজটী যেখানে পড়িয়াছিল, উদ্যানের সে অংশের মাটী অপেক্ষাকৃত অধিক ভিজে, আর ছোট বীজটী যেখানে পড়িয়াছিল, সে অংশের মাটী অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। ইহারও ফলে বড় বীজটী হইতে যে গাছটী হইয়াছে, সেটী অপেক্ষাকৃত অধিক সতেজ হইবে। এখনও যথেষ্ট হইল না। ছোট বীজ হইতে যে গাছটী হইল, তার চারিদিকে এরূপ সব গাছ থাকিতে পারে, যারা, পেঁপে গাছটী মাটীর যে উপাদানটী অধিক চায়, সেইটীই অধিক চায়। বড় বীজ হইতে উদ্ভূত গাছটীর চারিদিকে এরূপ অন্যান্য গাছ নাই। এই কারণের ফলেও একটী বৈলক্ষণ্য জন্মিবে। তারপর বড় পেঁপে গাছটী খুব সতেজ সবল হইয়া অনেক বড় বড় বড় পাতা উৎপাদন করাতে এ গাছটী ছোট গাছটীর মত ফলন্ত হইল না। এখন দেখা যাইতেছে, উক্ত দুইটী পেঁপে গাছের মধ্যে একটীর গুঁড়ী দীর্ঘতর ও স্থূলতর; ইহার পাতাগুলিও অপেক্ষাকৃত বড় ও মোটা; ইহার পাতার সংখ্যাও অন্যটীর পাতার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক; ইহার পাতাগুলির রংও অন্য গাছটীর পাতার রং হইতে অধিকতর হরিৎ বর্ণের; আর এ গাছটী অন্য গাছটী অপেক্ষা কম ফলন্ত। অথচ যে দুইটী বীজ হইতে এই দুইটী গাছ উৎপন্ন হইয়াছে, সে দুইটী বীজ একই পেঁপের বীজ এবং তাহাদিগকে একই উদ্যানে ছড়ান হইয়াছিল। পাঠক এখানে মনে করিবেন না যে, অবস্থা-নিচয়ের এরূপ সংযোগ হওয়া অসম্ভব, যার দ্বারা বড় বীজটী উদ্যানের সেই অংশেই পড়িবে—যেখানে পূর্ব্বে কলাই শুঁটীর চাষ করা হইয়াছিল, আর ছোট বীজটী সেই অংশে পড়িবে—যেখানে বালির ভাগ অধিক। আমাদের পূর্ব্বোক্ত পেঁপেটীর ছোট বড় দুই শত বীজ একত্রে মিশাইয়া চোখ বুজিয়া বাগানের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলে একটী বড় বীজ যে পূর্ব্বোক্ত অধিকতর উর্ব্বর অংশে পড়িবে এবং একটী ছোট বীজ যে উক্ত বেলে অংশে পড়িবে,—ইহা অসম্ভব নহে।

জন্তু জগৎ হইতে আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। এটী জটিলতর। এটীকে কোকিলেশ্বর বাবুর নিজের দৃষ্টান্ত বলিলেই হয়। বলরাম আর হরিদাসীর পাঁচটী পুত্র রাম, শ্যাম, হরি, কেদার, চণ্ডী। পুত্র কটী আজ সকলেই বয়স্ক। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই পাঁচটীর কোনটীই অবিকল অপর একটীর মত নয়, এবিভিন্নতার কারণ কি? কারণ আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি। রাম যখন ভূমিষ্ট হইয়াছিল তখন পিতা বলরামের বয়স ১৪ বৎসর, মাতা হরিদাসীর বয়স ১২ বৎসর। এরূপ অল্প বয়সের সন্তান বলিয়া রাম অতি দুর্ব্বল হইয়া জন্মিয়াছিল; ইহার মাথা, হাত, পা ছোট ও শীর্ণ। পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আছে যে, অতি অল্প বয়সের সন্তান দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ হয়। লোকের সাধারণ ধারণাও ঐরূপ। রাম ও শ্যামের

জন্মের মধ্যে বলরামের আর দুইটী সন্তান হইয়াছিল, তারা শৈশব অবস্থায় মারা যায়। শ্যাম যখন জন্মে, তখন পিতার বয়স ২৮ আর মাতার বয়স ২৬। মাতার বয়স যখন ২০, তখন হইতে তিনি একটী রোগে ভুগিতেছিলেন। পিতার পরিপক্ক বয়সের সন্তান বলিয়া শ্যাম অনেকটা পিতার মত। পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আছে, অন্য কোন কারণ বা বাধা না থাকিলে পিতার পরিপক্ক বয়সের সন্তান অনেকটা পিতার মত হয়। সাধারণতঃ ঋতুকালের ঠিক যে সময়ে গর্ভাধান হয়, হরিদাসীর তার দুই এক দিন পরে (হরির বেলা) গর্ভাধান হওয়াতে হরি অন্য সব ছেলে অপেক্ষা অধিকতর মা'র মত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধেও পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আছে; সন্তান আকার প্রকারে পিতার মত হইবে, কি মাতার মত হইবে, কি দুইএর মাঝামাঝি হইবে, তাহা ডিম্ব-কোষাণু (egg-cell) ঠিক কোন্ সময়ে উর্ব্বরীকৃত (fertilized) হয়, তার উপর নির্ভর করে। কেদার যখন জন্মে, তখন পিতার বয়স ৩১, মাতার বয়স ২৯; তখন বলরামের কাজকর্ম্ম খুব ভাল চলিতেছিল; ভাল খাওয়ায়, ভাল হাওয়ায়, ভাল অবস্থায় থাকায় বলরাম ও হরিদাসীর স্বাস্থ্য তখন খুব ভাল ছিল। কেদারও খুব সুস্থ ও সবল অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। আর যে গর্ভাধানের (fertilization এর) ফল কেদার, সেই গর্ভাধান নিয়মিত সময়ে হওয়াতে কেদার আকার প্রকারে পিতা মাতার মাঝামাঝি হইয়াছিল। কেদার জন্মিবার পর হরিদাসী আবার যখন সসত্ত্বা হইলেন, তখন বলরাম উপদংশ রোগগ্রস্ত (syphilitic) ছিলেন; কাজেই চণ্ডীর নাসিকার গোড়াটী চাপা হইয়াছিল, আর তার উপর-পাটীর সম্মুখের দুইটী দন্তের ধার (edge) অর্দ্ধচন্দ্রের মত (crescentic) অর্থাৎ একটী বৃত্তের অংশের মত হইয়াছিল। (এই নাকের ও দাঁতের বিভিন্নতার কারণটীও আমার কল্পিত কারণ নহে; ইহা চিকিৎসা-শাস্ত্রের এক স্থির সিদ্ধান্ত।) তারপর ভূমিষ্ঠ হইবার পরও পাঁচটী পুত্র কিছু আর অবিকল একই প্রকার অবস্থার মধ্যে পড়ে নাই। এখানে সুবিজ্ঞ পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এরূপ স্থলে একটী সামান্য কারণের ফল কতদূর যায়। একটী চোখরাঙ্গানিতে একটী ছেলের ভবিষ্য-জীবনের গতি নির্ণীত হইয়া যায়। বাল্যকালে মাতার একটী কথার দরুণ একটী ছেলের হয় ত ডাক্তারি শিখিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইতে পারে। আর্কোলার (Arcolar) যুদ্ধে একটী সেনার বন্দুকটী একটু অন্য প্রকারে ধৃত হইলে সমস্ত য়ুরোপের অবস্থা আজ অন্য প্রকার হইত। বন্দুকটী একটু অন্য প্রকারে ধৃত হইলে নেপোলিয়ন ঐ যুদ্ধে মরিয়া যাইতেন; আর নেপোলিয়ন্ ঐ সময়ে মরিলে য়ুরোপের অবস্থা যে অন্য প্রকার হইত, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। রাম ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুর্ব্বল; তার ব'সে ব'সে রাত দিন পড়াশুনা করাই জীবনের সুখ হইয়া দাঁড়াইল; সে ক্রমাগত চোখের কাছে বই ধরে ধরে আর অল্প আলোকে পড়াশুনা করিয়া নিকট-দৃষ্টিবান (short-sighted) হইয়া পড়িল। শ্যামের বিলাত যাবার ইচ্ছা হইল; তিনি চিরজীবন বিলাতেই বাস করিলেন। শীতপ্রধান দেশে বাস করাতে এঁর রং অন্য অন্য ভ্রাতার বর্ণের অপেক্ষা শুভ্রতর হইয়াছিল। হরি তার মাতামহের

বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, আর উক্ত মাতামহ একটী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। হরির ব্যবসা করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। হরি ব্যবসার্থে আফ্রিকাবাসী হওয়াতে তার চর্ম্মের বর্ণ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণ হইয়া পড়িল। কেদার ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকেই খুব হৃষ্টপুষ্ট। শৈশব অবস্থায় সকলেই তার সতেজ গঠনের প্রশংসা করিত। শরীরের দিকে তার খুব যত্ন। নানাবিধ ব্যায়ামে তার খুব রুচি। কেদার যৌবনে এক অত্যন্ত বলবান পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। চারিটী রাম একত্র করিলে তবে একটী কেদার হইত। চণ্ডী নানা অত্যাচারের নিমিত্ত, আর ভাল করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক না খাওয়া দাওয়ায় যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন; গঠনটীও যক্ষাগ্রস্তের মত খেঁকুরে গঠন হইল। বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুকালে সব ভ্রাতাই উপস্থিত। প্রিয় পাঠক, এখন একবার দেখুন, কোন ভাইটী কিরূপ। রাম ক্ষুদ্রকায়, তাঁর হাত পা গুলি ছোট ও শীর্ণ, আর ইনি নিকট-দৃষ্টিবান্। শ্যাম আকার প্রকারে অন্যান্য ভাই অপেক্ষা অধিকতর পিতার মত, আর বর্ণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শুভ্র। হরি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাতার মত, আর সর্ব্বাপেক্ষা কাল। কেদার আকার প্রকারে মা বাপের মাঝামাঝি আর সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। চণ্ডীর নাকের গোড়াটী চাপা; তার সম্মুখের দুইটী দাঁতের ধার বৃত্তের অংশের মত; আর গঠনটী খেঁকুরে। এখন বোধ হয়, কোকিলেশ্বর বাবু বুঝিলেন, এক মা বাপের পাঁচটী ছেলে কেন পাঁচ রকমের হয়; আর দেখিবেন, তাঁর আপত্তিটী কত অকিঞ্চিৎকর। আমরা আরও সূক্ষ্মত্বে যাইতে পারিতাম। দেখাইতে পারিতাম, কিরূপে লৈঙ্গিক জনন (sexual reproduction), জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন, অসহিষ্ণুতা, অসবর্ণ-বিবাহ, প্রত্যাবর্ত্তন (reversion), শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর কোন্ সময়ে গর্ভাধান হয়, ইত্যাদি নানা কারণ ব্যক্তিগত বৈলক্ষণের কিরূপ প্রবল কারণ। কিন্তু সময়াভাব, স্থানাভাব, আর পাঠকের ধৈর্য্যাভাব। সেগুলি অব্যবসায়ীকে বুঝানও দুঃসাধ্য। এই সব কারণে আমরা কোকিলেশ্বর বাবুর তৃতীয় কারণ সম্বন্ধে এখানেই ইতি করিলাম।

কোকিলেশ্বর বাবুর চতুর্থ কারণটী একটী আবদার মাত্র। তিনি বলিতেছেন, "আর যদি বিবর্ত্তবাদ মতে আদিতে একটী মাত্র জাতিরই সৃষ্টি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই জাতিই বা কি কারণে জন্মিয়াছিল, তাহার উত্তর পাওয়া যায় না।" ল্যাবরেটারিতে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম (জেলির মত দেখিতে আদি জীবন-বিশিষ্ট পদার্থ) প্রস্তুত করিতে না পারিলে সুদূর অতীতে পৃথিবীতে প্রোটোপ্ল্যাজম ঠিক্ কি রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল বলা যায় না *। কিন্তু যখন দেখি, লবণ, শর্করা, অণ্ডের শ্বেতাংশ প্রভৃতি বিশ্বের সমস্ত পদার্থ যেমন কতকগুলি পরমাণুর সংযোজনের ফল, সেইরূপ প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মও অঙ্গার (carbon),' অম্লজান (oxygen), যবক্ষারজান (nitrogen), উদজান hydrogen), গন্ধক ও ফসফরস্, এই কয়েকটী পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত; যখন দেখি, প্রোটোপ্ল্যাজমে এরূপ কোন পদার্থ নাই, যাহা পৃথিবীর অন্যত্রে দেখা যায় না; যখন দেখি,

* এ সম্বন্ধে আমাদের "পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ, যাহা নব্যভারতে বাহির হইয়াছিল, দ্রষ্টব্য।

পৃথিবী হইতে উক্ত পরমাণুগুলি লইয়া কণামাত্র প্রোটোপ্ল্যাজম্ চক্ষের সম্মুখে মণ মণ নূতন প্রোটোপ্ল্যাজম্ প্রস্তুত করিতেছে; যখন দেখি, জীবনরাজ্যের প্রায় সমস্ত ব্যাপারই (vital phenomenon) নৈসর্গিক কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়,—অর্থাৎ এ সব ব্যাপারে নৈসর্গিক শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তির কার্য্যের আবশ্যকতা অনুভূত হয় না; যখন দেখি, কাল যে জীবন-ব্যাপার (vital phenomenon) বিজ্ঞান নৈসর্গিক কারণমালার ফলস্বরূপ বলিয়া ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আজ তাহা উক্ত কারণমালার ফল বলিয়া প্রমাণিত করিতেছেন; যখন দেখি, তিনটী পরমাণুকে সারি সারি বসাইলে এক প্রকার পদার্থ হইবে, আর ঐ তিনটী পরমাণুকে এক কাল্পনিক ত্রিভুজের তিন কোণে বসাইলে স্বতন্ত্র গুণ বিশিষ্ট আর একটী পদার্থ হইবে,—অর্থাৎ কেবল সন্নিবেশনের ভিন্নতায় গুণের ভিন্নতা হইতে পারে; যখন দেখি, তথা-কথিত জড়পদার্থ ও জীবন্ত পদার্থের মধ্যে পার্থক্যও বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে বিদূরিত করিতেছেন; আর যখন দেখি, য়ুরিয়া, সিট্রিক আসিড্, নীল প্রভৃতি শত শত পদার্থ—যাহা কেবল জীবজন্তু বৃক্ষলতাই প্রস্তুত করিতে পারে বলিয়া পূর্ব্বে মানুষের ধারণা ছিল, যাহা মানুষ পূর্ব্বে উহাদিগের পরমাণু হইতে ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত করিতে পারিবে বলিয়া ভাবিতে পারে নাই, আজ তাহা অক্লেশে সেইরূপে প্রস্তুত করিতেছে; আরও যখন দেখি, উক্তরূপ একটী পদার্থ ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত হইবার পক্ষে একটী প্রধান অন্তরায় কেবল সেই পদার্থে পরমাণুগুলি কিরূপে সন্নিবিষ্ট,সেই জ্ঞানের অভাব; —যখন এই সব দেখি, তখন কিরূপে বলিব, প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মও একদিন ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে না; কিম্বা সুদূর অতীতে, সাধারণ নৈসর্গিক কারণমালার দ্বারা প্রোটোপ্ল্যাজম্ পৃথিবীতে অতি ধীরে ধীরে উদ্ভূত হয় নাই? আর ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রোটোপ্ল্যাজম যে কোন অলৌকিক শক্তি দ্বারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই। যদিও সকল অপক্ষপাতী, সত্যপ্রাণ, সূক্ষ্মদর্শী জীবনবিজ্ঞানবিদ্‌ই বিশ্বাস করেন যে, প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম নৈসর্গিক কারণমালার দ্বারা পৃথিবীতে তথা-কথিত জড় পরমাণু হইতে ধীরে ধীরে উদ্ভূত হইয়াছিল, তথাপি বিজ্ঞান নত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন যে, ঠিক কি প্রকারে, কি অবস্থায়, কি প্রণালীতে উক্ত আদি জীবন্ত পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি আজ অক্ষম। অন্যদিকে কিন্তু বিজ্ঞান বিনীত অহঙ্কারের সহিত বলিতেছেন:—"হাঁ আমি আজ অক্ষম, কিন্তু কে সক্ষম?"

যাক্, এখন কথা হইতেছে, জীবজগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদের (theory of organic evolution এর) সত্যতা, অসত্যতা কি প্রোটোপ্ল্যাজম্ কিরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল, এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে? না। তবে কেন জীবজগতের ক্রমবিকাশে বিশ্বাস না করি? জীবজগতে যে ক্রমবিকাশ দেখা যায়, তাহাই আমাদের বক্তব্য। সেই ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তিবাদই সর্ব্বপ্রথমে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়। তাহারই সপক্ষে

অনেক অখণ্ডনীয়, অকাট্য, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। আমরা আশা করিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধেই সেই সুদৃঢ় ভিত্তি সেই সব অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেখাইব ; কি স্থানাভাবে এবার আমরা তাহা পারিব না। যাহা হউক, জীবজগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদ বলিতেছেনঃ—"পৃথিবীতে আদিতে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ যেরূপেই আসুক্ না কেন, আমি দেখিতেছি, উক্ত প্রোটো-প্লাজ্‌ম্‌ হইতে লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী বৎসরে অদ্যকার এই নানা নানা জাতীয় জীব ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উদ্ভূত হইয়াছে।" ইহাই উক্ত অভিব্যক্তিবাদের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মূল ধর্ম্ম। এরূপ স্থলে একথা বলা যে, প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ প্রথমে পৃথিবীতে কিরূপে আবির্ভূত হইল, তাহা নিঃসন্দেহরূপে দেখাইতে না পারিলে আমি তোমার উক্ত অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করিব না, ইহা একটী আবদার মাত্র। বিজ্ঞান যে বিশ্বের সকল রহস্য ভেদ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন না ; বলিতেও পারেন না। বিজ্ঞান নিজেই নিজের গভীর অজ্ঞতা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান সকল বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত আজ মানবচক্ষুর সম্মুখে ধরিতে পারিতেছেন না বলিয়া,তিনি স্বীয় উজ্জ্বল আলোকে আমাদের গন্তব্য পথ যতদূর আলোকিত করিয়াছেন, আমরা ততদূর অগ্রসর না হই কেন ?

আমরা অতি সংক্ষেপ দেখাইলাম যে, কোকিলেশ্বর বাবু যে চারিটী পুরাতন আপত্তির পুনরুত্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটীও এরূপ নহে যে, তাহার জন্য প্রাকৃতিকনির্ব্বাচন বাদ বা অভিব্যক্তি-বাদ অসিদ্ধ হইতেছে। চতুর্থ আপত্তিটী আবদার মাত্র। তৃতীয়টী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। প্রথম দুইটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল প্রাকৃতিকনির্ব্বাচন-বাদের বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হইতে পারে,—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহারা অভিব্যক্তবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারে না। আমরা দেখাইয়াছি, এ দুইটী আপত্তি প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনকেই অসিদ্ধ করিতে পারিতেছে না—অভিব্যক্তিকে অপ্রমাণিত করা দূরে থাকুক। প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে লোকে নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটীও এরূপ নহে যে,তাহার নিমিত্ত প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনকে অবিশ্বাস করিতে হইবে ; —আমরা এরূপ আপত্তি ত আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীব-জগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদ আজ নানাবিধ স্বতন্ত্র (প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ ভিন্ন, অপর) যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে এরূপ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে যে, ডারউইনের প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন আজ যদি অপ্রমাণিতও হয়, তাহা হইলেও উক্ত অভিব্যক্তিবাদ অটল থাকিয়া যাইবে। এরূপ স্থলে কোকিলেশ্বর বাবু যে একদিকে অভিব্যক্তি আর অপরদিকে "পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সংকল্প"কে দণ্ডায়মান করিয়া তাঁর সিদ্ধান্ত স্বরূপ বলিতেছেন,—"এই সকল কারণে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারিটী আপত্তির নিমিত্ত) ইহাই বলা সঙ্গত হইয়া পড়ে যে, প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টিব্যাপারে পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সংকল্পের আবশ্যকতা ছিল",—এই কথাগুলি কতদূর সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ, তাহা বিজ্ঞ পাঠক আপনিই বিবেচনা করিবেন। কেবল স্মরণ

রাখিবেন, পরমেশ্বরের "ভিন্ন ভিন্ন সংকল্প" যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপাদন করিয়াছেন, একথার কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, শুধু যে প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন বা অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল অপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটীও কাজের আপত্তি নহে,—শুধু তাহাই নহে, তা ভিন্ন অভিব্যক্তির সপক্ষে—অর্থাৎ যেমন একটী মানুষ পূর্ব্ববর্ত্তী মানুষ হইতে উৎপন্ন হয়, তেমনি একটী জাতি সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য একটী জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এই মতের সপক্ষে—অনেক প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যদি কেহ বলেন, "কোকিলেশ্বর বাবু যে অভিব্যক্তিবাদকে আর পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সংকল্প ভিন্ন ভিন্ন জীব জাতির সৃষ্টির নিমিত্ত আবশ্যক, এই বিশ্বাসকে পরস্পর বিরোধী মত মনে করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। অভিব্যক্তিবাদ অসিদ্ধ নহে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু অভিব্যক্তির মূলে ঈশ্বরের ইচ্ছা বর্ত্তমান"—যদি কেহ এই কথা বলেন, তাহা হইলে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অভিব্যক্তিবাদকে যে বিশ্বাসযোগ্য বলিলেন, ইহাই আপাততঃ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, অভিব্যক্তির মূলে ঈশ্বরের ইচ্ছা বর্ত্তমান কি না, তাহা আমরা কীটাস্য কীট—আমাদের ক্ষুদ্র—অতি, অতি, অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। মূল দেশে যে উক্ত ইচ্ছা বর্ত্তমান, তাহার প্রমাণাভাব।

কোকিলেশ্বর বাবু এখনও আমাদিগকে ছাড়িতেছেন না। বিদায় লইবার সময় তিনি মুখ ফিরাইয়া আমাদিগের প্রতি একটী তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "নিতান্ত বিভিন্ন এক জাতিকে অন্য এক নিতান্ত ভিন্ন জাতিতে কদাপি পরিবর্ত্তন করা যায় না বলিয়াও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, বিভিন্নতার এক মাত্র কারণ পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা সংকল্প।" দৃষ্টিটী দেখিতে তীব্র, কিন্তু বাস্তবিক ফাঁকা;—কোকিলেশ্বর বাবুর কথাটী যুক্তিসঙ্গত নহে। লেখার ধরণে আর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, কোকিলেশ্বর বাবুর এস্থলে মর্ম্ম এই যে, একটী জাতি অল্প স্বল্প ভিন্ন অপর একটী জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত বিভিন্ন একজাতি নিতান্ত বিভিন্ন অপর এক জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, কোকিলেশ্বর বাবুর পূর্ব্বোক্ত কথাটী কতদূর যুক্তি-সিদ্ধ। প্রথমতঃ; মানুষ দুই চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে একটী নিতান্ত বিভিন্ন জাতিতে অপর একটী নিতান্ত বিভিন্ন জাতিতে পরিবর্ত্তিত করে নাই বা করিতে পারে না বলিয়া যে প্রকৃতি তাহা পারিবে না, তাহার কোন অর্থ নাই। মানুষ নিজের সখের জন্য নির্ব্বাচন করে; প্রকৃতি যে জীবের প্রতি সদয়, তার হিতার্থে নির্ব্বাচন করে। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশের জীব জন্তুকে একদেশে রাখে; মানুষ অনেক সময় নির্ব্বাচিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি লক্ষণকে ব্যবহার দ্বারা উন্নত করিতে পারে না; মানুষ ক্ষুদ্র-লোমযুক্ত আর বৃহৎ লোমযুক্ত মেষকে একই আব হাওয়ার মধ্যে রাখে; মানুষ যে জীবগুলির নির্ব্বাচিত লক্ষণটী নাই, তাহাদিগকে সব বিনাশ করে না; প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত রূপে কার্য্য করে। মানুষের ক্ষমতা ও সুযোগ পরিমিত; মনুষের ইচ্ছা অব্যবস্থিত; বাহ্য বস্তুর সহিত জীব জন্তুর

সম্বন্ধ বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা গভীর। এরূপ স্থলে মানুষ দুই চারি সহস্র বৎসর মধ্যে এক নিতান্ত বিভিন্ন জাতিকে অপর এক নিতান্ত বিভিন্ন জাতিতে পরিবর্ত্তিত করে নাই বা করিতে পারে নাই বলিয়া যে প্রকৃতি তার অসীম ক্ষমতা ও সুযোগ দ্বারা লক্ষ লক্ষ,কোটী কোটী বৎসরে তাহা পারে না—একথা কে বলিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ যদি স্বীকার কর,একটী জাতি তাহা হইতে অল্প স্বল্প ভিন্ন অপর এক জাতিকে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা হইলে যে কারণমালা, যে সময়ের মধ্যে কার্য্য করিয়া উক্ত অল্প পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই কারণমালা বা সেইরূপ কারণমালা পূর্ব্বাপেক্ষা শত সহস্র গুণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কার্য্য করিয়া কি অধিকতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না? যে জল বায়ু দশ বিশ বৎসর ধরিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত পর্ব্বতের উপর কার্য্য করিয়া তাহার উপর হইতে কেবল এক সুত্র মাত্র প্রস্তর চূর্ণীকৃত করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারে, সেই জল বায়ুই সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া সহস্র সহস্র ফুট উচ্চ উক্ত পর্ব্বতকে চূর্ণীকৃত করিয়া লুপ্ত করিতে পারে। যে সকল নৈসর্গিক কারণ সমুদ্রগর্ভে শত বৎসরে এক ফুট মাত্র উচ্চ একটী স্তর নির্ম্মাণ করিতেছে, সেই সকল কারণই লক্ষ লক্ষ বৎসরে সেই স্তরকে সহস্র সহস্র ফুট উচ্চ করিয়া তুলিতে পারে।

তৃতীয়তঃ কোকিলেশ্বর বাবু যে মনে করেন, অভিব্যক্তিবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃতিকে নিতান্ত বিভিন্ন এক জাতিকে নিতান্ত বিভিন্ন অপর জাতিতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে—তাঁর এ ধারণাই অমূলক। নিতান্ত বিভিন্ন একটী জাতি স্বভাবে আছে কি না, তাহাই সন্দেহস্থল। কাল যে দুই জাতিকে নিতান্ত বিভিন্ন মনে হইয়াছিল, আজ সেই দুই জাতির মাঝামাঝি তৃতীয় এক জাতি আবিষ্কৃত হইল, এবং ঐ অত্যন্ত বিভিন্নতাও তার সঙ্গে দুরীভূত হইল। এরূপ নিত্য হইতেছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিই। রুই মাছ ও কাতলা মাছকে কোকিলেশ্বর বাবু নিতান্ত বিভিন্ন দুই জাতি বলিবেন না—উহারা দুইটী ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু নিতান্ত বিভিন্ন দুইটী জাতি নহে; কিন্তু রুই মাছ ও বেংকে উনি অবশ্য নিতান্ত বিভিন্ন দুই জাতি বলিবেন,—"মৎস্য" জাতি ও "ভেক" জাতি। কিছুদিন পূর্ব্বে লোকে উক্ত দুই জাতিকে নিতান্ত বিভিন্ন জাতি বলিয়া মনেও করিত। কোকিলেশ্বর বাবুর দুর্ভাগ্যক্রমে কিন্তু এখন এক জাতীয় জীব আবিষ্কৃত হইয়াছে—দ্বি-শ্বাসী (Dipnoi) —যাহারা না মাছ না বেং, যারা মাছ ও বেং এর মাঝামাঝি কিম্ভুত কিমাকার এক জাতি। মাছ ও বেংএর মধ্যে নিতান্ত বিভিন্নতা যা ছিল, তাহা এই জাতি দুরীভূত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। মাছ ও উক্ত দ্বি-শ্বাসীর মধ্যস্থলে আবার এরূপ সব অনেক জাতি (intermediate species) ছিল, যারা উক্ত দুই জাতির মধ্যে সোপান স্বরূপ—যাহাদের মধ্য দিয়া মাছ হইতে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে আধুনিক দ্বি-শ্বাসীতে পৌঁছান যায়। আবার অন্যদিকে আধুনিক দ্বি-শ্বাসী ও সাধারণ বেংএর মধ্যস্থলে এমন সব জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, যারা ঐ দুই জাতির মধ্যে বিভিন্নতা অনেকটা কমাইয়া দেয়। আর একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক।

বেশী দিন নয়, আট বৎসর পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, বনমানুষ ও মানুষের মধ্যে বিভিন্নতাটা বড় বেশী। এই সে দিন জাবা দ্বীপে এমন এক বিলুপ্ত জাতীয় জীবের অস্থি পাওয়া গিয়াছে, যাহারা বনমানুষ ও মানুষের মাঝামাঝি ছিল;—যাহারা বনমানুষ ও মানুষের মধ্যে উক্ত বিভিন্নতা খুব কমাইয়া দিয়াছে। যে "অপ্রাপ্ত শৃঙ্খল" (missing link) পাইবার জন্য মানুষ উদ্‌গ্রীব ছিল উক্ত জীবই সেই "অপ্রাপ্ত-শৃঙ্খল"—না এখন ইহাকে "প্রাপ্ত শৃঙ্খল" বলাই ভাল। প্রিয় পাঠক আসুন, আমাদের এই নমস্য পূর্ব্বপুরুষকে আমরা ভক্তির সহিত প্রণাম করি! আরও একটী দৃষ্টান্ত লউন। টিক্‌টিকী ও গিরগিটী, এই দুই জাতি নিতান্ত বিভিন্ন দুইটী জাতি নহে;—এ দুইটী জাতিই এক সরীসৃপ শ্রেণীর (class এর)। পায়রা ও ঘুঘুও তেমনি দুইটী নিতান্ত বিভিন্ন জাতি নহে;—এই দুইটী জাতিই পক্ষী শ্রেণীর। কিন্তু টিক্‌টিকী ও পায়রাকে—একটী সরীসৃপ ও একটী পক্ষীকে সকলেই দুইটী বিভিন্ন জাতি বলিবে। কোকিলেশ্বর বাবুর দুর্ভাগ্যক্রমে অতি প্রাচীন স্তরে এমন সব জাতির জীব আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহারা সরীসৃপ ও পক্ষীর মাঝামাঝি—যাহাদের শরীরের কোন কোন অঙ্গ সরীসৃপের মত আবার কোন কোন অঙ্গ পক্ষীর মত। এই সব জাতির জীব সরীসৃপ ও পক্ষীর মধ্যে লোকে যে এক নিতান্ত বিভিন্নতা দেখিত, তাহা দূর করিয়াছে। শুধু যে দুইটী নিতান্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যস্থিত এক বা ততোধিক মধ্যবর্ত্তী জাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নহে; কোন কোন স্থলে দুইটী অতি নিকট-সম্বন্ধীয় জাতির মধ্যস্থিত সোপান স্বরূপ নানা মধ্যবর্ত্তী প্রকারের (ইহাদের "জাতি"ই বল বা "অন্তর্জ্জাতি"ই বল, বড় কিছু আসে যায় না) জীবও আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেখানে মৃত শরীর প্রস্তরীভূত (fossilized) হইয়া সংরক্ষিত হইবার বিশেষ সুবিধা ছিল, সেখানে যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়, একটী জাতি অন্য একটী নিকটতম জাতিতে কিরূপে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুদূর অতীতে সুইজারল্যাণ্ডে একটী হ্রদ(Steimhei) ছিল। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সেই হ্রদটীতে স্তরে স্তরে খড়িমাটী জন্মে। ইহা অবশ্য ঘোর অতীত কালের কথা। ঐ খড়িমাটীর নিম্নতম এবং প্রাচীনতম স্তরে এক জাতির গেঁড়ী পাওয়া যায়, আর উর্দ্ধতম ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্তরে আর এক উহার নিকট-সম্বন্ধীয় জাতির গেঁড়ী পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী স্তর সকলে এমন সব রকমের গেঁড়ী পাওয়া যায়, যাহারা মধ্যবর্ত্তী রকমের,—যাহারা সোপান স্বরূপ হইয়া নিম্নতম স্তরের জাতিকে উর্দ্ধতম স্তরের জাতির সহিত সংযুক্ত করে। ঐ মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলির মধ্যে একটী স্তরে যে রকমের গেঁড়ী পাওয়া যায়, আর ঐ স্তরের অব্যবহিত উপরের স্তরে যে রকমের গেঁড়ী পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভিন্নতা অতি অল্প—লঙ্কা ও লোটনের মধ্যে যেরূপ অল্প ভিন্নতা, সেইরূপ অল্প। তাই বলিতেছিলাম, এখানে যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, একটী জাতি কিরূপে অতি অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে অপেক্ষাকৃত একটী ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। আমরা এ প্রবন্ধের প্রথমে অভিব্যক্তির যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলাম,

সেটীও এখানে বিবেচনা করিবার বিষয়। রাইনোসারস্ ও ঘোঁড়া দুই বিভিন্ন জাতি সত্য; কিন্তু প্রকৃতি রাইনোসারাস্কে কিছু ঘোটকে পরিণত করে নাই, কিম্বা ঘোটককে রাইনোসারসে পরিবর্ত্তিত করে নাই। সুদূর অতীতে ফেনাকোডস্ নামক এক জাতীয় জীব ছিল—ইহারাই আধুনিক রাইনোসারস্ ও ঘোটকের পূর্ব্বপুরুষ। প্রকৃতি পঞ্চ অঙ্গুলি বিশিষ্ট ফেনাকোডস্কে কিছু এক অঙ্গুলি বিশিষ্ট ঘোটকে কিম্বা ত্রি-অঙ্গুলি বিশিষ্ট রাইনোসারসে এক লম্ফে পরিবর্ত্তিত করে নাই। আমরা দেখিয়াছি, ফেনাকোডস্ ও ঘোটকের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটী মধ্যবর্ত্তী জাতি ছিল, আর ফেনাকোডস্ ও রাইনোসারসের মধ্যেও অনেকগুলি জাতি ছিল। ফেনাকোডস্ ও ঘোটকের মধ্যে যে মধ্যবর্ত্তী জাতি গুলি ছিল, উহারা, যেন একটী সোপানের একটী একটী ধাপ স্বরূপ। সোপানের নিম্নতম ধাপ হইতে উর্দ্ধতম ধাপের দূরত্ব অনেক অধিক, কিন্তু একটী ধাপ হইতে তার অব্যবহিত পরের ধাপের—দূরত্ব অনেক কম। সেইরূপ ফেনাকোডস্ ও ঘোটকের মধ্যে ভিন্নতা নিতান্ত অধিক বটে, কিন্তু ফেনাকোডস্ প্রথমেই যে আপনা হইতে অল্প ভিন্ন জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই জাতি আর ফেনাকোডসের মধ্যে ভিন্নতা নিতান্ত অধিক ছিল না। এই রূপে প্রকৃতি ফেনাকোডস্ জাতীয় কতকগুলি জীবকে ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, অল্প অল্প ভিন্ন জাতিতে পরিবর্ত্তিত করিতে করিতে, ধাপের পর ধাপের উপর দিয়া অবশেষে একদিকে আধুনিক অশ্বে পরিণত করিলেন—আর একদিকে ঐ ফেনাকোডস্ জাতির আর কতকগুলি জীবকে ঐরূপে আর এক সোপান দিয়া, না না মধ্যবর্ত্তী জাতিতে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত করিতে করিতে আধুনিক রাইনোসারসে পরিণত করিলেন। অভিব্যক্তি এইরূপেই হইয়াছে। নিতান্ত ভিন্ন এক জাতি নিতান্ত ভিন্ন অপর এক জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া হয় নাই। আমরা অন্ধ, আমরা ফেনাকোডস্ ও ঘোটকের মধ্যে যে ধাপ গুলি আছে, সে গুলি দেখিলাম না; ফেনাকোডস্ ও রাইনোসারসের মধ্যে যে ধাপগুলি আছে, সে গুলিও দেখিলাম না, আর দুইটী সোপান নিম্নদেশে যেখানে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সাধারণ মধ্যবর্ত্তী স্থান টুকু অর্থাৎ ফেনাকোডস্কেও দেখিলাম না, কেবল উক্ত সোপান দুইটীর উর্দ্ধতম দুইটী ধাপ দেখিলাম—কেবল ঘোটক ও রাইনোসারস্ দেখিলাম; এস্থলে ঘোটক ও রাইনোসারস্ দুইটী নিতান্ত বিভিন্ন জাতি বলিয়া অনুভূত হইবে। ফেনাকোডস্ হইতে দুই দিকে যে দুইটী সোপান উঠিয়াছে, তাহা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিলে আমরা সহজে বুঝিতে পারি, প্রকৃতি কিরূপে লম্ফ না দিয়া, এক দিকে ঘোটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর এক দিকে রাইনোসারসে পৌঁছিলেন। জন্তু-জগতের সর্ব্বত্রেই এইরূপ কেবল ধাপ, ধাপের উপর ধাপ, কেবল সোপান, সোপানের উপর সোপান। মহান্ উত্তুঙ্গ জন্তু-সোপানের নিম্নতম দেশে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শূন্য, চক্ষু-কর্ণ-শূন্য এক বিন্দু জেলির মত আমিবা (Amœba) বা প্রেটোজিনিস (Protogenes); উর্দ্ধতম দেশে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, নানা ইন্দ্রিয় যুক্ত বিজয়ী মানব; আমাদের দৃষ্টি যদি কেবল প্রোটো-

জিনিস ও মানবেই বদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে এই দুই জীবের ভিন্নতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়, শরীর মন শিহরিয়া উঠে। প্রোটোজিনিস্ হইতে মানবে পৌঁছান অসম্ভব মনে হয়। মনে হয়, বনমানুষ পরিবর্ত্তিত হইয়া মানুষ হইতে পারে, কিন্তু প্রোটোজিনিস্ পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপে মানবে পরিণত হইবে!! কিন্তু যখন দেখি, প্রোটোজিনিস্ ও মানবের মধ্যে এক একটী ধাপ স্বরূপ শত শত সহস্র সহস্র জাতি আছে; যখন দেখি, ঐ মধ্যবর্ত্তী জাতিগুলির মধ্যে একটী তার অব্যবহিত নিম্নের জাতি হইতে প্রায় সেইরূপ ভিন্ন, মানুষ যেমন বনমানুষ হইতে ভিন্ন, তখন আর প্রোটোজিনিস্ হইতে মানবে পৌঁছান অসম্ভব মনে হয় না। সাধারণতঃ লোকদিগের এই ধাপ গুলি দেখিবার সুবিধা হয় না, কাজেই অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ তাঁহাদের নিকট অসম্ভব মনে হয়। আধুনিক জীবনবিজ্ঞানের একটী মহাগৌরবের বিষয়ই এই যে, উনি জীবজগতের সর্ব্বত্রে এইরূপ ধাপের পর ধাপ, সোপানের পর সোপান দেখাইয়াছেন ও এখনও নিত্য একটী নূতন ধাপ আবিষ্কার করিতেছেন, নিত্য একটী এরূপ জীব দেখাইতেছেন, যাহা দুইটী নিকট অথচ বিভিন্ন জাতির মধ্যবর্ত্তী। উদ্ভিদ-জগতেও ঠিক এইরূপ কেবলই ধাপ, ধাপের উপর ধাপ, কেবলই সোপান, সোপানের উপর সোপান। আবার একটী জন্তুজাতি ও একটী উদ্ভিদ্ জাতির মধ্যে লোকে যে পূর্ব্বে এক অপার আট্‌লাণ্টিক দেখিত, সে সমুদ্রের উপরেও বিজ্ঞান সেতু ফেলিয়াছেন। এখন এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে যাইবার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাস্তবিক জন্তুরাজ্য ও উদ্ভিদ্‌রাজ্য একটী বৃক্ষের দুইটী প্রধানতম শাখা স্বরূপ; বৃক্ষটী যেন ভূমি হইতে উঠিয়াই দুই প্রকাণ্ড শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ দুই শাখা নিম্নে যেখানে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেখানে আজও এমন সব জীব দেখা যায়, যাহারা না জন্তু না উদ্ভিদ*। জীবরাজ্যে তবে নিতান্ত বিভিন্নতা কোথায়? প্রকৃতিকেও নিতান্ত বিভিন্ন এক জাতিকে নিতান্ত বিভিন্ন অপর জাতিতে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় নাই। কোকিলেশ্বর বাবু বিদায়কালে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে যে কথাটী বলিয়াছিলেন, তাহাও নিতান্ত অসার প্রমাণিত হইল।

পরিশেষে উপসংহারকালে আমরা আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা আজ মোটামুটী যে সব বিষয়ে আলোচনা করিলাম, তাহা অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত জটিল। কত কঠিন ও কত জটিল, তাহা একটী সামান্য বৃত্তান্ত হইতে প্রিয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন। হক্‌সলি একজন জগতের উচ্চতম শ্রেণীর জীব-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলেন, ডারউইনের "অরিজিন অব স্পিসিজ্" (যে পুস্তকে এই সব বিষয় অতি গভীররূপে আলোচিত হইয়াছে) এরূপ কঠিন যে, তিনি উক্ত পুস্তক সাত বার পড়িয়াও সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারেন নাই। অভিব্যক্তিবাদ বা প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবাদ ভাল করিয়া বুঝা বা ইহাদের স্বপক্ষের প্রমা-

* লেখক সাত আট বৎসর পূর্ব্বে ভারত-বিজ্ঞান সভায় তাঁর "মাংসাশী উদ্ভিদ ও তাহাদের বৈজ্ঞানিক অর্থ" নামক সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতাতে এই বিষয়টী বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ণের গুরুত্ব বিচার করিয়া দেখা সহজ ব্যাপার নহে——একেবারেই নহে। উহা বুঝিবার ও দেখিবার অধিকার অর্জ্জন করিতে চইলে দুই চারি খানি পুঁথি পড়িলেই চলিবে না; কেবল ক্যাণ্ট, হেগেল, বেদান্তদর্শন ইত্যাদি কতকগুলি দার্শনিক গ্রন্থ পড়িলে চলিবে না; স্পেন্সার ও ডারউইন, হক্সলি ও হেগেলের পুস্তকগুলি গুলিয়া খাইলেও চলিবে না। ইহা বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশের কোন কোন মহাপুরুষ, যে অভিব্যক্তিবাদ উচ্চতম শ্রেণীর শত সহস্র বৈজ্ঞানিকের শত শত বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল বা ফলের উপর সংন্যস্ত, সেই অভিব্যক্তিবাদের উপর ইজি-চেয়ারে বসিয়া দুই চারি খানি পুঁথি পড়িয়া কলম চালাইতে চান; অভিব্যক্তিবাদের ক জানেন না, অভিব্যক্তিবাদকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। অভিব্যক্তিবাদ বুঝিবার ও বিচার করিবার অধিকার অর্জ্জন করিতে হইলে বিশাল প্রকৃতিগ্রন্থ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হয়; প্রকৃতির সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে হয়; অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হয়; সংসারের অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়। ভারতবাসীকে নানা বিপদ আপদ তুচ্ছ করিয়া সাগরপারে যাইয়া উপযুক্ত শিক্ষকের পদতলে বসিয়া, উন্মত্ত বৈরাগী হইয়া, নানা জাতীয় জীব জন্তুর শবদেহকে সঙ্গের সাথী করিতে হয়; এমন কি, প্রয়োজন হইলে মানুষের শবদেহকে শয়নাগারের বা ভোজনাগারের সঙ্গী করিতে হয়; * অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের সহিত নানা যন্ত্রের সাহায্যে উহাদের গঠন এবং উহাদের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হয়। তারপর বা তারই সঙ্গে সঙ্গে সত্যপ্রাণ হইয়া দর্শনসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়; এ অতি গভীর, ভয়াবহ, বিপদসঙ্কুল সমুদ্র, এ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা, ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত, পরস্পর-বিরুদ্ধ-দিক্‌গামী প্রবল স্রোত সমূহ সময়ে সময়ে ক্ষীণ জীবনতরীকে, শুধু কথার কথা নহে, কিন্তু বাস্তবিকই চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে উদ্যত;—এ অকূল সমুদ্রে একমাত্র কর্ণধার সত্যলাভের সর্ব্বত্যাগিনী বলবতী ইচ্ছা;——এ অপার সমুদ্রের উপর ঘোর অন্ধকার রজনীতে এক মাত্র ধ্রুবতারা ভাব-নিরপেক্ষ, অন্ধবিশ্বাস-অবিচলিত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা। প্রকৃতির সহিত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া ঐ বিশাল ভয়াবহ সমুদ্রে সন্তরণ দিতে দিতে মানব ঐ পূর্ব্বোক্ত মহা অধিকার লাভ করে, কিন্তু কি উচ্চ অধিকার! যে ভাগ্যবান পুরুষ এ মহান্ অধিকারের অধিকারী, তিনি আজ অসীমন্তের কেন্দ্রস্থানে—অনাদ্যনন্তত্বের সম্মিলনস্থলে দণ্ডায়মান; যদি বিশ্ব-প্রহেলিকার ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া কোন দিক হইতে একটু ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ আলোকরশ্মির পূর্ব্বাভাস মাত্র কেহ আজ পান ত তিনিই পাইবেন!! প্রিয় পাঠক, আসুন, আমরা ঐ অধিকারের কণামাত্র পাইবার জন্য যত্নশীল হই।*

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

* আমাদের একটী বন্ধু বিলাতে কলেজের অবকাশ কালে একটী মড়ার মাথা আনিয়া নিজের খাবার ও শোবার ঘরে এক মাস ধরিয়া ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন। মাথাটী বাড়ীউলীর ভয়ে আলমারিতে লুকাইয়া রাখিতেন।

* এই প্রবন্ধের ১১৫ পৃষ্ঠার ৬ লাইনের পর নিম্নলিখিত অংশটুকু পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিবেন।

অনেকে মনে করেন, প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম পূর্ব্বোক্ত অঙ্গারাদি ছয় প্রকার পরমাণুর নৈসর্গিক সংযোগের ফল হইতে পারে না, কেন না, উক্ত প্রোটোপ্ল্যাজমে এমন দুই চারিটী বিশেষ গুণ আছে, যাহা তাহার উপাদানভূত উক্ত ছয় প্রকার পরমাণুর কোনটীতেই নাই। কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, ইহা একটী চিরপোষিত ভ্রান্ত বিশ্বাস মাত্র যে কার্য্য ঠিক কারণের মত হইবে;—ইহা একটী কুসংস্কার মাত্র এরূপ মনে করা যে কার্য্যে এমন কোন গুণ থাকিতে পারে না, যা কারণে নাই; যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, একটী দ্রব্য যাহা কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, এই তিন প্রকার পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে—সেই দ্রব্যে এমন গুণ থাকিতে পারে, যাহা উক্ত কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেনে নাই—যাহা শুধু উহাদের সংযোজনের ফল স্বরূপ; তখন প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মে পূর্ব্বোক্ত দুই চারিটী বিশেষ গুণ আছে বলিয়া কি প্রকারে বলিব যে, প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম পূর্ব্বোক্ত অঙ্গারাদি ছয় প্রকার পরমাণুর নৈসর্গিক সংযোগের ফল নহে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।*

(শ্রীম-কথিত।)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে।

সপ্তমী পূজা, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। ঠাকুরের অনেকগুলি কাজ। শারদীয় মহোৎসব—রাজধানী মধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে আজ মায়ের সপ্তমীপূজা আরম্ভ। ঠাকুর অধরের † বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিবেন ও আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন। আর একটী সাধ, শিবনাথকে দর্শন করিবেন।

বেলা আন্দাজ দুই প্রহর হইতে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের ফুটপাথের উপর একটী ছাতি হাতে করিয়া মাষ্টার পাদচারণ করিতেছেন। ১টা বাজিল, ২টা বাজিল, তবু ঠাকুর আসিলেন না। শ্রীযুক্ত মহালনবিসের ডিস্‌পেনসারির ধাপে মাঝে মাঝে বসিতেছেন ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছেলেদের আনন্দ ও আবাল-বৃদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দেখিতেছিলেন।

বেলা ৩টা বাজিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সমাজ-মন্দির দৃষ্টে ঠাকুর করজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে হাজরা ও আর ২।১টী ভক্ত। মাষ্টার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আমি শিবনাথের বাড়ী যাইব। ঠাকুরের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের বাড়ীর দ্বারদেশে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। শিবনাথ বাড়ীতে নাই! কি হইবে? দেখিতে দেখিতে বিজয়*, মহালানবীস ইত্যাদি ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজ-মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন। ঠাকুর একটু বসুন—ইতি মধ্যে শিবনাথ আসিয়া পড়িলেও পড়িতে পারেন।

ঠাকুর আনন্দময়, সহাস্য বদনে আসন গ্রহণ করিলেন। বেদীর নীচে যে স্থানে সঙ্কীর্ত্তন হয়, সেই স্থানে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল। বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত সম্মুখে বসিলেন।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও সাইনবোর্ড (Signboard); সাকার, নিরাকার।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি, হাসিতে হাসিতে)। শুনলাম এখানে নাকি সাইনবোর্ড (Signboard) আছে। অন্য মতের লোক নাকি এখানে আসবার জো নাই। নরেন্দ্র † বল্লে, সমাজে গিয়ে কাজ নাই শিবনাথের বাড়ীতে যেও।

* প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

† শ্রীযুক্ত অধরলাল সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বাড়ী সভাবাজার বেণেটোলা। ঠাকুর তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। অধর প্রায় প্রত্যহ গাড়ী ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার পর ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে যাইতেন।

* শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

† ইদানীং স্বামী বিবেকানন্দ।

"আমি বলি, সকলেই তাঁকে ডাক্‌ছে। দ্বেষাদ্বেষির দরকার নাই। কেউ বল্‌ছে সাকার, কেউ বল্‌ছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে মতুয়ার * বুদ্ধি ভাল নয়। অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম ঠিক আর সকলের ধর্ম্ম ভুল। আমার ধর্ম্ম ঠিক, আর ওদের ধর্ম্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল। কেন না, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না কল্লে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না।

"কবীর বল্‌তো, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো কাকো বন্দো। দোনো পাল্লা ভারী।

"হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব; ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলই এক বস্তুকে চাহিছে। তবে যার যা পেটে সয় মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটী ছেলে থাকে, তাহলে সকলকেই পোলোয়া কালিয়া করে দেন না। কেন না সকলের পেট সমান না। কারুর জন্ম মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

"আমার ভাব কি জান। আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব। (সকলের হাস্য)। আমি ভাজা, হলুদ দিয়ে, টকের মাছ, বাটি চচ্চড়ি এ সব তাতেই আছি। আবার মুড়ির ঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্য)।

"কি জান, দেশ কাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় কল্লে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় করে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল সুধরিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তাহলে অবশ্য পথে কেউ বলে দেয়, ওহে ওদিকে যেও না—দক্ষিণ দিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনো না কখনো জগন্নাথ দর্শন কর্‌বে।

"তবে অন্যের ভুল মত হয়েছে, এ কথা আমাদের ভাববার দরকার নাই। যাঁর জগৎ, তিনি ভাবছেন্। আমাদের কর্ত্তব্য, কিসে যো সো করে জগন্নাথ দর্শন হয়।"

"তা তোমাদের মতটী বেশতো। তাঁকে নিরাকার বলছো এতো বেশ। মিছরির রুটি সিদে করে খাও আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে।

(বিজয়ের প্রতি)। "তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরূপীর গল্প শুনেছ। একজন বাহ্যে কত্তে গিয়ে গাছের উপর বহুরূপী দেখিছিল, বন্ধুদের কাছে এসে বল্লে, আমি একটী লাল গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকা লাল। আর একজন সেই গাছতলা থেকে এসে বল্লে যে আমি একটী সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকা সবুজ। কিন্তু যে গাছতলায় বাস কত্তো, সে এসে বল্লে, তোমরা যা বল্‌ছো সব ঠিক, তবে সে জানয়ারটী কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে আবার কখন কোন রং থাকে না।

* Dogmatism.

"বেদে তাঁকে সগুণ নির্গুণ দুই বলা হয়েছে। তোমরা নিরাকার বলছো। একঘেয়ে। তা হোক্। একটা ঠিক জানলে অন্যটাও জানা যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে, সে এঁকেও জানে, আবার ওঁকেও জানে।"

ঠাকুর এই বলিয়া দুই এক জন ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বিজয়ের প্রতি উপদেশ।

বিজয় তখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত। ঐ ব্রাহ্মসমাজে একজন বেতন-ভোগী আচার্য্য আজকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেছেন না। সাকার বাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন। এই সকল লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইতেছিল। এই সমাজের ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ হঠাৎ বিজয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

(বিজয় ও লোকনিন্দা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি সহাস্যে)। "তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো বলে। তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে? যে ভগবানের ভক্ত, তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়্‌ছে, তবু নির্ব্বিকার। যেমন তেমনি। অসৎ লোকে তোমাকে কত কি বল্‌বে, নিন্দা কর্‌বে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে।

(বিজয় ও দুষ্টলোক)।

"দুষ্টলোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর চিন্তা হয় না? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা কত্তো। চারদিকে বাঘ, ভাল্লুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎলোকের বাঘ ভালুকের স্বভাব, তেড়ে এসে অনিষ্ট করে।

"এই কয়টীর কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড়মানুষ। টাকা, লোকজন অনেক, মনে কল্লে তোমার অনিষ্ট কত্তে পারে। তাহাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে সায় দিয়ে যেতে হয়। তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে, কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ ক'রে তাকে ঠাণ্ডা কত্তে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা কত্তে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বল্‌বে, তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন বলে গালাগালি দিবে। তাকে বল্‌তে হয়, কি খুড়ো, কেমন আছ? তাহলে খুব খুসি হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।

"অসৎলোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকো টুকো আছে, আমি বলি আছে।

"কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আন্‌তে হয়। তা নাহলে হয়তো তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, তার আবার উল্‌টে অনিষ্ট কত্তে ইচ্ছে হয়।

(বিজয় ও সাধুসঙ্গ)।

"তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ কল্লে তবে সদসৎ বিচার আসে।

বিজয়। অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা আচার্য্য। অন্যের ছুটি হয়, কিন্তু আচার্য্যের ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসিত কল্লে পর, জমিদার আর একধার শাসন কত্তে তাকে পাঠান। তাই তোমার ছুটি নাই।

বিজয় (কৃতাঞ্জলি)। আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওসব অজ্ঞানের কথা। ঈশ্বরই আশীর্ব্বাদ করবেন।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানী, গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস।)

বিজয়। আচ্ছা আপনি কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, সমাজগৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)। এ এক রকম বশ। সারেমাতে। সারও আছে, মাতও আছে। (সকলের হাস্য)।

"আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। (সকলের হাস্য)। নক্স খেলা জান? সতর ফোঁটার বেশী হলে জ্বলে যায়। এক রকম তাস খেলা। যারা সতর ফোঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়না। আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি।

"কেশব সেন বাড়ীতে লেক্‌চার দিলে। আমি শুনেছিলুম। অনেক লোক বসে ছিল। চিকের ভিতর মেয়েরা ছিল। কেশব বল্লে, হে ঈশ্বর তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা ভক্তির নদীতে একেবারে ডুবে যাই। আমি হেসে কেশবকে বল্লুম, ভক্তি-নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে, তা হলে চিকের ভিতর যাঁরা রয়েছেন, ওঁদের দশা কি হবে? তবে এক কর্ম্ম কোরো, ডুব দেবে আর মাঝে মাঝে আড়ায় * উঠবে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না। এই কথা শুনে কেশব আর সকলে হো হো করে হাস্‌তে লাগলো।

"তা হোক্। আন্তরিক হলে সংসারেও ঈশ্বর লাভ করা যায়। 'আমি' আর 'আমার' এইটী অজ্ঞান। হে ঈশ্বর 'তুমি' ও 'তোমার' এইটী জ্ঞান।

"সংসারে থাকো যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি। সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে আমার হরি, কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এ বাড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারে সব কর্ম্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে গৃহ, পরিবার পুত্র, এ সব আমার নয়, এ সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।

"আমি মনে ত্যাগ কত্তে বলি। সংসার ত্যাগ কত্তে বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে, তাঁকে আন্তরিক চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায়।

(ব্রাহ্মসমাজ ও ধ্যানযোগ। Joga, subjective & objective.)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কত্তুম। তারপর ভাবলুম, এমন কল্লে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন কল্লে (চক্ষু খুল্‌লে) কি ঈশ্বর নেই? চক্ষু খুলেও দেখ্‌ছি, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীব, জন্তু, গাছ, পালা, চন্দ্র, সূর্য্য মধ্যে, জলে, স্থলে, সর্ব্বভূতে তিনি আছেন। আবার অন্তরে হৃদয় মধ্যেও আছেন।

* আড়া অর্থাৎ নদীর তীর।

(শিবনাথ; 'মমতেজোংহংশ সম্ভবম্।)*

"কেন শিবনাথকে চাই? যে অনেক দিন ঈশ্বর চিন্তা করে, তার ভিতর সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায়, কোন একটা বিদ্যে খুব ভাল রকম জানে, তার ভিতরও সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটী গীতার মত। চণ্ডীতে আছে যে খুব সুন্দর তার ভিতরও সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে।

(শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্য্যে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি।) আহা! কেদারের কি স্বভাব হয়েছে! এসেই কাঁদে। চোক দুটি সর্ব্বদাই যেন ছানাবড়া হয়ে আছে।

বিজয়। সেখানে * কেবল আপনার কথা ও আপনার কাছে আসবার জন্য ব্যাকুল।

"কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তেরা নমস্কার করিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেছেন।

শ্রীমঃ—

* যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহংশ সম্ভবম্ ॥

* ৺ কেদার চাটুর্য্যে পরমভক্ত, তখন ঢাকার সরকারি কাজ উপলক্ষে ছিলেন। ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন ঢাকায় মাঝে মাঝে যাইতেন তখন তাঁহার সহিত দেখা হইত। দুজনেই ভক্ত, পরস্পর দর্শনে আনন্দ করিতেন।

বুয়র যুদ্ধ।

যুদ্ধের পূর্ব্বে আপোসে মীমাংসার চেষ্টা

দক্ষিণ আফ্রিকার অদৃষ্টগুণে যে কয়েকটী গ্রহ তাহার অদৃষ্টচক্রে বিরাজমান, তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর স্বভাবই অবস্থার অনুরূপ নহে। যাহা হউক, যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার এবং সার আলফ্রেড্ মিলিনারের সঙ্গে ব্লুমফন্‌টীন নগরে যে দেখা হয়, তৎকালে এবং তৎপরবর্ত্তী কালে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে আপোসে সমস্ত বিষয় মীমাংসা করার কথোপকথন হইয়াছিল, সেই কথাগুলিও সংক্ষেপে পাঠক মহাশয়ের সম্মুখে আমাদিগের রাখা কর্ত্তব্য, তাহা হইতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, ইংলণ্ডের কলনিয়াল সেক্রেটরীর প্রাণের ভাব যাহাই হউক না কেন, তৎকালে প্রকৃত বিতর্কিত বিষয়ের ছলনাবলম্বনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, এবং বুয়র গবর্ণমেণ্টের তৎপরবর্ত্তীকালের অদূরদর্শীতাই তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ।

৩১শে মে হইতে ৫ই জুন পর্য্যন্ত ব্লুমফন্‌টীন নগরে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট এবং কেপকলনীর গবর্ণর এবং ব্রিটিস হাই-কমিশনরের সঙ্গে নানাবিধ বিরোধীয় বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হয়, তন্মধ্যে উইট্‌ল্যাণ্ডারদিগের আপত্তি সম্বন্ধে সার আলফ্রেড্ প্রেসিডেণ্টকে বলিলেন যে, সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যে পাঁচ বৎসর বসতির পর যদি উইট্‌ল্যাণ্ডারদিগকে সাধারণ-তন্ত্রের

বারারদিগের পূর্ণাধিকার প্রদত্ত হয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রধান সভায় তাহাদিগকে অন্যূন ৪টী সিট্ দেওয়া হয়, তবে উইট্ল্যাণ্ডারগণের অসন্তুষ্টি ও অসুবিধা দূর হইতে পারে।

ক্রুগার উল্লিখিত প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না, তিনি বলিলেন, তাঁহার বারারদিগের সংখ্যা ত্রিশ সহস্রের অধিক হইবে না, কিন্তু উপরের লিখিত নিয়মানুসারে ৬০,০০০,৭০,০০০ হাজার বিদেশীয় ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় বিভাগে সদস্য মনোনয়নের অধিকার জন্মিবে। তাহা হইলে ট্রান্সভয়াল রাজ্যের স্বাধীনতা কিছুতেই স্থায়ী হইবে না, আর স্বাধীনতা স্থায়ী হইলেও তাহা কখনই বুয়র-সাধারণ-তন্ত্র রাজ্য থাকিতে পারিবে না। সুতরাং তিনি প্রস্তাবান্তর উপস্থিত করিলেন; কোন নবাগত ব্যক্তি সাধারণ-তন্ত্র মধ্যে বসতি করার পর দুই বৎসরান্তে তিনি ঐ দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন। তৎপর পাঁচ বৎসর অন্তে তাঁহার সদস্য মনোনয়নের অধিকার জন্মিবে। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবকেও তিনি আবার এত বিধি ও উপবিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ করিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি যাহা দিতে প্রস্তুত হইলেন, তাহার আর বিশেষ কিছুই মূল্য রহিল না। আমাদিগের কথার সারবত্তা বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা সেই বিধি এবং উপবিধিগুলি যথাক্রমে নিম্নে সন্নিবেশিত করিতেছি।—

বাসেন্দা স্বরূপে পরিগণিত হওয়ায় নিয়মাবলী।

প্রত্যেক নবাগত ব্যক্তি, ট্রান্স্ভয়াল রাজ্যে আগমনের ১৪ দিবসের মধ্যে, নাম রেজেষ্টরী করিবেন, তাহা হইলে দুই বৎসর অন্তে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে দেশের বাসেন্দা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন।

নিয়ম যথা :—

(১) বাসেন্দা বলিয়া পরিগণিত হইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার ছয় মাস পূর্ব্বে তন্মর্ম্মে নোটিস্ দিতে হইবে।

(২) দুই বৎসর পর্য্যন্ত ধারাবাহী ক্রমে নাম রেজেষ্টরীভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উক্তকাল সর্ব্বদা দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্র রাজ্য মধ্যে বসতি করিতে হইবে।

(৪) কোন প্রকার অসম্মান-জনক রাজদণ্ডে কখনও দণ্ডিত হইলে উক্ত অধিকার প্রদত্ত হইবে না।

৫। আইনের বিধানানুবর্ত্তী ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং গবর্ণমেণ্টের অথবা দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন নাই, একথা প্রমাণ করা আবশ্যক।

৬। নবাগত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে দেশের বাসেন্দা ছিলেন, সে দেশে তাঁহার সদস্য মনোনয়নের অধিকারাদি ছিল, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে।

(৭) মর্টগেজে অনাবদ্ধ ১৫০ পৌণ্ড মূল্যের সম্পত্তির মালিক, অথবা ৫০ পৌণ্ড ভাড়ার বাড়ীর ভাড়াটিয়া, অথবা অন্যূন ২০০ পৌণ্ড বার্ষিক আয়ের অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

(৮) ষ্ট্রিটেটে যে প্রণালীতে শপথ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার অনুরূপ শপথ করিতে হইবে।

উক্ত প্রকারে বাসেন্দা শ্রেণীভুক্ত হইলে, তৎপর পাঁচ বৎসরের অন্তে সদস্য মনোনয়নের পূর্ণাধিকার নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

(১মঃ) বাসেন্দা রূপে পরিগণিত হওয়ার পরও ধারাবাহিক ক্রমে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত নাম রেজেষ্টরীভুক্ত করিতে হইবে। ঐকাল পর্য্যন্ত তদ্দেশ মধ্যে সর্ব্বদা বসবাস করিতে হইবে ইত্যাদি।

১৮৯০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্ব হইতে যাহারা রাজ্য মধ্যে বাস করিতেছে, তাহারা এই নূতন বিধি পাশ হওয়ার পর, ছয় মাসের মধ্যে বাসেন্দা এবং তৎপর দুই বৎসরের মধ্যে সদস্য মনোনয়নের অধিকারী হইতে পারিবে।

এতদরিক্ত আর কিছুই ক্রুগার করিতে পারিবেন না, তিনি স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বলিলেন; তিনি ব্রিটিস গবর্ণরকে আরো বলিলেন যে, আমি যদি কিছু দেই, তবে তাহার প্রতিদানে কিছু আমি পাইয়াছি, একথা না বুঝাইতে পারিলে, আমার বারারদিগকে আমি কি বলিয়া প্রবোধ দিব?" সার আলফ্রেড্ কিছুই দিবার নিমিত্ত যান নাই, তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন কি না, তাহাও সন্দেহস্থল, কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি বিশেষ কোন ফললাভের আশায় যান নাই, কেবল ক্রুগারের ভাব বুঝিতে গিয়াছিলেন। কেবল ভাব বুঝিতে যাওয়া অপেক্ষা মোটে না যাওয়া সহস্রগুণে ভাল ছিল। তিনি যেরূপ ক্রুগারের ভাব বুঝিয়া আসিলেন, ক্রুগারেরও তদ্রূপ তাঁহার ভাব বুঝিতে আর বাকী রহিল না। উভয়ে উভয়কে পূর্ব্ব হইতেই অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছিলেন, সেই অবিশ্বাসের ভাব আরো বর্দ্ধিত হইল। সার আলফ্রেড্ বুঝিলেন, ক্রুগার প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই দিতে চাহেন না। ক্রুগার বুঝিলেন, বণিক্ ইংরেজ কেবল নিতে চাহেন, প্রতিদানে কিছুই দিতে ইচ্ছুক নন।

সার্ আল্‌ফ্রেড্ কেপ্‌টাউনে এবং ক্রুগার প্রিটরিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ক্রুগার প্রিটরিয়াতে ফিরিয়া যাইয়াই বোধ হয় মনে করিলেন যে, তিনি যতদূর কসাকসি করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। তখন সদস্যমনোনয়নাধিকার সম্বন্ধে এক সংশোধিত বিধানের পাণ্ডুলিপি রাষ্ট্রীয় সভায় উপস্থিত করিলেন; ব্লুমফণ্টিনে যত বিধি ও উপবিধিজালে এই অধিকারকে তিনি পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, এই পাণ্ডুলিপিতে তদপেক্ষা সহজ বিধান সন্নিবেশিত হইল। তখন সার্ আল্‌ফ্রেড্ এবং চেম্বারলেন্ সাহেব উভয়ই স্বীকার করিলেন যে, ব্লুমফণ্টিনে প্রেসিডেণ্ট যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহাপেক্ষা কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন এবং সাত বৎসরে সদস্য মনোনয়নাধিকার প্রদানের বিধানাবলম্বনে পুনরায় আপোসের কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে একটী জয়েণ্ট কমিসন নিযুক্ত করিয়া অগ্রে দেখা আবশ্যক যে, এই নূতন বিধান বিধি-বদ্ধ হইলে উইট্‌ল্যাণ্ডারদিগের কতদূর সুবিধা হইবে, কি পরিমাণ লোক তৎকালে অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ক্রুগার, যে কোন কারণেই হউক, এই কমিশনে সম্মত হইলেন না, পক্ষান্তরে ইংরেজ যাহা চাহিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অতিরিক্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি পাঁচ বৎসরের বাসেন্দাকে সদস্য-মনোনয়নের অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় সভায় উইট্‌ল্যাণ্ডারদিগকে আটটী নূতন সিট দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; অধিকন্তু একথাও স্বীকার করিলেন যে, উইট্‌ল্যাণ্ডারদিগের প্রতিনিধি মোট

সদস্যের ⅓ সংখ্যকের কম কখনও হইবে না, এবং তাহারা প্রেসিডেণ্ট ও কমাণ্ডেণ্ট জেনেরেল মনোনয়নের অধিকারী হইবে। কিন্তু এই প্রস্তাব নিম্নলিখিত সর্ত্তাধীনে করা হইলঃ—

(১) বিটিস্ গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বারের এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে পুনরায় আর কখনও ট্রান্সভয়ালের আভ্যন্তরিক শাসন-প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এবং এই দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে নজির স্বরূপ গণ্য হইবে না

সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যের এতৎ সম্বন্ধে মনের ভাব তাঁহারা পরে আরো স্পষ্ট করিয়া এইরূপে প্রকাশ করেন যে, ১৮৮৪ সালের সন্ধি দ্বারা অথবা আন্তর্জাতিক বিধানানুসারে ব্রিটিস্ প্রজার সত্ব ও স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত যে অধিকার পরিচালনের সত্ব ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে বলা হয় নাই। তাহা যেরূপ আছে, তদ্রূপই থাকিবে।

(২) ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আর "সুজারেণ্টির" দাবি করিতে পারিবেন না। এতৎ সম্বন্ধে তর্ক আপোসে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(৩) ফ্রাঙ্কাইজ্ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর অন্যান্য বিরোধীয় বিষয় মীমাংসার নিমিত্ত সালিসিতে অর্পিত হইবে। এই সালিসের মধ্যে ভিন্ন স্থানীয় কোন ব্যক্তি বরিত হইতে পারিবেন না। ফ্রিষ্টেটের বারারদিগকে বরণ করিতে কোন আপত্তি আছে কি না, তাহা ট্রান্স্‌ভয়াল গবর্ণমেণ্ট জানিতে চাহেন। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যাহা নিয়া মতান্তর, উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় সালিসের মীমাংসাতে অর্পিত হইবে, এবং কোন্ কোন্ বিষয় অর্পিত হইবে না, তাহাও অগ্রে জানা আবশ্যক।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্রের এই প্রস্তাব যে সঙ্গত, তৎসম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ নাই। এই প্রস্তাব করার পর ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের আর কথা বলিবার কি ছিল? তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, বুয়র গবর্ণমেণ্ট তাহা সম্পূর্ণ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তদতিরিক্ত আরো কিছু দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কেবল প্রতিদানে এই মাত্র চাহিতেছিলেন, এবার তোমাদিগের অনুরোধ রক্ষা করা হইল বলিয়া আমাদিগের ঘরের কার্য্যে যখন ইচ্ছা, তখন যে তোমাদিগের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে, একথা বলিতে পারিবে না বলিয়া স্বীকার কর।

দ্বিতীয়ত—উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি দ্বারা যে সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, একটা অনর্থক অনর্থযুক্ত "সুজারেন" শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই নির্দ্ধারণের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিবে না।

তৃতীয়ত—উভয় জাতির মধ্যে যখন যে ঝগড়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা মধ্যস্থ দ্বারা মীমাংসিত হইবে।

তৃতীয় সর্ত্তটী এরূপ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছিল যে, তৎসম্বন্ধে ভাষা আরো পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহাতে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, বুয়র গবর্ণমেণ্ট এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই বিষয় লইয়া ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের সহিত কলহে কখনও প্রবৃত্ত হইতেন না। সরলভাবে যদি ট্রান্সভয়াল গবর্ণমেণ্টকে বলা হইত যে, তোমারা যে এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছ, তজ্জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ কর, কিন্তু অপরাপর বিষয়ে

কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক ইত্যাদি, তাহা হইলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত। কিন্তু চেম্বারলেন্ সাহেব ২৮ শে আগষ্ট তারিখে উক্ত লিপির যে উত্তর প্রেরণ করিলেন, তাহার ভাষা এবং ভাব তুল্যরূপে অসরল, এবং অনাত্মীয়তা পূর্ণ।

ঔপনিবেশিক সচিব লিখিলেন যে, পাঁচ বৎসরের বাসেন্দাকে ফ্রাঞ্চাইজ্ দেওয়া হইবে বলিয়া লেখা হইয়াছে, কিন্তু ট্রান্স্‌ভয়াল তাঁহাদিগের এই দানকে হয়ত এত বিধি, উপবিধি, সর্ত্ত এবং সময় দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবেন, যে কার্য্যত কিছুই দেওয়া হইবে না। সুতরাং অগ্রে উভয় পক্ষের একত্রে কমিসন দ্বারা অথবা এককালে স্বতন্ত্র ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক যে, প্রস্তাবিত বিধান বিধিবদ্ধ হইলে, সম্প্রতিই যথেষ্ট পরিমাণ উইট্ল্যাণ্ডার ফ্রাঞ্চাইজ্ পাইবার অধিকারী হইবেন কি না।

এই কথা কি ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীর পদোচিত হইয়াছে? ইংলণ্ড যে প্রস্তাব করিলেন, ট্রান্স্‌ভয়াল তাহা গ্রহণ করিলেন, তদতিরিক্তও দিলেন; ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্য কোন বাধাজনক সর্ত্ত অথবা নিয়মের কথা উল্লেখ করেন নাই; তবে অকারণ তাঁহার প্রতি কপটতা অথবা অসততার দোষারোপ কেন? সন্দেহস্থলে বরং শিষ্টাচারের সহিত বলিতে পারিতেন যে, ভবিষ্যতে পুনরায় এই বিষয় লইয়া উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যাহাতে মনান্তর না ঘটে, তজ্জন্য উভয় পক্ষেরই সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়, সুতরাং আপনাদিগের প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখা আবশ্যক। ইংলণ্ড যে ভাবে উত্তর দিলেন, তাহাতে যাহার প্রাণে আত্মসম্মানের সামান্য পরিমাণে অনুভূতিও বর্ত্তমান আছে, সে ক্ষুণ্ণ না হইয়াই থাকিতে পারে না। তারপর নূতন বিধি বিধিবদ্ধ হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন উপকার হইবে কি না, প্রস্তাবের পূর্ব্বে কি এ বিষয়ে ইংলণ্ডের চৈতন্য জন্মিয়াছিল না?

তৎপরে ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যের উল্লিখিত চিঠীর অন্যান্য অংশের উত্তরও উপযুক্ত এবং সময়োচিত হইয়াছিল, এরূপ বলা যাইতে পারে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্রের সেক্রেটরী লিখিয়াছিলেন, সন্ধির সর্ত্তানুসারে এবং সকল গবর্ণমেণ্টেরই নিজ প্রজার সত্ত্ব এবং স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত যে ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার আছে, তদনুসারে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন সম্বন্ধে যে পরিমাণ কথা বলিতে অধিকারী, তাহা বলিতেছেন এবং বলিবেন, ট্রান্স্‌ভয়াল তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না। কিন্তু এবার ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ট্রান্স্‌ভয়াল যাহা করিলেন, তাহা নজির দেখাইয়া যেন ভবিষ্যতে আবার উল্লিখিত বিষয়ের অতিরিক্ত কোন আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপণ না করা হয়। উভয় গবর্ণমেণ্টই পরস্পরকে অবিশ্বাস করিতেন, সে ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের যেরূপ ভাব হইতে পারে, তাহার কোন পক্ষেই ক্রটী হয় নাই। রিজ সাহেবের পক্ষেও এইরূপ ভাবে লেখা সঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। তাঁহার এই কথাই তিনি আরো কত রকমে লিখিতে পারিতেন, এবং এরূপ ভাবেও লিখিতে পারিতেন যে, তাহার অসরল উত্তর দেওয়া ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব হইত, কিন্তু তিনিও সে প্রণালী অবলম্বন করিলেন না। আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র

লোকের পক্ষে এই সমস্ত কথা বলা বড়ই প্রগল্‌ভতা; কিন্তু লেখকের আসন গ্রহণ করিলে সরলভাবে প্রাণের কথা জগৎকে বলা কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে কর্ত্তব্যের ব্যভিচার হয় বলিয়া আমরা মনে করি। যাহা হউক, উভয়পক্ষই তুল্য। চেম্বারলেন্ সাহেব সোজা কথায় লিখিতে পারিতেন, সন্ধির নিয়মের অধীনে এবং নিজ প্রজা-রক্ষার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক বিধানানুসারে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের যে অধিকার আছে, তাহার অতিরিক্ত কোন অধিকার পরি-চালনের নিমিত্ত যে এই গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষমতা আছে, তাহা কখনও মনে করা হয় নাই এবং মনে করা হইবে না, এবং বর্ত্তমান সময়ে ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্য যাহা করিলেন, তাহা আমরা ভবিষ্যতে নজির বলিয়া গণ্য করিব না। কিন্তু তদ্রূপ উত্তর না দিয়া ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী তৎসম্বন্ধে লিখিলেন যে,—

"১ম। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্বন্ধে মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, উইটল্যাণ্ডারদিগের সম্বন্ধে প্রতি-শ্রুতি কার্য্যে পরিণত, এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগের প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহারের দ্বারা আর তাহাদিগের স্বপক্ষে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করার আবশ্যকতা থাকিবে না। কিন্তু মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্টের সন্ধির সর্ত্তাধীনে যে অধিকার আছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে কিম্বা প্রত্যেক সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের নিজরাজ্যের বহির্দ্দেশবাসী প্রজাকে রক্ষা করার যে অধিকার আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে তাঁহারা অশক্ত।"

২য়। সুজারণ্টি সম্বন্ধে, মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ তন্ত্রের গবর্ণমেণ্টকে আমার ১৩ই ডিসেম্বর তারি-খের লিপির ২য় প্যারাগ্রাফের প্রতি দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

কথিত ২য় প্যারাগ্রাফে নিম্নলিখিত রূপ লেখা ছিল ঃ—

"আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত মোটের উপর মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্টের মতের ঐক্য আছে, এবং এই বিষয় লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্রের গবর্ণ-মেণ্টের সঙ্গে আর তর্ক করিবার কোন ইচ্ছা নাই। সাধারণ-তন্ত্রের গবর্ণমেণ্টের মতে তাঁহারা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র রাজ্য, এই তর্ক এই গবর্ণমেণ্ট মতে আইন, অথবা ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হয় না এবং ইহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।"

সালিস বরণ করা সম্বন্ধে লেখা হইল যে, বিদেশীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া যে প্রণা-লীতে সালিস বরিত হইতে পারে এবং সালিসগণ কি কি বিষয়ের মীমাংসা করি-বেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত আছেন।

উপরের লিখিত উত্তরগুলির রকম দেখি-লেই অবাক্ হইতে হয়। তৎপরে সকলের চূড়ান্ত, চিঠির শেষাংশ। এই অংশে লেখা হইল যে, যে সমুদয় বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইল, তদতিরিক্ত আরো অনেকগুলি বিষয়ে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মতান্তর আছে, উইট্-ল্যাণ্ডারদিগকে ফ্রাঞ্চাইজ্ দিলে তাহা বিদূরিত হয় না, এবং সেই সমুদয় বিষয় সালিসের দ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে না, সুতরাং তজ্জন্য প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের পক্ষে কেপ্‌টাউনে আসিয়া সার্ আলফ্রেডের সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

বুয়রদিগের প্রাণের ভাব পূর্ব্বেই সন্দেহ পূর্ণ ছিল, এই চিঠি পাইয়া তাহা আরও বর্দ্ধিত হইল, তাঁহারা ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদিগের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তাহাতে তাঁহারা দুঃখিত হইলেন ইত্যাদি। তথাপি তাঁহারা লিখিলেন যে, ফ্রাঞ্চাইজ্ সম্বন্ধে বিধান কিরূপ কার্য্যকর হইবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু যে বিধি কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তাহার কার্য্য সম্বন্ধে কিরূপে এইক্ষণে আলোচনা করা যাইতে পারে, এবং কতকগুলি জটিল নিয়মাধীন বিষয়ের তদন্ত করিবার নিমিত্ত কি প্রণালীতেই বা কমিসন গঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা আর কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন। শেষাংশের অর্থ তত পরিষ্কার নহে, আমরা এই নিমিত্তই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উভয় পক্ষই তুল্য, "এ বলে মোকে দেখ ও বলে মোকে দেখ"।

অতঃপর ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরেজের মন্ত্রী-সভার অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনান্তে তাঁহারা বুয়র গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বুয়র যাহা দিতে চাহিতেছেন, তাহা নিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ট্রান্স্ভয়াল্ প্রতিদানে যাহা চহিয়াছিলেন, তাহা দিতে স্বীকৃত হইলেন না। পক্ষান্তরে আবার একটী নূতন দাবি উপস্থিত করিলেন যে, নূতন সদস্যগণকে রাষ্ট্রীয় সভায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। তৎপর আবার নিম্নলিখিত রূপে মধুরেণ সমাপয়েৎ করিলেন। সেই মধুর অংশটী এই—"ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, এরূপ কখনও ঘটিবে না, তথাপি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ তন্ত্রের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের উপরে আমাদিগের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, অথবা তৎসম্বন্ধে উত্তর অসম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় অভিনবরূপে বিবেচনা করিবার এবং শেষ মীমাংসার নিমিত্ত তাঁহাদিগের মতানুসারে প্রস্তাব করিবার অধিকার মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন রহিল।" এই চিঠীর উত্তরে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্র গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমরা যাঁহা চাহিয়াছি, তাহা না দিয়া আপনারা কি কারণে আমাদিগের প্রস্তাবিত দান যে পাইতে আশা করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না।" আমরা যাহা চাহিয়াছি, তাহা না পাইলে আমরা কিছুই দিতে পারি না! এই উত্তরের নিমিত্ত বুয়র গবর্ণমেণ্টকে কেহই নিন্দা করিতে পারে না, এইরূপ উত্তর স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। বুয়র গবর্ণমেণ্টের চিঠী পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।

বুয়র গবর্ণমেণ্টের শ্রেষ্ঠতম অদূরদর্শিতা।

আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, বোধ হয় পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বুয়র গবর্ণমেণ্ট যদি অপেক্ষাকৃত কম স্বার্থান্বেষী, এবং অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ একদেশদর্শী হইতেন, তাহা হইলে, বুয়র জাতির এই দুর্দ্দশা ঘটিত না। শেষ সময়ে তাঁহারা উদার নীতি অবলম্বন করিয়া ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট পাঁচ বৎসরের বাসেন্দাকে ফ্রাঞ্চাইজের অধিকারী করিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাই

স্বীকার করিয়াছিলেন, কেবল দুইটী সর্ত্তের অধীনে তাঁহারা এই ফ্রাঞ্চাইজ্ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ১মটী, এই ঘটনা ভবিষ্যতে নজির বলিয়া গণ্য হইবে না। দ্বিতীয়টী সন্ধির সর্ত্তাধীনে এবং প্রত্যেক রাজ্যের স্বাভাবিক যে অধিকার আছে, তদতিরিক্ত কোন অধিকার আভ্যন্তরিক শাসন সম্বন্ধে পরিচালিত হইবে না। এই কথা বুয়র গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বলিয়াছিলেন, যদি তাহা স্থির রাখিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন, তবে ইংরেজের পক্ষে অগ্রে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইত। তাঁহারা সভ্য জগৎকে কি বলিতেন? ইংলণ্ডের লোককেই বা কি বলিয়া প্রবোধ দিতেন? কিন্তু নিয়তির গতি অপরিহার্য্য। বুয়র ইংলণ্ডের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া অভিমানে তাহা প্রত্যাহার করিলেন, তৎপর ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখে ইংলণ্ডকে শেষ লিপি (Ultimatum) প্রেরণ পূর্ব্বক যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন।

ক্রুগার নিজে যুদ্ধার্থী হইয়া ইংরেজ-রাজ্য আক্রমণ না করিলে; ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ট্রান্স্ভয়াল রাজ্য আক্রমণ সহজ হইত না। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রাজ্য সন্ধির সর্ত্ত অতিক্রম না করিলেও যদি ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত, তবে অন্য রাজন্যবর্গ আর কিছু করুন বা নাই করুন, ইংলণ্ডের কার্য্যকে একবাক্যে দূষিত এবং নিন্দিত বলিতে পারিতেন, ক্রুগারের শেষ কার্য্যে সে পথও তিনি অবরুদ্ধ করিলেন।

আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ রণ-ঘোষণার কোন অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই। ক্রুগার কি কখনও কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড হইতে অধিক পরিমাণে সৈন্য সামন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ব্রিটিস্ জাতিকে আফ্রিকা হইতে বিদূরিত করিতে পারিবেন? যদি তিনি তদ্রূপ ভাবিয়া থাকেন, তবে তাঁহার নিজের বল তিনি নিজে বড়ই অন্যায়রূপে বেশী মনে করিয়াছিলেন। পাহাড় পর্ব্বতের আড়ালে বসিয়া অব্যর্থ সন্ধানে আক্রমণকারী শত্রুকে বিনাশ করা এক কথা, আর অনাবৃত প্রান্তরে শিক্ষিত সৈন্যের উদ্যমময় আক্রমণের সম্মুখে স্থির থাকা সম্পূর্ণ পৃথক কথা। বুয়র নিজ রাজ্য মধ্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ, পটু এবং কৌশলী, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু আক্রমণকারী সৈন্যের যে শিক্ষা এবং ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক, তিনি তাহার অধিকারী ছিলেন না, তাহা তাঁহার বুঝা উচিত ছিল।

তার পর, যদি এই অসম্ভবপর কার্য্য সম্ভবপরও হইত, যদি বুয়র ব্রিটিস্ জাতিকে কেপ-কলনী এবং নাটাল হইতে প্রথমত বিদূরিত এবং তাড়িত করিতে সক্ষমও হইতেন, তবে ক্ষমতাশালী ব্রিটিস্ জাতিকে উত্তেজিত করিয়া সেই জয়লব্ধ ফল কত দিন ভোগ করিতে পারিতেন? ইংরেজের সহিত অস্ত্রবল পরীক্ষায় প্রথমতঃ যাহাই হউক, পরিণামে বুয়র কোন ক্রমেই যে জয়াশা করিতে পারেন না, ইহা বুয়রাধিনেতা ক্রুগারের বুঝা উচিত ছিল। তিনি ইহা বুঝিলেন না, তাঁহার শত্রুগণ যাহা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছিল, তিনি নিজে অগ্রণী হইয়া তাহাই করিলেন, ইহাকে অদূরদর্শিতা

না বলিলে আর কাহাকে অদূরদর্শিতা বলিব ?

যে যুদ্ধ, আত্মরক্ষার নিমিত্ত, মনুষ্যের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষার নিমিত্ত, আর্ত্তকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, জগতকে অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত, সেই যুদ্ধকে কেহই নিন্দনীয় অথবা দূষনীয় বলে না। যদি কোন যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিলে পুণ্য হয়, তাহা এই শ্রেণীর যুদ্ধ। কিন্তু যে যুদ্ধ কেবল নিজের দাম্ভিকতা প্রকাশের নিমিত্ত, নিজের বল বিক্রম বিকাশের নিমিত্ত, পরের সর্ব্বস্বাপহরণ এবং পরপীড়নই যে যুদ্ধের মূলভিত্তি, সে যুদ্ধ অত্যন্ত ঘৃণিত এবং নারকীয় পদার্থ। যাঁহারা তদ্রূপ যুদ্ধের নায়ক, তাঁহারা কখনও জগতে পূজ্য বলিয়া সম্মানিত হইতে পারে না।

যুদ্ধ যে প্রকারেরই হউক না কেন, ধ্বংস ইহার অভিন্ন সহচর। যুদ্ধের যে কেবল লোকের ধ্বংস হয়, তাহা নহে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণের উচ্চভাব এবং উচ্চাদর্শ বিদূরিত হইয়া, নীচ জিঘাংসা তাহাদিগের হৃদয়কে অধিকার করে। যুগ যুগ ব্যাপী শিক্ষা এবং সভ্যতার ফলে সামাজিক সংমিশ্রণ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং বহুদিনের নিমিত্ত বিশ্লিষ্ট হয়। দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের ও চিন্তার ফলে যে উন্নতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সহস্র সহস্র প্রাণের হৃদয়ের তন্ত্রী বিষম আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং সহস্র সহস্র নরনারীর, আবাল বৃদ্ধ বনিতার হাহাকার স্বরে আনন্দময় সংসার পরিপূর্ণ হয়। যাঁহারা সৌন্দর্য্যময় সৃষ্টি মধ্যে সর্ব্ব-বিনাশক এই ধ্বংসের প্রধান সহচরকে আনয়ন করেন, তাঁহাদিগের দায়িত্ব কি ভয়ানক !

আমরা ইংরেজ জাতিকে নির্দ্দায়ী অথবা নির্দ্দোষী বলিতেছি না। ইংলণ্ড যুদ্ধের নিমিত্ত ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন, একথা যদি সত্যও হয়, তথাপি ক্রুগার তাঁহাদিগকে সেই ছিদ্র দেখাইয়া না দিলে, তাঁহারা অগ্রে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন না। ক্রুগার সেই ছিদ্র অগ্রণী হইয়া দেখাইয়া দিলেন, এই নিমিত্তই আমরা তাঁহার নিন্দা করিতেছি।

ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাধান্য লইয়া বাকবিতণ্ডা করিতেছিলেন, যিনি প্রকৃত প্রধান, তাঁহার প্রাধান্য কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। মানুষের প্রকৃত প্রাধান্য এইরূপই পদার্থ যে, তাহা নিজের মুখে কখনই বাহির করা প্রয়োজন হয় না। প্রধান সর্ব্বদাই অপ্রধানের ন্যায় চলেন, কিন্তু অন্য লোকে আসিয়া তাঁহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। প্রধান ব্যক্তি অনেক সময় নিজের প্রাধান্যের বিষয় অবগত থাকেন না। ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিন প্রধান ছিলেন, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। প্রাণে মহত্ত্ব না থাকিলে কি মজুঁবা পরাভবের পর বুয়রকে ইংরেজসহস্তামুখে স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দান করিতে পারিতেন ? বুয়র ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের শত দোষ কীর্ত্তন করুন, কিন্তু ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। জেমসন্‌রেডের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজের এই মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। ইংলণ্ড অবলম্বিত নীতির বর্ত্ম হইতে একপদ স্খলিত হন নাই। অশুভক্ষণে রোড্‌সের ন্যায় লোকের হস্তে দক্ষিণ আফ্রি-

কায় ইংরেজ-গৌরব-রক্ষার ভার ন্যস্ত হইল, তিনি নিজেও অধঃপতিত হইলেন এবং ইংরেজকেও উচ্চ আসন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অধঃপতিত করিলেন। ইংরেজ-প্রাধান্যের ভিত্তি এই সময়ে সমূলে কম্পিত হইল। ইংরেজের সততার প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার আস্থা টলিল। ক্রুগার এই সময় যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, যদি তদপেক্ষা উদার নীতি অবলম্বনে কার্য্য করিতেন, তবে ট্রান্স্ভয়াল রাজ্যের স্থায়িত্বের ভিত্তি অক্ষয় পাষাণে গ্রথিত হইত এবং বুয়র ইংরেজাপেক্ষা প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রাধান্য অন্য ভাবে স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন। তিনিও নিজকে নিজে প্রধান বলিয়া প্রচার করিয়া প্রধান হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, যিনি নিজকে নিজে বড় বলেন,তাঁহার মনেই একটা ধারণা থাকে যে, কেহ তাঁহাকে নিশ্চয়ই ছোট বলিতেছে, এবং তদ্রূপ বলিবার কারণও আছে।

ইংরেজ ভগবানের যেরূপ অনুগৃহীত, তাহাতে কি তাঁহার অস্ত্রবলে প্রাধান্য স্থাপন সঙ্গত? অস্ত্রবলে, অত্যাচারবলে ত দস্যুও ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রধান হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের প্রকৃত প্রাধান্য তাহার সদ্দৃষ্টান্তে, উদ্যমে, এবং শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারে। বুয়র যদি এই ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেন, ইংলণ্ড তাহার শিরশ্ছেদনের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিতে কখনই সম্মত হইতেন না। কিন্তু বলের পরীক্ষায় ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া বুয়রের মূর্খতার পরাকাষ্ঠা।

কেহ বলিতে পারেন, বুয়র জয় পরাজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধার্থী হইয়াছিলেন না, জয় এবং পরাজয় ভগবানের প্রতি অর্পণ করিয়া কেবল মনুষ্যের ন্যায়ানুগত স্বত্ব এবং স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। বুয়র যদি অগ্রণী হইয়া পর-রাজ্য আক্রমণ না করিতেন, যদি ইংরেজাধিকারের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত ও গৃহাদি ভস্মীভূত না করিতেন, কেবল আত্মরক্ষার নিমিত্ত লিউনিডাসের ন্যায়—মহারাজা প্রতাপসিংহের ন্যায়—বদ্ধপরিকর হইয়া শত্রু-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেন, শত্রুর গতিরোধ করিতেন, তবে এ কথার সত্যতা আমরা অম্লান বদনে স্বীকার করিতে পারিতাম। কিন্তু বুয়রের কার্য্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ, তিনি আক্রমণকারী, আক্রান্ত নহেন।

মানুষ যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, নিয়তিচক্র অতিক্রম করা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। বুয়র নির্ব্বোধ নহেন, ক্রুগার একজন অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত, অথচ তিনি ভূয়োভূয়ঃ এইরূপ ভুল করিলেন! আর সেই ভুলের ফলে আজি বুয়রের জাতীয় জীবন নিঃশেষিত।

দক্ষিণ আফ্রিকার কি দুরদৃষ্ট! যে তিনটী লোকের উপর অদৃষ্ট প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছিল, সে কয়েকটী লোকই কি ভগবান এক ধাতুতে গড়াইয়াছিলেন? সার আলফ্রেড্ মিলিনার এবং প্রেসিডেন্ট ষ্টিনেরও বোধ হয় পূর্ব্বার্জ্জিত কোন পাপ ছিল, নচেৎ এই ক্ষেত্রে এই প্রকার কার্য্যের সহযোগীতা করা তাঁহাদিগের অদৃষ্টে ঘটিল কেন? সার আলফ্রেড্ কোন কার্য্যের নিমিত্ত নিজে দায়ী নন। তিনি ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে প্রেরিত হন। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত একেবারে নীরবে ছিলেন, ভাল মন্দ কোন কথাই বলেন নাই। তাহার পর যখন নিজে

সমস্ত দেখিলেন, বুঝিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন, তখন ইংলণ্ডকে সকল কথা জানাইলেন। ইংলণ্ডের তখন কালনিদ্রা ভাঙ্গিল। পূর্ব্বে যখন ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্য ধনমদে মত্ত হইয়া ন্যায়ানুগত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপথে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, যখন ইংলণ্ডের কথার প্রতি তাঁহাদিগের আস্থা ছিল, তৎকালে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে ন্যায়ানুগত পথ দেখাইলে, তাঁহারা ধন্যবাদের সহিত সেই পথে অগ্রসর হইতেন। তখন ইংলণ্ডের চক্ষে ক্রুগারের ন্যায় লোক আর কোথায়? ক্রুগার যাহা করেন, তাহাতেই বাহাবা। তারপর যখন চক্ষু মেলিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, কার্য্য বড়ই অন্যায় হইয়াছে। সেই পূর্ব্বকৃত ত্রুটী সংশোধন করিতে যাইয়া আরো সহস্র ত্রুটীর জন্য দায়ী হইলেন, নিজের অবহেলায় যে প্রাধান্য হারাইয়াছেন, তাহা পুনঃস্থাপনের চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া আরো নীচতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেন। মিলিনার কি করিবেন? কর্ত্তব্যের বোঝা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন, প্রাণপণে বহন করিয়াছেন, অকারণে তিরস্কৃত হইয়াছেন, সমুদয় সহ্য করিয়াছেন। পরের কার্য্যের নিমিত্ত অম্লান বদনে তিরস্কার সহ্য করা কম মহত্ত্ব নহে। কিন্তু তাঁহার মহত্ত্বে যায় আইসে কি? আফ্রিকার অদৃষ্টচক্রে তিনি উপগ্রহ মাত্র, প্রধান গ্রহ হইলে হয়ত আমরা অন্য ফল দেখিতে পাইতাম।

আমরা এতৎপূর্ব্বে যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা ব্যতীত আর একজন লোক আফ্রিকার বর্ত্তমান অবস্থার নিমিত্ত অনেক পরিমাণে দায়ী। শক্তি, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা এবং স্বার্থত্যাগে তিনি আদর্শ, তিনি পরিণামান্ধও ছিলেন না। কিন্তু বুয়র জাতির দুরদৃষ্ট বশত তিনিও এই ক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অশক্ত হইলেন। আমরা ফ্রিষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট ষ্টিন সাহেবের কথা বলিতেছি। অনেক নীচমনা লেখকের লেখনী ষ্টিনকে কলঙ্কিত করার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে মসিবর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু মহত্ত্বের উজ্জ্বল জ্যোতি স্বতঃ উদ্ভাসিত, যিনি যত আবর্জ্জনা তাহার উপর নিক্ষেপ করুন না কেন, কালে তাহা সমুদয় ভস্মীভূত এবং অপসারিত করিয়া সে জ্যোতি নরচক্ষের সমক্ষে বিভাসিত হইবেই হইবে। ষ্টিন ভ্রান্ত হইলেও, তাঁহার ভ্রান্তি উচ্চ প্রাণের বিচারভ্রান্তি, দুইটী প্রতিদ্বন্দী কর্ত্তব্য মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপনের অসামর্থ্য। এবং একটী কর্ত্তব্যকে ফলনিরপেক্ষ ভাবে অপরটী হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করার ফল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

সমাজ-শক্তি।

ধর্ম্মের দুই প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি, রাজা এবং সমাজ। রাজা এবং সমাজ উভয়ই মানবকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার সোপান। রাজা ব্যক্তিগত পাশব শক্তি, সমাজ সমষ্টিগত বিবেক শক্তি। রাজা পাশব-শাসন বলে এবং সমাজ প্রেম-বিবেক-বলে এ জগতের শাসন সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। রাজশক্তি যেখানে সমষ্টিগত সাধারণ শক্তিতে অভ্যুত্থিত, তথায় শান্তি বিরাজ করে, শাসন, সংরক্ষণ শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হয়। অন্যত্র কঠোর শাসন থাকিলেও অশান্তি এবং পাপ নির্ম্মূল হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে মানবকে রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র সমাজ-শক্তিই দণ্ডায়মান। পাপী, সকলকে তুচ্ছ করিতে পারে, কিন্তু সমাজ-বিবেকের নীরব শাসনকে উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু বিবেক যদি ম্লান হয়, সমাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, স্বেচ্ছাচারিতা যদি তথায় রাজত্ব করে, তবে মানবকে রক্ষা করিবে কে? রক্ষা করিবার বুঝিবা প্রত্যক্ষ আর কেহ নাই।

বিবেক প্রতি মানুষকে অসৎ হইতে সতে, প্রেয় হইতে শ্রেয়ে, অসুরত্ব হইতে দেবত্বে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উত্তেজনায় বা অবহেলায়,

অসংযমে বা অনিয়মে অনেক সময় বিবেক পরিম্লান হইয়া যায়। এই কারণে সব সময়ে মানুষকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে পারে না। এই সময়ে রাজশক্তি মানুষকে সাহায্য করে। কিন্তু রাজা যদি পতিত হন, কে রক্ষা করিবে? সে অবস্থায় সমাজ মানুষকে রক্ষা করে। সমাজ-বিবেকের তীক্ষ্ণ শাসনে পাপীর অন্তরে অনুতাপ উপস্থিত হয়, পাপী উদ্ধার হয়। কিন্তু সমাজ যদি পতিত হয়, তবে কে রক্ষা করিবে? সে অবস্থায় আর প্রত্যক্ষ রক্ষা-কর্ত্তা নাই। যে সমাজের সমষ্টিগত-বিবেক পরিম্লান ও আদর্শ খর্ব্ব, বুঝিবা সে সমাজের প্রয়োজনও নাই।

রাজশক্তি, সব সময়ে বিবেকানুমোদিত নহে। বংশ-পরম্পরায় পাশব-শক্তি কত শত শত পাপের অঙ্কুর সকলকে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া দিতেছে। সে শক্তির শাসন মানুষ গ্রাহ্য করে না; অথবা সে শক্তি নিরপেক্ষ ন্যায়ের শাসন দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না।

প্রতি ব্যক্তির বিবেক যে সমাজে উজ্জ্বল, পরিম্লান নহে, সে সমাজ সমষ্টিগত বিবেক-প্রাধান্যে সমুজ্জ্বল। সমবেত লোকের সম্মিলিত সমুজ্জ্বল বিবেক যে সমাজের রাজা, সেই সমাজের পাপের অঙ্কুর উন্মূলিত। সেখানে পাপী সদা অনুতপ্ত, ভয়ে জড়সড়। সম্মিলিত বিবেক-শক্তিই মানবত্ব। মানবত্বই পথভ্রষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মপথের ধ্রুবতারা। কিন্তু যে দেশে মানবত্বের আদর্শ নাই, সকলে স্ব স্ব প্রধান, স্বেচ্ছাচারী, শিথিল-বিবেক, সে দেশ রক্ষার উপায় কোথায়? বিবেক যে দেশে মরিয়া গিয়াছে, বা যে দেশে মরিয়া যাইতেছে, সে দেশ ও মরণের পথে চলিয়াছে, তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

পরিবারের কর্ত্তা বিবেক-প্রধান লোক হইলে, সে পরিবার পতনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। সমাজে বিবেক-প্রধান লোক কর্ত্তা হইলে, সে সমাজেরও পতনের ভয় নাই। ডিল্‌কে, পারনেল অসাধারণ লোক হইয়াও পতনের পর বিবেক-চালিত যে ইংলণ্ড-সমাজে নেতৃত্ব পদ হইতে পদমিত হইয়াছিলেন, সে ইংলণ্ড-সমাজ অনেকবার পাপের হস্তে পড়িয়াও মারা যাইতেছে না, এখনও পৃথিবীতে প্রধান। আর আমাদের দেশ, তুমি, আমি, সে—কত শত পতিত লোকের নেতৃত্বে উঠিতে চাহিতেছে! তাহা পারিবে কেন? উঠিতে না উঠিতে পড়িয়া যাইতেছে,—অথবা কত কাল ধরিয়া পড়িয়াই রহিয়াছে! অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? পাপী নেতা হইলে সমাজকে মজিতে হয়; সমাজের আদর্শ খর্ব্ব হয়। পতিত ব্যক্তি, সাধারণকে পতনের পথেই লইয়া যায়।

উপরের শ্রেণীর চরিত্রানুপাতে নিম্ন-শ্রেণীর চরিত্র গঠিত হয়। উপরের শ্রেণী সৎ হইলে নিম্ন শ্রেণীও সৎ হয়, উপরের শ্রেণী খারাপ হইলে নিম্নশ্রেণীও খারাপ হয়। আমাদের দেশের উপরের শ্রেণী বিলাসিতায়, ব্যভিচারে, মদ্যপানে যদি ডুবিয়া যায়, নিম্ন শ্রেণীকে কে রক্ষা করিবে?

আমাদের দেশের নেতৃত্ব বংশানুক্রমিক। যে বংশের যে ব্যক্তি উপরে ছিল, সে বা তার বংশধর, যতই অপরাধী বা পতিত হউক না কেন, চিরকালই নাকি উপরে থাকিবে! বংশের উপরে এখন আবার ধনের প্রাধান্য উপস্থিত। ধনী যত অপরাধীই হউন না কেন, নেতৃত্ব পাইবেনই। পতিত লোকের নেতৃত্ব যে সমাজে, সে সমাজ ডুবিবে, তাহার আর কথা কি? উচ্চশ্রেণী ও ধনী শ্রেণীর শিথিল-বিবেক, নিম্ন শ্রেণীতে সংক্রামিত হইতেছে,—দলে দলে লোক পাপের পথেই ছুটিতেছে। তুমি বল, বক্তৃতায় দেশ জাগিবে, কোথায় দেশ জাগিবে। হায় রে বুদ্ধি! চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন কোন্ দেশ কবে জাগিয়াছে বল ত? তুমি উল্লাসে পাপের সেবা করিবে, এবং অন্যকে জাগাইবার জন্য বক্তৃতা করিবে! নিশ্চয় জানিও, তোমার সে চেষ্টা কখনও সফল হইবে না। অগ্রে নিজে ভাল হও, তৎপর তোমার দৃষ্টান্তে অন্যে ভাল হইবে। নিশ্চয় জানিও, শুধু কথায় মানুষ ভুলিবে না।

নিয়ম, বিধি, সংহিতা সকল যখন বিবেকানুমোদনে রচিত হয়, তখন তাহা ঈশ্বরের প্রেরিত শাস্ত্র। আর সে সকল যখন স্বেচ্ছাচারী প্রধানদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার

অনুমোদনে রচিত, তখন তাহা ভূতের শাস্ত্র। সব দেশেই নিয়ম, বিধি, সংহিতা কোন না কোন আকারে আছে, অথচ লোক কেন পাপের পথে যাইতেছে? কারণ, উপরের শ্রেণী সে সকল মানে না। অথবা উপরের শ্রেণীর স্বেচ্ছাচার বা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই ঐ সকল বিধি ব্যবস্থা সৃজিত; সুতরাং তাহাতে মানুষের মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দেবাসুর—মানবে দুইয়েরই আবির্ভাব হয়। দেবত্বের প্রাধান্যে যখন মানুষ চলে, ফেরে ও কার্য্য করে, তখন মানুষের দ্বারা নিজের এবং সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়; আর যখন আসুরিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়, তখন কেবল পশুত্বের অভিনয় চলিতে থাকে, তখন তাহা দ্বারা কোন মঙ্গলের আশা থাকে না। দেবভাবের আবির্ভাবে যখন বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হয়, তখন তাহার দুর্জ্জয় প্রভাবে অসুর সম মানুষও কম্পিত হয় এবং ভয়ে ২ তাহার অনুসরণ করে। কিন্তু আসুরিক ভাবের আবির্ভাব দেখিলেই মানব সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল, শিথিল-বিবেক হয়। তাহারা মনে করে, তাহারাই জগতের রাজা। তাহারা যত জঘন্য কাজই করুক, তাহাদের আর শাস্তির ভয় নাই, মরণের ভয় নাই, কিছুই নাই। দুর্জ্জয় প্রভাবে তাহারা ধরাকে পাপে ডুবাইয়া দেয়।

হিন্দু সমাজের বিধি ব্যবস্থার অন্ত নাই। কিন্তু এক সময়ের এক দলের বিধি-ব্যবস্থা অন্য সময়ের অন্য দলের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। দেবত্বের আবির্ভাবের সময় যে সকল সুন্দর সুন্দর বিধি ব্যবস্থা হইয়াছিল, আসুরিক ভাবের আবির্ভাবের সময় তাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্র বিধবা বিবাহের অনুমোদনও করিয়াছেন, আবার বিরুদ্ধেও বলিয়াছেন। অনেক বিধিরই বিরোধী বিধি বর্ত্তমান। এরূপ অবস্থায় সমাজ কাহার আদেশ, কোন্ অনুশাসন মানিয়া চলিবে? নূতন ভাবে সমাজ গঠনের জন্য সময়োপযোগী বিবেকানুমোদিত নূতন বিধি ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু কে সে চেষ্টা করিবে? মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের একটু চেষ্টা ছিল, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। পুরাতন গলদে গা ঢালিয়া কোন রূপে সমাজ চলিতেছে। মদ্যপান, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহিলা-মর্দ্দন, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, জাল জুয়াচুরি, ঘুষ গ্রহণ—দিন দিনই যেন দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশ ও সমাজকে কে রক্ষা করিবে? রাজা বিদেশী, সমাজ গেল কি থাকিল, তাহাতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই। আর আমরাও সমাজ-বিধি সম্বন্ধে রাজাকে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে নারাজ। রাজা কিছুই করিতেছেন না; সমাজের নেতারা অনেকেই স্ব স্ব লইয়া ব্যতিব্যস্ত, অন্যদিকে অনেকেই পতিত, সুতরাং কে বা সমাজের কথা ভাবিবে, কে বা দেশ রক্ষা করিবে? গত সেন্সাস্ রিপোর্টে প্রকাশ, বঙ্গের বৈদ্য, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? সমাজের অশেষবিধ দুর্গতিই ইহার কারণ নয় কি? বিবাহের দোষেই দুর্নীতি ব্যভিচার সমাজে প্রশ্রয় পাইতেছে, বিবাহের অসমতার দরুণই অশেষবিধ পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে, দুর্ব্বলতা ও রোগ বাড়িয়া লোক সংহার করিতেছে। বিবাহের ক্ষেত্র প্রশস্ত না হইলে বাঙ্গালার সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই। কিন্তু কে সে সকল কথা ভাবিবে?*

* উন্নতির পথে কি ধ্বংসের পথে—বাঙ্গালী জাতি এখন কোন্ পথে অগ্রসর? একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়—বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উন্নত-শ্রেণী, ক্রমেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। কয়েক বৎসরের আদমসুমারীর আলোচনা করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৯ বৎসরের হিসাব আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই—বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর প্রভৃতি জেলায়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতির সংখ্যা কিরূপ হ্রাস হইয়াছে! প্রথমতঃ নিম্নলিখিত তালিকায় ব্রাহ্মণের অবস্থান্তর দৃষ্টি করুন:—

জেলা	১৮৭২	১৮৮১
বর্দ্ধমান—	১৬০৮২৬	১০৭৬৮৪
২৪ পরগণা—	১২০১০২	১১৪৯১১
নদীয়া—	৬০০২৪	৫৯৮৯৪
যশোহর—	৫১৯৯৯	৩৭৭৫২

ব্রাহ্মণের বংশ, বৎসরে বৎসরে এই অনুপাতে ধ্বংস

এদেশ রক্ষার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজকে এক সময়ে প্রধান সহায় মনে করিতাম। মনে করিতাম,ব্রাহ্মসমাজ আদর্শের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া অগ্রসর হইলে এদেশের সকল সমাজ সেই আদর্শে অগ্রসর হইবে। কিন্তু এতকাল পরেও,সমাজরক্ষার জন্য, নববিধান সমাজ ছাড়া, এ সমাজের অন্যান্য বিভাগে বিবেকানুমোদিত বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই। তাহার ফল এই হইতেছে, দিন দিন যেন স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার দিকেই সমাজের গতি হইতেছে। অনুতপ্ত পতিত লোকদিগকে আশ্রয় দিয়া সমাজ মহত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু যাহারা অন্যায় করিয়া তাহা সমর্থন করে, অনুতপ্ত হয় না, এমন লোকদিগকে প্রশ্রয় দিয়া সমাজ কি ভাল করিতেছেন? সমাজের উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মভাব অনেকটা শিথিল, নিম্নশ্রেণী টাকার খাতিরে উচ্চ-শ্রেণীর বশীভূত;—উচ্চশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতা অবাধে প্রশ্রয় পাইয়া চলিয়াছে; প্রচারক বল, নেতা বল, সকলে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! কোন্ পথে সমাজ চলিয়াছে, ভাবিয়া দেখিবারও বুঝিবা কাহারও অবসর নাই। ব্রাহ্মসমাজে যদি বিবেকশক্তি জাগরিত থাকিত, তবে পাপীরা ভয়ে সংত্রস্ত হইত—কিন্তু বিবেক শক্তির স্থলে আসুরিক শক্তির প্রাধান্য;—টাকা, টাকা, টাকা—এই রব চতুর্দ্দিকে;—ধনী লোকের শত সহস্র দোষ উপক্ষিত হইতেছে। সুতরাং দরিদ্রদিগেরও সাহস বাড়িয়া যাইতেছে। কে কার দোষের বিরুদ্ধে কথা বলিবে? কি জানি কেন, অনেকেই নিশ্চিন্ত এবং নির্ব্বাক্।

আমরা বুঝিয়াছি, বিবেক-শক্তি ব্রাহ্ম-সমাজে না জাগিলে,দেশের সকল আশা সুদূর-পরাহত। ক্রমে ক্রমে ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণ স্বর্গে গমন করিতেছেন, কেহ বা সংসার হইতে বিদায় লইতেছেন। যাঁহাদের হাতে সমাজের ভার পড়িয়াছে, তাঁহাদের চরণে নিবেদন, একবার ভাবিয়া দেখুন, সমাজের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে। দোহাই ধর্ম্মের, সমাজ রক্ষার জন্য সকল বদ্ধ-পরিকর হউন।

এই দুর্দ্দিনে. চতুর্দ্দিক যখন পাপের ঘনান্ধকারে পূর্ণ, তখন আর কাহাকে ডাকিব, কাহাকে ধরিব? বিবেক, তুই আজ কোথায়? মানবত্ব, তুই আজ কোথায়? দেব-বাঞ্ছিত সংহিতা, তুই আজ কোথায়? তোরা একবার এই পতিত দেশের পতিত সমাজের উদ্ধারের পথে সহায় হইয়া না দাঁড়াইলে আর রক্ষা নাই। কাতরে ডাকিতেছি, তোরা একবার জাগিয়া সমাজ-শক্তি-রূপে দণ্ডায়মান হ। আমি পাপী, দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পাপ-পথ পরিহার করিয়া স্বর্গের দিকে অগ্রসর হই। সমাজ শক্তি না জাগিলে আত্মরক্ষার বা এই পরাধীন দেশ রক্ষার আর যে উপায় নাই; তাই বিনীত প্রার্থনা,তোরা একবার সহায় হ। তোরা, দেবধামের দেবশিশু, মর্ত্ত্যের অমিয়া-ধারা,অথবা তোরাইত বিধাতার বিধাতৃত্ব। দোহাই তোদের, একবার, সহায় হ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

আত্ম-সমর্পণ

মা!

যার কাছে গেছি দুহাত জুড়িয়া
কাতরে কেঁদেছি গভীর দুখে,
সে-ই গেছে সরি'—অবজ্ঞার হাসি
উঠিয়াছে ফুটি তাহার মুখে!

ছার জীবনের বিশটী বছর
এখানে ওখানে ঘুরিয়া হরি,
সন্দেহ সংশয় বাড়িয়াই গেল
আজ বাদে কাল কখন মরি!

প্রাপ্ত হইতেছে। কায়স্থের সংখ্যাও এইরূপভাবে হ্রাস-প্রাপ্ত;—বর্দ্ধমান জেলায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থের সংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে হয় ৩৩ হাজার। কায়স্থের কেন্দ্রক্ষেত্র যশোহর-জেলায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থের সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হয় ৬০ হাজার! বৈদ্য এবং নবশাখ শ্রেণীও প্রায় এই অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। জানি না—একরূপ ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে এ জাতির অস্তিত্ব আর কতকাল বিরাজমান থাকিবে? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—উন্নতির পথে কি ধ্বংসের পথে? "অনুসন্ধান, ১২ই আষাঢ়, ১৩০৮।

মতে মতে ঘুরি এতদিন নাথ,
ফুলে ফুলে যথা ভ্রমর ধায়,
ক্লান্ত এ তনু অবশ পরাণ
নাহিক শকতি নাড়িতে পায়!

বিবাদ কলহ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ
অস্থিমজ্জাগত হয়েছে এবে,
অতীত কাহিনী সে গৌরব গাঁথা
ভুলেও স্বদেশী দেখেনা ভেবে!

সমগ্র জগত আছে যে চাহিয়া
ধর্ম্মের উৎকর্ষ ভারতের যত,
অনাদি অনন্ত ইতিহাস-স্তূপে
কোথাও পড়েনি তাহার মত।

বুঝিবা সে শুধু আকাশ-কুসুম—
এ বিশ্বের প্রাণে জীবন দান,
এক পরিবারে ঘরের অন্দরে,
নিয়ত যখন ভণ্ডামি ভাণ!

ধন মানে সুখে কিম্বা অহঙ্কারে
বলি দিতে আজো শিখেনি যারা,
বিশ্বাস ভক্তির মহা সন্ধিস্থানে
পারে কি কখনো দাঁড়াতে তারা?

তর্কবিতর্কের স্রোত প্রবাহিত
নাস্তিক যুবকে ধরম দিতে,
নির্ম্মল চরিত্র গভীর সাধনা
অবশ্যই চাই বিশ্বের হিতে।

সে কথা ভুলিয়া দলাদলি লয়ে
হায় জগদীশ! সকলে ঘুরে,
কি সুখে তাদের কাটে গো যামিনী
কতসুখ সেথা অহংপুরে?

যৌবন-ঊষায় প্রবৃত্তি-তাড়নে
বড় ভাগ্যবান অনাথ আমি,
তাদের দুয়ারে গিয়েছিনু কাঁদি
পাই নাই কিছু নিখিলস্বামি!

কেজানে কখন নিবিবে প্রদীপ
শাস্ত্র পড়া—তা'তে সময় চাই,
কিবা কাজ মিছে সময় ক্ষেপণে
দিবে কিগো প্রভো! চরণে ঠাঁই?

তব স্নেহ-মাখা পদতলে দেব,
বিমল ঊষায় উঠিব জাগি,
তোমার পবন মৃদু মন্দগতি
সৌরভ বহিবে আমার লাগি।

আকাশে চন্দ্রমা আমারি কারণ
উঠিবে নিয়ত মধুর হেসে,
গিরি, নদী, নদ, জলধি প্রান্তর
মোর হাসি সনে যাইবে ভেসে।

বিহঙ্গমকুল আকাশ মণ্ডলে
উড়িতে উড়িতে ধরিয়া তান,
বাজাইয়া দিবে এ জীবন-বীণে
বিশ্বাস ভক্তির গভীর গান।

কিন্তু
তোমার জগতে তুমি যে গো সব
"আমার' 'আমিত্ব' ভূতের কথা,
যে কাজ করাবে তাহাই করিব
খুঁজিব না আর সুখ কি ব্যথা!

যার কাছে গেছি সেই দে'ছে ঠেলে
বড় আশা করে এসেছি কাছে,
আমার স্থিতির তুমি লয় হও
অভাগা কেবল ইহাই যাচে!

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ শাসমল।

সিন্ধু-পারে।

যুগ যুগ বাহি' কত এ অকূল সিন্ধুতীরে
রহিয়াছি বসি,'
সুদীন মস্তক'পরে কত ঋতু চ'লে গেল,
কত রবি শশি!—
কত ঝঞ্ঝা, কত ঘাত হৃদির উপর দিয়া
গেছে কত দলি,'
করুণা কটাক্ষ রেখা হেলায় করেনি পাত
কেহ দীন বলি'!

অন্ধ কপর্দ্দকহীন: ভিখারী বলিয়া মাঝী
পার নাহি করে,
তীরে বসি' গণি তাই অনন্ত সাগর-উর্ম্মি
যুগ যুগ ধরে!—
আমারি সমুখ দিয়া কত যাত্রী পারে গেল
মৃদু ব্যঙ্গ হাসি,'
আমি শুধু আছি বসি' মাথায় লইয়া সেই
তুচ্ছ ঘৃণারাশি!

কে আজি এসেছ তুমি মহা জ্যোতির্ম্ময় ওহে
দেবরূপী নর!

পরপারে যা'বে বুঝি 'লভিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি
অজর অমর !
ধরিত্রীর সুপ্ত প্রাণে সৌরভ অমিয়মাখা
চেতনার ফুল
ফুটাইলে এত কাল ভেঙ্গে দিয়ে তার যত
স্বপনের ভুল ;

হৃদয়মরুতে তা'র বহাইয়া দিলে তুমি
অমিয় নিঝর,
স্বর্গের 'নন্দন' আনি' স্থাপিলে ধরণী বক্ষে
হে কবিপ্রবর !
আজি যে যাইবে পারে সাথে ক'রে লয়ে যাও
ক্ষুদ্র দীন হীন,—
শত তমোযুগ পরে জীবনের প্রাচী মূলে
ফুটুক সুদিন !

তরীতে উঠিতে যেতে সন্দেহ আকুল যদি
মাঝী কিছু কয়,—
তোমারি চরণে দীন 'ভৃত্য বলি' তুমি তারে
দিও পরিচয় !!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

পল্লী-চিত্র।

বিপুল জনতাময় শব্দ অবিরাম,
তাহা হতে একটুকু লভিতে বিরাম,
আসিয়াছি পল্লিবক্ষে, দিনেকের তরে ;
কিসের বন্ধন টুটি, সহসা যেনরে
গগনবিহারী মম ক্ষুদ্র মুক্ত প্রাণ
হেরি সে অসীম শোভা ; ক্ষীণ কণ্ঠে তান
তুলিল হৃদয় মম, মহান্ সঙ্গীতে
প্রকৃতির ; ক্ষণকাল রহি স্তব্ধ চিতে
হেরি সে বিপুল শোভা। কি মহা উৎসব
হতেছে এ পল্লিবক্ষে! কি মধুর নব
রাগিণী বাজিছে হেথা ! কি শোভা অতুল !
কিবা গন্ধ, কি সৌন্দর্য্য, কত ফল ফুল,
বিহগের কলকণ্ঠ, সুমধুর গান
তটিনীর ; অলিকুল মৃদু-মধু-তান,
বিরাট প্রকৃতি-শোভা ! চরণে নমিয়া
পাদপের, গ্রাম্যপথ গিয়াছে চলিয়া
আঁকা বাঁকা, কার দ্বারে লভিতে আশ্রয় ;
সবিতার ক্ষর করে, পাছে শ্রান্ত হয়
গ্রামবাসী পান্থ জন, স্নেহ পূর্ণ প্রাণ
তাই তরুরাজি, করে স্নিগ্ধ ছায়া দান
গ্রাম্য পথ খানি পরে। স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জল-
পূর্ণা তটিনী গাহি কল কল কল
চলেছে কি জানি কোথা। কোথা হতে আসে
কোথা পুনঃ চলে যায় যদি বা জিজ্ঞাসে
গ্রামবাসী কেহ, তবে ছলাৎ ছলাৎ
তটোপরে স্নেহ ভরে করিয়া আঘাৎ
কল কল গেয়ে পুনঃ কোথা যায় চলে ;
কোথা হতে আসে যায় কারেও না বলে।
প্রকৃতির প্রিয় ভূমি বিলাস-আলয়
নিশিদিন কতরূপে তাহারে সাজায়
মধুরে প্রকৃতি নিজে। শ্যামল অঞ্চল
প্রান্তরে বিছায়ে রাখে ; গ্রামের চঞ্চল
রাখাল বালকগণ খেলা করে তায়
মহোল্লাসে ; গাভীগণ চরিয়া বেড়ায়
অদূরে ; বালকগণ গাহে সুমধুর
অধরে বাঁশরী সাথে, দূর অতি দূর।
সমীরণ সেই গান বহে নিয়ে যায়
অস্পষ্ট, মধুর তবু, যেন ভেঙ্গা প্রায়।
সচেতন সদা ফুল্ল অয়ি পল্লি ! তুমি
বিলাসিনী প্রকৃতির বিলাসের ভূমি।
পড়িয়ে জড়ভক্তিকর বুলায়েছে তুলি,
ফিরিয়া স্বর্গের দিকে যাই ভুলি।
শক্তি না জাগিলে আত্মরাগে নয়ন।
[illegible] যে মোহ উৎপাদন
করে সে মাধুরী, রহি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ
প্রকৃতির পানে চাহি নিশ্চল বিমুগ্ধ।
বিশ্বরচয়িত্রী যিনি তাঁর কল্পনায়
তাঁহার কবিত্বে, তাঁর পবিত্র প্রভায়,
তাঁহারি সৌন্দর্য্যে পল্লী হয়েছে রচিত
তাই সে বিমুগ্ধ করে মানবের চিত।

শাঃ

কাব্য-কুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী। *

(১)

ভারতীর কুসুমিত মুঞ্জকুঞ্জ-বনে—
কে তুমি এ ঊষা কালে,
বৃক্ষ পত্র অন্তরালে,
ঢালিছ অমিয়া-স্রোতঃ ললিত পঞ্চমে ?

* কাব্য-কুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী বহুকাল যাবৎ সাহিত্য-সেবা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ। এই কবিতাটী সেই কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি মাত্র।

সে সুধা-সঙ্গীত রাশি,
স্বর্গীয় মলয়ে ভাসি,
ছুটিয়াছে শব্দময় "অনন্ত" সন্ধানে ;
কে তুমি, মিনতি করি,
কহ পিক-কুলেশ্বরি,
ছাইয়াছ এই বিশ্ব ও বীণার তানে ?
ঝরে সুধা-নির্ঝরিণী তব ঐ গানে।

(২)

কনক-কিরণ মাখা, কে তুমি, উষায়—
প্রীতির কুসুমগুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি তুলি,
দিতেছ "কুসুমাঞ্জলি" বিধাতার পায় ?
কে তুমি, হৃদয়ানন্দে,
পূজিতেছ সদানন্দে,
আকন্দ, অপরাজিতা, বন্য-ধুতুরায় ?
কে তুমি গো ছদ্মবেশে এসেছ ধরায় ?

(৩)

কে তুমি মানবী-বেশে দেবকুলবালা,
আপনা বিসরি, হায়,
মাগিছ ঈশের পায়,
"ভাঙ্গিও না ভুল"—বর, অবলা, সরলা ;
তোমার জননী-মূর্ত্তি,
"মা" এতে পেতেছে স্ফূর্ত্তি,
"মায়ের কুটীরে" নিভে দরিদ্রের জ্বালা।
তব প্রতিভায় বঙ্গ হয়েছে উজলা।

(৪)

তুমি কি গো সুখতারা কবিতা-আকাশে ?
তোমার কোমল-করে,
"কবিতা কুসুম" ঝরে,
সুরভি ভাসিয়া আসে "মলয় বাতাসে।"
যাঁহার কৃপায় শুনি,
ভ্রমরঝঙ্কার ধ্বনি,
পতিপ্রেম উঠে পড়ে প্রত্যেক নিশ্বাসে ;
যাহার "বুকের তলে,
স্বর্গ মন্দাকিনী চলে,"
মরেরে দলিতা লতা মনের উল্লাসে,
নীরবে রাখিয়া মাথা পতিপদ-পাশে।

(৫)

কে তুমি গো শব্দরূপা, কিম্বা মায়াবিনী
মাতায়ে জগতপ্রাণ;
"নীরবে" গাইছ গান,
নীরবে তুলিছ বীণে থাম্বাজের ধ্বনি,
অমঙ্গল প্রশ্ন কি রে ?
"আর কি আসিব ফিরে।"
কেনরে দেবীর মুখে নিরাশ কাহিনী ?
রহ চিরকাল তরে,
কোথা কবে কবি মরে ?
রহ বঙ্গ-মাতৃ-বুকে দিবা-নিশীথিনী ;
বঙ্গ-বালা তোমা বিনা হবে অনাথিনী।

(৬)

তুমি কি গো সঞ্চারিণী আকাশের তারা ?
পথ ভুলে "একা একা"
ধরায় দিয়াছ দেখা,
ছুটিয়াছ শূন্য পথে হ'য়ে দিশাহারা।
পৃথিবীর বিষ-বায়,
সহে না তোমার গায়,
সংসার-সংঘর্ষে পুড়ে হইয়াছ সারা,
বুকে ধরি অভাগিনী,
স্নেহের প্রতিমা খানি—
হৃদয়ের "প্রিয়বালা"—নয়নের তারা,
সে নহে তোমারই প্রিয়,
সে "প্রিয়" সবার(ই) প্রিয়,
সে প্রিয় সবার, তোমা স্নেহকরে যারা,
সে তোমার "দেবত্তার" কোহিনুর পারা।

(৭)

কবিতায় গড়িয়াছ ধরায় অমরা,
তব "অন্ধকার নিশি,"
জগৎ গিয়াছে মিশি,
উঠেছে করুণ স্বর—"আমরা কারা ?"
বঙ্গের দুর্দ্দশা হেরি,
বাজাও বিষাদ ভেরী,
বহিছে বঙ্গের দুখে নয়নে ধারা,
উঠিছে বিষাদ গাথা—"আমরা কারা ?"

(৮)

ত্রিদিবের বিহঙ্গিনী তুমি কি ললনে ?—
তুলিয়া থাম্বাজে তান,
গাইছ করুণ গান,
সুর-তরঙ্গিনী তটে নন্দন-কাননে,
আবার ভূতলে আসি,
হাসিছ অমিয়া হাসি,
মধুর ভর্ৎসনা করি, বঙ্গবালাগণে,
"বঙ্গমহিলার পত্র" কথার ছলনে।

(৯)
আমাদের দূর দশা হেরিয়া নয়নে—
অলক্ষিতে খরশান,
হানিছ বিদ্রূপ বাণ,
"ভ্রাতা প্রতি ভগিনীর" প্রিয় সম্ভাষণে ;
সে ভর্ৎসনে নাহি দুখ,
লাজে হই অধোমুখ,
নিজেদের অসারতা বুঝি মনে মনে,
কাজে বা কি করি আর,
শুধু গলাবাজী সার,
দেশোদ্ধার ব্রত লই নামের কারণে,—
—ঘরে ঘরে দলাদলি ভাই ভগ্নী সনে।

(১০)
স্বদেশ-বৎসলে, অয়ি ত্রিদিব-নন্দিনি !
সদা স্বদেশের তরে,
তব নেত্রে অশ্রু ঝরে,
হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম বহে মন্দাকিনী ;—
তোমার মনের সাধ,
প্রকাশে "মায়ের সাধ"
ভাবিছ মায়ের তরে দিবস যামিনী,
ধন্য শুভক্ষণে দেবি ! ধরেছ লেখনী।

(১১)
তুমি দেবি ! এবে পতি-বিয়োগ-বিধুরা,
ধন্য তব পতি-প্রেম,
বিশুদ্ধ বিমল হেম,
বহিছে হৃদয়তলে জাহ্নবীর ধারা ;
"আমার দেবতা" বলি,
নয়ন আসারে গলি,
লভিয়াছ তন্ময়তা সাধকের পারা,
তোমার দেবতা-মূর্ত্তি,
সর্ব্বত্র পাইছে স্ফূর্ত্তি,
"বহিছে নিশ্বাস তাঁর এই বিশ্ব ভরা ;"
তাঁহার সৌন্দর্য্য রাশি,
চাঁদিমায় আসে ভাসি,
গাহিছে তাঁহার গীত বিহঙ্গবধূয়া,
পুণ্যতীর্থ স্বচ্ছনীরা,
ঐ তব সাতক্ষীরা,
গয়া, গঙ্গা, বারাণসী, উজলা অমরা ;
যে তীর্থের রেণু চয়,
পূর্ণ পবিত্রতাময়,
বিজড়িত যার স্মৃতি অনন্ত আঁকারা,
ধন্য দেবি, তব স্পর্শে পবিত্র এ ধরা।

(১২)
তবে গো বিদায় এবে করি আশীর্ব্বাদ ;—
বঙ্গীয় সাহিত্য-বনে,
গাও আনন্দিত মনে,
কর ভারতীর সেবা এই মনে সাধ ;
মাতৃঅঙ্ক শোভা করি,
রহ চিরকাল ধরি,
সহিতে না হয় যেন বাদ বিসম্বাদ,
ধর গো, মহিলা-কবি, এই আশীর্ব্বাদ।

শ্রীপ্রসন্ননাথ রায়।

বিলে।*

দূর দৃষ্টি প্রসারিত বিস্তৃত সলিল,
বিষাদ কম্পিত প্রাণ—এই সেই বিল !
কোথা দেবি ! নেমে এস শোণিত-ভূষিতা,
মানময়ী দীন-হীনা-ভিখারিণী বালা !
গিয়াছে কলঙ্ক তব, পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত
হইয়াছে সমাধান—নিবেছেত জ্বালা !
হে মুরলা ! সন্ধ্যানিল ফুকারি নাচিয়া,
কদম্ব-কেশর গন্ধ আনিছে কৌতুকে
বনান্তর হতে !—এই বুঝি সেই বিল !
"নেপি অরবিন্দ" (স্বরগ দেবতা দুটী)
ঢালিত বেদনা-বারি করিত মন্ত্রণা,
কর্ম্মক্ষেত্র জগতের ব্যাকুল ইঙ্গিতে ;
নাচিত পঙ্কজাবলী সে সুর-সঙ্গীতে !
—পাইনাত সাড়া বুঝি এতটুকু কিছু—
দিগন্তে ছুটিয়া মরে দুরন্ত অনিল !
"অরবিন্দ" ছায়াস্পর্শে পূর্ণ লীলা তব,
কেনবা লাগিবে ভাল এই বিলঝিল,
কালপঙ্কে কালঅঙ্গ নিশ্চল সলিল !
থাক ঘুমাইয়া দেবি ! শান্তিময়ী অঙ্কে ;
আমরা রয়েছি ভবে কাঁপিতে আতঙ্কে
রক্তমুখে, রক্তবুকে হেরিয়া তোমায়,
উদ্দেশে অঞ্জলি দিতে ও পবিত্র পায় !!

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

*"———"বিল প্রান্তে, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় প্রণীত "মুরলা" পাঠান্তে লিখিত। লেখক।

প্রাচীন ভারতের কর্ত্তব্যবিজ্ঞান।*

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, আমার কোন বন্ধু কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্র দার্শনিক পদ্ধতিতে আলোচিত হয় নাই; এমন কি, উহার অস্তিত্ব একরূপ নাই বলিলেও চলে। আমি তখন এই কথার কি উত্তর দিয়াছিলাম, ঠিক স্মরণ নাই; কিন্তু সেই সময় হইতেই চিন্তাশীল মনীষিগণের দৃষ্টি বিষয়টীতে আকৃষ্ট করার বাসনা আমার মনে জাগরূক হয়। ক্ষুদ্র মনুষ্যের ইচ্ছা অনেক সময়ে ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া যায়, তাই এক বৎসর কাল আমি আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে যথোপযুক্ত চেষ্টা করিতে পারি নাই। একবার নির্ম্মাল্য নামক মাসিক পত্রিকায় বিষয়টীর অবতারণা করিয়াছিলাম মাত্র; কিন্তু সেই সময়ে নির্ম্মাল্যও কিছুকালের জন্য লোক-লোচনের বহির্ভূত হয়, আমার ইচ্ছাও সেই সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরে লুক্কায়িত থাকে। পরিশেষে যখন সাবিত্রী-লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের সভার বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন, তখন লুপ্তপ্রায় বাসনা পুনরুদ্দীপিত হয়। এক স্থানে এরূপ সুধীজনসমবায় সহজে ঘটিয়া উঠে না; অদৃষ্টবশে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় বিষয়টীর যথোপযুক্ত আলোচনা না হইলেও ভরসা আছে, শ্রোতৃবর্গ আপনারাই অভাব পূর্ণ করিয়া লইবেন। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পঙ্কিল সলিলরাশি সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাস্রোতে মিশাইয়া দেয়; সুরধনী উহা গ্রহণ করিয়া আপনার পূত প্রবাহে মিশাইয়া সিন্ধুগর্ভে অর্পণ করেন।

মনুষ্য আত্মপ্রকৃতিবশে প্রতিনিয়ত কর্ম্মস্রোতে ভাসমান। এ প্রবাহের আদি কোথায় কেহ জানে না, অন্ত কোথায় তাহাও দুর্নির্ণেয়। ইচ্ছায়ই হইক, অনিচ্ছায় হউক, মনুষ্যকে কর্ম্ম করিতেই হইবে।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বৈঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"
গীতা, ৩য় অ, ৫।

আবার আর একদিকে মনুষ্য স্বভাবতই চিন্তাশীল। তাই সে ভাসিতে ভাসিতেও ভাবিয়া দেখে, কোথায় ভাসিতেছি, কোথায় যাইতেছি। সে আপনাকে কর্ম্মপ্রবাহের ক্ষুদ্র তরঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারে না, সে দেখিতে পায়, রাগ-দ্বেষাদি প্রবৃত্তি সমূহ তাহার অনুমোদন ব্যতিরেকে ভাবী কর্ম্মের নিয়ামক হইতে পারে না; তাই সে আপনাকে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের নিয়ামক বলিয়া মনে করে, কর্ত্তৃত্বাভিমান সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া উঠে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেক এই কর্ত্তৃত্বাভিমানের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ। যাহাদের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি স্ফুরিত হয় নাই, যাহারা প্রকৃতির তাড়নায় অবশভাবে প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রবাহে গা ঢালিয়া দেয়, এক কথায় যাহারা পশু-প্রকৃতির চতুঃসীমা অতিক্রম করে নাই, তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্যও নাই, অকর্ত্তব্যও

* সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

নাই, কারণ তাহারা করে না। আবার আর একদিকে যাঁহারা কর্তৃত্বাভিমান অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মার অকর্তৃত্বানুসন্ধান করিয়া কর্তৃত্ব জাল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম্মে অকর্ম্মদর্শন করেন, সেই নিত্য-মুক্ত জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা মহাপুরুষগণ বিধি-নিষেধশৃঙ্খলের ঊর্দ্ধে বিচরণ করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব ও প্রবৃদ্ধ তমঃ এই উভয়ের মধ্য-দেশে রজোগুণের রাজ্য; ক্রিয়া-প্রবৃত্তি রজোগুণের ধর্ম্ম; মনুষ্যপ্রকৃতি স্বভাবত রজঃপ্রধান, তাই সে বিরোধিপ্রবৃত্তি সমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যতিব্যস্ত হয় এবং উহারই মধ্যে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে যত্নশীল হয়। "ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালাঃ" "অধস্তমো-বিশালাঃ" "মধ্যে রজোবিশালাঃ"।

কর্তৃত্ববুদ্ধিতে উপরক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে মনুষ্যের মনে সহজেই এই প্রশ্ন উদিত হয়—কর্ত্তব্য কি? যখন বিরোধিপ্রবৃত্তি এক সময়ে বিভিন্ন পথ অনুসরণ করিতে মনুষ্যকে প্রণোদিত করে, তখন তাহাদের মধ্যে কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর, এই বিতর্ক উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক এবং একরূপ অবশ্যম্ভাবী; এবং এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া কর্ত্তব্যমার্গ প্রদ-র্শন করাই কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

এখন দেখিতে হইবে, ভারতীয় শাস্ত্র-কর্ত্তামনীষিগণ উল্লিখিত প্রশ্নের কিরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকট উক্ত প্রশ্ন উপস্থিত হয় নাই, এরূপ মনে করা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় ও অসঙ্গত। বস্তুতঃ তাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতে এই প্রশ্নের বিচার করিয়া আসিয়াছেন।

যখন পরস্পরবিরোধিপ্রবৃত্তিসমূহ মনুষ্যকে বিভিন্নপথে প্রেরণ করিতে উদ্যুক্ত হয়, তখন আপাততঃ প্রতীত হইতে পারে যে, যে প্রবৃত্তির প্রেরণা-প্রযত্ন তীব্রতর, তাহার অনুসরণ করাই শ্রেয়স্কর। কারণ তীব্রতর প্রবৃত্তির আবেগ প্রতিরুদ্ধ করিতে হইলে বিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহাতে সাময়িক দুঃখের উৎপত্তি হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভবিষ্যদ্দর্শী চিন্তাশীল মনুষ্য এরূপ সহজ সমাধানে তৃপ্তি-লাভ করিতে পারে না; সে দেখিতে পায় যে, উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সকল সময়ে স্থিরমঙ্গলসাধক হয় না, বরং উহার অনু-বর্ত্তন করিলে অনেক সময়ে পরিণামে গুরুতর দুঃখজালে জড়িত হইতে হয়। তাই চিন্তাশীল মনুষ্য আপাতসুখকর প্রেয়োমার্গ হইতে স্থিরসুখকর শ্রেয়োমার্গকে বিবিক্ত করিয়া ফেলে।

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে।" কঠোপনিষৎ।

শ্রেয়ঃ, ও প্রেয়ঃ পরস্পর বিভিন্ন; ইহারা উভয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষকে প্রেরিত করে। উভয়ের মধ্যে যে শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করে, তাহার কল্যাণ হয়; পক্ষান্তরে যে প্রেয়োমার্গ বরণ করে, সে কল্যাণমার্গ হইতে স্খলিত হয়।

আমার বিশ্বাস যে, ইহা অপেক্ষা স্ফুটতর ভাবে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত শ্রেয়ঃসম্বন্ধি প্রশ্নের উপস্থাপনা করা একরূপ অসম্ভব। প্রবলতর প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তন করাই যে মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য নহে, তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে অথচ নিঃস-ন্দিগ্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এখন কথা এই, শ্রেয়ঃ কি?—অনুষ্ঠেয়

কর্ম্মের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে উহার প্রকৃতিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যে ভাবে, যে আশয়ে, যেরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অন্তঃপ্রকৃতি সংগঠিত হয়; আর যে আকারে কর্ম্মটী বহিরভিব্যক্ত হয়, তদ্দ্বারা উহার বহিঃপ্রকৃতি সংগঠিত হয়। এই বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়ের গণনা না করিলে কর্ম্মের প্রকৃতস্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। কারণ বহির্দৃষ্টিতে দুইটী কর্ম্ম একরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রেরকবুদ্ধি ও আশয় ভেদানুসারে উহাদের অন্তঃপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইতে পারে; সুতরাং এরূপ স্থলে উভয় কর্ম্ম সমান শ্রেয়স্কর বা শুভাবহ বিবেচিত না হওয়া অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নহে। একই কর্ম্ম যে বিভিন্ন প্রবর্ত্তনামূলে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা অনুভবসিদ্ধ; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তোপন্যাস অনাবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন্ কর্ম্ম সাধু বা শ্রেয়স্কর, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দুইটী স্বতন্ত্র বিচারের প্রয়োজন;—(১) কর্ম্মের বহিরভিব্যক্তি কিরূপ হওয়া সঙ্গত? (২) কিরূপ আশয়, কি বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য?

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের বিচার সমূহের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা অনেকই উল্লিখিত দুইটী প্রশ্নের স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করেন নাই। ইংলণ্ডীয় নীতিবিজ্ঞান লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই প্রধানতঃ অভিব্যক্ত কর্ম্ম কিরূপ হওয়া সঙ্গত, এই প্রশ্নের উত্তর নির্দ্ধারণে প্রয়াস পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা কর্ম্মপ্রবর্ত্তক আশয় কিরূপ হওয়া সঙ্গত, এই প্রশ্নই কর্ত্তব্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা অভিব্যক্ত কর্ম্মের সদসদ্বিচার কর্ত্তব্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের অঙ্গীভূত নহে মনে করিয়া তদ্বিষয়ক বিচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, যে যাহাই বলুক না কেন, পাশ্চাত্য কর্ত্তব্যবিজ্ঞান-শাস্ত্র একদেশদর্শিতার সীমা [illegible] ক্রম করিতে পারে [illegible]। তবে যে আমরা অনেকে উহাতে [illegible], তাহার কারণ এই যে, ইউরোপীয় দার্শনিকেরা অনেকেই আত্মতত্ত্ব (Metaphysics) ও কর্ত্তব্যতত্ত্ব (Ethics) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে দর্শনরাজ্যে সিদ্ধবস্তুবিষয়ক আত্মতত্ত্ববিচার ও সাধ্যকর্ম্মবিষয়ক কর্ত্তব্যতত্ত্ববিচার এতদুভয়ের আলোচনাস্থল স্বতন্ত্র। সুতরাং তাঁহারা অনেকই কর্ত্তব্যতত্ত্বনির্ণায়ক গ্রন্থ আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন, সুতরাং উহা পাঠকদিগের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর ভাবে আকর্ষণ করে। পক্ষান্তরে ভারতীয় দার্শনিকদিগের মতে কর্ত্তব্যতত্ত্বনির্ণয় আত্মজ্ঞানোপযোগী সাধনপ্রণালীর অঙ্গীভূত বলিয়া উহা দার্শনিকনিবন্ধসমূহে পৃথক্ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, বরং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মতত্ত্ব এরূপ ওতপ্রোত ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, দৃঢ়তর অভিনিবেশ ও সদগুরূপদেশ ব্যতিরেকে উহাদের অন্যোন্যসম্বন্ধনির্ণয় সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। সত্য বটে, ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণ অনেকে বৈধকর্ম্ম ও নিষিদ্ধকর্ম্ম কি কি, তাহার স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা শ্রদ্ধাবান স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনগণের মঙ্গ-

লোদ্দেশে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শনার্থ কিরূপ অবস্থায় কোন্ কর্ম্ম করা সঙ্গত, তাহাই প্রধানতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,সন্দেহপ্রবণ পাঠকগণের বিতর্ক স্পৃহার পরিতোষার্থ প্রতিপদে স্বনির্দ্দেশসমর্থনোদ্দেশে যুক্তিতর্কের অবতারণা করা আবশ্যক বা হিতকর বলিয়া মনে করেন নাই। কেবল রহস্যজ্ঞ উত্তমাধিকারিগণের শিক্ষার্থ স্থলে স্থলে কর্ত্তব্যনির্ণায়ক মূলসূত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। আর একটী কথা এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্রাতিরিক্ত দার্শনিক গ্রন্থ সমূহে কর্ত্তব্যতত্ত্বোপদেশস্থলে প্রধানতঃ কর্ত্তার স্বরূপ, কর্ম্মের স্বরূপ, এবং কিরূপ আশয়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অনুষ্ঠাতার বন্ধের কারণ ও মুক্তির পরিপন্থি হয় না বরং পরোক্ষভাবে মোক্ষলাভের সহায়তা করে, তাহাই অনুশীলিত হইয়াছে ; বৈধকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি কি, তৎপ্রদর্শন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়ীভূত বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে তৎবিষয়ক বিচার অবতারিত হয় নাই। এই সমস্ত কারণে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণের দার্শনিকভিত্তিশূন্য প্রৌঢ়িবাদমাত্র ; সুতরাং ভারতীয় দর্শনকারগণ বিধিনিষেধবিভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রগম্য বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে তদ্বিষয়ক আলোচনা না করায় কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্র ভারতবর্ষে দার্শনিকপদ্ধতিতে অনালোচিত রহিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কিরূপ আশয়ে,কি ভাবে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহা যে কর্ত্তব্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের অবশ্য আলোচনীয় বিষয়, ইহা যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়, উঁহারা ইহাও মনে করিতে পারেন যে, দার্শনিক নিবন্ধসমূহের যে অংশে উহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের অঙ্গীভূত নহে, আত্মতত্ত্ববিচারের অবান্তর অংশমাত্র। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যে 'ভারতবর্ষে কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন, এবং পাশ্চাত্য দর্শনকে এই অংশে পূর্ণতর বলিয়া মনে করিবেন, তাহা আমাদের পক্ষে ক্ষোভের কারণ হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে পারি না।

এখন দেখিতে হইবে, আমরা ইতিপূর্ব্বে কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের যে দুইটী অঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, ভারতীয় প্রাচীন মনীষিগণ তাহার কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের বহিঃপ্রকৃতি কিরূপ হওয়া শ্রেয়স্কর, তাহারই আলোচনা করা যাউক।

ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতবাদ আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ চতুর্ব্বিধ মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

(১) কেহ কেহ বলেন যে, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কিরূপ হওয়া সঙ্গত,তাহা সহজানুভূতিগম্য। মনুষ্যহৃদয়ে এরূপ একটী সহজসিদ্ধ বৃত্তি আছে, যে তদ্দ্বারা কোন রূপ যুক্তিতর্ক অবলম্বন না করিয়াই সন্দিগ্ধস্থলে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করা যায়। এইমত ইউরোপীয় দার্শনিক সমাজে Intuitionism বা সহজানুভূতিবাদ নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ (Intuition) শব্দের অনুবাদ স্থলে 'বিবেক' শব্দের প্রয়োগ করেন ; আমি ইহার অনুমোদন করি না, কারণ ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষা অনুসারে বিবেক শব্দে বিচার মূলক ভেদ সাধন (differen-

tiation) বুঝাইয়া থাকে, এবং উহা প্রধানতঃ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বা আত্মানাত্মবিবেক স্চনার্থই প্রযুক্ত হয়। ভিন্ন দেশীয় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ করিতে গিয়া দেশীয় শব্দের প্রচলিত চিরাগত অর্থের অন্যথাকরণ আমার মতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

(২) কেহ কেহ বলেন, কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করিতে কোন্ কর্ম্ম কিরূপ ফলদায়ক, তাহার আলোচনা করিতে হয়, এবং আপেক্ষিক বিচারে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠাতার অধিকতর সুখসাধক, তাহাই অবলম্বনীয়রূপে গণনা করা যুক্তিসিদ্ধ। এই মতের পারিভাষিক নাম Egoistic Hedonism বা কর্ত্তৃগত সুখবাদ।

(৩) পক্ষান্তরে অনেকের মত এই যে, ব্যক্তিগত সুখজনকত্বের বিচার দ্বারা কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। বিচারদ্বারা যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, তাহা কেবল ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে, সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। দার্শনিক দৃষ্টিতে সকলের সুখই সমান ভাবে অন্বেষণীয়; দার্শনিকজ্ঞান ব্যক্তিনিরপেক্ষ, পক্ষপাত-বিহীন। সুতরাং যে কর্ম্ম জনসাধারণের মঙ্গলদায়ক অর্থাৎ অধিকতর সুখসাধক, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে তাহাই সকলের অবলম্বনীয়; এবং তদ্বিপরীত সাধারণসুখবিরোধী কর্ম্ম পরিবর্জ্জনীয়। এই মত দার্শনিক সমাজে Utilitarianism or universalistic Hedonism অর্থাৎ সার্ব্বজনীনসুখবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

(৪) আবার কেহ কেহ বলেন, সুখ মানবজীবনের অন্বেষণীয় চরম লক্ষ্য হইতে পারে না; কারণ মানব-আত্মা শরীরী হইলেও পার্থিবসুখসাধনবাহুল্যে তাহার পূর্ণতৃপ্তি সম্ভবে না; আত্মস্বরূপ ঘটপটাদি দৃশ্যপদার্থের ন্যায় সসীম নহে, সুতরাং সাময়িক বিষয়ানুভবজনিত সুখ দ্বারা আত্মপ্রকৃতির পূর্ণবিকাশ হয় না। বস্তুতঃ যে উপায়ে আত্মপ্রকৃতির পূর্ণবিকাশ সংঘটিত হয়, তাহাই শ্রেয়স্কর বলিয়া অবলম্বনীয়, এবং যে কর্ম্ম এই উদ্দেশ্য সাধনে উপযোগী, তাহাই অনুষ্ঠেয়।

উপরে ইউরোপীয় কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রধান প্রস্থান চতুষ্টয়ের উল্লেখ করা গেল। এতন্মধ্যে সহজানুভূতিবাদ বা Intuitionism তিনটী অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে।

(১) কেহ কেহ মনে করেন যে, যখনই কোন ব্যক্তিকে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণার্থ সন্দিহান হইতে হয়, যখনই বিরোধিপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় দুইটী কার্য্যের মধ্যে কোন্টী অবলম্বনীয়, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তখন অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ফলাফল বিচার না করিয়া শুদ্ধ সহজানুভবের উপরে নির্ভর করিলে আপনা হইতেই কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। মনুষ্যের মনে এক স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ শক্তি বর্ত্তমান আছে, যদ্দ্বারা সে প্রত্যেক জিজ্ঞাস্যস্থলে দুইটী কর্ম্মের মধ্যে কর্ত্তব্যমার্গ বিবিক্ত করিয়া লইতে পারে। তজ্জন্য কোন রূপ বিচারবিতর্কের অপেক্ষা করিতে হয় না। এই মত কোন কোন দার্শনিক Perceptional Intuitionism নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(২) কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিপদে বিশ্লিষ্টভাবে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে প্রয়াসী হইয়া কোনরূপ সুশৃঙ্খল দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপ-

নীত হওয়া যায় না। বস্তুতঃ আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যখন আমরা কোন স্থলে কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করি, তখন সেই কর্ম্ম কোন না কোন সাধুবৃত্তির দৃষ্টান্তস্থল বলিয়াই তাহা প্রশস্ত রূপে প্রতীত হয়। সুতরাং মনুষ্যসমাজে বিবেকদর্শী জনগণ সহজেই সাধুবৃত্তি ও অসাধুবৃত্তি পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারেন; এবং সামাজিক সহজসিদ্ধসংস্কার তাঁহাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। এইরূপে সত্য, শৌচ, দয়া, দাক্ষিণ্যাদিবৃত্তি শ্রেয়স্কর, এবং তদ্বিপরীত অসত্য, হিংসা, কপটতা প্রভৃতি বৃত্তি শ্রেয়োবিরোধী বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হয়। তৎসাধনার্থ কোন রূপ যুক্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না।

(৩) কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, যদিও আমরা সাধারণতঃ সংস্কারমূলক ধারণাবশে কতকগুলি বৃত্তি সাধু ও কতকগুলি বৃত্তি অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি, এবং যদিও এরূপ সিদ্ধান্ত অনেক সময়ে আমাদিগকে প্রকৃত সৎপথেই প্রেরণ করিয়া থাকে, তথাপি সদসদ্বিচারমূলক বিধিনিষেধ সমূহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, উহারা কয়েকটী উচ্চতর মূল সূত্রের অনুবর্ত্তন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়; সেই মূল সূত্রগুলি সহজপ্রত্যয়সিদ্ধ সদসদ্বিচারের সন্দেহনিরাস, সমন্বয় সাধন, ও ঐক্যসংস্থাপন করিয়া থাকে; সুতরাং উহাদিগকে কর্ত্তব্যবিজ্ঞানের মূলভিত্তিভূমি বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। হয়ত সেই মূলসূত্রগুলির সন্ধান না পাইলেও সাংসারিক কর্ত্তব্যব্রত অনেক স্থলে অক্ষুণ্ণ ভাবে উদ্যাপন করিতে পারা যায়, কিন্তু মূলানুসন্ধিৎসু দার্শনিক সেই মূলসূত্রগুলিকেই কর্ত্তব্যবিজ্ঞানের সারভূত অবলম্বনস্থল বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রচলিত সহজসম্মত বিধিনিষেধগুলি উহাদেরই প্রয়োগস্থল মাত্র। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই মতে উল্লিখিত মূলসূত্র কয়টীই ইতরনিরপেক্ষভাবে কর্ত্তব্যমার্গ সূচনা করে, এবং উহাদের প্রামাণ্যই মূলতঃ সহজপ্রত্যয়সিদ্ধ; তদ্ব্যতীত যে সমস্ত প্রচলিত বিধিনিষেধ আপাততঃ সহজানুভূতিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারা প্রায়শঃ শ্রেয়োমার্গ সূচক হইহইলেও তাহাদের নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বতোগামী প্রামাণ্য নাই। অধ্যাপক সিজউইক এই মতকে Philosophical Intuitionism নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা এই মতের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা বলেন যে, প্রচলিত বহুজনসম্মত বিধিনিষেধগুলিকে সাধারণতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যসূচক বলিয়া স্বীকার করিয়া, সন্দিগ্ধস্থলে উহারা অনুষ্ঠাতার সুখাতিরেক সংঘটন এবং জনসাধারণের সুখবর্দ্ধন করে কি না, তদ্দর্শনে উহাদের সংশোধন এবং সমন্বয়সাধন করা দার্শনিকবিচারের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং ইঁহারাও প্রকারান্তরে কর্ত্তব্য নির্ণয়ার্থ অনুষ্ঠেয়কর্ম্মের ফলাফলবিচারের অপেক্ষা আছে, তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। উপরে সংক্ষেপে ইউরোপীয় মতবাদের প্রকৃতি প্রদর্শিত হইল। এখন উহাদের সহিত তুলনায় ভারতীয় বিধিনিষেধশাস্ত্রের পরীক্ষা করা যাউক।

সংসারে সকল লোক দার্শনিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। জনসাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে শাস্ত্রপ্রণয়ন করিতে হইলে উহাকে শুধু দার্শনিকদিগের উপযোগী করিয়া নিবদ্ধ করিলে তদ্দারা শাস্ত্রপ্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সংসাধিত হইতে পারে না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের আপেক্ষিক সমালোচনা করিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, ইউরোপীয় দার্শনিকগণ কর্ত্তব্যবিজ্ঞানের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের ততদূর হিতসাধক হইয়া উঠে নাই, কারণ তাঁহারা মূলসূত্রের অন্বেষণে ঊর্দ্ধে আরোহণের প্রয়াসী হইয়া নিম্নভূমিসংস্থ বিষয়াসক্ত জনগণের অভাব ও তৎপ্রশমনোপায় অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যজীবন একরূপ কর্ম্মপরম্পরাদ্বারা গ্রথিত; কর্ত্তব্যনির্ণায়ক মূলসূত্রের অন্বেষণ করিয়া তদবলম্বনে প্রতিপদে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে হইলে বিচারবিতর্কের তাড়নায় মনুষ্যকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত, সদনুষ্ঠানের অবসর অল্প হইতেও অল্পতর হইয়া যাইত। জীবনসংগ্রামে সাধারণ সৈনিকদিগকে আদেশশতদ্বারা পরিচালিত করিতে হয়, তাহাদিগকে মূলসূত্রের উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা শুভাকাঙ্ক্ষী দূরদর্শী নায়কের কর্ম্ম নহে। যাহারা নায়কতা করিতে জানে না, যাহাদের দায়িত্ববুদ্ধি নাই, যাহারা জনহিতোদ্দেশে শাস্ত্রপ্রণয়ন করে না, তাহারাই উহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। তাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মন্বাদিঋষিগণ বিধিনিষেধমুখে বিস্তৃতভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু জনসাধারণের যতদূর হিতসাধনোপায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ইউরোপে তাহার তুলনা মিলিয়া উঠা সুকঠিন। তুমি আমি গণ্ডূষ জলসঞ্চারী সফরী হয়ত তাঁহাদের উপদেশগুলিকে যুক্তিহীন প্রৌঢ়িবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহারা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থান পূর্ণ করিতে পারে, এমন আর কিছু দেখাইতে পারি কি? বস্তুতঃ জীবনের আদিমধ্যাবসানে বিভিন্নাবস্থায় মনুষ্যকে সাধারণতঃ কিরূপভাবে চলিতে হইবে, কোন্ বিষয়ে কিরূপ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তাহার সুবিস্তর আলোচনা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ যেরূপ ভাবে করিয়াছেন, অপর কোথাও সেরূপ হইয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। সুতরাং এই অংশে ভারতীয় কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্র আমার মতে পূর্ণতর।

এখন দেখা যাউক, ভারতীয় শাস্ত্রকর্ত্তাগণ যেরূপ বিশিষ্ট বিধিনিষেধসমূহের উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ সাধারণ-সম্মত প্রধান প্রধান সাধুবৃত্তিসমূহের প্রাশস্ত্যখ্যাপন করিয়াছেন কি না? পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ইউরোপীয় Intuitionist সম্প্রদায় সহজানুভূতিসিদ্ধ বলিয়া এই সমস্ত সাধুবৃত্তিগুলিরই প্রকটন করিয়া থাকেন; এইরূপে তাঁহাদের মতে সত্যপরায়ণত্ব, সত্যপ্রতিজ্ঞত্ব, পরহিতৈষিত্ব প্রভৃতির কর্ত্তব্যত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহারা ইউরোপীয় Intuitionist সম্প্রদায়-প্রণীত নিবন্ধগুলির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, উঁহারা Intuition বা সহজানুভূতির কর্ত্তব্য নির্ণায়কত্ব সম্বন্ধে স্বতঃপ্রামাণ্য সংস্থাপন করিতে যতদূর বিচারবিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মূলে অধিগম্য সাধুবৃত্তিসমূহের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতে ততদূর প্রয়াস স্বীকার করেন নাই। সুতরাং ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণ প্রশস্ত সাধুবৃত্তিগুলির সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহারোপযোগী উপদেশ ইউরোপীয় সহ-

আত্মভূতিবাদীদিগের গ্রন্থে বড় একটা মিলিয়া উঠে না। ভগবান মনু ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও যতি, এই চতুরাশ্রমীদিগের পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমধর্ম্মের উপদেশ করিয়া পরিশেষে আশ্রমনির্ব্বিশেষে সাধারণভাবে বক্ষ্যমাণ-রূপে ধর্ম্মলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।"

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ (বহিঃশৌচ ও অন্তঃশৌচ অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, এবং অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। এইস্থলে একটী মাত্র শ্লোকে ভগবান্ মনু প্রধান প্রধান সাধুবৃত্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ইউরোপীয় দার্শনিকেরা হয়ত ইহাই নির্দ্দেশ করিতে স্বস্বগ্রন্থের একাধিক অধ্যায় জুড়িয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আলোচ্য বিষয়ে অধিক কি উপকার হইয়াছে বলিতে পারি না; বরং এক স্থলে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম্মসঙ্গত শুভসাধক বৃত্তিগুলি উপন্যস্ত হইলে তদ্দ্বারা কর্ত্তব্যনির্ণয় সম্বন্ধে অধিক সুবিধা হওয়াও অসম্ভব নহে। এখন মনূক্ত দশবিধ সাধুবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেল। অসাধু কর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে সংক্ষিপ্ত লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। তিনি বলেন, শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মেরই মন প্রবর্ত্তক। তথাপি অধিষ্ঠানভেদে উহাদিগকে মানসিক, বাচিক ও শারীর, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে অশুভকর্ম্ম বক্ষ্যমাণ দশ লক্ষণে লক্ষিত করা যায়—

পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চাপি পৈশুন্যঞ্চাপিসর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ংস্যাৎ চতুর্ব্বিধম্।
অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥

পরদ্রব্য কিরূপে লইব, তদ্বিষয়ে অভিধ্যান, মানসিক পরানিষ্টচিন্তা, মিথ্যাজ্ঞানে অভিনিবেশ অশুভকর মানসিক কর্ম্ম এই ত্রিবিধ। পরুষবাক্য প্রয়োগ, মিথ্যাকথন, পৈশুন্য অর্থাৎ পরোক্ষে পরদোষকথন, ও অসম্বদ্ধ-প্রলাপ অশুভকর বাচিককর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ। অদত্তদ্রব্যগ্রহণ, অবৈধ হিংসা, ও পরদার-সেবা অসাধু শারীরকর্ম্ম এই ত্রিবিধ। যিনি বাক্য, মন ও শরীর অসাধু প্রবৃত্তি হইতে বিরত রাখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ত্রিদণ্ডী।—ও মুক্তিলাভে অধিকারী।

আমরা বাহুল্যভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না, শ্রোতৃবর্গ আকরে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, এ অংশেও ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত উপদেশ ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের উপদেশ অপেক্ষা ন্যূনতর বা অপূর্ণতর নহে।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, সাধুবৃত্তি ও অসাধুবৃত্তি সমূহের দৃষ্টান্তোপন্যাস করিতে গিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ হয়ত ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা অধিক কিছুই করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা কর্ত্তব্যনির্ণায়ক সহজসিদ্ধ বৃত্তিবিশেষের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বস্থলে কর্ত্তব্যনির্ণয়ের পথ অধিকতর সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ এরূপ নির্দ্দেশের কোন কারণ নাই। অনেকেই জানেন যে আত্মতুষ্টি ধর্ম্মনির্ণয়ের অন্যতর উপায় বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ইহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* ভগবান্ মনু বলেন যে,

* বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চপ্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্।
মনু। ২। ১২

আত্মতুষ্টি সাত্ত্বিককর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ, এবং তদ্বিপরীতভাব তমোগুণের চিহ্ন।

"যৎকর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈবলজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্।"
মনু। ১২। ৩৫

"যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্নলজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্যতৎসত্ত্ব গুণলক্ষণম্।"
মনু ১২।৩৭

এমন কি, সাক্ষ্যপ্রদান সময়ে সাক্ষীদিগকে আত্মনিষ্ঠ সদসদ্বিচার শক্তির অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উপদেশ দিয়া তিনি অসাধারণ লোকহৃদয়জ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যৎত্বংকল্যাণ মন্যসে।
নিত্যংস্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ।
যমো বৈবস্বতো দেবা যস্তবৈষহৃদিস্থিতঃ।
তেন চেদাবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মাকুরূন্গমঃ।
মনু। ৮। ৯১। ৯২

হে কল্যাণ! তুমি হয়ত মনে করিতেছ যে, তুমি একাকী অবস্থান করিতেছ, কিন্তু তাহা নহে; তোমার হৃদয়ে একজন পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ মুনি (মননকারী) বিরাজ করিতেছেন। সেই বৈবস্বত (জ্যোতিঃপ্রসূত) (অন্তর্যামী) যমদেব, যিনি তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহার সহিত যদি তোমার বিবাদ না হয়, তবে কি গঙ্গা, কি কুরুক্ষেত্র তোমার কোথায়ও যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়শক্তি প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন, তবে উহা ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়স্থলে একমাত্র প্রমাণ, ইহা তাঁহারা অঙ্গীকার করেন নাই। বরং সন্দেহস্থলে শ্রুতি, স্মৃতি, ও শিষ্টাচার প্রবলতর প্রমাণ ও তদবলম্বনে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করা সঙ্গত, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। আমার বিবেচনায় নিরবচ্ছিন্ন dogmatic Intuitionism অপেক্ষা ইহাই প্রশস্তমত। পাশ্চাত্যদার্শনিকেরা পরস্পর বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিরোধিবাদগত সত্যাংশেরও উপেক্ষা করিয়া থাকেন, বিরোধিবাদ সমূহের সমন্বয় বা একীকরণ সম্ভব কি না, তাহা ততটা ভাবিয়া দেখেন না। আত্মতুষ্টি, যে ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের অন্যতর উপায়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না, এমন কি, সাধারণতঃ উহার অবলম্বনেই প্রথমতঃ কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতে হয়, ইহাও অনুভবসিদ্ধ এবং অবশ্যস্বীকার্য্য। বহুপুরুষীয় ভূয়োদর্শন জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান অধস্তন পুরুষে সংস্কাররূপে অনুবর্ত্তন করে বলিয়াই হউক, জন্মান্তরীয়সংস্কার পরজন্মে অস্ফুটরূপে অভিব্যক্ত হইয়া ইহজন্মার্জ্জিত ভূয়োদর্শন দ্বারা অজ্ঞাতসারে স্ফুটীকৃত হয় বলিয়াই হউক, অথবা সমাজগত ধর্ম্মাধর্ম্মবুদ্ধি স্বচ্ছ চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া সেই প্রতিবিম্বিতজ্ঞানই ইতরনিরপেক্ষ সহজসিদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়াই হউক, যেরূপেই হউক, আত্মতুষ্টি বা ব্যক্তিগতসহজানুভব পরোক্ষভাবে সামাজিক কি ব্যক্তিগত পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ত্তব্যজ্ঞানদ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত, এরূপ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত বলা যায় না। আর তাহা না হইলেও, দেশকালাদি সহকারীভেদে সহজসিদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রকৃতি যে কিয়ৎপরিমাণে বিকৃত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ যে আত্মতুষ্টি আপাততঃ সহজসিদ্ধ ও স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার অন্তরালে অনেক সময়ে সমাজ ও শিক্ষার

প্রভুত্ব অলক্ষিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং সন্দিগ্ধস্থলে শুধু আত্মতুষ্টির উপর নির্ভর না করিয়া অন্তবিধ প্রমাণের উপযোগ বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, এবং ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ইহাই উপদেশ। সুতরাং পূর্ব্বাপর আলোচনায় প্রতীত হইতেছে যে, পাশ্চাত্য সহজানুভূতিবাদী দার্শনিকগণ কর্ত্তব্যতত্ত্বনির্ণয়প্রসঙ্গে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; বরং অনেকাংশে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই পূর্ণতর।

এখন সাধারণসম্মত বা সহজানুভূতিসিদ্ধ সদসদ্বিচারের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া ফলাপেক্ষ কর্ত্তব্যবিচারের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক ইহাই একমাত্র দার্শনিক প্রস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, এইমতে ব্যক্তিগত সুখসাধকত্ব এবং সাধারণ সুখসাধকত্ব অথবা এতদুভয়ের অন্যতর অনুষ্ঠেয় সাধুকর্ম্মের প্রতিপাদক লক্ষণস্বরূপ। অনেকেই জানেন যে, পাশ্চাত্য সুখান্বেষী (Hedonist) দার্শনিক সম্প্রদায়ও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ব্যবহারিক কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণার্থ কর্ম্মফলের আলোচনা করিয়া তদ্দৃষ্টে সিদ্ধান্ত স্থির করা অনেক সময়ে দুরূহ হইয়া উঠে; বস্তুতঃ সাধারণ-সম্মত স্বাভাবিক সদসদ্বুদ্ধির অস্তিত্ব ও সামান্যতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া বিশেষ সন্দিগ্ধস্থলে বিচার্য্যকর্ম্মের শুভাশুভফলের আলোচনা করিয়া তদবলম্বনে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করাই ব্যবহারতঃ প্রকৃষ্টকল্প। সে যাহা হউক, ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃসমাজে এই মতের কোন নূতনত্ব নাই। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন।

"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণম্।"

ভবিষ্যপুরাণ।

ধর্ম্মশব্দ দ্বারা শ্রেয়কেই উদ্দেশ করা হয়, এবং যে কর্ম্ম অভ্যুদয়ফলক, তাহাই শ্রেয়ঃ শব্দে লক্ষিত হয়। বৈশেষিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মলক্ষণ নিরূপণ স্থলে বলিয়াছেন— "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ।" যাহা হইতে অভ্যুদয় ও পরম্পরা ক্রমে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অভ্যুদয়রূপ ফলের অবলম্বনে ধর্ম্মাধর্ম্ম লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করা ভারতীয় শাস্ত্রকর্ত্তা ও দার্শনিকদিগের অনভিপ্রেত নহে। অভ্যুদয় শব্দ দ্বারা যে এ স্থলে কেবল কর্ত্তৃগত অভ্যুদয়ই উদ্দিষ্ট হইতেছে, তাহাও নহে; বস্তুত তাঁহাদের মতে ধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্ত জগতের শুভসাধক এবং ধর্ম্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থও ইহাই সূচনা করে। 'ধারণাৎ ধর্ম্ম উচ্যতে।' তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্ম্মেসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

ধর্ম্মই নিখিল জগতের আশ্রয়স্থান, ধর্ম্মে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মশূন্য হইলে কোন পদার্থই স্থিরভাবে থাকিতে পারে না, সুতরাং সকলে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত অভ্যুদয়ের সহিত সুখের সম্বন্ধ কি? পাশ্চাত্য Hedonist সম্প্রদায় বলেন, সুখই অভ্যুদয়ের অপরিহেয় উপাদান। আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয়

যে, আমাদের মহর্ষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—

"যদা বৈ সুখং লভতেঽথকরোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখংত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।" ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

লোকে যখন সুখ লাভ করে, তখনই কর্ম্ম করে, অসুখপ্রাপ্তি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক নহে, সুখ প্রাপ্তিই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; সুতরাং সুখই অন্বেষণীয়। তবে পার্থক্য এই যে ভারতীয় মহর্ষিগণ সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ সুখের পার্থক্য বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, বৈষয়িক সুখ প্রকৃত সুখ নহে,—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।"

পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র পদার্থে প্রস্তুত সুখ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, যাহা অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত পদার্থ, তাহাই সুখস্বরূপ, সুতরাং উহাই প্রকৃত অন্বেষণীয়। এইরূপ ভারতীয় ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পরিশেষে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে পরিণত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। পাশ্চাত্য কর্ত্তব্যবিজ্ঞান শাস্ত্র এই মহত্তত্ত্বের অনুসন্ধান পায় নাই, উহা ক্ষুদ্র সাময়িক দুঃখশবল সুখ সমূহের আহরণে ব্যাপৃত, এবং তাহাদেরই সঙ্কলন ব্যবকলন করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে উদ্যুক্ত। এরূপ অবস্থায় কোন প্রমাণে পাশ্চাত্য কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্র পূর্ণতর বলিয়া তাহার প্রাশস্ত্যখ্যাপন করিব, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত।

আমরা এ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের একাংশের আলোচনা করিয়া আসিলাম। দেখিলাম যে, যদিও অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সদসদ্বিচারপ্রসঙ্গে ইউরোপীয় দার্শনিকেরা বিস্তর অনুশীলন করিয়াছেন, তথাপি উহা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত উপদেশ হইতে পূর্ণতর, উন্নততর, অথবা ব্যবহারতঃ অধিকতর হিতকর বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। বরং পাশ্চাত্য দর্শনকারগণ অনেক স্থলে মূল সূত্র নির্ব্বাচন করিয়াই বিরত হইয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রকারগণের ন্যায় বর্ণাশ্রমবয়োভেদাদির আলোচনা করিয়া সূত্রানুগত নিয়মাবলীর নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিবন্ধ সমূহ সুশৃঙ্খল দার্শনিক চর্চ্চায় পরিপূর্ণ হইলেও, সাধারণের পক্ষে ততদূর কল্যাণদায়ক হয় নাই। যাহা হউক, কর্ত্তব্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের যে অংশে ভারতীয় শাস্ত্র পাশ্চাত্য শাস্ত্রের তুলনায় আপাততঃ অপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার আলোচনা করা গেল। এতৎপ্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলিবার রহিল বটে, কিন্তু সে সমুদায়ের উত্থাপন করিলে প্রবন্ধ আরও দীর্ঘায়তন হইয়া উঠিবে আশঙ্কায় অগত্যা নিরস্ত হইতে হইল।

এখন কর্ত্তব্যবিজ্ঞানের অপরাংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, একই কর্ম্ম বিভিন্ন বুদ্ধিতে বিভিন্ন আশয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এবং তদনুসারে উহার অন্তঃপ্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া উঠে। সুতরাং কোন্ আশয়ে কিরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর, তাহাও কর্ত্তব্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের অবশ্য আলোচনীয় বিষয়। আমি যতদূর অবগত আছি, পাশ্চাত্য দার্শনিকমণ্ডলী এ বিষয়ের যথোপযুক্ত আলোচনা করেন নাই; সত্য বটে সহজানুভূতিবাদীদিগের এক সম্প্রদায় কর্ম্মপ্রবর্ত্তক আশয় সমূহের প্রকৃতি ভেদানুসারে উহাদের আপেক্ষিক শ্রেয়স্করত্ব নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সর্ব্ববিধ

কর্ম্ম কিরূপ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে উহাদের আসক্তিমূলক বন্ধজনকত্ব অপনীত হয়, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রবর্ত্তক মনোবৃত্তি সমূহের মধ্যে আপেক্ষিক সদসদ্বিভাগ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। সকামকর্ম্ম বিভিন্ন কামনায় অনুষ্ঠিত হইলে কামনা সমূহের মধ্যে কোনটী অপেক্ষাকৃত শুভাবহ, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। একমাত্র প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট নিষ্কামকর্ম্মের মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, কামনাপরবশ হইয়া পরহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের কামমূলকত্ব প্রযুক্ত তাহাকে প্রকৃত প্রশস্তকর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অনুষ্ঠাতার স্বাধীন সঙ্কল্পের ফলভূত নহে; যে কর্ম্ম কামনা ব্যতিরেকে শুধু কর্ত্তব্যবুদ্ধির নিদেশানুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই প্রকৃত সাধুকর্ম্ম, কারণ উহা অনুষ্ঠাতার স্বাধীন সাধু সঙ্কল্পের পরিচায়ক। যাঁহারা গীতোক্ত কর্ম্মযোগের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই দেখিতে পাইবেন, পাশ্চাত্য দার্শনিকাগ্রগণ্য কাণ্টের উদ্ধৃত অভিমত ভারতীয় আর্য্যসিদ্ধান্তের অস্ফুট ছায়ামাত্র। কোন কোন পাশ্চাত্য সমালোচক বলেন যে, কাণ্টের উদ্ধৃত অভিমত অদূরদৃষ্টি ও অসম্যগ্বিশ্লেষণের পরিচায়ক; কারণ তাঁহাদের মতে কামনা ও কর্ম্ম এরূপ নিত্যসম্বদ্ধ যে, কামনা বর্জ্জন করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; সুতরাং কামনা সহকৃত কর্ম্মাপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মের প্রাশস্ত্য খ্যাপন করা দেবদত্ত অপেক্ষা বন্ধ্যাপুত্রের সৌন্দর্য্যখ্যাপনের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। এ সমালোচনা আমার বিবেচনায় সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে; সত্য বটে সঙ্কল্প ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই সাধিত হইতে পারে না; তথাপি ফলসঙ্গবিরহিত নিষ্কাম সঙ্কল্প নিতান্ত অসম্ভব সামগ্রী নহে; সঙ্কল্প ও ফলকামনা সাধারণতঃ পরস্পর সম্বদ্ধ, কিন্তু ফলকামনারূপ সহকারিব্যতিরেকে শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞান কর্ম্মসঙ্কল্পের নিয়ামক হইতে পারে না, এরূপ মনে করা আত্মহৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নিষ্কাম কর্ম্ম একান্ত অসম্ভব না হইলেও, কোন কোন স্থলে নিষ্কাম কর্ম্মাপেক্ষা সকাম কর্ম্মের প্রাশস্ত্য স্বীকার করিতে হয়, ইঁহাদের মতে পরহিতকামনায় অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত পরহিতকর কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই মতও সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ আসক্তিমূলক কর্ম্ম স্থলবিশেষে শুভফলপ্রদ হইলেও উহা মোক্ষফলক হইতে পারে না, এবং প্রবর্ত্তক কামনার প্রকৃতি যেরূপ হউক না কেন, উহা স্থলান্তরে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রতিযোগী হইতে পারে; সুতরাং আমূল বিবেচনা করিলে সকাম কর্ম্মাপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মের প্রাশস্ত্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

যাহা হউক, এখন সংক্ষেপে ভারতীয় কর্ম্মযোগের আলোচনা করা যাউক; নিষ্কামকর্ম্মের দুইটী প্রধান ভূমিকা আছে, তদুভয়ের একটীমাত্র কাণ্টের দর্শনে সূচিত হইয়াছে। প্রথম—কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান; দ্বিতীয়, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান। ভবদ্গীতা গ্রন্থে ভগবান্ প্রথমতঃ

বক্ষ্যমাণ রূপে অর্জ্জুনকে নিষ্কামকর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

'যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে।
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌশরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥" ২।৪৮।৪৯।

হে ধনঞ্জয়, তুমি যোগস্থ হইয়া আসক্তি-শূন্যভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যেন তোমার সমজ্ঞান হয়; তোমার কর্ত্তব্য তুমি অনুষ্ঠান করিবে, ফলাকাঙ্ক্ষা ও বৈফল্যবিদ্বেষ যেন তোমাকে উদ্বেজিত না করে। এই সমত্ববুদ্ধির নামই যোগ। এই সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা ফল-কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান অনেক নিকৃষ্ট। তুমি যোগজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কর, যাহারা কামনা পরবশ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা পরমার্থ দৃষ্টিতে নিতান্ত মূঢ়।

এইরূপে সাধারণতঃ নিষ্কামকর্ম্ম প্রশংসা করিয়া ভগবান্ বিশেষ ভাবে বলিতেছেন—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।" মনু ৩।৯

যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, সেই কর্ম্ম বন্ধের কারণ; সুতরাং হে কৌন্তেয়,তুমি আসক্তিবিরহিত হইয়া ঈশ্বরা-র্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বাকরোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্ম পত্রমিবাম্ভসা॥ ৫।১০।
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি
যোগিনঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গংত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। ৫।১১।
যুক্তঃকর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ভলে সক্তো নিবধ্যতে॥৫।১২।

যিনি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরো-দ্দেশে ভৃত্যের ন্যায় স্বফলনিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি জলগত পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ পাপ দ্বারা লিপ্ত হয়েন না। যোগিগণ অসঙ্গভাবে মমত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কায়মন ও বুদ্ধিদ্বারা যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তদ্বারা আত্মশুদ্ধিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এইরূপ ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত কর্ম্ম পরম্পরাক্রমে সাধক যোগীর আত্যন্তিক শান্তি বিধান করিয়া থাকে; যাহারা ফললোলুপ হইয়া সকাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারাই তদ্দ্বারা সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে কর্ম্মের ফলাফল ঈশ্বরোদ্দেশে উৎসৃষ্ট, যে কর্ম্মানুষ্ঠা-নের সময়ে অনুষ্ঠাতার মনে এইরূপ ভাব হয় যে "হে ভগবান্ আমি কে? তুমিই আমার প্রভু, আমিত আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র; আমি তোমার নিয়োগ পালন করিতেছি, ইহাই যথেষ্ট, আমি ফলকামনা করি না, তোমার আদেশে কর্ম্ম করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মফল তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করি-তেছি। আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভের অনু-সন্ধান করিতে চাহিনা, "ত্বয়া হৃষীকেশহৃদি-স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" সেই কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি সম্পৃক্ত হইলেও পর-ম্পরাক্রমে মোক্ষলাভের কারণীভূত হয়।

যদিও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিব্যতিরেকেও নিষ্কা-মকর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত অসম্ভব নহে, তথাপি এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভগবদাশ্রয় ব্যতীত কেবল নিরবলম্বভাবে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান ততদূর সহজসাধ্য নহে; বিশেষতঃ এরূপ স্থলে নিষ্কামব্রতের সর-সতাও অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়; সুতরাং উহার স্থায়িত্ব সিদ্ধির আশাও ক্ষীণ-তর হইয়া উঠে। এই সমস্ত কারণে এবং ভক্তিনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকতর অন্তিক-বর্ত্তী বলিয়া, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট নিষ্কামকর্ম্ম অনু-

বিধ নিষ্কাম কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া অভ্যুপেয়।

উপরে সংক্ষেপে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের প্রকৃতি প্রকটিত হইল। এই কর্ম্মযোগ কিরূপে ধীরে ধীরে ভগবদ্‌ভক্তি যোগ ও অদ্বৈতজ্ঞানযোগে পরিনিষ্ঠা লাভ করে, আসক্তিবর্জ্জিত নিষ্কামকর্ম্ম কিরূপে কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিবিরহিত কর্ম্মসন্ন্যাসে পরিণত হয়, প্রথমতঃ ব্রহ্মাগ্নিতে কর্ম্মফলের আহুতি প্রদান হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক কিরূপে পরিশেষে—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা।"—

এইরূপ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া দান, দেয়, দাতা সমস্তই ব্রহ্মময় অবলোকন করে, উপস্থিত প্রবন্ধে সে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। এস্থলে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জন পুরঃসর ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত নিষ্কামকর্ম্ম অনুষ্ঠাতাকে বাসনাসংস্কারাদি দ্বারা আবিষ্ট করিতে পারে না, বরং অনুষ্ঠাতার চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের সহায়তা করে। পক্ষান্তরে আসক্তিমূলক সকামকর্ম্ম অহমভিমান ও মমত্বাভিমানের সহিত এরূপ দৃঢ় সম্বদ্ধ যে,উহা কোন রূপেই নিঃশ্রেয়সসাধক হইতে পারে না, বরং মোক্ষপথের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া থাকে। আমি যতদূর অবগত আছি, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কর্ত্তব্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের এই অংশটী পরিস্ফুট রূপে বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ সমূহ এই অংশে নিতান্ত অপূর্ণ রহিয়াছে। বস্তুতঃ সকলদিক আলোচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্ত্তব্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের অবতারণা করিতে হয়, তবে ভারতীয় মহর্ষিগণের উপদেশের প্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের নিকট হইতে আলোচনা প্রণালী সংগ্রহ করিয়া তদবলম্বনে আর্যশাস্ত্রোপদেশের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান্ মনু বলিয়াছিলেন—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মংবেদ নেতরঃ।"

যিনি ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ বেদশাস্ত্রাবিরোধি তর্কসহকারে আলোচনা করেন, তিনিই ধর্ম্মের প্রকৃতস্বরূপ জানিতে পারেন, অন্যে পারেনা। আজ খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পাশ্চাত্যসভ্যতার পূর্ণ বিকাশ সময়ে, আজিও সেই নির্দ্দেশের যাথার্থ্য অব্যাহত রহিয়াছে। আজিও

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদনেতরঃ"

ঋষিপ্রোক্ত কর্ত্তব্যবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া কি বুঝিলাম? বুঝিলাম যে কর্ত্তৃত্বাভিমানসম্পৃক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানসাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষফলক হইতে পারে না, কারণ কর্ত্তৃত্বাভিমান দ্বৈতজ্ঞানমূলক, সুতরাং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের প্রতিরোধী। যে পর্য্যন্ত আত্মার অনন্তত্ব উপলব্ধ না হয়, যে পর্য্যন্ত সমস্ত দ্বৈতজাল অপহ্নুত করিয়া অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ অদ্বয়ানন্দ প্রতিষ্ঠালাভ না করে, সে পর্য্যন্ত জীব সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া ক্ষুদ্র সুখদুঃখস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইবে, ইহা একরূপ অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান অধিগত হইলে কর্ম্মবন্ধন আপনা হইতেই ছুটিয়া যায়; যখন কর্ত্তৃকর্ম্মাদিকারকব্যবহারের আশ্রয়-

ভুমি অবিদ্যা বিলুপ্ত হইল, তখন কর্ত্তা কে, কর্ম্মই বা কি? তখন বহুত্বের ভিতর দিয়া একত্ব পুনরধিগত হয়, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগ নিরস্ত করিয়া নিত্যচৈতন্য স্ফুরিত হয়, সুখদুঃখাদি অধঃকৃত করিয়া পরিপূর্ণানন্দ প্রতিষ্ঠালাভ করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভ বহুসাধন সাপেক্ষ; নিষ্কামভাবে বৈধকর্ম্মানুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিবর্জ্জন চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তন্মুখে পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সহায়তা করে; সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্ম-সন্ন্যাসে অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে সেই অধিকার লাভার্থ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে লোক-হিতকর শাস্ত্রোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবংত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্মলিপ্যতে নরে॥"

নামরূপাত্মক ব্যস্তবস্তুসমন্বিত সমগ্র-জগৎ এক পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, এবং সর্ব্বপদার্থ ব্রহ্মাত্মক অবলোকন করিয়া সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্মার অকর্ত্তৃত্বানুসন্ধান করিয়া অজ্ঞানকল্পিত সংসার হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। যখন সমস্ত জগতের আত্মাতিরিক্ত সত্তা নাই, তখন কাহার ধন? কাহার ধনে তুমি লোভ করিবে? কিন্তু যাহারা অনাত্মজ্ঞ ও কর্ম্মসন্ন্যাসে অনধিকারী, তাহারা নিস্পৃহ-ভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে; যাহারা এরূপ-ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা অশুভাত্মক কর্ম্মফল দ্বারা লিপ্ত হয় না, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার অন্য উপায় নাই। ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

বরদাচরণ

পেশাদার গায়কের গান ভাল হোক্ মন্দ হোক্ অনেকে শুনিতে পায়। তাই তাদের নাম দশের মধ্যে প্রচারিত। পেশা-দারের দুর্ভাগ্য, সবাই ডাকে। তাই ভাবে অভাবে গাইতে হয়। বার্ণিশ মাখান পচা কাঠ বাজারে ঢের পাওয়া যায়।

সখের দলে যা পাওয়া যায়, পেশাদারী দলে তাহার সম্ভাবনা নাই। জ্যোতিরিন্দ্রের এক একটী গান গিরীশ ঘোষের শত গানের সমতুল। সৌখিনের লজ্জা আছে, ভয় আছে, ভাবনা আছে। সমস্ত প্রাণটা মিশাইয়া নবনীকোমল অঙ্গুলীর অগ্রে সুধাসিক্ত করিয়া তিনি মালা গাঁথেন। কত মালিনী মালা বেচিয়া থাকে, কাণা রজনীর মালা সকলের চেয়ে সুন্দর। কাণীর চোখ থাকিলে মালা এত সুন্দর হইত না। যে ফুল আঁধারে ফোটে, তার সুগন্ধ ও সুষমার তুলনা নাই। যে গুলা বেহায়ার মত পথের ধারে দিনের বেলা কটমট করিয়া চাহিয়া থাকে, কুজ, লাক্ষা, তাম্বুল বা অঞ্জনের যত মাখামাখি হোক না কেন, তারা কবির হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। কটাক্ষের তীব্রতায় মন ভুলে না—কোমলতায় মন মুগ্ধ করে।

নব্যভারতের সহিত বরদাচরণের সম্বন্ধ অনেক দিন ছিন্ন হইয়াছে। এখন তাঁহার কথা কহিতে হইলে কেহ স্বার্থপরতার অপ-বাদ দিবে না। করমুষ্টির কঠোরতায় ও মস্তিষ্কের তীব্রতায় বরদাচরণ রাজদরবারে

অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। অচিরে উচ্চতম আসন অধিকার করিবেন। তাঁহার নির্ভীকতা, প্রতিভা ও বিচারশক্তির সমালোচনা করিবার সময় আসে নাই। সে মনোহর অধ্যায় পাঠ করিবার জন্য পাঠককে বিলম্ব করিতে হইবে। বুদ্ধির প্রখরতার সহিত ভাবের কোমলতার সম্মিলন অসাধারণ। এই অসম্ভব সম্ভাবনা বরদাচরণে দেখিয়াছি। রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অবসরের অভাব হওয়াতে অনেক দিন সরস্বতীর চরণতলে তাঁহাকে অঞ্জলী দিতে দেখি নাই। বিচারপতি বরদাচরণকে লোকে ভুলিতে পারিবে, কবি বরদাচরণকে কেহ ভুলিবে না। কৌমুদী-রজনীর মলয়-সেবিত শান্ত কমলাসন ছাড়িয়া বাত্যা-তাড়িত প্রভঞ্জন-দপ্ত গিরি-সিংহাসনে জ্বালা থাকিলেও সুখ নাই—গৌরব থাকিলে একটী বিজলীর চমক, অপরটী চন্দ্রিমার চিরপ্রভা। তাই বলিতে হয়

কি করিলি মোহের ছলনে
গৃহ তেয়াগিয়া বিপথে ভ্রমিলি
পথ হারাইলি গহনে।

বরদাচরণের মেঘদূতের অনুবাদ নব্য-ভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে অনুবাদ পড়িয়া রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছিলেন, "সংস্কৃত কোন কাব্যের এমন সুন্দর অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় তিনি আর দেখেন নাই। বিচক্ষণ সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছিলেন, কালিদাসের উৎকৃষ্ট কাব্যের এই অনুবাদে অতুলনীয় লিপিচাতুরীর পরিচয় পাওয়া যায়।" বাঙ্গালিনীকে গাউন পরাইলেও হাবে ভাবে বুঝা যায়, তিনি বিদেশিনী নহেন, বিলাতিনীকে সাড়ি পরাইয়া দেখিয়াছি, গৃহিণীর যে কোমল লাবণ্য, সে লাজ-ভরা আনত আঁখি তাঁহাতে স্ফুরে না। মেঘদূতের অনুবাদ, অনুবাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইলেও, অনুবাদ মাত্র। পদলালিত্য মধুর হইলেও কল্পনার স্বাধীনতা নাই, সাহেব যেন জুতা ছাড়িয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিয়াছে। বরদাচরণের অনুবাদে কালিদাসের সে আবছায়া নাই, সে প্রাণস্পর্শিতা নাই, সে দীর্ঘনিশ্বাস নাই, সে অবাঙ্মুখ একান্ত দৃষ্টি নাই। নীপমূলে যমুনার লহরী নাই—আবন নদে মরাল ভাসিতেছে। বটের শ্যামল শোভা নাই—ওকের দীর্ঘায়তনের কঠোরতা আছে।

মেঘদূতের অনুবাদ করিয়া ক্ষান্ত হইলে বরদাচরণের কৃতিত্বের আমরা প্রশংসা করিতাম, কিন্তু কবি পদবী লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না। তাঁহার মৌলিকতা, তাঁহার ভাবের উচ্চতা, গভীরতা ও কোমলতা, তাঁহার রসরঙ্গ লীলা-চাতুরী, কল্পনার স্বাধীনতা, উদ্দামতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা, তাঁহার মহত্ব ও মহত্বের প্রগল্‌ভতা—এক কথায় কবির কবিত্ব তাঁহার "অবসরে" বিকশিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার মেঘদূতের কথা লোকে যত শুনিয়াছে, "অবসরের" কথা তত শুনে নাই। অথচ অবসরকে রত্নাবলী বলিলে বহুভাষিতা হয় না। আধুনিক কবিগণের প্রায় সকলের পদাবলী পড়িয়াছি। কোনটী কাহারও ভাল, কোনটী কাহারও মন্দ। অনেকের অনেক গুলি করিয়া বাছিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু অবসরে এক সঙ্গে যতগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা পাওয়া যায়, এত আর কাহারও সংগ্রহে দেখি নাই। আদিম অন্ধকারের বর্ণনা অনেকেই করিয়াছেন,

"না ছিল এসব কিছু
আঁধার ছিল অতি
ঘোর দিগন্ত প্রসারি।"

এ যেন বাইবেলের একটী সুক্ত কি সুরা। মনের উপর একটী ছায়া পড়ে, তাহাতে আবর্ত্ত নাই, আবল্য নাই, ভাবায় না, ত্রাসিত করে না। মিল্‌টনে যাহা পড়িয়াছি, যেন যাদুকরের মায়াজাল ছাইয়া ফেলে, ত্রাসিত করে; কিন্তু ক্ষণেক পরে সে ত্রাস চলিয়া যায়, বিশেষতঃ তাহাতে বিশেষ গাম্ভীর্য্য নাই। মিল্‌টনের বিজ্ঞান ও কল্পনায় মিশ খায়না, তিনি যাহা বলেন, তাহা যেন তাঁহার মনের কথা নহে। ভাবের গাম্ভীর্য্যে মিল্‌টনের বিশেষত্ব নাই, কিন্তু গভীর ভাবের অবান্তর অনুশীলনে তাঁহার মহত্ব। স্বর্গের আলোক হইতে নরকের অন্ধকার, তুঙ্গগিরির উচ্চতা হইতে সাগরের বিশালতা পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ আবেগে তাঁহার পতত্র সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান, বাত্যায় বিপর্য্যস্ত নহে, অনলে দগ্ধ হয় না, বরফশিলায় সঙ্কুচিত নহে। তাঁহাকে অনুসরণ করিতে আমরা হাপাইয়া পড়ি, অবসাদে ভাব উবিয়া যায়। বরদাচরণের এ অবান্তর আবেগ নাই, কিন্তু রৌদ্ররসের উচ্ছ্বাসে বা আদিরসের শালীনতায় তিনি কোথায়ও মিল্‌টনকে, কোথায়ও টেনিসনকে পরাস্ত করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব শক্তির অনুশীলন থাকিলে তিনি নব্যবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি হইতেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অন্ধকারের স্থির গাম্ভীর্য্যের পরিচয় লউন।

"অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার।
গ্রাসি ধরণী, গ্রাসি গগন,—
তিমির গহ্বর ব্যাদান যেমন
রক্তবীজ-বধে কালিকার!
ঘোর অন্ধকার!—
অনন্তের মূর্ত্তি, কৃতান্তের ছায়া,
অনাদি পরম কারণের কায়া,
অসীমে সসীমে একাকার!

জগৎ চরাচর যে দিন না ছিল,
ব্যোম উপরে মহাব্যোম বিথার,
শুদ্ধ প্রকৃতি সনে অনাদি পুরুষ
বিশ্বসৃজন-তরে করিল বিহার,—
না ছিল শব্দ, স্পর্শও না ছিল,
রূপ নাহিক ছিল অভিন্ন তায়,
নিরম্বু শূন্যে রস নাহি সম্ভবে,
অক্ষিতি মধ্যে গন্ধ কোথায়?
কেবল সে ছিল অন্ধকার!
প্রকৃতির যেন এই বিশ্ব প্রসব-তরে
দিগন্ত ব্যাপিয়ে গর্ভের প্রায়!

আবার সে হবে অন্ধকার!—
শম্ভু-নিনাদিত প্রলয়-বিষাণে
শব্দ-তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ আকাশ;
বিচ্যুত-কক্ষ গ্রহগণ খসিয়ে,—
চূর্ণ-বিচূর্ণিত লুপ্ত বিভাস,—
অনন্ত শূন্যে যে দিন মিশিবে;
লুকাবে যে দিন দেশ ও কাল
ব্রহ্ম সুষুপ্তির নিশ্বাস-মাঝে,—
সে দিন ফিরিবে তিমির করাল!

এখন ত নাহি অন্ধকার;—
ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা, সসীম সকলি,
ব্যক্ত নয়নপথে ধরিয়ে আকার,—
অমানিশা কোলে তারকা হাসে,
গভীর ঘনগলে বিদ্যুৎহার!
কোথা অন্ধকার!

এসো অন্ধকার!
বিনাশ-সীমা, প্রসার হৃদয়,
নিবার ভিন্নতা, ক্ষুদ্রতা আর,—
অনন্ত অব্যয় আলোক তুমি যে,
অবেদ-কারণে দৃষ্টির পার!"

এইবার কবির লিপিচাতুরীর, বর্ণনার

মাধুর্য্য, ইন্দ্রজালিকের চিত্রপটের অনুপম শোভা অনুভব করুন।

"স্তব্ধ নিশীথে, শয্যা উপরে,
স্বপ্নে যুবতী বসিল উঠি,
শ্লথ-বন্ধন মুক্ত কবরী
পৃষ্ঠদেশেতে পড়িল লুটি;

ভুলিল টানিতে বক্ষে বসন —
লজ্জা তখন নাহিক প্রাণে,—
সপ্নখচিত চক্ষু দুটীতে
চাহিল সুপ্ত পতির পানে।

দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিমাকাশে
হেলাইয়া তনু পড়েছে ঝুঁকি,
আড়ালে থাকিয়া বাতায়ন-পথে
কক্ষ ভিতরে মারিছে উঁকি;

মন্দ পবন নন্দন ভ্রমি
গন্ধ মাখিয়া দাঁড়াল এসে,
অচপল, তবু নিশ্বাস-ভরে
সৌরভ ঘরে এসেছে ভেসে;

জ্যোৎস্না আড়ালে পাতিতেছে আড়ি
কৌতুকভরা তারকা শত,
জড়াজড়ি করি,—নববধূ ঘরে
কিশোরী বালিকাগণের মত!

না দেখিল চাঁদ, না দেখিল তারা
না জানিল মৃদু অনিল শ্বাস,
নাহি সম্বরে মুক্ত কবরী,
নাহি সম্বরে বুকের বাস,

জাগ্রত চোকে, নিদ্রিত মনে,
বিস্মিত যেন, হেরিছে,—কি এ?—
স্বপনের ছবি, নিদ্রার পারে
এসেছে মানবশরীর নিয়ে?

কিন্নরী-বীণা-নিন্দিত সুরে
মানবী-কণ্ঠে ঝরিল কথা,—
"প্রিয়! তুমি কি দেবতা?"

তুলিকার দুইটী আঘাতে একখানি ছবি আঁকিতে পারে, সে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী সন্দেহ নাই।

শুকায় কমলিনী দিবস শেষে;
লুকায় শশীকলা রজনী ভোরে;
সৃজিল তাই বিধি রমণীমুখ,—
ক্রমশঃ জ্ঞান লভে জগতজন।

বস্তুতঃ সুকবি বরদাচরণের পরিবর্ত্তে বিচারপতি বরদাচরণ পাইয়া আমাদের ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

"আমার জীবনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে"—পার্থিব দিবসের অপরাহ্নে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের এই পরিতৃপ্তি-ব্যঞ্জক উক্তি আজ অকালে কালগ্রাসে-নিপতিত ৺ অগ্রজ মহাশয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার সময় মুহুর্মুহু স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে।

আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ হরিদেব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার দুইটী পুত্র এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত তন্ত্রসার নামক গ্রন্থের একখানা প্রতিলিপি সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। কথিত আছে, "মগ"-স্পর্শভীতি তাঁহার জন্মভূমি পরিত্যাগের কারণ। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত মেঘনাতীরবর্ত্তী পাইকারচর গ্রামে বাসস্থান মনোনীত করেন। তন্ত্র-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ

অধিকার ছিল, এবং তিনি সাধনমার্গে সম্যক্ অগ্রসর হইয়াছিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই তিনটী ঐশ্বর্য্যশালী পরিবার তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন। এই পরিবারত্রয়ের মধ্যে দুইটী বৈদ্য এবং অপরটী কায়স্থবংশ সমুদ্ভূত। তাঁহাদের বংশধরগণ পাঁচদোনা, গয়েশপুর এবং আড়াই হাজার গ্রামে সসম্মানে বসতি করিতেছেন। কালক্রমে কয়েকটী ব্রাহ্মণ-পরিবার এবং আরও কতিপয় বৈদ্য ও কায়স্থপরিবার তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। অবস্থাপন্ন শিষ্যগণ প্রপিতামহ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য এবং খুল্ল-প্রপিতামহ বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যথাসম্ভব জমী উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদিগকে এতদঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আমাদের পিতামহ ভবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "শিবতুল্য" লোক ছিলেন। তাঁহার "সার্ব্বভৌম উপাধি ছিল। পাঁচদোনা নিবাসী শিষ্যগণের আগ্রহাতিশয় বশতঃ তিনি পাঁচদোনাতেই আবাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। পাঁচদোনা গ্রাম ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কিম্বদন্তী এই গ্রামের "ধ্বজেশ্বর" বটবৃক্ষকে ব্রহ্মপুত্র-প্রবহনকারী ক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশুরামের নামের সহিত বিজড়িত করিয়া তমসাচ্ছন্ন অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ইহার প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতে যত্নবান রহিয়াছে। পাঁচদোনার যে দুইটী প্রথিত-যশা বৈদ্যবংশের অতীত গৌরবকাহিনী অদ্যাপি ঢাকা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া বিস্ময়োৎপাদন করে, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতর "হাওলে" কৃপারাম রায়ের বংশই আমাদের শিষ্য।

পিতৃদেব ৺ ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহচরগণের নিকট তাঁহার মুক্তহস্ততা ও পরদুঃখকাতরতার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি লোককে আহার করাইয়া সুখী হইতেন। গ্রামের বাজার হইতে কমলা লেবু খরিদ করিয়া পথিমধ্যে বালক-গণকে বিতরণ করিতে করিতে আসিতেন। বাগানের আম প্রচুর পরিমাণে স্বহস্তে কাটিয়া দিয়া বন্ধুবান্ধবগণের তৃপ্তিসাধন করিতেন। পিতৃদেবের আহারের পর আচমনান্তে নাসারন্ধ্রে তৃণাদি প্রবিষ্ট করিয়া হাঁচি দেওয়ার অভ্যাস ছিল। একদিন রাত্রির আহারের পর এইরূপ হাঁচি দেওয়ার সময় তাঁহার শ্বাসরোধ হয়। তিনি প্রাঙ্গণা-ভিমুখে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই সহসা ভূতলে পতিত হন। তৎক্ষ-ণাৎ ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া আবার দুই এক পদ অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন এবং পুনরায় ভূতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন। এই অবস্থাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপে আমরা শিশুকালেই পিতৃহীন হই। অগ্রজ মহাশয়ের বয়স তখন কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর। আমাদের ভগ্নীর বয়স চারি বৎসর এবং আমার বয়স দুই বৎসর ছিল। ৺অগ্রজ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য পিতার পঞ্চম সন্তান। আমাদের প্রথম চারিজন সহোদর সহোদরা বাল্য-কালেই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া-ছিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মাতৃদেবী

অকুলসাগরে ভাসিলেন। আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপরেই পতিত হইল। পিতৃদেব মৃত্যুকালে বিস্তর ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই ঋণদায়ে তিনি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অনেকেই তখন তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হইল না। কতিপয় শিষ্যের সুপরামর্শে এই ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

আমাদের জননী অতি তেজস্বিনী। মানবজাতি যে সকল সদ্‌গুণের পূজা করে, তাঁহাতে সে সকল প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার নির্ভীকতা, হৃদয়ের উচ্চতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা অনেকের পক্ষেই অনুকরণীয়। বিপদে বিহ্বল হওয়া কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানেন না বলিলেই হয়। কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করা, কাহারও অনুগ্রহ প্রার্থনা করাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। আমাদের বাল্যকালে তিনি যেরূপ অভাবে কালযাপন করিয়াছেন, যেরূপ কষ্ট করিয়া আমাদের লালন পালন করিয়াছেন, সংসারে সেরূপ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। শিষ্যগণের নিকট স্বীয় কষ্ট ও অভাবের কথা জ্ঞাপন করিলে হয়ত তৎক্ষণাৎ তাহা দূর হইতে পারিত, কিন্তু তিনি নীরবে সমস্ত সহ্য করিতেন। কাহাকেও কিছু জানিতে দিতেন না।

হয়ত তিনি মানবহৃদয়ের নীচতা ও অন্তঃসারবিহীনতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; তাই কাহারও অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হন নাই। আমাদের পিতৃবিয়োগের দুই কি তিন বৎসর পরে তিনি কতিপয় মাসের জন্য উন্মাদরোগগ্রস্ত হন। সেই সময়ে আমরা গ্রামান্তরে কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রেরিত হইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তথায় আট দশ দিনের অধিককাল আশ্রয় পাই নাই। সেই বাড়ীর একব্যক্তি ইতিমধ্যেই সপরিবারে অদূরবর্ত্তী কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলেন। যিনি বাড়ীতে ছিলেন, তিনিও আমাদিগের জন্য কোন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক বোধ না করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে আমাদের গ্রামে মেলা বসে। আমরা তিনটী শিশু সেই মেলাতে প্রেরিত ও বিসৃষ্ট হইলাম! তথায় কোনও শিষ্যের একজন কর্ম্মচারী আমাদিগকে রোরুদ্যমান দেখিয়া, দয়াপরবশ হইলেন এবং তাঁহার মনিবের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এইরূপে ভগবান সে যাত্রা আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। পিতৃবিয়োগের প্রায় ১৬ বৎসর পরে তাঁহার জনৈক "বন্ধুর" সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে বলিলেন যে, তিনি পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় মাসের মধ্যে প্রায় দশ বার দিন আমাদের বাড়ীতে কাটাইতেন। পিতৃদেব তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিন্তু তিনি সেই ষোল বৎসরের মধ্যে নানা গোলমালে আমাদিগকে একবার দেখিয়া যাইতেও অবকাশ পান নাই! অহো দুর্ভাগ্য!!

১৭৮২ শকাব্দের ২১ শে জ্যৈষ্ঠ, পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিকালে অগ্রজ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হইতেই তিনি অতি সুশীল ও সুবোধ বালক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১১ বৎসর বয়সে পাঁচদোনা মধ্য-বাঙ্গলা স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তিলাভ করেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে কোনও চতু-

পাঠীতে অধ্যয়ন করাইবার জন্য মাতৃদেবীকে পরামর্শ দেন। কিন্তু অগ্রজ মহাশয় বৃত্তি পাইয়া ইংরেজী পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে মাতাঠাকুরাণী তাহাতেই অনুমোদন করেন। এইজন্য তাঁহাকে শিষ্যগণের নিকট অনেক অনুযোগ এবং আত্মীয়গণের নিকট বহুবিধ ভৎর্সনা শুনিতে হয়। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়িবার সময়ে অগ্রজ মহাশয়ের খরচ যোগাইবার জন্য মাতাঠাকুরাণী প্রথমতঃ গৃহের সযত্নরক্ষিত মূল্যবান দ্রব্যনিচয় বিক্রয় করিতে বাধ্য হন, এবং পরিশেষে ঋণ করিয়া খরচ চালাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই সময়ের দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। অগ্রজ মহাশয়ও মাতার কষ্ট দেখিয়া যথাসাধ্য অল্পব্যয়ে পাঠ চালাইতে যত্ন করিতেন। এই সময়ে তাঁহাকে রীতিমত পালা অনুসারে রন্ধন করিতে হইত। অর্থাভাবে সময়ে সময়ে কোন কোন পাঠ্যপুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন বলিয়াও শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় কষ্ট স্বীকার করিয়া অধ্যয়ন করেন নাই; এবিষয়ে তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। অগ্রজ মহাশয় প্রবেশিকা পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বেই মাতাঠাকুরাণীর অনুরোধে বিবাহ করেন।

অগ্রজ মহাশয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এবং ঢাকা কলেজ হইতে যথাসময়ে এফ্, এ, পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় গিয়া জেনারেল এসেম্ব্লির ইনষ্টিটিউসনে বি, এ, পরীক্ষার জন্য পড়িতে থাকেন। তথায় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে গিল্‌ক্রাইষ্ট্ পরীক্ষা দেন, কিন্তু সংস্কৃতের প্রশ্নের উত্তর দেবনাগর অথবা ইংরেজী অক্ষরে না লিখিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়াছিলেন বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য হয়। ইহাতে মনে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বি, এ, পরীক্ষাতে অকৃতকার্য্য হন। তারপর তিনি মুঙ্গেরের মহারাজার স্কুলে হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া যান। এই কার্য্যে থাকিয়া পুনরায় বি,এ, পরীক্ষা দিয়া বিফলমনোরথ হন, এবং কিয়ৎকাল পরে কুমিল্লাতে মহারাজার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হইয়া যান। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া সেই কাজ পরিত্যাগ করেন এবং ঢাকা রূপরবু স্কুলের একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বি,এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। এবারে তাঁহার যত্ন সফল হয়। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃতকলেজে ২০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তথা হইতে ১৮৮৫ সালে সংস্কৃত-সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে তিনি কিয়ৎকাল রিপণকলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এম্-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশাল ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসনের হেড্‌মাষ্টার হইয়া যান এবং তথায় থাকিয়া বি, এল, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। যথাসময়ে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকাতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতীতে ধীরে ধীরে তাঁহার পশার বৃদ্ধি হইতেছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠেন। এবং কিঞ্চিদূন দুই বৎসরকাল ঢাকাতে থাকিয়া বোর্ডের তদানীন্তন সেক্রেটরী পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয়ের অনুগ্রহে আবকারী বিভাগে সবডিপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া ছাপড়া নগরে গমন করেন। ছাপড়াতে তিন বৎসর কাল কার্য্য করিয়া আবকারী বিভাগের চাকরির প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। এই তিন বৎসর কাল মধ্যে ছাপড়াতে যাঁহারা কালেক্টর ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তাঁহার কার্য্যে সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং তাঁহার পদোন্নতি কিম্বা সাধারণ বিভাগে বদলীর জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে কিছুই হইল না দেখিয়া তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় ওকালতী করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। এবং পরিশেষে সাধারণ বিভাগে বদলী হইবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। আবেদন পত্রে ইহাও লিখিত ছিল যে, যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে যেন তাঁহার পদত্যাগে অনুমোদন করেন। তিনি তাঁহার এই ধৃষ্টতার ফল স্বরূপ পদত্যাগে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনই আশা করিতেছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রথম প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। তিনি সাধারণ বিভাগে বদলী হইয়া গয়া জিলার অন্তর্গত নোয়াদা উপবিভাগে খাসমহালের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তথায় তাঁহার ফৌজদারী বিচারও করিতে হইত। তিনি খাসমহালের কার্য্যে এবং বিচারকার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন এবং অতি সত্বরই প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তৎপর তিনি গয়া সদরে বদলী হইয়া ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন এবং বিচারকার্য্যে দক্ষতা নিবন্ধন আরও কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহাকে বাটোয়ারা এবং ফৌজদারী বিচার করিতে হইত। তিনি স্বীয় কার্য্যকুশলতায় উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়া উঠেন।

বাঙ্গালা ১৩০৭ সালের কার্ত্তিক মাসে অগ্রজ মহাশয় মজঃফরপুরে বদলী হন। প্লেগাক্রান্ত গয়া হইতে স্থানান্তরিত হওয়াতে তাঁহার বন্ধুবর্গ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের আনন্দস্থায়ী হইল না, তাহা কতিপয় দিবস মধ্যেই বিষাদে পরিণত হইল। তিনি কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন বেলা প্রায় দশটার সময় মজঃফরপুরে উপনীত হইয়া তাঁহার বন্ধু কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই দিনই অপরাহ্নে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্বর হয়। রাত্রিতেই উৎকট প্লেগ রোগের উপসর্গ সমূহ প্রকাশ পায়। যথোচিত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা হইল বটে, কিন্তু কিছুতেই রোগের শান্তি হইল না। ১লা অগ্রহায়ণ, রাত্রি প্রায় দুইটার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এসময়ে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু যে বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন, সংসারে তাহা নিতান্ত দুর্ল্লভ। তিনি আপনার জীবনের দিকে না চাহিয়া, স্ত্রী ও সন্তানগণের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, বন্ধুগণের উপদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এরূপ উৎকটরোগগ্রস্ত বন্ধুকে নিজের বাসায়, নিজের ঘরে, নিজের শয্যায় স্থান দিয়া প্রথম হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবিরত

তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন। স্থানীয় সিবিল সার্জ্জন ও তিন জন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দ্বারা যথারীতি চিকিৎসা করাইয়াছেন। অগ্রজ মহাশয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণ কয়েকদিন মজঃফরপুরে ছিলেন, সে সময়ে তাঁহারই যত্নে তাঁহাদের কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। মজঃফরপুরের সিবিল সার্জ্জন ইংরেজ ছিলেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া অগ্রজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, তাঁহার মৃত্যুর পরদিন প্রাতে বলিয়াছিলেন, —"তোমরা এখানে নূতন লোক। তোমাদের নানা প্রকার অভাব ও অসুবিধা হইতে পারে। যখনই যে অভাব অথবা অসুবিধা বোধ হয়, আমাকে জানাইও, আমি তাহা দূর করিয়া দিব। আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।"—কথাগুলি আজও মুহ্যমান হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দেয় এবং ইংরেজ জাতির মহত্ত্বের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের নীচ জীবনকে উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে প্রোৎসাহিত করে। বলা বাহুল্য, জ্ঞানেন্দ্র বাবুর যত্নই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ডাক্তার সাহেবের নিকট কোনরূপ আবেদন আবশ্যক হয় নাই। সদাশয় ভারত গবর্ণমেণ্ট অগ্রজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নীকে এক হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন,—ইহাও সহোদর-প্রতিম সেই জ্ঞানেন্দ্র বাবুরই চেষ্টার ফল।

অগ্রজ মহাশয় চারিটী পুত্র ও তিনটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ভূপেন্দ্র নাথ তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই ১৯০১ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি ঢাকা কলেজে পড়িতেছে। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথও এবার (১৯০২) প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক-সমাজে সুপরিচিত খ্যাতনামা বিদ্যোৎসাহী ভাওয়ালাধিপতি স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত রণেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর অগ্রজ মহাশয়ের অকালমৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তির পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সাহিত্য-সেবার পুরস্কার স্বরূপ শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথের পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহকল্পে মাসিক দশ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

অগ্রজ মহাশয় আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহার বেশভূষা অতি যৎসামান্য ছিল। কিন্তু তাঁহার সুগৌরকান্তি ও প্রতিভাব্যঞ্জক প্রশান্ত মুখমণ্ডল তাঁহার নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিত। তিনি নিরহঙ্কারী ছিলেন। তাঁহার সরল ব্যবহারে লোকে মুগ্ধ হইত। ফলতঃ প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে সময়ে সময়ে যেরূপ প্রীতিদায়িনী সরলতা লক্ষিত হয়, তাঁহার সরলতা সেইরূপ ছিল। তিনি প্রায় দ্বাদশ-বর্ষকাল বিহার প্রদেশে রাজকার্য্যে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভূত ক্ষমতাসত্ত্বেও লোকের প্রতি তাঁহার ব্যবহারে কর্কশতার লেশমাত্রও অনুভূত হইত না। কি বড়, কি ছোট সকলেই তাঁহার সবিনয় ব্যবহারে পরিতোষ লাভ করিতেন। তিনি তোষামোদ প্রিয় ছিলেন না। নিজেও কাহাকে তোষামোদ করেন নাই। তিনি অতি তেজস্বী ও নির্ম্মল চরিত্র ছিলেন। অন্তঃকরণের নীচতা বশতঃ কেহ তাঁহার বিরক্তি-

ভাজন হইলে, সেই বিরক্তি সহজে অপনীত হইত না। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সময়ে সময়ে কঠোরতায় পরিণত হইত। একজন ডিষ্ট্রীক্ট জজ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট অগ্রজ মহাশয়কে পরিচিত করিবার সময় বলিয়াছিলেন—"Here is my stern Deputy." একজন মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তিনি তাঁহাকে একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমার নিকটে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা সকলেই পরস্পরের নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি কখনও কাহারও নিন্দা কর না। তাহাতেই আমি বুঝিতে পারি যে, তুমি অতি ভাল লোক।"

অগ্রজ মহাশয় নিরতিশয় অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন। তিনি প্রত্যহ রাত্রি বারটা কি একটা পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন, অথবা লিখিতেন। আবার এদিকে অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিতেন। গুরুতর রাজকার্য্যও তাঁহার এই অভ্যাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। তিনি বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারিতেন না।

বি, এ, পরীক্ষার পূর্ব্বে কলিকাতা অবস্থান কালেই অগ্রজ মহাশয়ের লেখক হইবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি সেই সময় হইতেই পুস্তক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। পরে ক্রমে ক্রমে রাশি রাশি গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার লাইব্রেরীতে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ এবং ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি প্রতি মাসেই কিছু কিছু করিয়া গ্রন্থ ক্রয় করিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে Encyclopædia Britannica নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ ক্রয় করেন।

বরিশালে অবস্থানকালে নব্যভারতের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি তাঁহাকে নব্যভারতে রীতিমত লিখিতে প্রোৎসাহিত করেন। যদিও তৎপূর্ব্বেও কোন কোন পত্রিকায় সময়ে সময়ে তাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইত, তথাপি উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের উপদেশেই তিনি যথারীতি কার্য্যতঃ লেখকব্রত গ্রহণ করেন।

নব্যভারতের পাঠকবর্গের নিকট তাঁহার সাহিত্য-সেবার পরিচয় প্রদান করা বাহুল্য মাত্র। এই পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সাহিত্যেও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে "নেপালের পুরাতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াই তিনি সবিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। তাহাতে ডাক্তার ভাউদাজী, ভগবানলাল ইন্দ্রজী ও ডাক্তার বুলার প্রভৃতি কয়েকজন পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী অসাধারণ পণ্ডিতের ভ্রান্ত মত খণ্ডিত ও যথার্থ ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-সেবক সমাজে তাঁহার বিলক্ষণ যশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক পাঠকই হয়তঃ তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতেন। পুরাতত্ত্বের আলোচনা কিয়ৎ পরিমাণে কর্কশ হওয়া অনিবার্য্য। বাঙ্গালী পাঠক 'মধুর কোমল কান্তপদাবলী' ফেলিয়া উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকবহুল পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, এমত ভরসা তিনি নিজেও অধিক করিতেন না। কয়েক বৎসর হইল, একজন বেহারবাসী লেখক তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ হিন্দীভাষাতে অনুবাদ করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে নিরতিশয় সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

ঢাকাতে ওকালতী করিবার সময় তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম ভাগ" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক খানা তিনি জনকজননীর পবিত্র নামে উৎসর্গ করেন। নোয়াদা অবস্থানকালে "বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণবকবিগণের জীবনী" প্রণয়ন করেন এবং গয়াতে অবস্থানকালে—"ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা, প্রথম ভাগ" রচিত ও প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি "পাঠমালা" নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকাও রচনা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের অবশিষ্ট অংশের জন্য উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বিস্তৃত ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্যও উপকরণ সংগৃহীত আছে।

যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন বন্ধুবর জ্ঞানেন্দ্র বাবু তাঁহার সাহিত্য-সেবার কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন—"দাদা' তুমি যদি আর দশ বৎসর বাঁচিতে।" ইহার উত্তরে অগ্রজ মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"দাদা আর পাঁচ বৎসর বাঁচিলেই হইত।"

আর কি লিখিব ?—

স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত পাঠক-রচিত কয়েকটী গান।

পূর্ব্ববঙ্গের অনেক পাঠকই স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত পাঠকের * নাম শুনিয়া থাকিবেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার জনৈক ভক্তশিষ্যের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়। তিনি পূর্ব্বে কথকতা ব্যবসায়ী ছিলেন; অধুনা অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহার নিকট সময় সময় স্বর্গীয় পাঠক মহাশয়ের রচিত গান শুনিতে পাইতাম। ঐ সকল গান শুনিয়া আমার মনে হইত যে, উহা রচনা-চাতুর্য্যে এবং ভাবমাধুর্য্যে দাশুরায়, মধুকাণ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, রামনিধি গুপ্ত, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির রচিত গানের সহিত সমান স্থান পাইবার অধিকারী। আমি তাঁহাকে ঐ সকল সংগীত সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। এযাবৎ তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই; কখনও যে হইবেন, তাহাও আশা করি না। আমি অতি কষ্টে কয়েকটী গান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের কেহ যদি এই লুপ্ত-প্রায় রত্ন সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গবাসিদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, এবং লুপ্তরত্ন উদ্ধারজনিত যশঃ তাঁহার হইবে। বাবু জলধর সেন মহাশয় স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদারের (ফিকির চাঁদ ফকিরের) রচিত সংগীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার এই সদৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। আমি অনেক যত্ন করিয়াও স্বর্গীয় পাঠক মহাশয়ের জন্মসাল এবং তারিখ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের লোকের মহত্ত্ব ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়! "পাঠক" মহাশয়ের জনৈক আত্মীয় উহা জানিয়াও বলিতে স্বীকৃত হন নাই। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কাঁসাভোগ গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান; তাঁহার পিতার নাম চিন্তামণি ঠাকুর। প্রায় ৭০

* কৃষ্ণকান্ত পাঠক কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি নামেও অভিহিত হইতেন।

বৎসরে বয়সে পাঠক মহাশয়ের মৃত্যু হয়; তাহার পর প্রায় ১০ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার জন্মকাল ১২২৫—১২৩০ সাল নির্দ্ধারণ করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। তিনি কথকতা বিষয়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার কথকতা শ্রবণ করিয়া জনৈক প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ-পণ্ডিত তাঁহাকে পাঁচটী টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত একজন পরম নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। ভগবানের নিকট আত্ম-নিবেদন তাঁহার দৈনিক কার্য্য ছিল। তিনি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবার সময় প্রায় প্রত্যহ কখন 'অয়ি রাধে! মুঞ্চ তদমুচিন্তয়মমুদিনং "স্বপ্ন-বিলাসের" এই গানটী এবং কখন তাঁহার নিজরচিত "হরি বল, বলরে মাধা, দিন গেল বিফলে" এই গানটী গাইতেন। তাঁহার রচিত সংগীতগুলি আত্মার দীনভাব ব্যঞ্জক। পূর্ব্ববঙ্গের কথকতা ব্যবসায়িদিগের মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। কৃষ্ণকান্ত-রচিত সংগীতগুলির মধ্যে যে যে স্থলে "কৃষ্ণকান্ত বলে" বা "কান্ত বলে" প্রভৃতি ভণিতা আছে, তাঁহার কোন কোন শিষ্য সেই সেই স্থলে নিজ নাম সন্নিবিষ্ট করিয়া গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন! বিক্রমপুরে যিনি "কালীকুমার হরি" নামে প্রচার হইয়াছিলেন, তিনি একদিন সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। কথিত আছে যে, যখন তিনি কৃষ্ণকান্তকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ছি ছি কর কি? যে হরির পদারবিন্দ চিন্তা করিবার জন্য কত যোগীন্দ্র মুনিন্দ্রগণ যুগযুগান্তর ধ্যানস্থ হইয়া আছেন, তুমি সেই হরি; তুমি আমাকে প্রণাম করিবে কেন?" ইহাতে "কালীকুমার" অত্যন্ত লজ্জিত এবং নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্তের ধীর, গম্ভীর, মধুর স্বভাবে অনেকেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন; তাঁহার কোন কোন স্বাধীন ব্যবহারে এক দল লোক তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয় কি উপাদানে গঠিত ছিল, তাঁহার রচিত সংগীতগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—বৈষ্ণবমাত্রেই ইহা বিশ্বাস করেন; কৃষ্ণকান্তও ইহা বিশ্বাস করিতেন। রাধাকৃষ্ণরূপ এক হইয়া গৌররূপে প্রকাশ হইয়াছিল;—অন্তরে কৃষ্ণরূপ, বাহিরে রাধারূপ ইহাই শাস্ত্রের কথা এবং গোস্বামীদের মত। কৃষ্ণসন্দর্ভের

"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতঃ।"

এবং শ্রীমদ্ভাগবতের

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"

এই উভয় শ্লোকই গৌরাঙ্গের অবতারত্ব প্রতিপাদক। যে কয়েকটী গান উদ্ধৃত হইল, তাহার অধিকাংশই "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" ভাবসূচক। শ্রীকৃষ্ণের জন্য গৌরাঙ্গের ব্যাকুলতাভাব ইহাতে বিশেষরূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছে।

রাগিণী মনোহর সাই, তাল লোভা।

১। জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া গৌর হয়েছে॥
কারে ধরবে বলে ঝাঁপ দিল, থাই পেলে না, ন'দে উঠেছে॥
কারে জানি বাসত ভাল, কে ওর মনের মতন ছিল,
সদা ওর মন ছিল তা'র রূপের কাছে,

পেল না সকল, তাইত বিকল, অন্তরে ওর দাগ
লেগেছে॥
বুঝি ওর মন পুড়ে যায়, নেইকো স্থির ভ্রমি বেড়ায়,
তাপিতপ্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে,
ওরে প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে॥
নেইকো ওর দুঃখের অন্ত, হয়েছে পথ-শ্রান্ত,
সদা মনভ্রান্ত, নয়ন-জল পড়েছে।
কৃষ্ণকান্ত বলে, শান্তি নাই ওর, যাবৎ জীবন
তাবৎ আছে॥

চিন্তাশক্তির প্রভাব মহান, উহা দ্বারা তন্ময়ত্ব জন্মে। চিন্তিত বস্তুর গুণ এবং প্রকৃতি চিন্তাকারীর দেহমনকে তদ্ভাবগত করিয়া রূপান্তরিত করে, ইহা একটী দার্শনিক সত্য। শ্রীকৃষ্ণ রাধারূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার গৌরবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গৌরাঙ্গ ইহারই অভিব্যক্তি।

রাগিণী ঐ, তাল ঐ

২। পোঁজে তাই কোন্ স্বরূপে মনের মানুষ মিশে
গেছে।
ওতার পায় না দেখা, তাইতো একা, দেখার লেগে
কান্তে আছে॥
ভ্রমিছে দেশে দেশে, সে মানুষ পাওয়ার আশে,
শুদ্ধরস-প্রেমাবেশে, রাগ নিয়াছে।
নেই ভঙ্গ, রাগে মাখা অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গরাগ ধরেছে॥
সকল ওর রাগের বিকার, অঙ্গে হয়েছে প্রচার,
রাগে তার, তার সনে ওর মন মিশেছে।
যদি না মিশে মন কেবা এমন, কা'র লেগে কবে
কেঁদেছে॥
যায় যেন যায় কি না যায়, চায় যেন চায় কি না
চায়,
এমন ভাব-ভূষণে কায় গঠেছে।
ওর মনে ব্যথা, কয় না কথা, অন্তরে প্রেমকাঁটা
ফুটেছে।
যেন এ অঙ্গ নয় ওর, ভাবের তরঙ্গে বিভোর,
হেটে যায়, তাই যেন ধরায় পড়েছে।
কান্ত কয়—যার লেগে মন, করে এমন,
তারে বিনা জীবন মিছে॥

রাগিণী মনোহর সাই, তাল লোফা।

৩। তা'র কি প্রাণ, যে ওরে দীন হীন করে
সাজায়েছে।
(ও) তা'র প্রাণের তুল্য, নেইকো মূল্য, কোথা কি
তুলনা আছে॥
তা'র স্বভাব নেইকো ভাল; যদি কেউ বলে ভাল,
যে ভাল—কাজে তা' প্রকাশ পেয়েছে।
ওর যেমন, তা'র তেমন হ'লে, তবে কি রৈতনা
কাছে॥
সে দেশের রাজা কি সে; এত পদ পেল কিসে;
সে দেশে যাই করে তাই সেজেছে।
বসনভূষণ কেড়ে রেখে, করে দণ্ড করঙ্গ দিয়েছে॥
এমন ত দেখি নাই কোথা', এ বড় দুঃখের কথা,
যে ব্যথা অন্তরে ও পেতে আছে;
করে বপনং দ্রবিণাদানং দেশ হতে বিদায় করেছে॥
নাইকো ওর দয়ার গন্ধ, বিধাতার কি নির্ব্বন্ধ,
ও ভাবে প্রেম-সম্বন্ধ কিসে আছে।
কৃষ্ণকান্ত বলে, কপালফলে, সে সম্বন্ধ ঘুচে গেছে॥

এই গানে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসীবেশ ধারণের বিষয় উপলক্ষিত হইয়াছে।

রাগিণী ঐ, তাল ঐ।

৪। তা'রে ধিক্, যে রতন বিদায় দিয়ে প্রাণ ধরে
আছে।
কিন্তু তেমন জনার এমন হ'লে, প্রাণ যেত তা'র
পাছে পাছে॥
তার রূপ-লাবণ্যে ধিক্, তার সে কারুণ্যে ধিক্,
তার প্রেমেও ধিক্ ধিক্ রয়েছে।
তায় এ হতে কি বল্‌বো অধিক, জল বিনে মীন
কোথায় বাঁচে॥
সে ওরে কোর্‌লো বিদায়, কিন্তু ও তার প্রেমের
দায়,
পড়ে দুঃখ-সিন্ধু-নীরে ভাস্‌তে আছে।
কোথায় কে আছে এমন, কে বুঝে মন, আপন
বলে রাখে কাছে॥
তারি যদি দয়া হোত, তবে কি সে ছেড়ে দিত,
সদা তার হোয়ে রৈত পাছে।
করে সে ঘোষণা, পায় যাতনা,
(তবু) তার আশায় ওর জীবন আছে॥

ও বড় বিষম দশা, যার লেগে করে আশা,
সে ওর আশাপথের দূরে আছে।
কান্ত কয়—বিভিন্ন নয়, শুদ্ধ-প্রণয়
রূপে (রূপে) মাখা আছে ॥

'রতন'—শ্রীগৌরাঙ্গ।

রাগিণী ঐ, তাল ঐ।

৫। কোথা জানি কা'র কি ছিল এ গৌর রায় ॥
ওরে যেমন কেমন কেমন ভাবের মতন দেখা যায়।
নব প্রেম-রস-সিন্ধু-তরল-তরঙ্গে, ভেসেছিল
একা নয় সে, কে যেন ছিল সঙ্গে ;
পরে সে যেন কোন্ ঘাটে রলো, ও একা এল
নদীয়ায় ॥
কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন কখন নাচে,
* * * সকলই তার কাছে।
সে এল কি না পাছে, তাইত ফিরে ফিরে চায় ॥
কি মরি, নবহেমাঙ্গ বিচ্ছেদ-রসে মাখা,
সতত যখন করে না পায় তা'র দেখা ;
(ও গো) যার যাতনা সেই সে জানে, অন্যে কি তা
জানতে পায় ॥
অভিনব ভাবোদ্গম তিলে তিলে, কি করি কি
মনপ্রাণ কেড়ে নিলে নিলে,
কৃষ্ণকান্ত বলে, এত কাল ছলে প্রাণ জ্বালায়ে
যায় ॥

রাগিণী ঐ, তাল ঐ।

৬। হায়, গোরাচাঁদ যেন দীনহীন প্রায় ॥
উহার অন্তরে কি আছে নিগূঢ় অভিপ্রায় ॥
অনুরাগ-পবনযোগে, বিরহ-হুতাশনে,
দহিছে কাঞ্চনতনু জীবনেরি সনে ;
অনুরাগের চিহ্ন পরিপূর্ণ, নয়নে ওর দেখা যায় ॥
ভাবে বুঝি মনের মতন মানুষ যদি পেত,
তবেত অন্তরের কথা কিছু বলে যেত ;
(ও) তার ভাবে গদগদ অঙ্গ প্রেমমদে চলে যায় ॥
কি রসে সরস গো, পরশমণি গোরা,
রসিকশেখর তনু প্রেমরসে ভরা,
ও প্রেম সম্বরিতে নারে দেহে, (তাই) বাহিরেতে
প্রকাশ তায় ॥
যদি হয় কাঞ্চনতনু হৃদয়মাঝে রাখি,
হেমাঙ্গপরশে প্রেম উদয় হয় না কি ;
কৃষ্ণকান্ত বলে, ধর্‌বে না কি, মন রেখো ও রাঙ্গা
পায় ॥

রাগিণী ঝংলা—তাল আড়খেম্‌টা।

৭। যার মন দিলে মন পেতে পারি, তারে দিলেম
কৈ ॥
আমি রৈলেম আমার মত, তার মনের মতন
হলেম কৈ ॥
মনের আগুন মনে জানে বল্‌বি কার কাছে,
এমন বুঝে আগুন করে বারণ এমন কেবা আছে,
যে বুঝে যে মন তারই কৃপার ভাজন হলেম কৈ ॥
দিলে মন এমন র'লেম সদা বনিতা নিবাসে
হলো প্রায় কালশেষ,
দেখিনা শেষ মজেছি কি রসে,
যে দেশে গেলে আশা পূরে, সে দেশে যাওয়া হলো
কৈ ॥
সাধু যে জন দিয়াছে মন, তাহারই চরণ-পাশে,
সে রসের পাথার, দিয়ে সাঁতার, প্রেমতরঙ্গে
ভাসে,
এমনি হয়েছে যে জন, তার তুলনা আছে কৈ ॥
দেখি ভেবে দিব কারে, দেওয়ার দিন কি আছে ;
চিন্তামণি বলে, কান্তরে, দেখ্ কৃতান্ত তোর পাছে,
তোর আপন দোষে সব্ হারালি, তুই আমার দেশে
এলি কৈ ॥

'চিন্তামণি' কৃষ্ণকান্তের পিতা। কৃষ্ণকান্ত ইঁহারই নিকটে দীক্ষা নিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত ইঁহার পবিত্র আদর্শ অনুসরণ করিতেন।

৮। কানাই, একা হেথা এলি,
(ও তুই শ্রীদামেরে ফাঁকি দিয়া।)
ব্রজপুরে আদর করে (ভাইরে কানাই) শ্রীদামেরে
সখা বলে (ও) ডেকেছিলি ॥
ব্রজে তুইরে ছিলি কাল,
সে অঙ্গ তোর ছিল ভাল ;
তুই কাল ছিলি গৌর হলি,
(বলরে কানাই) ও তোর কালবরণ কা'রে দিলি—
ও তোর গৌরবরণ কোথায় পেলি ॥
যেন স্থিরা সৌদামিনী, যে ছিল তোর মনমোহিনী,

প্রেম-সিন্ধু তরঙ্গিণীর রূপসাগরে,—(তুই কিরে তার) রূপসাগরে ডুবেছিলি ॥
যে হ'ল সে হ'ল দেখা, আর কিরে তোর পাব দেখা,
কান্ত কয়, অন্তেতে দেখা দিস্‌রে তারে,
ব্রজের ভাবে বনমালী ॥

শ্রীদামের প্রতি অভিশাপ ছিল যে, তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের শত বৎসর সাক্ষাৎ হইবে না। উপরি উদ্ধৃত গানে সেই অভিশাপই উপলক্ষিত হইয়াছে।

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা।

৯। আমি দোষ দিব কার, সকলই আমার,
আপন কর্ম্মে ঘটে ॥
এমন দশা আর, আমা বিনে কা'র,
এমন তরি কা'র ডোবে ঘাটে ॥
ছিল কিছু ধন, করিয়ে বন্ধন, রঙ্গপুরের মাঠে।
করেছে প্রহার, করি হাহাকার, ছজনা তাই নিল লুটে ॥
আশা ছিল যা'র, কৃপাঅঙ্গীকার, গেল তা'রা-তার হেটে।
সে বিনে এবার, কে আছে আমার,
দাঁড়াই গিয়ে এবার কা'র নিকটে ॥
নিরাশা পাথার, তাহে শতধার, দুঃখের তরঙ্গ উঠে।
নাহি দেখি পার, ভাবি অনিবার,
কে করে নিস্তার এ সঙ্কটে ॥
পরশরতন চিন্তামণি ধন যার ঘটে, তার (ই) ঘটে;
কান্ত বলে তার, ঘট্‌বে কিবা আর,
আশালতার মূল গেছে ছুটে ॥

"রঙ্গপুর" শব্দে এখানে সংসার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। "ছজনা" ছয় রিপু। "চিন্তমণি" কৃষ্ণকান্তের পিতা। তারাতার—তাড়াতাড়ি—শীঘ্র।

১০। হরি, আমার মানস-সন্তাপ নাশিতে যদি
তোমার অতি দুঃখ হয়।
তবে কেন দুঃখ পাবে, যা হয় আমার হবে,
তুমি সুখে থাক, সুখময় ॥
অন্তর অন্তরে সন্তান সন্ততি,
অশান্ত সমাজে সতত বসতি,
আমার নাই অন্য গতি; (ওহে) ব্রজ জন-পতি,
দিবে কি শ্রীপদে আশ্রয় ॥
পড়েছি বিপাকে আপন কর্ম্মপাকে,
তুমি বিনা আর কে খণ্ডাবে তাকে,
মরম বেদনা নিবেদি তোমাকে,
তুষানলে দহে এ হৃদয় ॥

প্রার্থনার ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর আদর্শ কি আছে?

১১। কিবা নদীয়ায়, ভাব-কল্পতরুমূলে, স্বিরঙ্গে
ফুটেছে একটী ফুল।
ভুবনদুর্লভ, সুজনবল্লভ, ব্রজধামে ঐ তরুর মূল।
ফুলের মধ্যদলে নবনী লঘন,
বাহিরে গলিত-কাঞ্চন কিরণ,
কিবা সুদর্শন—যে করে দর্শন,
মনপ্রাণ কার না করে আকুল।
সেই হ'তে ন'দে ঘুচে নিরানন্দ,
সতত বিতত পরম আনন্দ,
ফুল হ'তে ক্ষরে প্রেম-মকরন্দ,
গন্ধে উড়ে পড়ে ভক্ত-অলিকুল ॥
ফুলের সৌরভ-করুণা-পবনে,
এই দশ দিশ ব্যাপিল ভুবনে,
আকর্ষিল জগজ্জন-গণ-মনে,
মায়া-স্নেহ-লতা-করিল উন্মূল।
কান্ত বলে সেই ফুল রায় রামানন্দ,
স্বরূপ দর্শনে বাড়িল আনন্দ,
তার বিনে কার ঘটে এ সম্বন্ধ,
প্রেমময় হ'ল গোদাবরি কূল ॥

এই গানটীতে "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" ভাব সূচিত হইয়াছে। "রামানন্দ রায়" একজন পরম ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের একজন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন। চৈতন্যদেব ইঁহার দর্শনেচ্ছায় নিজে বিদ্যানগর গিয়াছিলেন। এই গানটীর পদগুলি পড়িতে পড়িতে 'স্বপ্নবিলাসের'
"তোমার মতন অঙ্গের গড়ন,
আমার মত গৌরবরণ,
সে যে ব্রহ্মার দুর্লভ হরিনাম বিলাচ্ছেন যাকে তাকে'
এই পদটী স্বতঃই মনে উদিত হয়।

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল একতালা।

ও মন, আপনি ডুবিলি, আমাকে ডুবালি
(এ ঘোর ভব-সিন্ধু-নীরে)।

বহু জনম পরে, মানবদেহ ধরে,
পেয়ে আরবার হারালি হারালি
ও মন, ভাব্‌ছ বসে বসে বাঁচবে কতকাল,
কাল পেতে আছে বিষম মায়া-জাল,
হরিনাম-শস্ত্রে না কেটে সে জাল,
ভবে কি জঞ্জাল ঘটালি ঘটালি ॥
ও মন, যে দেহেরই কর মার্জ্জন ভূষণ,
দিনেক দুদিন পরে নিবে হুতাশন,
দুরন্ত কৃতান্ত করিবে শাসন,
* * * কেন না ভজিলি।
ও মন, দেহ-তরি তাহে গুরু কর্ণধার,
তবু না ভাবিলি উপায় তরিবার,
ভবপারাবার, কিসে পাবি পার,
দিনান্তে একবার হরি না বলিলি ॥
ওরে মন, আমি কিরে, তোর খাতকী ছিলেম এত,
ছিল মনে যাই, কল্লে মনের মত,
কৃষ্ণ (কান্ত) বলে, মন, বল্‌বো তোরে কত,
অবিরত বিষয়মদে রত র'লি ॥

শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী।

মেঘদূত-ব্যাখ্যা।

(কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য ॥৵০)

কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী M. A. মহোদয় কালিদাস ব্যাখ্যা ১ম খণ্ড নামে বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। একাধারে বীভৎস অশ্লীলতা ও ইতর ভাষা—এ উভয়ের সংযোগই এ গ্রন্থের অপূর্ব্বতা। শাস্ত্রী মহোদয়ের ন্যায় সুশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, খ্যাতনামা পণ্ডিত কর্ত্তৃক ঈদৃশ জঘন্য ভাব ও ভাষার প্রচার, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার পক্ষে যে কি সাংঘাতিক অনিষ্টকর, তাহা বলিয়া জানান যায় না। মেঘদূতের সৌন্দর্য্য-ব্যাখ্যার ছলে তিনি যে কি অকথা কুকথা লিখিয়াছেন, লজ্জা ও অপকারিতার ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায়, "সৌন্দর্য্যের মুখে রুচির উপর বড় একটা ঝোঁক থাকে না"—লিখিয়া নিজের সাফাই দিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য্যের ঝোঁকে কোন ভদ্রসন্তান যে এতটা বাড়াবাড়ি করিতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনায়ও আসে না। ভদ্রসন্তান শাস্ত্রী মহাশয় সৌন্দর্য্যের ঝোঁকে যাহা করিয়াছেন, কোন ইতরসন্তান কুস্থানে বসিয়া মদের ঝোঁকে তাহা করিতে পারে কিনা সন্দেহ। পুস্তকখানা অপশব্দঘটিত গ্রাম্যভাষায় ও অশ্লীল রসিকতায় পরিপূর্ণ। আবালবৃদ্ধ-বনিতা আপামর সাধারণ তাঁহার এ ব্যাখ্যা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। তাঁহার ব্যাখ্যার যে সকল স্থান একেবারেই অবাচ্য ও অশ্রাব্য, তিনি সেই সকল স্থান, বারংবার চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহাই কি সৌন্দর্য্যব্যাখ্যা? পড়িয়া আমাদের ধারণা হইল,—ইহা কালিদাসের বর্ণনার প্রতি গ্রাম্যরসিকতাপূর্ণ বিদ্রূপ, ব্যাখ্যার ব্যপদেশে নিজ উদ্দাম অশ্লীলপ্রিয়তার অভিনয়। নহিলে, সৌন্দর্য্যব্যাখ্যায় এত মদের প্রশংসা কেন? এত রতিশাস্ত্রের কথা কেন? (১)। সুরা ও রতি—এই দুইটী কি শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট পরম সুন্দর?

শাস্ত্রী মহাশয় একটী কসুমিত রক্তা-

(১) ৬০, ৩৯, প্রভৃতি পৃষ্ঠা দেখ।

শোক তরু লইয়া যেরূপ টলাটলি করিয়াছেন, তাহা পড়িলে বেশ্যারাও লজ্জা পায় (১)। তিনি গম্ভীরা নদী উপলক্ষ করিয়া যে ঘৃণিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি প্রত্যেক স্বদেশবাসীর নিকট শত শত বেত্রাঘাত লাভের দাবি করিতে পারেন।

প্রত্নতত্ত্ববিশারদ শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রত্নতত্ত্বটা কি অবশেষে জুগুপ্সিত অশ্লীলতত্ত্বে পর্য্যবসিত হইল? ইহাই কি তাঁহার ত্রিশ বৎসর সাধনার ফল! (২)। তাঁহার প্রবীণ বয়সে জ্ঞানের কি ইহাই পরিণতি!

কালিদাসের মেঘদূত অলৌকিক কবিত্বময় হইলেও, অশ্লীলতাদোষ-পরিশূন্য নহে। তাহা বলিয়া তাহাতে ছেবলামি নাই, ঘাঁটাঘাঁটি মাতামাতি নাই। যে কয়েক স্থানে অশ্লীল ভাব আছে, তাহার অধিকাংশ ব্যঙ্গার্থের মধ্যে গূঢ়, তাহা আবার তদীয় অনির্ব্বচনীয় করুণ গম্ভীর ছন্দ ও ভাষার প্রভাবে এত ক্ষীণশক্তি যে, তাহাতে পাঠকের চিত্ত কলুষিত হয় না। পড়িতে পড়িতে হৃদয় কোনও অপূর্ব্ব স্বপ্নময় রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাহার পবিত্র শোভায় আত্মহারা হইয়া যায়। সূক্ষ্মসৌন্দর্য্যদর্শী হরপ্রসাদ সেই সকল স্থান হইতে অশ্লীল ভাব সকল গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রাম্য ভাষায় পল্লবিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত করিয়া, সেই সকল চিত্র এরূপ নির্লজ্জভাবে পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন যে, দেখিলে মনে হয়, এ দেশে রাজা নাই, রাজদণ্ড নাই, হিতাহিত বোধ নাই; আমরা অরাজক উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যে বাস করিতেছি। সংস্কৃত কলেজের যে পবিত্র অধ্যক্ষপদ ঋষিকল্প বিদ্যাসাগর, কাউএল্, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, আজি সেই পুণ্যময় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অধ্যক্ষের আসন হইতে বিবিধ রতিবন্ধ এবং "সর্ব্বোৎকৃষ্ট রতিবন্ধের চরম আস্বাদ" বিঘোষিত হইতে লাগিল!!!

শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি সেই ইতরজন-ব্যবহার্য্য গ্রাম্য ভাষাকেই নাকি আদর্শ বঙ্গভাষারূপে চালাইবার জন্য ব্যগ্র। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান সমুন্নত অবস্থায় যদি শেষটা চাষার ভাষাই আদর্শ ভাষারূপে পরিগৃহীত হয়, এবং তাঁহার প্রদর্শিত অশ্লীলতত্ত্ব সকল শিক্ষণীয় হয়, তবে আর আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক গ্রন্থরচনা বা বিদ্যালয় স্থাপনা প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। ভদ্রসন্তানগণকে শৈশব হইতে ইতর-সহবাসে রাখিয়া দিলেই তাহারা যুগপৎ আদর্শ ভাষায় ও আদর্শ নীতিবিদ্যায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইবে। (৩)

(১) ৬২, ৬৩, ৬৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) "এই সৌন্দর্য্যের কিছু কিছু বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করি অনেক দিন ধরিয়া ইচ্ছা ছিল। এজন্য ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানাদেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানাগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি।"—ইত্যাদি, ভূমিকা দেখ।

(৩) শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শভাষার নমুনা যথা;—(১) পথ বাৎলিয়া দিতেছি। (২) চট্‌পট্ আলিঙ্গন। (৩) নেশায় বুঁদ। (৪) নম্বর ওয়ান (সুন্দরী)। (৫) ফিকে লাগিল। (৬) ওহে তেলকুচ্‌কুচে কাল মেঘ। (৭) দুষ্ট বুড়া কুবের মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসিয়া। (৮) পাড়াগেঁয় মেয়েরা ফেল্‌ফেল্ চাহিতেছে। (৯) গঙ্গা গাল কাত করিয়া হাসিতেছে। (১০) ইঁদুরদাঁতী (শিখরিদশনার অনুবাদ)। (১১) বিন্ধ্যের পাগুলা ডেলায় ডুমরিতে এবড়ো খেবড়ো, যেন গোদামিন্সের পায়ে। (১২) বক্ষের কথা কোট করিয়া বলিতেছে। (১৩) চট্ ফিরে এস। (১৪) দিনের তাৎ কম হয়। (১৫)

শাস্ত্রী মহাশয় একাদিক্রমে ৩০ বৎসর প্রগাঢ় চিন্তা, গভীর গবেষণা, অশ্রান্ত পরিশ্রম ও নানা দিগ্‌দিগন্ত পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার সমবেত চেষ্টার ফলস্বরূপ এই উপাদেয় পদার্থটী স্বদেশবাসিগণকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া ইহার বিচারভার যাঁহাদের উপর দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরি বা বিবেচনা কি? তাঁহারা কি বলিয়া এই গ্রন্থ লোকালয়ে প্রকাশ করিতে পরামর্শ দিলেন? বরং তাঁহার ইংরাজ বন্ধু পার্জ্জিটার ভাল। পার্জ্জিটার মহোদয় বঙ্গভাষা জানিলেও তিনি বিজাতীয় ও বিদেশীয়, তিনি যে গ্রাম্য বাঙ্গলা ভাষায় সব কথার অর্থ বুঝিবেন এরূপ আশা করা যায় না। তিনি যে অনেক অশ্লীল ভাব বুঝিয়া সেই সকল স্থান পরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার কথা।

সংস্কৃত মেঘদূত সংস্কৃত কলেজে, চতুষ্পাঠীতে, ও অন্যান্য স্থানে পঠিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক। শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পরীক্ষক। এজন্য ছাত্রেরা আগ্রহ সহকারে তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠ করিবে সন্দেহ নাই। অধুনা পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়িতেছে, তাহারাও পাঠ করিবে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য পাঠক পাঠিকার সংখ্যাও অল্প নহে। এই সকল কারণে এবং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা ভীত হইয়াছি। এই দুঃসময়ে যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় আচার্য্যেরা রক্ষক হইয়া ভক্ষক হন, তবে আর আশা ভরসা কোথায়? প্রথমে আমরা পুস্তক না পড়িয়া, নেসান পত্রিকায় ইহার সমালোচনা দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা কি এতদূর বীভৎস কাণ্ড ঘটিতে পারে? শেষে পুস্তক ক্রয় করিয়া দেখিলাম,—নেসান-পত্রিকার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

শাস্ত্রী মহাশয়! আপনি এতকাল ধরিয়া এত শাস্ত্র পড়িয়া, এত ভদ্রসঙ্গ ও গুরুপদেশ লাভ করিয়া, এ প্রবীণ বয়সেও কি এই সামান্য কথাটা জানিতে পারেন নাই যে,—পবিত্রতাই সৌন্দর্য্যের প্রাণ। জীবদেহ প্রাণশূন্য হইলেই যেমন বিকৃত হয়, তেমনি পবিত্রতা হারাইলে সকলি বিকৃত হয়। মূল মেঘদূতের যে সকল কবিতার ভিতর অশ্লীল ভাব আছে, ব্রণলোভী মক্ষিকার ন্যায় আপনি সেই সকল স্থানের দূষিত রস লইয়া মাতামাতি করিয়াছেন। মধুব্রতের ন্যায় প্রকৃত সৌন্দর্য্য-মধু গ্রহণ করেন নাই। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যময় বিভূতিময় স্থানগুলির ব্যাখ্যা কেবল "কচ্‌কিমি" করিয়া সারিয়াছেন। আপনি মেঘদূতকে মহাকাব্য বলুন, আপত্তি ছিল না। কিন্তু কৈ আপনার ব্যাখ্যায় মহাকাব্যের মহাপ্রাণতার কোনও পরিচয় পাইলাম না। আপনি সুধীবর চন্দ্রনাথের 'শকুন্তলাতত্ত্ব' দেখেন নাই? অল্প দিন হইল, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কালি-

---

ডেলাভাঙ্গা রঙ্, ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে ইংরাজি-মিশ্রিত বাঙ্গালা, যথা;—"যক্ষ জুনিয়ারদের মধ্যে একজন। বেশ রাইজিং ও প্রমিসিং অফিসর" ইত্যাদি। এই সঙ্গে—"শটোকলে বদনাবগুণ্ঠিতা," "নিকটান্তিসারিকা" প্রভৃতি সমাসঘটিত সংস্কৃতপদাবলী। স্থানে স্থানে "মহামহিমাময়" প্রভৃতি অশুদ্ধ সাধুভাষার মিশ্রণে গ্রন্থের ভাষা অদ্ভুত খিচুড়ী হইয়াছে।

দাস-কাব্যবিষয়ক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটীও কি আপনার নেত্রগোচর হয় নাই? রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ মহাকবির মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে ঐ দুই মহাত্মার উপর ভক্তিরসে হৃদয় আর্দ্র হয়। চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যে দেবমন্দিরে পবিত্র হোমাগ্নি জ্বালিয়াছেন, আপনি তথায় নরকাগ্নি জ্বালিলেন!

যখন সমস্ত বিশ্ব কঠোর নিদাঘ-রৌদ্রে দগ্ধ হইতে থাকে; যখন দেহ ও প্রাণ রোগ-শোকের জ্বালায় জ্বলিতে থাকে, তখন মেঘদূতের কবিতা স্মরণ করিলে জ্বালাযন্ত্রণা মিলাইয়া যায়; অকস্মাৎ সে প্রখর সূর্য্যতাপ নবমেঘের শীতল ছায়ায় পরিণত হয়; নবপ্রফুল্ল কুটজ, কদম্ব, কেতকী প্রভৃতি বিবিধ বন-কুসুমের পরিমল লইয়া মধুর বর্ষাবায়ু হৃদয়মধ্যে মৃদু মৃদু বহিতে থাকে; যেন অমৃতময় প্রলেপে বাহ্য ও অভ্যন্তর স্নিগ্ধ হইয়া যায়; ক্ষণে ক্ষণে নবজলধরের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নাদে ইন্দ্রিয়গণ শিখিকুলের ন্যায় পুলকিত হইয়া নৃত্য করে; জীবাত্মা ধরাতল হইতে গিরিশৃঙ্গে, গিরিশৃঙ্গ হইতে শিবলোকে উন্নীত হইয়া, সেই অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বপতির অনন্ত সৌন্দর্য্যসাগরে মগ্ন হইয়া যায়। যে মেঘদূতের এতদূর শক্তি, হায় শাস্ত্রী মহাশয়! আপনি তাহার কি দুর্গতি করিলেন! ত্রিশ বৎসর দেশ ভ্রমণ করিয়া ইহার প্রত্নতত্ত্ব-নির্ণয়ের পরিচয়ই বা কি দিলেন, বুঝিলাম না।

অবশেষে আমরা, কালিদাসকাব্যের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ, আর্য-প্রতিভা-সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি;—তিনি মেঘদূত-সুধাকরকে কাল-রাহুর গ্রাস হইতে অচিরে মুক্ত করুন। তিনি ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখাইলে মহাকবির গৌরবরক্ষা, আমাদের মর্ম্মপীড়ার শান্তি ও তাঁহার নিজের অক্ষয় পুণ্য হইবে।

এই মেঘদূতব্যাখ্যায় যে কয়েক স্থানে প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিলাম, গাম্ভীর্য্যের অভাবে তাহার প্রভাব মন্দীভূত। শাস্ত্রী মহাশয় ভাষার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিলে, এবং পরিহার্য্য অশ্লীল কথাগুলাকে অতিরঞ্জিত করিয়া না দেখাইলে, এরূপ নিন্দনীয় হইতেন না। আমরা তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির অপব্যবহার এবং সমাজের অনিষ্টকারিতা ভাবিয়াই সন্তপ্ত হৃদয়ে এত কথা বলিলাম। প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কাহারও মুখে বিন্দুমাত্র অশ্লীল কথা শুনিলে বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠেন,—"ভদ্রং ব্যাহরেম, ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম।" এ ঋষিবাক্য সকলেরি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

স্বর্গীয় স্বাধীনতা ও প্রকৃত বীরত্ব।

পরপ্রভুত্বদ্বেষী পাপমতি এজিদ, অনুনয় বিনয় এবং ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া কিছুতেই মহাত্মা এমামদ্বয়কে অধীনতা স্বীকার করাইতে সমর্থ হইল না। এক্ষণে যে কোন উপায়ে তাঁহাদিগের বিনাশসাধন করিয়া নিশ্চিন্ত এবং নিষ্কণ্টকাবস্থায় রাজ্যভোগ করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। পাপবুদ্ধি মন্ত্রী মরিয়ান এই পাপ-সংকল্প-সিদ্ধির সেতুস্বরূপ হইলেন। মরি-

স্থান মদিনায় থাকিয়া অর্থপ্রলোভনে পরমা-রাক্ষসী জায়দাকে বশীভূত করিয়া বিষের কৌটা হস্তে প্রদান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব কৌশলে বিষপান করাইয়া এমাম হাসেনের অমূল্য জীবন-প্রদীপ চিরনির্ব্বাপিত করিল। মদিনাধিপ মহর্ষি এমাম হাসেনের ঈদৃশ অসম্ভাবিত ভীষণ মৃত্যুতে তদীয় অনাথ পরিবার ও সমগ্র মদিনাবাসী গভীর শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। রাজর্ষি হাসেনের অভাবে তাঁহারা আহারবিহার পরিহার পূর্ব্বক ক্রমাগত দশ দিবস কেবল অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিলেন। শোকোচ্ছ্বাস প্রশমিত করিয়া কেহ কাহাকেও সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইলেন না। এমাম হোসেন জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন যে ভ্রাতার স্নেহবলে এতকাল স্নেহাধার মাতামহ ও জনকজননী শোক ভুলিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বিয়োগদুঃখে একান্ত বিধুর হইয়া পড়িলেন। বিশ্বসংসার তাঁহার পক্ষে অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিরূপে এস্লাম রাজ্যের দুর্ব্বহ ভার বহন করিবেন, কিরূপে পবিত্র বংশের গৌরব রক্ষা করিবেন, এই গরীয়সী চিন্তায় তিনি আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

নীচমনা মরিয়ান এইরূপে সফলমনোরথ হইয়া এমাম হাসেনের মৃত্যু-সংবাদ দামেস্কে প্রেরণ করিলেন।

এমাম হোসেনকে একান্ত নিরুপায় ও শোকাবসন্ন মনে করিয়া, কাপুরুষ এজিদ, তাঁহার মদিনাস্থ প্রতিনিধি অলীদকে লিখিলেন, "আপনি অবিলম্বে মদিনার নবীন ভূপতিকে আমার অধীনতা স্বীকার ও বয়েৎপাঠ অঙ্গীকার করাইবেন। তিনি সরল চিত্তে সম্মত না হইলে, সত্বর তাঁহাকেও ভ্রাতৃপথানুগমন করিতে হইবে, ইহাও জ্ঞাত করাইবেন।" অলীদ, অভিভাবক শূন্য, সহায় সম্পত্তিহীন, ভ্রাতৃশোকাকুল এমাম হোসেন-সমীপে দামেস্ক অধিপতির আদেশ-পত্রী জ্ঞাপন করিলেন। হোসেন, দামেস্করাজের আদেশলিপি শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তে সমুদয় শোক দুঃখ, হীনাবস্থা বিস্মৃত হইলেন। অনন্তর বজ্রকঠোরস্বরে কহিলেন,—"অলীদ! আপনি এজিদের আজ্ঞাবাহক মাত্র, সুতরাং আপনাকে আর অধিক কি বলিব? এজিদ মনে করিয়াছেন, আমি অভিভাবকশূন্য হইয়া নিতান্ত নিরুপায় ও দুর্ব্বল হইয়াছি; অতএব এবার অধীনতা স্বীকার এবং বয়েৎপাঠ-অঙ্গীকার অবশ্যই করিব। ধিক্ তাহার রাজবুদ্ধিকে! শত ধিক্ তাহার দুরাশাকে!! আপনি সেই রাজকুলাঙ্গারকে বলিবেন, যদি সোমসূর্য্য কক্ষভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হয়, যদি মহাসিন্ধু গণ্ডূষে পরিণত হয়, যদি পৃথ্বীতল রসাতলে যায়, তথাপি এমাম হোসেন এজিদের অধীনতা স্বীকার বা বয়েৎপাঠে সম্মত হইবে না। অলীদ, সুরেন্দ্রসিংহ হোসেনের এইরূপ বীরোক্তি শ্রবণ করিয়া আর কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না। নিঃশব্দে তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং তত্তাবৎ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া দামেস্কে প্রেরণ করিলেন।

দামেস্করাজ অলীদের পত্রপাঠে ক্রোধান্ধ হইয়া ঘোষণা করিলেন, "যে ব্যক্তি আমার অনন্ত সৈন্য ও অর্থবলে এমাম হোসেনকে বয়েৎপাঠে অঙ্গীকার করাইতে পারিবে, অথবা বয়েৎপাঠ অস্বীকার করিলে তাহার দেহচ্যুত মস্তক আমার নিকট আনয়ন করিতে পারিবে; তাহাকে আমার রাজত্বের

সর্ব্বপ্রধান প্রভুত্ব পদ ও লক্ষ দিনার পারিতোষিক প্রদান করিব। ঘোষণাপত্রী শ্রবণ করিয়া দুরাশাগ্রস্ত মন্ত্রী তদনুযায়ী কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। এজিদ পরম সন্তুষ্ট হইয়া অগণিত সৈন্য ও বিপুল অর্থবল সহ তাঁহাকে পুনরায় মদিনায় পাঠাইলেন।

মরিয়ান, বীরকুলতিলক মহাপুরুষ হজরত আলীর পুত্র অমিততেজ সিংহ-সংহনন এমাম হোসেনের সহিত তদীয় একান্ত অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ অধ্যুষিত মদিনা নগরে যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্তই অসম্ভব, পক্ষান্তরে বিপজ্জনক মনে করিয়া কূটকৌশল অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কোনও প্রকারে রাজর্ষি হোসেনকে মদিনা হইতে বহির্গত করিয়া বন্দীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় এমাম হোসেনও শত্রুর উপর্য্যুপরি অত্যাচার এবং ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত খিদ্যমান হইয়া স্বেচ্ছায় কিয়দ্দিনের নিমিত্ত স্থানপরিবর্ত্তনে মনন করিলেন। সুতরাং মরিয়ানের অভীষ্ট সহজেই কার্য্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত হইল।

এমাম হোসেন ষষ্ঠি হিজরীর শাবন মাসের চতুর্থ দিবসে শোকভারাক্রান্ত চিত্তে মদিনাবাসীদিগের নিকট বিদায় লইয়া স্বকীয় পরিবার এবং অনুচর ও সহচর সহ প্রথমতঃ মক্কায় আসিলেন। তৎপর তথা হইতে কুফাবাসীর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং ব্যাকুল আহ্বানে তথা যাইয়া নিরাপদ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য কুফানগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুতীক্ষ্ণ পাপবুদ্ধি মরিয়ান হোসেনের কুফাগমনের কথা শুনিয়া তৎসংবাদ দামেস্কে লিখিয়াছিলেন। এজিদ তদনুসারে দুর্ম্মতি আবদুল্লাজেয়াদকে অর্থবলে বশীভূত করিয়া হোসেনের অনিষ্টসাধনে কুফার পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাকে পদচ্যুত করিয়া তাহাকেই শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিয়া পাঠাইলেন। অধিকন্তু দামেস্ক হইতে মদিনা, মদিনা হইতে মক্কা, মক্কা হইতে কুফানগর পর্য্যন্ত প্রতি স্থানে চাতুর্য্যশীল ক্ষিপ্রগতি গুপ্তচর সকল নিযুক্ত রাখিলেন।

এদিকে রাজর্ষি হোসেন প্রিয়তম পরিজন এবং দ্বিরশীতিত সংখ্যক সহচরানুচর সহ ক্রমাগত কয়েকদিন যাবৎ গমন করিতেছেন, কিন্তু লক্ষিত স্থানের নিদর্শনই পাইলেন না। অবিশ্রান্ত অধ্বঃশ্রমে ও প্রচণ্ড তপনতাপে তাঁহার পথপর্য্যটনে অনভ্যস্ত অসূর্য্যম্পশ্যা পরিবার ও পরমভক্ত সহচরগণ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় গমন করিতে করিতে এক দিন তাঁহারা প্রাণিসমাগমশূন্য এক বিশাল প্রান্তর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উষরভূমি আরবে জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর অনেক আছে; কিন্তু ঈদৃশ ভীষণ প্রান্তর আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মহাপ্রান্তর কারবালা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার উত্তরে নিবিড় অরণ্য অহর্নিশ সমীরণ সংঘর্ষণে এক প্রকার হা-হুতাশ বিভীষিকাময় শব্দ উৎপাদন করিতেছে। পূর্ব্বদিকে ইউফ্রেটীস (ফেরাত) নদী উত্তাল তরঙ্গবক্ষে ভৈরব রবে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। সম্মুখে অনন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ব্যোমরাজ্যের চক্রবান রেখা এই প্রান্তরপরিধিতে সংলগ্ন হইয়া উদাস দৃশ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। এই ভয়াবহ দৃশ্যপূর্ণ প্রান্তর মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে হঠাৎ এমাম হোসেনের অশ্বপদ মৃত্তিকায় বসিয়া পড়িল। তখন আর অগ্রসর হইলেন না। গমনে ক্লান্ত

দিয়া অনুচরদিগকে শিবিররচনার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে কতিপয় ব্যক্তি তথায় বস্ত্রাবাস নির্ম্মাণে ব্রতী হইল। কেহ কেহ কাষ্ঠাদি সংগ্রহার্থে অরণ্যাভিমুখে গমন করিল। শিবিরে জলাভাব প্রযুক্ত অপর কতিপয় ব্যক্তি তদুদ্দেশ্যে বহির্গত হইল। এমাম হোসেন শিবিরস্থানের অদূরে উপবেশন করিয়া স্বাধীনতা-প্রিয়তার স্বর্গীয়ভাব ও অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে জলান্বেষণকারী অনুচরেরা বিমর্ষভাবে স্কন্ধাবারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হোসেন সমীপে নিবেদন করিল, "প্রভো! আমরা নানাস্থানে জলান্বেষণ করিতে করিতে পূর্ব্বপ্রান্তে এক নদীতটে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, অসংখ্য বীরপুরুষ সশস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক নদীজল রক্ষা করিতেছে। তাহারা আমাদিগকে জলাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সরোষ কর্কশবচনে বলিল,—"আমরা মহারাজাধিরাজ এজিদের আজ্ঞায় নদীজল রক্ষা করিতেছি। আমাদের একটী সংরক্ষী জীবিত থাকিতে ফেরাতের জলপান কাহারও ভাগ্যে নাই। যদি তোদের জীবিত প্রয়োজনে বাসনা থাকে, তাহা হইলে আর অগ্রসর না হইয়া সত্বর এস্থান হইতে পলায়ন কর্; নচেৎ হস্তস্থিত শাণিত শায়কাঘাতে এখনই তোদের পিপাসা-সাধ পূর্ণ করিব।" প্রভো! আমরা জল-সংরক্ষিগণ কর্তৃক এইরূপে নিগৃহীত হইয়া অগত্যা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি।"

এমাম হোসেন অনুচরগণের কথা শুনিয়া যারপরনাই ব্যাকুলিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, দুরাত্মা এজিদ আমাকে অধীনতা-নিগড়ে বদ্ধ করিতে না পারিয়া এক্ষণে সর্ব্বনাশে সমুদ্যত হইয়াছে। না হইলে কুফা যাইতে পথভ্রান্ত হইয়া কারবালায় আসিয়াছি; ইহা সে কেন অবগত হইবে? কেনই বা ফেরাত-জল সৈন্যগণ দ্বারা পরিরক্ষা করিবে? হায়! আমি এখন কি করিব? খাদ্যাদির অভাব না থাকিলেও পানীয়ভাবে এত লোকের জীবন কিরূপে রক্ষা হইবে? যখন অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহিবে, তখন তাহাদিগকেই বা কি বলিয়া প্রবোধ দিব? হায়! আমা হইতে বুঝি আজ জগৎ-পূজ্য সৈয়দবংশের লোপ হয়! আমার অপরিণামদর্শিতা দোষেই বুঝি আজ ধর্ম্ম-প্রাণ মদিনাবাসীর দেহত্যাগ সংঘটিত হয়। হে করুণাময় বিভো! এ দুঃসময়ে তুমিই একমাত্র সহায় এবং আশ্রয়। হে শক্তিময়! এ দীন সন্তান তোমার শক্তিবলেই এতদিন নৃশংস এজিদের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। হে প্রেমময়! এ দুঃসময়ে প্রেমামৃত দান করিয়া দীনের আত্মীয়, পরিবার ও ভক্ত মদিনাবাসীর পিপাসা শান্তি কর।" এমাম হোসেন দুই হস্ত তুলিয়া এইরূপে পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে শিবিরে জলাভাব প্রযুক্ত পথশ্রান্ত ও আতপক্লিষ্ট পরিজনগণ বলবতী পিপাসায় আক্রান্তা হইয়া হোসেনের নিকট পুনঃপুনঃ জল চাহিতে লাগিলেন। কোমলকায় শিশু এবং অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীগণের "জল জল" আর্ত্তনাদে এমাম হোসেন এবং অনুচরবৃন্দের হৃদয়ে দুঃখ সংক্ষোভের প্রচণ্ড তরঙ্গমালা প্রবাহিত হইল। যে হৃদয়

কিছুতেই অবনমিত হয় নাই—যে পুরুষ-শার্দ্দূল, এজিদের অনন্ত পরাক্রম এবং বিশ্বদাহী রোষে কোন দিনের জন্যও ভীত বা চিন্তিত হন নাই;—আজ সেই হৃদয়, কুসুম-কোমলবপুঃ বালকবালিকা ও যোষিৎ-বৃন্দের তৃষ্ণাজনিত যন্ত্রণা দর্শনে একান্তই ব্যথিত এবং ব্যাকুলিত হইয়া পড়িল। বীরপুরুষ আব্বাস, কতিপয় অনুচর সহ 'মশক' লইয়া ইউক্রেটীসের দিকে অগ্রসর হইলেন। শত্রুদিগের বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া 'মশক' জলপূর্ণ করিলেন। কিন্তু হায়! প্রত্যাবর্ত্তনকালে কঠোরহৃদয় নদী-সংরক্ষিগণ আব্বাসের অনুচরগণকে নিহত এবং তাঁহাকে ছিন্নবাহু পূর্ব্বক জলপূর্ণ'মশক' ভূপাতিত করিল। আব্বাস তদবস্থায় শিবিরে উপস্থিত হইলে, সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শোকের প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবলভাবে হোসেন-শিবিরে বহিয়া যাইতে লাগিল।

নদী হইতে জল সংগ্রহের আর কোনও উপায় নাই। সকলে পরামর্শ করিয়া এক কূপ খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর খনিত হইলে, নির্ম্মল জলের উৎস উৎ-সারিত হইল। সকলে কৃতজ্ঞতা ভরে দয়া-ময়ের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রথ-মতঃ সেই ভীষণ মরুতে জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় দগ্ধপ্রাণ অশ্ব ও উষ্ট্রদিগকে জলপানে কথঞ্চিৎ সুস্থ করা হইল। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের মধ্যেও অনেকেই জলপানে শান্তি লাভ করিলেন। কিন্তু হায়! সহসা সেই কূপের জল পরিশুষ্ক হইয়া গেল। সত্বর হস্তমিত ভূগর্ভ খনন করিয়াও আর জলের উৎস পাওয়া গেল না। বীরপুরুষগণ পূর্ব্বের ন্যায় তৃষ্ণার্ত্তই রহিয়া গেলেন।

এইরূপ নিরম্বু উপবাসে দিনত্রয় অতি-বাহিত হইল। আজ ৬১ হিজরীর প্রথম মাস, মহরমের ১০ই তারিখ প্রাতঃকাল। আদিত্যদেব উদয়াচল পরিত্যাগ করিয়া যতই উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, তাহার ময়ূখ-মালা যতই তেজস্বিনী হইতে লাগিল, শিবিরস্থ ধ্যাননিরত পরিজনগণ পিপাসা-যাতনায় ততই অধীর হইতে লাগিলেন। অস্ফুট, মধুরকণ্ঠে দগ্ধপ্রাণ শিশু সন্তানগণ "জল জল" শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এমাম হোসেন স্বতন্ত্র শিবিরে পরাৎপরের চিন্তায় ব্রতী ছিলেন, যখন বালকবালিকা-গণের তুমুল কোলাহল ক্রমশঃ বস্ত্রাবাস ভেদ করিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ত্বরায় মহিলা-শিবিরে উপস্থিত হই-লেন। তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া হাসেন-বানু ক্রোড়স্থ শিশুসন্তান স্বামীর ক্রোড়ে প্রদান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ সপ্তাহ গত হইল, বিন্দু মাত্র জল চক্ষে দেখিলাম না, স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই প্রাণাধিক সন্তানকে কিরূপে রক্ষা করিব?"

এমাম হোসেন উচ্ছ্বলিত শোকাবেগ অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি করিব? এ জীবনে শত্রুর নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থী হই নাই। বিশেষতঃ এজিদ যখন আমার সর্ব্বনাশসাধন মানসেই নদীকূল সৈন্যগণ দ্বারা পরিরক্ষা করিতেছে, তখন জল চাহি-লেই বা দিবে কেন?" হাসেনবানু তথাপি কহিলেন—"আপনি একবার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তান লইয়া ফেরাতকূলে গমন করুন। এজিদসৈন্যের দেহ রক্তমাংসে গঠিত হইলে,

অবশ্যই তাহারা এই শিশুর মুমূর্ষদশা দেখিয়া জলদান করিবে।" এমাম হোসেন, প্রিয়তমা পত্নীর সকাতর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। সসন্তান অশ্বারোহণে ফেরাতকূলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিমেষমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া এজিদসৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, —"ভ্রাতৃগণ! আমি জগন্মান্য আর্য্য মোহাম্মদের দৌহিত্র এবং বীরকুলাগ্রগণ্য আলীর পুত্র; আজ তোমাদের নিকট এই তৃষিত আসন্নমৃত্যু শিশুর প্রাণভিক্ষার্থে আসিয়াছি; দয়া করিয়া এক বিন্দু জলদানে প্রাণরক্ষা কর।" নির্দ্দয়হৃদয় এজিদসৈন্য এমাম হোসেনের পরিচয় পাইয়া বলিল—"আপনি অগ্রে মহারাজাধিরাজ এজিদের অধীনতা স্বীকার করুন, পশ্চাৎ জলদান করিব। আর অন্যথা করিলে, এই উত্থিত কৃপাণাঘাতে এখনই আপনার উষ্ণীষ শোভিত মস্তক দেহচ্যুত হইয়া দামেস্কে প্রেরিত হইবে।" এমাম হোসেন তাহাদের কথা শুনিয়া স্থির গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"এজিদবাহিনি! তোমরা মনে করিয়াছ, এমাম হোসেন আত্মীয় পরিজন সহ পিপাসা যাতনায় মরণোন্মুখ হইয়া অবশ্যই আমাদের মহারাজের অধীনতা স্বীকার করিবে। কাপুরুষের হৃদয়েই এইরূপ বিশ্বাস স্থানলাভ করে। বীরপুরুষ, কর্ত্তব্যপালনে মৃত্যু কেন, পার্থিব কোন যন্ত্রণাতেই অধীর হয় না। আজ জলাভাবে যদি আত্মীয়-পরিজন সহ এই ভীষণ প্রান্তরে প্রাণত্যাগ ঘটে, তাহাও একান্ত শ্রেয়ঃ, তথাপি নরাধম এজিদের অধীনতা স্বীকার এমাম বংশের সর্ব্বতোভাবে অকরণীয়।" এমাম হোসেনের কথা শেষ হইতে না হইতেই জনৈক এজিদসৈন্য তাঁহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া এক সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহা তাঁহার বক্ষে না লাগিয়া ক্রোড়স্থ সন্তানের সুকোমল উরস বিদীর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল। এমান হোসেন সন্তানের সতেজনির্গত শোণিতপ্রবাহে আর্দ্রীভূত হইয়া যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইতে শিবিরাভিমুখে অশ্ব ফিরাইলেন।

ক্ষত্রিয় বীরকুলগুরু মহারথ দ্রোণাচার্য্য "অশ্বত্থমাহত" এই অলীক সংবাদ শ্রবণে হাতের অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার অদ্বিতীয় উপাসক রাজপুত-বীর প্রতাপসিংহ, বন্যমার্জ্জারের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইয়াছিলেন। আর সপ্তাহ-নিরম্বু উপবাস মুসলমানবীর, আজি বাণবিদ্ধ সদ্য-রক্ত-রঞ্জিত মৃত সন্তান, পত্নীর ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করিয়া বীরবেশে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। ধন্য স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ধন্য বীর-ধর্ম্ম! জগতে ঈদৃশ স্বাধীনতোপাসক বীরের তুলনা কোথায়?

এমান হোসেনের যুদ্ধগমনের উদ্যোগ দেখিয়া তদীয় চিরভক্ত শিষ্যগণ শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর হোসেন সমীপে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "প্রভো! চরণানুগত দাসগণ জীবিত থাকিতে আপনার যুদ্ধে গমন সুদৃশ্য নহে।" এই বলিয়া অনুচরগণ অবিলম্বে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইলেন। বিপক্ষপক্ষে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পরীক্ষিত পরাক্রম দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতিক চমূ রণভূমি আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছিল। এই দ্বাবিংশতি সহস্র বীরপুরুষের সহিত দ্বিরশীতি সংখ্যক মুসলমান বীরপুরুষ

সম্মুখযুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভূমণ্ডলের ইতিহাসে ঈদৃশ অসমসাহিকতার বিবরণ আর একটী দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজর্ষি হোসেনের অনুচরবৃন্দের মধ্য হইতে এক এক জন সিংহ-সংহনন বীরপুরুষ, প্রলয়কালীন বজ্র বহ্নি-বিদ্যুৎসঙ্কুল প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মহাসংহার আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যে দিকে করাল-কৃপাণ এবং ভাস্বর বর্শা বিস্তার পূর্ব্বক ধাবিত হইতে লাগিলেন, সেই দিকেই মৃত্যুর ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে এক একজন মুসলমান বীরপুরুষ, অসীম বিক্রমে শত শত শত্রুকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া বীরপুরুষদিগের চিরগৌরবান্বিত শয্যায় পতিত হইলেন। একদা যিনি ভ্রাতৃশোকে ও শত্রুর অবিহিত অত্যাচারে খিদ্যমনা হইয়া শান্তিলাভের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি আজ একদিকে পরম পিপাসাকুল পরিজনের হৃদয়ভেদী ক্রন্দন কোলাহল, অপরদিকে ভক্ত বীরবৃন্দের ও প্রাণাধিক পুত্রগণের বিয়োগযন্ত্রণা, আকুলিত চিত্তে সহ করিয়া মহাসংগ্রামের যাত্রী হইলেন। যথার্থ বীরপুরুষ, এইরূপেই কঠোর বীরধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

এমাম হোসেন চতুর্ব্বিধ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। জম্বুকবৃত্তিপরায়ণ কাফের সৈন্য, বীরকেশরী হোসেনকে স্বয়ং রণস্থলে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভয়ে বাত-বিতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিল। কেহই দ্বৈরথযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। শেষে সেই অনন্তবাহিনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর সাহসে নির্ভর করিয়া দ্বৈরথযুদ্ধে অগ্রসর হইল। কিন্তু অচিরেই বীরেন্দ্রসিংহ হোসেনের শাণিত কৃপাণাঘাতে বর্ম্ম চর্ম্ম অশ্বসহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া উচ্ছিন্নমূল শালতরুর ন্যায় ভূপাতিত হইল। শত্রুকুলে মহাত্রাসের সঞ্চার হইল। সুরেন্দ্র-হোসেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিযোদ্ধার অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন, কেহই অগ্রসর হইতেছে না; তখন তিনি সংক্ষুব্ধ সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গের ন্যায়, সন্ত্রস্ত সিংহের ন্যায়, ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায়, মদোন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, প্রলয়কালীন বজ্রবহ্নি-বিদ্যুৎসঙ্কুল বাতাবর্ত্তের ন্যায়, কৃতান্ত রসনাবৎ বিদ্যুদ্দীপ্ত প্রচণ্ড তরবার এবং প্রস্তরবিদারী ভীমা বর্শা বিস্তার পূর্ব্বক গভীর হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া অগণ্য শত্রুবাহিনীর উপর সম্পতিত হইলেন। ভীষণ অসির প্রচণ্ড আঘাতে কাফেরগণ কদলীতরুর ন্যায় খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া পতিত হইল। দীপ্ত বর্শা বিদ্যুল্লতার ন্যায় শত্রুচমূর সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া মহাসংহার সাধন করিল। রক্তস্রোতে উষর ভূমি আর্দ্রীভূত হইয়া গেল। কাফেরগণ বীরেন্দ্র সিংহ আলীতনয়ের সে দুরাসদতেজঃ সহনে অক্ষম হইয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দিগ্বিদিক্ পলায়ন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রণভূমি জনপ্রাণিশূন্য হইয়া এক শ্মশান দৃশ্যের সূচনা করিল।

এমাম হোসেন, রণস্থল জনশূন্য দেখিয়া সানন্দে নদীতটে উপনীত হইলেন। ফেরাতের সুনির্ম্মল পয়োরাশি দর্শনে হোসেনের বলবতী পিপাসা আরও বলবতী হইয়া উঠিল, তিনি জলপানাশায় উল্লাসিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নদীগর্ভে অবতীর্ণ

হইলেন। অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল উঠাইলেন, মুখে দিবেন, এমন সময় কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী একে একে তাঁহার স্মৃতিপথাবলম্বী হইতে লাগিল। তখন তিনি সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হায়! এই জলের নিমিত্ত আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু, পাষাণহৃদয় এজিদ-সৈন্যকর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জলাভাবে রণক্লান্ত হইয়া আমার চিরসহচর ও ভক্ত বীরগণ বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। হায়, এই জলভাবে এমাম বংশের উজ্জ্বল মণি মহাবীর কাশেম, এজিদ-বাহিনীর শাণিত শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে। এই জল না পাইয়া প্রাণাধিক বীরপুত্র আলীআকবর আমার পরিশুষ্ক রসনা পর্য্যন্ত পরিলেহন করিয়াছিল। হায়! আমি তাহাদিগকে কালমুখে নিক্ষেপ করিয়া এখন কিরূপে এই জল পান করিব? এখনও আমার অনাথ পরিবারগণ ম্রিয়মাণাবস্থায় শিবিরে পড়িয়া রহিয়াছেন। উঃ! এই জলের অভাবে তাঁহাদের কুসুম-সুকোমল বপু পরিশুষ্ক লতিকাবৎ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে! আমি কি ঘোর ইষ্টতৎপর। অগ্রে তাঁহাদিগকে জলপান না করাইয়া নিজপ্রাণ রক্ষায় উদ্যত হইয়াছি। ধিক্ আমার স্বার্থপরতা! ধিক আমার প্রাণের মায়া! প্রতিজ্ঞা করিলাম, এজীবনে আর জলপান করিব না।" এই বলিয়া হোসেন মুখ-প্রায়-সংলগ্ন অঞ্জলিপূর্ণ জল নদীগর্ভে প্রতিক্ষেপ করিয়া তীরে উঠিলেন। ধন্য স্বার্থত্যাগ! ভূলোকে ঈদৃশ স্বার্থত্যাগী বীরের তুলনা কোথায়?

শত্রুসৈন্য দলে দলে চারিদিক হইতে আসিয়া বীরবর হোসেনকে আবেষ্টন পূর্ব্বক অবিরাম বিষাক্ত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। মহানাত্মা এমাম হোসেন, তৎসমুদয় উপেক্ষা করিয়া বজ্রপ্রতাপে কাফের দলে উৎপতিত হইলেন। তাঁহার অমিত-ভুজবলে দীপ্ত তরবার অবিরাম ভাবে কাফের দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিতে লাগিল। কিন্তু অসংখ্য শরাঘাতে তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে অবিরল ধারায় শোণিতপাত হওয়ায় একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সপ্তাহ নিরম্বু উপবাসক্লিষ্ট, শোকবিদগ্ধ, রণক্লান্ত বীরপুরুষ সেই অনন্তবাহিনীর সহিত আর কতক্ষণ যুঝিবেন? তথাপি তিনি সাহস এবং দৃঢ়তায় নির্ভর করিয়া বীরত্বের চরম আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। সহসা এক সুতীক্ষ্ণ শায়ক আসিয়া তাঁহার প্রশস্ত ললাটদেশে গভীর ভাবে বিদ্ধ হইল। রাজর্ষি হোসেন আর অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে পারিলেন না। দয়াময়ের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভূতলে অতুল ও অবিনশ্বর কীর্ত্তির মরকত-স্তম্ভ স্থাপন এবং গৌরবের মহতী পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া কক্ষচ্যুত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। সমস্ত জগৎ "হায়! হোসেন," "হায়! হোসেন" রবে প্রতিধ্বনিত হইল।

শ্রীসৈয়দ আবুল মোহাম্মদ
এসমাইল হোসেন সিরাজী।

যবনিকান্তরালে।

গত মাঘ মাসের নব্যভারতে উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আরও কিছু বলিবার থাকায় এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের অবতারণা।

গগনে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহারা কি কেবল ধরয়িত্রী এবং আকাশের শোভা সম্পাদনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, না আর কোন মহান্ অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য ইহাদের অস্তিত্ব? লুই ফিগ-য়ার (Louis Figuire) একজন ফরাসী দার্শনিক। তাঁহার 'The day after death' পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন—রবি, শশী, গ্রহ নক্ষত্রাদি সকলই প্রাণীপূর্ণ। মানব আত্মার শেষ বাসস্থান সূর্য্য। দেহান্তে মুক্তাত্মা ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করতঃ সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে না।

সূর্য্য মানবের প্রাণ, বল ও স্বাস্থ্য। সূর্য্য এক মুহূর্ত্ত না থাকিলে উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণী-জগৎ বাঁচিতে পারে না।

"In short the sun, the centre of the planatary aggregation, the constant source of light and heat, which sends forth motion, sensation and life upon the earth, is in our belief the final sojourn of purified perfected souls which have attained their most exquisite subtlety. They are entirely devoid of material alloy, they are pure spirits who dwell in the midst of the blazing atmosphere and the burning masses which compose the sun. The star whose size far surpasses the bulk of all others put together is sufficiently vast to contain them. From their throne of fire these souls all intelligence and activity, behold the marvellous spectacle of the march of all the planatary globes which compose the solar world through space. Placed in the centre of this vast world, understanding the secrets of nature and all mysteries of the universe, they are in possession of perfect happiness of absolute wisdom and of illimitable knowledge."

তিনি বলেন, সূর্য্যের সৃষ্টির প্রথম দিবস হইতে অনবরত জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, কিন্তু কই সূর্য্যের কিরণেরত কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না। কোন কোন জ্যোতি-র্ব্বিদ্ সূর্য্যে অন্যান্য গ্রহের পতন-জনিত তেজ উদ্ভবের কথা বলেন, কিন্তু উক্ত মত তিনি খণ্ডন করিয়া বলেন, সূর্য্যে পুণ্যবান্, পবিত্র এবং পূর্ণমুক্তাত্মাদিগের আবাস। তাঁহারা স্বয়ং তেজোময় এবং তাঁহাদেরই তেজ জীবজগতকে আলো এবং জীবন প্রদান করিতেছে। সূর্য্য মধ্যস্থান অধি-কার করিয়া সমুদায় সৌরজগতে আধিপত্য করিতেছে এবং তন্মধ্যস্থ মুক্তাত্মারা ইহার কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার মহিমায় এবং অনন্ত দয়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

যাঁহারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, পুরোহিত শ্রাদ্ধান্তে শ্রাদ্ধ-কারীকে বলেন, "আপনি কল্পনা করুন, আপ-নার পিতৃপুরুষ আপনার প্রদত্ত পিণ্ডোদক সূর্য্যের মত তেজোময় দেহ ধারণ করিয়া গ্রহণ করিতেছেন"। ইহাতে অনুমিত হয় যে, হিন্দুরাও সূর্য্যলোককে চরম বাসস্থান কিম্বা প্রধান একটী "লোক" বলিয়া মনে করেন।

সূর্য্যপূজা আমাদের নিত্য কার্য্য। "জবাকুসুম সঙ্কাশং" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক হিন্দু সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতে আদিষ্ট। যদি পবিত্র, পূর্ণ মুক্তাত্মাদিগের

আবাসস্থান সূর্য্য হয়, তাহা হইলে যাঁহারা সূর্য্যকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পবিত্র ভগবানের ভক্তমণ্ডলী-কেই প্রণাম করা হয়। অনেক আদিম জাতি সূর্য্যকে পূজা করিত এবং এখনও করিয়া থাকে।

সামান্য এই ধরা, বিশ্বের সহিত তুলনায় একটী পরমাণু মাত্র। এই ধরাকেই কি সুশোভিত করিতে ভগবান্ এতগুলি গ্রহ নক্ষত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন? ইহারা কি অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করে না? সে অভিপ্রায় তবে (Figuire) ফিগয়ার যাহা বলেন, তাহা কি নয়?

মানবের চরম বাসস্থান সূর্য্যলোক হউক, কি চন্দ্রলোক হউক, সে বিষয় আমাদের মীমাংসার প্রয়োজন নাই। গ্রহ-নক্ষত্রাদি যে জীবপূর্ণ এবং মানব দেহান্তে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া যে অগ্রসর হইতে হইতে শেষ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিবে, ইহা শাস্ত্রের উক্তি। ফিগয়ারের মত সমর্থন করিতে কোন হিন্দুর আপত্তি হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে অসংখ্য লোকের কথা আছে। তন্মধ্যে চন্দ্রলোক ও সূর্য্য-লোকের বিবৃতি দৃষ্ট হয়। সুন্দ উপসুন্দ ভ্রাতাদ্বয় তিলোত্তমার জন্য আত্মবিরোধে হত হইলে তিলোত্তমাকে সূর্য্যলোকে দেবতারা স্থান দিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে সূর্য্যলোক শেষ আবাসস্থান বলিয়া উল্লেখ হয় নাই।

জ্যোতিষী বোড্ (Bode) সাহেব বলেন,—

"The happy creatures which inhabit this privileged abode have no need of alternate succession of day and night, pure and unextinguishable light illumines it for ever. In the centre of the light of the sun, they enjoy perfect security under the shelter of the wing of the "Almighty."

কি আশাপ্রদ বাণী! কি আনন্দের সমাচার!

মানব জীবনান্তে আর একটী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ উহাকে মুক্তাত্মা বলেন। Jean Reynand উহাকে angel এবং ফিগয়ার উহাকে superhuman being বলেন। আমরা উহাকে মুক্তাত্মা বলিয়া অভিহিত করিলাম। সকলেই জীবনান্তে উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হন না। যাঁহারা মর্ত্তধামে পাপাচরণে সময় যাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থান অন্ধতমসাচ্ছন্ন; উহার নাম অসূর্য্য দেশ।

বাসনার বিনাশ না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। গতায়াত করিতে করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত! যাঁহারা পৃথিবীতে সন্তান সন্ততি রাখিয়া পরলোক গত হন এবং উহা-দের প্রতি যদি মায়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা ঊর্দ্ধগামী হইতে পারেন না। মায়ার বন্ধন ছিন্ন না করিতে পারিলে, মায়াপাশে জীবকে মর্ত্ত্যে আবদ্ধ রাখে। মায়া ভাল নয়। দয়াই একমাত্র লক্ষ্য। মুক্তাত্মা মহাপুরুষেরা দয়া করিয়া জীবকে সৎপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন। আমরা চক্ষু কর্ণ বিহীন, তাঁহাদের সৎ উপদেশ শুনিবার শক্তি নাই। যাঁহারা শুনেন, তাঁহারা জ্ঞানী। বিবেক বাণী কয়জন শুনেন এবং শুনিয়া তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন? সেই জন্য মানব বিপজ্জালে জড়িত। এত দুঃখ, এত কষ্ট এবং সেই জন্যেই এই ধরাকে অশ্রুপূর্ণ স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উপরে মায়া নাই, সকলই প্রেম; ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতে হয় না। যিনি বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক, তিনিই ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝিয়াছেন। স্বার্থপরতার নিকট প্রেম ম্লান হইয়া যায়, বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রেম হইতেই সমুদয় সৎগুণা-বলী প্রসূত। স্বাধীনতা, জ্ঞান, প্রতিভা

সকলই প্রেমের অপত্য। এই প্রেমে শনৈঃ শনৈঃ ভগবানের নিকট লইয়া যায়।

পরলোকবাসিনী জুলিয়া কি বলেন, শুনুনঃ —

"The degree of love with which any one loves, measures his religion. The degree of hatred or indifference which paralyses love in the soul, is the test of irreligion. Love eats into selfishness as the sun's rays eat into the black and dark-night. That is God in life, that is what we see. Light that shines in the darkness. Love is that light.

আত্মা জড়দেহে থাকিয়া মুক্তাত্মা কোন মহাপুরুষ দ্বারা চালিত হয়। সকল সময়ে তাঁহাদের উপদেশ অনুভব করা যায় না, কিন্তু মানব যখন কুমতি ও সুমতির সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন, তখন বেশ বুঝিতে পারেন যে, অদৃশ্য কোন একটী শক্তির দ্বারা তিনি চালিত। এই কুমতি ও সুমতি অধম এবং উত্তম মুক্তাত্মা। আমরা যাহা বলিলাম, সকলেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

দেহান্তেই মানবের প্রবৃত্তি নিচয় একেবারেই সুপথে ধাবিত হয় না। পাপী তখনই পুণ্যাত্মা হইতে পারে না। সুতরাং তথায় ভাল এবং মন্দ উভয় মুক্তাত্মা আছেন। উভয়েই— মানবজীবনের উপর আধিপত্য করিতে চেষ্টা করে। অবস্থানুসারে কখনও অধমাত্মা, কখন উত্তমাত্মা জয়যুক্ত হয়। বাইবেলেও এই মুক্তাত্মার কথা দেখা যায়। Guardian angel বলিয়া অভিহিত।

"Our readers will have perceived that the idea of a supreme and invisible protector of man, who guides his heart and enlighten his reason, has already been formulated by the christian religion, which has derived it from Holy scripture. It is the Guardian angel, a mysterious and poetic type, a seraphic creature whom God has charged to watch over the christian to guard him against snares and constantly to direct him in the ways of sanctity and virtue." Figuire.

ফিগয়ার নিজে যে সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দৃষ্টান্তের কয়েকটী এস্থানে লিপিবদ্ধ হইল। এস্থানে বলা আবশ্যক যে, ফিগয়ার সাধারণ প্রেততত্ত্বান্বেষীদিগের বিরোধী।

কাউণ্ট B ফিগয়ারের একজন বন্ধু। ৪০ বৎসর অতীত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। ফিগয়ার তাঁহার নিকট শ্রুত-হইয়াছেন যে, কাউণ্টের জননী প্রত্যহ তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। কাউণ্ট তাঁহার মাতার সৎপরামর্শে সকল কাজেই জয়যুক্ত হইয়া থাকেন।

ডাক্তার V একজন নাস্তিক। নাস্তিক হইলে কি হয়, তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর তিনি সর্ব্বদা তাহার জননীর সহিত কথোপকথন করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জীবদ্দশায় মাতার সহিত তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল না।

একজন খ্যাতাপন্ন মাসিক-পত্রিকা লেখক M. R. তাঁহার বিংশতি বর্ষ বয়ক্রমের একটী পুত্র পরলোকগত হন। ঐ পুত্রটী অতি সুশীল, বিনয়ী এবং কবি ছিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা মাত্র তিনি নির্জ্জনে পুত্রের বিষয় চিন্তা করিলে—পুত্র তাঁহার নিকট আগমন করেন এবং পিতার প্রশ্নানুযায়ী উত্তরদানে শোকাতুর পিতাকে সান্ত্বনা দান করেন।

এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মৃত্যু নাই। মৃত্যু স্বর্গের দ্বার, অনির্ব্বচনীয় আনন্দপূর্ণ নিকেতনের তোরণ।

ভগবান্ কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

দেহি নোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনংজরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

এই দেহ যেমন কৌমার যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধীরব্যক্তি তদ্বিষয়ে মুগ্ধ হন্ না।

আর তর্কে প্রয়োজন নাই। অসন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হই। তর্ক ত অনেক করিলাম। সন্দেহ ভঞ্জন কই হইল? বরং সন্দেহানল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। দিনও ফুরাইল। বিশ্বাস জ্বলন্ত না হইলে এ পাপরাশির বিনাশ হইবে না। তাই এখন প্রবল বিশ্বাসের প্রয়োজন। সন্দেহই বর্ত্তমান যুগে মানবের পরম শত্রু। ঋষিদিগের ও ভক্তমণ্ডলীর বাক্যে প্রত্যয় চাই। তাঁহারা প্রবঞ্চক নন্, কিম্বা তাঁহারা মতিচ্ছন্ন নন্ যে, মানবকে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য মিথ্যা-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। ভগবানের কৃপা না হইলে এ সন্দেহ দূর হইবে না। একপ্রাণ এক মনে সেই ভবার্ণবের কর্ণধার দয়াল হরিকে ডাকি, দয়া করিয়া তিনি দিব্যচক্ষু দান করিবেন।

একবার সেই পবিত্র কিরণ দর্শন হইলে আর অন্ধকারে যাইতে হইবে না। যাঁহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে,তিনি সেই ধর্ম্মানুযায়ী কাজ করুন, তাহাতেই মুক্তিলাভ হইবে। ধর্ম্মের কুটকচালে তর্কে প্রয়োজন নাই। ভগবান্ মানবের মন দর্শন করেন। আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে যে যে ভাবে ডাকিবে, তাহাতেই ফল পাইবে। সরলান্তঃকরণে পাটোয়ারি বুদ্ধি পরিহার করিয়া ডাকা আবশ্যক। ভাবের ঘরে চুরী না করিলেই হইল। সরলান্তঃকরণ, বিশ্বাস, ভক্তি এই পন্থার সহায়। "যদি দেখ পথে ভয়ের আকর, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার, সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে।" বাস্তবিক এ পথে তাঁহার প্রতাপ অমোঘ। এস্থানে বুদ্ধিবল হারি মানে। বিশ্বাসের সহিত পথ অবলম্বন করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কত সহায় উপস্থিত হইয়াছে। মায়াপাশে চরণ আবদ্ধ। এ নিগড় ছিন্ন করিতে একটু কষ্টের প্রয়োজন। যত্ন না করিলে রত্ন মিলে না।

মাধবেন্দ্র পুরী চৈতন্যদেবের গুরুর গুরু। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যের অভাব ছিল না। যে সময়ে তিনি প্রবল ব্যাধির যন্ত্রণায় বৃক্ষতলে শায়িত, একমাত্র শিষ্য ঈশ্বরপুরী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য নিকটে ছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর মেঘদর্শনে কৃষ্ণ স্ফুরিত হইত। মেঘদর্শনে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া তিনি সমাধিস্থ হইতেন। মাধবেন্দ্রপুরী ইচ্ছা করিলে অতুল বিভবের অধিকারী হইয়া ত্রিতল অট্টালিকার উপরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু কি মহানিধি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার মোহিনী শক্তিতে তিনি 'সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃক্ষতল অবলম্বন করিয়াছিলেন? এই বৃক্ষতলে মৃত্যুশয্যায় মাধবেন্দ্রপুরী ভগবানের দয়া স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে যাহা লিখিয়াছেন পাঠক একবার তাহা স্মরণ করুন্।

অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

ভুল কাহার ?

অধুনা বাঙ্গলাদেশে যত বড় পণ্ডিতই জন্মগ্রহণ করুন্ না কেন, আমরা কিন্তু দেখিলাম না যে শাস্ত্রবিচারে, সংযত ভাব রক্ষা করিয়া, অপরকে রূঢ় কথা না বলিয়া কেহ বিচার করিতে পারিলেন! এ দেশের শাস্ত্রীয়বিচারে প্রধানতঃ দুইটী অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী, সেই বিচার উপলক্ষ করিয়া, এক পক্ষ অপর পক্ষকে এমন কথা শুনাইয়া দেন, যাহাতে আহত না হইয়া পারা যায় না। আর একটী অংশ এই দেখা যায় যে, 'সংযতভাবে বিরুদ্ধ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা না করিয়া, নিজেই নিজের মুখে 'আমি যে বড় বুঝিয়াছি,' 'আমাপেক্ষা অন্যে যে কেহই এরূপ বুঝিতে পারে না',— অন্ততঃ যাঁহার বিরুদ্ধে বলা হইতেছে, তাঁহার বুদ্ধিটী যে আমা হইতে নিশ্চয়ই নিম্নস্তরের,—এই অংশটী কথায় কথায় পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। শাস্ত্রীয় বিচার বা প্রতিবাদ এইরূপ হওয়াই প্রার্থনীয়, যাহাতে তৃতীয় পক্ষ উভয় মত পড়িয়া, উভয়ের যুক্তি-প্রণালী ওজন করিয়া স্থির করিয়া লইতে পারেন, যে বাস্তবিকপক্ষে কাহার যুক্তি সমধিক সঙ্গত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের প্রতিবাদকারীরা নিজের অবতারিত যুক্তির ভালমন্দের বিচারের ভার অন্যকে দিতে আর বড় ইচ্ছুক হয়েন না। আরও একটী কথা আছে। যাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে হইবে, তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টীর সমগ্র অংশটীকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিবাদ করাই প্রকৃত হৃদয়বান্ মনীষীর উপযুক্ত। নতুবা, আগাগোড়া ছাঁটিয়া দিয়া, প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে সমগ্র না লইয়া, অংশবিশেষ মাত্র কাটিয়া লইয়া নিজের সুবিধামত প্রতিবাদ করিতে যাওয়া প্রকৃত প্রতিবাদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ধীর ব্যক্তি এরূপ বাক্যজালকে উপহাসাস্পদ বলিয়াই তাচ্ছল্য করিয়া থাকেন। সংযত প্রতিবাদ এ দেশে বড় কমই বাহির হইতে দেখা যায়। সিদ্ধান্তকারীর প্রকৃত মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষা করিয়া, বাক্যবাণ বর্ষণ করা অপেক্ষা, ধীর ও সংযত ভাবে কেবলমাত্র যাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে, তাহা কি কি যুক্তি ও তর্কের উপরে নির্ভর করে, সেই সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি সাজাইয়া, একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ যদি প্রস্তুত করিতে পারা যায়,—আর যদি তাহার সারবত্তা ও দৃঢ়তার বিচারের ভার, নিজের হাতেই না লইয়া, তৃতীয়পক্ষের উপরে ন্যস্ত রাখা যায়,—আমাদের বোধ হয়, শাস্ত্রীয় বিচারের ইহাই প্রকৃত মার্গ। আর যদি প্রতিবাদ করিতে গিয়া আমি বলিয়া ফেলি যে,—'আমি অমুকদিন অমুক স্থানে যে প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহা অতি "সুপ্রসিদ্ধ" এবং অমুক বিজ্ঞানবিদ্ তাহাতে অতিমাত্র "প্রীত" হইয়াছিলেন, 'আমি কি কম্ লোক, তোমরা আমায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না'—যদি প্রতিবাদ করিতে গিয়া এইরূপ ভাবে আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়া, ভয় প্রদর্শন করিতে হয়, তবে সেরূপ প্রতিবাদের মূল্য যে বড় অধিক হয়, আমাদের তাহা মনে হয় না।

নিতান্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধচিত্তে আজ্ আমা-

দিগকে বলিতে হইতেছে যে, বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যার 'নব্যভারতে' বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র মহাশয় আমাদের "ব্রহ্ম ও জগৎ" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধের একটী মাত্র ক্ষুদ্র অংশের বিরুদ্ধে যে সুদীর্ঘ ভূমিকা সহ একটী সুদীর্ঘ প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া, আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, সেই গুলি সমস্তই, সেই প্রতিবাদে প্রযুজ্য হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। শশি বাবু অবশ্যই "কর্ত্তব্যানুরোধেই" আমাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা একটা ভুল সিদ্ধান্ত শিখাইয়া, লোককে অপথে আনিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলাম, শশি বাবু সেই ভ্রান্ত পথ হইতে লোক উদ্ধারের কামনায়, সেটীকে তিনি কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের উপরে বিষ-দিগ্ধ বাক্যবাণ প্রয়োগ করাও "কর্ত্তব্যের" অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন, ইহাই পরিতাপের বিষয়।

আগাগোড়া না পড়িয়া, অংশ বিশেষমাত্র লইয়া নিজের সিদ্ধান্ত স্থির করিতে গেলেই, এইরূপ দোষ হইয়া থাকে। যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের "ব্রহ্ম ও জগৎ" প্রবন্ধ গোড়া হইতে পড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভারতের প্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক মতটী যে, আজ্‌কাল্‌কার আবিষ্কৃত অনেক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অনুমোদিত, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করাই আমাদের ঐ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখনকার বিজ্ঞান যতটা আবিষ্কার করিয়াছে, ও যে যে তথ্য আবিষ্কার করিতেছে, সেই সমস্ত তথ্যের সঙ্গে, যতদূর সম্ভব, বেদান্তের সমন্বয় সংস্থাপনই আমাদের উদ্দেশ্য। এই সে দিনও আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে "উপনিষদ ও তাহার উপদেশ" নামক প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায়, বলিয়াছি। এরূপ যাহার উদ্দেশ্য, সে 'বিবর্ত্তবাদকে' 'ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে,' ইহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম যে, শশি বাবু প্রথম হইতেই ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লেখনী চালাইয়াছেন !! এবং দুই একটী মাত্র লাইন্ পড়িয়াই মনে করিয়া লইয়াছেন যে, আমরা বুঝি বিবর্ত্তবাদের প্রণালীর বিরুদ্ধে মীমাংসা করিতে বসিয়াছি। বাস্তবিক, আমরা এত অহম্মুখ নই যে, বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মহনীয় সিদ্ধান্ত স্বরূপ বিবর্ত্তবাদকে অসিদ্ধ বলিতে উদ্যোগী হইব। বিশেষতঃ, আমাদের বেদান্ত-মতও অভিব্যক্তিবাদেরই প্রসারণ মাত্র। আমাদের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য এই মাত্র যে, জড়-বিজ্ঞান জড়ীয় উপাদান অবলম্বন করিয়া তাহার ক্রমবিকাশের নৈসর্গিক নিয়ম যেমন সুন্দররূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারে; একটীর পর একটী, কিরূপে পদার্থপুঞ্জ ও প্রাণীপুঞ্জ একই নিয়মে ক্রমাভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রণালী যেমন দেখাইতে পারে,—সেইরূপ তাহার মূলে, অর্থাৎ প্রত্যেক অভিব্যক্তির মূলদেশে ঐশীসংকল্প বা ইচ্ছা ব্যতিরেকে বিবর্ত্তবাদের স্বতন্ত্রভাবে কার্য্যকারিতা নাই। পাঠক আমাদের প্রবন্ধটী পড়ুন, অভিব্যক্তিবাদকে স্বতন্ত্র হইতে না দিয়া, তাহার সঙ্গে ঐশী নিয়মের, চেতনার অধিষ্ঠানের, সমন্বয় করাই আমাদের উদ্দেশ্য কিনা, সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। শশি বাবু যে সংখ্যাটীর প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন, বড় বেশী দূরে নহে, তাহারাই পূর্ব্ব দুই সংখ্যায় শশি বাবু দেখিতে পাইবেন যে, বিবর্ত্তবাদের কথা আসিল কেন? মূলতঃ অল্প সংখ্যক

উপাদানই পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া, ক্রমে ক্রমে এই প্রাকৃতিক পদার্থপুঞ্জ ও জীব-নিবহ দেখা দিয়াছে, ইহা আমরা বার-ম্বার প্রতিপাদন করিয়াছি কি না? "প্রোটোপ্লাজম্ও অঙ্গার, অম্লজান, যবক্ষার-জান গন্ধক ও ফস্ফরস্, এই কয়েকটী পরমাণুর দ্বারা নিৰ্ম্মিত" ইত্যাদি কথা বলিবার শশি বাবুর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। আমরা বুঝিতেছি, বিগত সংখ্যাগুলি না পড়াতেই শশি বাবু এই গোলে পড়িয়াছেন। আমরাও মূল উপাদান লইয়াই প্রতিপাদ্য বিষয় দেখিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, কেবল প্রত্যেক জাতির অভিব্যক্তির মূলে; জড়ীয় প্রণালী ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে যে ঐশীসংকল্প নিহিত থাকে, এই-টুকুই আমাদের নূতন কথা। ইহা অবশ্য শশি বাবু মানেন না। কিন্তু ইহা মানেন না বলিয়াই যে, তিনি প্রতিপাদ্য বিষয়টী কি তাহা না বুঝিয়াই, মনঃকল্পিত অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়া, আমাদিগকে তিরস্কার করিতে বসিবেন, এরূপ অধিকার, শশি-বাবু কেন, বোধ হয় কাহারই নাই। প্রতি-পাদ্য বিষয়টী যখন শশি বাবু পড়েন নাই, তখন না বলিয়া দিলে তিনি তাহা বুঝিবেন না বলিয়াই, আমরা অগ্রে তাহারই আভাস দিলাম, এখন আমরা দেখাইব যে, শশি বাবু যে সংখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ্য প্রণালী তিনি বুঝেন নাই বা ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝিয়াছেন।

প্রথম আপত্তিটীতে আমরা ইহাই দেখিয়াছিলাম যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও মানবীয় নির্ব্বাচন, এতদুভয়ের ফলে বিভিন্নতা আছে। শশি বাবু এ আপত্তিটী স্বীকার করেন, অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আপত্তিটী আমরা নিজেই বুঝি নাই, ইহা বলিতেও তিনি ছাড়েন নাই। কিন্তু তাহা তিনি বলুন, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কেন না, পাণ্ডিত্যের বৃথা আস্ফালন করিয়া স্পর্দ্ধা করাটাকে গর্হিত বলিয়াই মনে করি। যাহা হউক, শশি বাবু আপত্তিটীকে স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে, কেহই "এই আপত্তিটীকে সাংঘাতিক আপত্তি মনে করিবেন না।" আমরা বলি, সাংঘাতিক হউক্ বা না হউক্, যুক্তিযুক্ত আপত্তি বটে। শশি বাবু প্রথম আপত্তির উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আপত্তিটী "অকিঞ্চিৎকর" হইয়া যায় নাই, তাহা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। শশি বাবু নানাবিধ অবান্তর কথা তুলিয়া যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বিবর্ত্তবাদ নিঃসংশয়িত রূপে, কাহার্ কাহার্ সংযোগে বংশবিস্তার-ক্ষম সন্তান-সন্ততি হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থির করিতে পারেন নাই। কোন কোন স্থলে, সেইরূপ সন্তান-সন্ততি হয়, আর কোন কোন স্থলে তাহার ব্যভিচারও হয়। তাঁহার নিজেরই শেষ মীমাংসা এইরূপঃ—"অন্ততঃ কোন কোন স্থলে মানবনির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে তফাৎ নাই।" তাহা হইলেই পাঠক দেখুন, শশি বাবুও স্বীকার করিতেছেন যে, অনেক স্থলে এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায় যে, উভয়ের ফলে পার্থক্যও হয়। যে কারণ নিবহের সমবায়ে, দুইটী জাতি বংশবিস্তার-ক্ষম সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষমই হউক্, বা অক্ষমই হউক্, ইহা স্থির নিশ্চয় যে, কোথাও সক্ষম হয়, আবার কোথাও অক্ষম হয়। এসম্বন্ধে বিবর্ত্তবাদ ইহা

নিশ্চয় বলিয়া দিতে পারেন না যে, এই এই স্থলে সক্ষম এবং এই এই স্থলে অক্ষম। যদি তাহাই না হইল, তবে আমাদের আপত্তিটী "খণ্ডিত" হইল কি প্রকারে? "সাধারণ নিয়ম" হউক্ বা না হউক্, তাহা আপত্তির বিষয় নহে। ফলে তারতম্য অন্ততঃ একস্থলে হইলেই হইল। এই তারতম্যের কথা উত্থাপন করাতে, আমরা যে নৈসর্গিক কারণের বহির্ভাগে গিয়াছি, একথা শশি বাবু কোথায় পাইলেন? এই ধারণাটী শশি বাবুর ভ্রান্তধারণা বলিয়াই, তিনি প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তারতম্য অবশ্যই, স্বাভাবিক বা মনুষ্যদ্বারা সংঘটিত বা শশি বাবুর উল্লিখিত কারণ-রাশির দ্বারাই উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। অতি-প্রাকৃত কারণই যে এই তারতম্যের হেতু, ইহা ত আমরা বলি নাই। সাধে কি বলি যে, প্রবন্ধ না পড়িয়াই শশি বাবু প্রতিবাদ করিতে বসিয়াছেন! এই আপত্তি দ্বারা এইটুকু দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ও যৌন বা মানবীয় নির্ব্বাচনের কতকগুলি দৃষ্টান্ত পাইলেই যে, অভিব্যক্তিবাদের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহা নহে। "অভিব্যক্তিবাদ কতকগুলি স্বতন্ত্র যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত"। শশি বাবুর একথা আমরাও অস্বীকার করি না। প্রাকৃতিক বা মানবীয় নির্ব্বাচন, এই উভয়ের দৃষ্টান্ত লইয়া, অভিব্যক্তিবাদ স্থিররূপে নিজের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিতে সক্ষম নহে:—আমরাও ত ইহাই বলি। পাঠক আমাদের প্রথম আপত্তির শেষ কথা স্মরণ করুন:—"কেন এরূপ হয় (ফলে তারতম্য হয়) বিবর্ত্তবাদ ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতও এই কথা বলিয়াছেন:—

"We may cross one race with another, but we do not obtain, so far as we know, those phenomena of infertility, which are exhibited when we cross distinct species with each other. * * * But if we can not produce infertility, how can we apply the results of artificial selection to account for the origin of species?"

অবশ্য পরীক্ষা-পদ্ধতি ক্রমাগত চালাইতে থাকিলে হয়ত কালে হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলেও স্থির সিদ্ধান্তে কখনও পৌঁছা যাইবে কিনা, তাহা না ঘটিলে, আমরা অগ্রেই ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা "স্বাভাবিক কারণের বহির্ভাগে গিয়াছি" শশি বাবু এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন কেন?

এখন দ্বিতীয় আপত্তিটী সম্বন্ধে শশি বাবুর কথাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রশ্ন এই যে, অত্যন্ত অসভ্য মানুষের মস্তিষ্কাদির গঠন প্রভৃতি, খুব সভ্য মানুষের মত অনেক স্থলে দেখা যায়; অথচ ইহা স্থির যে, সুসভ্য মানুষকে যত বিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালন করিতে হয়, অসভ্যকে তাহার কিছুই করিতে হয় না। অতএব ঐরূপ মস্তিষ্কাদি যে প্রাকৃতিক কারণ সমূহের প্রয়োজনীয়তা (necessities of the environments) বশতঃই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব এস্থলেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্ত দ্বারা, অভিব্যক্তিবাদ বিশেষ সাহায্য পাইতেছেন না। এ প্রশ্নটীর, প্রথম প্রশ্নের ন্যায়, উদ্দেশ্য না বুঝিয়া শশি বাবু আপত্তি তুলিয়াছেন যে, অপ্রয়োজনীয় কোনও পদার্থ জগতে নাই। আজ যাহা

অপ্রয়োজনীয় মনে হইতেছে, দশ দিন পরে তাহার প্রয়োজনীয়তা পরিস্ফুট হইবে। আমাদের প্রশ্নটীর "দেখিতে পাওয়া যায়" এই বর্তমান কালের বাক্যটীকে, অতীত কালের বাক্য বুঝিয়া, তিনি অনর্থা বহু বাক্যব্যয় করিয়াছেন। এই প্রশ্নটী সম্বন্ধে, তাঁহার নিজের ধারণাই "অত্যন্ত অস্পষ্ট, অপরিষ্কার ও নিতান্ত কুজ্ঝটিকা পূর্ণ"; তাই তিনি অপরেরও তাহাই মনে করিয়াছেন।

অবশেষে আমাদের তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে, শশি বাবু বিজ্ঞের ন্যায়, একটীকে "অকিঞ্চিৎকর" এবং অন্যটীকে "আবদার মাত্র" বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্নতা কেন ঘটে, তাহার জন্য তিনি বহুবিধ প্রাকৃতিক কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেন আমরা বিভিন্নতা প্রাকৃতিক নিয়মে হয় না, এই কথাই বলিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি প্রবন্ধটী মোটে পড়িয়া দেখিবার ক্লেশ স্বীকার করেন নাই। প্রত্যেক পরিবর্তনের মূলে প্রাকৃতিক কারণ বর্তমান থাকে, শক্তি যে সূক্ষ্মকারণে অভিব্যক্ত হয় এবং সূক্ষ্মকারণই যে স্থূলকার্য্যে অভিব্যক্ত হয়, একথা আমরা বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি।.. conservation of force এবং পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ বলেই ("রাগবিরাগাভ্যাং সৃষ্টিঃ") যে জাগতিক পদার্থনিচয়ের আকৃতি গঠন প্রভৃতির কারণ, তাহা যে আমরা প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি, তাহা কি শশি বাবু মোটেই জানেন না ? "ব্রহ্ম ও জগৎ" প্রবন্ধের ২১ ও ২২ সংখ্যাটী আমরা বিনীত ভাবে শশিবাবুকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহা হইলেই তিনি যে উদ্দেশ্য বুঝিতে আগাগোড়া ভুল করিয়াছেন, তজ্জন্য লজ্জিত না হইয়া পারিবেন না। আমরা সেই স্থল গুলির পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক নহি। Protoplasm অলৌকিক কারণে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে, নৈসর্গিক কারণে ক্রমাভিব্যক্ত হয় নাই, এ ধারণা শশি বাবুর কেন হইল ? ২২ সংখ্যার কতকটা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আদিতে পরমাণুর সংখ্যা হয় ত অত্যন্ত অল্প ছিল। সেইগুলি মিলিয়া মিশিয়া এখনকার পরমাণু প্রস্তুত হইয়াছে। যেরূপ উত্তাপ এখন আমরা দিতে পারি, তদপেক্ষা যদি আরো অধিক উত্তাপ দেওয়া সম্ভব হইত, তবে হয় ত এই পরমাণুগুলিই বিশ্লেষ করা যাইত। (Florine, clorine, bromine) প্রভৃতি ভূত যদিও পরস্পর পৃথক্, তথাপি ইহারা যে একই জাতীয় এবং ইহাদের মূল যে একই কোনরূপ পদার্থ, তাহাতে এখন আর বড় একটা সন্দেহ নাই। ....এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, হয় ত আদিতে মূল পরমাণুর সংখ্যা খুব কম হইবারই সম্ভাবনা। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, অত্যল্প মূল অদৃশ্য পরমাণু হইতে যোগবিয়োগ বশতঃ পরিদৃশ্যমান ভূতগুলি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।......অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জে যে শক্তি লুক্কায়িত ভাবে ছিল, তাহা যতই ক্ষয়িত হইতে লাগিল, অর্থাৎ আলোক ও তাপ রূপে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ততই সেই শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুগুলি পুঞ্জাকারে (aggregation of masses) পরিণত হইতে লাগিল" ইত্যাদি।

অতএব Protoplasm যে "সাধারণ নৈসর্গিক কারণেই উদ্ভূত হইয়াছে", ইহা আমরাও মানি। "জীবজগতের ক্রমবিকাশে কেন বিশ্বাস তবে না করি", — শশি বাবু এ কথা কাহাকে বলিতেছেন ?

কথাটা এই যে, অভিব্যক্তিবাদের তৃতীয় আপত্তিটীও "অকিঞ্চিৎকর" নহে এবং

চতুর্থটীও "আবদার" নহে। অভিব্যক্তিবাদ ব্যক্তজগতের সূক্ষ্মকারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে, এবং সূক্ষ্মকারণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া, অল্প সংখ্যক মূলতত্ত্বেও পৌঁছিতে পারে। এক্ষেত্রে অভিব্যক্তিবাদ ও বেদান্ত একই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। তবে পার্থক্য কোথায়? সূক্ষ্ম অল্পসংখ্যক মূল-উপাদান অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারেই নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন কারণ-পরম্পরায় মিলিয়া মিশিয়াই বস্তুনিবহে পরিণতি পাইয়াছে, ইহা খুব সত্য। এ কথায় কাহারও সহিতই আমাদের অনৈক্য নাই। তবে অভিব্যক্তিবাদ কি বলিতে পারে যে, পরমাণু মিলিয়া মিশিয়া, ঠিক্ এই গো, মানুষ, বৃক্ষ, লতা ও অবান্তর অসংখ্য ঠিক্ সেই সেই জাতিরূপেই কেন ক্রমে ক্রমে পরিণত হইল? আমাদের বিশেষ অপরাধ এই যে, আমরা এই ক্রমবিকাশের প্রত্যেক স্তরে বিধাতার ইচ্ছাশক্তির সমন্বয় করিতে গিয়াছিলাম। আমরা এই অংশেই কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্যকারিতা মানি না, এই অংশে ঐশীশক্তিরও সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই জাতিরূপে পরিণতি করাইবার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করি। যদি অপরাধ হইয়া থাকে, এই অংশে আমাদের অপরাধ আছে। ঠিক্ ঐ Protoplasm কেন প্রথমে দেখা দিল, কি শক্তিবলে উহাই আবার ক্রমে ক্রমে পরস্পর সম্বন্ধ সূত্রে গঠিত অসংখ্য জাতিতে পরিণত হইল এবং ঠিক্ সেই সেই species কেন এরূপে হইতেছে ও যাইতেছে, ইহার উত্তরে কেবল জড়বিজ্ঞান কিছুই বলিতে পারিবে না। এস্থলে ঐশীসংকল্প বা ইচ্ছা আনিলে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে যায় না; বরং সমন্বয়ই সাধিত হইয়া থাকে। বরং ঐশীশক্তি না আনাই দোষের হইয়া থাকে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

যাহা হউক, শশি বাবুর প্রতিবাদে আমাদের একটী উপকার হইয়াছে। প্রবন্ধটীর উদ্দেশ্য বুঝিতে অনেকে না পড়িয়াই ভুল করিতে পারেন। আমরা দেখিতেছি যে, এই জন্যই এরূপ প্রবন্ধ খণ্ডশঃ প্রকাশ না করিয়া, একেবারে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে লোকে যত্নশীল হইয়া থাকেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (৭)

পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, চোরবাগান প্রভৃতি স্থানের ধনাঢ্য মল্লিকবংশ দক্ষিণ-বাগুয়ার প্রাচীন অধিবাসী। আমরা সুবর্ণ-বণিকদিগের মধ্যে দুই ঘর মল্লিক দেখিতে পাই, এক ঘর শীল মল্লিক, আর এক ঘর দে মল্লিক। মল্লিক কথাটী মুসলমান রাজ দরবার হইতে প্রদত্ত উপাধি, ইহার অর্থ আমীর বা ধনাঢ্য। উক্ত দুই ঘরের মধ্যে শীল মল্লিকেরা সপ্তগ্রামবাসী প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন। শেঠ বসাকদিগের মত সরস্বতীর দুরবস্থা, বর্গীর ভয় প্রভৃতি কারণে অনূ্যন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জয়রাম মল্লিক আসিয়া পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিয়াছিলেন। দে মল্লিকেরাও সপ্তগ্রাম হইতে ১৭০৩ সালে আসিয়া, বাগুয়ায় না বসিয়া কলিকাতায় যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহাই পরে বড় বাজারে পরিণত হইয়াছিল। ইঁহাদের কথা পরে বলা যাইবে। ইহা সত্য যে, এই দুই

মল্লিক-পরিবার এবং মুলুকচাঁদ বাবু এই তিন জনের দ্বারাই বড়বাজার সৃজিত হইয়াছিল।

জয়রাম মল্লিকের চতুর্থ পুত্র পদ্মলোচন মল্লিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট ধনশালী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্যামসুন্দর মল্লিক এতদূর বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে, কেবল ভারতবর্ষেই তাঁহার কারবার আবদ্ধ না থাকিয়া, চীন, ব্রহ্মদেশ, আরব, পারস্য পর্য্যন্ত তাঁহার হুড়ি নামক জাহাজ সকল যাতায়াত করিত। এইরূপে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য এবং রামকৃষ্ণ ও গঙ্গা বিষ্ণু নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকযাত্রা করেন। কায়স্থ ব্রাহ্মণেরা বলেন, সুবর্ণবণিকেরা অত্যন্ত কৃপণ, কিন্তু সে অপবাদ বুদ্ধিমান লোকের কথা নহে। কায়স্থ ব্রাহ্মণেরা যাহা উপার্জ্জন করেন, আপনাদিগকে তদপেক্ষা উচ্চ দেখাইতে এবং বেহিসাবী বাবুয়ানা করিতে, মামলা মোকদ্দমা, বিবাদ বিসম্বাদ করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। সেই জন্য ইহাঁদিগকে দুই তিন পুরুষের অধিক ধনাঢ্য অবস্থায় প্রায় দেখা যায় না। সাধারণত সুবর্ণবণিকদিগের প্রকৃতি সে প্রকার নহে। ইহাঁরা হিসাবী, তাই বলিয়া ধর্ম্মকার্য্যে এবং লোক-লৌকীকতায় পরাঙ্মুখ নহেন, বরং অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। ইহারা যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতে পটু, তদনুরূপ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেও সক্ষম, অথচ ফকীর হন না। শ্যামসুন্দর মল্লিকের উপযুক্ত পুত্র রামকৃষ্ণ মল্লিক ও গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক পিতার প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অলস ও ভোগবিলাসে জীবন কাটান নাই, তাঁহারাও পিতৃপদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক যথেষ্ট ধনবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এবং উপার্জ্জনের সহিত ধর্ম্মকার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশালা ছিল, সেখানে আগন্তুক মাত্রেই প্রচুর ভোজ্য প্রাপ্ত হইত। আত্মীয় বন্ধুদিগকে অর্থ সাহায্য এবং সুপরামর্শ দিয়া ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া আপনারা সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, অনেক ভদ্রলোককে সুপারিস করিয়া, প্রতিভূ হইয়া ভাল ভাল চাকুরী করিয়া দিতেন। বিস্তর ভদ্রলোক এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃপায় ধনবান হইয়াছিলেন। কেবল অভুক্তকে ভোজ্য দিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন নাই, সুবিজ্ঞ কবিরাজদিগকে রাখিয়া আপনাদের ব্যয়ে নানা প্রকার আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া রোগার্ত্তদিগকে প্রাণদান করিতেন। যাহাকে বাঙ্গালার ছিয়াত্তরে মন্বন্তর বলে, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেই দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে যখন সহস্র সহস্র সজীব নরকঙ্কাল কলিকাতার পথে ঘাটে 'হা অন্ন হা অন্ন' শব্দে ভ্রমণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিত, সেই দুঃসময়ে রামকৃষ্ণ ও গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক সহরের আট স্থানে আটটী অন্নছত্র স্থাপন করিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগকে অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও ঔষধ দিয়া অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বৃন্দাবনে একটী চিরস্থায়ী অন্নছত্র স্থাপন করিয়া তথাকার দীনদুঃখীদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। সুবর্ণবণিক সমাজের নানা প্রকার উপকার সাধন করায় তাঁহারা ইহাদিগকে আপনাদের দলপতি করিয়াছিলেন, এবং সামাজিক কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ মত সম্পন্ন করিতে সকলে বাধ্য হইয়াছিলেন।

Selection from unpublished Records গ্রন্থের ২০৫ এবং ৪৩২ পৃষ্ঠায় আমরা

একজন রাধাকৃষ্ণ মল্লিকের নাম দেখিতেছি, অথচ সে সময় কি পাথুরীয়াঘাটা কি বড়বাজার উভয় মল্লিকপরিবারে সে নামে কোন ব্যক্তি ছিল না। অন্য কোন পরিবারে কেহ রাধাকৃষ্ণ মল্লিক নামক বড় লোক থাকিলে কোন না কোন সূত্রে তাঁহার নামও জানা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাও পাওয়া যায় নাই। ১৭৬০ সালের ৩১ জুলাই গবর্ণরসভায় কতকগুলি জমীদারী তিন বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে মাগুরা পরগণার জমীদারী, যাহার বার্ষিক কর এক লক্ষ দুই হাজার টাকা, রাধাকৃষ্ণ মল্লিক এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এক শত টাকায় ক্রয় করেন। ১৭৬৬ সালে যখন গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের জাল করা অপরাধে ফাঁশীর হুকুম হয়, তখন কলিকাতার অধিকাংশ বড়লোকে এই বিচারের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও রাধাকৃষ্ণ মল্লিকের নাম দেখা যায়, কিন্তু রামকৃষ্ণ মল্লিকের নাম নাই। এই রামকৃষ্ণ মল্লিকই রাধাকৃষ্ণ মল্লিক নামে প্রচলিত ছিলেন কি না, বুঝা যায় না।

রামকৃষ্ণ মল্লিকের কনিষ্ঠ গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক ১৭৮৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি, এক মাত্র পুত্র নীলমণি মল্লিককে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রামকৃষ্ণ মল্লিক ১৮০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বৈষ্ণব দাস মল্লিক ও সনাতন মল্লিক নামক দুই পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। নীলমণি মল্লিক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর এবং বৈষ্ণবদাস মল্লিক ঐ বৎসর ৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মল্লিক ভ্রাতুষ্পুত্রকে অল্প বয়সে পিতৃহীন দেখিয়া বিশেষ যত্নে প্রতিপালন ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈষ্ণবদাসও কয়েক দিনের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাতপুত্রকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সম্মান করিতেন এবং কেবল যে ভালবাসিতেন, তাহা নহে, সম্পূর্ণ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। সনাতন মল্লিক ১৭৮১ সালের ৪টা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮০৫ সালে অপুত্রকাবস্থায় পরলোকস্থ হন। রামকৃষ্ণ মল্লিকের মৃত্যুর পর নীলমণি এবং বৈষ্ণবদাস এমন সদ্ভাবে সংসার পালন করিয়াছিলেন যে, হঠাৎ কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না যে, তাঁহারা সহোদর নহেন। এমন কি, সহোদরদিগেরও অনেক স্থানে তেমন সম্প্রীত থাকে না। নীলমণিই পরিবারের কর্ত্তা, বৈষ্ণবদাস যেন তাঁহার আশ্রিত বালক মাত্র। নিলমণি মল্লিকও তেমনি গুণবান সদাশয় পুরুষ ছিলেন। তিনি দেশে বিদেশে বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পুরুষোত্তম তীর্থে গমন করিয়া অনেক দুঃখী দরিদ্র, যাহারা সেই সময় জলপ্লাবনে গৃহশূন্য হইয়াছিল, তাহাদের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং নিজে যতদিন পুরীধামে ছিলেন, ততদিন আঠারনালায় যাত্রীদিগকে মাশুল দিতে হয় নাই, সে সমস্ত তিনি নিজে প্রদান করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের দক্ষিণ দাঁতন নামক স্থানে এক জগন্নাথ আছেন, নীলমণি মল্লিক ফিরিয়া আসিবার সময় উক্ত জগন্নাথের সুবৃহৎ নাটমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, মাতুলের একটী জগন্নাথ মূর্ত্তি ছিল, তিনি চোরবাগানে উক্ত জগন্নাথের মন্দির এবং

তৎসহ অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া অসংখ্য অভুক্তকে অন্নদান করিতেন, তাঁহারই কৃত ব্যবস্থা আজিও চলিতেছে, যদিও এখন লোকে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের অতিথিশালা বলিয়া জানে।

সে কালে দেনার দায়ে যাহারা কারাবদ্ধ হইত, তাহাদের মুক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না, যত দিন না ঋণ পরিশোধ হইবে, ততদিন আবদ্ধ থাকিতে হইত, অনেককেই জেলে জীবন শেষ করিতে হইত। সেই স্মৃতি অনুসারে আজিও অনেক উত্তমর্ণ "তোকে জেলে পচাইব" বলিয়া অধমর্ণকে ভয় দেখাইয়া থাকে। বহরমপুরের গৌরী সেন, (গৌরীকান্ত) কলিকাতায় নীলমণি মল্লিক এই সকল হতভাগ্যদিগের ভরসা ছিলেন। গৌরীসেনের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেই ঋণপরিশোধ হইত, নীলমণি মল্লিক ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে কারাগারের সমস্ত কয়েদীকে ঋণমুক্ত করিয়া নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিতেন।

এখন অপেক্ষা পূর্ব্বে সন্ন্যাসীদিগের দল অত্যন্ত অধিক ছিল, তাহাদের উপদ্রবে হিন্দুরা অস্থির হইতেন। তাহার দৃষ্টান্ত স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে সময়-সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে মুরসিদাবাদের শেঠদিগের গৃহে মহাচক্রান্ত সভা হয়, সেই সভায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজ্যের অরাজকতা বর্ণনায় দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে বলিয়াছিলেন, "নবাব সন্ন্যাসীদিগের উপদ্রব হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করেন না।" বাস্তবিক উহারা যখন দল বাঁধিয়া যে গ্রামে পড়িত, সে গ্রামের হিন্দুদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এমন কি, বড় বড় চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ধূনি জ্বালিবার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। কেবল যে অধিবাসীদিগকেই ইহাদের জন্য জ্বালাতন হইতে হইত, তাহা নহে; অনেক সময় গবর্ণমেণ্টকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। unpublished Record গ্রন্থে দেখা যায়, একবার বৰ্দ্ধমানরাজ ইংরাজদিগকে দশহাজার টাকা পাঠাইয়াছিলেন, নগরের বাহিরে সন্ন্যাসীরা তাহা কাড়িয়া লইয়াছিল। সারণের নিকট পাঁচ হাজার সন্ন্যাসীর সহিত গবর্ণমেণ্টকে রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, উক্ত সন্ন্যাসীরা গুলি, বারুদ, বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ঢাকায় একবার বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী কোম্পানির কুঠী লুণ্ঠন এবং ভগ্নপ্রায় করিয়া দেয়, পরে তাহাদিগকে ধরিয়া কুলিরূপে উক্ত কুঠী মেরামত করা হয়। কাশিতে সন্ন্যাসীরা হেষ্টিংসকে কি প্রকার বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, হেষ্টিংস সেযাত্রা কোনরূপে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতাতেও একবার সন্ন্যাসীদিগের সহিত কোম্পানির বিলক্ষণ দাঙ্গা হয়, তাহাতে বর্দ্ধমান রাজার এবং কলিকাতাবাসী বড়মানুষদের দ্বারবানেরা এবং অনেক বেহারী ও উত্তর পশ্চিমবাসী লোক সন্ন্যাসীদের পক্ষ হওয়ায় কোম্পানিকে ইংরাজ সৈন্য দ্বারা শান্তি রক্ষা করিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টান্তে কলিকাতাবাসী ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত ভাবিত যে, ভিক্ষার দাবী খাজনার দাবীর ন্যায় অবশ্য দেয়। ১৭৫৯ সালের ২০ আগষ্টের গবর্ণর সভায় কলিকাতার দুইশত ভিক্ষুক এই বলিয়া আবেদন করিয়াছিল যে,

"এপর্য্যন্ত তাহরা প্রত্যেক দোকান হইতে প্রতিদিন পাঁচ কড়া কড়ি হিসাবে ভিক্ষা পাইত, এখন দোকানদারেরা দিতে অস্বীকার করিতেছে, অতএব কোম্পানি হইতে তাহাদিগকে উহা আদায় করিয়া লইবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়।"

কলিকাতার অনেক ধনবান লোক সন্ন্যাসীদিগকে রীতিমত আহার এবং কম্বল ও পয়সা প্রভৃতি প্রদান করিতেন। নীলমণি মল্লিক গঙ্গার ধারে একটী প্রশস্ত ঘাট বাঁধাইয়া তাহার সঙ্গে সন্ন্যাসীদিগের বাসের জন্য প্রশস্ত দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা সেই স্থানে বাস করিত, তাহাদের খাদ্য ও কম্বল প্রভৃতি নীলমণি বাবু নিজে যোগাইতেন। তদ্ভিন্ন নিজ বাটীর সম্মুখে সদাব্রতের জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণ যুক্ত একটী চক ছিল, সেখানে যাহারা আসিত, তাহারাও রন্ধনোপযোগী সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হইত। এইরূপে নিজ কলিকাতায় তিন স্থানে প্রত্যহ তাঁহার সদাব্রতে অসংখ্য লোক অন্নবস্ত্রের অভাব হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। ১৮২৩ সালে যখন ষ্ট্রাণ্ড রোড নির্ম্মিত হয়, তাহাতে অনেক ঘাট মারা গিয়াছিল, নীলমণি মল্লিকের ঘাটও মারা যাওয়ায় তাহার চাঁদনী ও সন্ন্যাসী ভবন প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া নাবালক উত্তরাধিকারীর অভিভাবক বাজার বসাইয়াছিলেন, এক্ষণে উহা পানপোস্তা নামে পরিচিত হইয়াছে।

অন্নদানের সহিত জ্ঞানদান সম্বন্ধেও তাঁহার মন কৃপণ ছিল না, তিনি বাঙ্গালা পাঠশালা ও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিনাবেতনে তথায় বালকদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পুরুষদিগের স্থাপিত দাতব্য কবিরাজী চিকিৎসা যাহাতে সুচারুরূপে চলে, তাহার জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধান ও অর্থব্যয় করিতেন। গীতবাদ্যের প্রতিও উদাসীন ছিলেন না, প্রতিবৎসর সরস্বতী পুজার দিন তাঁহার গৃহে গীতবাদ্যের "মাইফেল" অর্থাৎ ওস্তাদদিগের গুণপনা প্রদর্শন হইত, তাহাতে দিক্ বিদিক্ হইতে গীত-বাদ্যের পণ্ডিতেরা আগমন করিতেন। নীলমণি বাবু অতি সমাদর ও যত্নের সহিত তাঁহাদের আতিথ্য করিতেন এবং প্রত্যেকের পাথেয় ও মর্য্যাদানুরূপ বিদায় দান করিতেন। বাবু রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধু বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। নিধু বাবুর সাহায্যে নিজ ব্যয়ে তিনি ফুল আখড়াই স্থাপন করেন। সকল প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সমতানে উচ্চরাগিণীতে ফুল আখড়াইয়ের সঙ্গীত হইত। নিধু বাবু ও নীলমণি বাবুর সহিত ফুল আখড়াইও অন্তর্ধান হইয়াছে, পরে নিধু বাবুর উপযুক্ত ছাত্র বাবু মোহন চাঁদ বসু রাজা রাজকৃষ্ণের সাহায্যে হাফ-আখড়াই সঙ্গীতসম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, ৪৬ বৎসর মাত্র বয়সে বাবু নীলমণি মল্লিক প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ভৃত্যদিগের সাহায্যে একখানি চৌকীতে বসিয়া পারিবারিক দেবালয়ে গিয়া প্রণামাদি করিয়া, আত্মীয় বন্ধুদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বিনীত ভাবে নিজকৃত দোষ ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার পর আপনাকে গঙ্গাতীরস্থ করিতে অনুরোধ করেন এবং সঙ্কীর্ত্তনে স্বরচিত একটী গীত গাহিতে বলেন। রোরুদ্যমান বান্ধবেরা

তাঁহাকে তাঁহার নিজকৃত ঘাটে লইয়া নামাইবার পর কিছুক্ষণ ভগবানের নাম জপ করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

নীলমণি বাবু পত্নী এবং তিন বৎসর বয়স্ক একটী দত্তক পুত্র রাখিয়া চলিয়া যান। দুঃখের বিষয়, পরবৎসরই বিষয় বিভাগ করিবার আবশ্যক হয়। বিধবা আপন নাবালক দত্তক পুত্র সহ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ ঠাকুরের বাটীতে প্রস্থান করিলেন। ইনিও অত্যন্ত দয়াবতী মহিলা ছিলেন। মোকদ্দমা উপলক্ষে বহুকাল ইহাদিগের ব্যয় সাহায্যার্থ একটী কপর্দ্দক স্বামীর সম্পত্তি হইতে না পাইলেও নিজ স্ত্রী ধন হইতে এবং ঋণ করিয়া জগন্নাথের নিত্যসেবা, অতিথি সেবা প্রভৃতি চালাইয়াছিলেন। অতিথিসেবা সম্পন্ন না হইলে নিজে আহার করিতেন না। যখন সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া আসিল, এবং নিজের ব্যয় হিসাবে অনেক টাকা লাভ করিলেন, তখন নানা প্রকার সৎকার্য্যে সে ধনের সার্থকতা সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র মল্লিক ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৩৫ সালে সাবালক হইয়া বিষয় সম্পত্তি স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এত দিন সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সার জেম্‌স্‌ হগ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। রাজেন্দ্র মল্লিকের গুণগ্রামের কথা কলিকাতাবাসী সর্ব্বসাধারণের অবিদিত নাই, তিনি নিজ বদান্যতা গুণে ১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথমে রায়বাহাদুর হন। দুঃখীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি এমন আশ্চর্য্য যে, যে অতিথিশালা তাঁহার পিতা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তে এমন যত্নে রক্ষিত হইয়াছিল যে, লোকে উহা তাঁহারই স্থাপিত বলিয়া মনে করিত। উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের গত ৬৬।৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে তিনি অকাতরে সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নর নারী, বালক বালিকার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া যখন সম্রাজ্ঞী হন, সেই সময়ে রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল যে মনুষ্য জাতিকেই তিনি ভাল বাসিতেন, তাহা নহে, পশু পক্ষীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আদর ছিল। কলিকাতায় তিনি সর্ব্ব প্রথম পশু পক্ষীর আদর দেখাইবার জন্য চিড়িয়াখানা স্থাপন করেন, আমরা বাল্যকালে সেখানে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য পশু পক্ষী দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতাম। রাজা বাহাদুর জীব বিদ্যা সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত ছিলেন, বিলাতের অনেক জীবতত্ত্বালোচনা সভায় ঐ বিষয়ে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ সকল লিখিয়া পাঠাইতেন যে, সেই সেই সভা হইতে তাঁহাকে সনন্দ ও পুরস্কার পদক প্রদত্ত হইয়াছিল।

সে সময় চিত্র বিষয়ে তিনিই বাঙ্গালী দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, চিত্র অঙ্কন, প্রতিমূর্ত্তি গঠন তাঁহার প্রধান আমোদের কার্য্য ছিল। তিনি আপনার শিল্প নৈপুণ্যবলে আশ্চর্য্য কারুকার্য্যযুক্ত মর্ম্মর প্রস্তরে রাজবাটী মণ্ডিত করিয়াছিলেন। আমরা বাল্যকাল হইতে রাজা বাহাদুরের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহনির্ম্মাণের বাঁশের ভারা কখন খোলা দেখি নাই। কোন কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিতেন, "আমাদের দেশে পূর্ব্বে কত আশ্চর্য্য ভাস্করী কারিকর ছিল, তাহার প্রমাণ পুরাতন তীর্থ

স্থানের দেবমন্দির সকল দেখিলেই বুঝা যায়, এক্ষণে উৎসাহাভাবে সেই সুন্দর বিদ্যা লোপ পাইতে বসিয়াছে, এখন রাজারা বিলাতী জিনিস ভালবাসেন, সুতরাং ইহারা অন্নাভাবে ভাস্করী ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেছে, আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতদূর পারি, জনকতক ভাস্করকে রাখিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের কার্য্য চালাইবার জন্য সর্ব্বদা নূতন চিত্র দ্বারা বাটীর সাজশয্যা পরিবর্ত্তন করি।" রাজা বাহাদুর ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা জানিতেন। প্রাণী বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ গুণ এই ছিল, যে তাঁহার মত অমায়িক ধনী লোক আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকও অনেক বিষয়ে পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন।

বাবু রামকৃষ্ণ মল্লিকের পুত্র বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক সংস্কৃত চর্চ্চায় দিবারাত্র নিযুক্ত থাকিতেন। নানা প্রকার দুর্লভ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আপনার পুস্তকালয় পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, বরং যত টাকায় হউক, এক একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। দেশ বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার কাছে আসিয়া যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়া তাঁহার বিদ্যা ও উদারতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া যাইতেন। তিনিও সর্ব্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া শাস্ত্রালাপে দিন কাটাইতেন। আগন্তুক সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানবান, তাঁহাদিগকে তিনি বিশেষ সমাদর করিতেন। ১৮৪১ খ্রীঃ ১০ই মার্চ্চ, তিনি পাঁচটী পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বীর নরসিংহ মল্লিক, স্বরূপচন্দ্র মল্লিক, দীনবন্ধু মল্লিক, ব্রজবন্ধু মল্লিক ও গোষ্ঠবিহারী মল্লিক পাঁচ ভ্রাতায় যথোপযুক্তরূপে পিতৃকার্য্য সমাধা করিয়া পৈতৃক বাটীতেই একান্নভুক্ত পরিবার হইয়া বাস করিয়াছিলেন। বাবু বীর নরসিংহ মল্লিক তুলসীদাস ও সুবলদাস নামক দুই পুত্র রাখিয়া ১৮৪৯ খ্রীঃ জুলাই মাসে এবং স্বরূপচন্দ্র অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। গোষ্ঠবিহারী মল্লিক ১৮৫১ খ্রীঃ এক মাত্র পুত্র বাবু কুঞ্জলাল মল্লিককে রাখিয়া পরলোক যাত্রা করিলে বাবু দীনবন্ধু মল্লিক পরিবারের কর্ত্তা হইয়া পূর্ব্ব গৌরব রীতিমত রক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময় দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট পূর্ব্ব দিকে বন্ধ ছিল, দীনবন্ধু বাবু অর্থ ব্যয় করিয়া উহা খুলিয়া রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীটের সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে চতুর্থ ভ্রাতা ব্রজবন্ধুর হস্তে পারিবারিক কর্ত্তৃত্ব আসিয়া পড়ে, তিনি এমন সুন্দর ভাবে পরিবার প্রতিপালন করিয়াছিলেন যে, ভ্রাতুস্পুত্রেরা সকলেই তাঁহার বিশেষ বাধ্য ছিলেন। ক্লাইব রো নামক রাস্তাটী বাবু ব্রজবন্ধু মল্লিকেরই কীর্ত্তি। তিনি ইহা খুলিয়া দিতে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ ৫০ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার আশুতোষ, গোবিন্দলাল, গোপাললাল, বনমালী, এবং মতিলাল নামক পাঁচটী পুত্র ছিলেন।

বীর নরসিং বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু তুলসীদাস মল্লিক বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি সুন্দর ইংরাজী জানিতেন, পারিবারিক সমস্ত ব্যাপারে খুল্লতাত

দিগের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করেন, তখন তুলসী বাবুই উহা প্রথম লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ তিনি বলাই-দাস ও হরপ্রসাদ নামক দুই পুত্র রাখিয়া দেহ ত্যাগ করেন। ব্রজবাবুর মৃত্যুর পর তুলসী বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর সুবলদাস বাবু পারিবারিক কর্ত্তারূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন, প্রজাদিগের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য তিনিই প্রথমে বস্তি উন্নতির কার্য্য আরম্ভ করেন, তিনি তৎকালে জষ্টিশ অব্ দি পিশ অর্থাৎ সাবেক মিউনিসিপালিটীর একজন সদস্য ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র পুত্র বাবু গোপী-মোহন মল্লিককে রাখিয়া পরলোকস্থ হন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

তগরের পুরাতত্ত্ব

ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া ইউরোপের বাণিজ্যশক্তি জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার গভীর গুহার নিবিড় অন্ধকারের ক্রোড়ে শায়িত ছিল, বর্ত্তমান বাণিজ্যলক্ষ্মীর লীলা-ভূমি ব্রিটনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যখন পৃথিবীর ইতিহাসে অপরিলক্ষিত ছিল, ভারতবর্ষ তখন বাণিজ্যের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বরোচ তখন ভারতের বাণিজ্য-লীলার কেন্দ্রস্থল। তগর সে লীলাক্ষেত্রের বিপুল ভাণ্ডার।

দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে এই ভারতের অনন্ত ঐশ্বর্য্য জগতের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত না থাকিলেও, তৎসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান কেহ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয় না। ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকার করেন। তৎপুর্ব্বে ৫৫১ খ্রীঃ পূঃ পারস্যাধিপ দারায়ুস হিস্তস্পেস সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করেন। তিনিও ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এমন প্রকাশ পায় না।

গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডারের অভি-যানের পর হইতেই গ্রীকগণ ভারতের বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব অবগত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হন এবং শীঘ্রই সমুদ্রপথে ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় উদ্ভাবনে যত্নপর হন।

অতঃপর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ইজিপ্টের (Egypt) অধীশ্বর টলেমি ফিলাডেলফিয়াস (Ptolemy Philadel-phius) ভারতের বাণিজ্যবিভব ও দেশের আভ্যান্তরীণ অবস্থা অনুসন্ধান করিতে এবং তদ্দেশীয় বণিকদিগের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের সম্বন্ধ সুগম করিয়া, বাণিজ্য-বিস্তারের উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং দাওনিসিয়াস্ (Dionysius) নামক জনৈক বাণিজ্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে তৎতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণ-ভারতে প্রেরণ করেন।

দক্ষিণভারতে তগর তখন বড়ই সমৃদ্ধি-শালী নগর ছিল। মসলিন্, কার্পাসবস্ত্র

এবং রেসমীবস্ত্র তগরের সর্ব্বপ্রধান উৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

এই সকল অভিজাত দ্রব্যের সংস্রব নিবন্ধনই তগর প্রথমে গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত হইয়া উঠে। ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ হইতে গ্রীকগণ তগরের পরিচয় প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতেই তাঁহারা তগরের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পান এবং অবশেষে ২১৩ খ্রীঃ পূঃ সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময় বরাগজা বা ভরুকচ্ছের (বর্ত্তমান বরোচ) ও কল্যাণ বন্দরের বাণিজ্য সর্ব্ব-বিষয়ে বিপুলতা ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। গ্রীকগণ সেই বিপুলতা সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথের যাবতীয় বাণিজ্যদ্রব্য সর্ব্বাগ্রে তগরে আনীত হইত এবং তগর হইতে তাহা গো-শকটে বরোচে ও কল্যাণে প্রেরিত হইত।

এরিয়ান নামক জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিক তাঁহার Periplus meris Erythraei নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তগরের পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া তগরকে প্লুটনা (Pluthana on Plithana) নামক অন্য একটী প্রসিদ্ধ জনপদের পূর্ব্বদিকে, প্রায় দশদিবসের পথে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্লুটনা বরোচ হইতে বিশ দিবসের পথ দক্ষিণে অবস্থিত। সে পথ বলগৎ পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া বিস্তীর্ণ ছিল। প্লুটনা পলটন নামে পরিচিত এবং মাইল হিসাবে তাহা বরোচ হইতে ২১৭ মাইল দক্ষিণে গোদাবরীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত।

ফ্রেনসিস উইলফোর্ড এরিয়ান উল্লিখিত দূরত্ব ও তাঁহার প্রদত্ত প্লুটনা হইতে তগরের ব্যারিং অনুসারে তগরের স্থান দেবগিরিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এ নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য মনে করা যাইতে পারে না। এই দেবগিরিও একটী প্রাচীনতম স্থান। ইহা ইলোরের দেবমন্দিরাদির জন্য বিশেষ পরিচিত। দেবগিরির বর্ত্তমান নাম দৌলতাবাদ—আরঙ্গাবাদ নামক প্রসিদ্ধ নগরীর ৪ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠানপুর (বর্ত্তমান পৈঠান বা পত্তন) তগর এবং প্লুটনার মধ্যস্থলে অবস্থিত।

সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ক্লডিয়াস টলেমি (Claudius Ptolemy) তগর এবং পত্তন নগর দ্বয়কে বিন্ধ্য গঙ্গার (গোদাবরী) উত্তরদিকে স্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভ্রমণকারী বিচির ভ্রমণ-কাহিনীতে পত্তন গোদাবরীর দক্ষিণে উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

Asiatic Research এর সংগ্রাহক বিচির মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ না পাইয়া টলেমির মতই সমীচীন বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু গেদোবরীর শাখা-প্রশাখাদির সহিত তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যদি উক্ত নগরদ্বয়ের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, তবে বিচিকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকে না। মানচিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তগর এবং পত্তন গোদাবরীর দুইটী শাখার মধ্যে অবস্থিত। টলেমি যদি দক্ষিণে প্রবাহিত শাখাটীর বিন্ধ্যগঙ্গা নামকরণ করিয়া তগরের স্থান উত্তরদিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং বিচি উত্তরে প্রবাহিত শাখার নাম গোদাবরী নির্দ্দেশ করিয়া তগর তাহার দক্ষিণে দেখাইয়া থাকেন, তবে উভ-

য়ের মতই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ঘটনা যে এইরূপ হইয়াছে, এ কল্পনা সঙ্গত নহে।

অন্যত্র আবার এরিয়ান, টলেমি, এ উভয় মতেরই বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক মহাশয় "তগর" শব্দে প্রথমে উক্ত গ্রন্থকারদ্বয়ের মতের স্বপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পরিশেষে কার্য্যক্ষেত্রে এরিয়ান এবং টলেমির মত একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া তগরের স্থান প্রতিষ্ঠানের ১০০ মাইল পশ্চিমে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি এই মত প্রচার করিয়া তাহার সত্যতা সপ্রমাণ স্বপক্ষে কোন যৎসামান্য প্রমাণও প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আবার পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান শব্দটী লইয়াও যে সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় অন্যান্য অনেকের ন্যায় গোলে পড়িয়াছেন, ইহাও অসম্ভব নহে। কারণ তিনি দাক্ষিণাত্য শব্দে পৈঠানের স্থান নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া "পেরিপ্লাসের" যে অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই অনুবাদই তাহার বিরুদ্ধে প্রচুর সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তিনি অনুবাদ করিয়াছেন "পৈঠান" (Paithan) বরুগজা হইতে দক্ষিণে ২১ দিনের পথ দূরে এই সহর অবস্থিত এবং ইহার পূর্ব্বে দশদিনের পথ দূরে তগর অবস্থিত। পৈঠান, প্রতিষ্ঠান শব্দের অপভ্রংশ। * Asiatic Researches এর লেখক কিন্তু "পেরিপ্লাসের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন :—

"Pluthana or Pultana is situated on the southern bank of the Godabori about 217 British miles to the southward of Boroach (10 days = 100 B. miles) That the famous town Tagura was about ten days journey to the eastward of Pultanah."

পৈঠান এবং প্লুটনা বা পলটনকে একই শব্দের বিভিন্ন আকৃতি ও উচ্চারণ বলিতে আমাদের একেবারেই আপত্তি ছিল না, কিন্তু Research লেখক স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, "Paithana, now Pattan (ইহাই প্রতিষ্ঠান) বা Putten is about half way between Tagura and Plithana* তাহা হইলেই 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক Plithana or Pluthana or Pultana কেই যে পৈঠান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা মনে করা যাইতে পারে না কি ?

এ ভ্রমে যে কেবল 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক মহাশয়ই পতিত হইয়াছেন এমত নহে ; লাটিন ভাষায় Stuckius (ষ্টাকিয়াস) নামক জনৈক অনুবাদক Periplus এর অনুবাদ Geographiae Veturis Scriptores Graecciminore) প্রকাশ করেন, তাঁহার অনুবাদেই এই নামগুলির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায় ; পরে Dr. Vincent Maccrindle প্রভৃতি তাঁহার ইংরাজি অনুবাদ প্রচার করেন। ঐ সকল ইংরেজি পুনরায় ভাষান্তরিত হইয়া গিয়াছে, এইরূপে তিন নকলে এখন আসল আসিয়া 'খাস্তায়' দাঁড়াইয়াছে। প্লুটনার নাম এখন আর কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। অনুবাদকগণের অন্যায় অবহেলায় এবং নির্দ্দয় ব্যবহারেই যে প্লুটনা বর্ত্তমান জগৎ হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। প্লুটনা বিদায় লইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার ভূতযোনিটী অদ্যাপি প্রতিষ্ঠানের স্কন্ধে চাপিয়া ভৌগোলিক রাজ্যে

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' ৮ম ভাগ, ৪৫৯ পৃষ্ঠা পৈঠান শব্দ দেখ।

* Asiatic Researches Vol. I. Page 369.

এক মহাবিভ্রাট ঘটাইয়া দিয়াছে। Plithana, Plutana, Pultan, Pithan, Pattan, Pratisthan প্রভৃতি নাম ভাষান্তরিত করিতে বসিলে যে তাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই শব্দগুলি—প্লিথনা, প্লুটনা, পলটন, পৈঠান, পত্তন যে প্রতিষ্ঠানের অপভ্রংশ হইতে পারে না, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিশেষ এই কয়েকটী শব্দের সংস্করণ পরিবর্ত্তনের বিষয় কল্পনা করিলে, ইহা অনুমান করিবার একেবারেই কারণ অভাব মনে করা যায় না।

টলেমি ও তৎকৃত ভূগোলে Plitana কে Paitana বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি টলেমি ভ্রমবশতঃ পৈঠান উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা মুদ্রাদোষে এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি, তাহা হইলে তগর হইতে প্লুটনার দূরত্ব ও অবস্থিতি সম্বন্ধে টলেমি ও এরিয়ানের মধ্যে কোন মতবৈষম্য দৃষ্ট হয় না। $\Lambda^{(l)}$ এবং $\Lambda^{(a)}$ এই দুইটী গ্রীক অক্ষরের সাম্যাকৃতি হইতেও যে এই ভ্রম ঘটিতে পারে, তাহা অক্ষর দুইটী লক্ষ্য করিলে সহজেই অনুমান করা যায়। "রিসার্চের" লেখক কিন্তু ইহা টলেমির ভুল বলিয়াই মনে করিতে পারিয়াছেন, এবং তদনুসারে প্লুটনা এবং প্রতিষ্ঠানকেও পরিষ্কার ভাবে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবকেও অনুবাদকগণের ভ্রম নির্দ্দেশে পতিত হইয়া এবং উল্লিখিত নানা কারণে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তিনি মূল "পেরিপ্লাস" ও তাহার লাটিন অনুবাদে বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াও টলেমির ভ্রান্তি অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন, "অতঃপর আমরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে পারি, তগর পৈঠান হইতে কিঞ্চিদধিক ১০০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।"* তিনি পলটন বা প্লুটনা নামক কোন জনপদের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই।

"পেরিপ্লাস" প্রাচীন গ্রন্থ। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারির মতে এরিয়ান খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই হস্তোত্তোলন দ্বারা অধিকাংশের ভোট সংগ্রহ করিয়া কিম্বা কল্পনার চিত্র ফলাইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপেক্ষা স্বকীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া অবশ্যই মনে করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময় হইতে ২১১৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২১৩ খ্রীঃ পূঃ গ্রীকগণ যখন দাক্ষিণাত্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল, তখন তগরে আরিয়াকা রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরিয়াকা সংস্কৃত অপরান্তিক শব্দের গ্রীক তরজমা। এই রাজ্য সুবা আরঙ্গাবাদ ও কঙ্কণ প্রদেশের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কঙ্কণের উত্তরাংশের সহিত সুর, সল্‌সেট্ দ্বীপ, কল্যাণ ও দমন, লার রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল।

তখন সমুদ্র উপকূলে অনেকগুলি বন্দর তগর রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। তাহা সত্ত্বেও তগর রাজের ব্যবসা বাণিজ্য স্থলপথেই পরিচালিত হইত। জলদস্যুদিগের অত্যাচার ও লুণ্ঠনই ইহার একমাত্র কারণ, তাহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। কিন্তু গ্রীকদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ

* Elphinstone's History of India, P. 244 read with footnote.

স্থাপিত হইলে বাণিজ্যদ্রব্যাদি তগর হইতে কল্যাণে আনীত হইত এবং তথা হইতে বাণিজ্যতরীযোগে তাহা বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইত।

ইজিপ্ট বিজয়ের পর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমদেশীয় বণিকগণ ভারতের বাণিজ্যভাণ্ডারে লোলুপ দৃষ্টি নিপাতিত করেন। অবশেষে ভারত তাহাদের লোলুপ নেত্রের কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। ভারতের বিপুল বাণিজ্য রোমান বণিকদিগের একচেটীয়া হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ভারতীয় বাণিজ্যের সহিত গ্রীক-সম্পর্ক একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কল্যাণ, বরোচ ও অপরাপর বন্দর সমূহে আর গ্রীকদিগের অধিকার রহিল না। এমন কি, বহু চেষ্টা করিয়া গ্রীকগণ লোহিত সাগরে পর্য্যন্ত তাহাদের বাণিজ্যতরী প্রবেশ করাইতে অসমর্থ হইয়া ভারতের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

এই সময়ে আরিয়াকার রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, এবং তৎপ্রদেশের তদানীন্তন রাজা শালিবাহন তাহা তগর হইতে প্রতিষ্ঠান পুরীতে (পত্তনে) পরিবর্ত্তিত করেন।

এই শালিবাহনই শক নামক অব্দের প্রবর্ত্তক। শকের গণনা ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরব্ধ হয়। ঐতিহাসিক প্লিনি, এই সময়ে প্রতিষ্ঠানে অন্ধ্রক রাজবংশীয়দিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। শালিবাহনের রাজত্বকালে রাজা বিক্রমজিৎ দাক্ষিণাত্যে র উত্তর জনপদ (লার প্রদেশ) শাসন করিতেছিলেন। রাজা শালিবাহন অপরাপর রাজন্যবর্গের অধিনায়কত্বে বিক্রমজিৎকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। যুদ্ধে বিক্রম নিহত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশ এক রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং তগরে পুনরায় আরিয়াকা রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকে। ঐ সময়ে শিলাহার রাজবংশীয়েরা তগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তগররাজের কঙ্কন প্রদেশস্থ ভূমিদান পত্রে এইরূপ প্রমাণিত হয়। উক্ত দানপত্র (তাম্রলিপি) জেনারেল চার্ণক টানা দুর্গের (Fort of Tanna) ভিত্তি নির্ম্মাণকালে মৃত্তিকাগর্ভে প্রাপ্ত হইয়া ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে Asiatic Society তে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা সোসাইটী হস্তে রক্ষিত আছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১২৯৩ খ্রীঃঅব্দে যখন দুরন্ত মুসলমানগণ বিজয়োন্মত্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশলাভ করে, তখনও তগর একজন অতি ক্ষমতাবান রাজার রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল ; এবং দিল্লীশ্বর সাহাজানের রাজত্বের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত তাহার তদবস্থাই অবগত হওয়া যায়। সাহাজানের রাজত্বকালে তগর মোগলসাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অতঃপর কিছুকাল মধ্যেই তাহার গৌরবশ্রী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহার অনতিদূরে চারি ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে কেরখী নামক স্থানে নব রাজধানী সংস্থাপিত হয়। কেরখী ও সময়ে নামান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান আরঙ্গাবাদ নামে পরিচিত হইতেছে।

আরঙ্গাবাদের ৪ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে দেবগিরি অবস্থিত। এই নির্দ্দেশ প্রামাণ্য হইলে দেবগিরিকে প্রাচীন তগর কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। Stuckius এর

অনুবাদে এরিয়ান প্রদত্ত প্লুটনা হইতে তগরের ব্যারিং পরিত্যক্ত হইয়াছিল। উইলফোর্ড সে ব্যারিং সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরাও তাঁহার মত অনুসরণ করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গতি রক্ষা করিলাম।

কেহ কেহ আধুনিক জুনারকে, যাহা প্রাচীন কালে শিবনেরি নামে খ্যাত ছিল, প্রাচীন তগর বলিয়া পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। এই জুনার নগর তিনটী গিরিসঙ্কটের মধ্যস্থলে অবস্থিত, এই হেতুবাদে স্থানের নাম ত্রিগিরি করিয়া তাহার অপভ্রংশ তগর কল্পনা করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন।

সম্প্রতি নিজামের হায়দরাবাদে একখানা তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তাম্রলিপিতে নাকি হায়দরাবাদকেও প্রাচীন তগর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জানি না, এ সকল বিষয়ে কাহার কি অভিমত থাকিতে পারে, কিন্তু এসমস্ত নির্দ্দেশ টলেমি কিম্বা এরিয়ান, কাহারও সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতেছে না—করিলেও তগরের নাম আর কেহ লইবে না। সে তগরেরই দুরদৃষ্ট।

দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের অব্যাহত স্থিতির পর একটা অতি প্রাচীনতম সমৃদ্ধিশালী জনপদ ধরণীপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল! ইহার জন্য দায়ী কে? নির্দ্দয় কাল—না ভারতের শাসনকর্ত্তাগণ! বৈদেশিক ঐতিহাসিকমণ্ডলী—না মাতৃভূমির কৃতি সন্তানগণ!!

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বুয়রযুদ্ধ

ফ্রিষ্টেটের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অসদ্ভাব ছিল না। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে স্যাণ্ড-রিভার কন্‌ভেন্সন্ দ্বারা ফ্রিষ্টেটের স্বাধীনতা স্বীকার করার পর হইতে এই যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রিষ্টেট স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, ইংরেজ তাঁহার সহায়তা ব্যতীত শত্রুতা করেন নাই। পক্ষান্তরে ফ্রিষ্টেটবাসী বুয়রও ইংরেজের সহিত বান্ধবতা এবং আত্মীয়তা ব্যতীত কখনও কোন বিদ্বেষ ভাব দেখান নাই। অশুভক্ষণে উষ্ণমস্তিষ্ক জেমসন্ সাহেব, সিসিল্ রোডসের দক্ষিণ হস্ত, ট্রান্সভয়াল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। আক্রমণকারীদিগের মধ্যে ব্রিটিস্ মিলিটারি কার্য্যকারকও দুই চারিজন ছিলেন। মেজর হোইট্ অতীব বিচক্ষণতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে একটী ডিচ্‌প্যাচ বাক্স সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং অনেক চিঠীপত্র সহ সেই বাক্সটী বুয়রদিগের হস্তগত হইল। তন্মধ্যে এরূপ অনেক কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছিল, যাহাতে জেমসন সাহেবের কার্য্য কেবল মাত্র সিসিল রোডস্ প্রণোদিত কার্য্য নয়, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, এবং আফ্রিকা সম্বন্ধে যে দুরভিসন্ধি, তাহা কেবল মাত্র ট্রান্স্‌ভয়ালের বিরুদ্ধে নহে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহার জ্বলন্ত শিখা পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যকেও আক্রমণ করিত, এইরূপ সম্ভাবনা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইল। তখন ট্রান্সভয়াল রাজ্যের আহ্বানে ষ্টিন সাহেব ট্রান্সভয়ালের সহিত মৈত্রী সন্ধিতে আবদ্ধ

হইলেন, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রণে, শান্তিতে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী এবং রক্ষক, এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইলেন। যখন তিনি এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন, তৎকালে ট্রান্সভয়াল রাজ্য কখনও ইংরেজ-রাজ্য আক্রমণ করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিবেন, এ কথা ষ্টিন সাহেব স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। আত্মরক্ষার নিমিত্ত যাহা করা সঙ্গত এবং আবশ্যক বলিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি তাহাই করিয়াছিলেন।

অতঃপর ট্রান্সভয়াল রাজ্য যখন ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, তখন ষ্টিন সাহেবের সমক্ষে দুইটী সমস্যা উপস্থিত হইল। যে সন্ধিসূত্রে তিনি আবদ্ধ, তাহাতে ট্রান্সভয়াল রাজ্যের কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি না থাকিলেও তিনি যোগ দিতে বাধ্য কি না? দ্বিতীয়ত,ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফল অপরিহার্য্য। বুয়র এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই পরাজিত হইবেন, বুয়র রাজ্যের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে। এই অবস্থায় এই ভ্রান্ত বুয়রদিগকে কর্ত্তব্যপথে আনা অসম্ভব। তবে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কেবল ফ্রিষ্টেটের স্বাধীনতা রক্ষা করা সঙ্গত হইবে কি না? তিনি প্রথম পথই তাঁহার গন্তব্য পথ বলিয়া স্থির করিলেন, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ফল নিরপেক্ষভাবে করিতে হইবে, ইহাই স্থির করিলেন।

যদি ষ্টিন্ সাহেব কোন পক্ষভুক্ত না হইতেন, তবে যুদ্ধ অন্তে আফ্রিকায় শান্তি স্থাপন কার্য্যে তাঁহার স্বর বিশেষ কার্য্যকর হইত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ক্রুগার দূরদর্শী হইলে ফ্রিষ্টেটকে কখনও এই যুদ্ধে কোন দিকে ডাকিতেন না। সে যাহা হউক, ষ্টিন্ সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু দেখিতে পাইয়াও তাঁহার জ্ঞানানুসারে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন, মৃত্যুনিরপেক্ষ হইয়া তাহাই করিতে অগ্রসর হইলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, ষ্টিন্ মনে করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ তাঁহার রাজ্যও ব্রিটিস্ সম্রাজ্যভুক্ত করিবেন, এবং সে কথা পরবর্ত্তী ঘটনায় অর্থাৎ গ্রেস্কোতে যে সমুদয় কাগজপত্র ধরা পড়ে, তদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, ষ্টিন্ আত্মরক্ষার নিমিত্ত ট্রান্সভয়ালের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। আমরা একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই। ষ্টিন্ সর্ব্বদা সরল ভাবে রহিয়াছেন। ট্রান্সভয়ালের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাঁহার বারারগণ ট্রান্সভয়ালের সঙ্গে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, একথা তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।

কোন নীচাশয় ব্যক্তি বলিয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্রের অর্থের দ্বারা ষ্টিন্ ক্রীত হইয়াছিলেন। যে জিহ্বা এইরূপ কথা উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, যে নীচাশয় এইরূপ ভাব অন্তরে স্থান দিতে সঙ্কুচিত হয় না, তাহার কথা মনুষ্য সমাজের আলোচ্য নহে। চন্দ্রের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পেচক চিরদিনই কাতর। চিরদিনই মহতের মহত্ত্বে নীচ দুঃখিত। মহতের স্বভাবে কলঙ্ক আরোপ করিতে পারিলেই তাহার সুখ। বিংশতি শতাব্দী এইক্ষণ পর্য্যন্ত এই নীচ সমালোচনবিষের সীমার বহির্দ্দেশে গমন করিতে পারেন নাই।

ষ্টিন্‌কে আমরা ভ্রান্ত বলিতেছি, তাঁহার ভুল কোথায়? পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ষ্টিনের ভুল কোথায়? আমাদিগের মত অন্যে গ্রহণ করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝি, তাহা না বলা

অন্যায়। ষ্টিন এক দিকে যেরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ, অপর দিকেও তদ্রূপ ফ্রিষ্টেটের বাসেন্দাদিগের সাংসারিক সুখ দুঃখ, ধন সম্পত্তি, জীবন সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের রক্ষক এবং ন্যস্ত বিশ্বাস ভাণ্ডারী। সন্ধির বন্ধন পবিত্র, অচ্ছেদ্য। কিন্তু সেই বাধ্যবাধকতারও সীমা আছে। ইংলণ্ড যদি ট্রান্সভয়াল অগ্রে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত রণঘোষণা করিতেন, তবে ষ্টিন্ সাহেবের গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু যে অবস্থায় তিনি ট্রান্সভয়াল রাজ্যের সঙ্গে যোগ দিলেন, সেই অবস্থায় তিনি যোগ না দিলে তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমে অন্যায় করা হইত না, এবং তাঁহার প্রতি যে গুরুতর ভার ফ্রিষ্টেটবাসিগণ ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহার পক্ষে উল্লিখিতরূপ অবস্থায় যোগ না দেওয়াই উচিত ছিল। আমরা এই নিমিত্তই বলিয়াছি, ষ্টিন্ও ভুল করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভুল মহত্ত্বের ফল, নীচতার, সঙ্কীর্ণতার অথবা স্বার্থসাধনের ফল নহে।

ষ্টিন্ পরাভূত হইয়াছেন, তাহার সমস্ত গিয়াছে—পদ, মর্য্যাদা, অর্থ, সুখ, শান্তি, পরিবার, পরিজন এ সমস্ত হইতে তিনি বঞ্চিত। আফ্রিকার উপত্যকা, অধিত্যকা তাঁহার বাসভূমি, কয়েক জন মাত্র বিশ্বাসী কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরার তাঁহার সহচর। কিন্তু এ অবস্থায়ও ধীর এবং প্রশান্ত বীর যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, ফল-নিরপেক্ষ ভাবে তাহা করিতেছেন। হয়ত অনতিকাল মধ্যে ব্রিটিস্ বেয়নট্ তাঁহার হৃদয়ের রুধির পান করিবে, তাঁহার চিরদিনের ভালবাসার স্বাধীনতার ছিন্ন পতাকার নীচে তাঁহার নশ্বর দেহ মাংসাহারী জীবের আহার হইবে। তিনি এই সমস্তই বুঝেন, সমস্ত জানেন, তথাপি ধীর প্রশান্ত এবং অবলম্বিত পথে অগ্রসর। যাহারা তাঁহাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল, তাহারা এইক্ষণে ক্লান্ত, তিনি বাধা না দিলে এতদিন হয়ত তাহারা ইংলণ্ডের পতাকার শীতল ছায়ায় তপ্ত মস্তক শীতল করিত, কিন্তু ষ্টিন্ অক্লান্ত, অপরিশ্রান্ত, একই পথে একই গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। * ধন্য কর্ত্তব্য জ্ঞান, ধন্য তুমি ষ্টিন্ যে এইরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অধিকারী! তুমি ভ্রান্ত হইলেও মনুষ্য সমাজের আদর্শ। ইংরেজের মধ্যে যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা অবশ্যই তোমার মহত্ত্ব দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্ভাগ্য বশত তোমারও ভুল হইল! নিয়তির গতি কে অবরোধ করিবে!

পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, বুয়রদিগের সকলেই ক্রুগারের কার্য্য সমর্থন করিয়াছিলেন। জেনেরাল জুবার্ট, যিনি শেষ পরাজয়ের তীব্র কশাঘাত সহ্য করার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি এবং বর্ত্তমান বুয়র কমাণ্ডাণ্ট জেনেরেল লুইস্ বোথা প্রথমাবধিই যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধ নিবারণ করার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বুয়র জাতি যখন স্থির করিলেন যে, যুদ্ধ করিতে হইবে, তখন যোদ্ধা দেশের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

* রিজ সাহেবের যে চিঠী ষ্টিন্ সাহেবের পরিত্যক্ত কোটের পকেটে পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, ট্রান্সভয়ালবাসী বুয়রগণ আর আশা নাই মনে করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ষ্টিনের প্রতিবাদে তৎপথাবলম্বী হন নাই।

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন যখন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন, তখন তাঁহারা অবনত মস্তকে রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে ব্রতী হইলেন। জুবার্ট এবং বোথার কার্য্য দেখিলে আমাদিগের সেই পুরাতন ইতিহাস স্মরণ হয়। বোথা বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে একজন বুয়র অধিনেতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না। ৩৭ বৎসরের যুবক, নির্ম্মল চরিত্র, শিক্ষিত বীর এবং ধনী। তাঁহাকে সকলে ভালবাসিত বটে, কিন্তু প্রাচীন বুয়রেরা তাঁহাকে বালক বলিয়া স্নেহ করিতেন, অনুবর্ত্তন করিতেন না।

জুবার্টের অবস্থা অন্যরূপ। জুবার্ট দেশের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ দেহের রক্তবর্ষণ করিয়াছেন, তিনি দেশের কার্য্যে আজীবন মৃত্যুর সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন, একদিনও তাঁহার একটী কার্য্য স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হয় নাই। ভীরুতা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পদার্থ এবং প্রাণ অতি উদার। সমুদয়ই বুঝিতে পারিতেন, বুদ্ধিমান এবং কৌশলী অথচ সম্পূর্ণরূপে নীচতাশূন্য। বুয়র জুবার্টকে সম্মান করিতেন, বোধ হয়, ক্রুগারের পরই বুয়র জুবার্টকে বিশ্বাস করিতেন এবং সম্মান করিতেন। জুবার্টের মত যদি ক্রুগারের মতের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইত, তাহা হইলে হয়ত বুয়র জাতি তাঁহার মত অতর্কিতভাবে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু বুয়রের চক্ষে ক্রুগার অদ্বিতীয় ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত, প্রায় সর্ব্বশক্তিমানের কাছাকাছি। সাধারণ অশিক্ষিত বুয়র কৃষককে কোন বিপদ প্রদর্শন করাইলে নির্ভয়ের সহিত উত্তর করিত, ভগবান এবং ক্রুগার আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। জুবার্টের প্রতি এত নির্ভর ছিল না। জুবার্ট যে কার্য্য করিতেন, সে কার্য্য হইলেই হইল, তাঁহার নিমিত্ত কে যশভাগী হইল, তৎপ্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে স্বাধীনতার যুদ্ধে জুবার্ট মরণ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিলেন, ক্রুগার যুদ্ধকালে যুদ্ধক্ষেত্রের চতুঃসীমা মধ্যেও ছিলেন না। ১৮৮১ সালের সন্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে জুবার্টই সমস্ত ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ যখন থামিল, তখন ক্রুগার অগ্রসর হইলেন, বুয়রের প্রতিনিধি হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। যশের অগ্রভাগ তাঁহার, বুয়রের চক্ষে তিনিই দেশের প্রধান উদ্ধারকর্ত্তা। জুবার্ট তাহাতে কথাও বলিলেন না।

জুবার্ট উদার মতাবলম্বী, তুল্যাধিকারের পক্ষপাতী। ক্রুগার ঠিক তাহার বিপরীত। দুই জনই ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে প্রেসিডেণ্টের আসনের নিমিত্ত প্রার্থী। ক্রুগারের পক্ষে ভোটের সংখ্যা বেশী হইল, জুবার্টের পক্ষীয় লোকেরা বলিলেন, অনেক অনুচিত ভোট রেজেষ্টরী হইয়াছে। তদন্তকালে ক্রুগারের পক্ষীয় অনেক ভোট অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সভা গোলযোগ নিবারণের নিমিত্ত ক্রুগারকেই প্রেসিডেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিলেন। উইটল্যাণ্ডারগণ আশা করিয়াছিলেন, জুবার্ট প্রেসিডেণ্ট হইবেন, তাঁহারা জুবার্টকে বলিলেন, এই অন্যায় মীমাংসা স্বীকার করা উচিত হইবে না। জুবার্ট ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, "এই উপলক্ষে আমি দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে প্রস্তুত নই।" এইরূপ চরিত্রের লোকের প্রকৃত মহত্ব বুঝা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাজেই বুয়র রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সমিতি যুদ্ধ সম্বন্ধে জুবার্টের মত গ্রহণ না করিয়া

ক্রুগারের মত গ্রহণ করিলেন। বিদুর, ভীষ্মের পরামর্শ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের পরামর্শ গৃহীত হইল। বুয়র শেষ অপরিণামদর্শিতার পরম অভিনয় করিয়া আত্মহত্যার প্রশস্ত বর্ত্মে পদার্পণ করিলেন।

যুদ্ধের আরম্ভ হইতে বুয়র জেনেরল প্রিন্স লুর আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত প্রধান ঘটনাবলী।

প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের প্রেরিত "শেষ লিপি" (ultimatum) যাহাতে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

অক্টোবর—৯, ১৮৯৯।

বুয়রদিগের কর্ত্তৃক কারাইপান নামক স্থানে, বর্ম্মাবৃত ট্রেন রেলচ্যুত করা এবং অস্ত্রসহ রক্ষকদিগকে হস্তগত করা।

অক্টোবর ১২ „

কিম্বার্লী এবং মেফেকিং বুয়র কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। „ ১৬ „

ডাণ্ডির যুদ্ধ, লুকাস মেয়রের অধীনে বুয়রদিগের পরাভব। „ ২০ „

এলাণ্ডস্ লেগেটর যুদ্ধে ইংরেজ ২টী কামান গ্রহণ করেন এবং ২৫০ বুয়রকে বন্দী করেন। „ ২১ „

ইংরেজ সেনাপতি ইউল, ডাণ্ডি পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্য লেডিস্মিথের দিকে গমন করেন। „ ২৩ „

রাইট ফন্টীনের যুদ্ধ, সার জর্জ্জ হোয়াইট সেনাপতি ইউলের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করেন। „ ২৪ „

ডাণ্ডি যুদ্ধে আহত সার্ ডবলিউ পি সাইমন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। „ ২৫ „

সেনাপতি ইউল লেডিস্মিথ প্রবেশ করেন। অক্টোবর ২৬ ১৮৯৯

ফারকারস্ ফারামে এবং নিকলস্ নেকের যুদ্ধ যাহাতে ইংরেজ পক্ষে কাহারও মতে ১১০০ কাহারও মতে ১৪০০ সৈন্য হত হয়। „ ৩০ „

বুয়রগণ কোলস্বর্গ অধিকার করে এবং সার রেডবার্জ বুলার কেপ টাউনে উপনীত হন। „ ৩১ „

বুয়রদিগের আক্রমণে ইংরেজ সৈন্য কলেঞ্জো পরিত্যাগ করেন এবং লেডিস্মিথের সহিত অন্যান্য স্থানের সমস্ত সংশ্রব শূন্য হয়। নবেম্বর ৪ ১৮৯৯

বুয়রদিগের কর্ত্তৃক মেফিকিং আক্রমণ এবং সেনাপতি ক্রঞ্জির পুত্র পাইট ক্রঞ্জির রণে পতন। „ ৭ „

বুয়রদিগের কর্ত্তৃক লেডিস্মিথ্ আক্রমণ এবং লেডিস্মিথ হস্তগত করিতে অশক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন। নবেম্বর, ৮ ১৮৯৯

ফ্রি-ষ্টেটবাসী বুয়রদিগের কর্ত্তৃক বার্গার ডরপ অধিকৃত। „ ১৩ „

বুয়রগণ কর্ত্তৃক চিবেলা নামক স্থানের সন্নিকটে বর্ম্মাবৃত ট্রেণের বিনাশ এবং ব্রিটিস পক্ষে গুরুতর ক্ষতি। „ ১৫ „

৬০০ অস্ত্রধারী বুয়র ২টী কামান সহ আলিওয়াল পথে প্রবেশ করেন। „ ১৮ „

বেলমণ্টের যুদ্ধে লর্ড মিথুএন্ কর্ত্তৃক বুয়রদিগের পরাভব। „ ২৩ „

ইষ্টকোর্টের নিকট উইলো-গ্রেঞ্জের যুদ্ধে বুয়রদিগের পশ্চাদ্গমন। „ ২৩ „

গ্রাসপানের যুদ্ধে লর্ড মিথুএনের জয়। „ ২৫ „

বুসম্যান ছেক নামক স্থান জেনেরেল গাটাকার কর্ত্তৃক অধিকৃত। „ ২৭ „

মডার নদের সন্নিকট যুদ্ধে বুয়রদিগের অধিকৃত স্থান লর্ড মিথুএন কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। নবেম্বর, ২৮ „

অবরুদ্ধ কিম্বার্লীর বহির্দ্দেশে যুদ্ধ এবং মেজর স্কট্ টার্ণারের যুদ্ধে মৃত্যু। „ ২৮ „

অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য সাহায্যে কর্ণেল পটার কর্ত্তৃক আরেণ্ডেল অধিকৃত হয়।

ডিসেম্বর, ৮ „

লেডিস্মিথে অবরুদ্ধ ব্রিটিস সৈন্যের কতক সৈন্য জেনারেল হাণ্টারের অধীনে রাত্রিতে বুয়রদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগের ২টী কামান বিনষ্ট করে। „ ৮ „

উল্লিখিতরূপ যুদ্ধে বুয়র পক্ষের আর একটী কামান বিনষ্ট হয়। „ ১০ „

ষ্টরমবার্গের যুদ্ধে জেনারেল গাটাকারের পরাজয় এবং ইংরেজ পক্ষে বিপুল ক্ষতি।

„ ১০ „

মেগারস্ ফণ্টিনের যুদ্ধে লর্ড মিথুএনের অধীন ব্রিটিস্ সৈন্যের ক্রঞ্জি কর্ত্তৃক পরাজয়, ইংরেজ পক্ষে বিপুল ক্ষতি, হাইল্যাণ্ড ব্রিগেডের নেতা সেনাপতি ওয়াকপের রণে পতন। „ ১১ „

কলেঞ্জো যুদ্ধে সার্ রেড্বার্জ বুলারের বোথার হস্তে পরাজয়, ব্রিটিস পক্ষে বিপুল ক্ষতি। ডিসেম্বর, ১৫, ১৮৯৯

লর্ড রবার্টস্ প্রধান সেনাধিনায়ক (Comnander in chief) এবং লর্ড কিচেনার তাঁহার পারিপার্শ্বিক কার্য্যকারকদিগের প্রধান নিযুক্ত হন। „ ১৭ „

লর্ড রবার্টস্ এবং লর্ড কিচেনারের কেপ টাউনে উপস্থিতি। জানুয়ারি, ১০ ১৯০০

স্পিয়নকপের যুদ্ধে প্রথমতঃ ইংরেজদিগের জয়, তৎপর ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত স্থান পরিত্যাগ। ২৪

লর্ড রবার্টসের মডার নদীতীরে উপস্থিতি। ফেব্রুয়ারি, ৯ „

কিম্বার্লির অবরোধ অপসারিত।

„ ১৫ „

পারেডবার্গ নামক স্থানে বুয়র সেনানী ক্রঞ্জি ইংরেজ সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত বুয়র সৈন্য পরাজিত এবং বীরত্বের ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ৪০০০ সৈন্য সহ ব্রিটিস হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। এই ঘটনা ব্রিটিস সৈন্যের মজু-বা যুদ্ধে পরাজয়ের সাম্বৎসরিক দিনে ঘটে। „ ১৬—২৭„

লেডিস্মিথের অবরোধ মুক্তি।

„ ২৮ „

বুয়রদিগের কর্ত্তৃক সন্ধির প্রস্তাব।

মার্চ্চ, ৬ „

লর্ড সালিসবারী কর্ত্তৃক প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

„ ১১ „

লর্ড রবার্টস্ কর্ত্তৃক ব্লুমফণ্টিন নগর অধিকৃত। „ ১৩ „

বুয়র সেনাপতি জুবার্টের পীড়া-জনিত মৃত্যু। „ ২৮ „

মেফিকিঙ্গের অবরোধ মুক্তি।

মে, ১৭ „

লর্ড রবার্টস্ কর্ত্তৃক জোহান্সবার্গ নগরাধিকার। „ ৩১ „

লর্ড রবার্টস্ কর্ত্তৃক প্রিটরিয়া অধিকার

জুন, ৫ „

ট্রান্সভয়াল রাজ্যের স্বাধীনতা বিনাশান্তে ব্রিটীস রাজ্যভুক্ত করা ও তন্মর্ম্মে ঘোষণা। „ ১১ „

থাবাঞ্চা পর্ব্বতের উপত্যকায় ফরিস্বার্গ নগরের নিকটে সেনানী ডিওয়েট্, অলিভার প্রিন্স্লুর অধীনে ফ্রিষ্টেট্বাসী বুয়রগণ

ব্রিটিস সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হন। প্রেসিডেণ্ট ষ্টিন, সেনানী ডিওয়েট এবং অলিভার অনুমান ২০০০ বুয়র সহ ব্রিটিস সৈন্য-শৃঙ্খলের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যান, কিন্তু তৎপর সেনানী প্রিন্স্‌লু ৪০০০ সহস্র বুয়র, অস্ত্র, শস্ত্র এবং রসদাসহ ব্রিটিস হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। জুলাই, ৩০ ১৯০২ ক্রমশঃ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

আড়ি।

আমার, ভোলার সাথে আড়ি!
আমি, ভয় করিনা, তারে বিনা,
জগৎ জিত্তে পারি;
কেবল, ভোলার সাথে হারি!
আমি, এদ্দিন যার একলা ছিলাম
মালিক অধিকারী,
ভোলা এসে, এক নিমেষে,
দখল নিল তারি!
তারে, দেখে সুখে, হাস্য মুখে,
বুকে নিল নারী,
ভাইরে, সেই অবধি, একটু যদি,—
শপথ কর্ত্তে পারি!
তারে, সাম্‌নে রেখে, পিঠে থেকে,
নিদ্রা যেতে নারি,
ভাইরে, আলোর পাছে, কালো বেশি,
মশার কামড় ভারি!

২

ভাই, বল্‌ব কি হায়, কদ্দিন যায়,
সেই যে ছাড়াছাড়ি,
এখন, দিনে রেতে, পাইনা খেতে,
একটী চুমো তারি!
তার, হৃদয় যোড়া ভোলা ছোড়া
স্নেহের জমিদারী
কল্লে, জবর দখল, হেসেই কেবল,—
কেমন মজা মারি!
সেযে, পাহাড় ধ'রে, আহার করে,
বীর পলোয়ান ভারি,
তার মত কই, দিগ্‌বিজয়ী,—
আমি,——তার সাথেই হারি!

এল, আবার বরুণ, আরো দারুণ,
আরেকটী ভাই তারি,
ভোলা গেল পাছে হ'টে
সে, সাম্‌না নিল কাড়ি!
আগে, ছিলাম পাশে, গা'র বাতাসে,
তবু,—বছর তিনেক চারি,
লজ্জা যে পাই, বল্‌ব কি ভাই,
এখন, শয্যা ছাড়াছাড়ি!
এখন, ক্ষুধার বেলায় শুধায় না সে,
থাক্‌লে বাহির বাড়ী,
আমি, আপ্‌না ঘরে পর হয়েছি,
এম্নি দাগাদারি!
ডাক্‌লে, দেয়না জবাব, এম্নি নবাব,
এম্নি অহঙ্কারী,
আমার, ইচ্ছা করে, কপ্নি প'রে,
হইগে দণ্ডধারী!
ভোলার মামী থাক্‌লে আমি,
পায় ধরিতাম তারি,
সেযে, টৌট্‌কাতে আট্‌কায়ে দিত,
কাজ্‌লা নয়ন ঠারি!

আমার, ভোলার সাথে আড়ি,
ভোলার পরে, বরুণ এল,
তবু ছিলাম বাড়ী!
আজ যে, পেলেম তত্ত্ব—কথা সত্য—
চিত্ত অবশকারী,
আমার, কাঁপ্‌ছে দেহ, ধর কেহ,
ঠিক্ থাকিতে নারি!—

শুন্‌লেম, আস্‌ছে পথে, পুষ্প রথে,
আরেক ধনুর্দ্ধারী,
আমায়, শেষকালে ভাই দেশ ছাড়া'লে,
লক্ষ্মীছাড়া নারী!
আমার, সবার সাথে আড়ি!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

আশার স্বপন।

A glory gilds the sacred page,
Majestic, like the sun;
It gives light to every age,
It gives, but borrows none.

———Cowper.

The succession cannot break. The further evolution must go on, the Higher Kingdom come—first the blade, where we are to-day; then ear, where we shall be to-morrow; then the full corn in the ear, which awaits our children's children, and which we live to hasten.

———Prof. Drummond.

Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned: from which some having swerved have turned aside unto vain jangling; desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm.

——1 Tim., i, 5, 6, 7.

ভাব ও মতের বাজার আজ কাল বড়ই সুলভ হইয়াছে। সত্যানুসন্ধানোৎসুর চতুর্দ্দিকে আজ শত সহস্র ভাব ও মত বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টীই বা বর্জ্জনীয়, তাহা তিনি নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। আজ তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়।

বিজ্ঞান প্রভৃতি জড় রাজ্যের ও সাহিত্য প্রভৃতি বুদ্ধি রাজ্যের অবস্থা যে প্রকার, সমাজ প্রভৃতি নীতি রাজ্যেরও তাহাই। এবং উক্ত অবস্থা অপেক্ষা ধর্ম্মরাজ্য অধুনাতন কালে তত্ত্বপিপাসুকে আরও বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। ধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, অধর্ম্ম আজ আকাশকে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ মতভেদ লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। সকলেই স্বীয় স্বীয় মত ও তাহার স্বার্থকতা প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর। এ অবস্থায় পড়িয়া, এই সকল কারণে, ধর্ম্ম-তরুবর নিত্যই শাখা প্রশাখায় বাহ্যিক আয়তনে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বৃদ্ধির সহিত যদ্যপি ইহার আভ্যন্তরিক পুষ্টি সাধনের চেষ্টাও বৃদ্ধি পাইত, বুঝিবা ইহার দ্রুত আয়ুঃক্ষয়ের আশঙ্কা আমাদের ব্যতিব্যস্ত ও ক্ষুন্ন করিত না। কিন্তু হায়! সেই মহা তরুবরের বিশ্বাস রূপ যে মূল, তাহার পর্য্যবেক্ষণে অতি অল্প লোকেই নিযুক্ত আছেন। ধীরে ধীরে মূল নীরস ও শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সময়টা এই প্রকার! এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্য হইতে, এই ঘোর আন্দোলনজনিত জনতা ভেদ করিয়া পিপাসাতুর শান্তি-সরোবরের নিকটে আসিতে পারিতেছেন না। এই ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে নব শতাব্দীর শুভ্র বালার্ক কিরণ প্রকাশিত হইয়াও হইতেছে না। এই আঁধারের ভিতরে একটুকু প্রকৃত নির্ম্মল অনাবিল জ্ঞানালোক প্রাপ্তির আশা দুরাকাঙ্ক্ষা রূপ

হইয়া পড়িয়াছে। সুজলা সুফলা ভারত আজ নাকি অজলা অফলা। সেই জন্যই বুঝিবা অন্তর্জগতেও আজ এই মহা দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব।

সকলেই যে বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ হইবেন, সকলেই যে উপনিষদাদি ধর্ম্মগ্রন্থে সত্যসার প্রাপ্ত হইবেন, সকলেই যে চিরঞ্জীব ঋষিগণের জ্বলন্ত বাক্যে আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক তদনুযায়ী জীবন যাপনকেই মোক্ষলাভের একমাত্র মার্গজ্ঞানে সেইরূপ জীবন গঠন করিবেন, সে আশা করা বৃথা। অথবা, যাবতীয় নর-নারী যে মহামুনি শাক্যসিংহের গভীর গবেষণার শরণাপন্ন হইয়া, দেব-প্রদর্শিত সেই পথে অনুগামী হইবেন এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাতীত চিরন্তন অক্ষয় আনন্দ ধামের যাত্রী সকলে নিত্য শান্তিপ্রদ মহা-মিলন বা নির্ব্বাণের উত্তরাধিকারী হইবেন, তাহা দুরাশা। ধর্ম্মবীর প্রেরিতাত্মা শ্রীমহম্মদের জ্বলন্ত একেশ্বরবাদ ঘোষণার্থ ও অজ্ঞানতার জাল ছিন্ন করিবার জন্য দুঃসাহসিক ভীষণ পরাক্রম তদনুচরবর্গ বামে ধর্ম্ম গ্রন্থ দক্ষিণে অসিধারণ পূর্ব্বক ধরিত্রীকে ত্রাসান্বিত করিয়াও, তাহাকে 'কাফের' বিমুক্ত করিতে আজও সক্ষম হন নাই। সেইরূপে, সেই প্রেম ও ভক্তি উচ্ছ্বাসের জোয়ার, যাহা, অনতিপূর্ব্বে নদিয়া ও শান্তিপুরকে একেবারে ভাসমান করিয়াছিল, সেই অমিয়রসাপ্লুত পবিত্র গুরুগৌরাঙ্গ আজিও সমগ্র ভারতকে বিধৌত করিতে পারেন নাই, সকল হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন হন নাই। দুঃখীতাপীর অশ্রুর সহিত অশ্রু মিলাইবার জন্য, কাঙ্গাল, তৃষিতকণ্ঠ, রুগ্ন, অনাহারী জনকে দয়াদাক্ষিণ্যে, প্রেম ভক্তিতে মজাইবার জন্য, অধম, পতিত, নিরাশ্রয় জনের উদ্ধারের জন্য, মহাত্মা ঈশা, গরীবের জন্য অধমতারণ, পতিতপাবন, দীন-জনের 'পিতা'র ধর্ম্ম প্রচারার্থ স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে উৎসর্গ করিয়া, উজ্জ্বল, জীবন্ত বিশ্বাসের অমর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াও, সমগ্র জগতের ধর্ম্ম-গুরুরূপে বৃত হইতে পারিয়াছেন কি না বা পারিবেন কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে কোন ধর্ম্ম বিশেষকে যুগধর্ম্মরূপে দণ্ডায়মান করিতে প্রয়াসী হওয়া আমাদের মতে নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা। প্রকৃত ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝা যায়, আজ তাহা যে প্রকার, দুই, দশ, শত বৎসর পরেও তাহাই থাকিবে; চিরকাল একই ভাবে থাকিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম কথাটী, অপরাপর সকল ব্যাপারের ন্যায়, দেশকালপাত্রাপাত্র ভেদে বিশেষ বিশেষ অর্থ ও সংজ্ঞা পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এবং এই বিশেষ অর্থ ও সংজ্ঞা লইয়াই পূর্ব্বোক্ত বাদানুবাদ, তুমুল আন্দোলনাদি চলিয়া থাকে। সামাজিক নীতি, বাহ্যিক আচরণ, উপাসনা প্রণালী, বসন, ভূষণ, আহার, ব্যবহার এই সমস্তই এই বিশিষ্ট ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। আমরা যথার্থ বিশ্বাস করি, কোন দিনই কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালীকে সমগ্র জগৎ আলিঙ্গন করিতে পারিবে না। এ যুগ মহা স্বাধীনতার যুগ। স্বেচ্ছাচারিতা এক কথা, স্বাধীনতা আর এক। আমরা বলিতেছি, ইহা স্বাধীনতার যুগ। কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মশৃঙ্খলে জগৎ আবদ্ধ থাকিতে নারাজ। আমাদের বিশ্বাস, চির-বৈচিত্র্যময় ভগবানের রাজ্যের এই এক অভিনব লীলা, ইহাই এক বিশেষ বিধান। মিলনের ভিতর বিচ্ছেদ, একাকারের ভিতরই শতা-

কার; ইহাই লীলাময় ভগবানের লীলার পরিচয়। এই জগতে, এই সৃষ্টির মধ্যে দুইটী পত্র, দুইটী পক্ষী, দুইটী কীট, দুইটী পশু, দুইটী দেশ, দুইটী মানব-প্রকৃতি, দুইটী আচার, ব্যবহার, দুইটী রীতি নীতি, দুইটী চিন্তা, সমতুল্য বা সমকক্ষ নহে। এমত অবস্থায় দুই ব্যক্তির ধর্ম্মমত যে সর্ব্বথা এক প্রকার হইবে, তাহা কোন্ যুক্তি অনুমোদিত, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিচার করিতে পরাঙ্মুখ। আবার অপর দিকে বিগত শতাব্দী সদর্পে, বিজ্ঞান-দুন্দুভিনাদে ঘোষণা করিতেছেন যে, এই জগত এক সনাতন 'ক্রমোন্নতি'; (Evolution) এক 'নৈসর্গিক মনোনয়ন' (Natural selection) এক বিবর্ত্তন সম্ভূত অতএব বিজ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ মানিতেই হইবে যে, জগত এক শক্তি সম্ভূত, এক নিয়মে পরিচালিত এবং একই কার্য্যকারণে পরিবদ্ধ। এ রাজ্য মিলনের জন্য, বিচ্ছেদ নাই। এদেশ একাকারের দেশ, বৈষম্য নাই।

বিশিষ্ট ব্যাপারে বৈষম্য থাকিবেই থাকিবে। ইহা বৈষম্য নহে, ইহা মোহ। আমরা যাহাকে হয়ত এই চর্ম্মচক্ষে বিভিন্ন প্রকারে দেখিতে পাইতেছি, বস্তুতঃ তাহা বিজ্ঞান অথবা দার্শনিক চক্ষে একই। যদি এই বৈষম্য থাকিবেই, তবে এই মোহ, এই অন্ধতা লইয়া এত রক্তপাত কেন? কেন আজ জ্ঞানগৌরবান্বিত গুণীগণমণ্ডলী বনচারী হিংস্র পশুদিগের মত অকাতরে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মমতকে মতদলনরূপ ঘৃণিত সমর ক্ষেত্রে যোদ্ধারূপে প্রেরণ করিতে কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইতেছেন না! মহা সাম্যময় রাজ্যে কেন আজ ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া ভাই ভাইয়ে দলাদলি করিতেছেন? ইহার পশ্চাতে আমরা কথঞ্চিৎ স্বার্থ দেখি,—একটু হিংসার আঘ্রাণ পাই; অহং অহং গরিমা কিছু বেশী মাত্রায় এখানে বর্ত্তমান; প্রচুর পরিমাণে অন্ধতা ও গোঁড়ামি থাকিলেই কলহপ্রিয়তা সচরাচর প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ভক্তিযোগের ও ধর্ম্মসাধনের পক্ষে যে এই প্রকার ব্যবহার কতদূর অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে, তাহা সহৃদয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী অনার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, ধর্ম্মের বর্ণ-পরিচয় তিনি ভুলিয়া গেলেন। ভুলিলেন যে, যে পদার্থই হউক না কেন, মহাদেবের, সেই অনাদির সৃষ্ট পদার্থ সকলের ভিতরই ন্যূনাধিকরূপে তিনি স্বয়ং বর্ত্তমান। এবং সেই সত্ত্বার ততটুকু উপলব্ধি করিবার জন্য, উক্ত পদার্থে সেই পরিমাণে শিক্ষনীয় পদার্থ আছে। এখানে কিছুই ঘৃণার্হ নহে। যিনি হিন্দু, তিনি তাঁহার মতামত লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঈশা, মুশা, বুদ্ধ, মহম্মদের আবার যে কোন মাহাত্ম্য আছে, তাহা বিবেচনা করিবার অবসর পাইলেন না;—পরন্তু, আরও পরিতাপের বিষয়, যে টুকু অবসর জুটিয়াছিল, তাহা সেই মহাপুরুষগণের মতামত-বিশ্লেষণেই—তদপ্রতি ঘোরকটাক্ষপাত, নিন্দা, ঘৃণা, মনের গ্লানি আরোপিত করিতে করিতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। এইরূপে মুসলমান, 'কাফের' হিন্দুর ব্যবহারের প্রকৃত প্রতিবাদ ও প্রতিদান করিতেছেন, ইহা জ্ঞান করিয়া, প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষিগণের অগণিত সার সত্যরত্নরাজি অবলোকন করিয়াও করিলেন না, চক্ষের সম্মুখে থাকিতেও সেগুলিকে উপেক্ষা করিলেন। জ্ঞান-দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইল, শিক্ষা বর্দ্ধিত হইতে হইতে আরও পরিমিত হইয়া

গেল। খ্রীষ্টিয়ান যীশু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও প্রচারোৎসুক হইয়া, অন্য পথ নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া কৃষ্ণ মাহাত্ম্যে দোষারোপ, কৃষ্ণচরিত্রের কলঙ্ক রটনা করিতে আরম্ভ করিলেন। খ্রীষ্ট মহত্ত্বে অন্ধ খ্রীষ্টিয়ান, কৃষ্ণ মহত্ত্ব-শিক্ষায় দীক্ষিত হইলেন না,—পরন্তু, তাঁহাদের সাধের খ্রীষ্টের উপর কলঙ্ক আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কেন না, এককে খর্ব্ব করিয়া যদি অপরের মহত্ত্ব ঘোষণা করিতে হয়, এককে নামাইয়া যদি অপরের উচ্চতা নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে অপরের বৃদ্ধি হইল কোথায়? এ ব্যবহারে স্থাপিত যে মহত্ত্ব, তাহা উক্ত নামের অনুপযুক্ত! স্বার্থপরবশ সংসার-সমর-ক্ষেত্রেই এই প্রকার দূষিত নীতির আবাস, তথায় ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। পবিত্র ক্ষেত্র ধর্ম্মরাজ্যকেও এই নীতি আক্রমণ করিয়াছে, পরিতাপের বিষয়। এই সমস্যার ভিতরে পতিত হইয়া মন ও আত্মা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।

সেই দিন কবে আসিবে, যখন এই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অপরা ভেদাভেদের কোলাহল-ভেদ করিয়া ধর্ম্ম ও জগতে সুললিত মহামিলনের ঐকতান শ্রুত হইবে। তখন মহাত্মা ঈশাকে অথবা প্রেরিত শ্রীমোহম্মদকে, তখন মহামুনি শাক্যসিংহ অথবা কবিবর কবিরকে,—তখন কনফিসিয়সের নীতি পুস্তককে অথবা জোরোস্তার কৃত জেন্দ আবেস্তাকে,—আদিম গ্রীস, রোম ও ভারতকে অথবা নবীন আমেরিকা, জর্ম্মানিকে উপহাস পরিহাস করিয়া জগৎ বৃথা সময় অতিবাহিত করিবে না। উক্ত ভক্তমণ্ডলী মধ্যে সকলেই সাধু, বিশ্বাসী, মহাত্মা। তাঁহারা যে সমস্ত উচ্চ আদর্শ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিপালন ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে তাঁহারা আমরণ সচেষ্ট ছিলেন। ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে আজ তাহার প্রমাণ দিতেছে। উক্ত ভক্তগণের প্রত্যেকের জীবনকে কত লক্ষ লক্ষ নরনারী আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। ঐ সমস্ত জীবন বড় সামান্য নহে। তাঁহাদের সেই প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি, সেই বালকস্বভাব-সুলভ অনাবিল সরল বিশ্বাস, সেই অনন্ত বৈরাগ্য ও স্বার্থত্যাগ, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কিঙ্কর-বিনিন্দিত সেবা, সেই হৃদয়ের গভীর আগ্রহ, সেই উজ্জ্বল শিক্ষা, সেই জ্ঞান, সেই ভক্তি, সেই প্রেম, সেই কর্ম্ম, সেই স্বর্গের ছবি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদের সহিত, জগত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, কোন ক্রমেই তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। এই পুণ্যশ্লোক জীবন সকল চিরদিন অমর থাকুক্। না পার তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিতে, তোমার হৃদয়কন্দরে তাঁহাদের জন্য একটু স্থান না হউক, নিশ্চয় জানিও, এ সৃষ্টির রাজাধিরাজের, তোমার ও আমার সকলের পিতার পিতা ভগবানের দরবারে তাঁহাদের প্রত্যেকের সিংহাসন অটল ও অচল। এবং আমরা বিশ্বাস করি, এই দুর্দ্দিন কাটিয়া গেলে, আবার সেই প্রেম-রবি উদিত হইবে। তখন এই সকল বিশিষ্ট ধর্ম্ম-মতামত-রূপ এই গাঢ় কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যাইবে এবং সকলে নিজের অন্তরে এই সাধুজনমণ্ডলী-পরিবিষ্টিত সেই মহারাজের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া মানবজন্মকে সার্থক করিবে। দয়াময় সেই দিনকে নিকটে আনয়ন করুন। 'তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক'—ইহাই আমার আশার স্বপন। শ্রীপ্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী।

সংস্কৃত নাটকের মৌলিকতা

অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে সংস্কৃত নাটক ভারতীয় সভ্যতার ফল নহে; কিন্তু গ্রীক সভ্যতা ভারতে যখন সুন্দররূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তখনই ভারতে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়গণের এমনই পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা ছিল যে, তাঁহারা অনেক বিদেশীয় জিনিস দেশীয় করিয়া লইয়াছেন, অথচ তাহাতে একটুও বিদেশীয় গন্ধ পাওয়া যায় নাই। সংস্কৃত নাটক দেখিয়া স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে, সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রথম নাটকখানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আশ্চর্য্য কৌশলে বিরচিত; এরূপ নাটকীয় নৈপুণ্য কোথা হইতে আসিল? *। সংস্কৃত নাটকে "জবনিকা" দেখিতেছি এবং গ্রীকগণকেই "জবন" বলিয়া জানিতেছি। গ্রীক জাতির সহিত জবনিকার সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। নাটকের মধ্যে সংস্কৃত এবং গ্রীক্ নাটকই সর্ব্বপ্রাচীন। এই উভয় নাটকের গঠনপ্রণালী প্রায় একরূপ। সংস্কৃত নাটক যেমন অঙ্কে অঙ্কে ও দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত, গ্রীক নাটকও সেইরূপ। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় গ্রীক নাটকেরও প্রথমে একটী প্রস্তাবনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, গ্রীক নাটকেও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকও গ্রীক নাটকের ন্যায় বসন্তকালে অভিনীত হইত। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সংস্কৃত নাটকের অভিনেতৃগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহারা সংখ্যায় পাঁচজন হইবে যথা সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক, বিট্, শকার ও বিদূষক; গ্রীক নাটকেও পুরুষ অভিনেতৃর সংখ্যা পাঁচজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গঠন প্রণালী সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একজাতি অন্যতরের নিকট ঋণী। *

সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্র। ভরত যদি গ্রীক অধিকারে না জন্মিয়া তাহার পূর্ব্বে জন্মিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংস্কৃত নাটক বিজয়ী হইত। ভরতমুনি তাঁহার সময়ে প্রচলিত মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সৌরশেনী, দাক্ষিণাত্যা প্রভৃতি ৭টী কথিত ভাষার মধ্যে বাহ্লীক ভাষাও গ্রহণ করিয়াছেন। † সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজীর ন্যায় ভরতের সময়ে বাহ্লীক ভারতবর্ষের একটী কথিত ভাষা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় নাটকে ইংরেজী actor প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভরতের সময়ে সংস্কৃত নাটকে বাহ্লীকভাষী অভিনেতা ছিল। ইহারা গৌরবর্ণ ছিল ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে বাস করিত। ‡ ভরত বলেন, কেতুমাল দেশের লোক নীলবর্ণ ও অবশিষ্ট দেশীয় লোক গৌরবর্ণ। নাটকাভিনয়ে তিনি ইহাদিগকে যে বর্ণেই অভিহিত করুন না কেন, ইটালী দেশকে কেতুমাল দেশ বলিত, তাহা আমরা সিদ্ধান্ত শিরোমণির "পশ্চিম কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা মহাপুরী" প্রভৃতি শ্লোক হইতে জানিতে পারি।

* Prof A. Weber, in his History of Indian Literature.

* Dr. Von Ernst Windisch, in the Congress of the Orientalists held at Berlin in 1882.

† মাগধ্যবন্তিজা প্রাচ্যা সুরসেন্যর্দ্ধ মাগধী।
বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যাচ সপ্তভাষা প্রকীর্ত্তিতা॥

‡ প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তা নামপ্যন্তিজা।
নায়িকানাং সখীনাং চ সুরসেনা বিরোধিনী॥
যোধনাগরকাদীনাং দাক্ষিণাত্যাশ্চ দীব্যতাম্।
বাহ্লীক ভাষোদীচ্যানাং খসানাং চ স্বদেশজা
ইত্যাদি।
শকাশ্চ জবনাশ্চৈব পাহবা (পহ্লবা) বাহ্লীকাশ্রয়াঃ
প্রায়েণ গৌরাঃ কর্ত্তব্যাঃ উত্তরাং পশ্চিমাং দিশম্।
নাট্যশাস্ত্র।

পাণিনি মুনি তাঁহার সূত্রে দুই জন নটসূত্রকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শতপথব্রাহ্মণে ইঁহাদেরই অন্যতর শৈলালি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। নটসূত্র ও নাট্যশাস্ত্র ঠিক একই পদার্থ কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। মহাভারতাদিতে যে নৃত্যগীতাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে নিয়মাবলীও ইহার বর্ণনীয় বিষয় হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু রামায়ণের "নাটকন্যা পরে স্যাহুর্হ্যানি বিবিধানি চ" প্রভৃতি শ্লোক যাঁহারা প্রক্ষিপ্ত মনে না করেন, তাঁহারা বলেন, পুরাকালেও ভারতে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত। কিন্তু এই নাটক বর্ত্তমান আকারে ছিল কি না, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না।

বোধ হয়, সংস্কৃত নাটক ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেই প্রথম প্রচারলাভ করিয়াছিল। একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে নট শব্দটী প্রাকৃত ভাষা হইতে আগত। ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত নাটকের সর্ব্বপ্রথম প্রণেতা হইলে কখনই ইহাকে প্রাকৃত নামে অভিহিত করিতেন না। নাটকে দ্বিজেতর জাতি ও স্ত্রীলোকেই প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিত। বিদূষক ব্রাহ্মণ, অথচ তাহাকে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলান হইয়াছে। বিদূষক নামের অর্থ দেখিলে বোধ হয়, দোষ কীর্ত্তনই যেন ইহার ব্যবসায় ছিল। ভরতমুনি ইহার আকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি হাস্যজনক। তিনি বলেন, বিদূষক, বামন, কুব্জ, বিকৃত মুখ, বড় বড় দন্ত বিশিষ্ট, খলিত মস্তক (টাক পড়া) পিঙ্গল চক্ষু অথচ ব্রাহ্মণ হইবেক। সে খঞ্জ না হইলেও অভিনয় করিতে করিতে কখনও খঞ্জের ন্যায়, কখনও কখনও বক পাখীর মত গমন করিবে; কখনও বাতুলের ন্যায় কথা বলিবে, কখনও বা অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিবে। এইরূপে কখনও বিকৃতাঙ্গ, কখনও বিকৃত ভাষা এবং কখনও বা বিকৃত পরিচ্ছদাদি দ্বারা সে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্যতীত ব্রাহ্মণসন্তানের এরূপ অপমান ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্ভব নহে। সংস্কৃত ভাষায় হিংসা অর্থে নট ধাতুর প্রয়োগ অতি কম দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ নট ধাতুটীর অর্থ হিংসা করা; ইহাতেও হয়ত কিছু রহস্য আছে। Sir Philip Sydney বলিয়াছেন* নাট্যমঞ্চের দুই ঘণ্টার অভিনয়ে নাটকের নায়ক নায়িকার বাল্য হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সমুদয় জীবনের ঘটনা বিবৃত করায় নাটকীয় নিয়মের লঙ্ঘন করা হয়। কেন না, গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টোটলের ইহা অনুমোদিত নহে। এরূপ অভিনয় দর্শকমণ্ডলীর পক্ষেও বিরক্তিকর। তিনি হয়ত একটুও ভাবেন নাই যে, তাঁহার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেক্ষপীয়র নামে একজন কবি আবির্ভূত হইবেন, যিনি Sir Philip অথবা Aristotle এর প্রবর্ত্তিত নিয়মে কর্ণপাতও করিবেন না, অথচ তাঁহারা দৃশ্যকাব্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, অথচ তাহা দর্শক অথবা শ্রোতৃগণের পক্ষে বিরক্তিকর হইবে না।† আর তিনি এ কথা একটুও জানিতে পারেন নাই যে, কালিদাসের পূর্ব্বে ভরত নামে একজন নাট্যশাস্ত্রকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিও এরিষ্টোটলের ন্যায় দীর্ঘকালের ঘটনা নাটকে বিবৃত হইতে পারে না, এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, অথচ কালিদাস তাহা উপেক্ষা করিয়াও নাট্যজগতে অদ্বিতীয় হইয়া গিয়াছেন।‡ কালিদাসের কাব্য সেক্ষপীয়রের জানা অসম্ভব, কিন্তু এরিষ্টোটলের বিষয় ভরতের পক্ষে জানিতে পারা আশ্চর্য্য নহে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Dr. Windisch বলেন (§) Plautus রচিত নাটক Curents এর সহিত ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম নাটক মৃচ্ছকটিকের যে কেবল বর্ণনীয় বিষয়েরই

---

* Apology & poetry.

† Shakespear এর কোন্ নাটক কত দিনের ঘটনায় পূর্ণ, তাহা "Transaction of the New Shakespearian Society 1878." হইতে অতি সহজে জানা যায়।

‡ অঙ্কচ্ছেদং মাসকৃতং বর্ষসঞ্চিতং বাপি তৎসর্ব্বং কর্ত্তব্যং বর্ষাদূর্দ্ধাচ নতুকচিৎ। নাট্যশাস্ত্র।

(§) Congress of the Orientalists held at Berlin in 1882.

সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, প্রত্যুত গ্রীক নাটকের Parasitus edax, miles gloriosus ও servus currens যথাক্রমে মৃচ্ছকটিকে বিটশকার ও বিদূষক নামে পরিচিত হইয়াছে। আর কুমারী চরিত্রের কলঙ্ককারিণী গ্রীক্ নাটকের Lena ই যেন মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার জননী বলিয়া ভ্রম হয়। অকৃত্রিম ভালবাসার প্রভাবে বসন্তসেনার যে নীচ হইতে সম্ভ্রান্ত অবস্থায় উন্নতি, তাহাও Plautus এর Cistellaria নাটকের Silenium এর গল্পের ন্যায় বোধ হয়। আর মৃচ্ছকটিক (Toy cart) নামটীই যেন Plantine নাটক Aulularia ও Cistellaria নামের অর্থ স্মরণ করাইয়া দেয়। উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন, ভারতে যখন গ্রীক্ সভ্যতার পূর্ণ প্রভাব, তখনই মৃচ্ছকটিক রচিত হইয়াছিল, সুতরাং উক্তরূপ সাদৃশ্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কয়েকটি বিষয়ে সংস্কৃত নাটকের সহিত সেক্ষপীয়রের নাটকের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় নাটকে Love's Labour's Lost এর Nine worthies এর Interlude এবং Midsummer Night's dream এর Pyramas Thisby র অভিনয় নাটকের ভিতর নাটকাভিনয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত; এবং এই নাট্যকৌশল (Kyd's Spanish Tragedy অথবা Green's James the Fourth এর পূর্ব্বে বোধ হয় কেহ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে এই নাট্যকৌশল প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। ৭ম শতাব্দীতে বিরচিত শ্রীহর্ষদেবের প্রিয়দর্শিকার তৃতীয় অঙ্ক, অষ্টম শতাব্দীতে বিরচিত ভবভূতির উত্তর চরিতের ৭ম অঙ্ক এবং ৯ম অথবা ১০ম শতাব্দীতে বিরচিত রাজশেখরের বালরামায়ণের সীতাস্বয়ম্বর নামক গর্ভাঙ্ক নাটকের ভিতর নাটকাভিনয়ের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে পত্রের অতি প্রচার ছিল, সুতরাং সেক্ষপীয়রের তাঁহার Hamlet ও Othelo প্রভৃতির অভিনয়ে যে পত্রের ব্যবহার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে পত্রাদির বিরল প্রচার সত্ত্বেও কালিদাস, শকুন্তলা, উর্ব্বশী প্রভৃতি রমণীগণের দ্বারা চিঠি লেখাইয়া যে কেবল নাটকীয় সৌন্দর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে, তাৎকালিক সামাজিক সভ্যতারও আভাষ দিয়াছেন।

সুরাপান ইউরোপীয় সভ্যতার একটী অঙ্গ হইলেও নাটকাদিতে ইহার প্রচলন খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। সেক্ষপীয়র Othelo তে Cassius এর মুখে মত্ততা প্রযুক্ত অসংবদ্ধ প্রলাপের পর যে আত্ম ভর্ৎসনা করাইয়াছেন, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিল্টনের Consus সুরারই অবতার বিশেষ। মদ্যপান মধ্যযুগে হিন্দু সভ্যতার হয়ত একটী অঙ্গ ছিল। নতুবা আমরা নাগানন্দে মত্ত শেখরককে সুরাপাত্র বহন করিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিতে দেখিতাম না। হর্ষদেব এই স্থলে শেখরককে কখন ঘূর্ণন, কখন প্রস্খলন কখনও বা বিদূষককেই স্বীয় প্রণয়িনী বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া বেন্‌জনসনের ন্যায় অনেকটা পরিহাস-রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রেও রাজমহিষী ইরাবতী নাট্যমঞ্চে অতি সতর্কতার সহিত বেড়াইতে চাহিলেও মত্ততা প্রযুক্ত সফল হন নাই। প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শেষে একটী উন্মত্ত দৃশ্যের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়।

সেক্ষপীয়র Prospus র হাতে যাদুকরী লাঠি দিয়া Ferdinand ও Miranda কে যতদূর আশ্চর্য্য করিতে না পারিয়াছিলেন, হর্ষদেব রত্নাবলীতে ঐন্দ্রজাল সম্বরসিদ্ধির হাতে ময়ূর-পুচ্ছ প্রদান করিয়া রাজদম্পতী কেন, সমুদয় দর্শকমণ্ডলীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সম্বরসিদ্ধি যে কেবল দম্ভ করিয়াই বলিয়াছিল যে সে

"ধরায় শশাঙ্ক কিম্বা ব্যোমে গিরিরাজ
সলিলে অনল কিম্বা মধ্যাহ্নেতে সাঁজ"

দেখাইতে পারিবে তাহা নহে। প্রত্যুত সকলে দেখিয়াছিল।*

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-অনুবাদিত রত্নাবলী ৮০ ও ৮৫ পৃষ্ঠা।

হর্ম্ম্যোপরি জ্বলে শিখা
কনকশিখর শোভা ধরি
জ্বলিয়া উদ্যান তরু
তীব্র তাপে দিক্ যায় ভরি।
কোথাও বা ক্রীড়া গিরি
ধূম যোগে জলদ শ্যামল
দাহ ভয়াকুলা নারী
অন্তঃপুরে ভীষণ অনল।*

আর Marlowe Doctor Faustus কে Helen of Troyএর দৃশ্য দেখাইয়া মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজশেখর তাঁহার কর্পূর মঞ্জরীতে ইন্দ্রজালিক ভৈরবানন্দ দ্বারা যে কৃত্রিম রমণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে নৃপবরের ভালবাসা পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

শ্রীযতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য।

মৃত্যুর দ্বারে।

যে দেহ এবং যে সংসারে আত্মা বাস করে, সে দেহ এবং সে সংসার রোগ-কীটে এবং পাপ-বিষে ভরা, সুস্থ এবং সবল থাকিয়া অবিরাম উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন। একেত গণা কয়েকটী দিন মাত্র এই পৃথিবীতে আত্মার অবস্থিতি, তাহারও অধিকাংশ রোগ-সেবায়, পাপ-সংগ্রামে অযথা ব্যয়িত হইয়া যায়; পারত্রিক মঙ্গলের পথে চলিতে এবং অনাবিল পুণ্যশান্তির কথা ভাবিতে অবসর বড় কম। কত, কত রকমে মানবজীবনের অধিকাংশ সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিলে প্রাণ ও মন অবসন্ন হয়। আমি দেখিতেছি, সর্ব্বদা যেন সপ্তরথী মানব-অভিমন্যুকে অকালে বধ করার জন্য বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুরিতে, ফিরিতে বা আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু—পতন, যেন মানবের অনিবার্য্য পরিণাম।

দিন দিন জড় বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতেছে, মানবের শরীরকে ধ্বংস করিবার জন্য কত কোটী কোটী কীট অবিরাম চেষ্টা করিতেছে; অধ্যাত্মবিজ্ঞান কত উজ্জ্বলরূপে প্রমাণ করিয়াছে, আত্মাকে বিনাশ করিবার জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য কতরূপে কত চেষ্টা করিতেছে। শত শত শত্রুর আবেষ্টনে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকম্পিত। একের হাত ছাড়াইলে দশ, দশের হাত ছাড়াইলে শত শত শত্রু আসিয়া প্রতিনিয়ত ঘিরিতেছে। মানবকে রক্ষা করার জন্য এক বিবেক শক্তি সদা বাধা দিতেছে, কিন্তু সে যখন পরাস্ত হইতেছে, তখন, মৃত্যু, পতন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

দেহের বিচরণ-ক্ষেত্র এই সংসার, সেখানকার দূষিত বায়ু সদা দেহকে এবং তৎসহ আত্মাকে আক্রমণ করিতেছে। দেহের ভিতরে বিবেক শক্তি রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু সংসারে মানবকে কে রক্ষা করিবে? চতুর্দ্দিকে কুদৃষ্টান্ত কিলবিল করিতেছে; সুয়ের রাজত্ব দিন দিন যেন সংসার হইতে তিরোহিত হইতেছে। সংসারে ধর্ম্মরূপী বিবেক এক সময়ে রাজা ছিল, সে মানবকে রক্ষা করিত, কিন্তু কালবশে সেও পরাস্ত ও পরিম্লান হইয়া যাইতেছে,—সুয়ের পরিবর্ত্তে কেবল কুয়ের দৃষ্টান্ত বাড়িতেছে;—যে ধারে আসে, সে-ই কেবল কুদৃষ্টান্ত দেখায়। কুয়ের আধিপত্যে, হায়,হায়,সংসার দিন দিন যেন পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে।

পবিত্রাণার্থী মানব-আত্মা এখন যায় কোথা? কাহাকে ধরিবে? কাহাকে ধরিয়া অনন্ত উন্নতির পথে চলিবে? দিন দিন যেন পথ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। সংসারে কাম-বাবু, ক্রোধ-বাবু, লোভ-বাবু, মোহবাবু, মদবাবু ও মাৎসর্য্যবাবুর আধিপত্য দিন দিনই বাড়িতেছে। কেহ বলিতেছে, ঋণ করিয়া মদ্য মাংস খাও, কখনও ঋণ শোধ করিও না, তাগাদায় আসিলে মহাজনকে কটুবাক্যে বা প্রহারে জর্জ্জরিত করিবে, না হয়,দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইবে, ভয় কি, সুখে আহার বিহার কর। কেহ বলিতেছে, জগতে সুন্দরী স্ত্রী কেবল

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত রত্নাবলী ৮০ ও ৮৫ পৃষ্ঠা।

পুরুষের উপভোগের জন্য রহিয়াছে, স্বেচ্ছা বিহার কর, শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভাসাইয়া দেও; যে ধর্ম্ম কথা বলিবে, তাহাকে ঘৃণা এবং উপহাসের জ্বলন্ত কটাহে নিক্ষেপ কর। এইরূপে, কত কত বাবু, কত কত রূপে তর্কজাল বিস্তার করিয়া মানুষকে আক্রমণ করিতেছে। সংসারে তাহাদেরই প্রাধান্য, সুতরাং তাহাদিগকে কে কি বলিবে? কেহ কিছু বলিলে তাহার সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত হইবে, সুতরাং কেহ কিছু বলে না। ভাল যাহা ছিল, তাহা একালে, এইরূপে, অপ্রতিবাদে, একেবারে যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধর্ম্ম, পুণ্য, পবিত্রতা,—শান্তি, আরাম, আনন্দ, একালে সব যেন অপ্রতিবাদে লোপ পাইতেছে; মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ব্যভিচার, মদ্য পান, পরনিন্দা, পরগ্লানি, হিংসা, বিদ্বেষ, কুকথা, কুভাব; অত্যাচার, মামলা, মোকদ্দমা; যুদ্ধ, নির্যাতন, নির্ম্মম ব্যবহার—অপ্রতিহত ভাবে বাড়িতেছে,—এই সকলই এখনকার দিনে সকলের প্রধান সাধনার বিষয়। এইরূপ যুগে, এইরূপ সর্ব্বধর্ম্ম-সংহারকারী বাবু-যুগে, বল, ধর্ম্মার্থী মানব কাহার আশ্রয়ে যাইয়া দাঁড়াইবে? কত কত উপদেষ্টা উপেক্ষিত, কত কত গুরু পুরোহিত পরিত্যক্ত, কত কত প্রচারক সর্ব্বত্র নিন্দিত। উপদেশ, কুসংস্কার; ধর্ম্ম কথা বাতুলের প্রলাপ, পুণ্য শান্তি, অলসেরই যেন উপভোগ্য। এইরূপ যুগমাহাত্ম্য-পূজায়, সর্ব্বত্র, সকলে মাতোয়ারা। মানবকে কে রক্ষা করিবে?

নিরাশ্রয় হইয়া, নিরাশায় ডুবিয়া, উন্নতিকামী মানব-আত্মা-শিশু এখন কেবল মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছে। বাঁচিয়া থাকিয়া যদি কেবল পাপ কথাই শুনিতে হইল, পাপ পথেই চলিতে হইল, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ কি? এইরূপ ভাবিয়া, ধর্ম্মকামী মানব-শিশু প্রতিনিয়ত মরণেরই অন্বেষণ করিতেছে! দেখিতেছি, এই জন্যই যেন বহ্নি-প্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, দিন দিন কত মৃত্যু-প্রলুব্ধ বন্ধু অসময়ে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। লোকে বলে, কলিযুগে আয়ুক্ষীণ, দেহ দুর্ব্বল, তাই চতুর্দ্দিকে অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। আমি বলি, তাহা নয়, দুরতিক্রম্য পাপবিষে মানুষ জর্জ্জরিত; পাপ-পথে দীর্ঘকাল মানবআত্মা চলিতে পারে না, চলিতে চায় না বলিয়াই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সুসন্তানদিগের তিরোধান হইতেছে। যাঁহাদের এই দেহে বা এই সংসারে ধর্ম্মলাভের আশা নাই, তাঁহারা বৃথা খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পরিম্লান হইবে কেন? দেহ বা সংসার-লীলাধাম, তাই বুঝি, আজ কাল ক্ষণস্থায়ী হইয়া আসিতেছে। যাই, যাই, যাই, তবে যাই। আয় মৃত্যু, তুই কাছে আয়, তোকে চুম্বন করিয়া স্বর্গে যাই। মানব-অভিমন্যু সহস্র রথীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে, মহা পরাক্রান্ত ধর্ম্ম-ভীমেরও সাধ্য নাই যে, তাহাকে রক্ষা করিবে; অর্জ্জুন-ধর্ম্ম-সখা শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্ট, অভিমন্যু বধের আর অধিক বাকী নাই। পরাজিত হইয়া, মানবগতি ও মানব-পরিণতি দেখিয়া দেখিয়া সকলে অবাক্।

যে দেহে পাপের রাজত্ব, যে সংসারে অধর্ম্মের রাজত্ব, সে দেহ ও সে সংসারের আর মায়া কি? এখন দেহ ও সংসার-মায়া পরিত্যাগ করিয়া অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে নীরবপুরে, সংযম-গুহায়, ইন্দ্রিয়াতীত তিমির-গর্ভে প্রবেশ করিবার বাসনা দিন দিন প্রাণে বলবতী হইতেছে। দিন যায়, যায়, যায়,—আর পরাজিত হইতে আমি পারি না; মৃত্যু, তুই ঐ দেবধামের দেবদূত, আমাকে দেহাতীত এবং সংসারাতীত নিত্যধামে লয়ে যাবি ত শীঘ্র কাছে আয়। আমি—আর মোটেই পারি না।

আরতি।

(এই কবিতা হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে পড়িতে হইবে। জয়দেবের "প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং, বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং, কেশব ধৃত মীন শরীর, জয় জগদীশ হরে।" এই সুরে রচিত।)

বিকশিত কমলদলে মানসসর মাঝে
শোভন সুরভিত আসন রাজে।
কবিরঞ্জিত আসন চরণে,
ভারতি! আরতি লহ মা! ১

উজ্জ্বল মুকুট শিরে যোজিত শতবর্ণে
বিরচিত ঋষিজন অর্জ্জিত পুণ্যে।
করি দীপিত অন্তর কিরণে,
ভারতি! আরতি লহ মা! ২

তাপসরচিত সুরম্য বিশদ বসন অঙ্গে
শান্তির পবনে দোলই রঙ্গে।
করি পবিত্র চিত্ত বরণ্যে!
ভারতি! আরতি লহ মা! ৩

নাটক কাব্য কলা ভূষণ তব দেহে;
বিম্বিত আভা সুরনর গেহে।
খচি মানস মম রতনে,
ভারতি! আরতি লহ মা! ৪

বরদে! বরবর্ণিনি! আগত সুত শরণে।
লহ লহ বিনতি ভকতিবর চরণে!
করি করুণা জীবন মরণে,
ভারতি! আরতি লহ মা! ৫

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১৩। অমিয়গাথা।—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী বিরচিত। শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় মহাশয়, কবির যে সুখপাঠ্য সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ১২ খানি গ্রন্থের নাম পড়িলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সকল পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। রাধানাথ বাবু লিখিয়াছেন যে "কবিতাগুলি পড়িলে বোধ হয় যে, সঙ্গীত-রাজ্যে বামাকণ্ঠের মাধুরী যেমন সর্ব্ববাদীসম্মত, কবিতা-রাজ্যেও যেন বামাকণ্ঠের সেইরূপ বিশেষত্ব আছে।" শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার বিশেষত্ব এই, ইঁহার কবিতা, কাব্যরস-রসিত রমণী হৃদয়ের মধুর উচ্ছ্বাস। কোন কোন মহিলা-কবি, কেবল কাব্য রচনার নামে, পুরুষ কবিদিগের অনুকরণ করিতেছেন, দেখিতে পাই। কিন্তু কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রীর ন্যায়, নগেন্দ্রবালার কবিতা তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মোক্তি। পুরুষের কল্পনায় যে সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না, এবং যাহা কামিনীর কল্পনা-নয়নে পরিস্ফুট, মহিলাকবিগণ যদি সকলেই তাহাই চিত্রিত করিতেন, তাহা হইলে পুরুষ পাঠকেরা অশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন। পুরুষ-কবি বালবিধবার দুঃখ দেখিয়া গাইয়াছেন;—

> কাড়িয়া লয়েছে কবরী কঙ্কণ,
> হার বাজু বালা দেহের ভূষণ;
> অনন্ত দুখিনী বিধবা নারী।

আবার অন্যত্র;—

> রাহুগ্রাসে শশধর, নক্ষত্র পতন,
> যখনি দেখিব, হায় করিব স্মরণ
> বিধবা নারীর মুখ। হায়রে বিদরে বুক!
> ইচ্ছা করে জন্মশোধ দেশত্যাগী হইরে!
> ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ওইরে।

এ সঙ্গীতে আমরা চিরদিন মুগ্ধ। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, 'বালবিধবা' কবিতায় লিখিয়াছেন;—

> তব প্রেমামৃত দিয়া ও বুকের কালি
> করুণা করিয়া দেব দেও গো মুছিয়া।
> ভরে দাও ও হৃদয় প্রেম শান্তি ঢালি,
> জগত মোহিত হোক্ ও পদ চুমিয়া।

ইহাই বিধবার জন্য সহৃদয়া রমণীর প্রার্থনা। কবির অমিয়-গাথা অমিয় ক্ষরণ করিতেছে।

১৪। বসন্ত-গাথা।—আসাম এবং উৎকলে বঙ্গ-সাহিত্য যে প্রকার আদৃত, তাহাতে তৎপ্রদেশীয় সাহিত্যের অনুসন্ধান লওয়া, আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিছুদিন হইল কয়েকখানি ওড়িয়া কবিতা সমালোচনার জন্য পাওয়া গিয়াছে। প্রথমখানি শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও প্রণীত বসন্তগাথা। মধুসূদন রাও মহাশয়ের কবিতা, ভারতীর শুভ্র পুণ্যপ্রভাময়ী জ্যোতি-প্রভাসিতা। এ বসন্ত গাথায়, চপল প্রেমিকের চিত্ত-চাঞ্চল্য নাই। কুসুমিত হৃদয় কুঞ্জে, "অমৃত সঙ্গীতময়ী" "বিশ্বপ্রসবিনী" বাণীর যে মঙ্গলগীতি ধ্বনিত হয়, এই গাথাগুলি সেই ধ্বনি-সম্ভূত। বসন্তগাথা উৎকল সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন করিবে, সন্দেহ নাই।

১৫।১৬।১৭।১৮ ১৯ ও ২০। অল্প সময়ের মধ্যেই বাবু নন্দকিশোর বল অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। উপযোগী বিষয় লইয়া ইঁহার কবিতা রচনা করিবার ক্ষমতা আছে। পল্লীচিত্র, বসন্ত কোকিল, নির্ঝরিণী, সীতা বনবাস এবং কৃষ্ণকুমারী, এই কয়েকখানি পুস্তকই সুপাঠ্য হইয়াছে। নির্ঝরিণীর 'নববর্ষা ভাবনা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতার অনুকরণে লিখিত।

২১। বিজয়িনী কাব্যম্।—শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। এই অভিনব সংস্কৃত কাব্য দ্বাদর্শ সর্গে সমাপ্ত। ইহাতে বিজয়িনী ৺মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চরিত প্রধানতঃ বর্ণিত হওয়ায় ইহার নাম "বিজয়িনী-কাব্যম্।" ইহার ১ম সর্গে ইংরাজ জাতির স্বভাব চরিত্র; ২য় স্বর্গে মহারাণীর বাল্যজীবন ও রাজ্যাভিষেক; ৩য় স্বর্গে মহারাণীর বিবাহাদি; ৪র্থ সর্গে মহারাণীর গার্হস্থ্য জীবন, ভারত-শাসন ও পতিবিয়োগাদি; ৫ম সর্গে আফ্রিকা ও বুয়র যুদ্ধের কথা; ৬ষ্ঠ সর্গে মহারাণীর স্বর্গারোহণ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি; ৭ম সর্গে মহারাণীর তিরোভাবে কবির বিলাপ; ৮ম সর্গে ৭ম এডওয়ার্ডের সিংহাসনারোহণ; ৯ম সর্গে মহারাণীর জন্য ভারতবাসীর শোক ও নবরাজের ঘোষণা; ১০ম সর্গে লণ্ডন বর্ণন; ১১শ সর্গে ইংলণ্ড বর্ণন; ১২শ সর্গে ভারতবর্ষ ও ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা প্রভৃতি বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সংস্কৃত ভাষায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ সুকবি। সরল ও সুললিত সংস্কৃত শ্লোক রচনায় ইহাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে অধুনা মৃতভাষা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এ অমরভাষার মৃত্যু নাই, ইহা সর্ব্বকালেই অমর। এই সনাতন ভাষা কখনও প্রকট, কখনও অপ্রকট ভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে। যাঁহারা এই দেবভাষার সেবা করেন, ইহাতে কাব্যাদি রচনা করেন, তাঁহারা আমাদের চির-পূজ্য। বিজয়িনী কাব্যের রচয়িতাকে আমরা অন্তরের সহিত সাধুবাদ দিতেছি।

২২। উদাসী।—প্রথম খণ্ড। আহ্‌মদী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আব্দুল হামিদ খান্ ইউসফজয়ী কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ২৲।

এই পুস্তক খানি বাঙ্গালার জনৈক অকৃত্রিম হিতৈষীর জীবন-ইতিহাস বলিলে ঠিক বলা হয়। লেখক বলেন—

"অন্যের মনপূত ও চিত্তরঞ্জক হইবে, এমন খেয়াল ও পছন্দ সই করিয়া আমি এ পুস্তক লিখি নাই। আমার নিজ মনের ভাবে নিজ পছন্দ সই করিয়া যা কিছু লিখিয়া থাকি। কেহ আমার গ্রন্থ পড়িয়া তুষ্ট হইবেন, সে আশাও কখনও করি না; আর অসন্তুষ্ট হইয়া নিন্দা করিবেন, সে ভয়ও কিছু রাখি না।"

এইরূপ স্বাধীন মন্তব্যের পর আর কোন কথা বলা চলে না। সরল ভাবে ভাব প্রকাশ করিবার গ্রন্থকারের খুব ক্ষমতা আছে। স্বাধীনতা যে গ্রন্থকারের মূলমন্ত্র, তাঁহার লেখার মৌলিকতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। লেখার দোষ ক্রটী যথেষ্ট আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে গ্রন্থকার যে উচ্চভাবের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।

২৩। ঈদল আজ্‌হা। শ্রীযুক্ত নওয়ারআলী চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১৲। গ্রন্থকার সুধাকরে "ঈদকাহিনী" নাম দিয়া

যে প্রান্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই "ঈদল আজ্‌হা" নামে প্রকাশিত। ইহার যে অংশ কোরাণ শরিফের টীকায় প্রকাশ নাই, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। মুসলমান-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ এ পুস্তক পড়িয়া বিশেষ উপকার পাইবেন। প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত।

২৪। যুগান্তর।—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম-এ প্রণীত; ২য় সংস্করণ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; মূল্য ১৷০। প্রথম সংস্করণে আমরা এ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলাম। এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। ছাপা পরিপাটী, কাগজ উৎকৃষ্ট।

২৫। শুশ্রূষা।—দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীশ্যামাচরণ দে প্রণীত। এ পুস্তক খানিরও প্রথম সংস্করণে আমরা বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলাম। এ পুস্তক খানি গৃহী মাত্রেরই গৃহপঞ্জিকার ন্যায় উপকারে আসিবে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম অপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে।

২৬। অমৃত-সাগর।—শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামিকৃত। শ্রীমোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত; মূল্য ১৷৷০। নব্যভারতের পাঠকগণ পরমহংস দেবের অনেক উপদেশ পাঠ করিয়াছেন। এইরূপ নির্ভীক ও উদার-হৃদয়, কুসংস্কার-বর্জ্জিত, বুজরুকিহীন মহাসাধকের উপদেশ পাঠে কাহার না উপকার হইবে? উপদেষ্টা যদি বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপ জানিতেন, তবে ভাষাগত এবং ভাবগত যে সকল দোষ এ পুস্তকে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা থাকিত না, আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। উপদেষ্টার ঐকান্তিক শুভ ইচ্ছা, আন্তরিকতা, ভাব-গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আমরা মোহিত। বঙ্গগৃহ অমৃত-সাগরের উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া যাক্।

২৭। তমোলুক ইতিহাস।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ৸০। এই পুস্তকের অধিকাংশ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, শেষ অধ্যায়টী কেবল নূতন সংযোজিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য অংশগুলি সংশোধিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকাকারে তমোলুকের ইতিহাস দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। নব্যভারতের সহিত এই পুস্তকের বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলে বিস্তৃত সমালোচনা করিতাম। আমরা আশা করি, এ পুস্তকের বিশেষ আদর হইবে।

২৮। দীপালী। ২৯। গান। শ্রীপ্রথমনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রমথ বাবু সম্বন্ধে নব্যভারতে অনেক কথা লেখা হইয়াছে। সুতরাং আর অধিক লেখা সমীচীন নহে। আমরা দীপালী হইতে একটী কবিতার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, গ্রন্থকার দিন দিন ভাব-রাজ্যে কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছেন। এরূপ সুরুচি সঙ্গত কবির কাব্য অক্ষয় হউক এবং লেখনীতে দেবতাদিগের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

আত্ম পরিচয়।

"হে বঙ্গ-রূপসী, আমি তোমাদেরি
আপনার গৃহ-কবি!
মনের হরষে আঁকি বসে বসে
তোমাদের শত ছবি;
কোনটি অরুণ, কোনটি করুণ,
সবি আমি ভালবাসি;
মানস-আগারে ধরে না আমার
সে অসীম রূপরাশি।
নীরব নিশীথে ভাব-সমাধিতে
বসি যবে মহা ধ্যানে,
সহসা উছসি ভরি উঠে বুক
তোমাদের জয় গানে।
মহিমার মাঝে ডুবায়ে তুলিকা
আঁকি বসে মায়া-ছবি;
হে বঙ্গ-রূপসী, আমি তোমাদেরি
আপনার গৃহ-কবি!
বাসর যাপিতে যাও যবে ধীরে
অধীর বধূর বেশে,
হৃদি-স্তরে স্তরে তরঙ্গের পরে
তরঙ্গ পড়িছে হেসে;
উঠে কি না উঠে সলাজ চরণ!
আঁকি বসে সেই ছবি;
হে বঙ্গ-রূপসী, আমি তোমাদেরি
আপনার গৃহ-কবি!!"

ইত্যাদি।

ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা।

হিন্দু এবং খ্রীষ্টীয় উভয় শাস্ত্রেরই মত এই যে, মানুষ বিধাতার অনুকরণে গঠিত; পরমেশ্বর মানুষকে ব্রহ্মলাভের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই হেতু মানবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানবপ্রকৃতিতে স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ভাবের বীজ নিহিত করিয়াছেন, নচেৎ আদৌ ধর্ম্মভাব-পরিশূন্য মানব ব্রহ্মলাভ করিবে কিরূপে? প্রকৃতিদত্ত ধর্ম্মভাবের পরিচালনে মানুষ বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ উপলব্ধি করিয়া পূর্ণব্রহ্মের অনন্ত বিশালতায় নিজের অসম্পূর্ণতা বিলীন করিতে সক্ষম হয়। মানবজীবনের উদ্দেশ্য —পূর্ণ মনে, পূর্ণ অন্তঃকরণে, পূর্ণ শক্তিতে প্রেমাধার পরব্রহ্মকে ভালবাসিয়া তাঁহার অনন্ত অস্তিত্বে নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব মানুষ সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে। এই মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের সৃষ্টিমূলে আছে বলিয়াই, আমরা ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত সৃষ্ট বলিয়াই, আমরা জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির অধিকার পাইয়াছি, তৎসমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায়তা বিধান করে এবং স্বতঃ আমাদিগকে ব্রহ্মনিষ্ঠার দিকে প্ররোচিত করে। ব্রহ্মলাভের সাধনোপায় ধর্ম্ম আমাদের প্রকৃতি নিহিত না হইলে বিধাতার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইত। তাই ধর্ম্ম আমাদের প্রকৃতি, অধর্ম্ম বিকৃতি। কিন্তু ধর্ম্মের নৈসর্গিকতা সম্বন্ধে, মানবমনের ধর্ম্মপ্রবণতা উহার প্রাকৃতিক গঠনের ফল কি না, তৎসম্বন্ধে, আজকাল অনেকেই বিশেষ সংশয়যুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকতার আস্ফালনে দেশ ঘোর আলোড়িত, শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণতঃ যে কোন বিষয়ের স্থিতিমূলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির চাক্ষুষ অবলম্বন দেখিতে না পাইলে আস্থা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ। কিন্তু ধর্ম্মজগতের তত্ত্ব সকল জড় জগতের তত্ত্বের ন্যায় কেবল বাহ্যিক প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি (experiment) দ্বারা পরীক্ষণীয় নহে। বিশ্বাসী ব্যক্তি স্থির চিত্তে ক্রমাগত অনুধাবন করিয়া ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন। আজকালকার প্রত্যক্ষবাদী (Positivists) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজ্ঞানবাদী (Sensationalists) শূন্যবাদী (Nihiiists) প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর অনাত্মবাদীগণ (Materialists) মানুষের সহজ ধর্ম্মবিশ্বাস পুরুষ-পরম্পরা-সঞ্চিত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু মানসিক বৃত্তি, চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি মানবপ্রকৃতির বিবিধ উপদানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহারা সকলেই আমাদিগকে স্বভাবতঃ ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রণোদিত করে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোধে উত্তেজিত করে। নিম্নে আমরা মানবের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কয়েকটী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া দেখিব, ধর্ম্মের অঙ্কুর যে মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত, তৎসম্বন্ধে কোন পরিচয় পাওয়া যায় কিনা।

(১) প্রথমতঃ আমরা মানবের বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

দেখিতে পাই, উহার ভিতরে ধর্ম্মের অঙ্কুর বর্ত্তমান রহিয়াছে। ধর্ম্মনির্ণয়ের নিমিত্ত আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিকাশ প্রাপ্ত বুদ্ধি-বৃত্তির প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে উহা আপনা হইতেই আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে ধর্ম্ম-ভাবের দিকে পরিচালিত করে। বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক মূল কার্য্য এই যে. উহা মানুষকে সকল বিষয়ের কারণানুসন্ধানে প্রণোদিত করে। জ্ঞানলাভ করিবার পূর্ব্বে, বুদ্ধি পরিপক্ব না হইতেই, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু খেলার পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলে, উদ্দেশ্য পুতুল মুখ নাড়িতেছে—তাহার কারণ আছে কি না অনুসন্ধান। পুতুলের অঙ্গচালন হইতেছে কিরূপে? এই কারণানুসন্ধানের পিপাসা শিশুর এত প্রবল যে, সে সাধের পুতুল ভাঙ্গিয়া দেখিতেছে, উহার অভ্যন্তরে মাথা নাড়িবার কোন কারণ বিদ্যমান্ আছে কি না। এইরূপে শিশু চারিদিকের বস্তু দেখিয়াই তৃপ্ত হয় না, সে প্রতি বস্তুর মূল আবিষ্কার করিতে সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। যাঁহারা শিশু-সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কোন নূতন বস্তু নেত্রপথে পড়িলে অবোধ শিশু সঙ্গীকে প্রশ্নপরম্পরায় কিরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। যে কোন বস্তুর কর্ত্তা কে, ঐ কর্ত্তার কর্ত্তা কে, উহার আবার কর্ত্তা কে, এইরূপ প্রত্যক বস্তু সম্বন্ধে শিশু কর্ত্তার উপর কর্ত্তার খোজ লইতে লইতে মূল কর্ত্তার সন্ধান পাইতে মহাব্যগ্র। শিশু বৃদ্ধ মানুষ মাত্রই স্বাভাবিক বুদ্ধি (instinct) বশতঃ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলারহস্য কি, ইহার কর্ত্তা কে এবং যে পর্য্যন্ত সে সমস্ত বিশ্বের শৃঙ্খলা-বিধায়ক এক আদি মূলকর্ত্তা আছে, এই জ্ঞানে না উপনীত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার চিত্ত স্থির হয় না। অতএব দেখিতেছি, ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিতে নিহিত, উহা আপনা হইতেই আমাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পরিচালিত করে। স্বাভাবিক বুদ্ধি আমাদিগকে কিরূপে ঈশ্বরজ্ঞান প্রদান করে, তাহা বুঝিবার আমাদের আর একটী সুন্দর উপায় আছে। বুদ্ধি যেরূপ আমা-দিগকে প্রতি বস্তুর মূল বা কারণ অন্বেষণে স্বতঃপ্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ আবার বিবিধ বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য বিচারে উত্তে-জিত করে। বিভিন্ন বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ বিচারের প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যেও দেখা যায়, শিশু যখনই কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ করে, তখনই উহার সহিত পূর্ব্বদৃষ্ট কোন পদার্থের ঐক্য আছে কি না, উভয়ে এক জাতীয় কি না, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে। অনে-কেই দেখিয়াছেন, বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করিয়া বুঝাইলে, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোন রূপ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে, বস্তু সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান পরিষ্কার হয়। এক বস্তু দেখিয়া অন্য বস্তুর সহিত উহার মিল দেখা-ইতে না পারিলে শিশুর মন কখনও পরি-তৃপ্ত হয় না। আমরা নানা বস্তু দেখিয়া, উহারা সকলে কোন এক বিশেষ নিয়মের অধীনতায় পরস্পর-সম্বন্ধ-পূর্ণ, যখন ইহা বুঝিতে পারি, তখন আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হয়। বিচিত্রতার মধ্যে যতই আমরা ঐক্য অনুমান করিতে পারি, ততই আমাদের তৃপ্তি বোধ হয়, ইহা আমাদের প্রকৃতি। এই বৈষম্যের ভিতরে সাম্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি আমাদিগকে সহজে ব্রহ্মজ্ঞানে পরিচালিত করে; আমরা বুঝি যে, এই বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত বিচিত্রতা এক সর্ব্বশক্তিময় সর্ব্বাধার সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে

উদ্ভূত ; তাই সকল পদার্থ বিভিন্ন হইলেও পরস্পর সম্বন্ধবান্। অতএব দেখা গেল যে, আমাদের মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তি স্বতঃই আমাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রণোদিত করে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে উত্তেজিত করে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, বিবেকের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মাধ্যাকর্ষণাদি যেরূপ জড়জগতে, ধর্ম্ম সেইরূপ মানব প্রকৃতিতে একটী নৈসর্গিক নিয়ম। বিবেকের নীরববাণী আমাদের অন্তরে অজ্ঞাতসারে এই জ্ঞানের সঞ্চার করে যে, অনেক কার্য্য ন্যায্য, অনেক কার্য্য অন্যায় ; যাহা ন্যায্য তাহা কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে আমাদের উপর যে এক শাসনকর্ত্তা আছেন, তিনি শাস্তি বিধান করেন এবং ন্যায় অন্যায়ের এক বিচারকর্ত্তা আছেন ; যিনি মহোচ্চ মানব শক্তির উপর কর্ত্তৃত্বশীল। সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপ্রণেতা পরমেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়া বিবেক আমাদের অন্তরে ঐশী-আজ্ঞা প্রচার করে। বিবেক অন্তরে যে ভাবের উদ্রেক করে, উহা অদৃশ্য ব্রহ্ম-আদেশ। তাই বিবেকের অনুজ্ঞাবিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বনে মানুষ এত শঙ্কিত, যেহেতু মানুষের এই সাধারণ জ্ঞান আছে যে, এরূপ করিলে ব্রহ্ম-আজ্ঞার লঙ্ঘন হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা অপরিহার্য্য। বিবেক একটী নৈসর্গিক মনোবৃত্তি ; ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য, ন্যায়ের অবশ্যকরণীয়তা, সর্ব্বোচ্চ পরমেশ্বরের সর্ব্বোপরি ন্যায়দৃষ্টি ও বিচার প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্ব ইহার মূল প্রণোদন। বিবেক আমাদের ঈশ্বর-নিয়োজিত নিত্য-সহচর ধর্ম্মোপদেষ্টা। প্রলোভনময় জীবন-পথে আমাদের প্রতিপাদ বিক্ষেপ বিপদাত্মক, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে বিবেকের অনুবর্ত্তিতা আমাদের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক সহজ উপায়। এ উপায় প্রকৃতিলব্ধ, সুতরাং মানুষ মাত্রেরই,'শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই অধিকারগত। এইক্ষণ, এই ধর্ম্মতত্ত্বের মূলাশ্রয় বিবেক মানবপ্রকৃতিতে মূলতঃ বর্ত্তমান্, না উহা শিক্ষাদির পশ্চাদুৎপন্ন সুফল, তৎসম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সন্দিহান আছেন। কিন্তু যাঁহারা বিবেকের স্বাভাবিকতায় সন্দেহ করেন, তাঁহাদের মানবপ্রকৃতির অন্তর্দর্শন অতি সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। হব্‌স্ (Hobbes) প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে আত্মপ্রিয়তাই (Self-love) মানবের মূল প্রকৃতি, ধর্ম্ম মানুষের আত্মহিত-সাধনের সহায়তা করে বলিয়া আদৃত। পরোপকার প্রভৃতি বিবেকানুমোদিত সৎকার্য্য সকল মানুষ কেবল আত্মহিতের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে এই মতটী খাটিতে দেখা গেলেও, মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে এই স্থূল বিচার ভ্রমাত্মক। সকল কার্য্যের মূলেই যদি আত্মচিন্তা থাকিবে, তবে বুদ্ধিমান্ লোক নিজের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও কেন পরের জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে ? দধিচি মুনি যখন জানিলেন, নিজের অস্থি প্রদান করিলে লোকের শান্তিরক্ষা হয়, তিনি অমনি তাহাই করিলেন, জীবনদান করিয়া নিজের কি সুখোৎপত্তির সম্ভাবনা ? আত্মপ্রিয়তাই (egoism) মানুষের মূলপ্রকৃতি নয়, পরার্থপরতা (altruism) শুধু স্বার্থানুসন্ধানের গৌণ ফল নয়। মানুষের স্বভাব স্বার্থলিপ্সা এবং পরার্থপরায়ণতা উভয়ই। পরার্থপরায়ণতা মানবচরিত্রের অতি স্বাভাবিক গুণ বলিয়াই দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে নিতান্ত নিষ্ঠুর স্বার্থান্ধ ব্যক্তিও অন্তর্প্রচ্ছন্ন বিবেকের

অজ্ঞাত সঞ্চালনে ক্ষণেক'আত্মচিন্তা পরিহার করিয়া পরার্থ-সাধন করে। শিক্ষা-সংসর্গাদি দ্বারা বিবেকের উৎকর্ষ সাধিত হয় ও উহা সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে, কিন্তু বিবেক একটী স্বভাবজাত মূল পদার্থ। বিবেক শক্তির স্বাভাবিকতা-বিরোধী ও প্রমাণ-নিরপেক্ষ-জ্ঞানে (intuitional knowledge) অবিশ্বাসী মিল (John Stuart Mill) প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদীগণ (Experientialists) বলেন যে, অভিজ্ঞতা (Experience) আমাদিগকে নানা অনুষ্ঠানে সঞ্চালিত করে। যখন কোন কার্য্য করিয়া দেখি যে, উহা আমাদের হিতকর, তখন আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই এবং এই অনুষ্ঠান ক্রমশঃ আমাদের অভ্যাসগত হইয়া দাঁড়ায়। আমরা প্রথমতঃ কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিয়া থাকি, পরে উদ্দেশ্য ভুলিয়া কার্য্যটী স্বতঃই সুখপ্রদ জ্ঞান করিয়া উহার অনুষ্ঠান করি। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, অর্থ দ্বারা জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ ঘটে, অতএব সুখভোগের উদ্দেশ্যে আমরা অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু কিছুকাল পরে আমাদের মনে হয়, অর্থোপার্জ্জন এই ক্রিয়াটীই সুখকর, তখন নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া ধনাধিকারের অবস্থাকেই পরম সুখকর মনে করি ও প্রবল ধনতৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া যে কোন প্রকারে হউক, ধন সঞ্চয়ে বিব্রত হই। এইরূপ মানুষে প্রথমে অভিজ্ঞতাবশতঃ সুখবিধায়ক কোন ভাবী উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া তৎসাধনের উপায়স্বরূপ কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করে; পরে উপায়স্বরূপ কার্য্যটীতেই সুখ অবস্থিত বোধ করিয়া মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বহুদূর সরিয়া পড়ে এবং উপায়কেই উদ্দেশ্য মনে করিয়া বারম্বার উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ও উহা ক্রমে অভ্যাসগত হইয়া যায়। হিতনীতির (utilitarian principles) আলোচনে আমরা বুঝি যে, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আমাদের বাস্তবিক কল্যাণসাধক। এই কল্যাণ সাধনরূপ উদ্দেশ্য গোড়ায় রাখিয়া আমরা উদ্দেশ্য সাধনের উপায়বোধে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি। এইরূপে অভিজ্ঞান-উদ্গত হিতনীতি আমাদিগকে সদনুষ্ঠানে পরিচালিত করিলে পর, আমরা পশ্চাৎ মনে করি যে, সদনুষ্ঠান অন্য গৌণ উদ্দেশ্যবিহীন, উহা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় আসিলে সদনুষ্ঠান স্বতঃকর্ত্তব্য আমরা বোধ করি এবং বারবার উহা করিতে করিতে উহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়। অতএব বিবেকানুমোদিত সাধুকার্য্য সকল মূলতঃ স্বাভাবিক নয়, মূলতঃ উহারা অভিজ্ঞতাজাত উদ্দেশ্য মূলক, কিন্তু পশ্চাৎ স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি যাহা বলা হইয়াছে, বোধ হয় তাহাতেই এই স্বাভাবিকতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া কিঞ্চিৎ বুঝা গিয়াছে। সুতরাং দেখা গেল, মিল প্রভৃতির মতে সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজক যে বিবেক, উহা কোন প্রকৃতি-নিহিত স্বাভাবিক পদার্থ নহে, উহা অভিজ্ঞতা অনুষ্ঠানাদির উৎপন্ন নূতন সংস্কার; উহার বিশেষত্ব এই যে, উহা মূলতঃ স্বাভাবিক না হইলেও পরে স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার ক্রিয়া স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। উদ্দেশ্য ও উপায়ের সাহায্যে (law of association) উদ্দেশ্য হইতে উপায়ে পরিবর্ত্তন (law of transference) প্রভৃতি কয়েকটী স্থূল নিয়মের কার্য্যে এই বিবেকের উৎপত্তি হয়। সূক্ষ্মবুদ্ধি দার্শনিকের এই বিবেকের প্রকৃতি বিচার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

মার্টিনো (James Martineau) প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকগণ এই মতের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং পরে সত্যের আলোচনা করিয়াছেন। মিল প্রভৃতির অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি আছে, কিন্তু তাহার অবতারণা এই সঙ্কীর্ণ স্থানে অসম্ভব। আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি, বিবেক আমাদিগকে যে সকল সৎকার্য্যে প্রণোদিত করে, তাহা অনেক স্থলেই-অভিজ্ঞতা অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না এবং উহার মূলে উদ্দেশ্য বর্ত্তমান্ থাকা অসম্ভব। কিন্তু পার্কার যখন (Theodore Parkar) কচ্ছপ মারিতে উদ্যত হইলেন, তখন বিবেক তাঁহাকে অন্তর হইতে নিষেধ করিল এবং তিনি অন্যায় কার্য্য করিতে পারিলেন না। অতি ক্ষুদ্র শিশুর এই অসদাচরণে বিরতি কোন প্রকারেই অভিজ্ঞতার ফল নহে, উহা বিবেকের স্বাভাবিক শাসন। বিবেক যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বস্তু এবং উহার শাসন যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাহা বিবিধ উদাহরণে পরিষ্কাররূপে দেখান যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, বিবেক আমাদের অনুষ্ঠানের উপর যে শাসন বিস্তার করিয়া আছে, উহা প্রকৃত পক্ষে সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসন। এই মতটী যে একেবারেই ভ্রমাত্মক, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে, অনেক স্থলে পাপাচারীগণ সমাজ কিম্বা রাজকর্ত্তৃক ধৃত হয় না, কিন্তু তথাপি অন্তরে পাপানুষ্ঠান হেতু ভয়ানক তীব্র জ্বালা অনুভব করে, এ যাতনা বুঝি সামাজিক যাতনা হইতেও ভয়ঙ্কর! যদি সমাজ ও রাজশাসনের উপর পৃথক বিবেকের শাসন বর্ত্তমান না থাকিত, তবে যে ব্যক্তি সমাজে ও রাজসমীপে সম্মান ভাজন, সে দ্বিতীয় ব্যক্তির অলক্ষ্যে আপন নীরবে পাপাচরণ করিয়া অহর্নিশ অশান্তি অনলে পুড়িয়া মরে কেন? অতএব বিবেকের শাসন সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসন হইতে স্বতন্ত্র। শুধু এ পর্য্যন্ত বলা যায়, সমাজশক্তি বা রাজশক্তি বিবেক বিধির অনুবর্ত্তী হইলে সবল হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে। এইক্ষণ দেখা গেল, যাঁহারা বিবেকের নৈসর্গিতা ও তদুত্তেজিত ধর্ম্মের নৈসর্গিকতায় সন্দেহ করিয়া, বিবেকের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্বন্ধে নানারূপ ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের যথেচ্ছ কাল্পনিক মত ভ্রান্ত। বিবেক বাস্তবিক কোন পরবর্ত্তী উৎপন্ন পদার্থ (after-growth) নহে, উহা মানবের জন্মগত জীবনীশক্তির ন্যায় সাধারণ অধিকার। মানুষ যেরূপ জন্মের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই জীবনীশক্তি লাভ করে এবং তাহার নিজের যত্ন বা অবহেলায় পশ্চাতে উহার বিকাশ বা নিস্তেজতা ঘটে, সেইরূপ মানুষ জীবনের আদি মুহূর্ত্ত হইতে বিবেকশক্তির অধিকারী হয় এবং তাহার নিজের তদধীনতা বা অনাদর উহার ঔজ্জ্বল্য বা পরিম্লানতা ঘটায়। বিবেক প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত হইয়া মানবের অন্তরে স্বভাবতঃ ধর্ম্মভাবের উদ্রেক করে; অতএব ধর্ম্মশীলতা মানবের প্রকৃতি, ধর্ম্মহীনতা বিকৃতি। যাঁহারা যুক্তিতর্কের সমর্থনাভাব হেতু সহজাত ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা বিবেকের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে কোন প্রচ্ছন্ন কারণ-প্রসূত গৌণফল বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল প্রয়াস বিফল হইয়াছে। যাহা হউক, বিবেকের কথা ছাড়িয়া দিয়া মানবের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিগুলির আলোচনা করি-

লেও দেখা যায় যে, আমাদের প্রকৃতিই আমাদিগকে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করে।

(৩) সম্প্রতি অতি সংক্ষেপে দেখা যাক, মানবহৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিগুলি কিরূপে মানবের অন্তরে ধীরে ধীরে স্বতঃ ধর্ম্মভাবের উন্মেষ করে।

মনুষ্যের হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম পিতামাতার প্রতি প্রীতি ও ভক্তির ভাব জাগরিত হয়। পিতামাতার অকৃত্রিম দয়ামায়া শিশু সন্তানের অন্তরে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভালবাসার উদ্রেক করে। শিশু সাক্ষাৎ পিতার স্নেহকরুণাতে ডুবিয়া তাঁহাকে ভালবাসে, এবং স্নেহময় প্রত্যক্ষ পিতার উপরে আর এক অসীম-স্নেহাধার পিতার পিতা আছেন, এই সাধারণ জ্ঞান ধারণ করিয়া শিশু স্বর্গস্থ পরম পিতার অসীম করুণা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। সাক্ষাৎ পিতার প্রতি ভালবাসা শিশুকে স্বর্গস্থ পিতার প্রতি অনুরক্ত করে। সুতরাং পিতৃভক্তির যে ভাব মানবহৃদয়ে প্রথম উন্মেষিত হয়, উহা মনুষ্যকে পরমপিতা পরমেশ্বরের দিকে লইয়া যায়।

মানবপ্রকৃতির আর একটী স্বাভাবিক ভাব অনুমোদন প্রভৃতি। ইহাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়তা করে। কোন নিঃস্বার্থ পরোপকারের কার্য্য দেখিলে, আমাদের স্বভাব এই যে, আমরা উহার অনুমোদন করিয়া আনন্দানুভব করি। কোন ব্যক্তিকে লোকহিতকর সাধুকার্য্যে নিযুক্ত দেখিলে তদ্দর্শনে ঐ সদনুষ্ঠানের অনুমোদন করিয়া চিত্ত স্ফীত না হয়, এরূপ সম্পূর্ণ নীতিবিহীন ব্যক্তি সংসারে আছে কিনা সন্দেহ। জন হাওয়ার্ড, ফাদার দামিয়েন্ প্রভৃতি জগৎহিতৈষীগণ যে রূপ নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়া মানবসেবার চমৎকার সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, ঐরূপ সৎকার্য্যের অনুমোদন করিয়া চিত্ত প্রসারিত না হয়, এরূপ লোক পৃথিবীতে বর্ত্তমান্ আছে, কল্পনা করাও কঠিন। মানুষের প্রকৃতি এই যে, মানুষ অপরের সাধুতা দেখিলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার অনুমোদন করে। অপরের মঙ্গলেচ্ছা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদির সহিত সহানুভূতি ও তাহার অনুমোদন আমাদের অন্তরে স্বভাবতঃ ধর্ম্মভাবের উদ্রেক করে। সাধু কার্য্যের অনুমোদন প্রবৃত্তি আমাদিগকে অনুরূপ সাধু অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করে। সাধুতার অনুমোদন-স্পৃহা হইতে আমাদের অন্তরে এই ভাব জাগ্রত হয় যে, মানুষে যে সাধুতা ও মঙ্গলেচ্ছা পরিদৃষ্ট হয়, সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর তাহার মূল কারণ, যাঁহার অসীম নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমের তুলনায় মানবের সমস্ত সাধুতা ছায়া মাত্র।

অপর আর একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রবল সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ধর্ম্ম আমাদের সহজাত অধিকার। মানুষের প্রকৃতিই এই যে, মানুষ সর্ব্বদাই যাহা নিজ হইতে উচ্চ তাহার সমাদর করে, যাহা বোধাতীত উন্নত তাহার প্রতি সম্মানসূচক বিস্ময় প্রকাশ করে, যাহা মহৎ প্রতাপান্বিত, তাহার পূজা করে। হিংসাপরবশ হইয়া বাহিরে মহতের সম্মান করিতে মানুষ কুণ্ঠতা প্রকাশ করিলেও, অন্তরে মানুষমাত্রই মহতের প্রতি সম্মানশীল হয়। বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, আমরা যতই কেন প্রকৃত স্বভাবের গোপনে সচেষ্ট না হই, কিন্তু মহত্ত্ব পরিদর্শনে স্বভাবতঃ আমাদের অন্তরে যে ভক্তির ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহা বাহ্য লক্ষণে পরিব্যক্ত হয়। মহত্ত্বের পূজা মানবের প্রকৃতি।

আমাদের হৃদয় পূজা করিবার নিমিত্ত গঠিত এবং সর্ব্বদাই পূজার উপযুক্ত বস্তুর অন্বেষণে অনুসন্ধানশীল। পৃথিবীতে যাহা সচরাচর লক্ষ, যাহাতে ক্ষুদ্রতা, অসম্পূর্ণতার পরিচয় বর্ত্তমান্, তাহা সাধারণতঃ আমাদের ভক্তি আকর্ষণ করে না এবং আরাধনা প্রবৃত্তির উদ্রেক করে না। সুতরাং সাধারণ বস্তু হইতে উচ্চতর মহত্বের আদর্শের কল্পনা করিয়া মানুষ তৎপ্রতি ভক্তিশীল হয় এবং যাহা অসীমত্বের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া আছে, যাহাতে সর্ব্বোচ্চ মহত্বের নিদর্শন বর্ত্তমান, মানুষ তাহার আরাধনে পূর্ণান্তঃ-করণে প্রস্তুত হয়। এই আরাধনা প্রবৃত্তি প্রবল হইলে মানুষকে সর্ব্বদাই এক অসীম অদ্বিতীয় আরাধ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। পূজা বা আরাধনা-প্রবৃত্তি যে মানবজাতির অতি স্বাভাবিক ও প্রবল, তাহার প্রমাণ এই যে, মানুষ সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে, অসভ্যতার যুগেও, প্রবল আরাধনা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা মানসে প্রত্যক্ষ গিরি নদী প্রভৃতি কিম্বা অপ্রত্যক্ষ দৈত্য দানব প্রভৃতির কোন কিছুকে মানবের অদৃষ্ট-বিধায়ক অসীম শক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া এক আরাধ্য বস্তুর কল্পনা করিয়া লইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে ভক্তি বা আরাধনাশীলতা, তাহা স্বভাবতঃ মানবকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করিয়া থাকে।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আমাদের আর একটী স্বভাবজাত ধর্ম্মভাবের মূল কারণ। সৌন্দর্য্য-বোধ ও সুন্দরের প্রতি চিত্তাকর্ষণ মানুষের অতি স্বাভাবিক; এই ভূলোকবাসী এমন কেহ আছেন কি না সন্দেহ, যিনি কোন না কোন রূপে সৌন্দর্য্যের উপাসক নহেন। মানুষ মাত্রই সৌন্দর্য্য সম্প্রাপ্তি ও সৌন্দর্য্য সম্ভোগের লালসাধীন; মানব মনের উপর সৌন্দর্য্যের এরূপ শান্তিশীতল প্রীতিস্নিগ্ধ প্রভাব যে, দুটী ব্যক্তি আকৃতি বা ব্যবহার-গত সৌন্দর্য্যের পরস্পর বিদ্যমানতা অনুভব মাত্র প্রাণের অস্ফুট আহ্বানে পরস্পরের প্রতি প্রীতিবিহ্বল হয়। গার্হস্থ্য জীবনের দৈনিক অভিজ্ঞতা এই, মাতৃক্রোড়বাসী শিশু কোন প্রীতি সুন্দর মধুর মূর্ত্তি দেখিলে অথবা কোমলতাময় সরল ব্যবহার পাইলে হস্তাদি চালন কিম্বা হর্ষব্যঞ্জক দৃষ্টি দ্বারা অপর ব্যক্তির সংসর্গভোগে কামনা প্রকাশ করে, পক্ষান্তরে আবার আকৃতি বা ব্যব-হারের কর্কশতা বিন্দুমাত্র অনুভব করিলে অপর ব্যক্তি সহস্র চেষ্টা করা সত্বেও শিশু তাহার সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনে একান্ত পরা-ঙ্মুখ হয়। বাস্তবিক মানবহৃদয়ের পক্ষে সৌন্দর্য্যের বশবর্ত্তিতা বড় স্বাভাবিক। যাহারা নির্ম্মল রুচির আস্বাদ পায় নাই, কিম্বা যাহাদের অন্য কোন কোমল বৃত্তির উৎকর্ষ হয় নাই, এরূপ অসভ্য হীন দশাপন্ন লোকের মধ্যেও একটা সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য যতই মানুষের চিত্তাকর্ষণ করে, মানুষ ততই জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতে সৌন্দর্য্যের মোহময় আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া পরিতুষ্ট হয়। গিরি, নদী, বন, উপবন, উপত্যকা যেখানেই মানুষ সৌন্দর্য্যের অনুভব করে, সেখানেই তাহার চিত্ত আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে। এই সৌন্দর্য্যলালসা যখন ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উন্মাদিনী শক্তির সহিত মানবের প্রাণ সৌন্দর্য্যপিপাসায় উন্মত্ত করিয়া তোলে, মানুষ তখন সাধারণ পার্থিব সৌন্দর্য্যে সন্তুষ্ট হয় না, তখন মানুষ চারি-

দিকে সৃষ্ট বস্তুতে যে সৌন্দর্য্য, তাহা হইতে উচ্চতর সৌন্দর্য্যের ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যের অন্তরালে অপ্রত্যক্ষ পূর্ণসৌন্দর্যের কল্পনা করে এবং বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্য সেই অপ্রত্যক্ষ অনন্ত সৌন্দর্য্যের ছায়া কল্পনা করিয়া প্রাণ শীতল করে। ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণ যে সৌন্দর্য্য বোধে পরিতৃপ্ত, সেই সৌন্দর্য্যজ্ঞান যখন প্রবলাকার ধারণ করিয়া তদাকাঙ্ক্ষায় মনুষের মন উন্মত্ত করিয়া তোলে, মানুষ তখন চিত্তশান্তির নিমিত্ত সমস্ত পার্থিব সৌন্দর্য্যের মূলে এক অসীম সৌন্দর্য্যাধারের কল্পনা করিতে আপনা হইতেই বাধ্য হয়। অতএব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যবোধ স্বতঃই আমাদিগকে অনন্তসৌন্দর্য্যময় পরমেশ্বরের দিকে পরিচালিত করে।

আমাদের আর একটী স্বাভাবিক বৃত্তি কৃতজ্ঞতা। মানুষের প্রকৃতি এই যে, মানুষ কোন ব্যক্তি হইতে উপকার প্রাপ্ত হইলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার আনুগত্য স্বীকার করে ও প্রত্যুপকার করিতে প্রয়াসী হয়। আমরা দেখিতে পাই, শিশু যে ব্যক্তি হইতে ভালবাসা ও আদর লাভ করে, শিশু তাহাকেই ভালবাসিয়া প্রাপ্ত সোহাগের প্রত্যর্পণ করিতে ব্যগ্র হয়। যে মহাদুর্দ্দান্ত অত্যাচারীকে বশে আনয়ন করা মহাকষ্টকর, এরূপ ব্যক্তিকেও ভালবাসিলে ও তাহার উপকার সাধন করিলে সে আপনা হইতে সহজে অনুগত হয়। এই বিমল কৃতজ্ঞতার প্রবৃত্তি যে রূপশিশু বৃদ্ধ, সভ্য অসভ্য সকল ব্যক্তির মধ্যেই দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বিড়াল কুকুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ইতর জন্তুর মধ্যেও দেখা যায়। সুতরাং এই প্রকৃতি যে অতি স্বাভাবিক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই প্রকৃতিনিহিত প্রবৃত্তি স্বতঃধর্ম্মভাবের উদ্রেক করে। আমরা জন্মিয়া পিতামাতা হইতে, এবং তৎপর অপরাপর ব্যক্তি হইতে নানা উপকার প্রাপ্ত হই ও তৎ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ হই। ব্যক্তি বিশেষের সাহায্য ও উপকার ব্যতীত আমাদের জীবন সংরক্ষণ অসম্ভব, সুতরাং জীবনধারণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কৃতজ্ঞতা শিক্ষার পথ বিস্তৃত হয়। কৃতজ্ঞতার প্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়, তখন উহার প্রণোদনে স্বভাবতঃ আমাদের মনে এই ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয় যে, মানুষ আমাদের যতই উপকারক হউক, সকলের উপরে আমাদের এমত এক মহান্ উপকারী আছেন, যাঁহার নিয়ত করুণা আমাদিগকে জীবনধারণে সক্ষম করিতেছে এবং যাঁহার বশ্যতা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

মানবহৃদয়ে যে সকল বিভিন্ন ভাবের স্বাভাবিক অবস্থিতি, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহারা সকলেই আমাদিগকে স্বতঃ পরমব্রহ্মের পূর্ণসাধুতায় অনুপ্রাণিত হইবার ক্ষমতা প্রদান করে। হৃন্নিহিত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি, আমাদিগকে পার্থিব বস্তু নিচয়ের অন্তরালে এক অসীম অদ্বিতীয় সর্ব্বগুণাধারের বর্ত্তমানতা কল্পনা করিতে স্বভাবতঃ প্রণোদিত করে এবং উহাই ধর্ম্মের স্বাভাবিক সূচনা।

(৪) মানব প্রকৃতির নানা দিক পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ধর্ম্মশীলতা মানুষের স্বভাব। আমাদের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার বিশদ আলোচনার স্থানাভাব, অতএব আর যৎকিঞ্চিৎ মাত্র আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মানব-প্রকৃতির

অপর দুইটী কেন্দ্রস্থলীয় বিশেষ ভাব এই—সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির উৎকট বাসনা—এই দুইটী নৈসর্গিক ভাব মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানে উন্নমিত করিতে বিশেষ ভাবে উপযোগী। মানুষমাত্রেরই অন্তরে সুখভোগের প্রবল তৃষ্ণা সর্ব্বদা বিরাজিত। মানুষ সুখান্বেষণে বিবিধ পথ অবলম্বন করিয়া দেখে, পার্থিব কোন সুখই চিরন্তন তৃপ্তিদায়ক নহে, উহা কেবল সাময়িক উত্তেজনার পরিতৃপ্তি সাধন করে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার নূতন সুখের অনুসন্ধানে উত্তেজিত করে। মানুষ অবশেষে পার্থিব সকল সুখের অকিঞ্চিৎকরতা অনুভব করিয়া শাশ্বত চিরন্তন সুখের পিপাসু হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করে। সুখভোগের নৈসর্গিক আকাঙ্ক্ষা হইতে মানুষ অবগত হয় যে, ধর্ম্মাচরণে ও ব্রহ্মলাভে মানুষের প্রকৃত সুখ পর্য্যবসিত; আজীবন ধর্ম্মাচরণ মানুষকে পারলৌকিক অনন্ত সুখের অধিকারী করে। সুখ সুখ করিয়া ঘুরিয়া মানুষ বুঝিতে পায় যে, পার্থিব সুখের উপর চিরতৃপ্তিময় স্বর্গীয় সুখ আছে, উহা ধর্ম্মসাধন ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। তাই সুখলালসা মানুষকে স্বভাবতঃ ধর্ম্মসাধনে নিয়োজিত করে।

মানবপ্রকৃতির আর একটী বিশেষ ভাব পরিপূর্ণতা (perfection) প্রাপ্তির উৎকট বাসনা। মানবপ্রকৃতির সারভূত নিয়ম এই যে, উহা সর্ব্বদাই মানুষকে নিজের ক্ষুদ্রসীমাতে আবদ্ধ থাকিতে নিষেধ করে এবং উচ্চতর শক্তির অধিকারী হইতে ব্যগ্র করে। মানুষের ইচ্ছা অনন্ত, মহৎ ও উচ্চ, কিন্তু উহার সহগামিত্বের শক্তি সর্ব্বদাই বহুদূর পশ্চাৎপদ; জন্মাবধি মানুষ অনেক বিষয়েই কামনাশীল হয়, কিন্তু কামনা যে বিষয়ে যতদূর বিস্তৃত হউক, মানবশক্তির সহায়তায় উহার ষোল আনা সিদ্ধি কোন দিনও ঘটে না। জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই মানুষের এই জ্ঞান পরিস্ফুট থাকে যে, তাহার শক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, দেশ কাল অনুসারে সকলের অপেক্ষা অতিরিক্ত হইলেও, তাহার নিজের অভীষ্ট সাধনের অনুপাতে তাহার শক্তি অসম্পূর্ণ যৎকিঞ্চিৎ। মহা পরাক্রমশীল ব্যক্তি সমস্ত শক্তির ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছে যে, তাহার যথেপ্সিত ফলপ্রাপ্তির অনেক বাকী রহিয়া গিয়াছে। মানবসমাজের সম্মিলিত শক্তিও এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। তাই প্রত্যেক বিষয়ে মানুষ জন্মাবধি আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে এবং সকল ক্ষেত্রেই স্বীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা মানুষের মনে অত্যন্ত অতৃপ্তি উৎপাদন করে। এই আত্মশক্তির ক্ষুদ্রত্বে অতৃপ্তি হইতে মানুষের অন্তরে স্বীয় শক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অসম্পূর্ণ শক্তির সীমাতিক্রম ও উচ্চতর শক্তির অধিকার আকাঙ্ক্ষা হইতে মানুষের মনে স্বভাবতই এই বিশ্বাস উপস্থিত হয় যে, মানুষের অধিকারে যে সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ শক্তি, তাহার উপরে সীমাতীত পূর্ণ শক্তির অস্তিত্ব আছে। আত্মশক্তির ক্ষুদ্রতাবোধ ও উহাতে অতৃপ্তি মানবের মনে পরিপূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মায় এবং উহা হইতে আবার অসীম পূর্ণ অস্তিত্বে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। মানবশক্তির ক্ষুদ্রতা স্বাভাবিক, উহাতে অতৃপ্তিও স্বাভাবিক, অতৃপ্তি নিবন্ধন পরিপূর্ণতা বা উচ্চতা লাভের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা

হেতু পরিপূর্ণতা বা অসীমত্বে বিশ্বাস অথবা ধর্ম্ম স্বাভাবিক। অতএব ধর্ম্ম মানবের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। মানুষের সকল অবস্থাতেই নিজের ক্ষুদ্রত্ববোধ স্বাভাবিক এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অসীমত্বের জ্ঞান স্বাভাবিক। মহামহোপাধ্যায় মোক্ষমূলর তাঁহার (Hibbert lectures) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, অসীমত্বের জ্ঞান (Knowledge of the Infinite) হইতে মানবের মনে প্রথম ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হইয়াছে। শিক্ষাদি দ্বারা মানব মন সমুন্নত হইবার পূর্ব্বে মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে ক্ষেত্রেই পরিচালিত হউক না কেন, মানবশক্তি অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ, ঐ সঙ্কীর্ণ শক্তির উপরে প্রভাবময় সীমাতীত পূর্ণ শক্তি বর্ত্তমান আছে, মানবশক্তি তাহারই পরিচালনাধীন। প্রত্যক্ষ মানবশক্তির অন্তরালে তদুপরি কর্ত্তৃত্বশীল অদৃশ্য মহাশক্তির অস্তিত্ব মানবমনের চিরন্তন বিশ্বাস। এ বিশ্বাস চিরকালই, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন আকারে, মানবের মন অধিকার করিয়া আছে। ঐতিহাসিক জানেন, ঘোর অসভ্যতার সময়েও মানুষ মানবের অদৃষ্টবধায়ক মহাশক্তি-সম্পন্ন দৈত্য-দানবের কল্পনা না করিয়া পারে নাই। মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতি এই যে, সে প্রতিবিষয়ে নিজকে অসম্পূর্ণ মনে না করিয়া পারে না, এবং পূর্ণতা লাভের প্রবলাবেগে অসীম পূর্ণ অস্তিত্বের কল্পনা না করিয়া স্থির হয় না। কর্ত্তৃত্বশীল প্রভাবময় পূর্ণ শক্তিতে বিশ্বাস মানুষকে তৎপ্রতি ভয়যুক্ত করে এবং তাঁহার সন্তোষবিধানার্থ তদনুমোদিত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করে।

(৫) মানব প্রকৃতির স্থূল ভাবগুলির বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে, উহাদের সকলের ভিতরেই ধর্ম্মের অঙ্কুর নিহিত রহিয়াছে, উহারা সকলেই আমাদিগকে স্বতঃ পূর্ণব্রহ্মের প্রতি উত্তেজিত করে। মানবপ্রকৃতির বিচার ছাড়িয়া দিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, মানুষ স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল ও ধর্ম্মভীরু। মানব প্রকৃতির অন্তর্দৃষ্টি যেরূপ মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্মশীলতা প্রমাণিত করে, ইতিহাসও তদ্রূপ মানবের স্বভাব, আচরণ ও অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর উজ্জ্বল বর্ণনালোকে ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা ও ধর্ম্মশক্তির প্রধানতা সম্বন্ধে সন্দেহ-তিমির দুরীভূত করে। আদিম অবস্থা হইতে পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, ধর্ম্মের ন্যায় অপর কিছুই তুল্য শক্তির সহিত মানবের উপর শাসন বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। পুরাকালের বিভিন্ন দেশীয় রাজনৈতিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের মূল অবলম্বন ধর্ম্ম। যে দেশে জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, সেই দেশেই রাজ্যের প্রস্তরময় ভিত্তি কম্পিত হইয়াছে এবং ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। পাঠক অল্পকালগত ভারতেতিহাসের সিপাহীবিদ্রোহ স্মরণ করিয়া দেখুন। সিপাহীগণ ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা গণনা করিয়া কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছিল! কিন্তু মহামহিমাময়ী ভারতেশ্বরী যখন স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন, ব্রিটিস্ রাজশক্তি ভারতীয় ধর্ম্ম স্পর্শ করিবে না—তখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। ধর্ম্ম লোকের এতই স্বাভাবিক প্রাণের বস্তু যে, মানুষ ধন রত্নাদি অপর সমস্ত হইতে

বঞ্চিত হইলে এত ক্ষিপ্ত হয় না, যেরূপ ধর্ম্মচ্যুত হইলে হয়। মানুষ যত সহজে ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার করে, অপর কিছুর নিকটেই অত সহজে অবনতমস্তক হয় না। তাই কথিত আছে, ফরাসি দেশের কোন প্রসিদ্ধ রাজনীতি-বিশারদ বলিয়াছেন, যদি প্রকৃত পক্ষেও ঈশ্বর বর্ত্তমান না থাকেন, তথাপি রাজ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত ঈশ্বর প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, প্রজা শাসনের নিমিত্ত সমস্ত বিধি ব্যবস্থা ব্রহ্ম-আদেশ ও ধর্ম্ম-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ধর্ম্মের দোহাই না দিলে প্রজাবর্গের মধ্যে শৃঙ্খলা সংস্থাপন অসম্ভব ব্যাপার। যে রাজ-শক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীন ও ধর্ম্মহীন, সে রাজশক্তি ক্ষমতাহীন, এবং স্বল্পকাল প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মের প্রতি মানুষের এতই নৈসর্গিক টান যে, যেখানেই ধর্ম্মের সংস্পর্শ, সেখানেই মানুষ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবনত। প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থাকর্ত্তারা সামাজিক, পারিবারিক,রাজনৈতিক সকল প্রকার বিধি ব্যবস্থার সহিতই ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য গূঢ়তম সম্পর্ক সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা জানি, ধর্ম্মবীর মহম্মদ ধর্ম্মপ্রভাবেই পৃথিবীর পূর্ব্বাংশে কি এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দুই একটী ঐতি-হাসিক ঘটনা স্মরণ করিলে মনে হয়, ধর্ম্ম মানুষের কি সযত্নপোষিত স্বাভাবিক প্রাণের বস্তু এবং উহার আকর্ষণ কি ভয়ঙ্কর মনো-মাদী। আমরা জানি, মধ্যযুগের ধর্ম্মযুদ্ধে (Crusade) কত শত য়ুরোপীয় নৃপতি রাজকীয় বিলাসভোগ তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া অবর্ণনীয় ক্লেশ স্বীকারে আসিয়াখণ্ডে উপ-নীত হইয়া আক্রমণকারীর হস্ত হইতে পবিত্র স্থানের রক্ষাকল্পে আপনাদিগের শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা জানি, ইংলণ্ডের কত অসংখ্য ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত বধমঞ্চে আরোহণ করিয়া স্মিতবদনে আপনাদিগের মস্তক দান করিয়াছেন। ভারতনারী শৌর্য্যসম্পদে অন্য দেশের নারী অপেক্ষা গৌরবিনী নহেন, কিন্তু সকলেই জানেন, ভারতললনা সতীত্ব-যজ্ঞের উদ্দীপ্ত অনলে জীবনাহুতি দিয়া জগতে কি লোকাতীত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ধর্ম্মপ্রাণতার কি মহোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন! যত দিন মানব-কুলের নির্ম্মূলতা না ঘটিবে, ততদিন এই অক্ষয় দৈব কীর্ত্তি মানবের ইতিহাস পূর্ণাক্ষরে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে। উল্লিখিত ঘটনা-বলী ধর্ম্মভাবের আতিশয্য প্রকাশ করি-তেছে, কিন্তু উহা হইতে এই সত্যের নিশ্চয়তা প্রতিপাদিত যে, ধর্ম্মপ্রাণতার মূল আমাদের প্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্য অভেদ্য রূপে গ্রথিত। যিনি চিন্তা করিবেন, তিনিই বিস্মিত হইবেন, মানবাত্মার উপরে দুর্লক্ষ্য ধর্ম্মশক্তির কেমন অমানুষী প্রভুত্ব, ধর্ম্মের অঙ্গরক্ষণে মানুষ কিরূপ আত্মরক্ষার চিন্তাপরিশূন্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ধর্ম্ম মানুষের স্বাভাবিক প্রাণের বস্তু; অপর সকল বস্তুর সংস্পর্শেই মানুষ পর্য্যায়ক্রমে হর্ষ বিষাদ, আশা নিরাশা, সুখ দুঃখের ভাগী হয়, কিন্তু ধর্ম্ম কেবল হর্ষ, আশা ও আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন অমিয় সিঞ্চনে ধর্ম্মানু-বর্ত্তীর প্রাণ সর্ব্বদা সুশীতল রাখে। ধর্ম্ম অমিশ্রিত আনন্দের উৎস বলিয়াই উহাকে প্রাণের সহিত এত ভালবাসে। এই আন-ন্দের উপভোগ আকাঙ্ক্ষায় কত কত ব্যক্তি

বিচিত্র সুখপূর্ণ বন্ধুবান্ধবের সহবাস পরিহার করিয়া জনহীন স্থলে বাস করিতেছেন, যেন তথায় বসিয়া প্রিয়তম পরব্রহ্মের সহিত হৃদয় খুলিয়া আলাপ করিতে পারেন এবং প্রাণে তাঁহার আনন্দোদ্দীপক আবির্ভাব অনুভব করিয়া ধন্য হইতে পারেন। ব্রহ্মসাধনার ব্যাকুলতায় মানুষ কবে কোন্ অনুষ্ঠানে শক্তির অভাব বোধ করিয়াছে? ধর্ম্মের গুণে বিশ্বাসী হৃদয়ের কোন অদমনীয় দুঃখ না নীরবে প্রশমিত হইয়াছে? ধর্ম্মবিশ্বাস মুমূর্ষের প্রাণেও কত আশা, শান্তি, ও শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে! কিন্তু হায়, তথাপি এ প্রশ্নসমাধানে মানব মন আলোড়িত, মানবের প্রকৃতি ধর্ম্মসাধনের উপযোগীরূপে গঠিত কিনা এবং ধর্ম্ম মানুষের স্বভাব-জাত অধিকার কি না?

আমরা সংক্ষেপে মানবপ্রকৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, উহারা সকলেই মানবের অন্তরে স্বভাবতঃ ধর্ম্মভাবের উদ্রেক করে। প্রকৃতিনিহিত বুদ্ধিবৃত্তি শৈশবাবস্থা হইতেই মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক আদি মূল কর্ত্তা আছেন, এই বিশ্বাসে পরিচালিত করে; বিবেক আশৈশব মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে ন্যায়ান্যায় দুইটী ভেদ আছে, ন্যায় কর্ত্তব্য, অন্যায় পরিহর্ত্তব্য, ন্যায় লঙ্ঘনে শাস্তি অপরিহার্য্য। স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি, সমুদয়ও; যথা পিতৃভক্তি, অনুমোদন প্রবৃত্তি, আরাধনাশীলতা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সমস্তই জন্মাবধি মানুষকে পরিদৃষ্ট পার্থিব বস্তুনিচয়ের অন্তরালে এক পূর্ণ গুণাধারের কল্পনাতে স্বতঃ উত্তেজিত করে; এতদ্ব্যতীত মানবপ্রকৃতির আর দুইটী স্বাভাবিক ভাব—সুখলিপ্সা ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা—এই দুইটী নৈসর্গিক ভাবও মানুষের মন জন্মাবধি চঞ্চল করে এবং মানুষের মনে স্বভাবতঃ পারলৌকিক অনন্ত সুখের আশা ও অদ্বিতীয় অসীমত্বের জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দেয়। ধর্ম্মোদ্দীপনী শক্তি যে মানব প্রকৃতির অন্তর্বর্ত্তী, এই গেল তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এতদ্ভিন্ন মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস প্রচার করিতেছে যে, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধনের পিপাসা অতি স্বাভাবিক বলিয়া মানুষ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কত অনুষ্ঠান করিয়াছে! অতএব দেখা যাইতেছে, সূক্ষ্মদৃষ্টি করিলে ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব হয় না। প্রকৃতির পরিচালনে মানুষ ধর্ম্মপ্রবণ, ধর্ম্মানুবর্ত্তিতা মানুষের স্বভাব; এবং ধর্ম্মসাধনের উপযোগিতা আমাদের স্বভাবায়ত্ত, সুতরাং উহা সকলেরই অধিকারভুক্ত। প্রকৃতিগত ধর্ম্মভাব যাহাতে পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের সকলেই উপযুক্ত বিধানে সচেষ্ট হওয়া উচিত। প্রকৃতি-উন্মেষিত ধর্ম্মভাবের সজীবতা রক্ষা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এবং উহাই আমাদের কর্ম্মশীলতার সর্ব্বোত্তম ক্ষেত্র।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত।

সার ধর্ম্মোপদেশ।

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
ইহা হ'তে ধর্ম্ম আর নাই সনাতন।

ধর্ম্ম শব্দ উচ্চারণ করিতেও ভয় হয়। অধুনা "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" বলিয়া চারিদিকে রঙবেরঙের নানাবিধ কোলাহল উপস্থিত দেখিয়া অনেকে ধর্ম্মের নাম শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠেন। আবার কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তির মুখে এমনও শুনা গিয়া

থাকে ;—"যে প্রকারে মদ, গাঁজা, গুলির নেশায় লোকে বোয়ে যায়, সেইরূপ কতকগুলি লোক ধর্ম্মের নেশাতে বিপথগামী হইয়া নষ্ট হইতেছে। ইহাও এক রকম বিশ্রী নেশার মধ্যে।" যাঁহারা এরূপ কথা সমূহ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, ধর্ম্ম কর্ম্ম করা বৃথা সময় নষ্ট, দুনিয়াদারীই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহার বাহিরে মানুষের আর কোন কাজ নাই। তাঁহাদের মতে রাজার আইন ও জেলখানা বাঁচাইয়া যেন-তেন প্রকারেণ দশ টাকা রোজগার করিয়া নিজে সুখে থাকা এবং পরিবারবর্গকে সুখে রাখাই মানবজীবনের চরম কার্য্য। জীবিতকাল "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" হইল ; তারপর মরণান্তে "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"। আবার অধিকাংশের দৃষ্টি মৃত্যু পর্য্যন্তও যায় না। বলা বাহুল্য, তাঁহারা "অহন্যেনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং, শেষা স্থিরত্বমিচ্ছন্তি" শ্রেণীর লোক। উঁহারা এ প্রকার সংসারবদ্ধ যে, চিরকাল এই ভাবে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ধন দৌলত লইয়া ঘরকন্না করিতে থাকিব, মৃত্যু কখনও আমাদিগকে এই মোহ-মায়াময় প্রাণপ্রিয় সংসারকূপ হইতে উত্তোলন করিবে না, ইহা ভাবিয়া কায়মনোবাক্যে সংসারকার্য্যে ব্যস্ত আছেন, কখন ভুলিয়াও মনে করেন না যে, কোন্ সময় কাল আসিয়া তাঁহাদের সাধের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিবে। এক দিন মরিতে হইবে, এ কথা কাহারও মুখে শুনিলে তাঁহারা শুধু আশ্চর্য্যান্বিত হন না, বিলক্ষণ বিরক্তি বোধ করিয়া থাকেন। *

যাহা হউক, উল্লিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের খাতিরে চুপ্ করিয়া থাকা চলে না। ভগবানের কৃপায় যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ইহসংসার কেবল শিক্ষার স্থান, অল্প কয়েক দিন মাত্র এখানে থাকিয়া শীঘ্রই গৃহে যাইতে হইবে, তাঁহারা পারলৌকিক কল্যাণ ও আত্মার উন্নতির একমাত্র উপায় ধর্ম্মধনোপার্জ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন। ইহা বিবেচনা করিয়া আমরা তাঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর বদনকমল নিঃসৃত বীজমন্ত্র সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে চিকিৎসক অন্বেষণ করিয়া থাকি ; এবং তাঁহার হস্তে ঔষধপথ্যাদি শারীরিক ব্যবস্থার ভার অর্পণ করতঃ পুনরায় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে একমাত্র তাঁহার উপদেশ

* কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতার অনৈক মহারাজোপাধি ভূষিত ধন-কুবের বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য স্থানান্তরে গিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করেন। সেরূপ প্রবাসে বিষয়কর্ম্ম কিছুই নাই, সুতরাং সময় কাটে না, দেখিয়া তাঁহার অমাত্যবর্গ রাজধানী হইতে এক জন কথক আনাইলেন। কথক ঠাকুর হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান আরম্ভ করিয়া প্রথম হইতেই মৃত্যু চিন্তা ও পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইবার বিষয় বলিতে লাগিলেন। "আমাদের সকলকেই এক দিন ধরাধাম ত্যাগ করিতে হইবে," ক্রমাগত এই কথা শুনিয়া মহারাজা বাহাদুর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কথা মধ্যে এক দিন কথক ঠাকুরকে বলিয়া ফেলিলেন ;—"অত মৃত্যুর কথা ভাল লাগে না। নিশ্চয় মরিতে হইবে বলিয়া ধন সম্পদ কিছুই নয়,—তবে কি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমাকে দান করিতে হইবে ? গান টান গাও ত বেশ ; নচেৎ একথাই 'মরিতে হইবে' 'মরিতে হইবে' আমি শুনিতে চাই না।" তদুত্তরে নির্ভীক কথকরাজ বলিলেন,—"আমি ত যাত্রার-দলের ছোক্‌রা নই যে, ফরমাশ মত গান গাইব। উপযুক্ত স্থলে গীত গাওয়া হইবে।" বলা বাহুল্য, কথক ঠাকুর তৎক্ষণাৎ বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

মত চলি। দৈহিক ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে নিয়ম, আধ্যাত্মিক বিকার মুক্ত হইবার পন্থাও তদ্রূপ। ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সমূহ স্বয়ং মীমাংসা করতঃ পরিত্রাণের পথে দাঁড়াইবার শক্তি কয়জন জীবের পক্ষে সম্ভব? জ্যামিতি শিক্ষার জন্য যুক্লিডের ন্যায় গ্রন্থ রচনা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে গেলে আমাদের মধ্যে কয়জনের ভাগ্যে তাহা ঘটিত? সুতরাং শারীরিক চিকিৎসার জন্য আমরা যেমন নিকটস্থ ভাল বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়া থাকি, দূরে খুব উৎকৃষ্টতর চিকিৎসক থাকিলেও তাঁহার নিকট যাই না; সকল অবস্থায় যাইতে পারিও না, তেমনি অভ্যন্তরের রোগ সমূহের প্রতিকার হেতু দেশ ও কালে যে সুবৈদ্য নিকট, তাঁহারই চরণাশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বিবেচনা করি। বিশেষতঃ তিনি যদি লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হন, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই।

ভবব্যাধির সুচিকিৎসা সম্বন্ধে পারদর্শী নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন আমাদের পক্ষে দেশ ও কালে অতি নিকটস্থ, সেরূপ আর কাহাকেও দেখা যায় না। সুতরাং ধর্ম্মার্জ্জন বিষয়ে তিনি প্রিয় শিষ্য সনাতন গোস্বামীকে অতি সংক্ষেপে যে কয়েকটী কথা দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশাস্ত্র-সার অমূল্য রত্নগুলির আলোচনা ও তদনুযায়ী চলিতে চেষ্টা করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

প্রথমঃ—"জীবে দয়া।" * জীব শব্দে প্রাণীমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর কীটপতঙ্গাদি হইতে খেচর, ভূচর, জলচর সমস্ত জন্তু জীব পদবাচ্য। জীব বলিলে মানুষকে যেমন বুঝায়, গো-মহিষ বায়সাদি পশুপক্ষী এবং মশক পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র দেহী প্রাণী সমূহকেও তেমনি বুঝাইয়া থাকে। খ্রীষ্টানদের মত "হত্যা করিও না" অর্থে কেবলমাত্র নরহত্যা বুঝিলে চলিবে না। যেখানে চেতনাশক্তি আছে, সেই খানেই ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব জানিয়া কোন প্রাণীকে হত্যা করা দূরের কথা, সামান্য কষ্ট দেওয়াও পাপ। শুধু তাহা হইলে চলিবে না, বধ করা, বেদনা জন্মান ত অকর্ত্তব্যই, তদুপরি তাহাদিগকে আত্মীয়বোধে রক্ষা করিতে হইবে, সেবা সাহায্য দ্বারা সর্ব্বথা পালন করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণা, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ভারতবাসী আর্য্যগণ পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গাদির প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে শিখেন নাই। এ কথা সঙ্গত নহে। প্রাত্যহিক পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে নিকৃষ্ট জীবদিগকে আহার দেওয়া একটী; ইহা মনুপ্রণীত ব্যবস্থা, সুতরাং অতি প্রাচীন। মহাভারতেও এ বিষয়ে অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* জীবে দয়ার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন চৈতন্যের সমকালিক সেই কূর্ম্মস্থানের কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বাসুদেব ব্রাহ্মণ। কোন দেশে, কোন কালে উহার তুলনা পাওয়া যায় না; ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষ ব্যতীত কুত্রাপি সম্ভবেও না। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত, ক্ষত স্থান সমূহে বহুসংখ্যক কীট জন্মিয়াছে; বাসুদেব প্রফুল্ল চিত্তে তাহাদিগকে দেহে পোষণ করিতেছেন। শুধু কি তাই? কীটগুলির মধ্যে কোনটী ক্ষতস্থানচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলে, পাছে দুঃখ পায় বলিয়া, উঠাইয়া আবার সেই স্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিতেছেন। ধন্য বাসুদেব! ধন্য তুমি! এমন নহিলে শ্রীগৌরাঙ্গ এরূপ ভাবে তোমার কৃপা করিবেন কেন? তুমি সংসারকে খুব উচ্চ শিক্ষা দিয়া গিয়াছ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে জনৈক জাতিস্মর বৃদ্ধা উক্ত মহাহবে কয়েকটী পুত্র হারাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন ;—"কৈশব ! আমি পঞ্চাশ জন্ম পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত দেখিয়াছি, কোথাও আমা দ্বারা এমন কোন পাপ হয় নাই, যাহার দণ্ডস্বরূপ আমি এ জন্মে এতগুলি পুত্র-শোক পাইবার যোগ্য।" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে বলেন ; "তুমি যতদূর দেখিয়াছ, তাহাতে ওরূপ কোন অপরাধ কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহার ওদিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, একপঞ্চাশৎ জন্মে তুমি ক্রীড়াচ্ছলে অতি নিষ্ঠুর ভাবে কয়েকটী পিপীলিকার প্রাণনাশ করিয়াছিলে, আজ ঠিক সেই কয়টী পুত্র তজ্জন্য বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে।" সমগ্র প্রাণীজগতের প্রতি কিরূপ সদয় ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা বুঝাইবার জন্য ইহা অপেক্ষা তীব্র উপদেশ আর কি হইতে পারে ?

দ্বিতীয় :—"নামে রুচি।"—

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহ।
পূর্ণঃশুদ্ধোনিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বা নামনামিনোঃ॥"

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং বলিয়াছেন ;

"ভগবানের স্বরূপ তাঁহার নাম হইতে অভিন্ন জানিবে। শ্রীহরির অনন্ত শক্তি তাঁহার নাম মধ্যে নিহিত আছে। ভক্তি সহকারে সদা সর্ব্বদা হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা নিরন্তর তাঁহার সংসর্গলাভ ঘটিয়া থাকে। নিয়ত ভগবানের সহিত বিহার করা যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য, নিরবচ্ছিন্ন তাঁহার নাম গান ও গুণানুকীর্ত্তন তেমনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন। একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণস্বরূপের ধ্যানধারণা কলিযুগে দুঃসাধ্য ব্যাপার ; পবিত্র প্রেম ও অচলা ভক্তি পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পূজা সহজ নয়। অতএব

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
"কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার।"

বাস্তবিক নামের মাহাত্ম্য বড় কম নয়। এমন শুনা গিয়াছে যে, কোন কোন পবিত্র পুরুষের সম্মুখে ওঁকার উচ্চারণ করাতে তাঁহাদের মস্তকের কেশ শলাকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়াছে।

আসল কথা, নামে রুচি চাই। যেমন সুস্বাদু খাদ্যে রুচি, সুমধুর সঙ্গীতে রুচি, সুন্দর পদার্থে রুচি, প্রিয়জনের সহবাসে রুচি, তেমনি হরিনামে রুচি চাই। ভগবান কেশবচন্দ্র * বলিয়াছেন, "যত বার পরমেশ্বরের যে নাম উচ্চারণ করিবে, তত বার সেই নামে বিশেষ বিশেষ রস আস্বাদন করিতে হইবে, নচেৎ নামজপ বৃথা।" তিনি নাম গ্রহণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন ;—"হরিনাম চক্ষে, কর্ণে, জিহ্বায়, হৃদয়ে প্রাণে রাখিবে। এই নাম রূপ করিয়া দর্শন কর, শব্দ করিয়া শ্রবণ কর, রস জানিয়া আস্বাদন কর, প্রেম জানিয়া হৃদয়ে ধারণ কর, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতর রাখ। এই নামে আপনি বাঁচিবে, পরকে বাঁচাইবে। নাম সর্ব্বস্ব। ইহকাল পরকালে নাম বিনা আর কিছুই নাই। নাম সৎ, অতএব নাম সার কর।"

* ৺ কেশবচন্দ্র, ৺ রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় হরিগতপ্রাণ মহাত্মাগণ এখন ভাগবতী তনু ধারণ করতঃ ভগবানের সঙ্গে একীভূত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং মর্ত্ত্যলোকে তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে "ভগবান" শব্দ প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হয় না। বিশেষ উঁহারা বাস্তবিক ভগবানের এক এক বিভূতি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শৌনকাদির প্রতি সূত কহিতেছেন :—

"অবতারাহ্য সংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥"

তৃতীয়ঃ—বৈষ্ণব সেবন ;—আধুনিক কালের অনেকে হয়ত কেবল বৈষ্ণব সেবন শুনিয়া চমকিয়া উঠিবেন, এবং মহাপ্রভুর অনুদার সংকীর্ণতার প্রতি কটাক্ষ করিতে উপদেশের ক্রটী করিবেন না ; পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বৈষ্ণব শব্দের যেরূপ অর্থ করি য়া গিয়াছেন, তাহাতে তদীয় উদার প্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণব কাহাকে বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন,—

"যার-মুখে মুখে শুনি একবার
কৃষ্ণ নাম, সেই পুজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার"

সুতরাং এখানে মানবমাত্রকেই বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ এমন পাষণ্ডাধম সম্ভবে না যে, কস্মিনকালেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করে নাই। নিতান্ত পক্ষে দুঃখ, বিপদ, রোগ-শোকের সময়ে তাহাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ব্যাকুলতা সহকারে বিপদুদ্ধারণ নাম গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

মানব-সেবন যে আমাদের পরিত্রাণের একটী প্রধান উপায়, সে বিষয়ে পৃথীবির সকল সাধুই একমত। কায়মনোবাক্যে ভ্রাতা ভগ্নীর সেবা-সাহায্য ব্যতিরেকে জীবের কল্যাণ কি প্রকারে সম্ভবে? যিনি এই অবশ্য-পালনীয় ব্রত সম্বন্ধে উদাসীন, তিনি পিতার প্রীতিভাজন হইবেন কিরূপে? কারণ, পিতা সাধুমুখে একথা প্রচার করিতে ক্রটি করেন নাই ;—"যে সকল ভ্রাতা ভগ্নীকে চক্ষে দেখিতেছে, যদি তাহাদের প্রতি প্রেম প্রদর্শনে অশক্ত হও, আমার পূজা কি প্রকারে করিবে? যে হেতুক আমাকে কখন দেখ নাই।" —"আমার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সন্তানের প্রতি যে সামান্য অত্যাচারও কৃত হয়, তাহা আমার উপর আসিয়া পড়ে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।" পিতা পুত্রে এতই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, পুত্রের প্রতি কোন প্রকার ক্রটী বা অন্যায় ব্যবহার করিলে তাহা পিতার গায়ে লাগে।

"হে দ্বিজগণ! সত্ত্বগুণের নিধি স্বরূপ ভগবানের অবতার অসংখ্য। যেমন উপক্ষয় শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তেমনি ভগবান হইতে নানা শ্রেণীর অগণ্য অবতার হইয়াছে।"

পিতা যখন সুখ দুঃখ-বিরহিত নির্ব্বিকার উদাসীন হইয়াও নিঃস্বার্থভাবে এত বড় গৃহস্থালী পাতিয়া আমাদের সকলের ভরণপোষণ সেবাসাহায্য শুশ্রুষা করিতেছেন, তখন আমরা যদি তদীয় পদানুসরণ করতঃ সংসারের সেবায় যত্নবান না হই, তাহা হইলে দৃশ্যটা কিরূপ বিকট হয়!!!

আমাদের শরীর মন এবং বিশ্বের ধনসম্পত্তি সমস্তই পিতার ; তিনি দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে ঐ সকল কিছু দিনের জন্য ভোগ করিতে দিয়াছেন মাত্র ; অপব্যবহার না করিয়া উহাদিগকে মানব-সেবনে প্রয়োগ করিলেই আমাদের আত্মার কল্যাণ, নচেৎ ঘোর প্রত্যবায় *। শ্রীমদ্ভাগবতে

* মহা উন্নতিশীল আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অনেক সহৃদয় মহানুভব ব্যক্তির মুখে এরূপ শুনা যায় ;—সংসারের অভিধান হইতে চ্যারিটী (Charity খয়রাত) শব্দ উঠাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ বাস্তবিক খয়রাত এ জগতে কি প্রকারে সম্ভবে? আমাদের অভাবযুক্ত দুঃখী ভ্রাতাদিগকে আমরা যাহা কিছু সাহায্য করি, সেটাও আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে ; কর্ত্তব্য সাধনকে খয়রাত বলা কোন্ যুক্তি সঙ্গত? মানবপরিবারের পরস্পরকে সাহায্য না করিলে পাপ, করিলে কোন পুণ্য নাই।" আমাদের দেশে যেরূপ বিধবার একাদশী, গৃহিণী ঠিক ঐ ভাবে একদিন যাহা বলিয়াছিলেন সেটাও মন্দ কথা নয় ;—"যে দিন সঙ্গে পয়সা কড়ি না থাকে, সে দিন পথপার্শ্বস্থ ভিক্ষুকগণকে দেখিয়া বড় লজ্জা বোধ হয়, এত সঙ্কুচিত হইতে হয়, যেন উহাদের কত ধারি।"

উক্ত হইয়াছে,—"দেহিগণের যতটুকু হইলে উদরপূর্ত্তি হয়, ততটুকু তাহাদের অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক যে ব্যক্তি আপনার বলিয়া মনে করে, সে চোর দণ্ডার্হ।"

এস্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। মানব-সেবা দুই প্রকার;—"কলীয়" অর্থাৎ অর্থরূপ কলের দ্বারা সাধিত; আর "প্রাণীয়"—হৃদয়ের আগ্রহ সহকারে শরীর মনের দ্বারা নিষ্কাম ভাবে সম্পাদিত। মহাপ্রভুর উপদেশ কলীয় মানব-সেবা নহে, খাটি প্রাণীয়। কলীয় মানব-সেবার ফল সমস্তই সাংসারিক, যদি কিছু আধ্যাত্মিক ফল থাকে, তাহা অতি অল্প মাত্রায়; আর প্রাণীয় সেবার ফল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, কেবল উহারই দ্বারা জীবের পারমার্থিক কল্যাণ সম্ভাবনা।

উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, সর্ব্বশাস্ত্র-সারসংগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের সংক্ষিপ্ত উপদেশ আমাদের পারলৌকিক উন্নতিকল্পে যথেষ্ট। তজ্জন্য আর কাহারও নিকট যাইতে হইবে না, দেশ বিদেশের ধর্ম্মগ্রন্থাদি আলোড়নের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

"বন্দে সাদ্বৈতং সাবধূতং
"পরিজনসহিতং কৃষ্ণ চৈতন্যদেবং।"
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত।
"কলিযুগে পাবন অদ্ভুত সুচরিত॥
"শরণ শরণাগতবৎসল দয়াময়।
"তিন রূপ এক আত্মা সর্ব্বগুণালয়॥
"অঞ্জলি মস্তকে ধরি দন্তে তৃণ করি।
"একান্ত ভাবেতে বন্দি চরণ-মাধুরী॥"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।)

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

হিন্দুসমাজের পুনঃসংগঠন।

আমরা পূর্ব্বে (নব্যভারত, ১২শ খণ্ড ৫ম সংখ্যা, ২৪৮ পৃষ্ঠা) হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে বলিয়াছিলাম, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থান বা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পুনঃসংস্থাপন এক কথা নহে। হিন্দু-সমাজের পুনঃসংগঠন সম্বন্ধেও আমাদের সেই কথা। হিন্দুর জাতীয় ভাবের মধ্যে পৌরোহিত্যের প্রভাব আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই পৌরোহিত্যের অনুচিত প্রভাব বশতঃ জাতীয় স্বাধীনভাবের অভিনব জাতীয় স্বত্বের সংকোচন কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। হিন্দু সমাজের পুনঃসংগঠন কার্য্যে হিন্দুরই প্রাধান্য থাকা আবশ্যক; ব্রাহ্মণ্য বা পৌরোহিত্য শক্তি সহায় হইতে পারে, কিন্তু উহাকে কর্ত্তৃত্বকারিণী করিয়া লওয়া অন্যায় হইবে। হিন্দুর রাজনৈতিক জীবন নাই। হিন্দুর ধর্ম্মনৈতিক জীবনও শ্লথ; হিন্দুর আছে কথঞ্চিৎ সমাজনৈতিক জীবন; তাহাও ব্রাহ্মণ্যশক্তি দ্বারা অভিভূত বা দুর্ব্বলীকৃত। হিন্দুসমাজের পুনঃসংগঠন সময়ে দেখিতে হইবে, এই সমাজনৈতিক জীবনে প্রকৃত বলের সঞ্চার হয়—ইহার মধ্যে এমন উপাদান থাকে, যাহা প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর।

হিন্দুর দীর্ঘ জীবনের মধ্যে উত্থান পতনের একাধিক বারের ইতিহাস শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করা যাইতে পারে। আমরা "মহারাজ দুর্য্যোধন," "ভীষ্ম" প্রভৃতি কতকগুলি প্রবন্ধে তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে মাত্র এই বলি-

লেই যথেষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণ্যশক্তি ও লৌকিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতই হিন্দুজীবনের মৌলিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিতেছে। বেদমন্ত্রে বর্ণিত হিন্দুজীবন—সুদাস, দিবোদাস, নহুষ প্রভৃতির জীবন—ব্রাহ্মণ-বর্ণিত হিন্দুজীবন অপেক্ষা স্বাধীন, কর্ত্তব্যপর, দৃঢ়, কর্ম্মপ্রবণ ও জয়শীল। উপনিষদ্‌বর্ণিত হিন্দুজীবন—জনকাদি রাজর্ষির জীবন—মহাভারত-বর্ণিত ব্রাহ্মণ্যানুগত যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় আত্মকলহতৎপর ও দাস-কল্প পরিম্লান নহে। বৌদ্ধশিক্ষা দ্বারা সমুন্নত হিন্দুজীবন যেমন তেজস্কর, তেমন জ্ঞানময়, যেমন বিজয়ী, তেমন একত্বের লীলাস্থল। ফলে বৌদ্ধরাজত্বকালেই হিন্দুস্থানের জাতিবৃন্দ একত্বের প্রথম আস্বাদ পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পুনরুত্থান কেবল হিন্দুর মহাপতনের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। আবার মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে শিবজী-প্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়দিগের উত্থান কেবল হিন্দুজীবনে নব বল সঞ্চারের পরিচায়ক। পেশবা বা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য যেমন মহারাষ্ট্রীয় জাতির পতনের কারণ, তেমন বঙ্গে নদীয়ায় ভবানন্দ মজুমদার-প্রমুখ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের উত্থান বঙ্গীয় ক্ষত্র-বৈশ্যের শূদ্রত্বে পরিণতি ও বহুবিধ রাজনৈতিক দুর্দ্দশার মৌলিক হেতু। এই প্রকারে যে সময়েই ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রভাব অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে—সেই সময়েই জাতীয় ভাব হীনপ্রভ হইয়াছে এবং ইহার প্রত্যেক সময়েই অমঙ্গলজনক ঘটনা পরিশেষে আনীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে লোক-শক্তি যে যে সময়ে যথাযথ ভাবে কার্য্য করিতে পারিয়াছে, সেই সেই সময়ের ইতিহাসই হিন্দুর গৌরবের বিষয়। এই জন্য বলিতেছি, লোকশক্তি উন্মেষিত করাই হিন্দুসমাজ পুনঃসংগঠনের প্রকৃষ্ট উপায়। যাঁহারা এক্ষণে হিন্দুসমাজ পুনঃসংগঠনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে লক্ষ্য না থাকিলে কৃতকার্য্য হইবেন না, বরঞ্চ দেশের প্রভূত অমঙ্গলের সূত্রপাত করিয়া দিবেন।

এই লোকশক্তিই ক্ষত্র-শক্তি। কেন না, ক্ষত্র অর্থে দেহ, * বাহু নহে। যে ক্ষত্রশক্তির উপর দেশের ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষার ভার অর্পিত ছিল—আত্মরক্ষার মূলীভূত উপায় যে ক্ষত্র-শক্তি, তাহা কি কোন বুদ্ধিমান জাতি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোকের উপর বা জাতীয় দেহের একাঙ্গের উপর ন্যস্ত রাখিতে পারেন? এই শক্তি জাতীয় দেহের সর্ব্বাঙ্গে নিহিত আছে, এবং ইহার সংগ্রহ জাতীয় দেহের সর্ব্বত্র হইতে হইয়া আসিতেছে। ইহাই হিন্দুর চিরন্তন প্রথা—ইহাই সকল জাতির চিরন্তন প্রথা। এই প্রথা অবলম্বন করিয়া বুয়রজাতি মরিয়াও মরিল না, অনেক গুলি স্বাধীনস্বত্ব অবলম্বন করিয়া পুনর্জীবিত হইতে চলিল। সুদাস, দিবোদাস, নহুষ, যদু, তুর্ব্বশ এবং আধুনিক কালে অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিবজী ইঁহারা কি বাহু হইতে উৎপন্ন? ক্ষত্রিয়ের বাহু হইতে উৎপন্নের কথা কৃত্রিম শ্রুতির বিকৃত অর্থমূলক অর্থাৎ ঋগ্বেদের ৯৮ সূক্তের ১১ ও ১২ ঋক মহা বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন (নব্যভারত, ১৬শ খণ্ড, ১২ সংখ্যা)। ফলে উক্ত দুই ঋক বেদে প্রক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেও ক্ষত্র ও ক্ষত্রিয় শব্দের বহুব্যবহার দেখা যায়। † সে সময়েত বাহু সম্বন্ধীয় রূপক প্রচলিত হয় নাই। ফলে

---

* বাচস্পত্য অভিধান।

† ঋগ্বেদ ৭।৬৪।২ এবং ৭।৮৯।১ ইত্যাদি।

ক্ষত্র শব্দের যে আভিধানিক অর্থ দেহ, তাহাই ঠিক ও ব্যবহারিক—জাতীয় দেহের যে অঙ্গ হইতে দেশ ও সমাজরক্ষার জন্য যথেষ্ট বল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই ক্ষত্রোৎপত্তির স্থান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। রাজপুত জাতিও এই অর্থে ক্ষত্রিয়।

কায়স্থ অর্থেও ক্ষত্রিয়,—দেহের সর্ব্বাঙ্গ হইতে সঙ্কলিত জাতি। হিন্দুসমাজ পুনঃসংগঠন কার্য্যে ইহাদের উপযোগিতা সুতরাং অধিক। ইঁহারা বৃথা গর্ব্বে মত্ত হইয়া আপনাদের আভিজাত্য ভুলিয়া না গেলে ইঁহাদের সহিত সর্ব্বজাতির সহানুভূতি সম্ভবপর। তদ্ভিন্ন কায়স্থের ব্যবসায় ক্রমশঃ আদর্শ ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে, কেননা, সমাজ-সংস্করণ ও পরিচালন-শক্তি এই ব্যবসায়ী লোকের হস্তে সমাহিত হইতেছে। কায়স্থ ও কায়স্থ ব্যবসায়িগণ গত শতবর্ষে সমাজ-সংস্করণের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন—সমুদায় শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহারা অনুবাদ করিয়া দিয়া হিন্দুজাতিবৃন্দকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরাবধি শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত করাইয়া দিতেছেন। একথা আমরা পূর্ব্বে "অনূদিত গ্রন্থ" প্রবন্ধে বলিয়াছি (নব্যভারত, ১৫শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)। এবম্বিধ বহুবিধ কারণে কায়স্থাদি জাতির সমাজ পুনঃগঠন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কিছু বিস্ময়কর নহে। তবে এই কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাই ভাবনার বিষয়।

ইংরেজ রাজত্ব ও শিক্ষার ফলে ভারতে ক্রমশঃ সমাজ-সংস্কারের চেষ্টাগুলি স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। রাজা রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ, দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্যসমাজ, থিয়োজফিষ্ট সমাজের সহিত দেশীয় লোকের যোগ—সকলই সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে। ইদানীন্তন স্বামী বিবেকানন্দের চেষ্টা কি সমাজের পরিবর্ত্তন-প্রয়াসিনী নহে? তদ্ভিন্ন কংগ্রেসের যতটুকু ব্যবহারিক মূল্য আছে, সেটুকুও সমাজ সংস্কারেরই দিকে। সুতরাং দেশের ইদানীন্তন যতগুলি উদ্যম প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য লক্ষ্য করিয়া সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা সমাজ-সংস্কারের সপেক্ষ, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কিন্তু এই সকল উদ্যমগুলিতে জাতীয় ভাব স্বল্প। এগুলি জনকতক শিক্ষিত লোকের ভাসা ভাসা চেষ্টা মাত্র এবং যাঁহারাও চেষ্টাশীল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মশীল নহে। জাতীয় ভাব উদ্দীপনের পক্ষে, একত্রিত ভাবে, বৃহদাকারে কার্য্য করিবার পক্ষে, এই সকল উদ্যম এক্ষণ পর্য্যন্ত যথেষ্ট উপযোগী হয় নাই। ইহার এক কারণ এই যে, যে দুই অঙ্গে ইহারা ঔষধ প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছে—রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি, সেই দুই অঙ্গই হিন্দুর অসার। উহাতে রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া অনেকদিন হইতে থামিয়া গিয়াছে। যে সামাজিক অঙ্গ হইতে প্রধান ভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত ছিল, তাহা উপরোক্ত চিকিৎসকেরা লক্ষ্য করেন নাই। সে যাহা হউক, ফলে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছে যে, সমাজের পুনঃসংগঠন ভিন্ন হিন্দুর অন্যবিধ চেষ্টা সত্বর ফলপ্রদা হইবে না।

এই জন্যই কালক্রমে সামাজিক উত্থানের সূত্রপাত দেখিতেছি। গত ১০।১৫ বৎসর মধ্যে বঙ্গদেশীয় চণ্ডাল জাতি "শূদ্র" বা "নমঃশূদ্র", কৈবর্ত্ত "মাহিষ্য", তিয়র "রাজবংশী" হইতে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইয়াছে। তিলি, সূত্রধর, গন্ধবণিক, সাহা (শৌণ্ডিক), বারুজীবী ও কায়স্থও আপনা

দের আভিজাত্যের উচ্চতর মূল্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। এই সকল চেষ্টার মূলে রাজশক্তির যথেষ্ট উত্তেজনা রহিয়াছে। প্রথমতঃ প্রাথমিক শিক্ষা বশতঃ সমাজ-সংশোধনের চেষ্টা স্বভাবতঃ নিম্ন স্তরে অঙ্কুরিত হইয়াছে;—যেমন উচ্চশিক্ষায় রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সংশোধনের ইচ্ছা স্ফুরিত হইয়াছিল,সেই রূপে প্রাথমিক শিক্ষায়সমাজ পুনঃগঠনের ইচ্ছা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বা জাতীয় ভাবে স্ফুরিত করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই লৌকিক ইচ্ছাকে কার্য্যকরী পথে প্রধাবিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টও সূক্ষ্ম রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। উচ্চ শ্রেণীর উদ্দেশ্য,অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে-গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বশ্রেণীর উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিতে হয়, সুতরাং সামাজিক ভাবকে সংযত ভাবে অভিষ্টানুকূল পথে প্রচালিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টও ক্রমশঃ প্রস্তুত হইয়াছেন। এজন্য সমাজ-পুনঃসংগঠন-কার্য্য সত্বর সম্ভাবিত, ইহাই সকলের ধারণা। এজন্যই হাই-কোর্টের বিচারপতির আসন, জজ, মেজিষ্ট্রেট, রাজা, মহারাজা, রায়বাহাদুর, ব্যবসায়ী, শিল্পী, পণ্ডিত, সম্পাদক প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণী হিন্দুর আসন টলিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছে, সমাজে কি যেন একটা কি হয়।

যখন প্রজাশক্তি ও রাজশক্তি একই উদ্দেশ্যে সমাজক্ষেত্রে কার্য্য করিতে চাহিতেছে, কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হইলেও ফল নিশ্চিত। সুতরাং এক্ষণ দেখিতে হইবে, সমাজ পুনঃগঠন যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন কোন্ পন্থা অনুসরণীয়—হিন্দু পন্থা না ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পন্থা?

বৈশ্যবারুজীবী সভার প্রধান মুখপাত্র বাবু যদুনাথ মজুমদার মহাশয় এ বিষয় অপেক্ষাকৃত গভীরতর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন। তিনি ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, সামাজিক কার্য্যে যে কোন ভাবেই হস্তক্ষেপ করা যাউক না কেন, জাতিভেদের কথা তৎসঙ্গে উঠিয়া পড়িবে। সুতরাং তাহার একটা মীমাংসা না করিয়া কোন সামাজিক কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করা যায় না। এজন্য তিনি জাতিভেদের সপক্ষেও বিপক্ষে যে যুক্তিগুলি উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ত্রুটী পুরস্কার প্রদান করিয়া কৃতি লেখকগণের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সমাজ পুনঃসংগঠন কালে জাতিভেদ সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ভাব অবলম্বন করা উচিত, তাহা তাঁহার বক্তৃতার নিম্ন অংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

"জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজের সামাজিক-ব্যবস্থাপনের যন্ত্র স্বরূপ। উহা ভাল কি মন্দ, উহা জাতীয়-উন্নতির সহায় বা অন্তরায়, সে আলোচনা এস্থানে করিব না, তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে, জাতিভেদ প্রথা হিন্দু-সমাজের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, অতএব ইহাকে ভালই বিবেচনা করুন, বা মন্দই বিবেচনা করুন, ইহার মূলোৎপাটন সহজ নহে, এ প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের কথা এই যে, প্রথাটী যখন আছে, এবং সহসা বিপর্য্যস্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই, সেখানে ইহার দ্বারা সমাজের যতটুকু উপকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুসমাজের এই জাতিভেদ প্রথার দ্বারা আপাততঃ আমরা কি উপকার প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা দেখা আবশ্যক। এই শত সহস্র সম্প্রদায়-সমন্বিত সুপ্রকাণ্ড হিন্দুজাতিকে একটী মাত্র সূত্রে সুসম্বদ্ধ করা আপাততঃ সম্ভবপর নহে। এতদন্তর্ভূত বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি আপন আপন সাম্প্রদায়িক সমুন্নতি করিতে যত্নপর হন, তবেই ক্রমে সমস্ত সম্প্রদায়ের

সমবেত উন্নতির ফলে সমগ্র জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে। বৃহৎ কার্য্য মাত্রেরই প্রায় এই নিয়ম।”

যদু বাবুর এই কথাগুলি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, তাঁহার জাতিভেদের প্রতি শ্রদ্ধা নাই; তবে আপাততঃ এ প্রথা যখন উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে, তখন উহার দ্বারা আমাদের যতটুকু উপকার সাধন করিয়া লওয়া যায়, তাহাই কর্ত্তব্য। সময় আসিলে এ প্রথাকে উঠাইয়া দেওয়া যাইবে। জাতিভেদের দ্বারা দেশের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই যদু বাবুর মতাবলম্বী হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তা এক কথা, কার্য্য এক কথা। যাহারা কার্য্যতৎপর, তাহারা, কার্য্যে যেরূপ কাঠিন্যই থাকুক না কেন, তাহাকে ভয় করিবে কেন?

এই শুনুন, তাম্বুলি জাতির সভায় এই কথার কিরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল;— উক্ত সভায় অটলবিহারী নায়েক প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি-স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। তাহার মর্ম্ম এই যে, উক্ত নায়েকেরা মহর্ষি শাণ্ডিল্যবংশ সম্ভূত বিদ্যাধর চেলের সন্তান। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজাধর চেল দ্বারবাসিনী হইতে ছোট বেলুনে আসিয়া ক্রমে তাহারা ৮½ঘর“প্রামাণিক” নামধেয় কুলীনে পরিণত হন এবং যে যে স্থানে সেই প্রামাণিকবংশ আছেন, তাঁহাদের যাহাতে কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ থাকে, বরং মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়, এই তাঁহাদের আবেদন। এই আবেদন বিপিনবিহারী নায়েক পাঠ করিয়াছিলেন। এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে হাইকোর্টের মোক্তার ৪২ গ্রামী সমাজের বাবু ব্রহ্মানন্দ দত্ত যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি। “আমাদের সম্মিলনী সভার উদ্দেশ্য সর্ব্ব সম্প্রদায়ের তাম্বুলিগণের একত্র মিলন। এই শুভ সম্মিলন সংঘটনের পূর্ব্বে ব্যক্তি বিশেষের মর্য্যাদা লইয়া আলোচনা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কেবল মাত্র সমাজ বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই যে এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা নহে, যাহাতে তাম্বুলি নামধেয় প্রত্যেক ব্যক্তিই মর্য্যাদাসম্পন্ন হইতে পারেন, তাহাই সভার অন্তর্লক্ষ্য।”

ইহার দ্বারাই পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হয় যে, বিরাট হিন্দুজাতির অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বা সম্প্রদায় মধ্যেও সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে অগ্রেই জাতিভেদের কথা উঠিয়া পড়িবে। তাম্বুলি সমাজের প্রথম অধিবেশনেই যে এই কৌলীন্যের তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছে, ইহা কেবল জাতিভেদেরই তর্ক বিতর্ক; কেন না, হিন্দু জাতি বা সম্প্রদায় সম্বন্ধে যাহা কৌলীন্য, বিরাট হিন্দু জাতি সম্বন্ধে তাহা জাতিভেদ। সুতরাং যদু বাবু যে বিবেচনা করিয়াছেন, জাতিভেদের ছায়ার তলে থাকিয়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলিতে সংশোধনাঙ্কুর গজাইতে পারে, তাহা তাঁহার ভ্রম। যে ভাবেই সামাজিক জীবনে অভিনবত্ব আসিয়া উপস্থিত হইবে—নবশাকে বৈশ্যত্ব, কায়স্থে ক্ষত্রত্ব কিম্বা নবশাকের কৌলীন্য ধ্বংস বা কায়স্থের কৌলীন্য ধ্বংস—তাহাতেই জাতীয় মহাভাব অর্থাৎ বর্ণভেদ প্রথার উষর ফল উৎপন্ন করিতে চাহিবে। সমুদ্রজলের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে তরঙ্গ তুলিব, সমুদ্র তাহা জানিতে পারিবে না; এ কথাও যেমন, জাতিভেদ প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈদ্য, লতাবৈদ্য,

গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর প্রভৃতি জাতি বৈশ্যত্ব লাভ করিবে; কায়স্থ, ছত্রী ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিবে, এ কথাও তেমন। ফলে এই যে ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্র স্তরেরভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আভিজাত্যের মূল্য নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, ইহাতে হয় জাতিভেদ সংবর্দ্ধিত, নয় ধ্বংসপ্রাপ্ত—ইহার এক ফল হইবেই। সুতরাং হিন্দু জাতিবৃন্দের দেখিতে হইবে, ইহার কিম্ভূত ফল তাহাদের প্রার্থনীয়।

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগে ছাত্র-সংখ্যাগুলিকে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ, দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সম্প্রতি হিন্দুজাতি মধ্যে পৌরোহিত্য ও লৌকিক শক্তিকে দ্বিধাকৃতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, ব্রাহ্মণ্য-শক্তির প্রতিকূলে লৌকিক শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট লৌকিকজীবনে প্রকৃত বল আনয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্ম, শিল্প, ব্যবসায়, উপনিবেশাদি বিষয়ে প্রজাবৃন্দকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিবেন। ফলে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বা বর্ণভেদ,যাহাকে সচরাচর হিন্দুয়ানি বলে, তাহা যে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরোধী, এ ধারণা ত গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের হ্রাস গবর্ণমেণ্টের হিতেচ্ছার ও তাঁহাদের স্বীয় সমাজ নীতির অনুকূল।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিগুলি—কায়স্থ, ছত্রী, রাজপুত; বৈদ্য, লতাবৈদ্য, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তিলি, তাম্বুলি, নাপিত, শৌণ্ডিক, সূত্রধর, কৈবর্ত্ত এবং চণ্ডাল বা নমঃশূদ্র;—এই সকল জাতি আভিজাত্যের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য যে ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ঠিক অনুকূল, এ কথা বলা যায় না। কায়স্থাদি জাতি ক্ষত্রত্ব, বৈদ্য লতাবৈদ্যাদি জাতি বৈশ্যত্ব অবলম্বনে পূর্ণ আর্য্য স্বত্ব লাভ করিতে চাহিলে, ইহা কখনই ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত হইবে না। মাননীয় বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় দেশহিতৈষী ও একতাপ্রয়াসী ব্যক্তিও কায়স্থ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন, ইহা আমরা জানি। অন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে কা কথা? সেই প্রকারে শৌণ্ডিকদিগের মালদহ জেলায় যজ্ঞসূত্র গ্রহণ, কৈবর্ত্তের মাহিষ্য নাম গ্রহণ, চণ্ডালগণের নবশূদ্র নামধারণ ইত্যাদি ব্যাপার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুমোদিত হয় নাই। শুনা গিয়াছে, এতাদৃশ নাম পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে নদীয়ার পণ্ডিতবর্গ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনও করিয়াছিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যশক্তি ভিতরে ভিতরে এই জাতীয় অভ্যুত্থান-চেষ্টার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে, এ কথা এক্ষণ বালকেও বুঝে। এবং এই অভ্যুত্থানও আর কিছুই নহে,ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের অযথা প্রভাবের প্রতি হিন্দুর গ্রীবাভঙ্গি। সুতরাং যেমন গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ দুই ভাগে হিন্দুজাতিকে পরস্পর বিরুদ্ধভাবে দণ্ডায়মান করিতে চেষ্টা করিতেছেন, হিন্দুজাতিবৃন্দও স্বভাবতঃ সেই ভাবে দণ্ডায়মান হইতেছে। এই উভয় ভাবের সংযোগে ক্রমশঃ যে এক অলক্ষিত মহাশক্তি জন্মিয়া উঠিতেছে, হিন্দুত্ব স্থাপনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর সমস্যা অন্য কোন দেবতা নাই।

হিন্দুজাতিবৃন্দের মধ্যে যে যে জাতির মধ্যে সমাজ-পুনঃসংগঠন মানসে সভা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের অনুষ্ঠান-পত্রাদি আমরা দেখিতে পাইয়াছি, সেই সেই জাতীয় সভাগুলির নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল, যথা—

(১) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা—কলিকাতা।

(২) বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবী সভা—যশোহর।

(৩) বঙ্গীয় তাম্বুলি জাতি সম্মিলনী সভা—কলিকাতা।

(৪) গান্ধিক বৈশ্য সমিতি—কাটোয়া।

(৫) বঙ্গীয় সূত্রধর সমিতি—কলিকাতা।

এতদ্ভিন্ন নমঃশূদ্র, মাহিষ্য ও সাহা বা শৌণ্ডিক জাতিও এই জাতীয় আন্দোলনে প্রকৃষ্ট ভাবে যোগ দিয়াছে, ইহা আমরা অবগত আছি।

এইক্ষণ একটী প্রশ্ন এই যে, এই সকল সমিতি কিম্বা এতাদৃশ অন্যান্য যে যে সমিতি বঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে কিম্বা হইবে, তাহাদিগকে একত্রিত ভাবে কার্য্যে রত করান যায় কি না? কোন সাধারণ ভিত্তি অবলম্বনে এই জাতিবৃন্দের কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হইতে পারে কি না? হিন্দু যদি একটী জাতি হয়, তবে এই সম্প্রদায়গুলি সমবেতভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমি এই বিষয় বৈশ্য-বারুজীবী সভার প্রবর্ত্তক বাবু যদুনাথ মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা এই ;—

"The Kayasta community is far more rich, influential and educated than my people and so they will have to follow the kayastas.

As regards the sacred thread I think I must wait for a year or two. I am trying to unite all the Baruis of all Bengal districts in one fraternity. Union is strength."

গন্ধবণিক সভার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষককেও আমি ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "এই সকল সভাগুলির একটী সাধারণ ধর্ম্ম আছে—তাহা হইয়াছে ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ, কেন না, ব্রাহ্মণগণ কিছুতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জন্মস্বত্ব' পুনর্দান করিতে ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং এই সাধারণ ভিত্তি অবলম্বনে সমাজ পুনঃসংগঠন প্রয়াসিনী সভাগুলির সম্মিলন হইতে পারে।" আমাদেরও এই বিশ্বাস। ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যকে সংযত করিয়া, পৌরোহিত্য শক্তিকে হিন্দুর হিতসাধিনী অবস্থায় আনয়ন করিতে না পারিলে, সমাজ-সংগঠনের এই সকল চেষ্টা বাস্পবুদ্বুদে পরিণত হইবে। যে সভাই যত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারাই তত আমাদের বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ফলে আমাদের এই জাতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাদের নিম্নলিখিত সম্বন্ধ কয়েকটী বিচার করিতে হইবে :—

১। আর্য্যানার্য্য সম্বন্ধ।

২। ক্ষত্র-বৈশ্য সম্বন্ধ।

৩। লোক-পুরোহিত সম্বন্ধ।

৪। দেব-মানব সম্বন্ধ।

১। এ দেশে বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। বিশুদ্ধ অনার্য্য জাতির অনুপাতও এক আনার অধিক হইবে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, লতাবৈশ্য, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, শূদ্র, কৈবর্ত্ত, রাজবংশী, নমঃশূদ্র, প্রভৃতি যে যে জাতি বর্ত্তমান সময়ে আছে, দেখা যায়, তাহারা সকলেই মিশ্র—আর্য্যানার্য্য রক্তোৎপন্ন। দীর্ঘকালের মিশ্রণ প্রণালীতে এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই নব্যভারতে "বর্ণসাম্য ও ধর্ম্মসাম্য" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বঙ্গের ব্রাহ্মণগণের গাত্রচর্ম্মের বর্ণ পরীক্ষায়

শতকরা ২৫ অংশের অধিক আর্য্যরক্তের নিদর্শন অনুভূত হয় না। অন্যান্য জাতি ত ব্রাহ্মণের পরে। ফলে অনার্য্যই বঙ্গীয় জাতিবৃন্দের গঠন উপাদানের মূলীভূত পদার্থ। এজন্য আমাদিগকে কেহ আর্য্যজাতি বলে না, আমরাও বলি না—আমরা বলি, আমরা হিন্দুজাতি অর্থাৎ আমরা মিশ্র জাতি। সুতরাং সমাজ পুনঃসংগঠন কালে এই আর্য্যানার্য্য বিভিন্নতা (যাহা এক্ষণে সাধারণতঃ আচরণীয়ত্ব ও অনাচরণীয়ত্বে রক্ষিত হইয়াছে) তাহা আর রাখার আবশ্যক নাই। চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি অনাচরণীয় জাতি, অনার্য্য-উপাদান সম্ভূতি স্বীকার করিলেও, অনাচরণীয়ত্বের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং শূদ্র ও বৈশ্যভাব গ্রহণ করিয়া আর্য্যানার্য্য বিভিন্নতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এই অনাচরণীয় জাতির লোকসংখ্যা বঙ্গে হিন্দু সংখ্যায় মধ্য শত করা ৭০এর কম হইবে না; তাহাতে ইহারা বৃদ্ধিশীল এবং আচরণীয় জাতি ক্ষয়শীল—লোকগণনার কাগজে ইহা প্রতিপন্ন হইবে—সুতরাং ইহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন জাতীয় কার্য্য সম্ভবপর নহে। সত্য বটে, ইহারা এক্ষণ পর্য্যন্ত সংমিশ্রণ জন্য প্রবল আবেগ প্রকাশ করে নাই, কিন্তু ইহারাই যে এই জাতীয় উত্থাপনের মূলীভূত কারণ, তাহার আমি একটুক ইতিহাস লিখিতেছি।

১৮৮৬ সনে "জল-চল" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হয়। তাহার মধ্যে একটী উপদেশ এই থাকে যে, লোক-গণনার সময় অনাচরণীয় জাতিগুলির "শূদ্র" বলিয়া অভিহিত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। চণ্ডাল জাতি প্রথমতঃ এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। ১৮৯১ সনের গণনা কালে গবর্ণমেণ্টকৃপায় তাহারা পুরা প্রচলিত "চণ্ডাল" নামের পরিবর্ত্তে নমঃশূদ্র" নাম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তদবধি ক্রমশঃ এইরূপ চেষ্টা চলিতেছে। প্রায় দশ বৎসর ব্যাপক চেষ্টায় কৈবর্ত্ত যে মাহিষ্য হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তস্থল চণ্ডাল। এই প্রকারের বঙ্গের জাতীয়তার নিম্নবর্ত্তী যে দুটী বৃহৎ ও সমধর্ম্মি স্তর আছে, তাহা গত পঞ্চাদশ বর্ষে প্রকম্পিত হইয়া যে চঞ্চলতা উদ্দীপিত করিয়াছে, আজ সেই চঞ্চলতা বশতঃ (যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি) হাইকোর্টের বিচারপতির আসানাসীন কায়স্থেরও চঞ্চল ভাব উপস্থিত হইয়াছে। ফলে জাতির একটী অঙ্গ কাজ করিবে, অন্য অঙ্গ চুপ করিয়া থাকিবে, ইহা কখনই হইবে না। আর্য্যানার্য্য সম্বন্ধ বিচার না করিয়া এবং পরস্পরের সহানুভূতি ব্যতিরেকে আমরা কিছুই করিতে পারিব না। যে পর্য্যন্ত আমাদের বাক্ বিতণ্ডার অবস্থা আছে, যে পর্য্যন্ত বক্তৃতা প্রবন্ধ নৃত্যগীত হাস উপহাসাদির অবস্থা আছে, সে পর্য্যন্ত আমরা অনার্য্য-সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিব; প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, পদে পদে তাহাদের দরকার হইয়া উঠিবে।

২। যেমন বঙ্গে আর্য্য নাই, তেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও নাই। এই সকল জাতীয় নদীগুলি বহুকাল হইতে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং সে সে স্থানে কেবল বালির স্তূপ ও অগাছা গজাইয়া উঠিয়াছে; তবে আছে এই সকল জাতীয়তাগুলির এক একটী স্রোতোরেখা। তাহাতে কোথাও কিঞ্চিৎ জল বহিতেছে, কোথাও বহিতেছে না। যেখানে বহিতেছে না, সেখানেও

একটুকু চিহ্ন আছে এই মাত্র। ইহার মধ্যে ক্ষত্র বৈশ্যের অবস্থা অতি ম্লান ও হীন।

ক্ষত্র বৈশ্যের বিশেষত্ব প্রখরিত করিতে হইলে আদৌ তাঁহাদের জন্মস্বত্ব বুঝিতে হইবে। ক্ষত্র বৈশ্যের জন্মস্বত্ব ব্রাহ্মণের সঙ্গে সমান, তাঁহাদের বেদে যজ্ঞাদিতে তুল্য অধিকার আছে। বৈশ্যের সন্তান, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ও ব্রাহ্মণের সন্তান ইচ্ছাক্রমে যে কোন দৈবকার্য্য করিতে পারে। সুতরাং ক্ষত্র বৈশ্যের এই জন্মস্বত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইল, অথচ ক্ষত্রিয়ের কোন অধিকার জন্মিল না; নবশাক বৈশ্য হইল, অথচ বৈশ্যের কোন অধিকার গ্রহণ করা হইল না; এসকল বৈশ্যের উপবীত গ্রহণের ন্যায় অর্থশূন্য কার্য্য। ইহাতে কোন জাতির যে সম্মান বৃদ্ধি হয়, এরূপ আমাদের বিশ্বাস নাই। কেহ কেহ বলেন, বৈদ্য জাতি গত ১৫০ বৎসরে অনেকে উপবীত গ্রহণ করিয়া কায়স্থাদি জাতি অপেক্ষা লোকচক্ষে ও রাজার চক্ষে সম্মানার্হ হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের সে ধারণা নহে। বৈদ্যের এক্ষণ সমাজে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সম্মান, উপবীত গ্রহণ না করিলেও বৈদ্যের এই সম্মান হইত—এই সম্মান বৈদ্যের একতা, কর্ত্তব্যতৎপরতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচায়ক; আভিজাত্য কিম্বা যজ্ঞ-সূত্রের মূল্য বশতঃ হয় নাই। তবে বৈদ্য যখন বৈশ্য প্রণালীতে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন, তখন বৈশ্যের স্বত্ব লাভের জন্যও তাঁহার চেষ্টা হওয়া উচিত। ফলে ক্ষত্র বৈশ্যান্তর্গত জাতি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সমধর্ম্মে সংস্থাপিত হইয়া ক্রিয়াকর্ম্মে আদান প্রদানে একীভূত হইয়া প্রকৃত আর্য্যত্বের ছাঁচে পুনর্গঠিত না হইলে এবং শূদ্রস্তরের জাতিগুলি সংমিশ্রিত ভাবে ইহাদের সঙ্গে যোগ না দিলে, এই সকল জাতীয় অভ্যুত্থানগুলি হিন্দুত্বের ভিত্তি ত দৃঢ় করিবে না; বরঞ্চ হিন্দুত্ব বিনষ্ট করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আক্রমণকারী ধর্ম্মগুলির সহায়তা করিবে। এরূপ দৃষ্টান্ত দাক্ষিণাত্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তথায় কোন কোন হীনজাতি হিন্দুজাতির উচ্চ স্তরের সংযোগে আসিতে চাহিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, পরিশেষে খ্রীষ্টান হইতে বাধ্য হইয়াছে। এজন্য বলিতেছি, ক্ষত্র বৈশ্যের ভিতরে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকা চাই যে, তাঁহাদের উত্থানের সহিত শূদ্রস্তরের জাতি গুলিকেও সমুত্থিত করিয়া লইতে হইবে। একথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, ক্ষত্র বৈশ্য সম্বন্ধের যে মূল্য কিম্বা বৈশ্য শূদ্র সম্বন্ধের যে মূল্য, ক্ষত্র ব্রাহ্মণ কিম্বা বৈশ্য-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধের সে মূল্য নাই। যে মুহূর্ত্তেই ক্ষত্র বৈশ্যের জন্মস্বত্ব লাভ করা হইবে, অথবা এই সকল জাতিধর্ম্মদাসত্ব ঘুচিয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষত্র বৈশ্য সম্বন্ধের মূল্য দ্বিগুণিত ও বৈশ্য শূদ্র সম্বন্ধের মূল্য চতুর্গুণিত হইয়া উঠিবে। এ ফল ভারতে অবশ্যম্ভাবী।

৩। এই সকল কথায়ই লোক-পুরোহিত সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন আনা উচিত, তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। মালদহে সাহা (শৌণ্ডিক) জাতি বৈশ্য-বণিক্ নামধারণ পূর্ব্বক যখন বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতে চাহিল, তখন তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ কিছুতেই তাহাদিগকে গৃহীতোপবীত করিতে চাহিলেন না; তাহারা বাধ্য হইয়া কাশী হইতে পশ্চিম প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিল। কিন্তু এইরূপ উপবীত গ্রহণ

আজ কয়েক ব্যক্তিরই হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কাঠিন্য বশতঃ তাহাদের জাতীয় উত্থান কেবল দুটী একটী ব্যক্তির মনোরথ পূর্ণ করিয়াই শেষ হইতে চলিল। বৈশ্য জাতিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীর্ঘকাল কষ্ট দিয়া আসিতেছে। অন্যান্য জাতিও বৈশ্য সাহাদের পথানুগামী হইলে, যুগযুগান্তর বসিয়া অন্তঃসারশূন্য এক নবীন আভিজাত্য লাভ করিতে পারিবেন। এজন্য আমরা বলিতেছি, এই পরিবর্ত্তন সময়ে এমন বিধান হওয়া উচিত যে, পুরোহিত দ্বিবিধ হয়েন, স্বজাতীয় ও ব্রাহ্মণ জাতীয়। যাহার যে পুরোহিতকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়, তিনিই তাহা করিতে পারিবেন। জাতি তাহাকে কোন মতে জাত্যন্তর করিতে চেষ্টা করিতে পারিবে না। এই মর্ম্মে সমুদায় সভাগুলিতে প্রস্তাব গৃহীত হইলে যেমন হিন্দুত্ব অগ্রসর হয়, তেমন উপস্থিত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়গুলি সত্বর সুসিদ্ধ হইতে পারে।

গুরু পুরোহিত সম্বন্ধ মধ্যে আর একটী কথা এই সময়েই শ্রোতব্য। ব্রাহ্মণবংশীয় পুরোহিত বলিলে সকল ব্রাহ্মণই পুরোহিত, একথা বুঝিতে হইবে না; যাঁহারা পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী, যজমানের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারাই পুরোহিত—এবং তাঁহাদিগকে পুরোহিতের পূর্ণ সম্মান দেওয়া উচিত। কিন্তু যে যে ব্রাহ্মণ যজন-যাজন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যে যে ব্যবসায়ে যিনি বড় হইয়াছেন, সেই সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বুঝিতে হইবে এবং আহার ব্যবহারে তাঁহাদিগকে তদনুসারে মর্য্যাদা দিতে হইবে। এজন্য বর্ত্তমান জাতি-সভাগুলির বিবাহ-ব্যয় কমাইবার জন্য এত ব্যস্ত না হইয়া শ্রাদ্ধের ব্যয় কমাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত। কেন না, শ্রাদ্ধকালীন ব্যয়ের অনেকাংশ প্রকৃত যজন-যাজনক্ষম ব্রাহ্মণ পোষণে ব্যয়িত না হইয়া অন্য বৃত্তি-শালী ব্রাহ্মণের জন্যে ব্যয়িত হয়।

৪। দেবমানব সম্বন্ধও হিন্দুজীবনের একটী প্রধান কথা। হিন্দু ঐশশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশকে দেবতা নাম দিয়া তাহাকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই অর্চ্চনা পূর্ব্বে অগ্নিতে যজ্ঞপ্রদান পূর্ব্বক সমাহিত হইত এবং সেই যজ্ঞে প্রত্যেক যাজ্ঞিক জাতিরই অধিকার ছিল। এই প্রথাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিমা পূজা প্রথায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিমা-স্পর্শ করার ক্ষমতা জাতিকে দেওয়া হওয়া নাই; জাতি কেবল দূরে থাকিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে, যজমানের সঙ্গে দেবতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ। ইহা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের একটী প্রধান ষড়যন্ত্র; ইহাতে যেমন একদিকে ব্রাহ্মণকেই দেবতুল্য করিয়াছে, তেমন অন্যদিকে যজমানকে মানবের প্রকৃত স্বত্ব, প্রকৃত মঙ্গলজনক অধিকার, যাহা দ্বারা দেবতার ভক্তি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে, তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। জাতীয় উত্থান সময়ে, সর্ব্বাগ্রে এই দেবমানব সম্বন্ধ বিচার করিয়া যাহাতে দেবতার সহিত জাতির ঘনিষ্টভাব স্থাপিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। দেবস্পর্শ-দোষ প্রথা উঠাইয়া দিয়া জাতিকে প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মদাসত্ব মুক্ত করিয়া লইতে হইবে; তাহা হইলেই সমুদায় সংস্কারকার্য্য সহজ হইয়া উঠে।

এই সকল পরিবর্ত্তন-চেষ্টা ভিন্ন এই জাতীয় উত্থানগুলির কোন মূল্য নাই। ইহাতে আমোদ আহ্লাদ, নাচভোজ, বক্তৃতা, করতালি বিস্তর থাকিতে পারে, কিন্তু

ইহাতে প্রকৃত জাতীয় ভাবের সমুত্থান হইতে পারে না। সুতরাং যাহাতে প্রাগুক্ত পরিবর্ত্তনের বীজ কার্য্যক্ষেত্রে রোপিত হয়, তজ্জন্য সকল গুলি সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক একটী স্থিরমতে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য। সেই মতানুসারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অযথা প্রশ্রয়কে সংযত করিয়া, জাতীয় উত্থান সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিয়া হিন্দুর ভবিষ্যৎ সমাজ ও ধর্ম্মনীতির পথ পরিষ্কার করা হউক। কায়স্থ-সভা এ বিষয়ে অগ্রণীত্ব গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কায়স্থ-সভার আজ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য-প্রণালী প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কায়স্থগণের ইহা বুঝা উচিত যে, তাঁহারা যে পথে চলিবেন, অন্যান্য জাতিও সেই পথে চলিবে, সুতরাং তাঁহাদের ভ্রমে সমুদায় জাতি গুলির ভ্রম উৎপাদন করিবে। তাঁহাদের তেজে সমুদায় জাতিগুলি তেজি-য়ান হইবে। কিন্তু তাঁহারা যদি কে কুলীন কে অকুলীন, কে বড় কে ছোট, এই কথা লইয়া কালাতিপাত করেন এবং অন্য জাতি গুলিকেও তাহাই করিতে শিক্ষা দেন, ভাষার এমন বাক্য নাই, যাহার দ্বারা আমরা তাঁহাদের কার্য্যের যথেষ্ট প্রতিবাদ করিতে পারি।

পরবর্ত্তী এক প্রবন্ধে কায়স্থ-সভার কার্য্য প্রণালীর সমালোচনা করিবার বাসনা থাকিল।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর।

আমিয়-মাখা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা যাহারা প্রথমে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া, কলিকলুষ মানবকুলকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহা-দের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা ভক্ত কবি শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য-চরি-তামৃত-রচয়িতা পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা মহানুভব শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের নামই বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। ফলতঃ কি শ্রীচৈতন্যভাগবত, কি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, এই তিন খানা গ্রন্থই অতুলনীয়। কোন খানের সহিতই কোন খানের তুলনা হয় না। মনে হয়, এই গ্রন্থ তিন খানা যেন সুরধনীর তিনটী ধারা; জীবকুলের শান্তিধামে যাইবার যেন তিনটী প্রশস্ত পথ। যতকাল বঙ্গভাষা থাকিবে, ততকাল এই গ্রন্থত্রয়ের সঙ্গে গ্রন্থকারগণও সাহিত্য-জগতে অমর হইয়া থাকিবেন। বঙ্গ সাহিত্যের শিক্ষাগুরু বলিয়া, সাহিত্য সেবী মাত্রেই ইঁহাদের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন। আজ আমরা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা ভক্তিরসের বিমল মধুমুগ্ধ সেই বিখ্যাত কবি মহানুভব লোচনদাস ঠাকু-রের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইব। বর্দ্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে, গোস্কুরা ষ্টেশনের নিকট-বর্ত্তী কো-গ্রামে বৈদ্যকুলে লোচনদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ণ নাম সুলোচন দাস, পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী, মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহীর নাম অভয়া দাসী। তাঁহার পিতা ও মাতামহ প্রভৃতি সকলেই বৈষ্ণব

ও পরম গৌরভক্ত ছিলেন। মাতামহের বাড়ী উক্ত কো-গ্রামেই ছিল। লোচনের আর কোন সহোদর ছিল না। অতি আদরে বাল্যকালে তিনি নিতান্ত দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ? লেখাপড়ায় কিছু মাত্রও মনোযোগী ছিলেন না। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের বহু যত্নে ও শাসনে তাঁহার লেখা পড়া শিক্ষা হয়। ক্রমে বঙ্গ ও সংস্কৃত ভাষাতে তিনি পরম পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে লোচনদাস তাঁহার কুলগুরু শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় গুরু গৃহেই অতিবাহিত করেন। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়, সরকার ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে লোচনদাসও পুরুষোত্তমে শ্রীগৌরচন্দ্রের নিকট যাইতেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় শ্রীখণ্ডবাসের জন্যই, বোধ হয়,' তখন সকলে তাঁহাকে শ্রীখণ্ডবাসী বলিয়া জানিতেন। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাকে শ্রীখণ্ডবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব হইলে পরেও লোচন দাস তাঁহার গুরুগৃহ পরিত্যাগ করেন নাই। সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন সরকার ঠাকুরের আশ্রয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খেতরি গ্রামে এক মহা মহোৎসব হয়। তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া রঘুনন্দনাদি মহান্তগণের সঙ্গে লোচনদাসও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৫৩৭ শকাব্দার কিছুকাল পরে, নিজে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা যাহা দেখিয়াছিলেন, পিতা ও মাতা সহ এবং অন্যান্য মহান্তগণের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা ও শ্রীমুরারী গুপ্ত কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন যে, বৃন্দাবন দাস যে সময় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন, লোচনদাসও ঠিক সেই সময় তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় বৃন্দাবন দাস তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত নাম রাখেন। এ সম্বন্ধে বহু লোকের নিকট বিস্তর কিম্বদন্তীর উল্লেখ শুনা যায়। কিন্তু কোন প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ না থাকায় এবং নানা কারণে আমাদের নিকট ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করিলে, তাঁহার গ্রন্থ কি গৌড় দেশ, কি শ্রীবৃন্দাবন, সর্ব্বত্রই বিশেষরূপ সমাদৃত হয়। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পাঠ ও ব্যাখ্যা বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিতেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষ লীলার বিস্তার বর্ণনা না থাকায়, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের অনুরোধে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৃন্দাবনদাসকৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৩৭ শকাব্দাতে চরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ইহাতে জানা যায় যে, এই সময় পর্য্যন্ত বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নাম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ইহার

আমি শুধু চাহি নাথ, তোমারে ছাড়িয়া
আমি যেন নাহি থাকি দূরে ;
তোমা'তে আপনা ঢালি, তোমাময় চিতে
রহি যেন তব অন্তঃপুরে।

১৩

আমি শুধু চাহি নাথ, তোমার বসুধা
আমি যেন ভাবি আপনারি ;
এই গর্ব্ব টুকু দিও—চরণে মিনতি
বুঝি যেন তুমিই আমারি।

শ্রীকাব্য-কুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী

কয়লার খনি। (১)

খনিতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে হইলে ভূতত্ত্ব জানা আবশ্যক। ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রস্তর এবং ধাতু সকল ভূতত্ত্বের দ্বারা পৃথক করিয়া কোন ধাতুর অবস্থা, আকারভেদে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

প্রায় ৪০ বৎসর অতীত হইল, রাণীগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে প্রথম কয়লার খনির কার্য্য আরম্ভ হয়। অধুনা বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ও মানভূম জেলার গোবিন্দপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত ঝরিয়া, গিরিডি, আসাম, মধ্য-ভারতবর্ষে মহাপাণী ; হায়দারাবাদে সিঙ্গারাণী, মান্দ্রাজে রাজা হজুমপালা, পাঞ্জাবে দান্দাদপিট প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনির কার্য্য চলিতেছে।

ভারতবর্ষের বোম্বাই, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, রাজপুতানা এবং মহীসুর প্রদেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই ভূগর্ভে কয়লা দৃষ্ট হয়।

কয়লার খনির কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমতঃ কয়লার গুণ নির্দ্দেশ করা উচিত মনে করি। হায়ড্রোজন, সালফর, কার্বন এ্যাস (ছাই) আকাশজল, ও জল কয়লায় মিশ্রিত হইয়া কয়লার রাসায়নিক পদার্থ সংঘটন হইয়াছে। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় কয়লারও ইতর বিশেষ আছে। ভাল কয়লার স্থান নিরূপণ না করিয়া অর্থব্যয় করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

বঙ্গদেশে বেগুনিয়া, জয়রামডাঙ্গা, বারবণি, ডিসার গড়, নওয়াপাড়া, গিরিডির করার বাড়ী, ঝরিয়া গোপালিচক, সাঁকতোড়িয়া, আসামে মাকুম ও চিরাকুঞ্জি, দিক্ষু, মাউকান স্থানের কয়লা উৎকৃষ্ট।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কয়লা ঝরিয়ার ১৫ নং, ১৬ নং ও ১৭ নং সিম ব্যতীত, তপসী ও আসানসোলের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে দৃষ্ট হয়।

কয়লা আকার ও গুণ বিশেষে পৃথক পৃথক নামে কথিত হইয়াছে যথাঃ—ষ্টীম* রবল, ডাষ্ট সফট্ কোক, হাউ কোক। খনির কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে অগ্রে দেখিতে হইবে, যে স্থান খনির কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে খনির কার্য্য চলিতেছে কিনা ও যদি

* ষ্টীম্—এঞ্জিনে পোড়াইবার বড় আকারের কয়লা।
রবল—ইট্ পোড়াইবার ছোট আকারের কয়লা।
ডাষ্ট—কয়লার ধূলা ইহার দ্বারাও ইঁট্ পোড়ান হয়।
সকট্ কোক্—রাঁধিবার কয়লা।
হাউকোক্—ইহা কয়লার গুড়ো এবং গোবর মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা হয় ; ইহার উত্তাপ অধিক এবং ইহা দ্বারা লোহা এবং শক্ত ধাতু গলান যায়।

কোন স্থানে খনির কার্য্য চলিয়া থাকে, তবে ঐ স্থানের উত্থিত কয়লা কোন্ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর কয়লা না হইলে খনির কার্য্য আরম্ভ করিয়া বিশেষ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঐ জমীর নিকটে কোন রেলওয়ে লাইন আছে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে; কারণ কয়লা উত্তোলন করিয়া যাহাতে অল্প ব্যয়ে বিক্রয় স্থানে রপ্তানী হইতে পারে, তদ্বিষয় দ্রষ্টব্য। অনেক সময় উত্তম কয়লার জমীতে, বহু ব্যয় করিয়া কোয়ারি-খাদে কয়লা বাহির হওয়ার পর কয়লা রপ্তানী না হওয়াতে সমস্ত অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন খুলিবার পূর্ব্বে কয়েকটী কয়লার কোয়ারি-খাদ হইতে কয়লা বাহির হওয়ার পর, গোগাড়ি দ্বারা দামোদর নদীতে চোলাই করিয়া নৌকায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে এত ব্যয় হইয়াছিল যে, উক্ত ব্যবসায়ে কোন প্রকার লাভ না হইয়া বরং লোকসান হইয়াছিল।

খাদের সন্নিকটে কয়লা কাটিবার কুলি পাওয়া যায় কি না, তাহাও দেখা আবশ্যক। দূর হইতে কুলি আমদানি করিয়া তাহাদিগকে মজুরী প্রদান করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যে স্থলে কুলি অধিক পাওয়া যায়, সেই স্থলে কার্য্য আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত।

ইউরোপের ইংলণ্ড, জর্ম্মনী এবং অন্যান্য স্থান সমূহের কয়লা ভূগর্ভের অনেক নিম্ন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত প্রদেশে খনির কার্য্য পরিচালনা করা ব্যয়-সাধ্য ও আশঙ্কাপ্রদ হইয়া থাকে। উক্ত খনি সমূহের গ্যাস সময়ে সময়ে জমাট বাঁধিয়া প্রাণনাশক হয়।

ভারতবর্ষে কেবল ডিশারগড় ও ছোট ধেমুয়ার খনি সমূহে গ্যাস বাহির হইয়া কয়লাকাটা কুলিদিগের প্রাণনাশ করিয়াছিল। এই সমস্ত গ্যাসের গন্ধ ডিম পচার ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

বঙ্গদেশে কয়লার গতি প্রায় উত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধাবিত হইতে দেখা যায়।

যে স্থান অর্থাৎ যে সীমা হইতে কয়লার সিম প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, ঐ সিমকে আউটক্রপ অর্থাৎ উৎপত্তির স্থান কহে এবং যে দিকে কয়লার গতি ধাবিত হইয়াছে, উহার শেষ ভাগ অথবা নিম্ন ভাগকে ডিপ্ সাইড বলে। ডিপ্ সাইড্ এবং আউট্‌ক্রপ উভয়েই খনিতে সংলগ্ন থাকিলে কার্য্যের সুবিধা হয়।

বোরিং—কয়লার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বোরিং করা আবশ্যক; কিন্তু উক্ত স্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। যে ব্যক্তি বোরিং স্থান নির্দ্দেশ করিবেন, তাঁহার কয়লার উপরিস্থ জমীর স্থান বিশেষ চিন্তা করিয়া এমন ভাবে বোরিং করিবার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে বোরিং রড্ চালাইলে ডাইক, এবং ভূষে না পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। কয়লার জমীর আউটক্রপের ও ডিপ সাইডের মধ্যবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে বোরিং দ্বারা কয়লার গতিবিধি জানিতে পারা যায়। কয়লার জমীর বিষয় ভাল প্রকারে না জানিয়া শুনিয়া বোরিং করিলে প্রায়ই নিষ্ফল হইতে হয়। জমীর অবস্থা পূর্ব্বে না জানা থাকিলে, বোরিং না করিয়া খাদ কাটাই আরম্ভ করিলে সাধারণত অর্থব্যয় হইয়া কার্য্য নষ্ট হয়।

বোরিং যন্ত্র দুই প্রকার (১) হাত বোরিং (হ্যাণ্ড বোরিং) (২) কল বোরিং (ডায়মণ্ড ড্রিল বোরিং)।

হাত বোরিং :—হাত বোরিং করিতে হইলে দশ দশ ফিট করিয়া এক একটী বোরিং রড্ ব্যবহার করিতে হইবে। ঐ বোরিং রড্ চিসেল, অর্থাৎ পাথর কাটিবার এক প্রকার ধারাল যন্ত্রে সংলগ্ন করিয়া, কয়লা পাইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, চিসেল ঘুরাইয়া চালাইতে হইবে। চিসেল ক্রমশঃ মাটী ও পাথর কাটিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে পর চিসেল উঠাইয়া বোমাযন্ত্র দ্বারায় নিম্নস্থিত পদার্থ উত্তোলন করিয়া তাহার প্রকৃতি সহজে বুঝা যায়। হাত বোরিং করিবার কুলিগণ অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিয়া চিসেল নির্দ্দিষ্ট ভূগর্ভে না চালাইয়া, কয়লা না পাইয়াও কয়লা পাইয়াছি বলিয়া মিথ্যা সংবাদ দিয়া থাকে, সুতরাং এরূপ স্থলে সন্দেহ হইলে কুলিদিগের প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বাসী ব্যক্তিকে বোরিং কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত।

হাত বোরিংয়ের নমুনা প্রত্যেক ১০ ফিট কার্য্যের পর ৩" তিন ইঞ্চি স্কোয়ার এক এক খণ্ড করিয়া রাখিয়া এবং ঐ নমুনার উপর কত ফিটের নমুনা লিখিতে হইবে। ১০০ শত ফিটের মধ্যে, জমীর নীচে কয়লা থাকিলে হাত বোরিং দ্বারা কয়লার গতিবিধি জানিতে পারা যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে শক্ত পাথর লাগিলে হাত বোরিং দ্বারা পাথর কাটিতে অনেক সময় নষ্ট হয়। সাধারণতঃ হাত বোরিং ২।৩ জন ব্যক্তি দ্বারাই পরিচালনা হইয়া থাকে। যেমন গর্ত্ত অধিক হইতে থাকে, অর্থাৎ যখন একটী রড্ শেষ হইবার সম্ভাবনা হয়, অমনি তাহাতে আর একটী রড্ সকেট দ্বারা সংলগ্ন করিতে হয়। ৪৫ ফিটের অধিক বোরিং করিতে হইলে ৪।৫ জন লোকের আবশ্যক হইয়া থাকে। অধিকদূর বোরিং করিতে হইলে কলবোরিং আবশ্যক। প্রথমতঃ বোর করিবার সময়ে একটী কাষ্ঠের গোলাকার চিসেলের (ডায়েমেটর) ব্যাস পরিমাণ একটী গর্ত্ত করিয়া এবং ঐ কাষ্ঠখণ্ড ভূমির উপর রাখিয়া উহার মধ্য দিয়া চিসেল চালাইতে হইবে।

কল বোরিং :—কল বোরিং (ডায়মণ্ড-ড্রিল-বোরিং) ভূগর্ভের অনেক নিম্নে অর্থাৎ ১০০ ফিটের নিম্নেই প্রশস্ত। ইহা দ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে চলিয়া থাকে। কল বোরিংয়ের ব্যবসা কলিকাতার কিলবরণ কোম্পানির একচেটিয়া। ইহারা প্রথম ১০০ ফুট ৪্ টাকা এবং তদূর্দ্ধ প্রতি শত ফিট ৫্ কিম্বা ৬্ টাকা হারে লইয়া থাকে। কেহ ইচ্ছা করিলে কল বোরিং নিজের ব্যবহারের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে ক্রয় করিয়া আনিতে পারেন, কিন্তু অন্য কাহাকেও ভাড়া দিতে পারেন না।

কল বোরিং চালাইতে হইলে একটী বয়লার ও ইঞ্জিন, রড্ চালাইবার জন্য আবশ্যক।

বোরিং রড্ সাধারণতঃ ১০ ফিট লম্বা এবং উহার উভয় দিকেই পেঁচ কাটা। রড্ পরস্পর সংলগ্ন করিতে হইলে সকেট দ্বারা সংলগ্ন করিতে হয়। এই প্রকারে পরস্পর রড্ সংলগ্ন করিয়া যত নিম্নে চিসেল দ্বারা পাথর কাটিয়া রড্ চালাইতে ইচ্ছা করা যায়, তাহা পারা যায়।

উক্ত বোরিং করিবার সময়ে একটী প্ল্যাটফরম অর্থাৎ একটী উচ্চ স্থান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ওয়াইনডিং এঞ্জিন বসাইয়া

এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী ভার্টিকেল বয়লার স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা এঞ্জিনে ষ্টীম যোগাইয়া রড্ এঞ্জিন দ্বারা চালাইতে হয় এবং অতি অল্প সময় মধ্যেই কল বোরিং দ্বারা ভূগর্ভের অতি নিম্ন হইতে প্রস্তর, ধাতু, কয়লা ইত্যাদি উপরে উত্থিত করা যাইতে পারে এবং প্রত্যেক রডের গোলাকার হীরক-খণ্ডের মধ্যস্থিত কোর দ্বারা নিম্নস্থ ধাতু, কিম্বা প্রস্তর, কিম্বা অন্য কোন খনিজ পদার্থ উপরে উত্তোলন করিয়া ধাতুর আকার জানিতে পারা যায়।

ঐ সমস্ত কোর নমুনার জন্য রাখা উচিত। বোরিং করিয়া কয়লার রাইজ অর্থাৎ যে দিক হইতে কয়লার গতি নিম্নে চলিয়া আসিয়া ডিপ্ সাইডে মিশিয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায়। যে জমী কয়লা উত্তোলন করিতে লওয়া হইয়াছে, তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া উপরিস্থিত যে স্থানে অফিস ঘর, বাড়ী ও ষ্টোর নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং খাদ কাটাইতে উপরিস্থ যতটা জমী আবশ্যক হইবে, তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া সমস্ত জমীর একটী নক্সা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। নক্সা প্রস্তুত হইলে যদি ঐ জমীতে ডিপ্ সাইড ও আউটক্রপ উভয়ই থাকে, তাহা হইলে আউটক্রপ লাইনের জমীর পরিমাণ অনুসারে এক বা ততোধিক কোয়ারি এবং ইনক্লাইন কাটিতে হইবে। কয়লার খাদ তিন প্রকার, কোয়ারি, ইনক্লাইন এবং পিট্।

কোয়ারি—অর্থাৎ পুকুরে-খাদ ;—সাধারণতঃ ৭।৮ ফিট হইতে ২০।২৫ ফিট মাটী এবং পাথর কাটিয়া কয়লা বাহির হইলে কোয়ারি খাদ করিয়া থাকে। কোয়ারি খাদের আকৃতি এক প্রকার পুকুরের ন্যায় বলিয়াই ইহাকে পুকুরে খাদ বলিয়া থাকে। ইহা প্রায়ই আউট ক্রপ লাইনের সীমাভুক্ত হইয়া থাকে। কোয়ারি খাদ হইতে কয়লা তুলিতে হইলে আলোর প্রয়োজন হয় না। কোয়ারি খাদে জল মারিবার জন্য একটী ভার্টিকেল বয়লার—ও ৬×১২ স্পেসিয়াল পম্পের আবশ্যক। স্পেসিয়াল পম্পে জল না মারিলেও শুখান কোয়ারি খাদ চলিতে পারে, কিন্তু বর্ষাকালে কোয়ারি খাদ জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এমন কি, বৃষ্টি হইলে স্পেসিয়ালেও জল মারাই কষ্টকর হইয়া থাকে। কোয়ারি খাদের কয়লা ভাল হয় না। কোয়ারি খাদ করিয়া তাহার পর কয়লার চালের দৃঢ়তা দেখিয়া ২।৪টী সুঁদ চালান যাইতে পারে। কিন্তু সুঁদ চালাইবার সময় অতি সাবধানে চাল পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। কোয়ারি খাদের চাল সাধারণতঃ এত নরম হইয়া থাকে যে, উহা সময়ে সময়ে পড়িয়া গিয়া সুঁদ বন্ধ করিয়া ফেলে, এবং সুঁদে লোক থাকিলে, প্রাণে মরিবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্ষাকাল কোয়ারি খাদ জলে ডুবিয়া যায় এবং তাহাতে কার্য্য করা যাইতে পারে না।

ইনক্লাইন্—(সিঁড়িখাদ) ইহা দ্বারা কুলিগণ সিঁড়ি দিয়া কয়লা স্থানে নামিয়া কয়লা কাটিয়া ঝোড়া দ্বারা মাথায় করিয়া উপরে আনিয়া, কয়লার গাদা বাঁধিয়া থাকে। সাধারণতঃ চল্লিশ পঞ্চাশ ফিটের উর্দ্ধ কয়লার স্থান নিম্নে জানিতে পারিলে সিঁড়ি খাদে উত্তম কার্য্য হয় না। কয়লার স্থান গভীর হইলে পিট খাদ দ্বারা কয়লা উত্তোলন সহজে হইয়া থাকে। সিঁড়ি খাদ এমন ভাবে স্থানবিশেষে করিতে হইবে যে,

কুলিগণের কয়লা কাটিয়া কয়লা ঝোড়ায় করিয়া উপরে আনিতে ক্লেশ বোধ না হয়। এঞ্জিন দ্বারা কয়লা উত্তোলন করিতে হইলে সিঁড়ির প্রশস্ততা কিছু অধিক করিতে হইবে। সিঁড়ির ঢাল (শ্লোপ) এমন ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে কুলি-কামিনীদিগের উঠিতে ও নামিতে কষ্টবোধ না হয়।

সিঁড়ি খাদে মূল সুঁদ চালাইবার পূর্ব্বেই একটী ভার্টিকেল বয়লার ও একটী স্পেসিয়েল পম্প ইন্‌ক্লাইনের উপরে স্থাপন করিয়া জল মারাইয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত সিঁড়িখাদ ডিপ্ সাইডের পিটের সহিত সংযোগ না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত ঐ ভার্টিকেল বয়লার ও স্পেসিয়েলের দ্বারা জল মারাই করিতে হইবে। ঐ ইন্‌ক্লাইন বা সিঁড়িখাদ হইতে অন্যূন ৩০০ তিন শত ফিট দূরে ডিপ্ সাইডের দিকে এমন একটী পিট বা কোয়াখাদ কাটিতে হইবে, যদ্দ্বারা ঐ ইন্‌ক্লাইনের সমস্ত জল ঐ পিটখাদ দ্বারা উঠাইতে পারা যায়। ইনক্লাইন কাটিয়া তাহার নিম্নদেশের মূল সুঁদ যাহাতে সত্বর পিটখাদে উক্ত মূল সুঁদের সহিত যুক্ত হয়, তাহা অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য। সিঁড়ি খাদ কাটাইবার সময় যদি শক্ত পাথর না পাওয়া যায়, তবে ঢালভাবে সিঁড়ির মাটী কাটিয়া বর্ষার পূর্ব্বে ঐ মাটীতে ঘাসের গোড়ায় গোবর মিশাইয়া ঘাসের চাবড়া সমস্ত ঢালুতে বসাইতে হইবে, এবং যদি তাহাতে ইনক্লাইনের মাটী ভাঙ্গিয়া পড়ে, এরূপ আশঙ্কা হয়, তখন ইঁটের দ্বারা কালভার্ট করিয়া শক্ত কয়লার স্থান পর্য্যন্ত গাঁথিয়া ফেলিবে এবং তাহার পর মূল সুঁদে কয়লা কাটিতে আরম্ভ করিবে।

(২) পিটখাদ :—ইহা বড় পাতকুয়ার ন্যায়; মাটী ও পাথর কাটিয়া কয়লার স্থানে প্রবেশ করিয়াছে। পিটখাদ ১৪´ হইতে ১৬´ ফিট ব্যাস লইয়া এতদ্দেশে কাটাই হইয়া থাকে। পিট খাদ কাটিতে আরম্ভ করিবার পর, যে পর্য্যন্ত শক্ত পাথর না লাগিবে, সেই সময় পর্য্যন্ত ঝোড়া দ্বারা মাটী উত্তোলন করিয়া উপরে একটু দূরে মাটী ফেলিতে হইবে। তাহার পর শক্ত পাথরের স্থান পর্য্যন্ত মাটী কাটাইয়ের পর পৌঁছিলে, ইট দ্বারা ঐ শক্ত পাথরের উপর হইতে গোলাকার করিয়া জমীর উপর পর্য্যন্ত গাঁথিয়া ফেলিবে। অধিক নিম্নে পাথর লাগিলে পর মাচান করিয়া ক্রমে ক্রমে উপরে গাঁথিয়া আসিতে হইবে এবং যখন খাদের কার্য্য না চলিবে, তখন উহা মাচান কিম্বা অন্য কোন প্রকার কাঠের পাটাতন দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে, যেন কোন প্রকারে কোন প্রাণী উহাতে না পড়িতে পারে।

অন্ততঃ ২০´ কিম্বা ৩০´ ফিট পর্য্যন্ত কপিকলে খুব শক্ত দড়ি অর্থাৎ ম্যানিলা রোপে লোহার একটী বড় হুক বাঁধিয়া নামিয়া থাকে। ঐরূপ প্রণালীতে নামা উঠা আশঙ্কাপ্রদ। হুকে নামা অপেক্ষা ২½ ফিট স্কোয়ার একটী পাটাতন প্রস্তুত করিয়া তাহার সমকোণের দড়িতে হুক লাগাইয়া, তদ্দ্বারা নামা উঠা প্রশস্ত এবং ঝোড়ায় করিয়া মাটী ও পাথর তুলিবার সময় নীচের পাথরকাটা কুলিদিগকে ঝোড়াতে এরূপ ভাবে বোঝাই করিতে হইবে যে, ঝোড়া উপরে উঠিবার সময় উহা হইতে কোন পাথর খাদের মধ্যে না পড়িয়া যায়। কুলি-মার্ত্তুল দিয়া যখন পাথরকাটা অসম্ভব বোধ হয়, তখন বারুদ ব্যবহার করা উচিত। কয়লার স্থানে

প্রবেশ করিতে কি পিট খাদ, কি সিঁড়ি খাদ, উভয়েতেই শক্ত পাথর কাটিয়া এবং বারুদ দ্বারা পাথরে আগর বসাইয়া পাথর ক্রমশঃ উপড়াইয়া ফেলিয়া খাদ কাটিতে হয়। শক্ত পাথর লাগিলে অনেক বারুদ খরচ হয়। খাদ কাটিতে কাটিতে পাথরের ভিতর দিয়া অধিক জল বাহির হইলে, সাধারণ বারুদে কোন কার্য্য হয় না; কারণ বারুদ ভিজিয়া গেলে পলিতার আগুন ধরিলেও ভিজা বারুদের দাহিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে জলের স্রোত অধিক, সে স্থানে পাথরে আগর বসাইয়া ডিনোমাইট ডিটোনেটর ও ফিউজ (পলিতা) লাগাইয়া আগুন ধরাইলে জলে ভিজিলেও ডিনোমাইট ও ডিটোনেটরের শক্তি নষ্ট হয় না। জলের মধ্যেও ডিনোমাইট শক্ত পাথর চূর্ণ করিয়া প্রবল বেগে জোরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। ডিনোমাইটে আগুন দেওয়া মাত্রই, কার্য্যকারীদিগের এবং অন্যান্য কুলিদিগের ডিনোমাইটের স্থান হইতে মুহূর্ত্ত সময় বিলম্ব না করিয়া, দূরে যাওয়া উচিত। নিকটে থাকিলে ডিনোমাইট কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত পাথর সমূহ দ্বারা আহত হইবার সম্ভাবনা।

বারুদ দিবার জন্য পাথরে ২" "হইতে ২½" ইঞ্চি আগর করিতে হইবে এবং ঐ আগরে বারুদ পূরিবার পূর্ব্বে শুখান গুঁড়া মাটী কিম্বা বালি দ্বারা ঐ আগরের চতুঃপার্শ্ব শুখাইয়া লইবে, পরে উহাতে বারুদ দিয়া ফিউজ লাগাইয়া পাথর উঠাইতে হইবে। আগরে বারুদ দিবার সময় সকল কুলি উপরে উঠিয়া আসিবে এবং বারুদের আওয়াজ হইবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে খাদে প্রথম এক জন হেড্‌কুলি নামিয়া তত্ত্বাবধান করিবার পর অন্য কুলিদিগকে নামাইতে হইবে।

ডিনোমাইটঃ—ডিনোমাইট এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ কাগজের ভিতর এক প্রকার মাটীর ন্যায় অগ্নি-উদ্দীপক পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুলিরা তজ্জন্য ইহাকে মাটী কহে।

ডিনোমাইট বিক্রয় জন্য কলিকাতায় গিলান্ডার আরবুথনট্‌ কোম্পানী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট ডিনোমাইট বিক্রয় হয় না। ডিনোমাইট ক্রয় করিতে হইলে পূর্ব্বে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া যে পরিমাণ ডিনোমাইট আবশ্যক হইবে, তাহা ব্যবহার করিবার জন্য অনুমতি লইতে হইবে। ডিনোমাইটের সহিত অগ্ন্যুদ্দীপক ডিটোনেটরের ও ডিনোমাইট অনুযায়ী পরিমাণ ধরিয়া পাশ লইতে হইবে। ডিনোমাইট ১" কিম্বা ১½" পরিমাণ ব্যাসের গর্ত্ত ৩' ফিট অন্তর ব্যবধানে গোলাকার করিয়া প্রথমতঃ আগর করিতে হইবে এবং খাদের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রে একটী ঐ প্রকার গর্ত্ত করিয়া উহাতে এবং অন্যান্য গর্ত্তগুলিতে ডিনোমাইট বসাইতে হইবে। তিনটী ডিনোমাইটের অতিরিক্ত একটী আগর স্থানে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যে ডিনোমাইটটী উপরে থাকিবে, উহার মধ্যে ডিটোনেটর ইঞ্চি ½" পরিমাণ ঢুকাইয়া সূতার দ্বারা ডিনোমাইটের উপরিস্থিত কাগজ ডিটোনেটরের মাঝামাঝি সূতার দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং তৎপরে উহাতে ফিউজ লাগাইয়া খাদ হইতে উঠিবার জন্য সদ্য প্রস্তুত থাকিয়া ফিউজ

গুলিতে আগুন ধরাইয়াই নিমেষের মধ্যে উপরে উঠিয়া আসিবে। ডিনোমাইটের ফিউজে আগুন লাগাইবার পূর্ব্বে যে খালাসী নিম্নব্যক্তিকে উপরে উঠাইবে, তাহাকে সাবধান করিতে হইবে যে, সাঙ্কেতিক চিহ্ন হইবামাত্রই উপরে উঠাইয়া লয়।

পিটখাদ ৩০। ৪০ ফিটের অধিক হইলে কপি কল দ্বারা উঠানামা না করিয়া পাল্লা বসাইয়া এঞ্জিনের দ্বারায় উপর ও নীচে উঠানামা করা যুক্তিযুক্ত। যতদিন পর্য্যন্ত খাদ কাটাই চলিবে, ততদিন পাল্লায় একটী পুলি লাগাইয়া তাহাতে এঞ্জিন হইতে রোপ ঝুলাইয়া একটী বাউতির দ্বারা খাদ কাটাই শেষ করিবে। সাধারণতঃ ডিনোমাইট কি প্রকারে উত্তম কার্য্য করিবে, কুলিগণ তাহা অবগত নহে, সুতরাং উপরে যে প্রকারে খাদে আগর দিয়া ডিনোমাইট দিতে হইবে, লেখা হইয়াছে, ঐ প্রকারে কুলিদিগের দ্বারা ডিনোমাইট দিবার ব্যবস্থা করিলে অতি অল্পদিন মধ্যেই, শক্ত পাথর হইলেও, পাথরকাটা কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। ডিনোমাইটের আওয়াজ হইয়া গেলে বারুদের ধুম দ্বারা খাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। খাদগাড়ো থাকিলে তৎক্ষণাৎ উপরের খাদমুখ বন্ধ করিতে হইবে। কারণ সময়ে সময়ে এমন ঘটিয়া থাকে যে, খাদের নিম্নস্থ পাথর ডিনোমাইটের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া খাদের উপর পর্য্যন্ত আসিয়া কুলিদিগকে আহত করিয়াছে। ডিনোমাইটের আওয়াজ হইবার পূর্ব্বেই খাদের উপরিস্থ ব্যক্তিগণ, খাদমুখ বন্ধ করিয়া, একটু দূরে গিয়া অবস্থান করিবে।

ডিনোমাইটের আওয়াজ হইবা মাত্র প্রত্যক শব্দকে গুণিয়া রাখিবে। অন্ততঃ ১ একঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া খাদে নামিতে চেষ্টা করিবে। যদি খাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, তবে বাউতিতে বড় তালগাছের ডাল কাটিয়া চারিটী পাতা যুক্ত ডাল বাউতির উপরে চারিদিকে লাগাইয়া বাউতিটীকে বার বার উঠা নামা করিলে বারুদের ধূম এবং গ্যাস বায়ুর সংঘর্ষণে ঘুচিয়া যাইবে, অর্থাৎ খাদের উপরিস্থিত পরিষ্কার বায়ু খাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থ বায়ুকে উপরে উঠাইয়া ফেলিয়া অন্ধকার দূর করিবে। যখন খাদের অভ্যন্তর পরিষ্কার হইবে, তখন নীচে নামিয়া দেখিতে হইবে যে, কয়েকটী ডিনোমাইট দেওয়া হইয়াছে, সেই পরিমাণ আওয়াজ হইয়াছে কি না? যদি ডিনোমাইটের সহিত আওয়াজের অনৈক্য হয়, অর্থাৎ আওয়াজ কম হইয়া থাকে, গর্ত্ত সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া যে ডিনোমাইটটীতে আগুন ধরে নাই, সেইটী উঠাইয়া লইয়া আসিবে এবং তাহাতে আগুন না ধরিবার কারণ নির্দ্দেশ করিবে। ডিনোমাইট কিম্বা বারুদ লইয়া যখন খাদে নামিবে, তখন কোন ক্রমে সঙ্গে আগুন লইয়া নামিবে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, কুলিগণ অনবধানতা বশতঃ কেরোসিন তৈলের আলো লইয়া বারুদ সহ নামিবার সময় হঠাৎ কেরোসিন তৈলের আলোর স্ফুলিঙ্গ পড়িয়া ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া কুলিগণের প্রাণনাশ করিয়াছে। বারুদ কিম্বা ডিনোমাইট লইয়া নামিবার সময়—একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান করা উচিত। খাদ কাটাইয়ের সময় এঞ্জিন খালাসীর নিকটে সাঙ্কেতিক ঘণ্টা নীচের সহিত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত এবং যে সাঙ্কে-

তিক চিহ্ন দ্বারা খালাসীকে বাউতি উঠাইতে নামাইতে, কি থামাইতে হইবে, তাহা যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। খালাসী ঘণ্টার শব্দ বুঝিয়া কার্য্য না করিলে সহজেই বিপদ হইবার সম্ভাবনা। খাদ কাটিবার সময়ে খাদে জল হইলে বাউতির তলা কাটিয়া তাহাতে এরূপ ভাবে একখানি ঢাকুনী দিবে, যাহাতে বাউতি জলের মধ্যে নামিলে জল বাউতির মধ্যে ঢুকিয়া বাউতি পূরিয়া ফেলিবে এবং বাউতি উপরে উঠাইবার সময়ে জলের জোরে বাউতির ঢাকনিটি বাউতিতে লাগিয়া যাইবে এবং জলনিঃসরণ বন্ধ হইবে এবং বাউতিটী উপরে উঠিয়া আসিবামাত্রই বাউতিটীকে খাদগাড়ী দ্বারায় খাদের মুখ হইতে অন্তরে টানিয়া লইয়া উহার জল নিঃসরণ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং পুনরায় বাউতিটীকে নিম্নে নামাইয়া জল উত্তোলন করিবে। বারংবার বাউতি দ্বারায় এই প্রকার সমস্ত খাদের জল নিঃশেষ করা যাইতে পারে; কিন্তু যদি কোন খাদে পাথর কাটাই করিবার সময় পাথরের সিওনির ভিতর দিয়া অধিক জলের স্রোত আসিয়া জলের পরিমাণ অধিক হয়, তবে ট্যানজি পেট্যাণ্ট ৬ × ১২ ফিট স্পেসিয়াল পম্প দ্বারা জলমারাই করিতে হয়। জলের জোর কম হইলে ছোট সাইজের পম্প দ্বারাই কার্য্য চলিতে পারে। ক্রমশঃ

শ্রীএম এন, রায়।

উদ্বোধন

জাগো জাগো ভারত মাতা!
চরণ-তলে তব অভিনব উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা।
অগণন জনগণ ধাত্রি!
অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা
অনন্ত সম্পদ দাত্রি!
মঙ্গলযুত তব কীর্ত্তি;
তব গুণ গৌরব তব যশ সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী। ১

শূরজননি সুরপূজ্যে!
নিহত সুকৃতি তব হৃত সুখগৌরব
দনুজদলিত নব রাজ্যে।
নব্য জগত ইতিহাসে
নগণ্য তুমি মা! অগণ্য মহিমা
বিস্মৃত দেশ বিদেশে।
জাগো জাগো ভারত মাতা!
চরণ-তলে তব রোদন উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা। ২

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বুয়র যুদ্ধ।

যুদ্ধের ঘটনাবলী সমালোচনা করিলে কি বুঝা যায় যে, ইংরেজ যুদ্ধ করিতেই কৃতসঙ্কল্প ছিলেন ?

পূর্ব্বে আমরা যে ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশ করিয়াছি, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই অনুমতি হইবে যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের নিমিত্ত কখনও প্রস্তুত ছিলেন না। যুদ্ধের নিমিত্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত থাকিলে যুদ্ধের প্রথম ভাগে

এরূপ অপদস্থ হইতেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের শেষাংশে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিস সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ৮০০০ সহস্র ছিল, তন্মধ্যে ৫০০০ পাঁচ সহস্র নাটালে অবস্থিত ছিল, তদ্ব্যতীত অশ্বারোহী পুলিস, ভলাণ্টিয়ার, রাইফেল্‌, ক্লাবের মেম্বার প্রভৃতি কতিপয় শিক্ষিত অস্ত্রধারী যোদ্ধা ছিল। যখন আকাশের মেঘের সঞ্চার আরম্ভ হইল, তখন নাটাল আত্মরক্ষার নিমিত্ত সৈন্যবল বৃদ্ধি করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। কেপ হইতে এক বেটেলিয়ন এবং জিব্রাল্‌টার হইতে এক বেটিলিয়ন প্রেরিত হইল, এবং কেপ হইতে প্রেরিত বেটিলিয়নের স্থান পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে আর এক বেটেলিয়ন প্রেরিত হইল। কিন্তু বুয়র পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ দিন দিন যেরূপ প্রভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহাতে উল্লিখিত পরিমাণ সৈন্যের দ্বারা আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইবে বলিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেন। তখন সেনাপতি সার্‌ জর্জ হোয়াইট, আল্ডারসট, মল্টা, ক্রিটি ও কেইরো, ইহার প্রত্যেক স্থান হইতে এক এক রেজিমেণ্ট সৈন্য, এবং ভারতবর্ষ হইতে ৭০০০ সাত সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইল। ইহার পরও বুয়রদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বুয়র নিশ্চয়ই ইংরেজরাজ্য আক্রমণ করিবেন। তখন ৭ অক্টোবর তারিখে ব্রিটিস রাজ্যের রিজার্ভ সেনাবিভাগ হইতে ৫০,০০০ সহস্র সৈন্যকে যোদ্ধৃসৈন্য সংখ্যাভুক্ত হইবার নিমিত্ত রাজাদেশ প্রচারিত হইল। এই সমস্ত সৈন্য সেনাপতি সার্‌ রেডভারজ্‌ বুলারের অধিনায়কতার অধীনে, সহকারী সেনাপতি (Lieutenant General) লর্ড মিথুএন্‌, সহকারী সেনাপতি সার্‌ উইলিয়ম গেটেকার্‌, সহকারী সেনাপতি সার্‌, এফ্‌, ফরেষ্টিয়ার এবং সহকারী সেনাপতি জে, ডি, পি, ফ্রেন্স কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে বলিয়া অবধারিত হইল।

এই আদেশ প্রচারিত হইবার দুই দিন পরেই বুয়র গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন এবং ১২ই অক্টোবর তারিখে ইংরেজ সৈন্যকে তাঁহারাই প্রথম আক্রমণ করিলেন।

বুয়র গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদিগের পক্ষসমর্থনকারীগণ বলিয়া থাকেন যে, বুয়র গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আত্মরক্ষার নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই করিয়াছেন, অন্য অভিপ্রায়ে তাহা করেন নাই। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে ব্লুমফন্‌টীন হইতে উভয় সাধারণতন্ত্ররাজ্যের প্রেসিডেণ্টদ্বয় ব্রিটিসরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী লর্ড সালিসবারীকে যে টেলিগ্রাফ করেন, তাহাতেও তাঁহারা বলেন যে, কেবল আত্মরক্ষার নিমিত্তই তাঁহারা এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই টেলিগ্রাফের মর্ম্ম আমরা নিম্নে সন্নিবেশিত করিতেছি।

"এই যুদ্ধ কেবল মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় মনে করিয়াই ইহাতে অবতীর্ণ হওয়া গিয়াছিল, এবং উভয় সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যই যে অবিতর্কিতরূপে আন্তর্জাতিক পূর্ণ রাজশক্তিশালী স্বতন্ত্র রাজ্য তদ্রূপে তাহাদিগের স্বাধীনতাকে নিরাপদ ও রক্ষা করা এবং মহারাজ্ঞীর যে সমস্ত প্রজা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছে, তাহারা কোনরূপে শারীরিক অথবা আর্থিক কোন বিষয় সম্বন্ধে বিপন্ন না হয়, তন্মর্ম্মে নিশ্চয়া-

ত্মক প্রতিশ্রুতি পাইবার নিমিত্তই পরিচালিত হইতেছে। উল্লিখিত সর্ত্তানুসারে; কিন্তু কেবল মাত্র উল্লিখিত সর্ত্তাধীনেই, আমরা এইক্ষণে, গত সময়ের ন্যায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তি স্থাপিত দেখিতে ইচ্ছা করি, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল অমঙ্গল এইক্ষণে রাজত্ব করিতেছে, তাহাদিগের শেষ করিতে ইচ্ছা করি। পক্ষান্তরে, মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট যদি এই দুই সাধারণ তন্ত্র রাজ্যের স্বাধীনতা বিনাশে দৃঢ় সঙ্কল্প হন, তবে আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, শেষ পর্য্যন্ত সেই পথে চলা ব্যতীত আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই।*

বুয়র জাতি যে অগ্রণী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে প্রেসিডেণ্টদ্বয়ও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা নিজদিগের কার্য্য এই বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বিবেচনায়, বুয়ররাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সেই পথ অবলম্বন করা উচিত বোধ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের এ কথা সমালোচনা করিলেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইংরেজ জাতির অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলে, এবং তাহাদিগের রাজ্য হস্তগত করিতে পারিলে, তৎপরে ইংরেজের টাকায় ইংরেজের ধার পরিশোধ করিয়া আরও কিছু লাভবান হইতে পারিবেন, এই আশাতেই তাঁহারা অগ্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

লর্ড সালিস্‌বরী ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের ১১ মার্চ্চ তারিখে উল্লিখিত টেলিগ্রাফের যে উত্তর দেন, তাহাতেও তিনি বুয়র রাজ্যকে যুদ্ধে অগ্রণী বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহার উত্তরের মর্ম্ম এই, বুয়র রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট শান্তির অবস্থাতেই ছিলেন, বুয়রগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া সেই ভাবের রূপান্তর ঘটাইয়াছেন। তাঁহারাই অগ্রে *

* "This war was undertaken solely as a defensive measure to safeguard the threatened independence of the South African Republic, and is only continued in order to secure and safeguard the incontestable independence of both Republics as sovereign international states, and to obtain the assurnace that those of Her Majesty's subjects who have taken part with us in this war shall suffer no harm whatsoever in person or property. On these conditions. but on these conditions alone, are we now, as in the past, desirous of seeing peace re-established in South Africa, and of putting an end to the evils now reigning over South Africa ; while, if Her Majesty's Govrenment is determined to destroy the independence of the Republics, there is nothing left to us and to our people but to persevere to the end in the course already begun."

* In the beginning of October last peace existed between Her Majesty and the two Republics under the conventions which then were in existence. A discussion had been proceeding for some months between Her Majesty's Government and the South African Republic, of which the object was to obtain redress for certain very serious grievances under which British Residents in South African Republic were suffering. In the course of these negotiations the South African Republic had, to knowledge of her Majesty's Government, made considerable armaments, and the letter had, consequently taken steps to provide corresponding reinforcements to the Brittsh garrisons of Cape town and Natal. No infringement of the right guaranteed by the Conventions had, up to that point, taken place on the British side. Suddenly at two day's notice, the South African Republic, after issuing an insulting ultinatum, declared war upon Her Majesty ; and the Orange Free State, with whom there had not even any discussion, took a similar step. Her Majesty's dominions were immediately invaded by the two Republics, siege was laid to three towns within the British frontier, a larger portion of the two colonies was overrun, with great destruction to property and life and the Republics claimed to treat the inhabitants of extensive portions of Her Majesty's dominions as if those dominions had been annexed to one or other of them. In anticipation of these operations

ব্রিটিস রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। এবং অনেক পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যতীত অন্য কোন জাতির বিরুদ্ধে তদ্রূপ আয়োজনের কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই সমস্ত কার্য্য আত্মরক্ষার নিমিত্ত হইয়াছিল কি না, সে বিষয় আলোচনা করা অনাবশ্যক, কিন্তু আয়োজনের ফল প্রত্যক্ষ; ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য বহু ব্যয়সাধ্য যুদ্ধে শত শত মূল্যবান জীবন বিনষ্ট হইবে। উভয় সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যকে যে অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা যেরূপ ভাবে অপব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে এই দুই রাজ্যের স্বাধীনতা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না।

ব্রিটিস রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীকে এই উত্তরের নিমিত্ত আমরা নিন্দা করিতে পারি না। বুয়র কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রে অবতীর্ণ হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখে ব্রিটিস্ বেচুনাল্যাণ্ড এবং গ্রিকাল্যাণ্ড ট্রান্সভয়াল্ রাজ্যভুক্ত করিয়া ঘোষণা করিলেন। এবং কিম্বার্লি ডিষ্ট্রিক্ট ও তাহার পরবর্ত্তী কতক স্থান ফ্রিষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত করা হইল বলিয়া ঘোষিত হইল। এইরূপ অবস্থায় ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের উত্তর যেরূপ হইতে পারে, প্রধান মন্ত্রী তদ্রূপ উত্তরই দিয়াছিলেন।

কর্ত্তব্যাবহেলার ফল।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে বিজিত বুয়র জাতিই কেবল মাত্র লাঞ্ছিত, এ কথা বলা যাইতে পারে না। এই যুদ্ধে ব্রিটিস্ জাতিকেও যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত এবং অপদস্থ হইতে হইয়াছে। সে সমস্ত কথাই আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি। এত লাঞ্ছনা, এত বিড়ম্বনা, এত ক্ষতি ও অপমান, এ সকল কোন্ কর্ম্মফলে ঘটিল? এক শ্রেণীর ইংরেজ সমস্ত দোষ স্বর্গীয় গ্ল্যাডষ্টোন ও লর্ড ডার্বির স্কন্ধে রাখিয়া আত্মাপরাধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতেছেন; আর এক শ্রেণীর লোকে বলিতেছেন, ইংরেজের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল, তাই প্রথমতঃ ইংরেজ বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, ইহা কেবল উপযুক্ত সতর্কতার অভাবের ফল। তৃতীয় এক শ্রেণীর লোক, তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প—কেবল মাত্র তাঁহারাই বলিতেছেন, ইংলণ্ড কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ, অথবা উদাসীন কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অসম্মত হওয়ার ফল, এই যুদ্ধ এবং ইহার লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা। আমরা এই তিনটী মতেরই আলোচনা না করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে চাহি না।

যাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্রিটিস জয়-

---

the South African Republic had been accunmulating for many years past military stores on an enormous scale, which by their character, could only have been intended for use against Great Britain.

"Your honour make some observations of a negative character upon the object with which these preparations were made. I do not think it necessary to discuss the questions you have raised. But the result of these preparations carried on with great secrecy, has been that the British Empire has been compelled to confront an invasion which has entailed upon the Empire a costly war and the loss of thousand of precious lives. This great calamity has been the penalty which Great Britain has suffered for having in recent years' acquiesced in the existence of the two Republics.

In view of the use to which the two Republics have put the position which was given to them, and the calamities with their unprovoked attack has inflicted upon Her Majesty's dominions, Her Majesty's Government can only answer your Honours Telegram by saying that they are not prepared to assent to the independence either of the South African Republic or the Orange Free State."

পতাকা উড্ডীন দেখিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা ব্রিটিস শক্তিকে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি করিবার জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহাদের চক্ষে মহামতি গ্লাডোষ্টোন ও ডার্বির কার্য্যাবলী দুর্ব্বলতা ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদের নিকট আজ গ্লাডোষ্টোন ভীরু, লর্ড ডার্বি মূর্খ। ইঁহারা বলিতেছেন, গ্লাডোষ্টোন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিপত্র দ্বারা বুয়রদিগকে সায়ত্বশাসন প্রদান করিয়া ও লর্ড ডার্বি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধিপত্র দ্বারা তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যে অপরিণামদর্শিতার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, উহার ফল ইংলণ্ডবাসীকে ভোগ করিতে হইতেছে। মজুবা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গ্লাডোষ্টোন ভীত হইয়াই ঐরূপ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ এই ইঙ্গিত করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। ইঁহারা বলিতেছেন, গ্লাডোষ্টোনের দুর্ব্বলতা ও অদূরদর্শিতাই বুয়রদিগকে অতিরিক্ত মাত্রায় সাহসী করিয়া তুলিয়াছিল; স্বাধীনতার যথেষ্ট অপব্যবহার; ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে পদে পদে উপেক্ষা, এবং অবশেষে এই ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ, এত অর্থনাশ, সকলই উহার একমাত্র ফল। মহাত্মা গ্লাডোষ্টোনের বিরুদ্ধে এই প্রকারের নীচ দোষের আরোপ করা যাইতে পারে কি না, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। মহামতি গ্লাডোষ্টোন আজ স্বর্গে, তাঁহার প্রিয় উদার নৈতিক দল আজ ইংলণ্ডে ক্ষীণবল, আজ সেই মহাত্মার বিরুদ্ধে যে কোন কথা বলা শোভা পাইতে পারে, কিন্তু সেই দূরদর্শী রাজনীতিবিদ পণ্ডিত যে মহদুদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বুয়রকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। মজুবা যুদ্ধে ইংরেজ পরাস্ত হইলেন, ব্রিটিস গৌরব রক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় লর্ড রবার্টসের অধীনে সৈন্য প্রেরিত হইল, আফ্রিকাতেও যথেষ্ট সৈন্য সংগৃহীত হইল, জয়াশা নাই দেখিয়া বুয়র মস্তক অবনত করিলেন। মহানুভব গ্লাডোষ্টোন বুয়র জাতির প্রাণের গভীরতা, স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন, এ সকল ঐতিহাসিক সত্য। এ সমুদায়ই আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এস্থলে অধিক বিস্তৃতি নিষ্প্রয়োজন। বুয়র ১৮৮৬ সনে স্বায়ত্ব শাসন ও ১৮৮৭ সনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি সকৃতজ্ঞ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, ক্রুগার গবর্ণমেণ্ট উদার নীতির পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে সংকীর্ণ নীতির অনুসরণ করিয়াছেন এবং হয়ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনে ট্রান্সভয়ালের অধিক উন্নতি হইবারও সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উক্ত রাজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতির প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং জুবার্ট-প্রমুখ উদার নৈতিক দলের দিন দিন ক্ষমতা-প্রসারণের প্রতি মনোযোগ করিলে এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, গ্লাডোষ্টোন-নীতি ট্রান্সভয়াল রাজ্যে কুফল প্রসব করিয়াছিল। আমাদের ইহাও মনে হইতেছে, আজও সেই মহাপুরুষ জীবিত থাকিলে বুঝি বা বিজ্ঞানোন্নত, সভ্যতাভিমানী, চিরশান্তি-স্থাপন-প্রয়াসী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-

ভাগকে এই ভীষণ নররক্তপাত ও অর্থনাশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হইত না। ইউট-ল্যাণ্ডরদের অসুবিধাও ঘুচিত, আদিমবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশাও অপসারিত হইত, অথচ বুয়রদিগের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ থাকিত। মহানুভব গ্লাডোষ্টোন জীবিত থাকিলে বুঝি সকলই সামান্য মসীযুদ্ধ দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিত, আজ এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া কম্পিত ও স্তম্ভিত হইতে হইত না। নিয়তির বিধি অখণ্ডনীয়, তাই দক্ষিণ আফ্রিকার অদৃষ্টাকাশে একই সময়ে রোড্‌স, চেম্বারলেন ও ক্রুগার, এই গুলি একত্র মিলিত হইয়াছিলেন।

সৈন্যসংখ্যা কম ছিল, তাই ইংরেজ প্রথমতঃ বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, ইহা কেবল উপযুক্ত সতর্কতার অভাবের ফল, এইরূপ যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিতেছি না। স্বাধীনতা-প্রিয় বুয়র জাতির যুদ্ধ-কৌশল, অদম্য উৎসাহ এবং বুয়র বারম্বার লাঞ্ছিত হইয়াও জীবন-মরণ উপেক্ষা করিয়া অপরিমেয় ব্রিটিস শক্তির প্রতিকূলে বর্ত্তমানেও যে প্রকারে যুদ্ধ চালাইতেছেন, দ্বাদশবর্ষীয় বুয়র শিশু ও বীরপ্রসূ বুয়র-রমণী রণক্ষেত্রে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেছেন, এই সকল স্মরণ করিলে উক্ত মত অনেক পরিমাণে অসার প্রতিপন্ন হইবে। বিপুল বলশালী ইংরেজ সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও মুষ্টিমেয় বুয়র কর্ত্তৃক কতবার পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

অন্য এক শ্রেণীর লোক বলিতেছেন, ইংলণ্ডের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহাদের কর্ত্তব্যাবহেলার ফল এই যুদ্ধ এবং এত লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা। এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা দুর্ভাগ্যবশতঃ বড়ই অল্প। ইংলণ্ড যখন যুদ্ধমদে মাতোয়ারা ও উত্তেজিত, যে কোনও প্রকারে বুয়রকে শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রতিহিংসাগ্নি যখন ইংলণ্ডবাসীর হৃদয়ে পুনঃ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ট্রান্সভয়াল রাজ্যের স্বর্ণখনিগুলি যখন বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ইংরেজকে সাদর আহ্বানে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেছেন, ইংলণ্ড যখন সম্পূর্ণ আত্মহারা, তখন আর ইঁহাদের ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি কে শুনিবে? বুয়র বর্ব্বর, নৃশংস, অত্যাচারী, স্বাধীনতার অনুপযুক্ত, ইহা যখন ইংলণ্ডবাসীর মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তখন কর্ত্তব্য ও নীতির দোহাই বা কে শুনিবে? ক্রুগার ইংরেজকে যুদ্ধের ছিদ্র দেখাইয়া দিয়াছিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু ব্রিটনের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা যদি বুয়রদিগের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের গভীরতা, স্বাধীনতার প্রতি জ্বলন্ত ভালবাসা উপলব্ধি করিবার জন্য একটু চেষ্টা করিতেন, তবে আজ পৃথিবীকে এই ধ্বংসের অভিনয় দেখিতে হইত কি না, এই হৃদয়দর্শী হাহাকার শুনিতে হইত কি না, গভীর সন্দেহ। ইংরেজ যাহা চাহিলেন, বুয়র প্রথমে তাহা দিতে চাহিলেন না, আবার পরে বুয়র তদপেক্ষা অনেক বেশী দিতে চাহিলেন, ইংরেজ তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না, ইহা কি এক রহস্য নহে? চেম্বারলেন মহোদয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যে যুদ্ধকে আত্মবিদ্রোহের স্বভাবযুক্ত, দীর্ঘকাল-স্থায়ী, কষ্টপূর্ণ, বহুব্যয়-সাধ্য যুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তিনিই কিনা নিজের বাধা দিবার ক্ষমতা থাকা সত্বেও সেই যুদ্ধে ইংলণ্ডবাসীকে প্রবৃত্ত

করাইলেন ও তাহাদিগকে অন্যরূপ বুঝাইলেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা সম্বন্ধে পদে পদে ভ্রমে পতিত হইলেন, ইহা কি ঘোর বিড়ম্বনার বিষয় নহে ?*

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

যুদ্ধের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী ও সন্ধি।

1900.

Sept. 11.—Mr. Kruger leaves Transvaal.

" 25.—British occupy Koomati Poort.

Oct. 25.—Formal annexation of the South African Republic.

Nov. 23.—De Wet captures garrison at Dewetsdorp, 400 men.

Dec. 5.—Knox heads De Wet off Cape Colony.

" 13.—Clements defeated by Delarey at Nooltgedacht, loss 602.

" 16.—Cape Colony invaded by Kritzinger.

" 29.—Surrender of Liverpools with 4·7 gun at Helvetia.

1901.

Jan. 23.—Sweeping movement in S. E. Transvaal results in capture of 734 prisoners and eight guns.

Feb. 10.—De Wet "slips" into Cape Colony.

" 28.—After "desperate chase" he is driven back into Orange River Colony, having lost all his guns, ammunition, transport, and many prisoners.

Mar. 23.—Babington "routes" Delarey at Ventersburg, capturing three guns and six Maxims.

Apr. 20.—Winter operations in Bushveldt.

Aug. 13.—Kitchener reports the largest return of Boer losses yet made in one week—800 prisoners, 700 waggons, 33,000 cattle.

" 15.—Beor leaders reply to Banishment Proclamation, stating intention to continue fighting.

Sept. 5—Lotter's commando captured.

" 17.—British force under Major Gough surprised at Utrecht, lost three guns and many men.

" 17.—Smuts surprises 17th Lancers.

" 26.—Fort Itala. Boers heavily repulsed.

Oct. 14.—Scheepers captured.

Nov. 1.—Col. Benson's column cut up at Brakenlaagte.

11.- Execution of Lotter.

20.--Commandant Buys captured.

* বুয়র-যুদ্ধের ইতিহাস এই পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াই গ্রন্থকার অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পরলোকগমনের কিছুকাল পরেই এই ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে গত ৩১শে মে, ১৯০২ সন্ধি সংস্থাপিত হয়। ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক যুদ্ধের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর তালিকা (প্রিন্স লুয় আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত) নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহ ও সন্ধির সর্ত্তাবলী প্রকাশ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম। নঃ সঃ।

Dec. 17 -Kritzinger captured by Gen. French.

„ 25 -Yeomanry camp at Tweefontein rushed by De Wet

1902.

Jan. -Methuen and Bruce Hamilton's sweeping movements.

„ 20 -Scheepers executed.

„ 26. -Ben Viljoen captured.

Feb. 4.- -De Wet again loses his last gun. Delarey defeated by Kekewhich.

„ 4- -The Great Orange River drive resulted in capture of about 900 Boers; De Wet escaped by rushing cattle across blockhouse line.

„ 25.—Disaster to Von Donop's convoy near Klerksdorp. British loss, 463.

Mar. 7.- -Lord Methuen defeated and captured, with loss of four guns and men.

„ 13.- -Release of Lord Methuen

„ 25.- -Guns lost by Methuen and Von Donop recaptured from Delarey.

„ 31.- -Terrible railway accident near Barberton.

Ap. 1.- -Queen's Bays suffer severely.

„ 3.- -Delarey defeated by Gen. Walter Kitchener.

„ 9- -Kritzinger acquitted of various charges which involved a death penalty.

„ 10.-—Boer leaders came into British lines at Klerksdorp to confer.

Ap. 18.—Boer leaders disperse to consult commandos.

May. 15.—Peace conference opened at Vereenigin ("place of union")

„ 18.—Delegates proceeded to Pretoria to discuss terms with Lord Kitchener and Lord Milner.

„ 27.—Commandant Malan mortally wounded and captured.

COST OF THE WAR IN MEN.

From the day the first shot was fired to 30 April, 1902, the total number of deaths have been.

	Officers.	Men.
In South Africa—	1,055 ...	20,520
Invalids sent home who have died	7 ...	478
	1,062	20,998

To the list of deaths must next be added the totally disabled—invalids sent home who have left the service as unfit. These number

5,531 MEN.

Then the War Office considers that it is very unlikely anything more will be heard of the following missing and prisoners:

I officer ... 131 men.

And thus we obtain the cost of the war in men in the total:

27,732.

DEATHS IN THE CAMPS.

Though we have no figures of the Boer losses in the field some

idea of the ravages of war amongst the non-combatant Dutch is to be had from the following total of adult and infant mortality in the concentration camps, where

18,066 Whites.

Died between June, 1901, and 31 March, 1902. Of these the white children, under 12 years of age, reached the appalling fiugre of

12,984.

FARMS DESTROYED.

A Parliamentary paper issued on 15 May of last year gave the numbers of farm burnt in the Orange River Colony and the Transvaal up to the end of January 1901, at

630.

No official statement on the subject has since been made, but letters from men in the field indicated that farm burning was continued long after it had been officially discountenanced.

COST OF THE WAR IN MONEY.

Treasury Estimate of Cost to 31 March, 1903, £222,974,000.

Of this sum £152,657,000 was spent up to 31 March last, and through the earlier termination of the war will probably result in the figures in the estimate not being reached, it should be pointed out that the army of occupation, the shipping of troops home, and the war gratuities will figure out very heavily in the expenditure of the current financial year.

HOW THE MONEY WAS RAISED.

By loan £152,417,000
By taxation(estimated) £705,557,000

The new and increased taxation includes the following :

7d. on income tax.
1s. a barrel on beer.
6d. a gallon on spirits.
4d. a lb. on tobacco.
6d. a lb. on foreign cigars.
2d. a lb. on tea.
4s. 2d. cwt on refined sugar (less on raw sugar) :
1s. a ton on exported coal of 6s. a ton and over in value f. o. b.
3d. per cwt on imported corn.
5d. per cwt on imported flour.

সন্ধির সর্ত্ত।

১ম—বুয়রেরা সমরাস্ত্র পরিহার করিবেন।

২য়—ইংরাজ হস্তে যে সকল বুয়র বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি কিছুরই হানি হইবে না, তাঁহারা ইংরাজের ব্যয়ে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হইবেন।

৩য়—বন্দিগণের মধ্যে যাহারা কোনও সমর বিধান অমান্য করে নাই, তাহাদিগকে কোনও প্রকারে দণ্ডভোগ করিতে হইবে না।

৪র্থ—বুয়রের মাতৃভাষা স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং আইন আদালতে যথাসম্ভব ব্যবহৃত হইবে।

৫ম—আপনাদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বুয়রেরা আপন আপন বন্দুক আপনাদের নিকট রাখিতে পারিবে।

৬ষ্ঠ—যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ট্রান্সভাল দেশে কোনও কর স্থাপিত হইবে না।

৭ম—বুয়রদিগের ঘরবাড়ী ও চাষবাসের ভূমি পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য ইংরাজ সাড়ে চারি কোটী মুদ্রা প্রদান করিবেন।

৮ম—ইংরাজ উপনিবেশের অধিবাসী যে সকল বুয়র ইংরাজের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারা উপনিবেশের আইন অনুযায়ী দণ্ডভোগ করিবে। কেবল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে না। তাহারা আজীবনের জন্য দেশের রাজকার্য্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে

দুয়ারাণী।

তুমি নহ দুয়া রাণী—তুমি নহ দুয়া,
আদরে তোমারে আগে দেই 'পাণ গুয়া'!
প্রণয়ের মহাযাগে,
তোমারি অর্চ্চনা আগে,—
তোমারি চরণ আগে চন্দন চুয়া!
সর্ব্বাগ্রে হৃদয়েশ্বরি,
তোমারি আরতি করি,
সোহাগে প্রদীপ দেই, মানে ধূপ ধূঁয়া!
তুমি নহ দুয়ারাণী—তুমি নহ দুয়া!

২

তুমি জ্যেষ্ঠা—তুমি শ্রেষ্ঠা—তুমিই প্রধান,
কেহ নহে তব সম,
প্রাণাধিক প্রিয় মম,
তব সিংহাসনতলে সকলের স্থান!
তব পদস্পর্শ জন্য,
জীবন কৃতার্থ—ধন্য,
দেবের অধিক দেবি আমি ভাগ্যবান!
তোমারি চরণ-রাগে,
প্রেমপদ্মবন জাগে,
শিরায় তরল উষা হাসে অনুমান!
তুমি পূর্ণিমার শশী,
মহাদেবী মহীয়সী,
অমৃত কিরণে তব ভাসে মৃত প্রাণ!
তোমার চরণরজ,
শত বৃন্দাবন-ব্রজ,
গোলোক বৈকুণ্ঠ ভাবি আমি করি ধ্যান!
তুমি জ্যেষ্ঠা, তুমি শ্রেষ্ঠা, তুমিই প্রধান!

৩

জাহ্নবী—জীবনময়ী তুমিই কেবল,
সাগরে পড়েছে কত,
আরো নদী শত শত,
তারা শুধু দেশাধোয়া কাঁদা মাটী জল!
তাদের মলিন স্পর্শে,
জীবন জাগে না হর্ষে,
জাগে না অমৃত আশা মৃত যে সকল,
তোমারি পবিত্র বারি,—
তোমারি প্রণয়ে নারি,
তোমারি পবিত্র স্পর্শ—আয়ুষ্য-মঙ্গল,—
সাগরের ভস্মবুকে,
জাগাইছে শত সুখে,
অনন্ত জীবন নিত্য দিয়ে নব বল!
হিমাদ্রির চূড়া উচ্চ,
শিবশির করি তুচ্ছ,
ত্যজি ব্রহ্ম কমণ্ডলু দেবর্ষি মণ্ডল,
আসিলে প্রণয়োচ্ছ্বাসে,
আতঙ্কে মাতঙ্গ ভাসে,
পাপীরে করিয়ে দয়া আসিলে ভূতল,—

নামিলে পঙ্কিল হ্রদে,
এত নিম্নে—এত অধে,
না ভাবিলে নীলাম্বুর তিক্ত লোণা জল,
কার এত প্রেম স্নেহ,
সাধিয়া যায় কি কেহ,
নিবা'তে পরের বুকে বাড়ব অনল ?
তোমার স্মরণে পুণ্য,
দেহ হয় পাপশূন্য,
কোটি তীর্থ হয় চিত্ত শিরা সন্ধিতল
তোমার চরণমাটি,
তাই লো তিলক কাটি,
লিখি ভালে হরিনাম শেষের সম্বল !
তুমি লো ধবলা গঙ্গে,
শত চন্দ্র হাসে অঙ্গে,
লাবণ্য বন্যায় ভাসে দুকূল-অঞ্চল !
ঢা'ল বুকে শত মুখে সুধা অবিরল !

৪

তুমি প্রিয়ে বৃন্দাদেবী—তুমি লো তুলসী,
রাধা নহে আধা তব, তুমি গরীয়সী !
প্রেম-বৃন্দাবন ধামে,
চির জয় তব নামে,
তোমার আরতি আগে করে কালো শশী,-
প্রণয় মঞ্জরী তব,
চিরফুল্ল চির নব,
শালগ্রাম রূপে হরি ধরেন শিরসি !
এমন আদর আর,
চরণে চন্দন কার ?
তুমি লো তুলসীহার আমার প্রেয়সি,
কি ছার বছর ষোল,
তিরিশে ত্রিদিবে তোল,
মন্দার মন্দির খোল উজ্জ্বল উরসি !
রাধা নহে আধা তব, তুমি গরীয়সী।

তুমিই হৃদয়রাজ্যে রাজ রাজেশ্বরী,
একণ্ঠের ক্ষীণ তান,
তোমারি বন্দনা গান,
বাজে হৃদয়ের যন্ত্রে দিবা বিভাবরী !
এই কাব্য, এ কবিতা,
তোমারি লো প্রেমগীতা,
রচে দাস বেদব্যাস শ্রীচরণ স্মরি !
তোমারি লো তপস্যায়,
হোমগন্ধে ব্যোম ছায়,
পুণ্য তপোবন মোর আশ্রম-বদরী !
বাক্য মন আত্মা দেহ,
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম স্নেহ,
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আশা একত্র আহরি,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য করি দান,
তথাপি পূরেনি প্রাণ,
বামন কামনা হায় কিসে পূর্ণ করি ?
আয় ও চরণতলে,
রাখি শির কুতূহলে,—
ও অনন্ত যজ্ঞফল দূরে পরিহরি,—
পাতালে করিয়ে বাস,
পূজি পদ বার মাস,
লোকচক্ষু অন্তরালে—দিবস শর্ব্বরী !
শত ইন্দ্র স্বর্গ সহ,
লয় হবে অহরহ,
হবে বিশ্ব মহাধ্বংস রেণু রেণু করি,
আমিই সে সর্ব্বগ্রাসে,
মহাপ্রেমে মহোল্লাসে,
প্রলয়ে রহিব স্থির শ্রীচরণ ধরি !
বলির পাতাল ভাল স্বর্গের উপরি !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সান্ত ও অনন্ত।

দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট বলেন :—"বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু বস্তু ইন্দ্রিয়ের নিকট যেরূপ ভাবে প্রতিভাত হয়, বস্তু সম্বন্ধে আমাদেরও সেই-রূপ জ্ঞান জন্মে ; যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই"। *

কথাটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আরো সহজে বুঝান যাইতে পারে। মনে কর, তোমার সম্মুখে একটী পুষ্পের তোড়া বিদ্যমান আছে,বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় তোড়া সম্বন্ধীয় জ্ঞান তোমার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতেছে। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারায় পুষ্পের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিতেছে, ঘ্রানেন্দ্রিয় দ্বারায় পুষ্পের ঘ্রাণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিতেছে, ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারায় ইহার কোমলত্ব অনুভব করিতেছ। এইরূপে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পুষ্পের তোড়াটী সম্বন্ধে তোমার বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উদয় হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুষ্প নামক যে মূল পদার্থ,তাহার জ্ঞান তোমার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইল না। যেহেতু তুমি তোমার কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম নও। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি মূল পদার্থের গুণ মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ মূল পদার্থ ইহার অতীত ; কাজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেই জন্য মূল পদার্থ সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাই দার্শনিকপ্রবর ক্যাণ্ট বলেন, মূল বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান মানবের ইচ্ছাধীন নহে। কিন্তু মূল বস্তু মানবেন্দ্রিয়ে যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, সেই জ্ঞানেরই কেবলমাত্র মানব অধিকারী। অতএব দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরই জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহা ইন্দ্রিয়াতীত ও যাহা কোন কালে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, সে জ্ঞানের আভাস প্রাপ্তির প্রয়াস মানুষের পক্ষে যে কেবল দুরাশা মাত্র, তাহা নহে, কিন্তু উন্মাদের চেষ্টা মাত্র।

ক্যাণ্ট্‌এর মতে সসীম পদার্থেরই জ্ঞান, মানব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার অনধিকারী। কিন্তু যাহা অসীম ও যাহা সসীম দেশ ও কালকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সে জ্ঞান হইতে মানুষ চিরবঞ্চিত। তবে কি আমরা অনন্তের জ্ঞান হইতে চিরকালই বঞ্চিত ? তবে কি সীমাবিশিষ্ট মানবহৃদয় অনন্তকে উপলব্ধি করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহা কি কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র ? তবে কি পুরাকালে আর্য্য মহর্ষিগণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির যে স্তবে ভারতাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, তাহা কি কেবল তাঁহাদিগের বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের পরিচয় মাত্র ? অনন্ত ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছি, এই মহাবাক্যে সমস্ত ভারতভূমিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, সেই মহা উক্তির অন্তরালে কোন বাস্তব সত্তা নাই কি ? ইহাই আমাদের ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মত ছাড়িয়া

* "Sensuous objects cannot be known except such as they appear to us, never such as they are in themselves ; supersensuous objects are not to us objects of theoretic knowledge."

দিলেও, আমাদিগের ভারতবর্ষে এই মতাবলম্বী বহু সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। অবতারবাদীরা বলেন যে, ব্রহ্ম যিনি অক্ষয়, অব্যয়, নিরঞ্জন ও নির্ব্বিকার, স্বয়ং তিনি অবতীর্ণ হইয়া মানবসমাজে যদি সান্তরূপে প্রকটিত না হন, তবে অবাঙ্মানসগোচর অনন্তকে সান্ত মানব জানিবে কি প্রকারে? খ্রীষ্ট-উপাসকেরা বলেন, পিতাকে জানিতে চাও, তবে পুত্রকে জান। অনন্ত যখন সান্তরূপ ধারণ করেন, তখন তাঁহার কতদূর অনন্তত্ব থাকে, এই বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অবতারবাদীদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যিশুপ্রচারিত ত্রিত্ববাদ, সাম্বুলস্ ও আরিয়স্ কর্ত্তৃক ত্রিত্ববাদের বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যাইতে পারে। * আবার এক আরিয়নদিগের মধ্যে নানা মতাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ খ্রীষ্টকে মানব অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক শক্তি বিশিষ্ট জীব মনে করেন। কেহ কেহ বা খ্রীষ্টকে সাধারণ মানবের ন্যায় কোন বিশেষ জীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মানব ও প্রকৃতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার সত্বা স্বীকার করিলেও, কেহই খ্রীষ্টকে অনন্ত পিতা ঈশ্বরের সহিত একাসনে উপবেশন করাইতে সম্মত নহেন। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও, রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের, পূর্ণ ও অংশাবতার লইয়া বহু প্রকার মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অনন্তও সান্তভাব ধারণ করিয়া সম্যক্ রূপে সান্ত জীবের গোচরীভূত হইতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে অবতারবাদীদিগের মধ্যেও মতদ্বৈধ আছে। এমন কি, ভক্তিপরায়ণ রোমান্ কাথলিক (Roman Catholic) সম্প্রদায় পুত্রকে পিতার সহিত একত্রে একাসনে উপবেশন করাইলেও, এবং পুত্রকে পিতার ন্যায় অনন্ত ভাবিয়া লইলেও পুত্রকে পিতার বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাধীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পিতা কর্ত্তা, পুত্র ভৃত্য। পিতা কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত, পুত্র কেবল কর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত। কর্ত্তব্য নিশ্চয়ে পুত্রের বিশেষ অধিকার নাই। মূল কথা এই যে, যেখানে অনন্ত সান্ত জীবের অবিষয়ীভূত ও অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে প্রচারিত হইয়াছে, সেইখানেই অনন্তকে সান্ত জীবের নিকট প্রকটিত করিবার জন্য গুরুবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ, অবতারবাদ ও নানা বাদ বিসম্বাদ আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, অবতারবাদেও অনন্তের সম্যক্ উপলব্ধি বা জ্ঞান হইতেছে না। এক দিকে বুদ্ধ স্বীয় প্রতিভাবলে বিচার করিতে গিয়া ঈশ্বরের সত্বা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন, ও এইরূপে অজ্ঞেয়বাদ প্রচার করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তুলিলেন; পক্ষান্তরে তিনিই আবার নিজের অজ্ঞাতসারে, পৌত্তলিকতাবাদ, অবতারবাদ ও গুরুবাদের মূল হইয়া উঠিলেন। এই বিষয়ে অতীত ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুই শত বৎসর পরিবর্ত্তী কাল পর্য্যন্তও ভারতের ইতিহাসে মূর্ত্তিপূজার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না। বলা বাহুল্য যে, বেদে মূর্ত্তিপূজার কোন উল্লেখ নাই। গুরুদেবের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধেরা বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্থাপকের মূল নীতির আদর্শভ্রষ্ট হইয়া, সেই ধর্ম্মসংস্থাপয়িতাকেই অনন্ত ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া তুলিল। এইখান হইতেই

* Tritheism, Sambullism, Arianism.

অবতারবাদের সূচনা। শুধু তাহা নহে, গুরুদেবের অবর্ত্তমানে তাঁহার কেশ, নখ, পাদুকা ও তৎকাল-লব্ধ অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নের পূজা আরম্ভ করিল। এইখান হইতেই মূর্ত্তি পূজার সূচনা। উত্তরকালে বুদ্ধদেবও আদর্শভ্রষ্ট আর্য্যদিগের অবতাররূপে পরিগণিত হইলেন। ভারতের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলে, গুরুবাদ, অবতারবাদ ও মূর্ত্তিবাদের উৎপত্তি ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া মন স্বতঃই দুঃখে ও শোকে উদ্বেলিত হইতে থাকে। মূর্ত্তিবাদ, গুরুবাদ ও অবতারবাদের উৎপত্তি এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে দেখিয়া কেহ যেন মনে না ভাবেন যে, আমরা উহা ঘৃণা বা অবজ্ঞার চক্ষে সন্দর্শন করি। পক্ষান্তরে মনে করি, উপরিউক্ত ধর্ম্মাবলম্বীগণ দ্বারা বহুল পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। অসভ্য জাতির জড়পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যজাতির অনন্ত ঈশ্বর আরাধনায় সান্ত মানবের অনন্তের উপলব্ধির প্রয়াসই দেখিতে পাই। এই স্থানে পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলরের মতের সহিত একমত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। মোক্ষমূলর বলেন—

"মানবজাতির আদিম অবস্থা হইতে ইদানীন্তন ধর্ম্মসমূহের আলোচনা করিলে ইহাই জ্বলন্ত অক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সান্ত ও সীমাবিশিষ্ট মানব অসীমকে ইয়ত্তাধীন করিতে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে, অসীমের পশ্চাৎধাবিত হইতে, ও অনন্ত ঈশ্বরকে হৃদয় মনের সহিত প্রেম করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র।*"

ঝঞ্ঝাবাতে বৃক্ষ শায়িত হইতেছে, অট্টালিকা ভূপতিত হইতেছে, প্রকৃতি ভীষণভাব ধারণ করিতেছে, মহাপবনের উৎপীড়নে প্রলয়ের সূচনা হইতেছে, কিন্তু আর্য্যমহর্ষিগণ সান্ত ঝঞ্ঝাবাতের অপর পারে ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত পবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দেখিতে পাইলেন। সাগরের জলরাশি বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতেছে, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া মহাপ্রলয় সংঘটন করিতেছে। কিন্তু আর্য্যমহর্ষিগণ সাগরান্তরালে ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দেখিয়া ধন্য হইলেন। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উষা অবগাহিতা প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য উষাদেবীর বন্দনা করিয়া ধন্য হইলেন। মূর্ত্তিপূজক মূর্ত্তি স্থাপনান্তে ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া,* অনন্তকে উপলব্ধি করিবার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। পালক, অস্থি, বৃক্ষ ও পশু প্রভৃতির পূজা করিতে গিয়া, ইহাদিগের অন্তরালে পূজা করিয়া অসভ্যজাতি স্বীয় ধর্ম্মজীবনের সাফল্যলাভ করিল। তবে কেন বলি যে, সান্ত মন অনন্তের ধ্যান ধারণা করিতে পারে না?

অনন্ত বলিলে আমরা কি বুঝি, ও ইহার লক্ষণ কি, এই সম্বন্ধে আমরা এখন বিচার করিব। মানবেন্দ্রিয় কেবলমাত্র সান্ত বিষয়েরই জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ। অর্থাৎ আমরা যাহা দর্শন করি, শ্রবণ করি, আস্বাদন করি, তৎসম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান

---

* মোক্ষমূলর বিরচিত Lectures on the Science and growth of Religion নামক পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় ...... we can hear in all religion a groaning of the spirit, a struggle to conceive the inconceivable, to utter the unutterable, a longing after the infinite, a love of God."

* আবাহন ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্রঃ—প্রাণা ইহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। আত্মেহাগচ্ছতু সুখং চিরং তিষ্ঠতু স্বাহা। ইন্দ্রিয়াণীহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥

জন্মে। কিন্তু যাহা দর্শনাতীত, শ্রবণাতীত ও অপর ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। সুতরাং অনন্ত অর্থে অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বুঝিতে হইবে। তুমি যাহা দেখিতেছ, তোমার দৃশ্যের বহির্ভাগে যে দেশ আছে,সেই দেশ সান্ত নহে; অনন্ত। কালের সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম খাটিতে পারে। তুমি হয়ত দুই সহস্র বা দশ সহস্র বর্ষব্যাপী ঘটনাবলীর ইতিহাস পাঠ করিতেছে, তাই বলিয়া কি তুমি ধারণা করিতে পার যে, এই দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে কাল বিদ্যমান ছিল না? অবশ্যই ছিল। কালের ধারণা না করিয়াই থাকিতে পার না। ইতিহাসে যে কাল সম্বন্ধে পাঠ করিয়াছ, তাহা সান্ত, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার অতীতকাল অনন্ত। অনন্ত কালের তুলনায় তোমার ঐতিহাসিক কাল অতিশয় পরিমিত ও সান্ত। অতএব সান্ত অর্থে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু বুঝিতে হইবে, ও অনন্ত অর্থে ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত পদার্থ বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় যদি সিদ্ধ না হইল, তবে কি অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ধারণার জন্য অপর কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক? আর্য্যঋষিদিগের ও জড়োপাসকদিগের তবে কি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন ইন্দ্রিয় ছিল? তাঁহারা কি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে অনন্তের ভাব ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? আমরা কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সত্তা স্বীকার করি না। পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত জ্ঞানলাভের যে অন্য কোন উপায় আছে, তাহাও ধারণা করিতে পারি না। আর্যদর্শনকারগণ আপ্তবাক্য-জনিত, উপমা-জনিত * প্রভৃতি যে জ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সারবত্তাও উপলব্ধি করিতে পারি না। যদিও মনোবিজ্ঞানের দু একটী গভীর তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা হয় নাই। এ বিষয়ে আমাদিগকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের সহিত একমত হইয়া বলিতে হয় যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। জ্ঞান প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষজ্ঞান † (perception) ও অনুমানসিদ্ধ জ্ঞান ‡ (reasoning)। ইন্দ্রিয় সাহায্যে তোমার মনের মধ্যে যে কোন বিষয়ের ছবি অঙ্কিত হয়, ও তজ্জন্য যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞান (perception)। বিবিধ প্রত্যক্ষজ্ঞান জনিত জ্ঞানের তুলনায় পরিশেষে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অনুমানমূলক জ্ঞান (reasoning)। অতএব অবিসং-

---

* ন্যায়দর্শনকার গৌতম অষ্টপ্রকার প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থসঙ্গতি, সম্ভব ও অভাব।

† ন্যায়প্রবর্ত্তক মহর্ষি গৌতম নিম্নলিখিত প্রকারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপ দেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্। ন্যায়—প্রথম অধ্যায়, ৪র্থ সূত্র। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাহায্যে যখন কোনও বস্তু সম্বন্ধে অব্যবহিত কি না আবরণ শূন্য, অব্যভিচারি কি না ভ্রম প্রমাদ শূন্য, ব্যবসায়াত্মক, কি না নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহে।

‡ অনুমান যে অর্থে ভাষায় ব্যবহৃত হয়, এখানে ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অনুমান শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষস্য পশ্চাজ্জায়তে জ্ঞায়তে যেন তদনুমানম্। ধূম-প্রত্যক্ষ করিয়া অদৃষ্ট অগ্নি সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অনুমানমূলক।

বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান ব্যতীত অপর কোন প্রকারে জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান ধারণার জন্য আমাদিগের সান্ত পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ই প্রশস্ত। কোন প্রকার অভ্রান্ত পুস্তক বা অভ্রান্ত অবতার বিশেষের শরণাপন্ন হইবার আবশ্যক নাই। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসই একমাত্র স্বতঃপ্রমাণ (revelation)।

সান্ত মানবেন্দ্রিয় কি প্রকারে অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আভাস পাইতে পারে, তাহা এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। মনে কর, বহু-দূরব্যাপী তরু-সুশোভিত কোন গ্রাম্যক্ষেত্রে তুমি একাকী দণ্ডায়মান আছ। তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হয়ত তিন চার ক্রোশব্যাপী স্থান তোমার চারি দিকে দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু তোমার দৃষ্টিশক্তিরও সীমা আছে। দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত স্থান দেখিতে পাইতেছ না। সেই জন্য দৃষ্টির বহির্ভূত স্থানের কোন জ্ঞান জন্মিতেছে না। দৃষ্টির অন্তর্ভূত স্থান সান্ত, দৃষ্টির বহির্ভূত স্থান অনন্ত, ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞানও অনন্ত। তুমি যদি কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হও, সন্দেহ নাই তুমি আর কিঞ্চিৎ দূর দেখিতে পাইবে। তথাপি তোমার দৃষ্টির বহির্ভূতে অনন্ত স্থান থাকিবে। ইহা দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় জন্য সান্ত জ্ঞানের সহিত তুমি অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আভাস পাইতেছ। এই অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আভাস না পাইলে সান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই বলিতেছি, ইন্দ্রিয় জন্য অসীম জ্ঞান অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সাপেক্ষ। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, সান্ত ও অনন্তের জ্ঞান যুগপৎ মানবমনে জন্মিয়া থাকে। তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত স্থান, তোমার দৃষ্টির অন্তর্ভূত স্থানের তুলনায় মহৎ, মহত্তর ও মহত্তম। অনন্ত যে কেবল মহৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কেবল তাহা নহে। কিন্তু ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও মানবেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কোন একটী ক্ষুদ্র বস্তুকে ভাগ কর, দেখিবে, ইহা ক্ষুদ্রতর হইল, এইরূপে যদি ক্রমশঃ ভাগ করিতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার বিভাজ্য বস্তুটী ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম হইতে থাকিবে। কিন্তু তবুও তাহা ক্ষুদ্রীকরণ সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মাইবে না। বস্তু যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, যাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তাহার কেন্দ্র ও পরিধি আছে। এই কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যবর্ত্তী ব্যাসার্দ্ধ (radius) থাকিবেই থাকিবে। এই ব্যাসার্দ্ধ সকল সময় সকল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কাজেই তোমার ক্ষুদ্রতম বস্তুটীকে ভাগ করিবার বিপক্ষে অনুকূল যুক্তি দেখিতে পাই না। মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অচ্ছেদ্য, অভেদ্য পরমাণুর সত্ত্বা স্বীকার করিতে পারা যায় না। অবিভাজ্যমান পরমাণুর (atom, imponderable substance) সত্ত্বা বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারা স্বীকৃত হইলেও ইন্দ্রিয়সাহায্যে তাহা ধারণা করা উন্মাদের প্রয়াস মাত্র। অবিভাজ্যমান, অংশবিহীন ক্ষুদ্রতম পরমাণুর সত্ত্বা স্বীকার করিলেও সৃষ্টি প্রক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করা মানবজ্ঞানের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। বিজ্ঞানবিশারদদিগের মতে পরমাণু-পরম্পরার সংযোগে বাহ্যজগতের অভ্যুদয়। সংযোগ দুই প্রকারে হইতে পারে। ব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ ও অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ।

যে সংযোগে ব্যাস ও পরিধির বৃদ্ধি হয় না, তাহাকে ব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ কহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—আকাশ, আত্মা, দিক্ ও কাল। ইহাদিগের পরস্পর সংযোগে কোন প্রকার ব্যাস পরিধির বৃদ্ধি নাই। যে অংশযুক্ত পদার্থের সংযোগে ব্যাস, পরিধির বৃদ্ধি হয়, তাহাকে অব্যাপ্যসম্বন্ধ সংযোগ কহা যায়। আরো স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, যখন পদার্থ পরস্পরার সংযোগে আয়তন বৃদ্ধি হয়, তখন তাহা অব্যাপ্যসম্বন্ধ-সংযোগ-মূলক জানিবে। কেন না, পদার্থ সমূহের বিভাজ্যমান অংশের সত্বাহেতু আয়তন বৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে। এখন দেখ, দ্ব্যণুকের আয়তন পরমাণুর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক। সে জন্য ইহা অব্যাপ্যসম্বন্ধ-সংযোগ-মূলক। কিন্তু অবিভাজ্যমান পদার্থ কদাপি অব্যাপ্যসম্বন্ধ-সংযোগ-মূলক হইতে পারে না। অথচ বিজ্ঞানবিশারদদিগের দ্বারায় পরমাণুর অবিভাজ্যমানত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব পরমাণুর ধারণা মানবজ্ঞানাতীত। সেই জন্য বলিতেছি, মহৎ সম্বন্ধে অনন্তত্বের সত্বার যে প্রকার আভাস পাওয়া যায়, সেই রূপ ক্ষুদ্র সম্বন্ধেও অনন্তের সদ্ভাবের জ্ঞান স্বতঃই জন্মিয়া থাকে।

আর একটী দৃষ্টান্ত ধর, বর্ণ সাস্ত, কেন না, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আধুনিক বিজ্ঞানবিশারদদিগের সাহায্যে বর্ণ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। রামধনুতে সাতটী মাত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা কে না জানে? আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সকল পূজ্যপাদ আর্য্যমহর্ষিগণ, উষা, অরুণ, বরুণ, সবিতা ও দিগ্‌দিগন্তব্যাপী গগনমণ্ডলের শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া ভাবে বিভোর হইতেন, তাঁহারা কিন্তু আকাশের নীলত্ব বিষয়ের কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। জেন্দাবেস্তা (Zendevesta) বা হোমার প্রণীত ইলিয়াড্ (Iliad) যে নীল বর্ণের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, ইহুদীজাতির প্রাচীন বিধান ও নব বিধানে (old testament and New testament) আকাশ নীলবর্ণে বিশিষ্ট হয় নাই। অনেক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে নীলবর্ণ প্রকাশ উপযোগী কোন কথা নাই। অনেক সময় তাহারা কাল ও নীলের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। এমন কি, আজও সুসভ্য ইংরাজজাতি "প্রহারের চোটে কাল ও নীল চেহারা করে দেওয়া" (to beat black and blue) এইরূপ বাক্যংশ ব্যবহার করিয়া বর্ণজ্ঞান সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। আরিষ্টটল (Aristotle) রামধনুতে কেবলমাত্র তিনটী বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, লাল, পীত ও সবুজ, (tri coloured rainbow)। ডিমোক্রাইটস্ (Demokritos) কেবল চারিটী বর্ণ জানিতেন। পাঁচের অতিরিক্ত বর্ণভেদ থাকিতে পারে, চীনবাসীরা পূর্ব্বে ধারণাই করিতে পারিত না। ভাষা বিকাশের সহিত মানবসমাজ বর্ণের বৈচিত্র্যজ্ঞান ধারণা করিতে সক্ষম হইতেছে। সর্ব্বভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষমূলর সত্যই বলিয়াছেন, ভাষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ব্যতীত বস্তু সম্বন্ধে পরিস্ফুটরূপে প্রত্যক্ষজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কে তবে বলিতে পারে, বর্ণে সপ্ত প্রকার ভেদই প্রশস্ত? কোন্ বিজ্ঞানবিশারদ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, রামধনুতে সপ্তাধিক বর্ণভেদ নাই। ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা

ও ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ অভাবে রামধনুর বিবিধ বর্ণবৈচিত্র্য-জ্ঞান জন্মিতেছে না। ভবিষ্যতে ভাষার বিকাশ হইলে, রামধনুর সপ্তাধিক বর্ণবৈচিত্র্য-জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা। প্রকৃত পক্ষে রামধনুর বর্ণবৈচিত্র্য অনন্ত। এখন দেখিতে পাইতেছ, যে বর্ণকে ক্ষুদ্র, সান্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবিয়াছিলে, তাহা অনন্ত, অপরিমিত, ও অনিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়া উঠিল। তাই বলিতেছি, অনন্ত যেমন মহৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ ক্ষুদ্রও সান্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বর্ণে যে ভাবে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখিলে, শব্দেও সেইরূপ অনন্ত বিরাজমান। এক সেকেণ্ডে তিরিশ বার বায়ুর বিকম্পন হইতে শব্দ-জ্ঞান জন্মিতে থাকে। কিন্তু চারি সহস্র বার বিকম্পন হইলে, আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় এত দুর্ব্বল যে, শব্দজ্ঞান জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কেবলমাত্র অর্থশূন্য কোলাহলেরই অনুভূতি হইতে থাকে। কিন্তু বায়ুর অনন্ত বিকম্পনে অনন্ত শব্দ-জ্ঞানের সম্ভবনা আছে। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা নিসংশয়িতরূপে সিদ্ধান্ত হইল যে, অনন্ত, মহৎ, অপরিমিত, অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সান্ত, পরিমিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম বস্তুগুলিকে ওত-প্রোত-ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়া আছে। কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ, অনন্তের সত্বায় সত্বান্বিত। অনন্তের অসদ্ভাবে ক্ষুদ্রও মহতের সত্বাই থাকে না। কারণ দেখিতে পাইতেছি যে, অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবে ক্ষুদ্র ও মহতের জ্ঞান জন্মিবার আদৌ সম্ভাবনা নাই।

মানবহৃদয়ে অনন্তের যে ক্রমিক পরিস্ফুরণ, বিকাশ ও অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী, আমরা এখন তাহাই প্রতিপন্ন করিতে যত্নশীল হইব। ইলিয়াড্, জেন্দাবেস্তা, বেদ, খ্রীষ্টোপাসকদিগের পুরাতন ও নব-বিধানে (Old testament ও New testament) আকাশের নীলত্ব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকিলেও, বর্ত্তমান কালের ন্যায় সুদূর অতীত কালেও যে আকাশ নীল বর্ণ ছিল, এ কথা কে না স্বীকার করিবে? অনেক বর্ব্বর জাতি তিনের অধিক গণনা করিতে পারে না। তাই বলিয়া কে সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে, তাহাদিগের দৃষ্ট গাভী চতুষ্পদ নহে, কিন্তু ত্রিপদ? গাভী এখন যেমন চতুষ্পদ, সুদূর অতীতে বর্ব্বর জাতির সমক্ষেও সেইরূপ চতুষ্পদ। কিন্তু ভাষা সম্যক্‌রূপ স্ফূর্ত্তি না হওয়াতে বর্ব্বর জাতি ব্যক্ত করিতে পারে না। সেইরূপ অনন্তও সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় বিরাজমান। মানবের যতই ভাষার বিকাশ হইতেছে, ও ইন্দ্রিয় ক্রমিক উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, অনন্তও তদ্রূপ মানবজ্ঞানে প্রতিভাত হইতেছে। বর্ব্বর জাতি অনন্তকে সান্তের মধ্যে, পরিমিতের মধ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহের মধ্যে নখ, কেশ, পালক, অরণ্যানি-সঙ্কুল নির্জ্জন প্রান্তর, ও উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সুসভ্য জাতি অনন্তকে স্থান ও সময়ের সহিত একীভূত করিয়া, সম্মিলিত করিয়া, শেষ অদ্বৈতভাবে প্রচার করিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত, একাত্ম করিয়া আবদ্ধ করিল। পরিশেষে স্থান ও কাল উত্তীর্ণ হইয়া, বিশ্বরূপ অতিক্রম করিয়া, অনন্ত ক্রমশঃ বিরাট হইতে বিরাটতর রূপ ধারণ করিতেছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনন্তের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া, অনন্তের অনন্তত্বই ঘোষণা করিতেছে। অনন্তের এই অনন্তরূপ দেখিয়া পাঠক ভীত

হইও না। অর্জ্জুন ও অনন্ত ভগবানের সান্ত হইতে অনন্তরূপ ধারণে মুগ্ধ, ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছিলেন।

অর্জ্জুন বলিতেছেন, তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম (মুমুক্ষুদিগের) জ্ঞাতব্য, এই জগতের এক মাত্র আশ্রয়, নিত্য, সনাতন কর্ম্মের প্রতিপালক, ও সনাতন পুরুষ মনে করিতেছি। তুমি উৎপত্তি স্থিতি লয় রহিত, অনন্ত বীর্য্য ও অনন্ত বাহু, চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ নেত্রশালী, প্রদীপ্তাগ্নি মুখ, এবং তুমি সকল তেজঃ প্রভাবে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ, ইহা আমি অবলোকন করিতেছি। হে হৃষীকেশ! তোমার মহত্ত্ব কীর্ত্তনে যে জগৎ প্রহৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে এবং সিদ্ধ পুরুষগণ প্রণত হয়, তাহা যুক্তই বটে। হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! হে মহাত্মন্! পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধপুরুষগণ কি হেতু তোমাকে নমস্কার না করিবেন? যেহেতু তুমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা এবং তাহা হইতেও গুরুতর, তুমি সৎ (অর্থাৎ ব্যক্ত) তুমি অসৎ (অর্থাৎ অব্যক্ত) এবং এ উভয়ের মূল কারণ যে পরব্রহ্ম, তাহাও তুমি। হে অচ্যুত! তোমার এই মহিমা অনবগত থাকিয়া, প্রমাদ বা প্রণয় হেতু তোমাকে সখা মনে করিয়া অভিভব করতঃ যে হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইত্যাদি বাক্য কহিয়াছি, এবং তোমার একাকী অবস্থানকালে কিম্বা বন্ধুজন সমক্ষে বিহার, শয়ন, উপবেশন কিম্বা ভোজনকালে পরিহাস নিমিত্ত (তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব তবু) আমি তোমাকে যে তিরস্কার করিয়াছি, তাহা আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। হে অপ্রতিম প্রভাব! তুমি চরাচর সমস্ত জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; ত্রিলোক মধ্যে তোমার তুল্য কেহ নাই; তোমা অপেক্ষা মহান্ অন্য কেহ থাকিবার সম্ভাবনা তবে কোথায়?* উল্লিখিত শ্লোকে সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী, সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ গীতাকার বিবর্ত্তিত প্রণালীর ক্রম অনুসরণ করিয়া, অর্জ্জুনের উক্তি রূপে, অনন্তের পরিস্ফুরণ, বিকাশ, ও ক্রমিক অভিব্যক্তি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, অনন্যসাধারণ প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছেন। আমরাও এতদূর পর্য্যন্ত অনন্তের স্বরূপ, লক্ষণ, বিকাশ ও ক্রমিক অভিব্যক্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এখান উহা কতদূর ক্যান্‌ট্‌-দর্শনশাস্ত্র-সম্মত, তাহারই পর্য্যালোচনা করিব। ক্যানট্ বলেন, অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। †

* ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরংনিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্ম গোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে॥
অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশোদ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥
কস্মাচ্চ তেন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥
সখেতিমত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহার শয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহম প্রমেয়ম্॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্য প্রতিমপ্রভাব॥
গীতা, ১১অ, ১৮, ১৯, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪২।

† "Supersensuous objects are not to us objects of theoretic knowledge."

ক্যান্ট্-বিরচিত দর্শন শাস্ত্রে বিবিধ মতের সম্যক্‌রূপে সামঞ্জস্য না হওয়াতেই উত্তরকালীন দার্শনিকেরা নানাবিধ মত প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনেক স্থল এখন অস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে যে, ক্যান্ট্-এর বহু উক্তি অবলম্বন করিয়া বহুল দর্শন-শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, ক্যান্ট্‌কে অবলম্বন করিয়া শেলিং, ফিক্‌টে (Schelling, Fichte) ও অন্যান্য দর্শন-কারগণ বিবিধ শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া, দর্শন জগতে মহা উপপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। ক্যান্টের মতে মূলবস্তুর সম্যক্ জ্ঞান না হইলেও, মূলবস্তুর সত্ত্বা জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে না। কারণ, যদি সত্ত্বা না থাকে, তাহা হইলে রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ আসে কোথা হইতে? যদি বস্তু না থাকে, তবে তাহার গুণ আসে কোথা হইতে? সান্ত বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিতেছে, সে বিষয় ক্যান্ট্ও অস্বীকার করিতেছেন না। তবে সান্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান মূলবস্তুর জ্ঞান নহে। কিন্তু মূলবস্তু সম্বন্ধীয়-গুণের, বা উহা ইন্দ্রিয় সমক্ষে যে প্রকারে প্রতিফলিত হইতেছে, বা মূল বস্তু যে ভাবে ইন্দ্রিয় সমক্ষে প্রবর্ত্তিত,প্রতিভাত ও বিকসিত হইতেছে, মানব সেই জ্ঞানেরই অধিকারী। কিন্তু জ্ঞানের জন্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আবশ্যক। সুতরাং জ্ঞেয় বস্তুর সত্ত্বা স্বীকার না করিলে ক্যান্টের দার্শনশাস্ত্রের বিশুদ্ধ মায়াবাদে (pure idealism) পরিণত হওয়া অবশ্য-ম্ভাবী। এই ভয়ে ক্যান্ট্ স্পষ্টই বলিতে-ছেন,—"মূল বস্তু সম্বন্ধে সম্যকরূপে জ্ঞান না হইলেও, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের দ্বারাই বস্তুর সত্ত্বা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার কোন অন্তরায় নাই। * এইরূপ স্বীকার করিয়া না লইলে এক অতি-উৎকট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। দর্শনজ্ঞান জন্মিতেছে, কিন্তু দর্শনজ্ঞান জন্মাইবার বস্তু নাই।" ভাষান্তরে বলিতে গেলে বলিতে হয়, শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া। সুতরাং সান্ত বস্তুর জ্ঞান উপলব্ধি করিতে গিয়া, অনিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু বা অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান উপলব্ধি করিবার মানব অধিকারী। তাহা ক্যান্ট-কেও বাধ্য হইয়া স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি কেবল ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানে অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সম্ভাব স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সম্যক্ উপলব্ধির কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই। অবতরণিকা নামক গ্রন্থে রামমোহন রায়ও এই প্রকার মতের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। 'কোনও উপায় তাঁহার স্বরূপের (অর্থাৎ অনন্ত ভগবা-নের স্বরূপের) নির্ণয় হয় কি না?' এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় কহিতেছেন,— "তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তি-সিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধা-রণ করিতে পারে না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতে-ছেন, তাঁহার স্বরূপেও পরিমাণ নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়।" বেদে কোন স্থলে সেই অসীম পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি

*"Nevertheless it should be observed that we must be able, if not to know, at all events to be conscious of the same objects, also as *Dinge an sich*. Otherwise we should arrive at the irrational conclusion that there is appearance without something that appears."

শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধান কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন বলিতেছেন, "যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার সত্বা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর (যিনি অনন্ত) আছেন, ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয়ঃ হইতেছে ইত্যাদি।" আর্য্যধর্ম্ম-সংস্থাপক স্বর্গীয় দয়ানন্দ সরস্বতী গৌতমকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান-নির্দ্দেশক সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরের সত্বা প্রতিপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে জীবাত্মার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিতে পারে, তাহাও প্রমাণ করিয়াছেন। তর্ককেশরী দয়ানন্দ সরস্বতী বলিতেছেন:—মন ইন্দ্রিয় সাহায্যে বস্তুবিষয়ক গুণের জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ। কিন্তু গুণীর (অর্থাৎ মূল পদার্থের) জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। আত্মা যখন মনের ও মন যখন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন গুণীর বা মূলপদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। পৃথিবী একটী বস্তু, মন ইন্দ্রিয় সাহায্যে পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইতে পারে, কিন্তু যখন মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। সেই রূপ পবিত্র ও শুদ্ধ জীবাত্মা সৃষ্টির রচনা সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বরের সত্বা সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হয়।*

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, অনন্তের সত্বা জানিলেই কি যথেষ্ট হইল? সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার কি কোন উপায় নাই? আমরা বলি, আছে। বহু পুরাকাল, যাহার সম্বন্ধে ইতিহাসও সাক্ষ্যদান করিতে অসমর্থ হয়, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানুষ অনন্তকেই নানা ভাবে, নানা প্রকারে, নানা অবস্থার অধীনে উপলব্ধি করিয়া, নিজের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন নিয়মিত করিয়া আসিতেছে। জ্ঞান যাহাকে সম্যকরূপে ধরিতে না পারিয়া হতাশ মনে ফিরিয়া আসিল, ভক্তি সেখানে গিয়া অনন্তকে আয়ত্ত করিল। জ্ঞান যেখানে হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ক্লিষ্টমান ফিরিয়া আসিল, সিদ্ধহস্তা ভক্তি সেই লক্ষ্য অক্লেশে ভেদ করিয়া সফলকাম হইল। পূজ্যপাদ গীতাকার ভগবৎ উক্তিরূপে কি বলিতেছেন, সেই বিষয়ে অবধান করুন।*

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

১১ অ, ৫৪।

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তি ভক্তি দ্বারা আমায় ঐরূপ জ্ঞাত হইতে পারে এবং আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে ও তাহাতে

---

* (প্রশ্ন) আপ্ ঈশ্বর ২ কহতে হো পরন্ত উস্ কী সিদ্ধি কিস্ প্রকার করতে হো? (উত্তর) সব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণো সে। (প্রশ্ন) ঈশ্বর মেঁ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কভী নহী ঘট সকতে? (উত্তর)...... ..অব্ বিচারণা চাহিয়ে কি ইন্দ্রিয়োঁ ঔর মন সে গুণোকা প্রত্যক্ষ হোতা হয় গুণী কা নহি। জৈ সে চারোঁ ত্বচা আদি ইন্দ্রিয়োঁ সে স্পর্শ, রূপ, রস, ঔর গন্ধ কা জ্ঞান হোনে সে গুণী জো পৃথিবী উস কা আত্মা যুক্ত মন সে প্রত্যক্ষ কিয়া জাতা হয়, ঔরসে ইস্ প্রত্যক্ষ সৃষ্টি মেঁ রচনা বিশেষ আদি জ্ঞানাদি গুণোঁ কে প্রত্যক্ষ হোনে সে পরমেশ্বর কা ভী প্রত্যক্ষ হয়...... ভাব পরমেশ্বর কা প্রত্যক্ষ হোতা হয় তো অনুমানাদি সে পরমেশ্বর কা জ্ঞান হোনে মেঁ ক্যা সন্দেহ।......সত্যার্থ প্রকাশঃ ১৮১ পৃঃ।

প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। সেই জন্য বলিতেছি, ভক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞানের সাহায্যে সান্ত মানবের পক্ষে অনন্তের ধ্যান ধারণা করা অসম্ভব। তাই মনিষী মোক্ষমূলরও আমাদের সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন, "১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নলিখিত প্রকার ভক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। এমন কি, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের বিনা সাহায্যে নানা অবস্থার অধীনে নানা প্রকার ধর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ ভক্তির সাহায্যে অনন্তের উপলব্ধি করিতেছে। অনন্তকে উপলব্ধি করিবার মানবচিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক শক্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে জড়পূজা ও প্রেতপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীন্তন অনন্ত ঈশ্বরের আরাধনা আদৌ সম্ভবপর হইত না। মানবজাতির আদিম অবস্থা হইতে ইদানীন্তন ধর্ম্মসমূহের আলোচনা করিলে ইহাই জলদ অক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সান্ত ও সীমাবিশিষ্ট মানব অসীমকে আয়ত্ত করিতে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে, অনন্তের পশ্চাৎধাবিত হইতে, ও অনন্ত ঈশ্বরকে হৃদয়মনের সহিত প্রেম করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র।"* ভক্তাধীন ভগবান ভক্তিডোরে ভক্তের নিকট আবদ্ধ হন, ইহাই অসন্দিগ্ধ ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ... বলিয়াছেন "ভক্তিতে ডাকিতে পারিলে আমি থাকিতে পারি কৈ? ভক্তিতে চৈতন্য মোরে বেধেছিল প্রেমডোরে"।

এখন ভক্তি কি পদার্থ ও ইহার লক্ষণই বা কি, উপসংহারে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যেষ অনুরাগো "ভক্তিঃ।" অর্থাৎ পূজ্য বস্তুতে কামনারহিত অনুরাগের নামই ভক্তি। আবার কেহ ঈশ্বরানুরক্তিকেই ভক্তি কহিয়া থাকেন। বাস্তবিকই অহেতুকী ভক্তি ঊর্দ্ধমুখী, অনন্তধাবিনী ও অনিন্দ্রিয় বস্তুগ্রাহিনী। প্রমাণ স্বরূপ জীব গোস্বামী-বিরচিত ভক্তি রসামৃতসিন্ধু হইতে দু একটী শ্লোক উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলনকে সামান্যত ভক্তি কহে। এই অনুশীলন জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত এবং অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহা শূন্য হইলেই উত্তমা ভক্তি বলা যায়। উপরোক্ত শ্লোকে ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উত্তমা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ—অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন; তটস্থ লক্ষণ দুটী:—অন্যাভিলাষিত শূন্য এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত। নারদ পঞ্চরাত্রেও ভক্তির এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তি রুচ্যতে।"

ইন্দ্রিয়গণ দ্বারায় হৃষীকেশের তৎপরত্ব রূপে সেবনকেই ভক্তি কহে। এই সেবন

* "... ..in 1873, I tried to define the subjective side of religion or what is commonly called faith, in the following words: —Religion is a mental faculty which independent of, may, in spite of sense and reason, enables man to apprehend the infinite under different names and under varying disguises. Without that faculty, no religion, not even the lowest worship of idols and fetishes, would be possible; and if we will but listen attentively, we can hear in all religions a groaning of the spirit, a struggle to conceive the inconcievable, to utter the unutterable, a longing after the infinite a love of God."*

Lectures on the Science and Growth of religion p.23.

সর্ব্বোপাধি বিরহিত এবং নির্ম্মল হইবে। এখানে তৎপরত্ব শব্দের অর্থে আনুকূল্য, সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত শব্দে অন্যাভিলাষিতা শূন্য। সেবন, অনুশীলন, আর নির্ম্মল শব্দে জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত বুঝিতে হইবে। আবার তন্ত্রে দেখুন—সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী। নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্ গোবিন্দ ভক্তিতঃ॥ অর্থ—মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! যে ব্যক্তির গোবিন্দ-চরণারবিন্দে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ ভক্তিযোগ তাহাকে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি, বিষয়রূপ ভক্তি, মুক্তিস্বরূপ শাশ্বত ব্রহ্ম ও নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ অনুভব করাইয়া থাকে। হরিভক্তি সুধোদয়ে এই ভাবের প্রতিধ্বনি দৃষ্ট হয়:—

"ভূয়োঽপি যাচে দেবেশ ত্বয়ি ভক্তি দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্ত চতুর্ব্বর্গ ফলদা সুখদালতা॥"

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দেবেশ! আমি বারম্বার তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার ভক্তি যেন তোমাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হয়, যেহেতু এই ভক্তিলতা সুখদা অর্থাৎ ঈশ্বরানুভবানন্দদাত্রী এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল প্রদান করেন। উপরি উক্ত শ্লোকে ভক্তি মোক্ষ লঘু কারিতার কারণ হইতেছে। যেহেতু হৃদয়ে অল্পমাত্র ভগবদ্বিষয়ী রতি আবির্ভূত হইলেই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় তৃণ তুল্য জ্ঞান হইতে থাকে, অর্থাৎ ঐ পুরুষার্থ ভক্তের হৃদয়ে গমন করিতে লজ্জিত হয়। ভক্তি সম্বন্ধে অনুশীলন করিতে গিয়া সকল দেশের ভক্তই উক্তরূপ লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মনোবিজ্ঞান-বিশারদ গড্উইন্ (Godwin) ভাবান্তরে ভক্তি-বিষয়ে উক্ত রূপ লক্ষণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ধর্ম্মভীতি, অর্চনা-বৃত্তি, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি মানবের কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাভাবিক বৃত্তি আছে। সামাজিক বৃত্তির সহিত প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও কার্য্যতঃ ইহাদের বিশেষ পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যেহেতুক উক্ত ধর্ম্ম-বৃত্তির লক্ষ্যবস্তু (ইন্দ্রিয়ের) বিশেষ ভাবে দর্শনেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, অনির্দ্দিষ্টরূপে সুবিশাল, অপরিমিত ও অনন্ত।"* অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, যে ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানে অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায় মাত্র। সান্তকে অবলম্বন করিয়া মানবহৃদয়ে অনন্তের ক্রমিক বিকাশ, পরিস্ফুরণ ও অভিব্যক্তি হইতে থাকে। ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া উপক্রমণিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে যে, ভক্তির দ্বারাই মানবের অনন্তকে উপলব্ধি ও ভোগ করিবার বাসনা পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে।

অধুনা ভারতে নানা বিভাগে উন্নতি সাধিত হইতেছে। নানা স্থানে সাহিত্য অনুশীলন, শিল্প চর্চ্চা, ও আর কত প্রকার উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে। পুরাকালে পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষিগণ সামাজিক, রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে অনন্তের সত্তা অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া ধর্ম্মজীবনের আদর্শকেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া, সান্ত প্রকৃতির মোহজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের আশঙ্কা হয় যে,

* "The religious affections are fear, adoration, gratitude, faith. These are in nature like the social affections but they are distinguished by their unlimited character. Their objects are invisible, indefinitely great, and so approach towards the infinite". Page 99, Active principles.

যদি আমরা প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, ধর্ম্ম ও সমাজ উপপ্লবে এবং অন্যান্য কার্য্যকলাপে পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষিগণের ন্যায় অনন্ত ভগবানের অঙ্গুলীসঙ্কেত হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারি, তাহা হইলে পাশ্চাত্য বিলাসিতার ঝঞ্ঝাবাতে, বহুকাল-নির্ম্মিত মহর্ষিদিগের আদরের ধর্ম্মজীবনরূপ প্রাসাদ অচিরে ভূমিসাৎ হইবে। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী।

সখের দল ও পেশাদারী দল

গত আষাঢ় মাসের "নব্যভারতে" (বিংশ খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা, ১৫৯ পৃষ্ঠা) বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরীর "বরদাচরণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। ক্ষীরোদ বাবু প্রথম দুই প্যারাগ্রাফে সখের দলের সহিত পেশাদারী দলের তুলনা করিয়া, সখের দলের শ্রেষ্ঠতা সমর্থনের আয়াস পাইয়াছেন। ক্ষীরোদ বাবুর এটী নূতন প্রয়াস। ইংরাজি ভাষায় সৌখীন (amateurish) শব্দটী ফরাসী ভাষা হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ শিক্ষানবিসী (wanting the finish of a professional)। ভারতবর্ষ বা অপর কোন প্রদেশে পেশাদার অপেক্ষা সৌখীনের প্রশংসা নাই। আমরা উক্ত প্যারাগ্রাফ্ দুইটী ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিয়া, তিনি যে নূতন মত স্থাপনায় বিফল-মনোরথ হইয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিব। যদি আমাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া, ক্ষীরোদ বাবু নিজ অভিমত স্থাপন করিবার পুনরুদ্যম করেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।

১। "পেশাদার গায়কের গান ভাল হোক্ মন্দ হোক্, অনেকে শুনিতে পায়। তাই তাদের নাম দশের মধ্যে প্রচারিত।"

লেখার ভঙ্গিতে প্রকাশ পায় যে, পেশাদার গায়কের গান নিকৃষ্ট হইলেও, অনেকে শুনিতে পায় বলিয়াই সেই নিকৃষ্ট গীত দশের মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে। ক্ষীরোদ বাবুর মতে সাধারণে নির্ব্বোধ, যাহা শুনে তাহাতেই মোহিত হয়, তাহার আর ভালমন্দ বিচার করে না। কিন্তু তাহা নহে, প্রবন্ধলেখক সাধারণকে যতটা মূর্খ বিবেচনা করেন, বাস্তবিক তাহারা ততটা মূর্খ নহে। সাধারণের মধ্যে ক্ষীরোদ বাবুর মত লোক শত সহস্র রহিয়াছেন, তাহাদিগকে মূর্খ জ্ঞান করায় ক্ষীরোদ বাবুর বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় নাই। সাধারণে যদি মূর্খ হইত, তাহা হইলে বটতলার গ্রন্থকারের দ্বারে দ্বারে ফেরিওয়ালা দ্বারা পুস্তক বিক্রয় প্রভাবে বঙ্কিম বাবুর একখানি পুস্তকেরও দ্বিতীয় সংস্করণ হইত না। সাধারণেই পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট জিনিস না হইলে দশের মধ্যে কখনই প্রচারিত হয় না। "দশমুখে ধর্ম্ম" প্রবাদ বাক্যটী বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে। ক্ষীরোদ বাবু প্রবন্ধ লিখিবার কালীন বোধ হয় কোন মহৎ উদ্দেশে এ কথাটী বিস্মৃত হইয়াছেন।

"পেশাদারের দুর্ভাগ্য সবাই ডাকে। তাই ভাবে অভাবে গাহিতে হয়। বার্ণিশ মাখান পচা কাঠ বাজারে ঢের পাওয়া যায়।"

ক্ষীরোদ বাবুর উদ্দেশ্য পেশাদারে ভেল চালাইয়া থাকে! আমরা বলি, তাহারা খ্যাতনামা পেশাদার নহে—সামান্য পেশাদার; সুযোগমত দুই এক জনকে ঠকায়

এবং যাঁহারা সস্তায় মাল খোঁজেন, তাঁহারাই এই সব পেশাদারের খরিদদার। এ পেশাদারী স্থায়ী হয় না। যদিও চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু এরূপ পেশাদার সর্ব্বদাই বদ্‌লাইয়া যায়। আজ রামা পেশাদার ইনসল্‌ভেণ্ট গেল, কাল শ্যামা পেশাদার উক্ত স্থলাভিসিক্ত হইয়া পরশ্ব অপরকে স্থান দিয়া বাতি জ্বালিলেন। কিন্তু যে পেশাদার ঠকায় না, তাঁহার দোকানে বার্ণিশ করা পচা কাঠ থাকে না, তাঁহাদের পেশাদারী অপ্রতিহত প্রভাবে চিরকাল চলিয়া যায়। পৃথিবী যতই কলুষিত হোক, ভাল জিনিসের আদর চিরকালই থাকিবে। ক্ষীরোদ বাবু পচা কাঠই পেশাদারী দোকানে দেখিয়াছেন, কিন্তু যদ্যপি তাঁহার বাটীতে ভাল বার্ণিশ করা কাঠ থাকে, তাহা তিনি কোন্ সখের দোকান হইতে আনিয়াছেন? তাঁহাকে পেশাদারী দোকান হইতেই ক্রয় করিতে হইয়াছে। তিনি তো আর স্বয়ং সুন্দর বনে গিয়া, উৎকৃষ্ট কাঠ সংগ্রহ করিয়া, স্বয়ং রেঁদা ও বার্ণিশ করিয়া লন নাই!

২। "সখের দলে যা পাওয়া যায়, পেশাদারী দলে তাহার সম্ভাবনা নাই।"

ক্ষীরোদ বাবুর মতে সখের দলে যেরূপ উৎকৃষ্ট জিনিষ পাওয়া যায়, পেশাদার দলে তৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এ কথাটী সম্পূর্ণ বিপরীত। সখের দলের কার্য্য সখের উপর (অর্থাৎ অন্য জীবিকা-কার্য্যের সাবকাশ মত) হইয়া থাকে, কিন্তু পেশাদার অষ্টপ্রহর প্রাণপণ করিয়া খাটে। বিশেষতঃ কলাবিদ্যা, যাহা লইয়া কথা, তৎসম্বন্ধে পেশাদার প্রায়ই প্রথমে সৌখীন থাকেন। যখন দেখেন যে, সখের উপর তাঁহার কার্য্য অভীষ্টানুরূপ চলে না, সমস্ত সময় অর্পিত না হইলে তাঁহার সাধনার বস্তু তিনি লাভ করিতে পারেন না, অপর কার্য্যে অর্থ চেষ্টায় ফিরিলে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তিনি পেশাদার হন। কায়মনপ্রাণ অর্পণে কার্য্য করিলে যে সে কার্য্য সাময়িক সখের কার্য্য অপেক্ষা উত্তম হইবে, ইহাতে পৃথিবীর কোন স্থানে কোন জাতির সন্দেহ নাই। সখের কার্য্য পেশাদারী হইতে ভাল, এটী ক্ষীরোদ বাবুর আবিষ্কার, সম্পূর্ণ নূতন, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার মতটী সত্য হইলে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তাঁহাকে স্কুলের শিক্ষাকার্য্য হইতে অবসর দেওয়া, কেন না, শিক্ষাকার্য্যে তিনি পেশাদার, তাঁহার দোকানে পচা কাট।

সখ কথার অর্থ লইয়া এখানে একটী কথা উঠিতে পারে। কেহ কেহ রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধককে সৌখীন বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা বলি, তাঁহারা সৌখীন নন, তাঁহারা সাধক। পেশাদারদিগেরও পরিবার ও আত্মভরণপোষণ চিন্তায় সাময়িক অন্যমনা হইতে হয়। কিন্তু সাধক তন্ময় হইয়া দিবারাত্র থাকেন, তাঁহার আর কোন চিন্তাই নাই, সুতরাং অবিচ্ছিন্ন তন্ময়ত্ব-গুণে পেশাদার অপেক্ষা সমধিক কৃতী হন।

"জ্যোতিরিন্দ্রের এক একটী গান গিরীশ ঘোষের শত গানের সমতুল।"

জগতে যতপ্রকার কার্য্য আছে, বোধ হয় ভদ্রলোকের গুণের নিন্দা করার ন্যায় সহজ আর কিছুই নাই। কেন না, কোন ভদ্রলোক তাঁহার নিজের গুণের ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন না, নিন্দা নীরবে সহ্য করেন। আমরা মাসিক, সাপ্তাহিক ও প্রাত্যাহিক বহু কাগজে বহুবার

গিরীশচন্দ্রের নিন্দা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু একবার মাত্র "বঙ্গবাসীতে'' সহৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিবাদ ব্যতীত এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও প্রতিবাদ পাঠ করি নাই। সুতরাং আমাদেরও বিশ্বাস জন্মিয়াছে, গিরীশচন্দ্র ঘোষকে গালি দেওয়া অপেক্ষা এত সহজ ও নিরাপদ আর কিছুই নাই। হইতে পারে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু সুন্দর গীত রচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্ষীরোদ বাবুর, তুলনায় গিরীশ বাবুর নিন্দা করা এ স্থলে অনাবশ্যক। যদি তিনি সখের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত বলিয়া থাকেন (সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য তাই) তাহা হইলে উভয়েরই গীত উদ্ধৃত করিয়া, যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার মত সমর্থন করা উচিত ছিল। ক্ষীরোদ বাবু আপনাকে যতই বড় ভাবুন, সাধারণে যে তাঁহার কথাটী, বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এরূপ নহে। যে কথাই বলুন, তর্ক যুক্তি না দেখাইয়া বলিলে সে কথাই হইল না। এরূপ অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক উল্লেখে কেবলমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। যে গিরীশচন্দ্রের গীত, ভারতবর্ষে যেখানে বাঙ্গালী আছে, সেই স্থানেই গীত হইয়া থাকে, তাঁহাকে এরূপ অহেতু নিন্দা করা উচ্চরুচির পরিচয় নয়। আমরা বিশেষ রূপ জানি, গিরীশ বাবু কাহারও নিন্দায় কর্ণপাত করেন না। যাঁহারা তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকেন, এ কারণ তাঁহারা বিষ ঢালিতে না পারিয়া আপনার বিষে আপনিই জর্জ্জরিত হইয়া থাকে।

"সৌখীনের লজ্জা আছে, ভয় আছে, ভাবনা আছে।"

তাহার আর সন্দেহ কি? পেশাদার প্রথমে সখে যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে সেই কার্য্যে সমস্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অন্য কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তিনি যে সে কার্য্যের চরমোৎকর্ষ করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার সহিত সৌখীন যদি প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার লজ্জা, ভয় ও ভাবনা তো হইবেই। তাহা না হইলে উন্মাদ হইবার তাঁহার অতি অল্পই বিলম্ব আছে।

"সমস্ত প্রাণটা মিশাইয়া নবনীকোমল অঙ্গুলীর অগ্রে সুধাসিক্ত করিয়া তিনি মালা গাঁথেন।"

পেশাদার ভিন্ন সমস্ত প্রাণটা মিশাইয়া মালা গাঁথিতে পারে না। সৌখীনের মালা গাঁথা ভিন্ন আরও কাজ আছে। তাঁহাকে চাকুরীটী বজায় রাখিতে হয়, সংসারের কার্য্য দেখিতে হয়, অন্ততঃ জমিদারীটী দেখিতে হয়; তবে নিষ্কর্ম্মার কথা স্বতন্ত্র।

"কত মালিনী মালা বেচিয়া থাকে, কাণা রজনীর মালা সকলের চেয়ে সুন্দর। কাণীর চোখ থাকিলে মালা এত সুন্দর হইত না।"

মালিনীই শুধু পেশাদার নয়, কাণা রজনীও পেশাদার। সে মালা বেচিয়া তাহার পিতার সাহায্য করিত, পিতাও তাহার মালা সহরে বেচিয়া আসিত। কাণীর মালা সুন্দর, কবিকল্পনায়—কার্য্যক্ষেত্রে নয়।

"যে ফুল আঁধারে ফোটে, তার সুগন্ধ ও সুষমার তুলনা নাই। যে গুলা বেহায়ার মত পথের ধারে দিনের বেলা কটমট করিয়া চাহিয়া থাকে, রক্ত, লাক্ষা, তাম্বুল বা অঞ্জনের যত মাখামাখি হোক না কেন, তারা কবির হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। কটাক্ষের তীব্রতায় মন ভুলে না—কোমলতায় মন মুগ্ধ করে।"

ক্ষীরোদ বাবুর অর্থ বোধগম্য হয় না। তিনি লিখিতেছেন, তীব্র কটাক্ষ কবিহৃদয় স্পর্শ করে না, কোমলতায় স্পর্শ করিয়া থাকে। এ স্পর্শের অর্থ কি? বা এখানে

এ সকল কথার সার্থকতা কি? সম্ভবতঃ তাঁহার অভিপ্রায়, যাঁহারা বেশ্যার সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, তাঁহারা কবি হন না, কুল কামিনীর মাধুর্য্য দেখিলে কবি হইয়া থাকে। কুলকামিনীর মাধুর্য্য দেখিবার অধিকার পেশাদার এবং সৌখীন উভয়েরই আছে। আর রাস্তার ধারে "রুজ মাখান ফুল" (অর্থাৎ বেশ্যা) যে সৌখীন দেখিতে পান না, এমত নহে, তবে এ কথার উল্লেখ কেন? কবি, নারী বর্ণনা করিয়া থাকেন। স্বভাবকবি যাহাতে সৌন্দর্য্য পান, তাহাই লক্ষ্য করেন। গ্রীকদেশে ও ভারতবর্ষে গণিকা-গৃহে উচ্চ চর্চ্চা হইত; কবি, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইতেন, ইতিহাস পাঠে ইহা জানা যায়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রভৃতি পরকীয়া মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া পরমার্থলাভ করিয়াছিলেন। দোষ বস্তুতে নয়—মনে। পরমহংসদেব গণিকা দর্শনে "আনন্দময়ী" বলিয়া প্রণাম করিতেন। ক্ষীরোদ বাবুর যদি অভিপ্রায় এই হয় যে, পেশাদারেরা বেশ্যা দেখিয়া বেড়ায় এবং সৌখীনেরা কুলাঙ্গনা দেখে, তাহা হইলে তিনি একটী অযথা অপবাদ পেশাদারের উপর আরোপ করিতেছেন। অতিশয় বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিরও মাতা, ভগিনী প্রভৃতি আছেন। উচ্চ বস্তুর আদর হীনজনের নিকটও আছে। স্বভাবদোষে মদ খায়, কিন্তু মদ যে খারাপ, তাহা জানে। সৌখীন হইলেই যে কুলাঙ্গনার চিত্র অঙ্কিত করিবে, আর পেশাদার করিবে না, এ কথা বলা ক্ষীরোদ বাবুর যোগ্য নয়। জগদ্বিখ্যাত সেক্স্‌পিয়রকে "রুজ মাখান" স্ত্রীলোক লইয়া, কার্য্য করিতে হইয়াছিল। "রুজমাখা" মিসেস সিডনস্‌ চিত্রকরের শীর্ষস্থানীয় রেনালড্‌সের আদর্শ। কালিদাসের বেশ্যালয়ে মৃত্যু হইয়াছিল, প্রবাদ আছে। আর ইহাও জানা উচিত যে, বেশ্যা হইলেই যে একেবারে সমস্ত সদ্‌গুণবর্জ্জিতা হইয়া থাকে এবং কুলাঙ্গনামাত্রই যে সমস্ত সদগুণসম্পন্না, তাহা নহে। অনেকের নিজ স্ত্রীর প্রখরতায় জীবন শ্মশান হইয়াছে। "রুজমাখান" রঙ্গভূমির বেশ্যা নেল গুইন (Nell Gwinn) ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসকে সদ্‌যুক্তি দ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী এ্যান যখন ফ্রান্স আক্রমণ করেন, তখন ফ্রান্সরাজের উপপত্নী তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যুদ্ধব্যয় নির্ব্বাহ করেন। শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে, কুলাঙ্গনা, স্বামী জেলে যাইতেছে, তত্রাচ ("স্বর্ণলতার" প্রমদার ন্যায়) তাহার স্ত্রীধন ব্যয় করে নাই। কিন্তু অনেকেই জানেন,—কলিকাতা, চোরবাগানের জনৈক বেশ্যা তাহার উপপতির বিপদকালে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া রক্ষা করিয়াছিল; সোণাগাছির জনৈক প্রসিদ্ধ বেশ্যা উপপতির স্ত্রীর ভরণপোষণের নিমিত্ত যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়াছিল। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। উপপতির মাতৃহীন সন্তানগণকে অতি যত্নে লালনপালন করিতে অনেক বেশ্যাকে দেখা যায়। এ সকল উচ্চ গুণ যে কবি হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারে, তাহার প্রমাণ অনেক কাব্যে আছে। ক্ষীরোদ বাবু যখন সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সমস্ত বিচার করা তাঁহার উচিত ছিল। তাঁহার লেখায় তাঁহার পক্ষপাতিতা না বলিলেও, তাঁহার অদূরদর্শিতা প্রকাশ পায়।

পরমহংসদেব বলিতেন, ফুলের সৌরভ থাকিলে ভ্রমরগণ চতুর্দ্দিক হইতে আপনারাই ছুটিয়া আসে, ফুল বাস বিলাইতে ভ্রমরের দ্বারে যায় না। যদ্যপি বরদাচরণ বাবুর "অবসর" গ্রন্থ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যে শীঘ্রই তাহার সমাদর বাড়িয়া উঠিবে। ক্ষীরোদ বাবুর অপর লেখককে হেয় করিয়া, তাঁহাকে বাড়াইবার কোনও আবশ্যক ছিল না।

ক্ষীরোদ বাবু "অবসরের" আঁধার কবিতাটী যেরূপ বহু আড়ম্বর সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে কবিতার নূতনত্ব কিছুই দেখিলাম না। সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদবর্ণিত "অন্ধকারে আচ্ছাদিত, ঘোর অন্ধকার" হিন্দু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে। বরদা বাবুর বর্ণনা, তাহার অস্পষ্ট ছায়া মাত্র, কেবল নূতনত্ব এই:—

"স্তব্ধ প্রকৃতি-সনে অনাদি পুরুষ
বিশ্বসৃজন-তরে করিল বিহার,—"

কিন্তু উদ্ধৃত ছত্র দুইটীর ভাবার্থ শাস্ত্রের মর্ম্মবিরুদ্ধ। শাস্ত্রে পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। এরূপ নূতনত্ব উচ্চ কবির পরিচয় নয়। ক্ষীরোদ বাবুর বিচারপতির প্রশংসাসূচক প্রবন্ধেই প্রমাণ হয় যে, সখের কাব্য পেশাদারী কাব্য অপেক্ষা ভাল হয় নাই। ক্ষীরোদ বাবু এরূপ ভ্রমপূর্ণ বিচারপতির স্তুতি-প্রবন্ধ যে কি উদ্দেশ্যে লিখিলেন, তাহা অনেক ভাবিয়াও বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বামীবিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচার কার্য্য।

স্বামী বিবেকানন্দ মান্দ্রাজীদের নিকট আমেরিকা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দাস; তাঁহারই দূত হইয়া তাঁহার মঙ্গল বার্ত্তা তিনি সমগ্র জগৎকে বলিয়াছেন।*

মান্দ্রাজে তৃতীয় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আমি সারগর্ভ যা কিছু কথা বলিয়াছি, সমস্তই পরমহংসদেবের, আর যদি কিছু বলিয়া থাকি, সে সব আমার—

"Let me conclude by saying that if in my life I have told one word of truth it was his and his alone, and if I have told you many things which were not true, correct and beneficial to the human race, it was all mine and on me is the responsibility." *Third Lecture, Madras.*

কলিকাতায় ৺ রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে যখন তাঁহার অভ্যর্থনা করা হয়, তখনও বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দেবের শক্তি আজ জগৎব্যাপী, হে ভারতবাসীগণ, তোমরা তাঁহাকে চিন্তা কর, তাহা হইলে সকল বিষয়ে মহত্ব লাভ করিবে। তিনি বলিলেন—

"If this nation wants to rise it will have to come enthusiastically round his name. It does not matter who preaches Ramakrishna, whether I or you or any body. But him I place before you and it is for you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now what you shall do with this great ideal of life. * * * Within ten years of his passing away this power has

* "It was your generous appreciation of him whose message to India and to the whole world, I the most unworthy of his servants, had the privilege to bear; it was your innate spiritual instinct which saw in him and his message the first murmurs of that tidal wave of spirituality which is destined at no distant future to break upon India in all its irresistible powers" *etc: Reply to Madras Address.*

encircled the globe. Judge him not through me. I am only a weak instrument. His character was so great that I or any of his disciples, if we spent hundreds of lives, could do no justice to a millionth part of what he really was."

গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে স্বামী বিবেকানন্দ একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। ধন্য গুরুভক্তি!

আজ আমরা একটু আলোচনা করিব, পরমহংসদেবের সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম স্বামী কিরূপ প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১। ঈশ্বরদর্শন।

(Realisation of God.)

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম কথা ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে। কতকগুলি মত্ মুখস্থ বা শ্লোক মুখস্থ করার নাম ধর্ম্ম নয়। এই ঈশ্বর দর্শন হয় যদি ভক্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকে, তা এজন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই হউক। একদিনের তাঁহার কথাবার্ত্তা আমাদের মনে পড়ে। দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে কথা হইতেছিল।

পরমহংসদেব কাশীপুরের ৺ মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীকে বলিতেছিলেন*—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর!

"বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পঁহুছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পঁহুছিলে আর এক রকম, তখন স্পষ্ট স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, "আলু লও" "পয়সা দাও"।

"বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর, শাস্ত্র, সায়েন্স (Science) সব খড় কুটো বোধ হয়।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ এসব আগে জানবার জন্য অতো ব্যস্ত কেন?

"কিন্তু যোসো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক্, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক্; তখন ইচ্ছা হয় তো তিনিই বলে দেবেন, কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর দ্বারবান সব সেলাম করবে। (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত। এখন বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম্ম চাই। সাধন চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাক্‌লে হবে না। তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর, দেখা দাও বলে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনী কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।

"শুধু 'তিনি আছেন' বলে বসে থাকলে কি হবে। হালদারপুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চারা করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেলো, মাছটা ধপাঙ্গ করে উঠলো। যখন দেখা গেল, আরো আনন্দ।*

* রবিবার, ২৬এ অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

* যীশু খ্রীষ্টও তাঁর শিষ্যদের এই কথা বলিতেন। "Blessed are the pure in spirit, for they shall see God."

ঠিক এই কথা স্বামীও চিকাগোর ধর্ম্মসমিতি সমক্ষে বলিলেন—অর্থাৎ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা, দর্শন করা—

"The Hindu does not want to live upon words and theories. He must see God, and that alone can destroy all doubts. So the best proof a Hindu sage gives about the soul, about God is "*I have seen the soul*; I have seen God." * * The whole struggle in their system is a constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God and see God; and this reaching God, seeing God becoming perfect even as the Father in heaven is perfect, constitutes the religion of the Hindus."

Lecture on Hinduism (Chicago Parliament of Religions).

আমেরিকার অনেক স্থলে স্বামী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সকল স্থানেই এই কথা। Hartford নামক স্থানে বলিয়াছিলেন—

"The next idea that I want to bring to you is that religion does not consist in doctrines or dogmas. * * The end of all religions is the realising of God in the soul. Ideas and methods may differ, but that is the central point. That is the realisation of God, something behind this world of sense—this world of eternal eating and drinking and talking nonsense—this world of false shadows and selfishness. There is that beyond all books, beyond all creeds, beyond the vanities of this world—and that is the *realisation of God within yourself.* A man may believe in all the churches in the world, he may carry on his head all the sacred books ever written; he may baptise himself in all the rivers of the earth; still if he has no perception of God I would class him with the rankest atheist.

স্বামী তাঁহার রাজযোগ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আজকাল লোকে বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর দর্শন হয়; লোকে বলে হাঁ পূর্ব্বকালে ঋষিরা অথবা খ্রীষ্ট আদি মহাপুরুষগণ আত্মদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজ কাল আর তাহা হয় না। স্বামীজী বলেন, অবশ্য হয়—মনের যোগ (concentration) অভ্যাস কর, অবশ্য হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে পাইবে—

"The teachers all saw God, they all saw their own souls, and what they saw they preached. Only there is this difference that in most of these religions, especially in modern times, a peculiar claim is put before us and that claim is that these experiences are impossible at the present day, they were only possible with a few men, who were the first founders of the religions that subsequently bore their names. At the present time these experiences have become obsolete and therefore we have now to take religion on belief. This I entirely obey. Uniformity is the rigorous law of nature; what once happened can happen always.

Raja Joga: Introductory.

স্বামী New York নামক নগরে ৯ই জানুয়ারি, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কাহাকে বলে (*Ideal of a Universal Religion*) এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন—অর্থাৎ যে ধর্ম্মে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী বা কর্ম্মী সকলেই মিলিত হইতে পারে। বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার সময় ঈশ্বর-দর্শন যে সব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, এই কথা বলিলেন;—জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি এগুলি নানা পথ, নানা উপায়—কিন্তু গন্তব্য স্থান একই অর্থাৎ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার। স্বামী বলিলেন,

"Then again all these various *Jogas* (work or worship, Psychic control or philosophy) have to be carried out into practice; theories will not do. We have to meditate upon it, realise it until it becomes our whole life. Religion is realisation, not talk, nor doctrine, nor theories however beautiful they may be. It is being and becoming, not hearing or acknowledging; it is not an intellectual assent. By intellectual assent we can come to a hundred sorts of foolish things and change them next day, but this being and becoming is what is religion.

মান্দ্রাজীদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ কথা—হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব ঈশ্বর-দর্শন—বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য, ঈশ্বর দর্শন—

"The one idea which distinguishes the Hindu religion from every other in the world, the one idea to express which the sages almost exhaust the vocabulary of the Sanskrit language is that man must

realise God. * * . Thus to realise God, the *Brahman* as the *Dvaitas* (dualists) says, or to become *Brahman* as the *advaitas* say is the aim and end of the whole teachings of the *Vedas*.

Reply to Madras Address.

স্বামী, ২৯এ অক্টোবর, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে বক্তৃতা করেনঃ—বিষয়, ঈশ্বর দর্শন (*Realisation*)। এই বক্তৃতায় কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়া নচিকেতার কথা উল্লেখ করিলেন। নচিকেতা ঈশ্বরকে দেখিতে চান্, ব্রহ্মজ্ঞান চান। ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন, বাপু যদি ঈশ্বরকে জানিতে চাও, দেখিতে চাও, তাহা হইলে ভোগ আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, ভোগ থাকিলে যোগ হয় না, অবস্তু ভালবাসিলে বস্তু লাভ হয় না। স্বামী বলিতে লাগিলেন, আমরা বলিতে গেলে সকলেই নাস্তিক, কতকগুলি বাক্যের আড়ম্বর লইয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিতেছি। যদি একবার ঈশ্বর দর্শন হয়, তাহা হইলে সত্য সত্যই বিশ্বাস কিনা করিতে পারে ?

"We are all atheists and yet we try to fight the man who tries to confess it. We are all in the dark ; religion is to us a mere-nothing, mere intellectual assent, mere talk—this man talks well and that man evil. Religion will begin when that actual realisation in our souls begins. That will be the dawn of religion * * . Then will real Faith begin."

Realisation. London.

২। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়।

(Harmony of all Religions)

নরেন্দ্র * ও অন্যান্য কৃতবিদ্য যুবকগণ, ঠাকুর রামকৃষ্ণের সকল ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, একথা পরমহংসদেব মুক্তকণ্ঠে তো বলিতেন। কিন্তু তিনি আরো বলিতেন, সকল ধর্ম্মই সত্য—অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্ম দিয়া ঈশ্বরের কাছে পঁহুছান যাইতে পারে। এক দিন, ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, ৺ কেশবচন্দ্র সেন কোজাগর লক্ষ্মী পূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ষ্টীমারে করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। পথে জাহাজের উপর অনেক বিষয়ে কথা হইল। ঠিক এই সকল কথা ১৩ই আগষ্ট অর্থাৎ কয়েক মাস পূর্ব্বে হইয়াছিল। এই সর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয় কথা আমাদের diary হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

৺ কেদারনাথ চাটুর্য্যে সে দিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে মহোৎসব করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসিয়া বেলা ৩।৪টার সময় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। মত পথ। সকল ধর্ম্মই সত্য। যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়া যাওয়া যায়। ধর্ম্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

"নদী সব নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।

"ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি ; আর শুধু একটা দড়ি দিয়েও উঠা যায়। তবে উঠবার সময় একটা ধরে উঠতে হয়—দু তিন রকম সিঁড়িতে পা দিলে উঠা যায় না। তবে ছাদে উঠবার পর সব রকম সিঁড়ি দিয়া নামা যায়, উঠা যায়।

"তাই প্রথমে একটা ধর্ম্ম আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর লাভ হলে সে ব্যক্তি সব ধর্ম্ম পথ দিয়ে আনাগোনা করতে

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বের নাম।

পারে। যখন হিন্দুদের ভিতর থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু; যখন মুসলমানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে মনে করে মুসলমান,আবার যখন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেশে, সকলে ভাবে ইনি বুঝি খ্রীষ্টান।

"সব ধর্ম্মের লোকেরা একজনকেই ডাকছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি; কেউ God, কেউ আল্লা, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু।

"একটা পুকুরের চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্চে, তারা বলছে 'জল'। আর এক ঘাটে মুসলমান, তারা বলছে 'পানি'। আর এক ঘাটে খ্রীষ্টান, তারা বলছে 'water'। আবার এক ঘাটে কতকগুলো লোক বলছে 'aqua'। (সকলের হাস্য)। বস্তু এক—জল। নাম আলাদা, তবে ঝগড়া করবার কি দরকার। সকলেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে ও সকলেই তাঁর কাছে যাবে।

একজন ভক্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যদি অন্য ধর্ম্মে ভ্রম থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা ভ্রম কোন্ ধর্ম্মে নাই? সকলেই বলে, আমার ঘড়ী ঠিক যাচ্চে। কিন্তু কোন ঘড়ীই একেবারে ঠিক যায় না। সব ঘড়ীকেই মাঝে মাঝে সূর্য্যের সঙ্গে মিলাইতে হয়।

"ভুল কোন ধর্ম্মে নাই? আর যদিই ভুল থাকে, যদি আন্তরিক হয়, যদি ব্যাকুল হয়ে ডাকে, তা হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

"মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে—ছোট বড়। সকলেই 'বাবা' বলতে পারে না। কেউ বলে 'বাবা', কেউ 'বা' কেউ বা কেবল 'পা'। যারা 'বাবা' বলতে পারলে না, তাদের উপর বাপ কি রাগ করবে নাকি? (সকলের হাস্য)। না বাপ সকলকেই সমান ভালবাসবে?*

"লোকে মনে করে 'আমার ধর্ম্ম ঠিক, আমি ঈশ্বর কি বস্তু বুঝেছি, ওরা বুঝতে পারে নাই; আমি ঠিক তাঁকে ডাকছি, ওরা ঠিক ডাকতে পারে না; অতএব ঈশ্বর আমাকেই কৃপা করেন, ওদের করেন না।' এসব লোক জানে না যে, ঈশ্বর সকলের বাপ মা, আন্তরিক হলে তিনি সকলকেই দয়া করেন।"

কি প্রেমের ধর্ম্ম! একথা তিনি তো বার বার বলিলেন, কিন্তু কয় জন ধারণা করিতে পারিল? এক ৺ কেশব সেন কতকটা পারিয়াছিলেন। আর বিবেকানন্দ। তিনিই জগতের সম্মুখে এই প্রেমের ধর্ম্ম অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রচার করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মতুয়ার বুদ্ধি* করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। 'আমার ধর্ম্ম সত্য ও তোমার মিথ্যা' এটীর নাম 'মতুয়ার বুদ্ধি'—এইটী যত অনর্থের মূল। স্বামী এই অনর্থের কথা চিকাগো-ধর্ম্ম-সমিতি সমক্ষে বলিলেন। বলিলেন, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি অনেকেই ধর্ম্মের নামে কত রক্তারক্তি, কাটাকাটী, মারামারি করিয়াছেন।

"Sectarianism, bigotry and its horrible descendant, fanaticism, have possessed

* ঠিক এই কথা এক খানি ইংরাজী গ্রন্থে আছে—Maxmuller's Hibbert Lectures. মোক্ষমুলরও এই উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, যাঁহারা দেবদেবী পূজা করেন, তাহাদের ঘৃণা করা উচিত নয়।

* মতুয়ার বুদ্ধি—dogmatism.

long this beautiful earth. It has filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair." *Lecture on Hinduism*; Chicago *Parliament of Religions.*

স্বামী অপর এক বক্তৃতায় 'সকল ধর্ম্ম সত্য' এ কথা বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—

"If any one here hopes that this unity will come by the triumph of any one of these religions and destruction of the others, to him I say, Brother, yours is an impossible hope." Do I wish that the Christian could become Hindu! God forbid. Do I wish that the Hindu or Budhist would become Christian? God forbid.

"The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No. It becomes a plant, it assimilates the air, the earth and the water converts them into plant substance and grows a plant.

"Similar is the case with religion. The Christian is not to became a Hindu or a Budhist nor the Hindu or the Budhist to become a Christian. But each must assimilate the others and yet preserve its individuality, and grow according to its own law of growth.

আমেরিকায় স্বামী Brooklyn Ethical Society নামক সভায় হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অধ্যাপক Dr. Lewis James সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানেও প্রথম কথা, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়। স্বামী বলিলেন, একজনের ধর্ম্ম সত্য, আর সকলের ধর্ম্ম মিথ্যা, এরূপ হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম সত্য বলিতেছ, সে একটী ব্যাধি বিশেষ বলিতে হইবে। সকলের পাঁচটী অঙ্গুল আর একজনের যদি ছয়টী হয়, বলিতে হইবে যে, তাহার একটী রোগ বিশেষ!

"Truth has always been universal. If I alone were to have six fingers on my hand while all of you had only five, you would not think that my hand was the true intent of nature, but rather that it was abnormal and diseased. Just so with religion. If one creed alone were to be true and all the others untrue, you would have again to say that religion is diseased. If one religion is true, all the others must be true. Thus the Hindu religion is your property as well as mine.

Lecture at Brooklyn.

স্বামী চিকাগো ধর্ম্মমণ্ডল সভা সম্মুখে যে দিন প্রথম বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন, যে বক্তৃতা শুনিয়া চার পাঁচ সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে আসন ত্যাগ করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন †, সেই বক্তৃতা মধ্যে এই সমন্বয়-বার্ত্তা ছিল। স্বামী বলিয়াছিলেন—

"I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. *We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true.* I belong to a religion into whose sacred language, the Sanskrit, the word 'exclusion' is untranslatable.

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, কর্ম্মযোগ ও স্বদেশহিতৈষণা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা বলিতেন 'আমি ও আমার' এইটী অজ্ঞান, 'তুমি ও তোমার' এইটী জ্ঞান।

একদিন ৺ সুরেশমিত্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছিল, রবিবার ১৫ই জুন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী ভক্তও আসিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ভক্তদের বলিলেন—

"দেখ 'আমি ও আমার' এইটীর নাম অজ্ঞান। কালীবাড়ী রাণমণি করেছেন,

† "When Vivekananda addressed the audience as sisters and brothers of America, there arose a peal of applause that lasted for several minutes". *Dr. Barrows's Report.* "But eloquent as were many of the brief speeches no one expressed so well the spirit of the Parliament of religions and its limitations as the Hindu monk. * * He is an orator by Divine right."

New York Critique.

এই কথাই লোকে বলে! কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন। 'ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক করে গেছেন'; এ কথা আর কেউ বলে না যে ঈশ্বর ইচ্ছায় এটী হয়েছে! 'আমি করছি' এইটীর নাম, অজ্ঞান। 'হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়, এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ সব তোমার জিনিস, এ স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিস, এ সব কথা জ্ঞানীর।

'আমার জিনিস' 'আমার জিনিস' বলে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া, শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটী দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখে ছিলেন।"

ঠাকুরের কথা—শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটী দয়া থেকে হয়—ভক্তি থেকে হয়। তবে স্বামী বিবেকানন্দ অত স্বদেশের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন?

স্বামী চিকাগো ধর্ম্মমণ্ডলে একদিন বলিয়াছিলেন, আমার গরীব স্বদেশবাসীদের জন্য এখানে অর্থ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, ভারি কঠিন; খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট, যাহারা খ্রীষ্টান নয়, তাদের জন্য টাকার জোগাড় করা কঠিন।

"The crying evil in the East is not religion—they have religion enough but it is bread that these suffering millions of burning India cry out for with parched throats. * * * I came here to seek aid for my impoverished people, and fully realised how difficult it was to get help for heathens from Christians in a Christian land." *Speech before Parliament of religions* (Chicago Tribune).

স্বামীর একজন প্রধান শিষ্যা শ্রীমতী ভগ্নী নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) বলেন যে, স্বামী যখন চিকাগো নগরে বাস করেন, তখন ভারতবাসীদের কাহারও সহিত দেখা হইলে তিনি অতিশয় যত্ন করিতেন, তা তিনি যে জাতিই হউন—হিন্দু হউন, বা মুসলমান, বা পার্শী বা যিনিই হউন। তিনি নিজে কোন ভাগ্যবানের বাটীতে অতিথিরূপে থাকিতেন। সেইখানেই নিজের দেশের লোককে লইয়া যাইতেন। গৃহস্বামীরাও তাঁহাদের খুব যত্ন করিতেন; আর তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, তাঁহাদের যত্ন যদি না করেন, তাহা হইলে স্বামীজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন;—

"At Chicago any Indian man attending the great World Bazaar, rich or poor, high or low, Hindu, Mahomedan, Parsi, what not, might at any moment be brought by him to his hosts for hospitality and entertainment and they well knew that any failure of kindness on their part to the least of these would immediately have cost them his presence.

দেশের লোকের কিরূপে দারিদ্র্য-দুঃখ বিমোচন হয়, তাহাদের কিসে সৎশিক্ষা হয়, কিসে তাহাদের ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, এই জন্য স্বামী সর্ব্বদা ভাবিতেন।

কিন্তু তিনি দেশের লোকের জন্য যেরূপ দুঃখিত ছিলেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ দুঃখিত থাকিতেন। শ্রীমতী নিবেদিতা বলেন, স্বামী যখন দক্ষিণ United States মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কেহ কেহ

তাঁহাকে আফ্রিকাবাসী (Coloured man) মনে করিয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন, ইনি তাহা নহেন, ইনি হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ, তখন তাঁহারাই অতি সমাদরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'স্বামী, যখন আমরা তোমাকে বলিলাম 'তুমি কি আফ্রিকাবাসী?' তখন তুমি কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন?' স্বামী বলিলেন, কেন আফ্রিকাবাসী নিগ্রো কি আমার ভাই নয়?

অর্থাৎ স্বদেশবাসী কি জগৎ ছাড়া? নিগ্রোকেও যেমন ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ ভালবাসা, তবে তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকা, তাই তাদের সেবা আগে। এরি নাম অনাসক্ত হয়ে সেবা। এরি নাম কর্ম্মযোগ। সকলেই কর্ম্ম করে, কিন্তু কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ করে ভগবানের অনেক দিন ধরিয়া নির্জ্জনে ধ্যান চিন্তা না করিলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় না। 'আমার দেশ' বলিয়া নয় তাহা হইলে তো মায়া হইল; 'তোমার (ঈশ্বরের) এরা' তাই এদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা করিব; 'তোমারই এ কাজ' আমি তোমার দাস, তাই এই ব্রতপালন করিতেছি, সিদ্ধি হউক অসিদ্ধি হউক, সে তুমি জান; আমার নামের জন্য নয়, এতে তোমার মহিমা প্রকাশ হইবে।'

যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষিতা (Ideal Patriotism) কাহাকে বলে, লোক শিক্ষার জন্য স্বামী তাই এই দুরূহ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাদের গৃহ পরিজন আছে, কখন ভগবানের জন্য যাহারা ব্যাকুল হয় নাই, যাহারা 'ত্যাগ' এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করে, যাহাদের মন সর্ব্বদা কামিনী কাঞ্চন ও এই পৃথিবীর মান সম্ভ্রমের দিকে, যাহারা ঈশ্বর দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য শুনিয়া অবাক্ হয়, তাহারা স্বদেশহিতৈষিতার এই মহান উচ্চ আদর্শ কিরূপে গ্রহণ করিবে। স্বামী স্বদেশের জন্য কাঁদিতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা এটীও মনে রাখিতেন যে, এই অনিত্য সংসারে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিলাত হইতে ফিরিবার পর হিমাচল দর্শন করিতে আলমোরায় গিয়াছিলেন। আলমোরাবাসীরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধে পূজা করিতে লাগিলেন। স্বামী নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমগিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গাবলি সন্দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। বলিলেন, আজ এই পবিত্র উত্তরাখণ্ডে সেই পবিত্র তপোভূমি দেখিতেছি, যেখানে ঋষিগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়া, এই সংসারের কোলাহল হইতে প্রস্থান করিয়া নিশিদিন ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। তাঁহাদেরই শ্রীমুখ হইতে বেদমন্ত্র বিনির্গত হইয়াছিল! হায়! কবে আমার সে দিন হইবে! আমার কতকগুলি কাজ করিবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু এই পবিত্র ভূমিতে অনেক দিন পরে আবার আসিবার পর সকল বাসনা এককালে অন্তর্হিত হইতেছে, ইচ্ছা হয় বিরলে বসিয়া শেষ কয় দিন হরিপাদপদ্ম চিন্তায় গভীর সমাধি মধ্যে নিমগ্ন হয়ে শেষের কয় দিন কাটাইয়া যাই।

"It is the hope of my life to end my days somewhere within this Father of mountains, where *Rishis* lived, where philosophy was born." *Speech at Almora.*

হিমালয় দেখিলে আর কর্ম্ম করিতে

ইচ্ছা হয় না—মনে এক চিন্তার উদয় হয়—কর্ম্ম-সন্ন্যাস।

"As peak after peak of this Father of mountains began to appear before my sight, all those propensities to work, that ferment that had been going on in my brain for years, seemed to quiet down, and the mind reverted to that one eternal theme which the Himalayas always teach us, the one theme which is reverberating in the very atmosphere of the place, the one theme that I hear in the rushing whirlpools of its rivers'—*Renunciation.*"

"এই কর্ম্ম-সন্ন্যাস, এই ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ অভয় হয়—আর সকল বস্তুই ভয়াবহ—

"সর্ব্বম্‌বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাম্ বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

"Every thing in this life is fraught with fear. It is renunciation that makes one fearless."

"এখানে আসিলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না, ধর্ম্ম লইয়া ঝগড়া বিবাদ কোথায় পালাইয়া যায় * কেবল একটী মহান্ সত্যের ধারণা হয়—ঈশ্বরদর্শনই সত্য, আর যা কিছু জলের ফেণার ন্যায়—ভগবানের পূজাই একমাত্র জীবনে প্রয়োজন, আর সমস্তই মিথ্যা।

"ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু! অথবা মধুকর পদ্মের উপর বসিতে পাইলে আর ভন্ ভন্ করে না!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যেখানে ইচ্ছা যাও। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর গৃহ, ধন, পরিজন, আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বদেশ বিদেশ আবার কি? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, ঈশ্বরকে না জানলে এসব ধন, বিদ্যা কি হবে? হে মৈত্রেয়ী, আগে তাঁকে জানো, তার পর অন্য কথা! স্বামী এইটী জগৎকে দেখাইলেন। যেন বলিলেন, হে জগৎবাসীগণ, আগে বিষয় ত্যাগ করে নির্জ্জনে ভগবানের আরাধনা কর, তার পর যা কিছু কর কিছুতেই দোষ নাই, স্বদেশের সেবা কর, ইচ্ছা হয় কুটুম্ব পালন কর, কিছুতেই দোষ নাই, কেন না তুমি এখন বুঝিতেছ যে সর্ব্বভূতে তিনি আছেন—তিনি ছাড়া কিছুই নাই—সংসার, স্বদেশ কিছুই তিনি ছাড়া নয়। ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে, তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, রাম, তুমি যে সংসার ত্যাগ করিবে বলিতেছ, আমার সঙ্গে বিচার কর; যদি ঈশ্বর এ সংসার ছাড়া হন, তবে ত্যাগ কোরো*। রামচন্দ্র আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাই চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, ছুরীর ব্যবহার জেনে, ছুরী হাতে কর। স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে, যথার্থ কর্ম্মযোগী কাহাকে বলে, দেখাইলেন।

দেশের কি উপকার করিবে? স্বামী জানিতেন যে, দেশের দরিদ্রদের ধন দিয়া সাহায্য করা অপেক্ষা অনেক মহৎ কার্য্য আছে। ঈশ্বরকে জানাইয়া দেওয়া প্রধান কার্য্য; তৎপরে বিদ্যাদান; তাহার পর জীবন দান; তাহার পরে অন্ন বস্ত্র দান। সংসার দুঃখময়। এ দুঃখ তুমি কয় দিনের জন্য ঘুচাইবে? ঠাকুর রামকৃষ্ণ ৺কৃষ্ণদাস

" * Strong souls will be attracted to this Father of mountains in time to come, when all this fight between sects and all those differences in dogmas will not be remembered anymore, and quarrels between your religion and my religion will have vanished altogether, when mankind will understand that *there is but one eternal religion and that is the perception of the Divine within, and the rest is mere froth*! Such ardent souls will come here knowing that the world is but vanity of vanities, knowing that *every thing is useless except the worship of the Lord and the Lord alone.*"—*Speech at Almora.*

* যোগবাশিষ্ঠ।

পালকে* জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা জীবনের উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দূর করা'। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার ওরূপ রাঁড়ীপুতী † বুদ্ধি কেন? জগতের দুঃখনাশ তুমি করবে? জগৎ কি এতটুকু! বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে? এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খপর নিচ্চেন। তাঁকে আগে জানা—এই জীবনের উদ্দেশ্য—তারপর যা হয় কোরো, কারুর উপকার করতে ইচ্ছা হয় কোরো।

স্বামীও একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন—

"Spiritual knowledge is the only thing that can remove our miseries for ever; any other knowledge satisfies wants only for a time. * * He who gives spiritual knowledge is the greatest benefactor of mankind. * * Next to spiritual help (ব্রহ্মজ্ঞান) comes intellectual help (বিদ্যা দান); the gift of secular knowledge is far higher than the giving of foods and clothes; the next gift is the gift of life, and the fourth the gift of food." *Karmayoga* (New York); *My plan of Campaign* (Madras.)

ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য; আর এ দেশের ঐ এক কথা। আগে ঐ কথা তার পর অন্য কথা! 'রাজনীতি' (Politics) প্রথম হইতে বলিলে চলিবে না। আগে অনন্যমন হইয়া ভগবানের ধ্যান চিন্তা কর, হৃদয় মধ্যে তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন কর। তাঁহাকে লাভ করিয়া তখন 'স্বদেশের' মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে; কেন না, তখন মন অনাসক্ত; 'আমার দেশ' বলিয়া সেবা নয়—সর্ব্বভূতে ভগবান্ আছেন বলিয়া তাঁহারই সেবা। তখন স্বদেশ বিদেশ ভেদ-বুদ্ধি থাকিবে না। তখন কিসে জীবের মঙ্গল সাধন হয়, ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, দাবাবড়ে যারা খেলে, তারা ঠিক চাল বুঝতে তত পারে না; যারা উদাসীন, কেবল বসে খেলা দেখে, তারা উপর চাল্ বেশ বলে দিতে পারে। কেননা, উদাসীনের নিজের কোন দরকার নাই, রাগদ্বেষবিমুক্ত। উদাসীন অনাসক্ত জীবন-মুক্ত মহাপুরুষ নির্জ্জনে অনেক দিন সাধন করিয়া যাহা লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহার কাছে আর কিছুই ভাল লাগে না;—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে।

হিন্দুর রাজনীতি সমাজনীতি তাই সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্র। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি মহাপুরুষ এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা। তাঁহাদের কিছুরই প্রয়োজন নাই। তথাপি ভগবান্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া গৃহস্থের জন্য তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁরা উদাসীন হয়ে দাবা-বড়ের চাল বলে দিচ্ছেন, তাই দেশ কাল পাত্র বিশেষে তাঁহাদের কথায় একটী ভুল হইবার যো নাই।

বিবেকানন্দ কর্ম্মযোগী। অনাসক্ত হইয়া পরোপকারব্রত রূপ কর্ম্ম করিয়াছেন। তাই কর্ম্মীদের সম্বন্ধে তাঁহার কথার এতো মূল্য। অনাসক্ত হইয়া এই দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, যেমন পূর্ব্বতন মহাপুরুষ-গণ জীবের মঙ্গলার্থ বরাবর করিয়া গিয়াছেন। এই নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনার্থ যেন আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিতে পারি। কিন্তু এটী কি কঠিন ব্যাপার! প্রথমে হরিপাদপদ্ম লাভ করিতে হইবে!—তজ্জন্য

* ৺ কৃষ্ণদাস পাল দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

† রাঁড়ী পুতী বুদ্ধি—বিধবার ছেলের বুদ্ধি, হীন-বুদ্ধি; কেন না সে ছেলে অনেক নীচ উপায়ে মানুষ হয়; পরের তোষামোদ করিয়া, ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের ন্যায় ত্যাগ ও তপস্যা করিতে হইবে! তবে এই অধিকার হইতে পারে।

ধন্য ত্যাগী মহাপুরুষ! তুমি যথার্থই তোমার গুরুদেবের পদানুসরণ করিয়াছ! তাঁর মহামন্ত্র—আগে ঈশ্বর লাভ, তাহার পর অন্য কথা, তুমিই সাধন করিয়াছ! তুমিই বুঝিয়াছিলে, ভগবান্‌কে ছাড়িয়া দিলে, এ সংসার যথার্থই স্বপ্নবৎ, ভেল্কী বাজি; তাই সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া তাঁর সাধন আগে করিয়াছিলে। যখন দেখিলে, সর্ব্ব বস্তুর প্রাণ তিনি, যখন দেখিলে তিনি ছাড়া কিছুই নাই, তখন আবার এই সংসারে মনোনিবেশ করিলে; তখন হে মহাযোগিন্, সর্ব্বভূতস্থ সেই হরির সেবার জন্য আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে; তখন তোমার গভীর অপার প্রেমের অধিকারী সকলেই হইল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বিদেশী, স্বদেশবাসী, ধনী, দরিদ্র, নর নারী, সকলকেই তুমি প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছ! তখন তীব্র বৈরাগ্য বশতঃ যে গর্ভধারিণী মাতৃদেবীকেও ত্যাগ করিয়া চক্ষের জলে ভাসাইয়া, গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তখন সেই মাকে আবার দর্শন দিলে ও বাৎসল্য স্বীকার করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিলে! তোমার গুরু ভাইরা তোমার অদ্ভুত স্নেহ ও তোমার সর্ব্বভূতে সেই অপার প্রেম স্মরণ করিয়া আজ তোমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তোমার সেই পঞ্চম বর্ষীয় প্রেমানুরঞ্জিত বালকমূর্ত্তি, তোমার সদানন্দ রূপ আজ না দেখিতে পাইয়া ভগ্নহৃদয় লইয়া বাস করিতেছেন; তাঁহারা নিশিদিন বিরলে বসিয়া তোমার জন্য মণিহারা ফণীর ন্যায়, অথবা শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাখালদিগের ন্যায়, আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন,—তাঁহারা দিন গণনা করিতেছেন, কবে পিতা ও তোমার সহিত পিতার পরমধামে, তাঁহাদের সম্মিলন হইবে! তুমি পিতার কার্য্য সাঙ্গ করিয়া আজ তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া আছ ও তোমার গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত অতুলনীয় কণ্ঠে তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করিতেছ! এসো, একবার আসিয়া তোমার প্রাণের ভাইদের সান্ত্বনা কর! আর যাহাদিগকে গুরুদেবের পথ প্রদর্শন করাইয়া, তাঁহার পথে তুলিয়া লইয়া, কাছে রাখিয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহাদের একটু অসুখ হইলে চিন্তিত হইতে ও শতবার খপর লইতে, তাহারা তোমাকে অনেক দিন দেখে নাই; তাহারা মাতৃহীন বালকের ন্যায় দীনহীন হইয়া রহিয়াছে; এসো, তাহাদের ও তোমার ভাইদের সান্ত্বনা করিবে! আর সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গার তীরে যে তপোবনে মহাপূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ; হরিময় জগতের সেবার্থ অশ্রুতপূর্ব্ব পরিশ্রম সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম সাঙ্গ করণান্তর বিশ্রামার্থ যে তপোবনে ফিরিয়া আসিয়াছিলে; যে তপোবনে, গভীরতত্ত্বচিন্তা ও ধ্যান সমাধি হইতে মন নামাইবার জন্য মাঝে মাঝে বালকের ন্যায় তরু লতা পশু পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করিতে ও তাহাদের সন্তান বোধে লালন পালন করিতে; যে তপোবনে সাক্ষাৎ মহাকালীর সম্মুখে তাঁহার সেবায় মহাসমাধিমগ্ন তোমার মহামন্ত্রপূত দেব দেহ প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি মধ্যে আহুতি প্রদান করিয়াছ,—আজ সেই তপোবনে তোমার ভাইরা বিষণ্ণ বদনে সাশ্রুনয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ দিন যাপন করিতেছেন; আজ

সেই তপোবনে তোমার লালিত পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কাতর, তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার দিবে বলিয়া ও তাহাদের লইয়া আনন্দ করিবে বলিয়া, তুমি কখন আসিবে বলিয়া, তাহারা ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; অতএব এসো, ভক্ত চূড়ামণি, তোমার গভীর স্নেহের জিনিস গুলিকে একবার দেখিয়া যাও, একবার আসিয়া তাহাদের হৃদয়ের গভীর বেদনা দূর কর!!

৪। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

এক দিন ৺ কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যবৃন্দ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কেশবের সঙ্গে সাকার নিরাকার সম্বন্ধে অনেক কথা হইত। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিতেন, আমি মাটীর কালী মনে করিনা। চিন্ময়ী কালী। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী, যখন নিষ্ক্রিয় তখন 'ব্রহ্ম', যখন সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন, তখন কালী, অর্থাৎ যিনি কাল * সঙ্গে রমণ করেন। তাঁহাদের নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা একটু তুলিয়া দিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, কুলকিনারা নাই। ভক্তি হিমে এই সমুদ্রের স্থানে ২ জল বরফ হয়ে যায়; স্থানে স্থানে যেন জল বরফ আকারে জমাট্ বাঁধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার ব্রহ্ম-জ্ঞান-সূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ টুপ্ সব উড়ে যায়। তখন কি তিনি মুখে বলা যায় না—মন বুদ্ধি অহংতত্ত্ব দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

"যে লোক এ একটা ঠিক জানে, সে আর একটাও জানতে পারে। যে নিরাকার জানতে পারে, সে সাকারও জানতে পারে। সে পাড়াতেই গেলে না—কোন্‌টা শ্যামপুকুর কোনটা তেলিপাড়া, জানবে কেমন করে?"

সকলে নিরাকার পূজার অধিকারী নয়, তাই সাকার পূজার বিশেষ প্রয়োজন, এ কথাও পরমহংস বুঝাইলেন। বলিলেন—

"এক মার পাঁচ ছেলে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করছেন, যার যা পেটে সয়। কারু জন্য মাছের পোলাও করছেন। যার পেটের অসুখ, তার জন্য মাছের ঝোল করছেন। যেটা যার পেটে সয়।"

এদেশে সাকার পূজা হয়। খ্রীষ্টান মিসনরিরা আমেরিকা ও ইউরোপে এদেশবাসীদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসীরা পুতুল পূজা করেন—ও তাহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পূজার অর্থ আমেরিকাতে প্রথমেই বুঝাইলেন। বলিলেন, ভারতবর্ষে পুতুল পূজা হয় না।

"At the very outset I may tell you there is no polytheism in India. In every temple, if one stands by and listens he will find the worshippers applying all the attributes of *God* to these *Images*."

Lecture on Hinduism.

ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই সাকার চিন্তা বই আর কিছু আসিতে পারেনা, এ কথা মনোবিজ্ঞান (Psychology) সাহায্যে স্বামী বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন—

"Why does a Christian go to Church? Why is the cross holy? Why is the face turned towards the sky in prayer? Why are there so many images in the Catholic church? Whey are there so many images *in the minds* of Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about *anything* without a material image than we can live without breathing. Omnipresence to almost the

* কাল—The Spirit of Eternity,

whole world means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we think of the extended earth; that is all." *Lecture on Hinduism* (Chicago)

স্বামীজীও বলিলেন, 'অধিকারী ভেদে সাকার পূজা ও নিরাকার পূজা। সাকার পূজা কুসংস্কার নহে—মিথ্যা নহে, 'নিম্ন-স্থানীয় সত্য'—

"If a man can realise his divine nature most easily with the help of an image, would it be right to call it a sin? Nor even when he has passed that stage should he call it an error. To the Hindu man is not travelling from error to truth but from truth to truth, from lower to higher truth."

স্বামীজী বলিলেন, সকলের পক্ষে এক নিয়ম হইতে পারে না। ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি নানা ভক্তের নিকট নানা ভাবে প্রকট হইতেছেন। হিন্দু এইটী বুঝেন।

"Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Other religions lay down certain fixed dogmas and try to force society to adopt them: they place before society one kind of coat which must fit Jack and John and Henry, all alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his body. *The Hindus have discovered that the Absolute can be realised, thought of or stated only through the Relative.*"

৫। পাপবাদ।

স্বামীজীর গুরুদেব বলিতেন, ঈশ্বরের নাম লইলে ও আন্তরিক তাঁহার চিন্তা করিলে পাপ পালিয়ে যায়। যেমন তুলার পাহাড় অগ্নিস্পর্শে একক্ষণে পুড়িয়া যায়; অথবা যেমন বৃক্ষে পাখী অনেক বসিয়াছে, হাততালি দিলে সব উড়ে যায়। এক দিন কেশব বাবুর সহিত কথা হইতেছিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। মনে-তেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি, আর অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায় 'বিষ নাই' 'বিষ নাই' জোরকরে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি মুক্ত' এই কথাটী রোক করে বল্‌তে বল্‌তে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

খ্রীষ্টানদের একখানা বই (Bible) একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বল'-লাম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ!

তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বারবার বলে, সে শ্যালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে সে তাই হয়ে যায়!

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি! আমি তাঁর নাম করেছি,আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি? কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিয়াছিল। এক দিন ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে তার জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে, 'ওরে তুই আমায় একঘটী জল দিতে পারিস? তুই কি জাত?' সে বল্লে, ঠাকুর মহাশয় আমি হীন জাত্ মুচি। কৃষ্ণকিশোর বল্লে, তুই বল্ শিব, আর জল তুলেদে।

"ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

"কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বলো যে 'অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি তা আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর!

স্বামীজী খ্রীষ্টানদের এই পাপবাদ

সম্বন্ধে বলিলেন, পাপী কি! তোমরা অমৃতের অধিকারী Sons of Immortal Bliss, তোমাদের ধর্ম্ম যাজকেরা রাত দিন নরকাগ্নির কথা বলে, সে কথা শুনিও না।

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye, divinities on earth, sinners? It is a sin to call a man so. Come up, Oh lions! and shake off the delusion that you are sheep! you are souls immortal, spirits free and blest and eternal, ye are not matter, ye are not bodies, matter is your servant, not you the servant of matter." *Lecture on Hinduism* (Chicago).

আমেরিকায় Hartford নামক স্থানে স্বামী বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখানকার American Consul Paterson সাহেব তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বামী আবার খ্রীষ্টানদের পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, যদি ঘর অন্ধকার হয়, তাহলে 'অন্ধকার' অন্ধকার' 'অন্ধকার' করিলে কি হইবে? আলো জ্বালো তবে তো হবে—

"Shall we advise men to kneel down and cry : O miserable sinner that I am! No, rather let us remind them of their divine nature * * If the room is dark, do you go about striking your breast and crying, "It is dark! it is dark!" No, the only way to get the light is to strike a light and then the darkness goes. The only way to realize the light above you is to strike the spiritual light within you and the darkness of impurity and sin will flee away. Think of your higher self not of your lower.

স্বামী পরমহংসদেবের কাছে একটী গল্প* শুনিয়াছিলেন, সেই গল্পটী বলিলেন। "একটা বাঘিনী এক ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। পূর্ণগর্ভা তাই লাফ দিতে গিয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘিনীর মৃত্যু হইল। ছানাটী ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল, আর তাদের সঙ্গে ঘাস খেতে লাগল ও 'ব্যা—অ্যা,' 'ব্যা—অ্যা' করতে লাগল। কিছুদিন পরে সে ছানাটী বেশ বড় হইল। একদিন ছাগলের পালে আর একটা বাঘ পড়িল। সে দেখে অবাক্ যে একটা বাঘ ঘাস খাচ্চে, আর ব্যা ব্যা করছে, আবার তাকে দেখে ছাগলদের মত পালাচ্চে! তখন তাকে ধরে জলের কাছে নিয়ে গেল ও বলিল, 'তুইও বাঘ, তুই ঘাস খাচ্চিস কেন, আর ব্যা ব্যা করচিস্ কেন—দেখ আমি কেমন মাংস খাচ্চি, তুইও খা, ঐ দেখ জলে তোর মুখ দেখা যাচ্চে, আমারই মত।' বাঘটা সব দেখিল, মাংসেরও আস্বাদ পাইল।"

৬। 'কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ'—সন্ন্যাস।

একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমাদের diary হইতে সেই কথাবার্ত্তার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে লোক শিক্ষা দেওয়া যায় না। দেখনা কেশব (সেন) ঐটী পারলে না বলে কি হলো শেষটা। তুমি নিজে ঐশ্বর্য্যের ভিতর, কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থেকে যদি বল সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই বস্তু, অনেকে তোমার কথা শুনবে না। আপনার কাছে গুড়ের নাগরী রয়েছে, পরকে বলছে 'গুড় খেওনা'! তাই ভেবে চিন্তে চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করলেন। তা না হলে জীবের উদ্ধার হয় না।

বিজয়। হাঁ। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, কফ যাবে বলে পিপ্পল খণ্ড তএর ক'রলাম*—' কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হ'ল, কফ

* এই আখ্যায়িকাটী সংবাদদর্পনে আছে। আখ্যায়িকা প্রকরণ।

* পিপ্পলখণ্ড—অর্থাৎ নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার।

বেড়ে গেল ; নবদ্বীপের অনেক লোক ব্যঙ্গ করিতে লাগিল ও বলিল, নিমাই পণ্ডিত বেশ আছে হে ; সুন্দরী স্ত্রী, প্রতিষ্ঠা, অর্থের অভাব নাই, বেশ আছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব যদি ত্যাগী হোতো, অনেক কাজ হোতো। ছাগলের গায়ে ক্ষত থাকলে আর ঠাকুর সেবা হয় না, বলি দেওয়া হয় না। ত্যাগী না হলে লোক শিক্ষার অধিকারী হয় না। গৃহস্থ হলে কজন তার কথা শুনবে ?"

বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী, তাই তাঁর ঈশ্বর বিষয়ে লোক শিক্ষা দিবার অধিকার। বিবেকানন্দ বেদান্তে ও ইংরাজি ভাষা ও দর্শনাদিতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য, তাই কি তাঁর মাহাত্ম্য ? বিবেকানন্দ অসাধারণ বাগ্মী, তাই কি তাঁর মাহাত্ম্য ? এর উত্তর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিবেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ভক্তদের সম্বোধন করিয়া পরমহংসদেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"এই ছেলেটীকে * দেখছো, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটী ; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হইলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখন আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ্ ফোটে আর ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাবে, আর মাটীতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উচুতে উঠে যায়।"

বিবেকানন্দ এই 'হোমাপাখী'—তাঁর জীবনের এক লক্ষ্য মার কাছে চোঁচা দৌড় দিয়ে উঠে যাওয়া—গায়ে মাটী না ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে অর্থাৎ সংসার স্পর্শ না কর্‌তে কর্‌তে ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলিয়াছিলেন, 'পাণ্ডিত্য ! শুধু পাণ্ডিত্য কি হবে ? শকুনিও অনেক উঁচুতে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে ! কোথায় পচা মড়া ! পণ্ডিত অনেক শ্লোক ফড়র্ ফড়র্ করতে পারে, অনেক পাশ্ কর্‌তে পারে, কিন্তু মন কোথায় ? যদি হরিপাদপদ্মে থাকে, তবে তাকে আমি মানি, যদি কামিনীকাঞ্চনে থাকে, তাহলে তাকে আমার খড়্‌কুটো বোধ হয়।'

বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নন,—তিনি সাধু মহাপুরুষ। শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরেজও আমেরিকা-বাসীগণ তাঁকে ভৃত্যের ন্যায় সন্তানের ন্যায়, সেবা করেন নাই। তাঁহারা

---

* স্বামী বিবেকানন্দ তখন General Assembly কলেজে পড়েন। বয়স সবে ১৯।২০ ; তাঁহার বাড়ী তখন কলেজের কাছে সিমুলিয়ায়। পিতার নাম ৺ বিশ্বনাথ দত্ত, হাইকোর্টের আটর্নি। বালকের নাম নরেন্দ্র। কলেজে থাকিয়া বি, এ, পাশ করেছিলেন। তখন Hastie সাহেব প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মা আছেন ও ভাই ভগ্নীরা আছেন।

· স্বামীর জন্মদিন সোমবার পৌষ সংক্রান্তি ১২৬৯ সাল প্রাতে ৬।৩৩।৩৩ সময়, সূর্য্যোদয়ের ৬মিনিট পূর্ব্বে, বয়স ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন হইয়াছিল।

বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি আর এক জাতীয় লোক। লোকে সম্মান, টাকা, ইন্দ্রিয়-সুখ, সন্ন্যাস, পাণ্ডিত্য লইয়া রহিয়াছে; ইঁহার এক লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ.* । আমেরিকায় তাঁহার প্রলোভন কম হয় নাই। একে জগৎব্যাপী প্রতিষ্ঠা। তাহাতে সর্ব্বদাই পরমাসুন্দরী উচ্চ বংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলাগণ সর্ব্বদা আসিয়া আলাপ ও সেবা করিতেন। তাঁহার এত মোহিনী শক্তি যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্যা (heiress) সত্য সত্য একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "স্বামী! আমার সর্ব্বস্ব ও আমাকে আপনাতে সমর্পণ করিলাম।" স্বামী তদুত্তরে বলিলেন "ভদ্রে! আমি সন্ন্যাসী, আমার বিবাহ করিতে নাই। সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরূপা।"

ধন্য বীর! তুমি গুরুদেবের উপযুক্ত শিষ্য! তোমার গায়ে যথার্থই পৃথিবীর মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই! তোমার গায়ে কামিনীকাঞ্চনের দাগ্‌টী পর্য্যন্ত লাগে নাই। তুমি প্রলোভনের রাজ্য হইতে পলায়ন কর নাই। তাহার মধ্যে থাকিয়া শ্রীনগরে বাস করিয়া, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইয়াছ! তুমি সামান্য জীবের ন্যায় দিন কাটাইতে চাও নাই! তুমি দেবভাবের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া এ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছ!

৭। স্বামী ও কর্ম্মযোগ; নিষ্কাম কর্ম্ম।

পরমহংসদেব বলিতেন "কর্ম্ম সকলেরই করিতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এ তিনটী ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ। কর্ম্ম করিতে হইলে, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। 'আমি কর্ত্তা' এটী অজ্ঞান। আমার ধন জন, কার্য্য কলাপ, এটীও অজ্ঞান। আপনাকে অকর্ত্তা জেনে ঈশ্বরকে ফল সমর্পণ করে কাজ করিতে হয়। গীতায় যে আছে কর্ম্মযোগ, সে এই। তবে কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। অনেক দিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের সাধন না করিলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা যায় না। কোন দিক্ থেকে আসক্তি আসিয়া পড়ে, ইহা জানিতে পারা যায় না। মনে করিতেছি, আমি অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া দানাদি কার্য্য করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আমি লোকমান্য হইবার জন্য করিতেছি, নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। যে ব্যক্তি গৃহস্থ, যার গৃহ পরিজন আত্মীয় কুটুম্ব আমার বলিবার আছে, তাহাকে দেখিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম ও অনাসক্তি, পরার্থে স্বার্থত্যাগ, এ সকল শিক্ষা করা বড় কঠিন। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধু মহাপুরুষ যদি নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া দেখান, তাহা হইলে লোকে সহজে বুঝিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জ্জনে গুরুর কৃপায় অনেক দিন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্ম্মযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংসদেবের মত কেবল জ্ঞান ভক্তি লইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই। সংসারীরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া

---

* Truth never comes where lust and fame and greed
Of gain reside. No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be?
Nor he who owns however little—
So give these up, *Sanyasin* bold say
"Om tat sat, om!"
Song of the Sanyasin by *Vivekananda*.

তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, স্বামীজী তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও মান, এ সকলকে সন্ন্যাসীর ন্যায় কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না; কিন্তু তাহাদিগকে পরার্থে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিজে কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গ হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অর্থ জীবের মঙ্গল কল্পে ব্যয় করিয়াছেন। স্থানে স্থানে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোরার নিকটস্থ মায়াবতীতে, ৬ কাশীধামে, মান্দ্রাজে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে নানা স্থানে—দিনাজপুর, বৈদ্যনাথ, কিষণগড়, দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে—সেবা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় পিতৃ মাতৃহীন অনাথ বালক বালিকাগণকে অনাথাশ্রম করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। রাজপুতনার অন্তর্গত কিশেনগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, এ আশ্রমে ইংরেজ Commissioner নিজে আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করিয়াছিলেন। মুরসিদাবাদের নিকট ভাবদা গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম চলিতেছে। স্বামী হরিদ্বার নিকটস্থ কঙ্খলে পীড়িত সাধুদিগের জন্য সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া সেবা সুশ্রূষা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙ্গালের জন্য একাকী বসিয়া কাঁদিতেন! আর বন্ধুদের সমক্ষে বলিতেন 'হায়! এদের এত কষ্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা করিবার অবসর পর্য্যন্ত নাই!''

তিনি সন্ন্যাসী। তাঁহার এ সকল কর্ম্মের কি প্রয়োজন *? কেবল লোক-শিক্ষার জন্য। সংসারী লোককে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে এ সকল কর্ম্ম করাইলেন। এখন সংসারী লোকে শিখিবে যে, যদি তাহারাও কিছু দিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের সাধন করিয়া ভক্তি লাভ করে, তাহারাও স্বামীজীর ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারিবে, যথার্থ অনাসক্ত হইয়া দানাদি সৎকার্য্য করিতে পারিবে। স্বামীজীর গুরুদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আঠা লাগবে না।" অর্থাৎ নির্জ্জনে সাধনের পর ভক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীর কার্য্যে হাত দিলে, যথার্থ নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করিলে, নির্জ্জনে সাধন কাহাকে বলে, একটু আভাস পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের এ সকল কর্ম্ম কেবল লোক শিক্ষার জন্য।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥

এই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ অতিশয় কঠিন। তাই সাধুরা জ্ঞান ও ভক্তি পথ অবলম্বন করিয়া সংসার কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর সাধন করেন। তবে বিবেকানন্দের ন্যায় উত্তম অধিকারী বীর পুরুষ কেবল এই কর্ম্মযোগের অধিকারী। ভগবানকে অনুভব করিতেছেন, অথচ লোক শিক্ষার জন্য সংসারে কর্ম্ম করিতেছেন, এরূপ মহাপুরুষ পৃথিবীতে কয়টী? ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা, কামিনী কাঞ্চনের দাগ একটীও লাগে নাই, অথচ জীবের সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ আচার্য্য কয়টী দেখা যায়?

স্বামীজী লণ্ডনে ১০ই নবেম্বর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বেদান্তের কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিবার সময় গীতার কথা বলিলেন—

"Curiously enough the scene is laid on the battle-field, where Krishna teaches this philosophy to Arjuna, and the doctrine which stands out luminously in every page of the Gita is intense activity, but in the midst of that, eternal calmness. And this idea is called the secret of work to attain which is the goal of the Vedanta."

Practical Vedanta, (London).

বক্তৃতায় স্বামীজী কর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাসীর

" * Who sows must reap they say and cause must bring. The sure effect. Good Good; bad, bad; and name.
Escape the law: But who so wears a form
Must wear the chain." Too true; but far beyond
Both name and form is Atman, ever free
Know thou art that, Sanyasin bold."
Song of the Sanyasin (by Vivekananda)

ভাবের ("Calmness in the midst of activity") কথা বলিয়াছেন। স্বামী "রাগ-দ্বেষবিবর্জ্জিত" হইয়া কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যে এরূপ কর্ম্ম করিতে পারিতেন, সে কেবল তাঁর তপস্যার গুণে। তিনি কিরূপ ঈশ্বর চিন্তা করিয়া বেলুড় মঠে দিন কাটাইতেন, তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ করিবার দিনের ঘটনাগুলি স্মরণ করিলে যথেষ্ট হইবে।

"বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে শুনিলাম, প্রায় মাসাবধি স্বামী বেশী বেশী ধ্যান জপ করিতেছিলেন। ভোর ৪টা ৫টা হইতে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা ও সন্ধ্যার পর অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল এইরূপে নির্জ্জনে ধ্যান জপ করিতেন। আর এই কয়দিন যেন শরীরে রোগ ছিল না। শুক্রবার সকালেও ঐরূপ ঠাকুর ঘরে বসিয়া ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। ধ্যান শেষ হইলে ঠাকুর ঘরে থাকিতে থাকিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে গান মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে নাচিতে গাইতেন, সেই গানটী গাহিয়াছিলেন—

"মা কি আমার কালো রে!
কালরূপ দিগম্বরী,
হৃৎপদ্ম করে আলো রে।"

মঠের সাধুরা নীচে ছিলেন তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া এই মধুর গান শুনিতে লাগিলেন—স্বামীর কণ্ঠ দেবদুর্লভ গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত! তাহাতে ভক্তিমাখা! খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা শিষ্যদের লইয়া তিনি অন্ততঃ তিন ঘণ্টা কাল যজুর্ব্বেদ পাঠ শুনিলেন ও নিজে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কেবল একটী গুরু ভাইয়ের সঙ্গে আমোদ করিতে করিতে বিলাতের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া কহিয়াছিলেন। ৫॥০ টার পর সেই গুরু-ভাইটীর সঙ্গে বেলুড়ের বড়রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আজ আমার শরীর খুব ভাল আছে।

"সন্ধ্যার পর তিনি উপরের ঘরে ঈশ্বর চিন্তা করিতে গেলেন। ডাক্তার সাণ্ডা ইত্যাদি অনেকে সতর্ক করিয়া দেওয়াতে তাঁহাকে একাকী থাকিতে দেওয়া হইত না। সন্ধ্যার পর একটী শিষ্য ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবার্থ তাঁহার কাছে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ আমি একটু জপ করিব, তুমিও ঘরের বাহিরে গিয়া জপ তপ করগে। ব্রহ্মচারী নিকটস্থ ছাদে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আন্দাজ এক ঘণ্টা কাল পরে স্বামী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার জপ হইয়াছে, এখন আমি একটু শুইব। তুমি সব জানালা খুলিয়া দাও, গরম বোধ হচ্চে ও আমার মাথায় হাওয়া কর। এই বলিয়া মেজেতে যে বিছানা পাতা ছিল, তাহার উপর শয়ন করিলেন। হাতে জপমালা। এই বলিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে নিদ্রিত হইলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার নাক ডাকিতে লাগিল। মাথায় অল্পকাল বাতাস দেওয়ার পর তিনি বলিলেন, আচ্ছা আর এখন বাতাস করিতে হবে না। তুমি আমার পাটা একটু টিপে দাও। এই বলিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে নিদ্রিত হইলেন এবং মাঝে মাঝে নাক ডাকিতে লাগিল। নিদ্রা এক ঘণ্টা কাল ছিল। শিষ্যটী সেবা করিতে লাগিলেন। স্বামী বাম পার্শ্বে শুইয়া ছিলেন। মাঝে একবার পাশ ফিরিয়া শুলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট ছেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেরূপ দ্যায়লা করে ও হাসে কাঁদে সেইরূপ একবার কাঁদিয়া উঠিলেন। ব্রহ্মচারী শিষ্যটী তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে দেখেন যে, স্বামীজী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বালিসের নীচে মাথা পড়িয়া গেল। আবার একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

"তখন ব্রহ্মচারী অতিশয় চিন্তিত হইয়া নীচে গিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখেন, স্বামীজীকে ডাকিলে কথা কন না। তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, ইনি হয়ত সমাধিস্থ।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে শিষ্যদের মধ্যে প্রধান আসন দিয়া গিয়াছেন। স্বামীও তাঁহার প্রধান শিষ্যের কাজ করি-

য়াছেন। তিনি সমগ্র জগৎ সমক্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান সনাতন হিন্দুধর্ম্ম। এই হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় পতাকা স্বামী বিবেকানন্দ, দেশ বিদেশে স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

এখন ত্রিতাপে তাপিত নরনারী মাত্রেই ঠাকু রামকৃষ্ণের কাছে আসিতে পারিবে ও শান্তি লাভ করিবে।*

শ্রীম—

সমন্বয় ভাষ্যের আলোচনা।

শ্রদ্ধাস্পদ—

নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়—

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয় নব্যভারতে (১৩০৮ আশ্বিন ও কার্ত্তিক) "আমার প্রত্যুত্তর" শীর্ষক প্রবন্ধে আষাঢ় মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত "বাদ প্রতিবাদ" প্রবন্ধের যে উত্তর দেন, তদুত্তরে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে যে দুই খণ্ড পত্র লেখেন, তাহা প্রকাশার্থ পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক "নব্যভারতে" উহা প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব।

৩নং রমানাথ মজুদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১০ই ভাদ্র, ১৩০৯

একান্ত বশংবদ
শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়,
গীতা-সমন্বয় ভাষ্যের অন্যতর প্রকাশক।

সশ্রদ্ধ নিবেদন,

আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, সত্য আবিষ্কৃত হইবার জন্য যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতে বয়োবৃদ্ধের নিকট বালক বা যুবারও সাপরাধ হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। বরং অনুচিত সম্ভ্রমবশতঃ সত্য-প্রকাশে কুণ্ঠিত হইলেই অপরাধ ঘটে। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,

অন্যায়মত্তি যো মোহাদন্যায়াচ্চ শৃণোতি যঃ।
উভৌ তৌ নরকৌ যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরম্॥

এরূপ স্থলে আপনি কেন, 'এই প্রতি-বাদের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উপা-ধ্যায় মহোদয়ের নিকটে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" এ কথা বলিয়া আমায় পুনঃ পুনঃ লজ্জা দেন। ইহা যদি বাস্তবিক প্রমাণিত হয় যে,আমি শ্রীমচ্ছঙ্করের গৌরব-হরণের জন্য বৃথা বাগ্‌জালবিস্তার করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা হইলে আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, এবং তজ্জন্য জনসমাজের নিকট আমার যথোচিত অবমানিত, নিন্দিত ও তিরস্কৃত হওয়া প্রয়োজন। অপরের গৌরব-হরণ করিয়া যে ব্যক্তি আপনার গৌরববৃদ্ধি করিতে যায়, শীঘ্রই সে সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সে যাহা হউক, আপনার এতাদৃশ প্রয়াসের পরও আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, শ্রীমচ্ছঙ্কর গৃহস্থগণকে যোগের অধিকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যোগে অধিকার ও ব্রহ্ম-সংস্থতা শ্রীমচ্ছঙ্করের নিকট একই সামগ্রী, সুতরাং এরূপ মতপোষণ করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত নহে। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের ব্যাখ্যানে "একাকী চেতি বিশে-ষণাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বা, সন্ন্যাসিত্বে হপি সতি ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ" এই বলিয়া গৃহিগণকে তিনি যোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের উল্লেখ স্থলে ৫৩ শ্লোকে "পরমহংস পরি-ব্রাজকো ভূত্বা" এ কথা বলিয়া পূর্ব্বের কথা তিনি আরও সুদৃঢ় করিয়াছেন। আপনার সমালোচনের প্রেরণায় আমি আপনাকে যে পত্র লিখি, তাহাতে এই একটী কথা পরিষ্কার হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে, যে হৃদয়স্থ ব্রহ্মে ইন্দ্রিয়গণকে অব-রুদ্ধ করিবার কথা আছে তিনি সগুণ ব্রহ্ম; গীতার যোগ নির্গুণ ব্রহ্মাশ্রয় করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করের এই ধারণা। এই ধারণাবশতঃ তিনি গৃহস্থগণকে গীতোক্ত যোগের অনধি-কারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর গীতার যোগকে এইরূপ স্থির করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত গীতার

* ঠাকুর রামকৃষ্ণের আত্মপ্রত্যয় শিক্ষা ও দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয় শিক্ষা স্বামী কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ও জগৎকে বুঝাইয়াছিলেন, সেই কথা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সিদ্ধান্তের বিরোধী এই বলিয়া আমি আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া যে, বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই, আপনি সেই বিষয় তুলিয়া সমগ্র বিচারের বিষয়টিকে রূপান্তরদান করিয়াছেন। একরূপ বিচার যে ঠিক নহে, তাহা কি আর বলিতে হয়? আশ্রমান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করা শ্রীমচ্ছঙ্কর নিষেধ করিয়াছেন, আমি এরূপ কোন কথাতো লিখি নাই; অথচ সেই কথার উপরে আপনি এত অধিক বাক্যব্যয় করিয়াছেন যে, মনে হয় যেন আমি এইটিকেই বিচারের বিষয় করিয়াছি। আমি বলিয়াছি, পরিব্রাজকাশ্রমব্যতীত অন্য আশ্রমে ব্রহ্মসংস্থতার সম্ভাবনা নাই, শ্রীমচ্ছঙ্করের এই মত। ইহাতে আশ্রমান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিবার অধিকার নাই, এ কথা আসিল কিরূপে? গৃহস্থাশ্রম হইতে যে পর পর আশ্রম উদ্ভূত হয়, এ কথা কি আমি কোথাও অস্বীকার করিয়াছি? তবে আমি বলি, কোন ব্যক্তি এক আশ্রম ছাড়িয়া অন্য আশ্রমে গেলে তিনি আর পূর্ব্বাশ্রমী থাকেন না। যে আশ্রম হইতে তিনি আশ্রমান্তরে গেলেন, সে আশ্রমের কিছু অবিরোধী নিয়ম থাকিয়া যায় এবং বর্ত্তমান আশ্রমের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম উপস্থিত হয়। আবার সে আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে গেলে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিটির পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমের যে গুলি অবশেষ ছিল, সে গুলি আর থাকে না, কেবল অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিটির ব্যবহারের কতক থাকে, কতক চলিয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত না দিলে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার সম্ভাবনা নাই, তাই এ সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দণ্ডকমণ্ডলু আদি ব্যবহার, ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদরপূর্ত্তি, গন্ধমাল্যাদিসেবনত্যাগ ইত্যাদি যে সকল নিয়ম আছে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে আর সে সকল থাকে না। থাকে কি? বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন, জপাদি অনুষ্ঠান। গৃহস্থাশ্রম হইতে যখন বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ হয়, তখন কুটুম্বভরণাদি গৃহস্থের কর্ত্তব্য নিবৃত্ত হয়; অগ্নি ও যজ্ঞ নিবৃত্ত হয় না বটে, কিন্তু এ সকলেতে যে পশুমাংসাদি ব্যবহৃত হইত তাহা আর থাকে না, ফল মূলাদি সেই সকল উপকরণের স্থানাধিকার করে। বানপ্রস্থাশ্রমে পত্নী যদি ইচ্ছা করেন সঙ্গে যাইতে পারেন। অপত্য উৎপন্ন না হইয়া থাকিলে বা অপত্যের অভাব হইলে অপত্যোৎপাদনও বিধিসিদ্ধ। কিন্তু অপত্যোৎপাদন বিধিসিদ্ধ বলিয়া তিনি যে গৃহস্থাশ্রমী, এ কথা বলা যাইতে পারে না। বানপ্রস্থাশ্রমী যখন চরমাশ্রমের উপযুক্ত হইলেন, তখন যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলই চলিয়া গেল। এখন আর তাঁহার পক্ষে নারীসংস্পর্শ বিধিসিদ্ধ রহিল না। বন্য ফলমূলাদি না পাইলে, বানপ্রস্থের সম্বন্ধে যে ভিক্ষাচরণের ব্যবস্থা ছিল, এখন সেই ভিক্ষাচরণমাত্র অবশিষ্ট থাকিল। পর পর আশ্রমবিভাগে এই দেখা যায় যে, পূর্ব্বাশ্রমের কিছু থাকিয়া গেলেও অন্তিমাশ্রমে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বানপ্রস্থাশ্রমের সাময়িক ভিক্ষাচরণভিন্ন পূর্ব্বাশ্রম সকলের কিছুই থাকে না। সর্ব্বশেষ চরমাশ্রমে পূর্ব্বাশ্রমসিদ্ধ কোন লক্ষণই থাকে না। শাস্ত্রীয় প্রমাণে আমি এই কথা বলিয়াছি, যদি সে সম্বন্ধে কোন দোষ থাকে তাহাই দেখান উচিত ছিল। কেবল ভাগবতে নয়, শ্রীমচ্ছঙ্করশিষ্য বিদ্যারণ্যকৃত জীবন্মুক্তি গ্রন্থে উদ্ধৃত জাবাল শ্রুতিতেও বিদ্বৎসন্ন্যাসসম্বন্ধে এই উক্তি আছে;—'অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্ত-বদাচরন্তঃ'। আপনার উদ্ধৃত,—

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

মনুর দ্বাদশাধ্যায়ের এই ৯২ শ্লোকটির ব্যাখ্যানে "নত্বগ্নিহোত্রাদিপরিত্যাগপরতয়েত্যুক্তম্" এই অংশটি শ্রীমৎকুল্লূক কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, আমি তাহার কোন বিচার না করিয়া লিখিয়াছিলাম, "শ্রীমৎকুল্লূকের এই টীকা দেখিয়া উহাকে গৃহস্থাশ্রম সমুচিত বলিয়া যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, শ্রীমচ্ছঙ্করের মতে তাহা সিদ্ধ হইতেছে না।" শ্রীমৎকুল্লূকের এরূপ লেখার অভিপ্রায় কি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, মনুর

এই বচনটি গৃহস্থাশ্রমসমুচিত শ্রীমৎকুল্লূক ইহা স্বয়ং বলেন নাই, মনুর পূর্ব্বাপর বচন-পাঠেও উহা প্রতীত হয় না। শ্রীমৎকুল্লূকের টীকা এই,—

'শাস্ত্রে চোদিতান্যপি অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য ব্রহ্মধ্যানেন্দ্রিয়জয়প্রণবোপনিষদাদিবেদাভ্যাসেষু ব্রাহ্মণো যত্নং কুর্য্যাৎ।'

এ অংশে সুস্পষ্ট অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মত্যাগ নিবদ্ধ রহিয়াছে। অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মত্যাগ পরিব্রজ্যাশ্রমোচিত, গৃহস্থাশ্রমসমুচিত নহে; কেন না গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে গেলে কর্ম্মানুষ্ঠান অপরিহার্য্য। মনুর ষষ্ঠাধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে পরিব্রজ্যাসম্বন্ধে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদগৃহাৎ॥

এরূপ স্থলে শ্রীমৎকুল্লূক 'অগ্নিহোত্রাদীনি কার্য্মাণি পরিত্যজ্য', এ কথা বলিয়াও কেন বলিলেন? 'এতচ্চ এষাং মোক্ষোপায়াস্তরঙ্গোপায়প্রদর্শনার্থং নত্বগ্নিহোত্রাদি-পরিত্যাগপরতয়েত্যুক্তম্'? বলিলেন এই জন্য যে, এইগুলি মোক্ষের অন্তরঙ্গ উপায় ইহাই এখানে প্রদর্শিত হইতেছে; ইহা প্রদর্শিত হইতেছে না যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে পরিত্যাজ্য। যদি শ্রীমৎকুল্লূকের এরূপ অভিপ্রায় না হইত, তাহা হইলে ষষ্ঠাধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে 'মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ' এ অংশের কেন তিনি ব্যাখ্যা করিবেন;—

মোক্ষে মোক্ষান্তরঙ্গে পরিব্রজ্যাশ্রমে মনোনিয়োজয়েৎ।

মোক্ষশব্দের এইরূপই অর্থ যে শাস্ত্রসিদ্ধ তাহা মিতাক্ষরাতেও দেখিতে পাওয়া যায়;

'মোক্ষশব্দেন চ মোক্ষফলশ্চতুর্থাশ্রমঃ।'

আপনি মনুর বচন ও শ্রীমৎকুল্লূকের ব্যাখ্যার উপলক্ষ করিয়া যদি আমার প্রতি এই দোষারোপ করেন যে, আমি গৃহস্থাশ্রমে জ্ঞানানুশীলনের প্রতিকূল তাহাও এইরূপে দাঁড়াইতেছে না।

শঙ্কর বর্ণাশ্রমাদি অজ্ঞানবিজৃম্ভিত জানিয়াও চতুর্থাশ্রমের সঙ্গে পরিব্রাজকের যোগ রাখিলেন কেন? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমি যে উত্তর দিয়াছি, আপনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এরূপ যোগের এইরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে "শঙ্কর গৃহস্থাশ্রমের ও বানপ্রস্থাশ্রমের যে শাখায় ব্রহ্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অনুশীলিত হইত, তাহার প্রাধান্যস্থাপন করিয়া পরিব্রাজকাশ্রমের তুল্য বলিয়াই মনে করিতেন," "যাঁহারা গৃহস্থ হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনকে জীবনের মুখ্য কার্য্য করিয়া লইয়া তাহাতে দৃঢ়াভ্যস্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের সে গৃহস্থাশ্রম আর 'অবিদ্যা বিজৃম্ভিত' রহিল না।" আপনি আপনার এই পক্ষস্থাপনের জন্য পরে ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্য হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার বিচারকালে আপনার এ সিদ্ধান্ত ঠিক কি না প্রতিপন্ন হইবে। আপনি আমার পত্রে উদ্ধৃত বিবিদিষাসন্ন্যাসঘটিত প্রমাণটিকে * শঙ্করের মনে করিয়া এ স্থলে তুলিয়াছেন তাহাতে আপনি স্বমতস্থাপনে কৃতার্থ হন নাই। কেন না, সেই শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যই বলিয়াছেন,

'মুনিত্বং মননশীলত্বং। তচ্চাসতি কর্ত্তব্যান্তরে সম্ভবতীত্যর্থাৎ সন্ন্যাস এবাভিধীয়তে।......ন চ বেদনমুনিত্বয়োরেকত্বং শঙ্কনীয়ং বিদিত্বা মুনির্ভবতীতি পূর্ব্বোত্তরকালীনয়োস্তয়োঃ সাধ্যসাধনত্বপ্রতীতেঃ। নন্বু বেদনস্যৈব পরিপাকাতিশয়রূপমবস্থান্তরং মুনিত্বম্, অতো বেদনদ্বারা পূর্ব্বসন্ন্যাসস্যৈব এতৎফলমিতি চেৎ বাঢ়ম্, অতএব সাধনরূপাৎ সন্ন্যাসাদন্যং ফলরূপমেনং সন্ন্যাসং ব্রূমঃ।

---

* আমার পত্রে উদ্ধৃত ইহা বলিতেছি কেন? এই জন্য বলিতেছি যে, বিদ্যারণ্যকৃত জীবন্মুক্তি গ্রন্থ দেখিলে আপনি আর প্রমাণটিকে শঙ্করের কৃত বলিয়া লিখিতেন না। এতদপেক্ষা আরও এরূপ মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ এই যে 'বিরুদ্ধ্যতে' এই পাঠের স্থলে 'বিদহ্যতে' আপনি এই পাঠ করিয়াছেন। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, আপনি আমার হস্তাক্ষর ভাল করিয়া পড়িতে না পারাতে ঈদৃশ গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন। যদি বর্ণযোজকের ভুল হয় আশ্চর্য্য ভুল! কেন না পদটি ব্যাকরণশুদ্ধ। অন্যতর কারণ এই "আপনি স্বয়ং গ্রন্থখানি পাঠ করিলে মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন' এত বড় তত্ত্বকথা যাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছিল, সেই জনক যে ক্ষত্রিয় রাজোচিত সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহিত করিয়াছিলেন, একথা কি শঙ্কর জানিতেন না?" এ যুক্তি দিয়া আর আপনার বিষয়টি প্রমাণ করিতে হইত না; কেন না ঐ কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গেই আছে "শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু লোকে চ তাদৃশাং তত্ত্ববিদাং বহূনামুপলম্ভাৎ।" এমন স্পষ্ট কথা থাকিতে আবার অনুমান কেন?

অনুবাদ—মননশীলত্বই মুনিত্ব। কর্ত্তব্যান্তর না থাকিলে তাহা হওয়া সম্ভবপর এজন্য অর্থতঃ (by implication) সন্ন্যাসই উক্ত হইয়াছে।...বেদন (জ্ঞান) ও মুনিত্ব একই, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। কেন না 'জানিয়া মুনি হয়' এ কথা বলাতে একটি পূর্ব্ব আর একটি উত্তরকালোৎপন্ন হওয়াতে একটি সাধ্য আর একটি সাধন ইহাই প্রতীত হইতেছে। যদি বল বেদনের (জ্ঞানের)ই অতিশয় পরিপাকরূপ অবস্থান্তর মুনিত্ব; অতএব বেদন দ্বারা যে পূর্ব্ব সন্ন্যাস হইয়াছিল এটি তাহারই ফল; আচ্ছা, তাহাই যেন হইল, তাহা হইলেও সাধনরূপ সন্ন্যাস হইতে এটি ভিন্ন, কেন না ইহাকে ফলরূপ সন্ন্যাস বলিব।

সংসারকে নিঃসার জানিয়া সারদর্শনের অভিলাষে বিবিদিষা সন্ন্যাস ঘটিয়া থাকে। সুতরাং গৃহাশ্রম আর অবিদ্যাবিজৃম্ভিত রহিল না একথা আসিতেই পারে না। বিবিদিষা সন্ন্যাস পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান নহে। অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিবামাত্র প্রব্রজ্যাবলম্বনে আর বিলম্ব থাকে না।

যদা তু বিদিতং তৎ স্যাৎ পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তদৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতাং শিখাং ত্যজেৎ।
জ্ঞাত্বা সম্যক্ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বং ত্যক্ত্বা পরিব্রজেৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্য যখন প্রব্রজ্যাবলম্বন করেন নাই তখন তিনি বিবিদিষু ছিলেন। যাই তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিল অমনি তিনি প্রব্রজ্যাবলম্বন করিলেন। শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শ্রবণ করুন।

সম্যগনুষ্ঠিতৈঃ শ্রবণমনননিদিধ্যাসনৈঃ পরতত্ত্বং বিদিতবদ্ভিঃ সম্পাদ্যমানো বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ। তঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সম্পাদয়মাস। তথাহি বিদ্বচ্ছিরোমণির্ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যো বিজিগীষুকথায়াং বহুবিধেন তত্ত্বনিরূপণেনাশ্বলায়নপ্রভৃতীন্ মুনীন্ বিজিত্য বীতরাগকথায়াং সংক্ষেপবিস্তারাভ্যামনেকধা জনকং বোধয়িত্বা মৈত্রেয়ীং বুবোধয়িষুস্তৎসাহত্বরয়া তত্ত্বাভিমুখ্যায় স্বকর্ত্তব্যং সন্ন্যাসং প্রতিজজ্ঞে। ততস্তাং বোধয়িত্বা সন্ন্যাসং চকার।

অনুবাদ— শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহারা পরতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা যে সন্ন্যাস করেন সেই সন্ন্যাস বিদ্বৎসন্ন্যাস। এইরূপ উক্ত আছে, বিদ্বচ্ছিরোমণি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য জয়লাভের অভিলাষে যে কথোপকথন করেন, তাহাতে বহুবিধ তত্ত্বনিরূপণ দ্বারা আশ্বলায়ন প্রভৃতি মুনিকে পরাজিত করিয়া যখন বীতরাগ হইলেন, তখনকার কথোপকথনে সংক্ষেপ ও বিস্তারে জনকের জ্ঞানোৎপাদন করিয়া মৈত্রেয়ীর জ্ঞানোৎপাদনে অভিলাষবশতঃ শীঘ্র তাঁহার তত্ত্বের দিকে অভিমুখ্য হয় এজন্য তিনি যে সন্ন্যাস করিবেন, তাহা তাঁহাকে বলিলেন। তদনন্তর তাঁহার বোধোৎপাদন করিয়া আপনি সন্ন্যাস করিলেন।

আপনি ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্য হইতে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন 'ব্রহ্মজ্ঞান অত্যন্ত পরিপক্ব' হইলে গৃহস্থকেও শ্রীমচ্ছঙ্কর পরিব্রাজকোচিত সাধক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের শেষভাগে আপনি লিখিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় শঙ্করের উক্তির সম্বন্ধে কিরূপ বলেন জানিতে উৎসুক রহিলাম।" আপনি শ্রীমচ্ছঙ্করের বাক্যগুলিকে যে অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীমচ্ছঙ্কর সে অর্থে সে বাক্যগুলি ব্যবহার করেন নাই, তাহার বিপরীত অর্থে তিনি ঐ সকলের ব্যবহার করিয়াছেন, এই আমার ধারণা। আপনি শ্রীমচ্ছঙ্করের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাখ্যার বিপরীত অর্থে যে শ্রীমচ্ছঙ্কর ঐ সকলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতে যত্ন করিব।

প্রথম উদ্ধৃত উক্তিটী এই :—

যোহি অধিকৃত কর্ম্মণি তস্য তদকরণে প্রত্যবায়ঃ, নহি নিবৃত্তাধিকারস্য গৃহস্থস্যেব ব্রহ্মচারিণো বিশেষধর্ম্মানুষ্ঠানে।

আপনি এ কথাগুলির কোন অনুবাদ না করিয়া কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন, "পাঠকগণ এস্থলে দেখিবেন 'গৃহস্থস্যেব' কথাটি রহিয়াছে।" এই ভাষ্যাংশে শ্রীমচ্ছঙ্কর এই দেখাইতে অভিপ্রায় করিয়াছেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে গৃহস্থের যে প্রকার প্রত্যবায় হয়, যে ব্রহ্মচারীর কর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্ম না করিলে সেরূপ প্রত্যবায় হয় না। সুতরাং এক 'গৃহস্থস্যেব' পদের উপর ভর দিয়া আপনি

যে গৃহস্থ এবং ব্রহ্মচারীকে এক শ্রেণীতে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইতেছে না।

দ্বিতীয় উদ্ধৃত উক্তিটী এই :—

পরিব্রাজকানাং ভিক্ষাচরণাদিবদুৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ানামপি গৃহস্থাদীনামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানিবৃত্তিরিতে চেন্ন,

এই উক্তিটী উদ্ধৃত করিয়া আপনি লিখিয়াছেন, "এখানেও

'উৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ানামপি গৃহস্থাদীনাং।'

এই উক্তি দ্বারা গৃহস্থের তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা শঙ্কর স্পষ্ট বলিলেন। তবে গৃহস্থাশ্রমাদি হইতে পরিব্রাজকাশ্রম পৃথক্ কেন? শঙ্কর বলেন :—

স্বস্বামিভেদবুদ্ধ্যানিবৃত্তেঃ কর্ম্মার্থত্বাচ্চেতরাশ্রমাণাং

অর্থাৎ পৃথক্ এই জন্য যে অন্যান্য আশ্রমে কর্ম্ম করিবারও ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যাশ্রমে যত দিন স্বস্বামিভাব না যাইতেছে, ততদিন ভেদজ্ঞান অনিবার্য্য, এইটুকু দেখাইবার জন্যই পার্থক্য''।

ভাষ্যের প্রথম উদ্ধৃতাংশ এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ধৃতাংশের অনেক পরে দেখা যায়। সমগ্র ভাষ্যাংশ তুলিয়া তাহার অনুবাদ না করিয়া দিলে আপনার অর্থের বৈপরীত্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য সমগ্র ভাষ্যাংশ ও তাহার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি। মূল ও অনুবাদ অধ্যয়ন করিয়া আপনি বুঝিতে পারিবেন, শ্রীমচ্ছঙ্করের ভাবের বিপরীত পথে আপনি আপনার যুক্তি চালাইয়াছেন কিনা?

মূল—পরিব্রাজকানাং ভিক্ষাচরণাদিবদুৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ানামপি গৃহস্থাদীনামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানিবৃত্তিরিতি চেৎ ন, প্রামাণ্যচিন্তায়াং পুরুষপ্রবৃত্তেরদৃষ্টান্তত্বাৎ। ন হি নাভিচরেৎ ইতি প্রতিষিদ্ধমপ্যভিচরণং কশ্চিৎ কুর্ব্বন্ দৃষ্ট ইতি শত্রৌ দ্বেষরহিতেনাপি বিবেকেনাভিচরণং ক্রিয়তে। ন চ কর্ম্মবিধিপ্রবৃত্তিনিমিত্তে ভেদপ্রত্যয়ে বাধিতেঽগ্নিহোত্রাদৌ প্রবর্ত্তকং নিমিত্তমস্তি। পরিব্রাজকস্যেব ভিক্ষাচরণাদৌ বুভুক্ষাদি প্রবর্ত্তকম্। ইহাপ্যকরণে প্রত্যবায়ভয়ং প্রবর্ত্তকমিতি চেৎ, ন,ভেদপ্রত্যয়বতোঽধিকৃতত্বাৎ। ভেদপ্রত্যয়বাননুপমর্দ্দিতভেদবুদ্ধির্বিদ্যয়া যঃ স কর্ম্মণ্যধিকৃত ইত্যবোচাম। যোঽধিকৃতঃ কর্ম্মণি তস্য তদকরণে প্রত্যবায়োন নিবৃত্তাধিকারস্য,গৃহস্থস্যেব, ব্রহ্মচারিণো বিশেষধর্ম্মানমুষ্ঠানে। এবং তর্হি সর্ব্বঃ স্বাশ্রমস্থ উৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ঃ পরিব্রাড়িতি চেৎ, ন, স্বস্বামিত্বভেদবুদ্ধ্যনিবৃত্তেঃ;, কর্ম্মার্থত্বাচ্চেতরাশ্রমাণাং। অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি শ্রুতেঃ। তস্মাচ্চ স্বস্বামিত্বাভাবাদ্ভিক্ষুরেকএব পরিব্রাড্ ন গৃহস্থাদিঃ।

অনুবাদ—পরিব্রাজকগণের যেরূপ ভিক্ষাচরণাদি কর্ম্ম নিবৃত্ত হয় না, তেমনি গৃহস্থগণের একত্বপ্রত্যয় জন্মিলেও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকলের নিবৃত্তি হয় না; দৃষ্টান্তস্থলে এরূপ বলিতে পারা যায় না, কেন না যেখানে প্রামাণ্য (প্রমাণ ও অপ্রমাণের বিষয়) আলোচিত হয় সেখানে কোন মানুষের প্রবৃত্তি দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। 'কাহারও প্রতি অত্যাচার করিবে না' এরূপ প্রতিষেধসত্ত্বেও কাহাকেও অত্যাচার করিতে দেখিয়াও শত্রুর প্রতি দ্বেষরহিত বিবেক (বিবেকী ব্যক্তি) কখনও অত্যাচার করে না। ভেদজ্ঞান কর্ম্মবিধিতে প্রবৃত্ত হইবার কারণ। সে ভেদজ্ঞান চলিয়া গেলে অগ্নিহোত্রাদিতে প্রবৃত্ত করিবার কোন কারণ থাকে না। ক্ষুধাদি পরিব্রাজককে যেমন ভিক্ষাচর্য্যাদিতে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, * তেমনি অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয় এই ভয় উহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত রাখিবে এরূপ বলিতে পারা যায় না, কেন না যে ব্যক্তির ভেদজ্ঞান আছে অগ্নিহোত্রাদি তাহারই

* ক্ষুধাদি পরিব্রাজককে ভিক্ষাচরণাদিতে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে এই ভাষ্যাংশ দেখিলেই প্রতীত হইবে "শঙ্কর বর্ণাশ্রমাদি অজ্ঞানবিজৃম্ভিত জানিয়াও, চতুর্থাশ্রমের সঙ্গে পরিব্রাজকের যোগ রাখিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আপনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন তাহা নহে, আমি তাহার যে উত্তর দিয়াছি তাহাই সঙ্গত। আমার উত্তর এই :—"...রাখিলেন কেন? ইহাতেও তো ভিক্ষাচর্য্যরূপ আশ্রমোচিত কর্ম্ম সংযুক্ত আছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার (শঙ্করের) উত্তর এই যে, শরীরপাতপর্য্যন্ত ভিক্ষাচর্য্যা থাকিবে তৎপরে নহে। সুতরাং তাহাতে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। যদি অনিষ্ট উপস্থিত হয় তাহা হইলে ভিক্ষাচর্য্যাত্যাগ করিবে। (তথাপি কিং তেনেতি। যদি স্যাৎবাঢ়ম্ অভ্যুপগম্যতে হি তৎ।'—টীকা—যদি তু ক্ষুধাদিদোষ প্রাবল্যাদাত্মানং নিক্ষিপ্তমপি বিস্মৃত্য প্রার্থনাদিপরোক্তবতি তদানিবৃত্ত্যুপদেশোঽপি ভবত্যর্থবান্—শ্রীমদানন্দজ্ঞানগিরিঃ।)

অধিকৃত বিষয়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে ব্যক্তির ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, এখনও ভেদজ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি কর্ম্মে অধিকারবান্, এই কথা আমরা বলি। যে ব্যক্তি কর্ম্মে অধিকারবান্ তাহারই কর্ম্ম না করাতে প্রত্যবায় ঘটে, গৃহস্থের যেমন ব্রহ্মচারীর বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয় না, কেন না কর্ম্মে তাঁহার অধিকার নিবৃত্ত হইয়াছে। যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে একত্বপ্রত্যয় উৎপন্ন হইলেই স্ব স্ব আশ্রমস্থ সকলেই পরিব্রাজক হন। না, তাহা হইতে পারে না; কেন না আপনার স্বামিত্ব ও ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় নাই, আর অন্যান্য আশ্রম কর্ম্মানুষ্ঠানেরই জন্য। শ্রুতি বলিয়াছেন (জায়া-পুত্র-বিত্ত সম্পত্তি লাভের) অনন্তর কর্ম্ম করিবে।" এ জন্যই গৃহস্থাদি পরিব্রাজক নহেন, ভিক্ষুই পরিব্রাজক, কেন না তাঁহার আপনার স্বামিত্ব চলিয়া গিয়াছে।

এস্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে গৃহস্থ ও পরিব্রাজক অতি ভিন্ন, ইহারা কখন এক হইতে পারেন না। গৃহস্থ হইতে গেলে তাঁহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে; পরিব্রাজক হইতে গেলেই তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম নিবৃত্ত হওয়া চাই। গৃহস্থের যখন কর্ম্মে অধিকার নিবৃত্ত হয় না, তখন 'কর্ম্মে অধিকার নিবৃত্ত হইয়াছে' এ বিশেষণটি গৃহস্থের সঙ্গে কখন অন্বিত হইতে পারে না; ব্রহ্মচারীর সঙ্গেই উহার অন্বয়। একত্বজ্ঞান জন্মিয়া যদি কর্তৃত্বজ্ঞান চলিয়া না যায় তাহা হইলে সে একত্বজ্ঞানে পরিব্রাজকত্ব উপস্থিত হয় না; কেন না কর্তৃত্বজ্ঞান থাকিতে কর্ম্মনিবৃত্ত হয় না কর্ম্ম নিবৃত্তি না হইলে পরিব্রাজকত্ব উপস্থিত হইবে কি প্রকারে? কর্তৃত্বজ্ঞান চলিয়া যাওয়া কর্ম্মনিবৃত্ত হওয়া পরিব্রাজকের অন্যান্য আশ্রম হইতে বিশেষ লক্ষণ কেন হইল? কর্তৃত্বজ্ঞান না গেলে কর্ম্মনিবৃত্ত না হইলে ব্রহ্মসংস্থা হয় না। ব্রহ্মসংস্থতা এক পরিব্রাজকেরই হয় অপর আশ্রমীর হয় না। সুতরাং স্বকর্তৃত্বতিরোধন ও কর্ম্মের নিবৃত্তি এবং এ দুইয়ের সিদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মসংস্থতা, এ কিছু সামান্য প্রভেদ নয়। ব্রহ্মসংস্থতাই পরিব্রাজকের অসাধারণ লক্ষণ।

'তস্মাৎ সিদ্ধং নিবৃত্তকর্ম্মা ভিক্ষুক এব ব্রহ্মসংস্থইতি।'

অতএব নিবৃত্তকর্ম্মা ভিক্ষুই ব্রহ্মসংস্থ। একথার আর কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না; কেন না আর কোন আশ্রমে ইহার সম্ভাবনা নাই;—

কস্মাৎ পরিব্রাজকস্যৈব ব্রহ্মসংস্থা? সম্ভবাৎ।
এতেন কর্ম্মচ্ছিদ্রে ব্রহ্মসংস্থাসামর্থ্যাং

চতুর্থস্থলে আপনি ভাষ্যের এই অংশটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন "বিন্দুমাত্রও কর্ম্ম থাকিলে তাহাকে পরিব্রাজকাশ্রমী না বলিয়া গৃহস্থাশ্রমী বলাই শঙ্করের অভিপ্রায়।" এ অংশের এরূপ অর্থ হইল কিরূপে বোঝা দায়। ছান্দোগ্যভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষকারী বলিয়াছিলেন,

চতুর্ণামধিকৃতত্বাবিশেষাৎ ব্রহ্মসংস্থত্বেহ প্রতিষেধাচ্চ স্বকর্ম্মচ্ছিদ্রে চ ব্রহ্মসংস্থায়াঃ* সামর্থ্যোপপত্তেঃ

[আশ্রমান্তরের ব্যক্তিগণ কর্ম্মে ব্যাপৃত, তাহাদিগের ব্রহ্মসংস্থার সামর্থ্য নাই; ক্রিয়াশূন্য পরিব্রাজকেরই সামর্থ্য আছে, (নম্বাশ্রমান্তরাণাং কর্ম্মার্থত্বাৎ—তত্রৈব ব্যাপৃতত্বাৎ ন ব্রহ্মসংস্থায়াঃ সামর্থ্যমস্তি। পরিব্রাজকস্য তু নির্ব্যাপারস্য ব্রহ্মসংস্থতা সুকরেত্যত আহ স্বকর্ম্মেতি) এ কথার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষকারী বলিয়াছেন।] 'যখন চারি আশ্রমেই অনুষ্ঠানসম্বন্ধে কোন বিশেষ নাই এবং ব্রহ্মসংস্থ হইলেও তদ্বিষয়ে কোন নিষেধ নাই, তখন অন্যান্য আশ্রমিগণের স্ব স্ব অনুষ্ঠানের মধ্যে মধ্যে যে অবসর আছে, সেই অবসরমধ্যে ব্রহ্মসংস্থতারও সামর্থ্য ঘটিতে পারে।' এই কথার উত্তরে এ স্থলে বলা হইয়াছে।

এতেন কর্ম্মচ্ছিদ্রে ব্রহ্মসংস্থাসামর্থ্যম্।

টীকা—যত্তু কর্ম্মচ্ছিদ্রে গৃহস্থাদেরপি ব্রহ্মসংস্থাসামর্থ্যমিতি তৎপ্রত্যাহ এতেনেতি। অনিবৃত্তভেদপ্রত্যয়স্য ব্রহ্মসংস্থত্বাবনেতি যাবৎ। সামর্থ্যপ্রত্যুক্তমিতি সম্বন্ধঃ।

'কর্ম্মের অবকাশস্থলে গৃহস্থাদিরও ব্রহ্মসংস্থার সামর্থ্য আছে এই যে বলা হইয়াছে ['এতেন' এই পদে] ভাষ্যকার তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন :—যাহার ভেদপ্রত্যয় নিবৃত্ত হয় নাই তাহার ব্রহ্মসংস্থার সম্ভাবনা নাই এই কথা বলিয়া কর্ম্মের অবকাশস্থলে ব্রহ্মসংস্থার সামর্থ্যও খণ্ডিত হইবে।' ক্রমশঃ

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।

---

* পূর্ব্বপক্ষকারীর এই পাঠটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে "এতেন কর্ম্মচ্ছিদ্রে ব্রহ্মসংস্থাহ সামর্থ্যাং" ইহাতে আপনি যে এই লুপ্ত অধিকারটি নিবিষ্ট করিয়াছেন উহা ভুল।

ভাষা ও সাহিত্য।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় শব্দ সঙ্কলন

ইতিপূর্ব্বেই আমরা শব্দের কথা বলিয়াছি। শব্দই ভাষার জীবন। কিন্তু পৃথিবীতে কোন দ্রব্যই চিরদিন ঠিক একই অবস্থায় থাকিতে পারে না। পরিবর্ত্তন প্রকৃতির অপরিহার্য্য সনাতন বিধি। শব্দের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহারও বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। সদর্থ-প্রকাশক শব্দ হয়ত এখন কদর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, পূর্ব্বে যে শব্দের অস্তিত্বই ছিল না, এখন হয়ত তাহাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখা যায়, আবার পূর্ব্বে যে সকল শব্দ দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন আর হয়ত তাহাদিগের কোন অস্তিত্ব নাই। যদি বিশেষ কোন ঘটনার অনুরোধে কোন শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সেই ঘটনার লঘু গুরুভেদে সৃষ্ট শব্দটীর স্মৃতি রক্ষিত হইয়া থাকে। কখনও হয়ত সেই ঘটনাবিশেষের সহিত তৎসৃষ্ট শব্দটীও বিস্মৃত হইতে হয়, কখন বা আবার সেই ঘটনাটী বিস্মৃত হইলেও শব্দটী ভুলিতে পারা যায় না। কিন্তু কোনও নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার ব্যাকরণ-দর্শিত পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে সাহিত্যের নিকট তিনি অপরাধী। অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনি করিয়া শব্দ যোজনা করিয়া থাকেন, সমাসান্ত পদের ত কথাই নাই। ব্যাকরণ দূরে পড়িয়া কাঁদিয়া মরুক, সে দিকে তখন দৃষ্টি করিবার অবসর তাঁহাদিগের হয় না।

শব্দের যে নানা কারণে অর্থ-পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই পরিবর্ত্তন একদিনে বা একমাসে বা এক বৎসরে হয় না। সাধারণ অন্যান্য দ্রব্যাদির মত শব্দ বিশেষের অর্থও যেন ব্যয়িত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায় *। তাই বলিয়া যে তাহাদের রূপের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা নহে। অনেক সময় কোন একটী শব্দকে কাটিয়া ছাঁটিয়া এমন করা হয় যে, তাহাকে দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না; তাহার আকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় অর্থেরও তদ্রূপই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যাহারা আমাদিগের দাস দাসী, যাহারা আমাদিগের নিতান্ত প্রিয় পাত্র, তাহাদিগকে আহ্বান করিবার সময় আমরা প্রায়ই পূর্ণ অক্ষুণ্ণ নামটী ব্যবহার করি না। যাহার নাম 'বিশ্বনাথ' তাহাকে বলি "বিশু," যাহার নাম 'নলিনী' তাহাকে বলি "নলু বা নলি", যাহার নাম নীরদা, তাহাকে বলি "নীর বা নীরু" ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহা ছিল না। রাজা দুষ্মন্ত কি শকুন্তলাকে কখনও "শকুন্ত" বা অমনি আর একটা কিছু বলিয়া আদর করিয়া ডাকিতেন, না শকুন্তলাই প্রিয়ম্বদাকে "প্রিয়" এবং অনু-

* "Words, like material substances, changed, worn out, exhausted of their meaning, and at last rendered quite unserviceable by long use."—P. Marsh.

সূর্য্যাকে "অসূ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন? এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বর্ত্তমান সাহিত্যের যুগে অর্থহীন সমাসান্ত পদ এবং অস্পষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দের বড় আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতাতেই ব্যাধি কিছু সংক্রামক। কিন্তু উক্তরূপ শব্দ-সঙ্কলনে লেখকের ক্ষুদ্র শক্তি এবং দীনতাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ভাষার অঙ্গপুষ্টি হয় না। শব্দের harmony যাহাতে বজায় থাকে, এখন সেই দিকে আমাদিগের দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাই আমরা "সূর্য্য" বুঝাইতে হইলে বলি "মহিয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম!"

নবীন লেখকদিগের কথা পরিহার করিয়া, যাঁহারা সাহিত্য জগতের ধ্রুবতারা হইবার আকাঙ্খা রাখেন এবং যাঁহাদিগের গৌরবরাশি এখন বঙ্গ সাহিত্যের কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাঁহাদিগের দিকে চাহিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অনেকে সেই একই দোষে দুষ্ট। কিন্তু তাঁহাদিগেরই দায়িত্ব অধিক। তাঁহারা যাহা লিখিতেছেন, সহস্র লোকে তাহা পাঠ করিতেছে, সহস্র লোকে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা শিক্ষকের পদে আসীন হইয়া সহস্রকে শিক্ষা দিতেছেন। এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে যাহারা বর্ত্তমান, তাহারাও পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহাদিগেরই রচনা-কৌশল, শব্দবিন্যাস, ভাব-সমাবেশ প্রভৃতি অনুকরণীয় বলিয়া মনে করিবে। সুতরাং বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎযুগ, এই উভয় যুগের শিক্ষা বিধান করিবার আশা যাঁহারা রাখেন বা প্রত্যক্ষই যাঁহারা শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদিগের অতিশয় সতর্ক হইয়া চলা উচিত—শ্লথবিন্যস্ত ভাব বা শব্দ পরিহার করা একান্তই কর্ত্তব্য। কারণ প্রত্যেক অস্পষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দেরই ভাল করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ মন্দ করিতে তাহারা অপারগ নহে। শব্দার্থের গোলযোগ উপস্থিত হইলে ভাবাবিষ্কারের পথও নানারূপে কণ্টকিত হয়, ভাবের চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। লেখক একরূপ চিন্তা করিয়া কিছু একটা লিখিয়াছেন, পাঠক তাহার অর্থ করিবে অন্য প্রকার। পাঠকের জন্যই লেখক, লেখকের জন্য পাঠক নহে।

নবীন লেখকদিগেরও অন্ধনির্ভরতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহারা অনেক সময় বেশ বুঝিতে পারেন যে, কোন একটী শব্দ অর্থশূন্য বা ব্যাকরণ-দুষ্ট বা অস্পষ্টার্থজ্ঞাপক। কিন্তু তাহা জানা সত্বেও তাঁহারা সেই শব্দটীই নিজে ব্যবহার করিয়া থাকেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন 'অমুক অত বড় লোক, সাহিত্যক্ষেত্রে একজন মহারথী, তিনি যখন লিখিয়াছেন, তখন আমরা কোন্ ছার!' কিন্তু সেই 'অমুকের' যে একটা ভুল হওয়া অসম্ভব নহে, সেদিকে তাঁহারা দেখেন না। এইরূপ অভ্যাসে নিজের মৌলিকতা হ্রাস হয়, সাহস করিয়া যায়, সাহিত্যে যে সত্যপ্রিয়তার আবশ্যক, তাহারও যথেষ্ট হানি হয়। দূর ভবিষ্যতে ইহার আর একটী তীব্র বিষময় কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। যদি এখন হইতেই এই ব্যাধির সুচিকিৎসা না হয়, তাহা হইলে একদিন এমন সময় আসিবে, যেদিন বঙ্গসাহিত্যে কেবল কতকগুলি অর্থহীন ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দসমাবেশ এবং দরিদ্র হীন অস্পষ্টভাবের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যাইবে না।

সাহিত্যে একটা সাহস আবশ্যক, একটা সরলতা আবশ্যক, একটা সত্যপ্রিয়তা চাই। যে সাহিত্যে ইহার কোন একটীর অভাব, সেই সাহিত্য জীবনহীন—তাহার কোন মূল্য নাই। একজন প্রসিদ্ধ ইয়ুরোপীয় সমালোচক বলিয়াছেন:—

"But the habit of using vague language at all, and specially the current devices for hinting much while affirming nothing, are in a high degree injurious both to precision and justness of thought, and to sincerity, frankness, and manliness of character. * * * The practice of employing these empty sounds—they have no claim to be called words—is founded partly in that vulgar prejudice of polite society, which proscribe the expression of decided sentiments ... indicative of a want of knowledge of the world and moreover, arrogant and pedantic."

যাহা উদ্ধৃত হইল, যদিও তাহা পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু কথাগুলি এখন অস্মদ্দেশেরও উপযুক্ত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মৌলিক ভাষারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এদেশেও সে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যখন মুসলমান ভারতের রাজা ছিলেন, সেই সময় অনেক গুলি পার্সি এবং উর্দ্দূ শব্দ আমাদিগের কথিত ভাষার ভাণ্ডারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা না হইয়াও পারে না। কারণ যাহারা বিদেশীয়, যাহাদিগের ভাষা স্বতন্ত্র—তাহাদিগের সহিত দৈনিক আলাপ পরিচয়, কাজকর্ম্ম, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি সহস্র প্রকারে লিপ্ত হইতে হইলে মনের ভাব আদান প্রদান করিতে হয়, এবং তাহা করিতে হইলেই পরস্পর পরস্পরের কথা বুঝিতে পারা আবশ্যক। সেই জন্যই একের ভাষায় অন্যের শব্দ, অন্যের ভাব প্রভৃতি আসিয়া পড়ে। কিন্তু কালক্রমে সেই সকল শব্দ এবং ভাব সাহিত্যে স্থায়ী হইয়া যায়। এইরূপে মুসলমানদিগের সময়ে যে সকল যাবনিক শব্দ ও যাবনিক ভাব আমাদিগের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, এখন আর তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুরূহ—আমরা সকলেই উত্তরাধিকারী সূত্রে তাহাদিগকে সাহিত্য মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

বাঙ্গলার আদিম অসভ্যদিগের ভাষার সঙ্গে আর্য্যদিগের কথিত ভাষা কতক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। অনার্য্য শব্দ কোন্ গুলি, নির্ণয় করা সহজ নহে। এই বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে অনেক শব্দ মিশ্রিত আছে, যাহা পার্শী, আরবী কি উর্দ্দূতে নাই—সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে তাহাদিগের উদ্ভবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উদাহারণ দিয়াছেন, যথা—"কুলা, ঢেঁকি, ধুচুনি ইত্যাদি।" সাধারণত; আমরা বাঙ্গলার তিন প্রকার শব্দ দেখিতে পাই। (১) সংস্কৃত মূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গলায় রূপান্তর ঘটিয়াছে, (২) অরূপান্তরিত সংস্কৃত মূলক শব্দ, যথা—জল, মেঘ, সূর্য্য এবং (৩) যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সম্বন্ধ-বিরহিত।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন:—

"এ বাঙ্গলা দেশে কোন্ চাষা আছে যে ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ। বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্যা হইবে মাত্র। নিষ্কারণে ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে।"

তৃতীয় শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধেও তাঁহার অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যথা,—

"যদি কোন ধনবান্ ইংরাজের অর্থ-ভাণ্ডারে

হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে এবং সেই ইংরাজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া ফাশি লেখা মোহারগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরাজকে ঘোরতর মূর্থ বলিবে।"

মুসলমানের পর ইংরাজ রাজত্বের সময়েও ঠিক সেই একই অবস্থা। অনেকগুলি পাশ্চাত্য শব্দ, নানাবিধ পাশ্চাত্য ভাব আমাদিগের সাহিত্যের আভরণ হইয়াছে। আমরা কিছুতেই আর তাহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি না। বঙ্গসাহিত্যের শব্দ-ভাণ্ডার এই রূপে পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্য—আধুনিক বঙ্গভাষা।

আমাদিগের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনে ইংরাজি পুস্তকাদি পাঠেই অধিক সময় ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গলা বা সংস্কৃতের চর্চ্চা তত নাই। সেই জন্যই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইতে এত বিলম্ব হয়। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, তাহা হইতে সুন্দর ভাব বাছিয়া লইয়া মাতৃ ভাষার চরণ-নিম্নে উপহার দিতে পারিলে সাহিত্যের পক্ষে অনেক উপকার করা হয়। কিন্তু তদ্রূপ চেষ্টা অধুনা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় আজ কাল ইংরাজি গল্পের এবং ইংরাজি কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। কোন কোন লেখক অনুবাদকে অনুবাদ বলিয়াই স্বীকার করেন—তাঁহারা সাধু। আর কেহ কেহ তাহা না করিয়া গল্পের আসল ইংরাজি নাম এবং ঘটনায় স্থান পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক একটী কাল্পনিক নামকরণ করিয়া নিজের মৌলিকতার পরিচয় দিবার জন্য সাহিত্যের বাজারে সেই বিলাতী মাল চালাইয়া দিয়া থাকেন। এদিকে তাঁহাদিগের অত্যাচারে, পুরাতন Strand Magazine, Harper's Magazine প্রভৃতি বিলাতী মাসিক অস্থির হইয়া উঠে—"নাইন পেন্স" মূল্যের গল্পের বহিগুলি প্রাণান্ত হয়!

এই সকল গল্প বা কবিতায় মাতৃভাষার কোন উন্নতি হয় না। কারণ তাহারা প্রায়ই বিদেশী ভাবাপন্ন, সুতরাং—আমাদিগের চক্ষে বিকৃত এবং সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে অনুপযোগী। কোন বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছিলেনঃ—

"সরলতা ও আন্তরিকতা-হীন জীবন যেমন সমাজের অপকারক, সরলতা ও আন্তরিকতা হীন সাহিত্যও তেমনি সাহিত্যের অপকারক। * * * * সৎ জীবন, পৃথিবীর কল্যাণকর; সৎসাহিত্যও পৃথিবীর কল্যাণকর সাহিত্য,—জীবনের প্রতিবিম্ব।"

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমিও তাহাই বলিতেছি।

"অগ্রে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিপুষ্টি না হইলে, ধর্ম্ম ও সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা, সকলই পরিচালিত করিতে হইবে। সত্য অপেক্ষা মহৎ আর কোন বস্তু নাই;—সেই সত্য সাহিত্যের অন্তরে নিহিত। ধর্ম্ম অপেক্ষা পরমবন্ধু আর কেহ নাই;—সেই ধর্ম্ম সাহিত্যের উচ্চতর সোপানে। উচ্চে উঠিবার অগ্রে আপনাকে, তথা সাহিত্যকে শক্তিশালী করিতে হইবে। কিন্তু ভাগে এ কাজ হয় না। সেই জন্যই প্রবন্ধের মুখবন্ধে বলিয়াছি, জীবনে যেমন, সাহিত্যেও তেমনিই, ভাগ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।"

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

উপনিষদের উপদেশ। (৩)

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

শ্বেতকেতু পরদিন পুনরায় পিতার নিকটে উপস্থিত হইলে, অরুণি তাহাকে বলিতে লাগিলেন :—

সৌম্য! একান্ত অভাবাত্মক অসৎ হইতে সৎপদার্থের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না, একথা কল্য তোমাকে বলিয়াছিলাম, আজ্ তাহার কারণ তোমায় বলিব। মনোযোগ দিয়া শুনিয়া যাও। উৎপত্তির পূর্ব্বে* কার্য্য ও কারণ কাহারই উপলব্ধি হয় না বলিয়া, উহারা যে ছিল না, এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। উৎপত্তির পূর্ব্বে, কারণে (Cause) তাহার কার্য্যটী (effect) লীনভাবে বর্ত্তমান থাকে। মৃত্তিকা না থাকিলে যেমন তাহা হইতে ঘট জন্মিতে পারে না, মৃত্তিকা আছে বলিয়াই, ঘট উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে; তদ্রূপ কারণ হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। বিনা কারণে, কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, অভাব হইতেই ত কার্য্যোৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ঘটের দৃষ্টান্তই গ্রহণ কর, দেখিবে যে, মৃৎপিণ্ডটী ধ্বংশ না হইলে ত ঘট উৎপন্ন হয় নাই। অতএব মৃৎপিণ্ডের ধ্বংশরূপ অভাবই, ঘটোৎপত্তির কারণ। কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি দেখাইয়া অসৎ হইতেই যে সতের উৎপত্তি হয়; এই কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা এই ঘটের দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকেও, বীজ ও অঙ্কুরের দৃষ্টান্তও দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, একটী বীজ হইতে যখন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, তখন আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি যে, বীজটী একেবারে ধ্বংশ হইয়া যাইবার পর তবে অঙ্কুরটী জন্মে। সুতরাং বীজ-ধ্বংশই যখন অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু, তখন অভাব হইতেই ত বস্তুর উৎপত্তি হয় প্রমাণিত হইতেছে। সৌম্য! অসৎবাদী-পণ্ডিতদিগের এই দুইটী দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদের মত শুনিলে। কিন্তু আমি তোমাকে দেখাইতেছি যে, তাঁহাদের এদৃষ্টান্ত ও যুক্তি নিতান্তই অসম্পূর্ণ। কুম্ভকার যখন মৃত্তিকা দিয়া ঘট প্রস্তুত করিতে থাকে, তখন প্রথমতঃ একটা 'মাটীর ডেলা' বা মৃৎপিণ্ড তৈয়ারী করে এবং মৃৎপিণ্ডটী ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে ঘট প্রস্তুত করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মৃৎপিণ্ডটী ধ্বংশ হইবার পরই ঘট উৎপন্ন হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, মৃৎপিণ্ড ধ্বংশ হইল বটে, কিন্তু মৃত্তিকা ত রহিয়াই যাইতেছে। মূল উপাদান মৃত্তিকা ত এ ক্ষেত্রে ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে না। পিণ্ডটী ত মৃত্তিকার একটা আকার বা সংস্থান-বিশেষ মাত্র। মৃত্তিকাই, ঘটের কারণ। পিণ্ডরূপ আকারটী ত আর ঘটের কারণ নহে। সুতরাং মৃৎপিণ্ডটী ধ্বংশ হইবার পর, ঘট উৎপন্ন হইল বলিয়াই যে বুঝিতে হইবে যে, 'ধ্বংশটীই' ঘটের কারণ,

* শঙ্করাচার্য্য অভাব হইতে যে ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যেও একটী সুপ্রসিদ্ধ বিচার করিয়াছেন। সেই বিচারে যে সমস্ত নূতন যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে, আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদের এই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও, উল্লেখ করিয়া যাইব।

তাহা ত কিছুতেই সঙ্গত হইতেছে না। এইরূপ সুবর্ণ-পিণ্ডই, বলয়ের কারণ নহে। বলয়-উৎপত্তির কারণ, সেই সুবর্ণই। একটা কার্য্য উৎপাদন করিতে গেলেই, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটা কার্য্যের ধ্বংশ হইয়া যায়,—এ নিয়ম সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী একটা কার্য্যধ্বংশ হইয়াছে বলিয়া যে, কারণটী নিজেই ধ্বংশ হইয়া গেল, ইহা ত যুক্তিযুক্ত কথা নহে। সুতরাং পিণ্ডাদির ধ্বংশের পর, ঘটাদির উৎপত্তি হইলেও, মৃত্তিকা যখন বিদ্যমান রহিয়া যাইতেছে, মৃত্তিকার যখন তাহাতে ধ্বংশ হইতেছে না;—তখন অসৎপদার্থ হইতেই যে ঘটাদি সৎ পদার্থ জন্মে, একথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারিতেছে না। আর, তুমি যদি বল যে, ঘট-উৎপত্তির পূর্ব্বে, মৃত্তিকা ত শুধু মৃত্তিকার আকারে থাকে না, উহা পিণ্ডাকারেই থাকে,—একথা যদি তুমি বল, তবে আমি বলিব যে পিণ্ডের আকারেই থাকুক্, আর যে কোনরূপ আকারেই থাকুক্ না কেন, উহা মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মৃত্তিকাই পিণ্ডাকারে থাকিয়া, আবার সেই মৃত্তিকাই ঘটাকারে উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে মৃত্তিকার ত ধ্বংশ হইতেছে না। সেই পিণ্ডটী ধ্বংশ হইবার পরেও,সেই মৃত্তিকাই ঘটের কারণ, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। বীজের দৃষ্টান্তেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। যদিও আপাত-দৃষ্টিতে, বীজটী গলিয়া ও পচিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবার পরেই, অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তথাপি বীজের অবয়ব* অথবা অবয়বের মধ্যে লীনভাবে অবস্থিত (potentially existent) আকারের ত ধ্বংস হয় না। ঐ অবয়বই অঙ্কুরে অনুস্যূত হয় এবং উহাই পরে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। অতএব এস্থলেও, বীজধ্বংশই অঙ্কুরের কারণ নহে। বীজাবয়বই, অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু। সুতরাং আপত্তিকারীর যুক্তির কোনও সারবত্তা নাই, ইহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিলে। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যটী, লীনভাবে (undeveloped or potential state) কারণেতেই বর্ত্তমান থাকে। সেই লীনভাবে অবস্থিত কার্য্যটীই পরে অভিব্যক্ত, প্রকাশিত (developed) হয় মাত্র। অভিব্যক্তি হইলেই তাহার তখন প্রত্যক্ষ (perception) হয়। সূর্য্য কিরণ দ্বারা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও যেমন অন্ধকারে ঘটটী বিদ্যমানই থাকে, তদ্রূপ প্রকাশ্যমান্ কার্য্যটীও, প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও, কারণে নিহিতই থাকে। ঘটটী যদি তথায় একেবারেই না থাকিত, তবে সহস্র সূর্য্য কিরণ আসিয়াও, উহাকে প্রকাশিত করিতে পারিত না।

কিন্তু এস্থলে তোমাকে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। কারণে কার্য্যটী বিদ্যমান থাকে বলিয়াই যে, উহা ঠিক্ কার্য্যের আকারে (*i.e* fully developed state এ) বর্ত্তমান থাকে, ইহা মনে করিও না। কার্য্যটীর, কারণে অস্তিত্ব থাকিলেই যথেষ্ট হয় না। বিদ্যমান থাকিলেও, উহার অভিব্যক্তি আবশ্যক। সেই অভিব্যক্তির আবার একটা সাধক (instrument) থাকা আবশ্যক। যে ক্রিয়া দ্বারা সেই লীন কার্য্যটী প্রকাশিত হইবে, সে ক্রিয়া থাকা আবশ্যক; নতুবা কার্য্যটী কাহার বলে প্রকাশিত হইবে?

* যে মূল ধাতু বা উপাদান দ্বারা পদার্থ গঠিত হয়, তাহাকেই উহার "অবয়ব" বলে। যেমন বৃক্ষগত মূল পরমাণু গুলিই বৃক্ষের অবয়ব, এবং বৃক্ষটী অবয়বী।

উৎপত্তির পূর্ব্বে, ঘটাদি অবশ্যই 'কোন কিছু' দ্বারা অবরুদ্ধ বা আবৃত থাকে; সেই আবরণ ভাঙ্গিয়া দিলে, তবে ঘটাদির প্রকাশ সম্ভব হইতে পারে। মৃত্তিকা হইতেই অভিব্যক্ত হওয়ার অগ্রে, মৃত্তিকার অবয়ব পিণ্ডের আকার ধারণ করে; এই পিণ্ডাকার-ধারণই ঘটের আবরক বলিতে হইবে। এই পিণ্ডাকার দ্বারা ঘটটী আবৃত থাকে বলিয়াই, ঘটের উপলব্ধি হয় না। এই পিণ্ডরূপ আবরণ ধ্বংস করিয়া দিলেই ঘটের প্রকাশ হয়। অতএব কার্য্য, কারণেতে যে পূর্ব্বাবধিই বর্ত্তমান ছিল, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু একথার উপরেও একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সে আপত্তিটী এই :—যদি ঘট পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, ইহা সত্য হয়; এবং যদি পিণ্ডরূপ আবরণটী ধ্বংস করিয়া দিলেই, পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান-ঘটের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ সম্ভব হয়, তবে যে ব্যক্তি ঘট নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইবে, সে ব্যক্তি কেবল সেই আবরণটী মাত্র ধ্বংশ করুক্, তাহার আর ঘটের জন্য অন্য কোন রূপ যত্ন করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু কুম্ভকার ত কেবল মৃৎপিণ্ডটী ভাঙ্গিয়াই নিশ্চিন্ত হয় না, ঘট নির্ম্মাণের জন্য তাহাকে ত আরো নানা প্রকারে যত্ন করিতে হয়। সুতরাং কেবল আবরণ ধ্বংশ করিলেই যে ঘটটী প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এ কেমন কথা হইল? আপত্তিটী এইরূপ। কিন্তু এ আপত্তিটী নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কেন অকিঞ্চিৎকর, তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, অন্ধকারের মধ্যে একটী ঘট বর্ত্তমান আছে। অন্ধকারাবৃত ঘটের প্রকাশ সাধনের জন্য লোকে যে প্রদীপ আনয়ন করে, সেই যে প্রদীপানায়নক্রিয়াটী, সেটী কি কেবল অন্ধকারনাশেরই জন্য? তাহার কি ঘট প্রকাশ করাও একটী প্রয়োজন নহে? অর্থাৎ অন্ধকারনাশ ও ঘট প্রকাশ,—এই উভয়ের জন্যই প্রদীপের প্রয়োজন। কথাটা এই যে, লোকে অভিব্যক্তির জন্যই নানারূপ যত্ন করিয়া থাকে, সেই যত্ন দ্বারা আবরণটীও যে নষ্ট হইয়া যায়, সেটী প্রাসঙ্গিক মাত্র। কার্য্যকে প্রকাশিত করিবার জন্য যে যে ক্রিয়ার আবশ্যক, সেই সেই ক্রিয়া করিলেই কার্য্যটী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সুতরাং যেরূপেই হউক্, কারণে কার্য্যটী বর্ত্তমান থাকেই, কেবল তাহার অভিব্যক্তির জন্য কতকগুলি ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। সেই ক্রিয়াগুলি উপস্থিত হইলেই, কার্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে যে কার্য্যটী উহাতে বিদ্যমান থাকে, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, সৎবস্তু হইতেই, সদ্বস্তু উৎপন্ন হয়। যাহা ছিল না, তাহা হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না।

আবার দেখ, যদি অভাব-পদার্থ হইতেই ঘটাদি সৎপদার্থ জন্মিত, তবে ঘটনির্ম্মাণার্থী কুম্ভকার ঘটনির্ম্মাণকালে, মৃত্তিকাদি সৎপদার্থের সংগ্রহ জন্য ব্যস্ত হয় কেন? কুম্ভকার জানে যে মৃত্তিকা হইতেই ঘট প্রস্তুত হইতে পারিবে।*

অতএব সর্প যেমন কুণ্ডলীকৃত আকার ধারণ করে, মৃত্তিকা চূর্ণ যেমন পিণ্ডাকার বা ঘটশরাবাদির আকার ধারণ করে, তদ্রূপ

* শঙ্করাচার্য্য কেমন সুন্দর যুক্তির অবতারণা করিয়া 'সৎকার্য্যবাদ' স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখাবার জন্যই আমরা এ বিষয়টী বিস্তৃত ভাবে বলিলাম। পাঠক দেখিবেন, ইউরোপীয় দার্শনিক যুক্তি অপেক্ষা শঙ্করের যুক্তি কম সারবান্ নহে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সদ্বস্তু ছিল, তাহাই রূপান্তরিত (modified) হইয়া, বিশ্বরূপে দেখা দিয়াছে মাত্র। অতএব সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎরূপেই অবস্থিত ছিল। সৃষ্টপদার্থ, সেই সদ্বস্তুরই রূপান্তর মাত্র। পিণ্ড এবং ঘট উভয়ই পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু উভয়ই মৃত্তিকা মাত্র। ঘটও সেই মৃত্তিকারই রূপান্তরিত অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তদ্রূপ এ বিশ্বও সদ্বস্তুরই রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ব্রহ্ম ত নিরবয়ব, মূর্ত্তিবিহীন এবং নিষ্ক্রিয় বস্তু। এরূপ নিরবয়ব বস্তু হইতে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আকারাদি রূপান্তরিত হইল? রজ্জুর অবয়বে যেরূপ সর্পের আকার বলিয়া বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ ব্রহ্মে মনুষ্যবুদ্ধি-কল্পিত বিশ্বের রূপ অনুভূত হয়। মৃত্তিকা যেমন ঘটাকারে পরিণত হয়, রজ্জু যেমন সর্পাকারে বিবর্ত্তিত হয়, এইরূপ ব্রহ্মও বিশ্বাকারে পরিণত বলিয়া, মনুষ্য বুদ্ধিতে অনুভূত হয়। একবস্তুতে, অন্য বস্তুর আরোপ করিয়া লোকে যেমন সেই বস্তুকে, অন্যবস্তুরূপেই মনে করে; যেমন লোকে রজ্জুকেই সর্প বলিয়া মনে করে; ঘটকে বাস্তবিক মৃত্তিকা না বলিয়া, ঘট বলিয়াই মনে করিয়া লয়; তদ্রূপ মনুষ্যবুদ্ধি বিশ্বকে ব্রহ্মের বিকার বলিয়া মনে করে। রজ্জুকে রজ্জু বলিলে, যেমন পূর্ব্বের সর্পবুদ্ধি তিরোহিত হয়, ঘটকে মৃত্তিকা বলিয়া জানিলে যেমন ঘটবুদ্ধি তিরোহিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মবিদের নিকটে বিকার বুদ্ধি আর থাকে না; বিশ্ব অন্তর্হিত হয় কেবল ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকেন। বিশ্বের এ রূপ, আকার প্রভৃতি মিথ্যা; ইহারা সেই সৎরূপেই বর্ত্তমান। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অবিদ্যার প্রভাবেই আকারাদির ভ্রম হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল কথা আরো গুরুতর। একথার তত্ত্ব আর একদিন বুঝাইয়া দিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সমালোচন।*

একখানি উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা করিবার জন্য অদ্য আমাদের এই উদ্যম। বিল্বগ্রাম—এই উপন্যাসের ক্ষেত্র। ঐ বিল্বগ্রামের ভূম্যধিকারী, হরমোহন নামক এক ব্যক্তি। অন্নপূর্ণা, তাঁহার পালিত তনয়া। অমরনাথ বসুও, ঐ হরমোহনের পালিত পুত্র। গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য, অমরনাথের এক অকৃত্রিম মিত্র। হরমোহনের বরাবর এই একই সংস্কার—অন্নপূর্ণা, তাঁহারই কন্যা। সেই জন্যই তাহাকে এই অমরনাথের সহিত উহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। তারানাথ তর্কবাগীশ, হরমোহন বাবুর কুলপুরোহিত। চন্দ্রচূড় তর্করত্ন, তারানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি সন্ন্যাসী ও গৃহত্যাগী। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি ভ্রাতাকে বলিয়া যান—হরমোহনের যৌতুক-গৃহে যুগ্ম-প্রদীপের ভিতর এক খণ্ড লিপি আছে। উহা কোন রমণীর লিখিত। বিবাহ হইবার অন্ততঃ দুই দিন পূর্ব্বে অন্নপূর্ণাকে উহা পড়িতে দিবে।

* যুগল-প্রদীপ —"মৈনপুরীর" উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, মূল্য ১. টাকা।

সত্য সত্যই, একদা অন্নপূর্ণার বিবাহ দিন নির্দ্ধারিত হইল। তখন তারানাথ তর্কবাগীশকে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ চিন্তিত ও পরে বিলক্ষণই বিব্রত হইতে হইল। তাঁহার ধারণা ছিল—উক্ত পত্রের তাৎপর্য্যার্থ বিপজ্জনক। সুতরাং বিবাহে বিলম্ব-সংঘটনেই তাঁহার প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হইল। তাঁহারই প্রস্তাবে বিবাহ স্থগিত হইল। হরমোহন বাবু, কুল-পুরোহিতের বাক্যে উপেক্ষা না করিয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতেই বাধ্য হইলেন। এ দিকে মদনমোহন নামক এক প্রতারক ঘটকের প্ররোচনায় অন্নপূর্ণার এক নূতন বর আসিয়া জুটিল! ঘটক, পরিচয় দেয়—ঐ বর যে সে পাত্র নয়—অতি যোগ্য পাত্র—রাজকুমার। বর অপর কেহই নহে—সে উক্ত অমরনাথেরই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাহার নাম পশুপতি বসু। পশুপতি, প্রকৃতই অতি মাত্র পশুপ্রকৃতিক লোক। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত গুরুচরণ ভট্টাচার্য্যের মাতার গুণেই বর (পশুপতি) প্রতারক প্রমাণীকৃত হইল।

এই ঘটনার সহিত অমরনাথের জীবনের যে অংশের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—তাহার যে যে অবস্থার চিত্র প্রদর্শন না করিলেই নয়, কেবল সেই অংশই চিত্রিত করিব। একদা অমরনাথ, ঘটনাক্রমে যমুনা-নীরে এক অনিন্দ্য সুন্দরীর ভাসমান শরীর সন্দর্শন করিলেন। তাহার দেহ, তীরে উত্তোলিত হইল। এই রমণীরই নাম "ছায়া"। এই "ছায়া" হরমোহন দত্তের প্রকৃত সুতা। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন হরমোহন, স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। হরমোহনের জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গেই অন্নপূর্ণার তীর্থ-ভ্রমণে প্রবৃত্তি। নানা স্থান পরিভ্রমণের পর, বিন্ধ্যগিরিতে যে যোগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়—তিনিই অন্নপূর্ণার জননী শারদাসুন্দরী। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করিয়া অন্নপূর্ণাকে যৌতুক-গৃহের যুগল-প্রদীপ জলে নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিলেন। গৃহ-প্রত্যাগতা অন্নপূর্ণা, উহার রহস্য-জিজ্ঞাসু হইয়া, প্রদীপ জলে না ফেলিয়া, উহার অভ্যন্তরস্থ পত্র উদ্ঘাটিত করিয়া পাঠ করিলেন। তখন তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না, তিনি হরমোহনের তনয়া নহেন—তাঁহার গুরু-কন্যা। ছায়ার সহিত অমরনাথ, পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অন্নপূর্ণা ছায়ার গুরু-কন্যা—সুতরাং তাঁহার মাতৃস্থানীয়া।

এখন 'যুগল-প্রদীপ' বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। যদি কেহ বলেন—

"চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে এত বড় একটা অস্বাভাবিক মূর্খ বানান হইল কেন?"—

আমাদের বক্তব্য বলিয়া লই। অন্নপূর্ণার মাতা শারদাসুন্দরী অতি সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া। তিনি হরমোহন দত্তের মন্ত্রদাতা গুরু, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের দুহিতা। চন্দ্রচূড়ের একমাত্র পুত্র নিরঞ্জনের সঙ্গে ঘটনাবশতঃ অতি গোপনে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সে বিবাহের কথা, শারদাসুন্দরীর মাতা ও শশীর মা এই দুইজন বই আর কেহই জানিত না। তাহাদের দুই জনেরই মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপারটা আর কেহই জানিত না। শারদাসুন্দরী চন্দ্রচূড়ের মৃতপুত্র নিরঞ্জনের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু শারদাসুন্দরী অবিবাহিতা, ইহাই সাধারণের ধারণা ছিল। তিনি যে অন্নপূর্ণার মাতা, এ কথা হঠাৎ লোকসমাজে প্রকাশিত হইলে, লোকে কি ভাবিত, বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। শারদাসুন্দরী, সমাজে কুলটা বা কলঙ্কিনী বলিয়া পরিচিতা হইতেন না কি? শারদাসুন্দরীর

নিজের উক্তি দেখুনঃ—"লোকে কলঙ্কিনী বলিবে! তাহার মাতা যে গোপনে, নিরঞ্জনের সঙ্গে তাহাকে শাস্ত্রমত নারায়ণের সম্মুখে, পরিণীতা করিয়াছিলেন, এ কথা এত দিনের পরে কে বিশ্বাস করিবে?"

এরূপ অবস্থায় সকলে অন্নপূর্ণাকে শারদাসুন্দরীর গর্ভসম্ভূতা ও চন্দ্রচূড়ের পুত্রের ঔরসজাতা জারজ-কন্যা বলিত কি না? কেবল তাহাই নহে—সেই সঙ্গে অন্নপূর্ণার কুখ্যাতি ঘটিত না কি? হরমোহন দত্ত ও তাঁহার স্ত্রীর কথা বলিব।—অন্নপূর্ণা তাঁহাদের কন্যা নহেন, এ কথা হঠাৎ জানিতে পারিলে, তাঁহাদের মনোভাব কিরূপ হইত? তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর ক্লেশই পাইতেন, পাঠক ভাবিয়া দেখুন না কেন? এ কথা অকস্মাৎ লোকসমাজে প্রকাশিত হইলে, কি ভীষণ আন্দোলন চলিত। ভীষণ হুলস্থুল পড়িয়া যাইত না? চন্দ্রচূড় না কি মূঢ় নহেন—কিন্তু মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন, তাই ওরূপ ঘটনা ঘটিতে দেন নাই। তিনি দেখিলেন, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, এ রহস্য প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। কন্যার বিবাহদিন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতার, মাতার অথবা উভয়েরই মৃত্যু হইতে পারে। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়াছিল। যদি হরমোহন দত্তের জীবদ্দশায়, অন্নপূর্ণার বিবাহের অনেক পূর্ব্বে, অকারণ ঐ রহস্য, প্রকাশিত হইত, কে চন্দ্রচূড়কে অদূরদর্শী না বলিতেন? এ সকল ছাড়া, এ রহস্য জানিতে পারিলে অন্নপূর্ণার বিষম যন্ত্রণা পাওয়া সম্ভাবিত। বিবাহের পূর্ব্বে অন্নপূর্ণারও মৃত্যু হইতে পারিত। তাহা হইলে অনর্থক তাহাকে এ ক্লেশ দিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। এই সকল ভাবিয়া চন্দ্রচূড়ের অভিপ্রায় ছিল—নিতান্ত আবশ্যক হইলে (বিবাহের অল্প দিন মাত্র পূর্ব্বে) যেন এই বিভীষিকাময় রহস্য প্রচারিত হয়। এই সকল বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া দেখিলে, বিবাহের আয়োজন পণ্ড হওয়ার ব্যাপার কি তুচ্ছ নয়?

একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"হরমোহন দত্তের অমরনাথের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তাঁহার সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিয়াছিল।" পাঠক মহাশয়েরা 'যুগল-প্রদীপের' ঐ অংশ পড়িয়া দেখিলে বুঝিবেন—উহা অমূলক ও অলীক। দশম পরিচ্ছেদের শেষে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে, হরমোহন ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া এবং অনেক চেষ্টার পরেও দেখিলেন, অমরনাথের সঙ্গে তাঁহার পালিতা কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্ভব নহে। অমরনাথকে ছাড়িতে হরমোহনকে ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইতে হইয়াছিল। হরমোহন কাতরস্বরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিয়াছিলেন—"বিধাতঃ, শেষ জীবনে কি আমার অদৃষ্টে এই ছিল?"

সমালোচককে কে বলিল যে হরমোহন দত্ত যে পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই বরের বাসস্থান, বিভব, বংশ, পরিচয় প্রভৃতির কিছুমাত্র অনুসন্ধান করেন নাই? তবে কোথায়, কোথায়, কার কার কাছে, কি কি অনুসন্ধান হইয়াছিল, উপন্যাসে তাহার সবিশেষ উল্লেখ নাই। এ সকল লিখিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। বরং এ সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে গেলে অনেক অনাবশ্যক বিশেষ বিশেষ বিষয় সকলে পুস্তকের অকারণ বাহুল্য বর্ণনা দোষঘটিত। পাঠক দেখিতে পাইবেন, মদন ঘটক স্বয়ং বলিতেছে—"আর যা যা পরিচয় আবশ্যক হবে, আমি আপনাকে লিখে দিব। আর কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয়

করলেই এই কলিকাতায় দুই শত লোকের মুখে শুনতে পাবেন, আপনার নাম পশুপতি বাবু, ইত্যাদি।" আবার ৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন—"ধনেমানে, কুলে শীলে, ও রূপে গুণে, মুর্শিদাবাদের স্বর্গীয় রামসর্ব্বস্ব বসুর পুত্র পশুপতি বাবুর মত যে দ্বিতীয় পাত্র পাওয়া অসম্ভব, তা আপনি সামান্য অনুসন্ধান করিলেই জান্‌তে পার্‌বেন।"

ইহার অনেক দিন পরে, অনেক ঘটনার পর, হরমোহন মদন ঘটকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। ইত্যো মধ্যে তিনি যে বরের সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করেন নাই, কে বলিল? ধূর্ত্ত মদন ঘটক; পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

একজন দোষদর্শীর আপত্তি এই, "অমর ও গুরুচরণ সেই দস্যুপতিকে চিনিয়াও, তাহা প্রকাশ করিল না কেন? অমর অবশ্যই অন্নপূর্ণাকে ভালবাসিত, সুতরাং অন্নপূর্ণা একজন দস্যুর হাতে পড়িবে, ইহা সে কেমন করিয়া সহ্য করিল?—আর তাহারা পলাইলই বা কেন?" উপরোক্ত কথাগুলি সম্পূর্ণ অলীক। অতি স্পষ্টাক্ষরেই লেখা আছে, অমর ও গুরুচরণ নরেন্দ্রকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই। চিনিবারও কিছুমাত্র সম্ভাবনা বা সুযোগ ছিল না। ৬১ পৃষ্ঠায় দেখুন—

"গুরুচরণ অমরের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল,—

"বর কে? তাকে চিন্‌তে পেরেছ কি?" অমর বলিল—"কেবল এই মাত্র জান্‌তে পেরেছি, তাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখেছি।"

গুরু। আমিও কোথায় দেখেছি, তা ঠিক্ মনে হচ্ছে না। যদি নেপালে দেখে থাকি, তাহ'লে বোধ হয় মা তাকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্‌বেন।"

আবার ৬২ পৃষ্ঠায় দেখুন—

অপরাহ্নে গুরুচরণ বামুন পিশির নিকটে গিয়া বলিল, "মা! আজ আমরা বর দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।"

"কেমন দেখ্‌লে বাবা?"

"আমার বোধ হয়, যেন তাকে ছেলেবেলা নেপালে দেখেছিলেম। তা যদি হয়, তুমি তাকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বে।"

বামুন পিশি হাসিয়া, সাদরে গুরুচরণের গাল টিপিয়া, বলিলেন, "ছেলেটা যেন পাগল! তুমি যখন নেপাল থেকে এসেছিলে, তোমার পাঁচ বছর বয়স। পাঁচ বছরের কথা তোমার মনে আছে?"

এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় কি লেখা রহিয়াছে, পাঠক মহাশয় দেখিতে পাইলেন। অমর ও গুরুচরণ নরেন্দ্রকে দস্যুপতি বলিয়া চিনিতে পারা দূরে থাকুক, তাহারা তাহাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছিল, তাহার কিছুই জানিত না। এরূপ অবস্থায় সমালোচকের মতে অমরনাথ যদি হরমোহন দত্তের নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলিত—"রাজপুত্রের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ দিতেছেন; তাহাকে দেখিয়া আমার মোটেই পছন্দ হইল না। বরং মনে কি একটা ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আর আমার বোধ হইল, যেন পূর্ব্বে তাহাকে কোথাও দেখেছি। সুতরাং এমন বরের সঙ্গে বিবাহ না দিয়া আমার সঙ্গে বিবাহ দিন।"—তাহা হইলে কি ঠিক্ স্বভাবসঙ্গত হইত? হরমোহন অমরনাথের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন মনে করিয়া তাহাকে অনেক যত্নে ও বহুব্যয়ে

লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন, তৎপরে পূর্ব্ব-কথিত অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়। এরূপ স্থলে আরও অধিক কাল হরমোহনের গলগ্রহ হইয়া থাকা অমরনাথের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার হইত? আর এই ভীষণ-মূর্ত্তি অন্নপূর্ণার ভাবী বরের সঙ্গে বিবাহ-উৎসবে নিমগ্ন থাকা কি তাহার পক্ষে স্বভাবসঙ্গত হইত?—তাহারা দুই জনে পলাইল কেন, তাহা একাদশ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত ও পরিস্ফুট রহিয়াছে। এমন স্থানে তাহাদের উভয়েরই একযোগে পলায়ন এতই স্বভাবসঙ্গত যে, স্পষ্টবাক্যে তত তাহার কারণ নির্দ্দেশের প্রয়োজন দেখা যায় না।

"যুগল-প্রদীপ" অস্বাভাবিক ঘটনা-বহুল, ইহা অন্যতম আপত্তি। আকস্মিক ঘটনা সম্বন্ধে দোষগ্রাহী ব্যক্তি যাহা বলিতে পারেন, তাহা কতদূর আকস্মিক, ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া ও গল্পের সারাংশকে নিজের অভিপ্রায় মত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিকৃত ভাবে না দেখাইয়া, প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত করিলে তিনি হরমোহন দত্তের কন্যার সঙ্গে অমরনাথের সাক্ষাত হওয়া "আকস্মিক ঘটনা" বলিতে পারিবেন না। আর অন্নপূর্ণা অন্য কোন যোগিনীকে না দেখিয়া তাহার মাকে কেন দেখিল? অন্নপূর্ণা তীর্থভ্রমণকালে আরও হয়তো দশজন যোগিনীকে দেখিয়া থাকিবে, আরও দুই শত অচেনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার সাক্ষাত হয় নাই, কে বলিল? কিন্তু আখ্যায়িকায় সঙ্গে যে যে ব্যাপারের সম্বন্ধ বা সংস্রব নাই, তাহার উল্লেখ, কেবল অনর্থক নহে, কিন্তু অনাবশ্যক ও অস্বাভাবিক। গুণগ্রাহী সমালোচক, এই ভাবেই এরূপ বিষয় গ্রহণ করেন—ইহাই শিষ্টাচার ও সুপদ্ধতি।

অমরনাথ যে সকল ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে গোরক্ষপুরে আটটরাম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সেখানে মৃত্যুশয্যাশায়ী নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিল, কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলে কোন ব্যক্তিরই ইহাকে আকস্মিক বা অস্বাভাবিক বলিতে প্রবৃত্তি হইবে না—ইহাই আমাদের অভিমত।

সুতরাং প্লট সম্বন্ধে যে চারিটী আপত্তি, তাহা নিতান্ত ভিত্তিহীন।

তারপর চরিত্র-চিত্রণের কথা। রামধন সরকার ও মদন ঘটকের চরিত্র যিনি অতিরঞ্জিত বলিবেন, আমাদের মতে তাঁহার কাব্যকলাজ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ। এমন স্থলে, এরূপ বিবাদীয় বিষয়ে কোথায় কোন স্থানে অতিরঞ্জিত, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শন না করিলে গ্রন্থকর্ত্তার উপর ঘোরতর অবিচার করা হয়। গুরুচরণ ও অন্নপূর্ণার চরিত্র অতিরঞ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং সুরঞ্জিত ও সুচিত্রিত। গুরুচরণ আটটরাম সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এখন কথা হইবে, গুরুচরণ উহা কেন অমরনাথকে দিয়া ফেলিল? গুরুচরণের চরিত্র যে প্রকারে অঙ্কিত ও চিত্রিত, তাহাতে বলিতে পারি, এই প্রকারই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। অন্যের পক্ষে উহা অস্বাভাবিক হওয়া বিচিত্র নহে। গুরুচরণের গ্রামের অনেক লোকই ইহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। রামসদয়, হরিচরণ, রামধন সরকার, রমেশ প্রভৃতি সকলেই তাহাকে অপদার্থ, 'মূর্খ' প্রভৃতি মধুর বিশেষণ উপহার দিয়াছিল।

আর অন্নপূর্ণা যুগল-প্রদীপের মধ্যস্থিত চিঠিখানি ছিঁড়িয়া না ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল কেন ?—এই এক প্রশ্ন। এরূপ স্থলে সাধারণ স্ত্রীলোকমাত্রেই অবশ্য চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিত। কিন্তু অন্নপূর্ণা অতি উচ্চ প্রকৃতির রমণী—আদর্শনারী। এই জন্যই অন্নপূর্ণা ও গুরুচরণ চরিত্রের এত উৎকর্ষ।

এইবার পূর্ব্বরাগের কথা। এখানে কোন সমালোচক কয়েকটী নীতিগর্ভ উপদেশ দিয়া বলিতে পারেন—"অমরনাথ অন্নপূর্ণার প্রেমানুরাগী হইয়া গৃহত্যাগী হইল। সে অল্প কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই আবার ছায়াকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গেল। কোথাকার অন্নপূর্ণা কোথায় পড়িয়া রহিল।" অন্নপূর্ণার সঙ্গে অমরনাথের পূর্ব্বরাগ কি প্রকার, তাহা একটু বুঝিয়া দেখিলে কেহই একথা বলিতে সাহসী হইবেন না। পূর্ব্বাপর অন্নপূর্ণার প্রতি অমরনাথের যে প্রকার ক্ষীণ অনুরাগ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা কূট সমালোচকের চক্ষে "বিলাতী দুরন্ত, দুর্দ্দমনীয় উদ্দাম মনোবৃত্তি" বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু সুসমালোচকের চক্ষে নহে। উদাহরণ স্বরূপ একাদশ পরিচ্ছেদে অমরনাথের অন্নপূর্ণার প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে কথাগুলি পড়িয়া দেখুন। যখন ভৃত্য গদাধর আসিয়া সংবাদ দিল, মুর্শিদাবাদের একজন রাজপুত্রের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, "গুরুচরণ পায়ের বেদনা ভুলিয়া গিয়া লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি বল্‌লি গদা! অন্নপূর্ণার সঙ্গে অমরের বিবাহ হবে না? তুই পাগল হয়েছিস্ নাকি?"

অমর বলিল, "ও পাগল হয়নি, তুমিই পাগল হয়েছ। চুপ ক'রে খাটের উপর বসে থাক। নহিলে পায়ের বেদনা আরও বাড়্‌বে। বুঝতে পারছনা। গুরোদাদা! গদা যা বল্‌চে, সমস্ত সত্য। কর্ত্তাবাবু বড়মানুষ, তাঁর রাজার মত মান-সম্ভ্রম ও সম্পত্তি আর আমি গরিব। আমার সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ যে সম্ভব নয়, তা আমি আগেই জানতেম।"

গুরুচরণ সরোষে গদার দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে আবার কর্ত্তাবাবু আমাদিগকে ড'ক্‌তে পাঠায়েছেন কেন? আমরা তো কখনই যাব না!"

অমরনাথ বলিল, "গুরোদাদা। তুমি মিছে রাগ কর্‌ছ...তাঁর মেয়ের বিবাহ, তিনি যা ভাল বিবেচনা কর্‌বেন তাই ত করবেন। এতে দাদা আমাদের কথা কহিবার কি অধিকার আছে?"

গুরুচরণ বলিল, "তা সত্য। কিন্তু ভাই! আমি এ বিবাহ দেখতে কোন মতে যেতে পার্‌ব না। তোমার যেতে ইচ্ছা হয়, তুমি একলা যাও।"

অমরনাথ, বলিল "একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে, আমাদের না যাওয়া কত দোষের কথা। কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট অকৃতজ্ঞ হতে হবে। আর হয় তো অন্নপূর্ণারও মনে কত ক্লেশ হবে।"

গুরুচরণ অমরের হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই, সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার মনে দুঃখ হচ্ছে না? এমন রূপে গুণে লক্ষ্মী সরস্বতী অন্নপূর্ণা।" * *

অমরনাথ বলিল, "এ পৃথিবীর সুখ ও ঐশ্বর্য্য কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকালে আমাকে বল্‌তেন, 'মরীচিকাময় সংসার-মরুভূমি তোমার সম্মুখে। কত বিষাদ, কত বিপ-

নকে আলিঙ্গন করতে হবে, কত আশা-কত সুখের সাধ হতে বঞ্চিত হতে হবে, কত সাধের ধন, কত হৃদয়ের সামগ্রী পরিত্যাগ করতে হবে।" * *

অন্নপূর্ণার প্রতি অমরনাথের এই ক্ষীণ অনুরাগ ও এই দুর্ব্বল প্রেমের চিত্র এই পুস্তকের অনেক স্থানে দেখান হইয়াছে! যে"স্বপ্নময়, আবেশময়, মোহময়, মদিরাময়, মধুময় মনোবৃত্তির" কথা কোন সমালোচক প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা ছায়ার প্রতি অমরনাথের প্রেম সম্বন্ধে খাটিতে পারে, কিন্তু অন্নপূর্ণার প্রতি তাঁহার যে প্রেম আগাগোড়া চিত্রিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না।

যে সময়ে যে অবস্থা নিচয়ের ঘটনা পরম্পরার মধ্যে ছায়ার সঙ্গে অমরনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হইল, ছায়ার প্রতি তাহার যে আকস্মিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহার ব্যতিক্রম হইলে, স্বাভাবিক নিয়মের বৈপরীত্য ঘটিত। যেমন যখন কোন পথিক, পথ হারাইয়া ঘোরান্ধকার-ময় জনশূন্য প্রান্তরে একাকী পড়িয়া, গন্তব্য পথ-নির্ণয়ে অসমর্থ হয়—সেই দিগন্তব্যাপী তিমিরের মধ্যে হঠাৎ সম্মুখে আলোক দেখিতে পাইলে, যেমন সে, বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া, সেই আলোকের নিকট ধাবিত হয়, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, "ছায়াকে" দেখিয়া 'অমরনাথের' মনের অবস্থা, ঠিক্ সেইরূপ হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থা-নিচয়ের ঘূর্ণি-বায়ু-মধ্যে না পড়িলে, হয় তো তাহার হৃদয়-মধ্যে এই আকস্মিক প্রেম-বহ্নি, এইরূপে জ্বলিয়া উঠিত না।

অমরনাথ, যে উপায়-অবলম্বনে মুমূর্ষু ছায়ার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, কোন কোন অতি সুবিজ্ঞ বড় সমালোচক, তাহাকে "ঠিক্ গোবিন্দলালের ফ্যাসন" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার, "কৃষ্ণকান্তের উইল্" নামক [illegible] উপন্যাসের এক স্থানে জলমগ্না রোহিণীর জীবন-রক্ষার এইরূপ উপায় দেখাইয়াছেন সত্য। কিন্তু তা ছাড়া বিজ্ঞ সমালোচক, কোন একখানি "Medical Jurisprudence" খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন—জলমগ্ন মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবন সঞ্চারে এইরূপ বৈজ্ঞানিক নিয়মই লেখা আছে। সে যাহা হউক, স্বীকার করিলাম, এটী "গোবিন্দলালের ফ্যাসন" কিন্তু "অমরনাথও, গোবিন্দলালের ফ্যাসনে প্রেমে পড়িল"—এ কথা কি সম্পূর্ণ অলীক নহে? গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সঙ্গে অমরনাথ ও ছায়ার কোন্ সাদৃশ্য সমালোচক দেখিয়াছেন, বলিতে পারেন! যেরূপে এই উপন্যাসের আধ্যাত্মিকাংশ, বিকৃত ভাবে পাঠকের সম্মুখে রাখা হইয়াছে ইহাও তাহারই একটী উদাহরণ মাত্র! দেখিলে দারুণ দুঃখে হৃদয় দগ্ধ হয়, অর্দ্ধ-জরতী "ভারতী" এইরূপ মতাশ্রিতা।

যদি কেহ বলেন—"অন্নপূর্ণাও আবার আজীবন অমরনাথকে স্বামি-জ্ঞানে ভালবাসিয়া, অনায়াসেই তাহাকে পুত্র-বাৎসল্যে সম্বোধন" করিল কিরূপে? ইহার উত্তরে এই বলিব।

প্রথমতঃ।—লোকাচারে, দেশাচারে ও হিন্দুধর্ম্মানুসারে অন্নপূর্ণা, অমরনাথ ও ছায়ার মাতৃস্থানীয়া। কেন না, অমরনাথ ও ছায়া, কায়স্থজাতি, এবং অন্নপূর্ণা হরমোহন দত্তের গুরুতনয়া, অতএব ব্রাহ্মণ-

দ্বিতীয়তঃ।—সমালোচ্য "যুগলপ্রদীপ" উপন্যাসের মেরুদণ্ড, প্রকৃতির বিশ্বজনীন প্রেম! সে প্রেম, না থাকিলে, মানুষে ও পশুতে প্রভেদ থাকিত কি? ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করাই, মানব-জীবনের মুখ্য লক্ষ্য হইত। এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন, স্বর্গীয় দিব্য আলোক-বিরহিত, নিরবচ্ছিন্ন পাপময় তামসে ডুবিয়া যাইত। সেই আলোকময়, প্রীতিময়, দিগন্তব্যাপী প্রকৃতি-প্রেমই, এই উত্তম উপন্যাসের ভিত্তি! সেই প্রকৃতি-প্রেম, প্রতিনিয়ত অবিরাম ধারায় মানব-হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। তাহা না হইলে, সংসার বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইত, লোকসমাজের শান্তি ও সুখ, বিলুপ্ত হইত। মাতৃস্নেহ, দাম্পত্য-প্রেম, ভ্রাতৃবাৎসল্য, বন্ধুর প্রণয়, পরের হিতসাধনায় আত্মোৎসর্গ, প্রভৃতি যে কোন প্রবৃত্তি, মনুষ্য-হৃদয়ে উচ্চ ও মহৎ, পবিত্র ও সুন্দর,—তাহা সেই প্রকৃতির অনন্ত অসীম প্রেম হইতে সম্ভূত ও তাহারই অংশ মাত্র। এই মনোবৃত্তি-সমূহের মধ্যে কোনটী পবিত্রতম ও উচ্চতম?—উত্তরে বক্তব্য—অকৃত্রিম—অপার্থিব মাতৃস্নেহ। রমণী-হৃদয়ের এই পবিত্র মনোবৃত্তি, প্রকৃতির অনন্ত প্রেমের আদি উৎস! এটী পবিত্র দাম্পত্য প্রেম হইতেও, উচ্চতর—পবিত্রতর। পবিত্র দাম্পত্য প্রেমেও পরোক্ষে স্বার্থপরতার গন্ধ আছে, পাশব প্রবৃত্তির সম্বন্ধ আছে। কিন্তু মাতৃস্নেহে স্বার্থপরতার লেশ কোথায়? উহাতে পাশব প্রবৃত্তির অনুমাত্র সংস্রব নাই। যে রমণী, এই প্রলোভনময় পার্থিব জীবনে, রিপু-দল-পরিবৃত মনুষ্য-করে প্রকৃতির পবিত্র প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিতে চাহেন, তাঁহাকে প্রকৃতি-প্রেমের এই আদি উৎস (মাতৃপ্রেম) দেখিতে হইবে, জগতের মা হইতে হইবে! রমণীর উচ্চতম যোগাভ্যাস জান কি? প্রকৃতিকে, যেমন আপন পবিত্র ক্রোড়ে মাতার স্নেহে নিখিল জগৎ ধারণ করিতে হয়,—রমণীকে তাঁহারই অনুকরণে তাহারই মত মাতৃভাবে জগৎকে দেখিতে হইবে। যেমন পর্ব্বত-নিঃসৃতা স্রোতস্বতী, প্রথমে মন্দস্রোতে, ধীরে ধীরে, সাগরের উদ্দেশে প্রবাহিতা হয়, ক্রমে চারিদিক্ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, একে একে আসিয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করে, অবশেষে সেই বিপুলকায়া তরঙ্গিণী, অনন্ত সাগরে মিশিয়া যায়, তেমনই এই উপন্যাসের অন্নপূর্ণার চরিত্র, ক্রমে অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনা নিচয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া প্রবল হইতে প্রবলতর বেগ ধারণ করিয়া অবশেষে প্রকৃতির অনন্ত প্রেমে মিশিয়াছে! অন্নপূর্ণা রিপুদলকে দলিত করিয়া, সংসার-বাসনাকে লোষ্ট্রবৎ ভূতলে ফেলিয়া রাখিয়া, দাম্পত্য-প্রেম হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া, প্রকৃতির মাতৃ-প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিতা 'আনন্দরূপিণী সস্মিত-বদনা সুরলোক হইতে অবতীর্ণা জগৎজননী অম্বিকার' পবিত্র রূপ ধারণ করিয়া দম্পতি যুগলের সম্মুখে দাঁড়াইল! তাই লেখক, অন্নপূর্ণাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হায় পাঠক! আমরাও কি এক দিন, এ নশ্বর জীবন, বালিকা অন্নপূর্ণার মত অনন্তবাহিনী প্রেমধারায় ঢালিয়া দিতে পারিব না?"—তাই "যুগল-প্রদীপের" উজ্জ্বল শিখা, পার্থিব লালসা ও সংসার-স্পৃহাকে ভস্মীভূত করিয়া, ধরাতলকে অমরভবনে পরিণত করিল।

উপন্যাসোক্ত চরিত্রাবলী আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, "ছায়া" মূর্ত্তি-

মতী সরলতা। তাঁহার কমনীয় ভাবের অভাব কৈ? অন্নপূর্ণায় দেবীত্বের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। তাঁহার 'অন্নপূর্ণা' নাম সার্থক। "চন্দ্রচূড়" সংযতপুরুষ। সংযমের পূর্ণতা পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতে পরিলক্ষিত। আর—শারদাসুন্দরী? অপত্যবাৎসল্য, যেন এত দিন সুন্দর আধারের অপেক্ষায় ছিল—শারদাদেবীকে পাইয়া, সে, চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইল। অমরনাথকে সরলতার খনি বলিলেও হানি নাই—তাঁহার অমায়িকতা, ইহলোকের আদর্শস্থানীয় উপচিকীর্ষা 'গুরুচরণে' বিলক্ষণ বিদ্যমান। হরমোহন ও অকপটতা, এই দুই, দুই নয়—অভিন্ন বস্তু

ভাষায় একদিকে সরলতা, অপর দিকে মধুরতা। বর্ণনা-চাতুর্য্য ও ভাবগাম্ভীর্য্যের জন্য ইহার এত আদর। আর্য্যজাতির যত কিছু প্রাচীন মনোরম পদার্থের সত্তা আছে, তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষায় ঔপন্যাসিকের প্রাণগত লোকাতীত প্রয়াস।

গ্রন্থাভ্যন্তরগত রহস্য, অতি মধুর মধুময়। স্বভাব বর্ণনে ঔপন্যাসিক কবির একচেটিয়া না হউক—তাহাতে তাঁহার অসামান্য অধিকার। নভেল ও রোমান্সের—যুগল বস্তুর সমাবেশ, 'যুগল-প্রদীপে' দেখা দিয়াছে। এই উপন্যাস যাঁহার লেখনী-মুখ হইতে বহির্গত—তিনি নিশ্চিতই নিপুণ প্রবীণ চিত্রকর। "শৈলবালা" "পরেশপ্রসাদ" "অমৃত-পুলিন" "কোহিনুর" তাঁহারই রচিত। এগুলি, উপভোগ্য উৎকৃষ্ট উপন্যাস গ্রন্থ। এ পর্য্যন্ত যত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা আপাততঃ তাঁহার শেষ পুস্তক। বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গেই মানুষের কৃতিত্ব উদ্ভাসিত হয়—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই নিয়মেই বলিতে পারি—"যুগল প্রদীপ" স্বপ্ন উজ্জ্বল—সুতরাং মনোরম।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সমন্বয় ভাষ্যের আলোচনা। (২)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

(৫) আপনার পঞ্চম উদ্ধৃতাংশ এই :—

যে পরিব্রাজকাঃ শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেষাং চেৎথংবিত্তিঃ সহার্চ্চিরাদিনা গমনং।

আপনি ইহার এইরূপ অভিপ্রায় লিখিয়াছেন—"এইরূপ পরিব্রাজকের গতি ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকের গতি একই রূপ; কেবল অত্যুৎকৃষ্ট পরিব্রাজকের কোথায়ও গতি নাই

উদ্ধৃতাংশের সমগ্র অংশ এই।

যে চারণ্যোপলক্ষিতা বৈখানসাঃ পরিব্রাজকাশ্চ শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেষাঞ্চেৎথংবিত্তিঃ সহার্চ্চিরাদিনা গমনং বক্ষ্যতি পারিশেষ্যাৎ অগ্নিহোত্রাহুতিসম্বন্ধাচ্চ গৃহস্থা এব গৃহস্থ ইত্থং বিদুরিতি।

এস্থলে 'তদ্‌যইত্থং বিদুঃ' এই শ্রুতি কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে, ইহাই দেখান উদ্দেশ্য। বিচারে স্থির করা হইয়াছে অরণ্যবাসিপ্রভৃতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ তপস্বী, তাঁহারা অর্চ্চি অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, ইহা পরে বলা হইবে, এস্থলে গৃহস্থগণ গৃহীত হইতেছেন (পরিব্রাজকা বানপ্রস্থাশ্চ গৃহস্থামিতি চেন্নেত্যাহ যে চেতি। কেষাং তর্হি গ্রহণমত আহ পারিশেষ্যাদিতি গৃহস্থ এব। হেত্বন্তরমাহ অগ্নিহোত্রেতি।) যদিও এস্থলের অর্থ করিতে গিয়া আপনার ভ্রম ঘটিয়াছে, সিদ্ধান্তটি ঠিক আছে, কেন না

পঞ্চাগ্নিবিৎ গৃহস্থ এবং অতত্ত্বজ্ঞ বানপ্রস্থাদি শ্রদ্ধাবান্ তপস্বিগণের গতি একই রূপ। তবে এস্থলে বিশেষ কথা এই ;—

ননূর্দ্ধরেতসাং গৃহস্থানাঞ্চ সমানে আশ্রমিত্বে ঊর্দ্ধরেতসামেবোত্তরো পথা গমনং ন গৃহস্থানামিতি ন যুক্তম্। অগ্নিহোত্রাদিবৈদিককর্ম্মাভাবো চ সতি নৈষ দোষঃ অপূতাহি তে। শত্রুমিত্রসংযোগনিমিত্তৌ হি তেষাং রাগদ্বেষৌ তথা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হিংসানুগ্রহনিমিত্তৌ; হিংসানৃতমায়া হব্রহ্মচর্য্যাদি চ বহুশুদ্ধিকারণমপ্যপরিহার্য্যং তেষাম্। অতোহপূতাঃ অপূতত্বায়োত্তরেণ পথা গমনং। হিংসানৃতমায়াহব্রহ্মচর্য্যাদিপরিহারাচ্চ শুদ্ধাত্মনোহীতরে শত্রুমিত্ররাগদ্বেষাদিপরিহারাচ্চ বিরজসস্তেষাং যুক্ত উত্তরঃ পন্থাঃ।

এই ভাষ্যাংশের সার এই, যে সকল গৃহস্থ লোকাদিপঞ্চাগ্নিবিৎ না হইয়া কেবল বিবিধ বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সেই অনুষ্ঠানে দ্বেষ হিংসাদি চিত্তের মালিন্যকর অনেক বিষয় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে মলিন করে, সুতরাং তাঁহাদিগের দেবযান পথে গমন ঘটে না। অতএব ঊর্দ্ধরেতা তপস্বিগণের জীবনে মালিন্যকর বিষয় উপস্থিত হয় না, এজন্য তাঁহারা দেবযান পথে গমন করেন।

আপনার ষষ্ঠ উদ্ধৃতাংশ এই :—

এতেন গৃহস্থস্যৈকত্ববিজ্ঞানে সতি পারিব্রাজ্যমর্থসিদ্ধম্

"এই সকল অপেক্ষাও স্পষ্টতম উক্তি পাঠক শুনুন" এই বলিয়া আপনি এই ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উদ্ধৃত করিবার পর লিখিয়াছেন, "গৃহস্থের যখন ব্রহ্মজ্ঞান অত্যন্ত পরিপক্ক হয়, তখন তাহাকেও পরিব্রাজকাশ্রমোচিত সাধক বলা যাইতে পারে।" সত্য কথা এই যে, তখন আর গৃহস্থ গৃহস্থ থাকেন না, পরিব্রাজক হইয়া যান। যদি পরিব্রাজক না হন, কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম এ দুই তাঁহাতে বিদ্যমান আছে বলিয়া তিনি পরিব্রাজক হন না, ব্রহ্মসংস্থতাপ্রাপ্তিরও যোগ্যতা তাঁহাতে উপস্থিত হয় না। এ সকল কথা যে আমার স্বকপোলকল্পিত নয় ভাষ্যের অগ্র পশ্চাৎ ও ভাষ্যব্যাখ্যাতার কথা গুলি উহা সপ্রমাণ করিবে। ভাষ্যাংশের অগ্র পশ্চাৎ এই :—

তস্মাদ্বেদান্তপ্রমাণজনিতৈকত্বপ্রত্যয়বত এতৎ কর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণং পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মসংস্থত্বঞ্চেতি সিদ্ধম্। এতেন গৃহস্থস্যৈকত্ববিজ্ঞানে সতি পারিব্রাজ্যমর্থসিদ্ধম্। নম্বগ্ন্যুৎসাদনদোষভাক্ স্যাৎ পরিব্রজন্। বীরহা বা এষ দেবানাং যোগ্নিমুদ্বাসয়ত ইতি শ্রুতেঃ। ন, দৈবেনৈবোৎসাদিতত্বাদুৎসন্ন এব হি স একত্বদর্শনে জাতে। অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বমিতি শ্রুতেঃ, অতো ন দোষভাগ্ গৃহস্থঃ পরিব্রজন্নিতি।

অনুবাদ—অতএব ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যাঁহার বেদান্তপ্রমাণজনিত একত্ব-প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তাঁহারই কর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণ পারিব্রাজ্য এবং ব্রহ্মসংস্থত্ব (ঘটে)। এতদ্দ্বারা অর্থতঃ (by (implication) সিদ্ধ হইতেছে যে, গৃহস্থের (বেদান্ত প্রমাণজনিত) একত্ববিজ্ঞান হইলে পারিব্রাজ্য হয় অর্থাৎ পরিব্রজ্যার অধিকার জন্মে। পরিব্রজ্যা করিতে গিয়া গৃহস্থকে অগ্ন্যুৎসাদন (চিরদিনের জন্য অগ্নিত্যাগ) করিতে হয়, ইহাতে তিনি দোষভাজন হন; কেন না শ্রুতিতে কথিত আছে, 'যে ব্যক্তি অগ্নিবর্জ্জন করে, সে ব্যক্তি দেবগণের নিকট বীরহা হয়।' না, তিনি দোষভাজন হন না, কেন না, দৈবকর্ত্তৃক অগ্নি উৎসাদিত হইয়াছেন। একত্বদর্শনজন্মিবামাত্র অগ্নিতো উৎসন্ন হইয়াছেনই। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, 'অগ্নি হইতে অগ্নিত্ব দূরে চলিয়া গিয়াছে।' অতএব পরিব্রজ্যাশ্রয় করিয়া গৃহস্থ দোষভাজন হন না।

কি জানি বা 'গৃহস্থের একত্ববিজ্ঞান হইলে পারিব্রাজ্য হয়' এই বাক্যটির সঙ্গে

অর্থাৎ পরিব্রজ্যায় অধিকার জন্মে' এই ব্যাখ্যাসংযোগ করাতে আপনি মনে করেন, আমি স্বকপোলকল্পিত অর্থের যোজনা করিয়াছি, তাই এস্থলের টীকা এখানে উদ্ধৃত হইল।

টীকা—এতেনেতি। একত্ববিজ্ঞানেন ভেদপ্রত্যয়স্যোপমর্দ্দিতোপপাদনেনেতি যাবৎ। একত্ববিজ্ঞানং পরোক্ষং বিবক্ষিতম্। অপরোক্ষস্য পারিব্রাজ্যমন্তরেণাযোগাৎ তস্যোপরতিশব্দিতস্য শমাদিবৎ সাধনত্বশ্রুতেরিতি দ্রষ্টব্যম্।

অনুবাদ—একত্ববিজ্ঞান দ্বারা ভেদপ্রত্যয় বিনষ্ট হইয়াছে ইহাই প্রতিপাদন 'এতদ্দ্বারা' পদের অর্থ। [এস্থলে] একত্ববিজ্ঞান পরোক্ষ অভিপ্রেত হইয়াছে। পরিব্রাজ্য বিনা অপরোক্ষ একত্ববিজ্ঞান হয় না। অপরোক্ষ একত্ববিজ্ঞান উপরতিশব্দে শব্দিত। উহা শ্রুতিতে শমদমাদির ন্যায়সাধনমধ্যে গণ্য।

যখন গৃহস্থের একত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ ভেদ বুদ্ধির অন্তর্ধান হইবামাত্র ভাষ্যকার তাঁহাকে পরিব্রজ্যাকরিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন ভাষ্যের ব্যাখ্যাতা গৃহস্থের একত্ববিজ্ঞানকে যে পরোক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধিগতমাত্র এবং সেই বুদ্ধিগত একত্ববিজ্ঞানকে পারিব্রাজ্যাবলম্বন করিয়া অপরোক্ষ অর্থাৎ জীবনগত করিয়া লইতে হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কখন শ্রীমচ্ছঙ্করের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ফলতঃ বৈরাগ্য উদিত হইলেই পরিব্রজ্যাকরিবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, একত্ববিজ্ঞান উপস্থিত-হইবামাত্র পরিব্রজ্যাকরিবারও সেইরূপ ব্যবস্থা। জীবনগত একত্ববিজ্ঞান ও উপরতি (সম্যক্ নিবৃত্তি) যখন একই সামগ্রী, এবং উপরতি ও পরবৈরাগ্য যখন ভিন্ন বস্তু নহে, তখন এরূপ ব্যবস্থা করা শ্রীমচ্ছঙ্করের পক্ষে কিছু অসঙ্গত হয় নাই। তবে আপনি যে উত্তম গৃহস্থকে 'পরিব্রাজকাশ্রমোচিত সাধক' এবং উত্তম গৃহস্থাশ্রমকে 'পরিব্রাজকাশ্রমের তুল্য' বলিয়াছেন, তাহা যদি পরোক্ষজ্ঞানযুক্তত্বের সঙ্গে সংযুক্ত রাখেন, তাহা হইলে শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গের সহিত আপনার মতের ঐক্য হয়। কিন্তু পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান সমজাতীয় নহে, ইহা স্বীকার করিলে পরিব্রাজক ও গৃহস্থাশ্রম যে সমজাতীয় নহে, ইহা সহজে প্রতিপন্ন হয়। এরূপ হইবার কারণ এই যে, পরোক্ষজ্ঞানে ব্রহ্মসংস্থতা হয় না, অপরোক্ষজ্ঞানে ব্রহ্মসংস্থতা হয়। ব্রহ্মসংস্থাতেই পারিব্রাজক ও গৃহস্থের অত্যন্ত ভিন্নতা।

এখন আপনি নিজেই বিচার করিয়া দেখুন, শ্রীমচ্ছঙ্করের মত বলিয়া আমি যাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, আপনার উদ্ধৃত ছান্দোগ্যভাষ্যে তাহাই স্থিরতর রহিল কি না? গৃহস্থাশ্রম হইতে পারিব্রাজ্য একেবারে স্বতন্ত্র; পারিব্রাজ্য ভিন্ন অন্য কোন আশ্রমে ব্রহ্মসংস্থতা হয় না; ব্রহ্মসংস্থ হইতে গেলে পূর্ব্ব আশ্রমত্রয়কে অতিক্রম করিতে হয়, এ সকল কথা আপনার উদ্ধৃত ভাষ্যের পূর্ব্বাপর বিচারে স্থির হইল। এ বিচারে আমি শ্রীমচ্ছঙ্কর বা আপনার উপরে কোন অযথাসিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিয়াছি কি না আপনিই পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, এবং যদি আমার পক্ষ হইতে কোন অসদর্থ ঘটান হইয়া থাকে আপনি প্রদর্শন করুন, আমি তাহাতে সন্তুষ্টই হইব। এ অংশ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না বলিয়া পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলা যাউক।

আপনি মনে করেন, "ঋগ্বেদের পারলৌকিক বচনগুলির অর্থ এই যে, যত দিন যজ্ঞপরায়ণ সেই জীবগুলি ঘুরিয়া পুনরায়

পৃথিবীতে না আসিতেছে, তত দিনের অর্থাৎ সেই interval টুকুর অবস্থাবর্ণন করিয়াছেন মাত্র।" ঋগ্বেদ কেন ব্রাহ্মণ ও সূত্র গুলিতেও তো আর এ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার কথা নাই। বেদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থের পর যে মত প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে'জীবগুলির ঘুরিয়া পুনরায় পৃথীবীতে' আসার জন্য কাল প্রতীক্ষা নাই, একেবারে চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসাই বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞ দ্বারা চন্দ্রের সহিত এক হইয়া চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু সেখান হইতে পৃথিবীতে আসার কোন উল্লেখ নাই।

চন্দ্রমা বা অকাময়ত—অহোরাত্রানর্দ্ধমাসান্মাসান্‌তুনৎসংবৎসরমাপ্ত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নুয়ামিতি। স এতং চন্দ্রমসে প্রতীদৃশ্যায় পুরোডাশং পঞ্চদশকপালং নিরবপৎ। ততোবৈ সোঽহোরাত্রানর্দ্ধমাসান্‌তুনৎ সংবৎসরমাপ্ত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোৎ। অহোরাত্রান্‌ হ বা অর্দ্ধমাসান্‌ মাসান্‌তুনৎ সংবৎসরমাপ্ত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতি য এতেন হবিষা যজতে।৩।১ ৬।

বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে দিব্যধামে পানভোজনের নিবৃত্তিকাল বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু সেখান হইতে পৃথিবীতে আগমনের কোন কথাই নাই। যে ইষ্টাপূর্ত্তাবলম্বন করিয়া চন্দ্রলোক হইতে একেবারে পৃথিবীতে আসা বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে, তৈত্তিরীয়ে উদ্ধৃত ঋকে সেই ইষ্টাপূর্ত্তে চিরস্থায়ী লোকে চিরস্থায়ী হইয়া থাকাই বর্ণিত রহিয়াছে।

শাশ্বতীঃ সমা উপযন্তি লোকাঃ শাশ্বতীঃ সমা উপযস্তাপঃ।
ইষ্টং পূর্ত্তং শাশ্বতীনাং সমানাং শাশ্বতেন হবিষ্টানন্তং লোকং পরমারুরোহ।২।৪।৫।

ব্রাহ্মণানুসারে কতকগুলি আদিত্যের পশ্চাতে কতকগুলি আদিত্যের উপরিভাগে লোক আছে। যে গুলি আদিত্যের পশ্চাদ্ভাগে স্থিত সে গুলিতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারা যায় না, আর যাঁহারা আদিত্যের উপরিভাগে যান তাঁহারা নিত্যকাল সেখানেই বাস করেন। অচিরস্থায়ী লোকগুলি উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত। অধো হইতে ক্রমান্বয়ে ক্রিয়াফলে উর্দ্ধে উত্থান করা যায়, এ বর্ণনা ব্রাহ্মণে আছে, কিন্তু উর্দ্ধ হইতে একেবারে পৃথিবীতে নামিয়া আসা কোথাও বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় না। 'অগ্নিই বিদ্যা অগ্নিই কর্ম্ম এ কথা যে ব্যক্তি জানে সে মরিয়া জন্মে জন্মিয়া অমৃতত্ব ভাজন হয়। আর যে ব্যক্তি জানে না সে মরিয়া জন্মে জন্মিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।' জন্মে কোথায়? জন্মে পরলোক।

অথ খলু ক্রতুময়োঽয়ং পুরুষঃ। স যাবৎ ক্রতুরয়মস্মাল্লোকৎ প্রৈতি এবংক্রতুর্হ অমুং লোকং প্রেত্যাভিসম্ভবতি।

"পুরুষ ক্রিয়াময়। যেরূপ কর্ম্ম করিয়া ইহলোক হইতে গমন করে সেইরূপ ক্রিয়াময় (পুরুষ) হইয়া পরলোকে গমন করত জন্ম গ্রহণ করে।" এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, অক্রিয়াবান্‌ লোকেরা পরলোকে জন্মগ্রহণ করে না, ইহলোকে থাকে। যদি তাহাই হইবে, তবে শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের দলস্থ হইয়া দস্যুগণের আসিবার সম্ভাবনা ছিল কোথায়? এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বিভাগ এতদ্দ্বারা সকলেরই একবিধ গতি, এক লোকে স্থিতি বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা পৃথিবী ও দিব্যধাম এই দুইটিকে সীমা করিয়া অনেকগুলি পার্থিব ও দিব্য

লোক নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাতে এই হইয়াছে, যে সকল লোক সূর্য্যালোকে দিবারাত্রিযুক্ত সেই সকল ক্ষয়িষ্ণু পিতৃলোক; দক্ষিণদিক্ পিতৃযান দিয়া গমনীয়। এই সকল পার্থিব লোক পৃথিবীর সন্নিহিত অব্যবহিত অন্তরীক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দূরতম দেশপর্য্যন্তব্যাপী। যে সকল লোক জ্যোতিষ্মান্, দিবারাত্রিবিরহিত, সে সকল লোক চিরস্থায়ী। সেখানে গিয়া একবার জন্ম হয় আর জন্ম হয় না, লোকলোকান্তরে ভ্রমণ ঐচ্ছিক। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থ সকল যে পরলোকের তত্ত্বনির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অপূর্ণ নহে, তাহাকে পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়াসান্তরের প্রয়োজন নাই। যদি সম্ভব হয়, পরবর্ত্তী বৈদান্তিক মত বৈদিক পারলৌকিক মতের সহিত সমঞ্জস করিয়া লওয়া বিধিসিদ্ধ। আমার বিচারে সমঞ্জস করিয়া লওয়া সহজ। অন্যে ইহাতে সায় দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে বল চলে না।

শ্রীমচ্ছঙ্কর বেদান্তাবলম্বন করিয়া পরলোকতত্ত্বসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন সংক্ষেপে তাহা নিবদ্ধ করিতেছি। যে সকল ব্যক্তি যজ্ঞাদি কিছুই অনুষ্ঠান করে না, তুচ্ছ সংসারের কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা এখানে মরিয়া এখানেই জন্মগ্রহণ করে। যাহারা বৈদিক বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, হিংসাদিজন্য মালিন্যবশতঃ তাহারা দক্ষিণ দিক্ দিয়া পিতৃযানে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রলোকে গমন করে। তাহারা বাষ্পাকারে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া জলময় তনু প্রাপ্ত হয়। সেখানে তাহারা দেবগণের ভোজ্য অর্থাৎ তাঁহাদিগের ক্রীড়নসামগ্রী হয়। কর্ম্মক্ষয়ে তাহারা পুনরায় বাষ্পাকার হইয়া মেঘ, মেঘ হইয়া বর্ষণাকারে পর্ব্বতাদি প্রদেশে বর্ষিত হইয়া প্রস্তর, তরু গুল্মাদির উপরে নিপতিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। প্রস্তরাদিতে প্রবিষ্ট হইলে সেখানে বদ্ধ হইয়া পড়ে। উহারা নদীর প্রবাহাদিতে নীত হইয়া সমুদ্রে জলজন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে সচেতন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। যে সকল অংশ এইরূপে জলজন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত না হয় সে সকল অংশ আবার বাষ্পাকারধারণ করিয়া মরুভূমি আদিতে বর্ষিত হয়। সেখানে যদি দৈবক্রমে কোন জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় তাহা হইলে সচেতনতালাভের উপায় হয়। যজ্ঞকারী ব্যক্তি যখন বাষ্পাকারে গিয়াছিল, তখন অচেতন ছিল, আবার যখন কর্ম্মক্ষয়ে সে লোক হইতে বাষ্পাকারে অবতরণ করিল তখনও অচেতন ছিল। কোন ব্যক্তির মস্তকে লগুড়াঘাত করিলে সে যেমন অচেতন হইয়া যায়, এবং তাহার অজ্ঞাতসারে যেখানে সেখানে তাহাকে লইয়া যাওয়া যায়, বাষ্পাকার এই সকল জীবেরও সেই দশা। ব্রীহিযব ইত্যাদিতে যখন জীব পরিণত হয়, তখন ছেদনপোষণাদিতে যে কোন ক্লেশ হয় না, তাহার কারণ এই অচেতনতা। যখন ব্রাহিযবাদি মনুষ্যদেহগত হইয়া বীজরূপে পরিণত হয় এবং শুক্রশোণিতযোগে নরদেহধারণ করে, তখন আবার যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া চন্দ্রলোকে জীব গমন করে। আবার পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, এই প্রকার চক্রবৎ ভ্রমণ হইয়া থাকে। যে সকল গৃহস্থ লোকাদিপঞ্চাগ্নিবিৎ তাঁহারা এবং শ্রদ্ধাবান্

তপোনিরত বানপ্রস্থ, বৈখানস ও পরিব্রাজক, হিরণ্যগর্ভাখ্য সত্য ব্রহ্মের উপাসক, ইঁহারা উত্তর দিক্ দিয়া দেবযানে গমনপূর্ব্বক প্রাজাপত্যাদি: পুণ্য লোক প্রাপ্ত হন। সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ প্রাণসহকারে নাড়ী পথে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের অমৃতত্ব আপেক্ষিক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। যাঁহারা একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎ জ্ঞানযুক্ত, তাঁহাদের মূর্দ্ধন্য নাড়ী অথবা অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন হয় না, তাঁহারা আত্যন্তিক অমৃতত্বলাভ করেন।

এ বড় আশ্চর্য্য যে, যাহা সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থে নাই বেদান্ত তাহা কোথা হইতে গ্রহণ করিলেন। এ মত ব্রাহ্মণজাতির চিন্তা বা অনুধ্যানের ফল নহে। সংহিতাদি গ্রন্থ তাঁহাদিগের চিন্তার ফল, সুতরাং তন্মধ্যে এ মত দৃষ্ট হয় না। এমত ক্ষত্রিয়বংশ হইতে ব্রাহ্মণগণ শিক্ষা করিয়াছেন। যদি এমত বিদেশ হইতেও আসিয়া থাকে তাহা হইলেও ইহা যে বৈদিক মতের সহিত মিলিত করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি সমঞ্জস করিয়া লওয়া না হইত, তাহা হইলে যজ্ঞাদির সঙ্গে জীবগতি সংযুক্ত করিবার কোন কারণ ছিল না। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থের সঙ্গে বেদান্তের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে ইহা দেখাইতে গিয়া আমি সমন্বয়ভাষ্যে বলিয়াছি, "মৃতগণ পরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ইহাই বৈদিকগণের মত। 'সে লোক হইতে কর্ম্ম করিবার জন্য এ লোকে আইসে'—ইহাই বেদান্তিগণের মত।" "বৈদিক ও বেদান্তিগণের মতের একতাসাধন করিবার জন্য যদি আমাদের কৌতুহল থাকিত তাহা হইলে আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা করিতাম—'সে' 'এ' এ দুই শব্দ এক লোক ছাড়িয়া অপর লোকে প্রবেশ দেখা ইতেছে।" 'যদি আমাদের কৌতূহল থাকিত' এ কথা মৌখিক নয়, কেন না আমি শেষে বলিয়াছি, "পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের পন্থা অবলম্বন করিয়া যদিও আমরা ঈদৃশ ব্যাখ্যানকৌশল অবলম্বন করিতে পারিতাম এবং দেশকালে আবদ্ধ নয় ঈদৃশ সত্য দৃষ্টিতে যদিও এ কথা মূলতঃ ঠিক হইত, তথাপি তত্তৎকালের লোকেরা আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে যত্ন করিলাম তাহাই যে ঠিক বিশ্বাস করিতেন, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না।" এ কথা বলিয়া কিরূপে পরলোকে স্থিতি সিদ্ধ হয় তাহাও আমি দেখাইয়াছি। শ্রীমচ্ছঙ্করের অনুসরণ করিলে আরও সহজে সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে।

শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন,

'ন চ পুনরাবর্ত্তন্তে' ইতি, 'ইমং মানবমাবর্ত্তং ন বর্ত্তন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধশ্চেৎ ইতি ন, 'ইমং মানবম্' ইতি বিশেষণাৎ তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তীতি চ। যদি হ্যেকান্তেনৈব নাবর্ত্তেরন্ "ইমং মানবমিহ' ইতি চ বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ। 'ইমমিহ' ইত্যাবৃত্তিমাত্রমুচ্যতে ইতি চেৎ; ন, অনাবৃত্তিশব্দেনৈব নিত্যানাবৃত্ত্যর্থস্য প্রতীতত্বাদাবৃত্তিকল্পনাহনর্থিকা। অত 'ইমমিহ' ইতি চ বিশেষণার্থবত্তায় অন্যত্রাবৃত্তিঃ কল্পনীয়া।

অনুবাদ - যদি বল 'পুনরাবৃত্ত হয় না' 'এই মানবে আবৃত্তি ঘটে না' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে, তাহা ঘটে না; কেন না 'এই মানব' বিশেষণ থাকাতে তাহাদিগের আর এখানে পুনরাবৃত্তি নাই। যদি একান্তই আবৃত্তি না থাকে তাহা হইলে 'এই মানব এখানে' এ বিশেষণ অর্থশূন্য হইয়া যায়। যদি বল 'ইহাকে এখানে' এ বিশেষণে আবৃত্তি মাত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না, কেন না অনাবৃত্তি নিত্য অনাবৃত্তি

বুঝাইতেছে, এরূপ স্থলে আবৃত্তিকল্পনাকরা অনর্থক হয়। অতএব 'ইহাকে এখানে' এ বিশেষণের অর্থবত্তাসাধনের জন্য (পৃথিবী ছাড়া) অন্যত্র (অনাবৃত্তিধর্ম্মবিশিষ্ট লোকে) আবৃত্তিকল্পনা করিতে হইবে।

যদি একটী শ্রুতির অনুরোধে 'ইহ' শব্দসত্বেও সমধর্ম্মী লোকান্তরে আবৃত্তিকল্পনা করিতে হইল, তাহা হইলে 'সে লোক হইতে এ লোকে আইসে' এস্থলে 'এ'লোক পৃথিবী সমানধর্ম্মাক্রান্ত লোক কেন বলা হইবে না? যেখানে পৃথিবীশব্দ আছে সেখানে সমধর্ম্মিত্ববশতঃ তন্নামে অন্য পার্থিব লোক উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে, কেন না তাহা হইলে বেদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থের সহিত বেদান্তের বিরোধ ঘুচিয়া যায়। শাস্ত্রসমূহের সমাধান করিতে গিয়া যিনি যাহা বলেন, তাহাই যে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। যদি এরূপ নিয়ম থাকিত, শ্রীমচ্ছঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় আচার্য্যের মতখণ্ডন অন্য আচার্য্যগণ করিতেন না। আমি যাহা ঠিক সমাধান মনে করি তাহাই ব্যক্ত করিয়াছি, আজও করিতেছি, উহার গ্রহণ বা অগ্রহণ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিপত্তির উপরে নির্ভর করে; সুতরাং সে বিষয়ে আমি কোন আগ্রহ প্রকাশ করি না।

আপনি বলিয়াছেন 'বৃহদারণ্যকের ৬ প্রপাঠকের তৃতীয় ব্রাহ্মণে, জীবের স্বপ্নাবস্থাবর্ণন করিতে গিয়া উপনিষদ অতি স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন যে, জীব যে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শন করে, তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দেহগ্রহণকালে যাহা যাহা দেখিবে বা করিবে এতদুভয়ের কোন কোন কার্য্য বা দৃশ্য পদার্থ, বর্ত্তমান নিদ্রাবস্থায় দেখিয়া থাকে।"

উপনিষদে এ সকল কথার উল্লেখ নাই, ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন। স্বপ্ন ইহলোক পরলোকের সন্ধিস্থল, আত্মা স্বপ্নে ইহলোকে পরলোকে বিচরণ করে উপনিষদে এইমাত্র আছে।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে পারিব্রাজ্যাশ্রম যে অন্যান্য আশ্রম হইতে একান্ত ভিন্ন তাহা প্রতিপন্ন হইল; শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্রহ্মসংস্থতা পারিব্রাজ্যাশ্রমে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে; জ্ঞানানুশীলনপূর্ব্বক যাঁহারা গৃহে, বনে, বা বিবিদিষা সন্ন্যাসে স্থিতি করেন তাঁহারা যে কেবল পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র প্রাপ্ত হন, পরিব্রজ্যা বিনা অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, শ্রীমচ্ছঙ্কর ও তাঁহার অনুযায়িবর্গের যে এই অভিপ্রায়, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে; যোগের প্রাণ মননশীলত্ব, পরিব্রজ্যা বিনা উহা সিদ্ধ পায় না, সুতরাং মননপ্রধান যোগ শ্রীমচ্ছঙ্কর ও তাঁহার অনুযায়িগণের মতে পারিব্রাজ্যাশ্রমে আবদ্ধ, ইহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না; শ্রীমচ্ছঙ্কর যে গীতোক্ত যোগকে ঈদৃশ যোগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। পরলোকতত্ত্বসম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি তৎসম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি এবং যে সিদ্ধান্তে সংহিতা ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থের সহিত বেদান্তের সামঞ্জস্য হয় আমি মনে করি, অপরের তদ্গ্রহণে আমি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে চাই না। তবে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত এ সম্বন্ধে আমার মতের ঐক্য হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমার সান্ত্বনা এই যে আমি অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই নাই।

দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্।
৩স্ক, ৩১অ, ৪২শ্লো।

তথা কামপরো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্।
উপর্য্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্।
৪স্ক, ২৯অ, ৩১ শ্লো

"জীবভূত অর্থাৎ মনোময় দেহে এক লোক হইতে অন্যলোকে গমনপূর্ব্বক পুরুষ কর্ম্মসকল ভোগ করে, এবং নিয়ত কর্ম্ম করে।" "বিবিধ অভিলাষযুক্ত জীব উচ্চনীচ পথে ভ্রমণপূর্ব্বক হয় উপরে নয় অধোতে নয় মধ্যে কর্ম্মানুরূপ প্রিয়াপ্রিয় প্রাপ্ত হয় *।"

পূর্ব্বপত্রে জীবসম্বন্ধে আমি শ্রীমচ্ছঙ্করের যে মত ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, উহাই যথেষ্ট আর তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না।

প্রত্যুত্তরের প্রত্যুত্তরে যাহা বলা হইল তন্মধ্যে যদি কোথাও ভ্রান্তি থাকে তৎপ্রদর্শনে আমি অনুরোধ করিতেছি। আপনার সমালোচনার প্রেরণায় আলোচ্য বিষয়গুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইতেছি, এজন্য আপনি আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। †

আপনি ও ভাষ্যপ্রকাশকগণ এ পত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন।

১৫ই কার্ত্তিক।

১৮২৩ শক। শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।

সশ্রদ্ধ নিবেদন,

আমি আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম, কিন্তু আপনি লিখিয়াছিলেন আপনার প্রত্যুত্তরের শেষ হয় নাই, সুতরাং শেষ প্রত্যুত্তর পাঠ করিয়া আপনার পত্রের উত্তর দিব এই মনে করিয়া তখন পত্রের উত্তর দি নাই। আপনি ছল কপটতা অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত এ কথা আমি লিখি নাই, কেবল দুঃখের সহিত এই কথা আমি আপনাকে জানাইয়াছি যে, আমি বিচার্য্য বিষয় বলিয়া যাহার অবতারণা করিয়াছি সে বিষয়ে কোন উত্তর না দিয়া আমি যাহা বলি নাই তাহা ধরিয়া আপনি আগাগোড়া বিচার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিয়াছি, 'এরূপ বিচার যে ঠিক নয় তাহা কি আর বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হয়।' সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস বিনা ব্রহ্মসংস্থতা হয় না গৃহী কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না' সুতরাং ব্রহ্মসংস্থতারূপ যোগ তৎ সম্বন্ধে সম্ভব নয় শ্রীমচ্ছঙ্কর এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, আমি তো এই কথাই বিচারস্থলে আনয়ন করিয়াছিলাম; গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞানালোচনার প্রতিকূলে তো কোন কথা বলি নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, শ্রীমচ্ছঙ্করের বাক্যে তদ্বিপরীত কিছু থাকিলে তাহাই তো দেখান উচিত ছিল। এবার যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও আমার দুঃখ এই যে, আপনি তাঁহার ভাষ্যের কথাগুলি তত দূর পর্য্যন্ত

* ছান্দোগ্যোপনিষদে—'স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চোলোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাম।' 'স এষ চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চ' —সূর্য্যের উপরিভাগে অনেকগুলি লোক দেবভোগ্য, সূর্য্যের নিম্নভাগে অনেকগুলি লোক মনুষ্যভোগ্য, বেদান্ত এ কথা বলাতে সমন্বয়ভাষ্যের সিদ্ধান্ত বেদান্তসিদ্ধ কি না, পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া দেখুন। ঊর্দ্ধে ও মধ্যে যেমন বহুলোক অধোতেও যে তেমনি বহু লোক —"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ"— এ শ্রুতিতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

† সমন্বয় ভাষ্যের প্রকাশক বাবু তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশয়ের সহিত আমাদের এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, ইহার উত্তর কোকিলেশ্বর বাবু দিলে তাহা নব্যভারতে ছাপা হইবে; তৎপর এ সম্বন্ধে আর বাদ প্রতিবাদ নব্যভারতে প্রকাশ হইবে না। তৎপরও যদি উপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, তবে তাহা স্বতন্ত্র "সমন্বয় ভাষ্যের পূর্ব্বোত্তর পক্ষ" নামক পুস্তিকায় মুদ্রিত হইলে, ৮৪।২ হ্যারিসন রোডে প্রকাশকের নিকট তাহা পাওয়া যাইবে। ন, স।

উদ্ধৃত করিয়াছেন, যত দূর উদ্ধৃত করিলে আপনার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপন্ন হয়; আর একটু অগ্রসর হইলেই আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা প্রমাণিত হইত, সে কথা গুলি আর আপনি তোলেন নাই। এরূপ ভাবে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে লোকের মনে কি এই সংস্কার জন্মিতে পারে না যে, স্বমত রক্ষার দিকে আপনার এত দূর ঝোঁক হইয়াছে যে, অন্যদিক্ দেখিবার আর প্রবৃত্তি নাই। আমি আপনাকে কপট বা জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য এ সকল করিয়াছেন তাহা বলিতেছি না, তবে এই বলিতেছি যে কোন এক দিকে মন বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলে মনের যে অবস্থা হয় উহা সেই অবস্থার নিদর্শন। আমারও যে এরূপ হইতে পারে না, ইহা আমি বলি না। যদি সেরূপ আমার হইয়া থাকে আপনি বা পণ্ডিতমণ্ডলী উহা দেখাইলে আমি মাথা পাতিয়া আমার মানসবিকারস্বীকার করিব। দেখুন আপনি বৃহদারণ্যক হইতে "কর্ম্মাণি সংস্কারার্থানি" এই হইতে আরম্ভ করিয়া (মধ্যে মধ্যে কিছু বাদ দিয়া) "এবং যথোক্তেন......আত্মানম্ বিদিত্বা......মুনির্ভবতি" এই পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহার পরের অংশ আর উদ্ধৃত করেন নাই। পরের অংশ যদি উদ্ধৃত করিতেন তাহা হইলে শ্রীমচ্ছঙ্করসম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই প্রমাণিত হইত। কেননা তিনি বলিয়াছেন—

"মননান্মুনির্যোগী ভবতীত্যর্থঃ। এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি নান্যম্। নম্বন্যবেদনেঽপি মুনিত্বং স্যাৎ কথমবধার্য্যতে এতমেবেতি: বাঢ়ম্, অন্য বেদনেঽপি মুনির্ভবেৎ; কিন্ত্বন্যবেদনেন মুনিরেব স্যাৎ কিন্তুহি কর্ম্মাপি ভবেৎ। স এতস্ত্বৌপনিষদং পুরুষং বিদিত্বা মুনিরেব স্যাৎ নতুকর্ম্মী, অতোঽসাধারণত্বং মুনিত্বং বিবক্ষিতমস্যেত্যবধারয়ত্যেত্র মেবেতি। এতস্মিন্ হি বিদিতে 'কেন কং পশ্যেৎ' ইত্যেবং ক্রিয়াঽসম্ভবনাৎ মননমেব স্যাৎ।"

ইহার অর্থ এব যে মননে মুনি অর্থাৎ যোগী হন। ইঁহাকে জানিয়াই মুনি হন, আর কাহাকেও জানিয়া নহে। অন্যকে জানিলেও তো মুনিত্ব জন্মিতে পারে, তবে কেন 'ইহাঁকেই" এরূপ বলা হইতেছে? আচ্ছা স্বীকার করা গেল অন্যকে জানিলেও মুনি (মননশীল) হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অন্যকে জানিলে সাধক যে কেবল মুনি হন তাহা নহে কর্ম্মীও হন। সে ব্যক্তি এই উপনিষদুক্ত পুরুষকে জানিয়া কেবল মুনি হন কর্ম্মী হন না। অতএব এস্থলে অসাধারণত্ব মুনিত্ব বলা অভিপ্রেত বলিয়া 'ইঁহাকে' এই বলিয়া (শ্রুতি) উহাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই উপনিষদুক্ত পুরুষকে জানিলে কে 'কাহাকে দেখে' এই শ্রুত্যানুসারে কর্ম্ম অসম্ভব হইয়া পড়াতে কেবল মননই হয়।

'কেবল মননই হয়' ইহার অর্থ এইযে, কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গিয়া যে মননের বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তাহা আর এ স্থলে ঘটিতে পারে না, 'কে কাহাকে দেখে' এই ভাবে ব্রহ্মেতেই নিত্য স্থিতি হয়। 'অন্যকে জানিলেও মুনি হয়', একথার ভাব এই যে উপনিষদুক্ত পুরুষ ভিন্ন অন্যকে অর্থাৎ দেবতান্তরকে জানিলে সেই দেবতাকে মনন করিতে হয়, কিন্তু এ মননের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মানুষ্ঠান থাকে, কেন না কর্ম্মানুষ্ঠানের উপলক্ষ করিয়া দেবতান্তর চিন্তা উপস্থিত হয়। এ চিন্তা সে ধ্যান যোগ নহে যাহাতে ব্রহ্মস্থ হইয়া সাধক বাস করেন। সর্ব্বথা কর্ম্মনিবৃত্ত না হইলে আর সে ধ্যানযোগ হয় না। ভাষ্যের অংশমাত্র প্রকাশ করিলে কি প্রকার প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়, তাহার আর দুই একটি

দৃষ্টান্ত দি। আপনি তৈত্তিরীয় ভাষ্য হইতে এই অংশটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন,

অদিনা ব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চবিদ্যাং প্রত্যুপকরাত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ করণত্বাচ্চ শ্রবণমননিদিধ্যাসননাম্।

ইহার আগের কথাগুলি না বুঝিলে যথার্থ অর্থ প্রতীত হয় না। সকল অংশ তুলিলে কি অর্থ হয়, শ্রীমদানন্দ গিরি যে আভাস দিয়াছেন তাহাতেই সহজে প্রতীত হইবে।

ইদানীং গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মণাং বহিরঙ্গত্বং সন্ন্যাসাশ্রমকর্ম্মণাং ত্বন্তরঙ্গত্বং বিদ্যাসাধনত্বমিতি বিশেষং দর্শয়িতুং চোদ্যমুত্থাপয়তি কর্ম্মনিমিত্তত্বাদিত্যাদিনা।

ব্রহ্মজ্ঞানসাধনবিষয়ে গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম সকল বহিরঙ্গ, সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কর্ম্ম অহিংসাদি ও শ্রবণ মননাদি অন্তরঙ্গ সাধন এই বলা উদ্দেশ্য, সুতরাং গ্রহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলি হইতে ব্রহ্মজ্ঞানোচিত সাধন পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন এখানকার উদ্দেশ্য মিশ্রিত করিয়া ফেলা নহে। আপনি বৃহদারণ্যক হইতে যে—

মানসানাঞ্চ ধ্যানজ্ঞান বৈরাগ্যাদীনাং সন্নিপত্যোপকারকত্বং।

এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ও পূর্ব্বাংশ গ্রহণ করিলে ঐভাবই প্রকাশ পায়। এরূপ ভাগ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন কি জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই—

শমদমাদীনাঞ্চাত্মদর্শনসাধনানামন্যাশ্রমেষ্বনুপপত্তেঃ।—ঐতরেয়ভাষ্যোপক্রমণিকা।

প্রাগ্ ব্রহ্মবিজ্ঞানান্নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মাণি। তৈঃ শিঃ বঃ ১১ অনু।

শমদমাদি আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য সাধন অন্যাশ্রমে সম্ভবে না। শ্রুতি ও স্মৃতিসিদ্ধ আত্মসাক্ষাৎকারোপযোগী কর্ম্মগুলি তত দিন করিবে যত দিন ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সাক্ষাৎ জ্ঞান উপস্থিত না হয়। 'শমদমাদীনাং চাত্মদর্শনসাধনানাম্'' এস্থলে শমদমাদিও যে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে আর অনুষ্ঠেয় থাকে না, শ্রীমদানন্দ গিরি স্পষ্ট বাক্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন,—

নেদং বিদ্বদ্বিষয়ং তস্য সাধনবিধিবৈয়র্থ্যাৎ কিন্তু বিবিদিষুবিষয়মিতি বক্তুমাত্মদর্শনসাধনানামিত্যুক্তম্।

একথা আচার্য্যের অনুমোদিত; কেন না তিনি ইহারই কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছেন।

এতেন গুরুশুশ্রূষাতপসোরপ্রতিপত্তির্বিদুষঃসিদ্ধা।

বিদ্বৎসন্ন্যাসীর পক্ষে গুরুশুশ্রূষা ও তপস্যাও সম্ভবে না।

আপনার লেখার বিপরীতে কতকগুলি কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আজও বলিতে হইল বলিয়া আমি দুঃখিত। এক এক সময়ে এজন্য মন আমার বড়ই ভারগ্রস্ত হয়। তবে যে লিখি সে কেবল শাস্ত্রীয় বিচারে সত্য প্রকাশ পায় তাহারই অনুরোধে।

এই সকল মতবৈপরিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের উভয়ের মতের মিল কোথায় তাহাই দেখা যাউক। ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ গৃহীর তৎসমুচিত সাধন যে শ্রীমচ্ছঙ্করের অভিমত ইহা আপনিও মানেন আমিও মানি। সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে গৃহত্যাগপূর্ব্বক পারিব্রজ্যাশ্রমাবলম্বনকরা তাঁহার অভিপ্রেত, এবিষয়েও আমাদের কোন মতভেদ নাই। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের যে দশম শ্লোক লইয়া মতভেদ উপস্থিত সে শ্লোককে শ্রীমচ্ছঙ্কর যে যোগারূঢ় ব্যক্তিতে নিয়োগ করিয়া ধ্যানযোগে গৃহীর অধিকার নাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এই ধারণাতেই আমি পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছি, "যোগে অধিকার ও ব্রহ্মসংস্থা শ্রীমচ্ছঙ্করের নিকট একই সামগ্রী, সুতরাং এরূপ মতপোষণ করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত নহে।"

তবে আপনি যে, "যুক্ত" বলিয়া যোগীর একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা কোন ভাষ্য বা ব্যাখ্যানসঙ্গত নহে। যাহা হউক, যখন মূল বিষয়ে উভয়ের মতের অনৈক্য নাই, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু 'গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে শঙ্করের উপরে অবিচার' করিয়া এরূপ মনে করা যখন ভ্রমসম্ভূত, তখন আশা করি এখানেই উত্তর প্রত্যুত্তরের পরিসমাপ্তি হইবে।

পরিশেষে প্রার্থনা এই, সত্যানুরোধে যে সকল কথা লিখিয়াছি তাহা যদি তীব্র বলিয়া প্রতীত হয়, সত্যানুরোধে তাহা ক্ষমা করিবেন।

১৮ অগ্রহায়ণ,
১৮২৩ শক। শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।

বার-ভুঞা।

ফজল গাজী।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অপর কয়েকটী পরগণার শাসনভার গাজী বংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা পালওয়ান সাহ নামক জনৈক দরবেশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৫৭০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান গাজীবংশের উনবিংশ পুরুষ পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রচলিত কিম্বদন্তী হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, মুসলমান কর্ত্তৃক গৌড়ের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গবিজয় সাধারণতঃ ধর্ম্মোন্মত্ত অস্ত্রধারী মুসলমানগণ দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছিল। তাহারা ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত হইয়া দিল্লীর দরবার কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়াও এই যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে পালওয়ান সাহ এই দুর্দ্দান্ত ধর্ম্মোন্মত্ত দলের অধিনায়ক বলিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র * সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা শুনা যায় যে, দিল্লীতে অবস্থানকালে বুদ্ধি-কৌশলেই হউক বা দৈববলেই হউক, একটা ভগ্ন প্রসাদের ছাদ, যাহা স্থপতিরা বহু চেষ্টায়ও সম্যক মিলাইতে সমর্থ হয় নাই, তাহা তৎকর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছিল, এজন্য বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু কায়াম খাঁ সাহেব ঐরূপ অর্থগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বাদসাহকে জানাইলেন, অর্থ লইয়া বঙ্গদেশে গমন করা সহজসাধ্য বা নিরাপদের বিষয় নয়, তবে যদি তাঁহার কৃত কার্য্যের জন্য বাদসাহ যথার্থই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ভাওয়াল পরগণা দান করিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষের কারণ হয়। বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার উক্ত প্রস্তাবেই সম্মতি প্রদান করেন।

দানপত্র প্রস্তুত হইবার সময় আর একটী বিষয়ের অবতারণা হইল যে, ঐ দলিল কাহার নামে প্রযুক্ত হইবে? তৎসময় পর্য্যন্ত কায়াম খাঁ বিবাহ করেন নাই, কিন্তু তিনি বাদসাহকে জানাইলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে অষ্টাদশটী পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হইবে, "বড় গাজী," অতএব দানপত্র এই বড়গাজীর নামেই প্রস্তুত হউক। পালোয়ান

* কায়াম খাঁ—এশিয়াটিক রিচার্স, ৪৩ সংখ্যা. ডাক্তার ওয়াইজ কৃত প্রবন্ধ।

সাহের পুত্র কায়াম খাঁ সাহেব তৎপর ঐ দানপত্র লইয়া ভাওয়াল আগমন করেন, পরে লক্ষা নদীর তীরে চৌরার নামক স্থানে বাসস্থান সংস্থাপন করেন।

বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল সাধারণের নিকট সবিশেষ পরিচিত। কিন্তু যখন ঢাকার নাম সাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল, সেই সময়েও ভাওয়াল ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিল, জানা যায়। প্রবাদ আছে, পালবংশীয় অনেক রাজা ভাওয়ালে বাস করিতেন। পূর্ব্বে ভাওয়াল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে পালরাজাদের সময় হইতে উহা স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়া উঠে। ভাওয়ালের একাংশ রণ ভাওয়াল নামে পরিচিত, অবশ্য এই স্থানে একটী প্রসিদ্ধ রণাভিনয় কোন কালে হইয়া থাকিবে, এজন্য উহা রণভাওয়াল নামে পরিচিত হইয়াছে। রণভাওয়ালের তিনটী স্থানে তিন রাজবাড়ীর চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কাপাসিয়া থানার চারি মাইল পশ্চিমে শিশুপাল রাজার আবাসস্থান ছিল। ধলেশ্বরী তীরে সাবারে এখনও হরিশ্চন্দ্র পালের ভগ্নাবাসের চিহ্ন লক্ষিত হয়। তেলিপাবাদ পরগণার তরাগ নদীতটে যশঃ পাল রাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সকল রাজাদের বিষয় নিশ্চয়রূপে কিছুই জানিবার বা বলিবার উপায় নাই।

ভাওয়ালের পশ্চিম সীমায় সাবারের নিকট ধামরাই গ্রামে যশঃ মাধবের মন্দির আছে। লোকপ্রবাদানুসারে জানা যায়, এই মূর্ত্তি বহুকাল পূর্ব্বে যশঃপাল রাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিটী নিম কাষ্ঠে নির্ম্মিত, নীলবর্ণে চিত্রিত, সাধারণত, উহা "মাধব" নামে পরিচিত। অদ্যাপি রথযাত্রার সময় ধামরাইমাধব বাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ শেষ পালরাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া গাজীবংশ ভাওয়ালে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কায়মাম সাহেবের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষে বাহাদুর গাজী নিঃসন্তান হওয়ায় তাহার ভ্রাতা মাতাব গাজী ভাওয়ালের জমিদারী প্রাপ্ত হয়। মানসিংহ যখন ঈশা খা মসনদআলীকে দমন জন্য বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎসময় মাতাব গাজী ও তাহার পুত্র ফজল গাজী বর্ত্তমান ছিলেন।

ইতিহাসে ফজলগাজী সম্বন্ধে অধিক কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইমাত্র জানা যায় যে, বাঙ্গলাদেশে বার ভুঞা একত্রিত হইবার সময় ফজলগাজী তৎ সহ যোগদান করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু বাদসাহের প্রতিকূলে কোন যুদ্ধোদ্যোগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীতি হয় না। ইঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরদিগের নিকট এখনও কয়েক খানি প্রাচীন দলিল আছে, কিন্তু সেগুলি কতদূর সত্য, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। প্রথম দলিল দৌলত গাজী সম্বন্ধে, সাহসুজা উক্ত গাজীকে ভাওয়ালের জমিদার স্বীকার করিয়া তৎপ্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা ইসলাম খানের প্রতি আদেশ পত্র প্রচার করেন। দ্বিতীয় দলিল ভাওয়ালের রাজস্ব সম্বন্ধে, ঐ পরগণার তৎসময়ের রাজস্ব ৪৮৭০০টাকা ধার্য্য হয়।

ঔরঙ্গজীব বাদসাহের রাজত্বকালে যে প্রবল অরাজকতায় দেশ উচ্ছিন্ন যাইতে বসিয়াছিল, তৎসময় গাজীবংশধরেরাও বর্ম্মিরূপ ব্যসনে নিমগ্ন হইয়া আপনাদের অধঃপাতের পন্থাবলম্বন করিয়াছিলেন।

দৌলত গাজী রাজস্ব প্রদানে বিরত হওয়ায়, ঢাকার নবাব তাঁহার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করেন। তৎপর দৌলত মুর্শিদাবাদ নিজামৎ আদালতে আপিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভাওয়ালের বর্ত্তমান রাজবংশীয় পূর্ব্বপুরুষ কুশধ্বজ রায় তাঁহার উকিল বা মোক্তার হইয়া যথেষ্ট আয়াস স্বীকারে মোকদ্দমা চালাইয়া গাজীর পক্ষে জয়লাভ করিয়াছিলেন। গাজী এজন্য যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া কুশধ্বজ রায়কে আপন জমিদারীর প্রধান নায়েবী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ভাওয়াল লইয়া আইসেন। গাছার জমিদারবংশের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সময়ে গাজীদের অধীনে জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত হন।

কিছু দিন পরে কুশধ্বজ রায়ের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বলরাম রায় (অপর নাম জানকীনাথ রায়) গাজীদের দেওয়ান হইলেন। বলরাম রায় ও গাছার ঘোষ মহাশয়, খরচ সেরেস্তার মোহরের পালাসনার রায় মহাশয় একত্রিত হইয়া, অকর্ম্মণ্য ও ব্যসনাশক্ত গাজীগণের পরিবর্ত্তে ক্রমে জমিদারি আপন আপন নামে চালাইতে আরম্ভ করিলেন। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-বিরহিত কর্ম্মচারীগণই পরে ভাওয়ালের জমিদার বলিয়া পরিচিত হইল। ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে সুলতান গাজী লর্ড কর্ণওয়ালিশের নিকট বিষয় পুনরোদ্ধার জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে গাজী বংশধরেরা নিকটবর্ত্তী মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট কৃপা-প্রার্থী হইয়া অতি দীনভাবে বাস করিতেছেন। চৌরায় এখনও পালোয়ান সাহ ও কায়ম্বর খাঁ সাহেবের কবর দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত সমাধির নিকট এখনও একটী ধ্বংসমুখে পতিত প্রাচীন মসজিদ বর্ত্তমান আছে। তন্নিকট একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে। মসজিদের এক মাইল পশ্চিমে আর একটী সমাধি-মন্দির আছে, উহা প্রাচীর বেষ্টিত। কোশাখালী নামে আর একটী শুষ্ক সরিৎ আছে, উহাতে যুদ্ধ-তরী সকল থাকিত। লক্ষীয়ার সন্নিহিত আধুনিক বালিগার নিকট মাতাব গাজীর পিতা বাহাদুর গাজী নির্ম্মিত একটী সুন্দর মসজিদ ছিল। উহা পতিত হওয়ায় তৎসংলগ্ন প্রস্তরলিপি অতি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। গাজীদিগের অধীনে বহু তালুকদার ছিল। ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু নিষ্কর ভূমি আছে। গাজীবংশের বিবরণ আর অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান জমিদারগণের সহিত আমাদের এই প্রবন্ধের আর কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব তৎবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক। শ্রীআনন্দনাথ রায়।

ভুল কোকিলেশ্বর বাবুরই।

গত শ্রাবণ মাসের "নব্যভারতে" কোকিলেশ্বর বাবু আমাদের প্রতিবাদের "ভুল কাহার?" এই নাম দিয়া যে উত্তর দিয়াছেন, তাঁহার ভূমিকা ও অন্যান্য স্থান পড়িয়া প্রথমেই একটী কথা অপ্রতিহত প্রভাবে আমাদের মনে আসিয়া পড়িল। কথাটী এই:—নিজের চক্ষে একটী বৃহৎ কাষ্ঠ-খণ্ড দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু অপরের চক্ষে একটী সামান্য ধূলিকণাও দেখিতে পাইতেছ। (কথাটী ঠিক কি মনে নাই, ঐ

ধরণের বটে।) কোকিলেশ্বর বাবু অনুযোগ করিতেছেন, আমরা উঁহাকে "রূঢ় কথা" বলিয়াছি, উঁহার উপর "বিষ-দিগ্ধ বাক্যবাণ প্রয়োগ" করিয়াছি, ইত্যাদি। আমরা ত এ অনুযোগের কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। আমরা কোন "রূঢ় কথা" ব্যবহার করি নাই; কোন "বিষ-দিগ্ধ বাক্যবাণ"ও প্রয়োগ করি নাই। তবে বোধ হয়, কোকিলেশ্বর বাবুর আত্মাভিমানে আঘাত পড়িয়াছে। আমরা তাঁর লেখার—তাঁর কতকগুলি উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছি, ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছি এবং আবার করিতে বাধ্য হইয়াছি। সত্যের অনুরোধে এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইয়াছি, "কোকিলেশ্বর বাবু এ আপত্তিটী বুঝেন না বা তাঁর লেখায় কোথাও গলদ আছে," "তাঁর এ ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট ও কুজ্মটিকাপূর্ণ"; "তাঁর এ আপত্তিটী অকিঞ্চিৎকর; "তাঁর ও আপত্তিটী আবদার মাত্র।" এই, এর বেশী কিছু বলি না। এ সব কথা যদি "বিষ-দিগ্ধ বাক্যবাণ" হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। কোকিলেশ্বর বাবুর এত "ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা" গেলে চলিবে কেন? কাহারও আপত্তিকে সত্যের অনুরোধে "অকিঞ্চিৎকর" বা "আবদার মাত্র" বলিলে যদি "বিষ-দিগ্ধ" বাক্যবাণ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ত আর আলোচনা—তর্ক বিতর্ক চলে না। আর ইহাও বলি, আমরা আবার যখন দেখিয়াছি, কোন বিষয়টী (একটী আপত্তি) কোকিলেশ্বর বাবু ঠিক বুঝিয়াছেন, তখন খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছি। আর আমাদের প্রতিবাদের গোড়াতেই তাঁকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন মনে রাখেন যে, আমরা তাঁর ভ্রান্ত মতগুলির প্রতিবাদ করিলেও আমরা তাঁকে যেমন পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় স্বদেশবাসী ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতাম, পরেও ঠিক তেমনি করিব। পাঠক মহাশয় এখন দেখুন, কোকিলেশ্বর বাবু কিরূপ "সংযত" ভাবে উত্তর দিয়াছেন, আর পূর্ব্বোক্ত কথাটী আপনা আপনি মনে আসিয়া পড়ে কি না। আমরা লিখিয়াছিলাম, কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর প্রথম আপত্তিটী তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন নাই বা তাঁর লেখায় কোথাও গলদ আছে। খালি বুঝেন নাই বলিয়াছি,—খালি বলিয়াছি হয় ত লেখায় গলদ আছে—এই অপরাধ। তিনি যে আপত্তিটী বুঝিয়াছেন, তার প্রমাণ না দিয়া প্রতিশোধ স্বরূপ বলিতেছেন, আমরা "পাণ্ডিত্যের বৃথা আস্ফালন করিয়া স্পর্দ্ধা" করিয়াছি। এ কিরূপ "সংযত" উত্তর—কিরূপ সহৃদয়তা, তাহা পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিবেন। আর এক স্থানে লিখিয়াছেন "শশি বাবু বিজ্ঞের ন্যায়।" ইহার অর্থটা হইতেছে শশি বাবু একটী মূর্খ। তা তিনি শতবার আমাদিগকে মূর্খ বলুন, তাতে ক্ষতি নাই—এ কথা লিখিবার আমাদের উদ্দেশ্য খালি তাঁর "সংযত" লেখনীর পরিচয় দেওয়া। পাঠক, কোকিলেশ্বর বাবুর সংযত লেখনীর আর একটু পরিচয় পাইলে আপনি লজ্জিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না—হয় ত কর্ণে অঙ্গুলি দিবেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন "শশি বাবু যে সংখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ্য-প্রণালী তিনি বুঝেন নাই বা ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝিয়াছেন।" "বুঝেন নাই" একথা বলুন;—তাঁর যদি তাহাই ধারণা (আমরা পরে দেখাইব তাঁর এরূপ ধারণা ভ্রান্তি ধারণা) হইয়া থাকে,

তিনি বলিতে পারেন। কিন্তু পাঠক মহাশয় আপনিই বিবেচনা করুন, সে লেখনী কিরূপ "সংযত", যে লেখনী বিনা কারণে অপরের সম্বন্ধে লিখিতে পারে যে,ঐ অপর ব্যক্তি হয়ত ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝিয়াছেন। কোকিলেশ্বর বাবু কি জানেন না, বিনা কারণে অপরের সম্বন্ধে এরূপ ভাবাও নিতান্ত অন্যায় ও অধর্ম্মের কাজ? আমরা আশা করি, কোকিলেশ্বর বাবুর বিবেক (Conscience) তাঁকে ক্ষমা করিবে। আর আমাদের প্রার্থনা আমাদের লেখনী যেন কখন কোকিলেশ্বর বাবুর ন্যায় "সংযত" না হয়।

যাহা হউক, এখন আসল বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। কোকিলেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ভুল কাহার?" তাই আমরা দুঃখের সহিত দেখাইতে বাধ্য হইতেছি যে, তিনি যে উত্তর দিয়াছেন—তাহাতে এবং তাঁহার প্রবন্ধের ২৩ সংখ্যায় তিনি যে অভিব্যক্তিবাদ (Evolution theory) কিছু বুঝেন না, তাহা প্রতি পদে পদে প্রকাশিত করিয়াছেন; এক এক স্থানে আমাদের লেখার দরুণই হউক বা অন্য কারণেই হউক সুর বদলাইয়াছেন; কোন কোন স্থলে এক স্থানে যা বলিয়াছেন, তার সঙ্গে অন্য স্থানে যা বলিয়াছেন, তার সঙ্গতি নাই; আর অনেক স্থলেই অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য বৃথা বাক্যজাল বিস্তার করিয়াছেন। আমরা আরও দেখাইব যে, তিনি যে বলিয়াছেন, আমরা তাঁর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝি নাই, এ কথা নিতান্তই অমূলক।

এস্থলে অগ্রে কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর প্রবন্ধের যে সংখ্যায় জীবজগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন, তাঁর নিজের কথায় সেই সংখ্যার একটী চুম্বক দেওয়া আবশ্যক। ২৩ সংখ্যার প্রারম্ভেই জীবজগতে নানাবিধ শ্রেণী ও জাতির কথা বলিয়া কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন, "এই শ্রেণী-বিভাগের কারণ কি? এত প্রকার ভেদ কি রূপে হইল? এই বিভেদের মূলে কি ঈশ্বরেচ্ছা বর্ত্তমান অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক নিয়মে একটী মাত্র প্রাণী জাতি হইতে এই বিশাল ও বহু জাতীয় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে?" তারপর "বিবর্ত্তবাদ (Evolution theory) কিরূপে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে" তাহা কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর সাধ্যানুসারে দেখাইয়াছেন। তারপর বলিতেছেন, "বিবর্ত্তবাদের যুক্তি ও উত্তর আমরা প্রধানতঃ দেখিলাম। কিন্তু বিবর্ত্তবাদের যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। এখানে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী প্রধান আপত্তির উল্লেখ করিতেছি। মনুষ্য যত্ন দ্বারা যে পরিবর্ত্তিত নূতন প্রাণী অভ্যুদিত করান যায়, তাহা এবং প্রাকৃতিক অনুকূলতায় যে নূতন প্রাণী অভ্যুদিত হয়, তাহা, এতদুভয়ের ফলে বিশেষ পার্থক্য আছে। অপেক্ষাকৃত বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদ্বয়কে একত্র করিয়া দিলে সেই সংযোগফলে যে সন্তান জন্মে, ঐ সন্তানদিগের আর সন্তান উৎপাদন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু প্রাকৃতিক অনুকূলতায় যে নূতন জাতীয় জীব অভ্যুদিত হয়, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সংযোগে ঐ প্রকারের সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, দেখা যায়। কেন এরূপ হয়, বিবর্ত্তবাদ ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। কোন কোন অসভ্য বর্ব্বর জাতিতে এরূপ কোন হাড় বা পেশী আদি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা উহাদের

কোন প্রকার ব্যবহার বা প্রয়োজনে আসে না। সুতরাং উহারা যে প্রাকৃতিক অনুকূলতায় স্থায়ী জীবে পরিণত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। তারপর একই দম্পতীর পাঁচটী সন্তানের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দুইটী মাত্র সন্তানের কেন এরূপ অঙ্গবৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল, বিবর্ত্তবাদ একথার উত্তর দিতে কিছুতেই সক্ষম নহে। আর যদি বিবর্ত্তবাদ মতে আদিতে একটী মাত্র জাতিরই সৃষ্টি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই জাতিই বা কি কারণে জন্মিয়াছিল, তাহার উত্তর পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে দৃঢ়তা সহকারে ইহাই বলা সঙ্গত হইয়া পড়ে যে, প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি ব্যাপারে পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সঙ্কল্পের আবশ্যকতা হইয়াছিল। নিতান্ত বিভিন্ন এক জাতিকে অন্য এক নিতান্ত ভিন্ন জাতিতে কদাপি পরিবর্ত্তন করা যায় না বলিয়াও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, বিভিন্নতার এক মাত্র কারণ—পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প। জড় রাজ্যেও একথা বিলক্ষণ খাটে। * * * * প্রত্যেক নাম ও রূপ (species and individuals) পরমেশ্বরের সঙ্কল্প বলে অভ্যুদিত হইয়াছে ইহাই বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত।"

এখন আমরা দেখিব, কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে কি ভুল করিয়াছেন ও আমাদের প্রতিবাদের কি উত্তর দিয়াছেন।

অভিব্যক্তি বাদের বিরুদ্ধে কোকিলেশ্বর বাবুর প্রথম আপত্তি।

আমাদের প্রতিবাদ প্রবন্ধে কোকিলেশ্বর বাবুর উক্ত প্রথম আপত্তি খণ্ডন কালে আমরা বলিয়াছিলাম যে, তিনি নিজেই তাঁর আপত্তিটী বুঝিতে পারেন নাই, অথবা তাঁর লেখায় কোথাও গলদ আছে। আমরা খুব সংযত ভাবেই এই কথা বলিয়াছিলাম। পাঠক মহাশয় উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখিবেন, তিনি বলিতেছেন "অপেক্ষাকৃত বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদ্বয়কে একত্র করিয়া দিলে সেই সংযোগ ফলে যে সন্তান জন্মে, ঐ সন্তানদিগের আর সন্তান উৎপাদন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু প্রাকৃতিক অনুকূলতায় যে নূতন জাতীয় জীব অভ্যুদিত হয়, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সংযোগে ঐ প্রকার সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে দেখা যায়।" এ কথাগুলির যে কি অর্থ তাহা কোকিলেশ্বর বাবুই বুঝেন। আমরা বিশ বার পড়িয়াও উহাদের সঙ্গত অর্থ করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। পাঠক মহাশয় এখানে স্মরণ রাখিবেন কোকিলেশ্বর বাবু এখানে মানবীয় নির্ব্বাচন (artificial selecion) ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ("প্রাকৃতিক অনুকূলতার," —কোকিলেশ্বর বাবু natural selectionএর উক্ত বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন) ফলে পার্থক্য দেখাইতেছেন। উপরি উদ্ধৃত দুইটী লাইনের প্রথম লাইনটীর ("অপেক্ষাকৃত বিভিন্ন ....দেখা যায় না") যদি কোন অর্থ থাকে ত এই অর্থ যে অশ্ব ও গর্দ্দভ এই প্রকারের দুই অপেক্ষাকৃত বিভিন্ন জাতির সংযোগফলে যে অশ্বতর অশ্বতরীবৎ সন্তান জন্মে, সেই অশ্বতর অশ্বতরীবৎ সন্তানদিগের আর সন্তান উৎপাদন হইতে দেখা যায় না। ভাল; কথাটী সত্য। কিন্তু কোকিলেশ্বর বাবুর ধারণা এই যে এইটী মানবীয় নির্ব্বাচনের ফল, কেন না, তাহা না হইলে তিনি

অব্যবহিত পরের লাইনে "কিন্তু প্রাকৃতিক অনুকূলতায় যে নূতন জাতীয় জীব...” একথা বলিবেন কেন। বস্তুতঃ কিন্তু অশ্ব ও গর্দ্দভের সংযোগ দ্বারা বংশবিস্তারে অক্ষম অশ্বতর অশ্বতরী উৎপাদন করাকে মানবীয়-নির্ব্বাচন (artificial selection) বলে না*। তারপর কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন "কিন্তু প্রাকৃতিক অনুকূলতায় যে নূতন জীব অভ্যুদিত হয়, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সংযোগে ঐ প্রকারের সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে।” কি প্রকারের সন্তান? যদি ধরা যায় যে, এখানে অশ্বতর অশ্বতরীর মত বংশবিস্তারে অক্ষম এই প্রকারের সন্তান কোকিলেশ্বর বাবুর মনোগত ভাব, তাহা হইলে মানবীয় নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলের পার্থক্য দেখান হইল কই; আর যদি ধরা যায়, বংশ-বিস্তারে সক্ষম (fertile offspring) এই প্রকারের সন্তান তাঁর মনোগত ভাব, তাহা হইলে বাস্তবিক যা প্রকৃত তথ্য (fact)—অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনোদ্ভূত জাতিরা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বংশবিস্তার-ক্ষম সন্তান উৎপাদনে সাধারণতঃ অক্ষম—তাহার সহিত সঙ্গতি হয় না। আপত্তিটী লিখিতে গিয়া যিনি এইরূপ ছাই ভস্ম লিখিতে পারেন, তিনি যখন এইরূপ লিখিয়াছিলেন, তখন যে আপত্তিটী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? আমরা এ কথাটী সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এখনও বলিতেছি। আর শতবার বলিব, যতক্ষণ না কোকিলেশ্বর বাবু সহৃদয়তার সহিত নিজের ভুল স্বীকার করেন। পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ করি-তেছি, তিনি বিচার করিয়া দেখুন, আমরা ও কথা বলিতে পারি কি না। (আপত্তিটী বাস্তবিক দুর্বোধ্য, আমরা আমাদের প্রতি-বাদ প্রবন্ধে আপত্তিটী বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া সে স্থানটীও দেখিবেন।) কোকিলেশ্বর বাবুর কি দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল না যে, তাঁর উক্ত কথাগুলি ঠিক লেখা হই-য়াছে? তাহা না করিয়া বলিলেন কি না

* কোকিলেশ্বর বাবু আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের প্রথমেই শিক্ষণীয় একটী তত্ত্ব সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এক বিষম গোলে পড়িয়াছেন। সাধারণতঃ লোকে যাকে মানবীয় নির্ব্বাচন(artificial selection) বলে,ডারউইন এবং অন্যান্য সকল জীবন বিজ্ঞানবিদ যাকে মানবীয় নির্ব্বাচন বলেন, তাহা এইরূপ:—মনে করুন এক গোলা পায়রার ঝাঁক থেকে এমন দুইটী (একটী পুরুষ, একটী স্ত্রী) গোলা নির্ব্বাচন করা গেল, যাদের গলা ওরি মধ্যে একটু স্ফীত গোচের। উহাদের সংযোগ সাধন করা হইল। এখন উহাদের সংযোগ ফলে যে সন্তান সন্ততি জন্মিবে, তাহাদের সকলেরই গলা কম বেশী একটু স্ফীত হইবে। এখন আবার এই একটু গলাফোলা সন্তান সন্ততিদের মধ্য হইতে এমন দুইটী (একটী পুরুষ, একটী স্ত্রী) বাছিয়া লওয়া গেল, যাদের গলা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে স্ফীত। এইরূপে বংশের পর বংশ ধরিয়া নির্ব্বাচন করিলে,—গলার স্ফীতত্য এইরূপে বংশপরম্পরায় পুঞ্জীকৃত করিলে, শেষে যে সন্তান সন্ততি জন্মিবে,তাহাদিগের গলা বিলক্ষণফোলা হইবে। এখন তাহাদিগকে গলা ফোলা (pouter) অন্তর্জ্জাতি (Variety) নাম দেওয়া হইবে। গোলা পায়রা (rock pigeon) হইতে এইরূপ গলাফোলা পায়রা উৎপাদন করাকে মানবীয়-নির্ব্বাচন বলে। মানবীয় নির্ব্বাচনের সহিত যখন লোকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের তুলনা করেন, তখন তাঁহাদের মনোগত ভাব ঐরূপ নির্ব্বাচন। অশ্ব ও গর্দ্দভের ন্যায় দুই বিভিন্ন জাতি হইতে অশ্বতরের ন্যায় (Sterile) সন্তান উৎপাদন করাকে মানবীয় নির্ব্বাচন (artificial Selection বলে না। অথচ কোকিলেশ্বর বাবু উদ্ধৃত অংশে তাহাই মনে করিয়াছেন।

আমরা "পাণ্ডিত্যের বৃথা আস্ফালন করিয়া স্পর্দ্ধা" করিয়াছি ! ইহা যে কিরূপ আলোচনা পদ্ধতি তাহা কোকিলেশ্বর বাবুই জানেন। ভুল কাহার ? সাধে কি আমরা সাধারণ ভাবে বলিয়াছিলাম যে, ইহা বড় পরিতাপের বিষয় যে, এ দেশে যিনি অভিব্যক্তিবাদের (evolution theoryর,) ক খ ও জানেননা, তিনি অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়া সেই আপত্তির উপর এক অনুমান সংস্থাপন করিতে যান ? আরও দুঃখের বিষয় যে, ভুল দেখাইয়া দিলে আবার উল্‌টে গালাগালি !

প্রথম আপত্তিটীর মূলকথা হইতেছে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে যে জাতি উদ্ভূত হয় (অর্থাৎ ডারউইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হয়) আর মানবীয় নির্ব্বাচনের ফলে যে জাতি উদ্ভূত হয়, এরূপ জাতিদ্বয়ের মধ্যে কোন কোন স্থলে একটী সামান্য বিষয়ে একটী পার্থক্য দেখা যায় ; অতএব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও মানবীয় নির্ব্বাচনের প্রণালী এক রকমের হইতে পারে না। পার্থক্য কোথায় ? জননশীলতা সম্বন্ধে। কোন কোন স্থলে,—কোন কোন স্থলে কেন, অনেক স্থলে যে এ পার্থক্যটুকু আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি নাই। আমরা খালি বলিতে চাই ও বলিয়াছি যে, যেমন রাম, হরি, লক্ষ্মীর মধ্যে জননশীলতা (fertility) সম্বন্ধে পার্থক্য (রামের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা আছে, হরির নাই, লক্ষ্মীর গর্ভে গদাধরের ঔরসে সন্তান জন্মে নাই যদিও গদাধর জননশীল—potent ছিলেন, কিন্তু শ্যামের ঔরসে লক্ষ্মীর গর্ভে সন্তান হইল)—এরূপ পার্থক্য সত্ত্বেও ইহাদের নিজেদের (রাম, হরি, লক্ষ্মীর) জন্মগ্রহণ-প্রণালী এক প্রকারের হইবার বাধা নাই (বাস্তবিকও এক প্রকারের), সেইরূপ মানবীয় নির্ব্বাচনোদ্ভূত জাতি আর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনোদ্ভূত জাতির মধ্যে জননশীলতা সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও, ঐ দুই জাতির জন্মপ্রণালী—ঐ দুই জাতির উৎপত্তির প্রণালী মূলে এক প্রকারের হইবার বাধা নাই।*

আর আর সব বিষয়ে মানবীয় নির্ব্বাচনোদ্ভূত জাতি ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনোদ্ভূত জাতির মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে, কেবল উক্ত সামান্য বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। আমরা দেখাইয়াছি, কোন কোন স্থলে এ সামান্য বিষয়েও পার্থক্য নাই। কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর উত্তরে তাহা অস্বীকার করেন না। তবেই এরূপ স্থলসকলে যে কোকিলেশ্বর বাবুর প্রথম আপত্তির মূল্য নাই, তাহা স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। অন্যান্য অনেক স্থলে যেখানে পূর্ব্বোক্ত পার্থক্য বর্ত্তমান আছে, সেখানেও যে আপত্তিটীর মূল্য নাই, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি, এ পার্থক্য কিরূপে, কি কারণে

* কথাটী আরও একটু বিশদ করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি। রামের সন্তান উৎপাদনে ক্ষমতা আছে, হরির সে ক্ষমতা নাই। জননশীলতা (fertility) সম্বন্ধে রাম ও হরির মধ্যে এই পার্থক্য আছে বলিয়াই—কেবল এই জন্যই যেমন কেহ বলিতে পারেন না যে, রাম নিজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এক প্রকারে আর হরি নিজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অন্য প্রকারে,—বলিতে পারেন না যে রাম পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে জন্মিয়াছে আর হরি অন্য কোন প্রকারে জন্মিয়াছে, সেইরূপ মানবীয়-নির্ব্বাচনোদ্ভূত জাতি ও প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনোদ্ভূত জাতির মধ্যে কেবল জননশীলতা সম্বন্ধে একটু পার্থক্য আছে বলিয়াই কেহ বলিতে পারেন না যে, উক্ত দুই জাতির উৎপত্তির প্রণালী মূলে এক প্রকারের হইতে পারে না।

সম্ভবতঃ সমুদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের উল্লিখিত কারণগুলি কোকিলেশ্বর বাবু অস্বীকার করেন না। তিনি তবুও বলিতেছেন, তাঁর আপত্তির খণ্ডন হইল না। আমাদের উল্লিখিত কারণগুলি যদি তিনি অস্বীকারই করিলেন না,তবে আর তাঁর আপত্তির খণ্ডন হইল না কি প্রকারে? কোকিলেশ্বর বাবু বোধ হয় এখানে একটী ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তাই তিনি ওরূপ মনে করিতেছেন। কোকিলেশ্বর বাবু বোধ হয়, মনে করেন যে, দুইটী কার্য্যপ্রণালী—যাহারা অপরাপর সব বিষয়ে মিলে—তাহাদের ফলে কোন একটী বিষয়ে একটু পার্থক্য দেখাইতে পারিলেই ঐ দুইটি কার্য্যপ্রণালীর মূলগত সৌসাদৃশ্যের সম্ভাবনা বিনষ্ট করা হইল। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। ফলে কোন বিষয়ে একটু আধটু তফাৎ থাকিলেও মূল প্রণালীদ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিবার বাধা নাই। এই মনে করুন, রাম ও শ্যাম দুইটী শিশু সন্তান। দুয়েরই বয়স তিন মাস। তিন মাসের শিশু সাধারণতঃ দেখিতে যেরূপ হয়, রাম সেই প্রকার দেখিতে। শ্যামকে দেখিলে মনে হয়, যেন ৮০ বৎসরের এক বৃদ্ধ শিশুর আকার গ্রহণ করিয়াছে; মনে হয়, বুঝি বা নারায়ণ আবার শ্যামরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন;—শ্যাম দেখিতে এমনিই বুড়ুটে গোচের। অন্যান্য সব বিষয়ে—হাত, পা, নাক, কাণ, পান, ভোজন ইত্যাদি বিষয়ে—রামে ও শ্যামে কোন তফাৎ নাই। শ্যাম খালি দেখিতে বুড়ুটে গোচের। এখন কেহ বলিতে পারেন যে, শ্যামের জন্মপ্রণালী রামের জন্মপ্রণালীর মত হইতে পারে না। কেন পারে না? তখন আপত্তিকারী বলিবেন, "পারে না এই জন্য যে, শ্যাম দেখিতে নেহাতই বুড়ুটে গোচের; রাম ও শ্যাম দেখিতে বড় ভিন্ন; সুতরাং উঁহাদের জন্মপ্রণালী একরূপ হইতে পারে না।" এখন যদি দেখান যায় যে, পিতার উপদংশ রোগ থাকিলে সন্তান ঐরূপ বুড়ুটে গোচের হয়, তাহা হইলে আর আপত্তিকারীর ঐ আপত্তিটী দাঁড়াইতে পারে না;—তখন আর তিনি বলিতে পারেন না যে, ঐ আপত্তির জন্য রামের জন্মপ্রণালী ও শ্যামের জন্মপ্রণালী মূলে এক হইতে পারে না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও মানবীয় নির্ব্বাচনের প্রণালী সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঐ দুই নির্ব্বাচনের ফলে কোন কোন স্থলে (সব স্থলে নয়) একটী সামান্য বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু সে পার্থক্যের এরূপ সব কারণও (সময়ের বিভিন্নতা, মাল মসলার বিভিন্নতা প্রভৃতি) আমরা দেখাইয়াছি যে সব কারণ প্রণালীদ্বয়ের মধ্যে মূলগত সৌসাদৃশ্য সত্ত্বেও ফলে উক্ত পার্থক্য আনয়ন করিতে পারে; যেমন উপদংশ রোগ রামের ও শ্যামের জন্মপ্রণালী মধ্যে মূলগত সৌসাদৃশ্য সত্ত্বেও উক্ত দুই শিশুর মধ্যে আকারগত পার্থক্য আনয়ন করিতে পারে। কোকিলেশ্বর বাবু ঐ সকল কারণ অস্বীকার করেন না। তবে আর আপত্তি খণ্ডন হইল না কি প্রকারে?

পাঠক মহাশয় পূর্ব্বোদ্ধৃত চুম্বক হইতে দেখিবেন, কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর প্রথম আপত্তিটী বিবর্ত্তবাদের(evolution theoryর) বিরুদ্ধে আপত্তিস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। গত শ্রাবণ মাসের "নব্যভারতে" যা উত্তর লিখিয়াছেন, তাহাতে কিন্তু আমাদের প্রতিবাদের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক কোকিলেশ্বর বাবু সুর বদলাইয়াছেন।

এবার বলিতেছেন "এই আপত্তি দ্বারা এই টুকু দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ও যৌন বা মানবীয় নির্ব্বাচনের কতকগুলি দৃষ্টান্ত পাইলেই যে অভিব্যক্তিবাদের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহা নহে।" কি সঙ্গতি! ভুল কাহার? প্রথমে অতি স্পষ্টরূপেই আপত্তিটী অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে খাড়া করিলেন আর এবার সুর বদলাইয়া বলিতেছেন কি না, তাঁর উদ্দেশ্য অন্য রকম ছিল। তাঁর এ গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা কোথাও কিছু বলিলেন না, পাঠক কি জান হইবেন যে হাতগুণে তাঁর গুপ্ত উদ্দেশ্য বুঝিবেন? যা'ক্, সে কথা যা'ক্। তাঁর নূতন গুপ্ত উদ্দেশ্যটী যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে উদ্দেশ্যটীকে একটী অদ্ভুত উদ্দেশ্য মনে হয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্ত দ্বারা যে অভিব্যক্তিবাদের বিশেষ সাহায্য হয় না, ইহা এক অদ্ভুত তত্ত্ব। বিশেষ সাহায্য হইবারই কথা ও হইয়াছে। এ কথা, যিনি অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাস কিছুমাত্র অবগত আছেন, তিনিই জানেন। প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে এই ভয়ে এ সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিলাম না।

যাহা হউক, কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর প্রথম আপত্তিটি অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধেই খাড়া করুন (যা পূর্ব্বে করিয়াছিলেন) আর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদের বিরুদ্ধেই খাড়া করুন (যা সুর বদলাইয়া এবার করিয়াছেন) আপত্তিটী প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণে বাধক স্বরূপ দাঁড়াইতে পারে না। আমরা আমাদের প্রতিবাদ-প্রবন্ধে এ কথা বিস্তারিতরূপে বলিয়াছি আর এবারও ঠিক তাহাই বলিতেছি।

কোকিলেশ্বর বাবু অবশেষে তাঁর এ আপত্তিটী সমর্থনের জন্য কোন ইংরাজী লেখকের দুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ স্থলে উক্ত লেখকের নাম দেওয়া কি কোকিলেশ্বর বাবুর উচিত ছিল না? কেন নাম দিতে এত ভয় কেন?

তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি।

কোকিলেশ্বর বাবুর দ্বিতীয় আপত্তিটী পাঠক মহাশয় উপরি উদ্ধৃত চুম্বক হইতে দেখিবেন। তিনি বলিতেছেন;—

"কোন কোন অসভ্য বর্ব্বর জাতিতে এরূপ কোন হাড় বা পেশী আদি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা উঁহাদের কোন প্রকার ব্যবহারে বা প্রয়োজনে আইসে না। সুতরাং উঁহারা যে প্রাকৃতিক অনুকূলতায় স্থায়ী জীবে পরিণত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না।"

আমরা আমাদের প্রতিবাদে স্পষ্টাক্ষরে লিখিলাম, অসভ্য বর্ব্বর জাতিতে এরূপ কোন অপ্রয়োজনীয় "হাড় বা পেশী"ই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা সভ্য জাতিতে নাই। কোকিলেশ্বর বাবু অসভ্য জাতিতে বদ্ধ এবং অপ্রয়োজনীয় যেরূপ হাড় বা পেশীর কথা বলিতেছেন, সেরূপ হাড় বা পেশীর অস্তিত্বই নাই।* পাঠক মহাশয় আপনিই বলুন, এরূপ লেখা থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যায়। এরূপ লেখা দেখিয়াই আমরা বলিয়াছিলাম,

* কোকিলেশ্বর বাবু যদি বলেন, "অসভ্য জাতিতে বদ্ধ" এ কথা তিনি বলেন না,—তিনি যদি বলেন, "যেরূপ হাড় বা পেশীর কথা আমি বলিয়াছি, সেরূপ হাড় বা পেশী যে অসভ্যজাতিতেই বদ্ধ, তাহা নহে, তাহা অসভ্য জাতিতেও আছে আর সভ্য জাতিতেও আছে, তবে কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে তাহাদের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই—যদিও সভ্য জাতির মধ্যে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে"—যদি এই কথা বলেন, তাহা হইলেও আমরা বলিব, একপ হাড় বা পেশীর অস্তিত্বই নাই।

কোকিলেশ্বর বাবুর এ সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট, অপরিষ্কার ও কুজ্ঝটিকাপূর্ণ। বলিয়াছিলাম, যখন এরূপ লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁর মনে সত্য মিথ্যার খিচুড়ী হইয়াছিল। অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি লিখিতে গিয়া যিনি আপত্তিটীকে এরূপ হাড় বা পেশীর উপর খাড়া করেন, যাদের অস্তিত্বই নাই, তাঁর ধারণাকে আমরা 'অস্পষ্ট, অপরিষ্কার ও অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা পূর্ণ' বলিয়াছিলাম, ইংলণ্ড কি জার্ম্মনি হইলে তাঁর অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে উক্তি সকল লোকে দূরে নিক্ষেপ করিতেন। তাঁরা বলিতেন, ইনি অভিব্যক্তিবাদের ক, খ, জানেন না, ইনি অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি খাড়া করিতে গিয়াছেন। যাহা হউক, কোকিলেশ্বর বাবুর কি উচিত ছিল না, এ সম্বন্ধে তাঁর ভ্রমটী স্বীকার করা? ভ্রমটী স্বীকার না করিয়া তিনি কি পাঠকের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিয়াছেন? কোন্ সহৃদয় লেখক তাহা না করিতেন? ভ্রম স্বীকার করা দূরে থাকুক, উল্‌টে স্কুল বয়ের প্রতিশোধ তোলার স্বরূপ বলিয়াছেন, উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই "অস্পষ্ট, অপরিষ্কার ও নিতান্ত কুজ্ঝটিকা পূর্ণ"।*

যাক্ এবার আবার সুর বদলাইয়া কোকিলেশ্বর বাবু কি বলিতেছেন, শুনুন। "এখন দ্বিতীয় আপত্তিটী সম্বন্ধে শশি বাবুর কথাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রশ্ন এই যে, অত্যন্ত অসভ্য মানুষের মস্তিষ্কাদীর গঠন প্রভৃতি, খুব সভ্য মানুষের মত অনেক স্থলে দেখা যায়;—অথচ ইহা স্থির যে, সুসভ্য মানুষকে যত বিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালন করিতে হয়, অসভ্যকে তাহার কিছুই করিতে হয় না। অতএব ঐরূপ মস্তিষ্কাদি যে প্রাকৃতিক কারণ সমূহের প্রয়োজনীয়তা (necessities of the environmets) বশতঃই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ইহা কি রূপে সম্ভব হয়? অতএব এস্থলেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্ত দ্বারা অভিব্যক্তিবাদ বিশেষ সাহায্য পাইতেছেন না। এ প্রশ্নটীর প্রথম প্রশ্নের ন্যায় উদ্দেশ্য না বুঝিয়া শশি বাবু আপত্তি তুলিয়াছেন যে, অপ্রয়োজনীয় কোনও পদার্থ জগতে নাই। আজ যাহা অপ্রয়োজনীয় মনে হইতেছে, দশ দিন পরে তাহার প্রয়োজনীয়তা পরিস্ফুট হইবে। আমাদের প্রশ্নটীর "দেখিতে পাওয়া যায়" এই বর্ত্তমান কালের বাক্যটীকে অতীত কালের বাক্য বুঝিয়া তিনি অযথা বহু বাক্য ব্যয় করিয়াছেন। এই প্রশ্নটী সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ধারণাই 'অত্যন্ত অস্পষ্ট, অপরিষ্কার ও নিতান্ত কুজ্ঝটিকা পূর্ণ, তাই তিনি অপরেরও তাহাই মনে করিয়াছেন।" আমরা কোকিলেশ্বর বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে তাঁর উত্তরটী সমুদয় উদ্ধৃত করিলাম, কারণ উত্তরটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আর তাঁর যুক্তিপ্রণালী, তাঁর সহৃদয়তা, তাঁর সংযতভাব অন্যত্রে কিরূপ, এই অংশটী তাহা নমুনা স্বরূপ প্রকাশ করিবে। দেখা যাউক, উত্তরটী কিরূপ; আমরা অংশটীর প্রত্যেক ছত্র বিচার করিয়া দেখিব। প্রথমেই পাঠক মহাশয় দেখিবেন,

* কোকিলেশ্বর বাবু যদি বলেন, যে উনি খালি হাড় ও পেশী বলেন নাই; উনি হাড় ও পেশী আদি বলিয়াছিলেন; তাহা হইলেও ওঁর অব্যাহতি নাই। যদি কেহ বলেন, রামের ঘর ইষ্টকাদিতে নির্ম্মিত, আর তার পর দেখা যায় যে, উক্ত ঘরে ইষ্টকেরই নাম গন্ধ নাই—ঘরটী ছিটেবেড়া ও গোলপাতার ঘর, তাহা হইলে তাঁর উক্তি কি রূপ বোধ হয়?

হাড় বা পেশী গিয়া এবার "মস্তিষ্কের গঠন প্রভৃতি" "প্রশ্ন" হইয়াছে। ভুল কাহার? কার ধারণা কুজ্‌ঝটিকা পূর্ণ? হাড় বা পেশী গিয়া মস্তিষ্কের গঠন প্রভৃতি এবার আসিল কেন? আচ্ছা, তাহাই আসুক। এখন দেখা যাউক, এই নব বেশে উত্থিত কোকিলেশ্বর বাবুর দ্বিতীয় আপত্তিটী কিরূপ জিনিস।* কোকিলেশ্বর বাবু বোধ হয় স্বীকার করিবেন, কোন মানুষ যদি দাঁড়াইতে চান, তবে তাঁর পা থাকা উচিত। কোকিলেশ্বর বাবু যে এই আপত্তিটী খাড়া করিয়াছেন,তা তার পা আছে কি না, আগে দেখা উচিত ছিল। এই আপত্তিটী খাড়া করিতে হইলে আপত্তিকারীর আগে দেখান উচিত যে, মস্তিষ্কের অমুক গঠনটী বা অমুক প্রকারের গঠনটী সুসভ্য মনুষ্যের নানা বিষয়িণী চিন্তার সহিত নিয়ত সংসৃষ্ট ;—যে, সেই গঠনটীর বা সেই প্রকারের গঠনটীর আর অন্য কোন কার্য্য নাই,—নানা বিষয়ে চিন্তাই তাহার কার্য্য ; তার পর দেখান উচিত যে, সেই গঠনটী বা সেই রূপ গঠনটী নানা বিষয়ে চিন্তা করে না, এরূপ অত্যন্ত অসভ্য জাতির মস্তিষ্কে আছে। কোকিলেশ্বর বাবু কিম্বা তিনি যাঁদের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া ঐ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের অগ্রে ঐ তিনটী বিষয় দেখান উচিত। শারীর-বিদ্যা ও শারীর-ক্রিয়া-বিদ্যা (Anatomy and Physiology) এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই ; তবে কোকিলেশ্বর বাবু বা তাঁর মত আপত্তিকারীরা যদি পারিয়া থাকেন ত তাহা স্বতন্ত্র কথা। যদি তাঁরা পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিষয় দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই বলিতে পারা যাইবে, তাঁহাদের আপত্তির পা আছে। এখন আমরা বলিতে বাধ্য যে, আপত্তিটী "উঠ্‌তে পারে না, কুট্‌নী করিতে যায়।"*

তার পর কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন—"এ প্রশ্নটীর প্রথম প্রশ্নের ন্যায় উদ্দেশ্য না বুঝিয়া শশি বাবু আপত্তি তুলিয়াছেন যে, অপ্রয়োজনীয় কোন পদার্থ জগতে নাই। আজ যাহা অপ্রয়োজনীয় মনে হইতেছে, দশ দিন পরে তাহার প্রয়োজনীয়তা পরিস্ফুট হইবে।" কোকিলেশ্বর বাবুর কোন

আর একটী কথা যেন আমরা মনে রাখি। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যে জগতের সমুদয় জাতিরই অভিব্যক্তির কারণ, তাহা ডারউইন কখন বলেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ন্যায় অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ আছে—যাহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহিত সমবেত হইয়া বা স্বতন্ত্র ভাবে কোন কোন জাতি সমুদ্ভূত করিয়াছে।

---

* মস্তিষ্কের কি কি গঠন ও কোন্ কোন্ 'অত্যন্ত অসভ্য" জাতি মনে করিয়া কোকিলেশ্বর বাবু আপত্তিটী খাড়া করিয়াছেন, তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট রূপে বলিতেন, তাহা হইলে সকলের পক্ষেই ভাল হইত। তাঁর authority বা authotities এর নাম উল্লেখ করাও বোধ হয় এস্থলে উচিত ছিল।

* এখানে কোকিলেশ্বর বাবুকে একটী বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত মনে করিতেছি। কোকিলেশ্বর বাবুর লেখা হইতে মনে হয়, তিনি "necessities of the environments" আর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এক মনে করিতেছেন। (পাঠক মহাশয় কোকিলেশ্বর বাবুর উপর উদ্ধৃত অংশটী দেখুন।) বাস্তবিক তাহা নহে। কোন একটী লক্ষণ বা গঠন necessities of the environment হইতে উদ্ভূত হইতে পারে,কিন্তু তাহা বলিয়াই যে তাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা উদ্ভূত বলিতে হইবে, তার কোন অর্থ নাই। আমরা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, কোন অকেযো অপ্রয়োজনীয় লক্ষণ উৎপাদনে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কোন হস্ত নাই।

শুপ্ত উদ্দেশ্য বুঝিবার আমাদের ক্ষমতা নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই ত তাঁর উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া লইতে হইবে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় আপত্তিটী স্পষ্টই অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়াছিলেন; আমরাও তাহাই বুঝিয়াছিলাম। এবার সুর বদলাইয়া বলিতেছেন, আপত্তিটী প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদের বিরুদ্ধে। আচ্ছা, এবার তাই আমরা বুঝিলাম। কিন্তু আপত্তিটী অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধেই খাড়া করুন আর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বাদের বিরুদ্ধেই খাড়া করুন, আমরা এই মাত্র দেখিলাম, আপত্তিটীর পা নাই। তার পর কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন "শশি বাবু আপত্তি তুলিয়াছেন যে, অপ্রয়োজনীয় কোন পদার্থ জগতে নাই।" হা অদৃষ্ট! আমরা ত এ কথা আমাদের প্রতিবাদ-প্রবন্ধে কোথাও বলি নাই——কোথাও ঘুণাক্ষরেও বলি নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের উক্তি স্পষ্ট——অতি স্পষ্ট। আমরা বারম্বার বলিয়াছি, জগতে অকেযো গঠন বা লক্ষণ সম্ভবতঃ আছে। আমরা প্রায় আড়াই স্তম্ভ ঐ অকেযো গঠন গুলি জগতে কিরূপে আসিল, তার সম্ভাব্য কারণ নির্দ্দেশে নিয়োজিত করিয়াছি।* সব অকেযো গঠন বা লক্ষণই যে ভবিষ্যতেও অকেযো বলিয়া গণিত হইবে তাহা নহে; কতকগুলি অকেযো লক্ষণ (যা আজ আমরা আমাদের অজ্ঞতার জন্য অকেযো বলিয়া মনে করিতেছি) খুব সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে কেযো বলিয়া পরিগণিত হইবে;——এইরূপ মুখবন্ধ করিয়া আমরা স্পষ্ট বলিয়াছি—'যাহা হউক, আমাদের এই অজ্ঞতার জন্য কতকগুলি অকেযো ('আমরা আজ যাহাদের অকেযো মনে করি.) লক্ষণ বাদ দিলেও সম্ভবতঃ কতকগুলি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই অবশিষ্ট অকেযো লক্ষণগুলি কোথা হইতে কিরূপে আসিল?'* এখানে কি স্পষ্টাক্ষরে বলা হইল না যে, জগতে এমন কতকগুলি অকেযো লক্ষণ সম্ভবতঃ আছে, যারা শুধু আমাদের অদ্যকার অজ্ঞতার জন্য অকেযো নয়—যারা ভবিষ্যতেও অকেযো বলিয়া পরিগণিত হইবে? তারপর আমরা এইরূপ অকেযো লক্ষণ গুলি কিরূপে জগতে আসিল, তার তিনটী সম্ভাব্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছি—'এরূপ আরও কয়েকটী কারণ আমরা দেখাইতে পারি—যাহা দ্বারা বুঝা যায়, অকেযো লক্ষণ জীবরাজ্যে কোথা হইতে কিরূপে আসিল।' † আমাদের এইরূপ সব স্পষ্ট—অতি স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও যে কোকিলেশ্বর বাবু কিরূপে উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া বলিলেন, "শশি বাবু আপত্তি তুলিয়াছেন যে, অপ্রয়োজনীয় কোন পদার্থ জগতে নাই"—কিরূপে যে এ কথা তিনি বলিলেন, তাহা ভাবিয়া আমরা বাস্তবিক আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। কি ঘোরে পড়িয়া, কি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কোকিলেশ্বর বাবু যে এরূপ উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইলেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, তিনি হয় আমাদের প্রবন্ধ ভাল করিয়া পড়েন নাই, না হয় এ বিষয়ে তাঁর গোড়া পত্তনের

* গত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের "নব্যভারতে" ১০৮—১০৯ পৃষ্ঠায় "এ গুলির মধ্যে কতকগুলি......অকেযো লক্ষণ জীবরাজ্যে কোথা হইতে কিরূপে আসিল।" এই লাইন গুলি দ্রষ্টব্য।

* গত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের নব্যভারত ১০৮ পৃষ্ঠা।

† এই সংখ্যারই ১০৯ পৃষ্ঠা।

অভাব—তাই স্পষ্ট, অতি স্পষ্ট উক্তি সকলও বুঝিতে পারেন নাই।

তারপর কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন, "আমাদের প্রশ্নটীর 'দেখিতে পাওয়া যায়' এই বর্ত্তমান কালের বাক্যটীকে অতীত কালের বাক্য বুঝিয়া তিনি অযথা বহু বাক্য ব্যয় করিয়াছেন।" এ কথার যে কি অর্থ তাহা কোকিলেশ্বর বাবুই বুঝেন। পাঠক মহাশয় আপনি বুঝিতে পারেন? আমরা ত জানি, আমরা তাঁর বর্ত্তমানকালের বাক্যটীকে বর্ত্তমান কালেরই বাক্য বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। আর ঐরূপ বুঝিয়াই বলিয়াছিলাম যে, অসভ্য জাতিতে বন্ধ এবং অকেযো যেরূপ হাড় বা পেশীর কথা কোকিলেশ্বর বাবু বলিয়াছেন, সেইরূপ হাড় বা পেশীই নাই। আমরা যে কোকিলেশ্বর বাবুর বর্ত্তমান কালকে অতীত কাল বুঝিয়াছিলাম, এ ভ্রান্ত ধারণা যে তাঁর কোথা হইতে হইল, তাহা তিনিই জানেন। কোকিলেশ্বর বাবুর নিজেরই "তালে ঠিক" নাই; দোষ চাপাতে যান অন্যের ঘাড়ে! আর আমরা অযথা বহুবাক্য ব্যয় করিয়াছি কি না, তাহা পাঠক মহাশয়ই বিবেচনা করিবেন। শুধু যদি কোকিলেশ্বর বাবুর আপত্তিখণ্ডন করাই আমাদের উদ্দেশ্য হইত, আর শুধু কোকিলেশ্বর বাবুই যদি নব্যভারতের একমাত্র পাঠক হইতেন, তাহা হইলে তাঁর আপত্তি সম্বন্ধে "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা" এই কথা বলিয়াই চুপ করিয়া যাইতাম। আমরা আমাদের প্রতিবাদ প্রবন্ধে কোকিলেশ্বর বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের বাক্তব্য বলিবার কালে তাঁর আপত্তি খণ্ডন করিতে করিতে অকেযো লক্ষণ বা গঠনগুলি জীবরাজ্যে কিরূপে আসিল, এ সম্বন্ধে আধুনিক জীবন বিজ্ঞানের ধারণাগুলিও পাঠক মহাশয়ের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে যদি আমরা অযথা বহু বাক্য ব্যয় করিয়া থাকি, পাঠক মহাশয়ই তাহার বিচার করিবেন।

তার পরের পংক্তিটী এই; "এই প্রশ্নটী সম্বন্ধে তাঁহার (শশি বাবুর) নিজেরই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট, অপরিষ্কার ও নিতান্ত কুজ্‌ঝটিকাপূর্ণ, তাই তিনি অপরেরও তাহাই মনে করিয়াছেন।" কোথায় আমাদের ধারণা অস্পষ্ট, তাহা না দেখাইয়া এরূপ বলা অন্যায় কি না, তাহা পাঠক মহাশয়ই বিবেচনা করিবেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কোকিলেশ্বর বাবু ঠিক স্কুলবয়ের মত ঝগড়া করিতে বসিয়াছেন। তিনি তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে নিজেই গোড়াতে ভুল করিলেন; সে ভুল স্বীকার না করিয়া আপত্তিটীকে নূতন আকারে খাড়া করিলেন (আপত্তিটীর পা আছে কি না, সে কথা আমরা এখানে দেখিতেছি না); তারপর সুস্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইলেন। তার পর বিনা কারণে স্কুলবয়ের মতন বলিলেন কি না আমাদের "নিজেরই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট, অপরিষ্কার ......" ইত্যাদি! ধন্য কোকিলেশ্বর বাবুর "সংযত" ভাব! ধন্য ধন্য তাঁর বিচার-প্রণালী!! ধন্য ধন্য ধন্য তাঁর সহৃদয়তা!!!

জীবজগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কোকিলেশ্বর বাবুর ধারণা কতদূর স্পষ্ট?

যাক্; কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে তাঁর উত্তরে কিরূপ বিশুদ্ধ বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, কিরূপ

"সংযত" ভাব দেখাইয়াছেন ও কিরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইলাম। এখন আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত দেখাইতে বাধ্য হইতেছি যে, জীবজগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদের (Organic evolution এর) মূলতত্ত্ব সম্বন্ধেই তাঁর ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও কুজ্ঝটিকাপূর্ণ। (আমরা একথাগুলি অতি সংযত ভাবেই লিখিলাম।) আর তাঁর ধারণা ঐ রূপ বলিয়াই তিনি নানা গোলমালে পড়িয়াছেন ;—একবার বলিতেছেন, তিনি জীবজগতের ক্রম বিকাশে বিশ্বাস করেন, আবার এরূপ কথা বলিতেছেন, যাহা জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদের মূলে আঘাত করে ; আর বৃথা বাক্যব্যয়ও করিয়াছেন। কোকিলেশ্বর বাবু গত মাসের নব্যভারতে আমাদের প্রতিবাদের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগকে বুঝাইতে চান যে, তিনি অভিব্যক্তিবাদে—জীবজগতের ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করেন। "এরূপ যাহার উদ্দেশ্য, সে বিবর্ত্তবাদকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে, ইহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।" "বাস্তবিক আমরা এত অহমুখ নই যে, বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মহনীয় সিদ্ধান্ত স্বরূপ বিবর্ত্তবাদকে অসিদ্ধ বলিতে উদ্যোগী হইব।" "'জীবজগতের ক্রমবিকাশে কেন তবে বিশ্বাস না করি' শশি বাবু এ কথা কাহাকে বলিতেছেন?" পূর্ব্বোক্ত উত্তরের এই সকল উক্তি ও অন্যান্য স্থান হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোকিলেশ্বর বাবু আমাদিগকে বলিতে চান যে, তিনি অভিব্যক্তিবাদে—জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাস করেন। তাই যদি হইল, তবে তিনি কেমন করিয়া তাঁর প্রবন্ধের ২৩ সংখ্যায় (পাঠক মহাশয় উপরে উদ্ধৃত চুম্বকটী দেখুন) অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে চারিটী আপত্তি তুলিয়া, ঐ সকল আপত্তিগুলির যে খণ্ডন আছে, তাহা কোথাও ঘুণাক্ষরেও না বলিয়া——কেমন করিয়া বলিলেন, "এই সকল কারণে (অর্থাৎ ঐ চারিটী আপত্তির জন্য) দৃঢ়তা সহকারে ইহাই বলা সঙ্গত হইয়া পড়ে যে, প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টিব্যাপারে পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সঙ্কল্পের আবশ্যকতা হইয়াছিল"? যাক ; এ অসঙ্গতিও (contradiction) আমরা এখানে তত ধর্ত্তব্য মনে করি না ; কেন না কোকিলেশ্বর বাবু সুর বদলাইয়াই হউক আর যে প্রকারেই হউক উক্ত অসঙ্গতির সঙ্গতি করিতে চেষ্টা করিছেন। কিন্তু জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাস করিয়া কোকিলেশ্বর বাবু যে কি প্রকারে বলিলেন, "নিতান্ত বিভিন্ন, এক জাতিকে অন্য এক নিতান্ত বিভিন্ন জাতিতে কদাপি পরিবর্ত্তন করা যায় না বলিয়াও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, বিভিন্নতার এক মাত্র কারণ পরমেশ্বরর ইচ্ছা বা সঙ্কল্প"—— কি প্রকারে যে এ কথা বলিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। কোকিলেশ্বর বাবুর এই সুস্পষ্ট উক্তি জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী (diametrically opposite)। জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদের (Theory of organic evolution এর) মূলতত্ত্বই এই যে, একটী নিতান্ত বিভিন্ন জাতি অন্য একটী বিভিন্ন জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে * (—ইহা অবশ্য এক

* কোকিলেশ্বর বাবু বলিবেন, উক্ত পরিবর্ত্তনে ঐশী-ইচ্ছা বর্ত্তমান। আমরা জিজ্ঞাসা করি——কি রূপে বর্ত্তমান?——সঙ্গে সঙ্গে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে, না

লক্ষে সাধিত হয় না, কিন্তু অতি ধীরে ধীরে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ধাপের উপর দিয়াই সাধিত হইয়াছে)। কোকিলেশ্বর বাবু যদি অভিব্যক্তিবাদের—জীবজগৎ সম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশবাদের উক্ত মূলতত্ত্বটী ভাল করিয়া বুঝিতেন, তাহা হইলে অনেক গোলের হস্ত হইতে নিজেও পরিত্রাণ পাইতেন আর পাঠককেও পরিত্রাণ দিতেন। তাহা হইলে তিনি প্রকৃতত: এক প্রকারের স্বতন্ত্র-সৃষ্টি-বাদে (special creation এ) বিশ্বাস করিয়াও আপনাকে জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। এখানে আমরা জীবজগৎ সম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশবাদ সত্য কি মিথ্যা,সে কথার বিচার করিতেছি না,—আমরা শুধু বলিতে চাই যে, কোকিলেশ্বর বাবুর পূর্ব্বোক্ত সুস্পষ্ট উক্তির ন্যায় জীবজগৎ সম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী উক্তি করিয়া কেহ আপনাকে উক্ত ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসী বলিতে পারেন না। আর এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি * করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা উহাঁকে জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই ; আর বাস্তবিকও এখনও কেহ পারিবেন না—যতক্ষণ না তিনি বলেন, তাঁর উক্ত সুস্পষ্ট উক্তি ভ্রান্ত উক্তি। সেই জন্যই আমরা বলিয়াছিলাম,কোকিলেশ্বর বাবু একদিকে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন সংকল্প ও অপরদিকে অভিব্যক্তি (জীব-জগতের) দণ্ডায়মান করিয়াছেন। এখন তিনি বলিতে চান, "ওগো আমি যে জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাস করি।' তা যদি করেন,

মূলে ? সঙ্গে সঙ্গে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে উক্ত পরিবর্ত্তনে উক্ত ইচ্ছা বর্ত্তমান তাহার কোন প্রমাণ নাই ; কোকিলেশ্বর বাবুও তাহার কোন প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেন নাই। শুধু তাহাই নহে ; অভিব্যক্তিবাদ বরং বলিতেছে "প্রোটোপ্লাজম দাও আর লোকে সাধারণত: যাদের প্রাকৃতিক শক্তি (আলোক, তাপ, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি) বলে, সেই সব শক্তি দাও, আমি মোটামুটী রকমে দেখাইয়া দিব, কি রূপে উক্ত পরিবর্ত্তন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐশী-ইচ্ছার কার্য্য ব্যতিরেকে সংসাধিত হইতে পারে।" আর যদি বল, উক্ত পরিবর্ত্তনের মূলে ঐশী-ইচ্ছা বর্ত্তমান,——অর্থাৎ যদি বল ঐশী-ইচ্ছাই আদি অণু পরমাণুদিগকে সেই রূপ শক্তি দিয়াছেন—যাহার ফল উক্ত পরিবর্ত্তন, তাহা হইলে আমরা বলিব, তাঁহারও প্রমাণাভাব। শেষোক্ত বিষয়টী, অর্থাৎ মূলে ঐশী ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে কি না— এই বিষয়টী আমরা এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে, বিচার করিয়া দেখিতে বাধ্য হইব।

* কোকিলেশ্বর বাবুর ২১ সংখ্যায় কিম্বা তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এমন কোন উক্তি আমরা দেখিতে পাইলাম না, যাহার এই সুস্পষ্ট উক্তির সহিত সঙ্গতি হয় না। বরং এমন অনেক উক্তি দেখিলাম, যাহারা এই উক্তির ছায়া মাত্র, অথবা যাহারা এই উক্তির মূল স্বরূপ। আমরা কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর প্রবন্ধের ২২ সংখ্যায় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "এক এক জাতীয় প্রাণী এক এক রূপ। জাতিগত বৈলক্ষণ্য প্রাণীতে দেখা যাইতেছে। যে কালেই ইহারা প্রদুর্ভূত হইয়া থাকুক, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল (অশ্ব, ব্যাঘ্র, মনুষ্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নরূপে) সন্দেহ নাই।" ইহাতে যে একটা জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য জাতি হইয়াছে,এভাবের লেশ মাত্রও দেখিতে পাইলাম না,—অথচ ইহাই জীবজগতের অভিব্যক্তিবাদের মূলতত্ত্ব। এই উদ্ধৃত অংশে বরং একপ্রকারের স্বতন্ত্র-সৃষ্টিবাদেরই আভাস পাইলাম। কোকিলেশ্বর বাবু বৈদান্তিক সূক্ষ্ম শরীর ও প্রলয়ের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আর যাহা তিনি বিশ্বাস করেন, তাহাতেও ঐরূপ আভাসই পাওয়া যায়।

আমাদের বোধ হয়, জীবজগতের অভিব্যক্তিবাদের পূর্ব্বোক্ত মূলতত্ত্বটী—যে একটা বিভিন্ন জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়াই একটী নূতন বিভিন্ন জাতি হয়, যেমন মাছের মত জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বেঙ হয়—উক্ত মূলতত্ত্বটী আমাদের দেশের দর্শনে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের ভুল হইতে পারে। কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যদি এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারেন যে উক্ত মূলতত্ত্বটী আমাদেরই দেশের দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা বড় বাধিত হইব। আমা-

তাহা হইলে তাঁর উক্ত ক্রমবিকাশবাদ ক্রমবিকাশবাদ নহে; উহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত এক কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ!

আমরা কোকিলেশ্বর বাবুর উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি কি না?

কোকিলেশ্বর বাবুর একটী অনুযোগ হইতেছে—আমরা তাঁহার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমাদের প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাঁর এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। নিজের ধারণার দোষ থাকিলে, লিখিবার, বলিবার দোষ থাকিলে, লোকে চিরকালই বলিয়া থাকেন, "আমার উদ্দেশ্য বুঝিলেন না," যেন উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়া কেহ যা ইচ্ছা তাই লিখিতে পারেন। তার পর কোকিলেশ্বর বাবুর উদ্দেশ্য না বুঝিবার ত কোন কারণ ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য সমালোচ্য সংখ্যায় (আমরা যে সংখ্যার একটী চুম্বক গোড়াতেই উদ্ধৃত করিয়াছি) স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত,—অভিব্যক্তির মূলে ইচ্ছাবিশিষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা (ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন সংকল্প) প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর এ উদ্দেশ্যটী যে সাধারণের অনবগাহ্য তা ত বোধ হয় না। আর তাঁর উদ্দেশ্য যদি নাই বুঝিয়াছিলাম, তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রতিবাদে কি প্রকারে বলিয়াছিলাম, তিনি একদিকে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কল্প ও অপরদিকে অভিব্যক্তি দণ্ডায়মান করিয়াছেন? তবে তাঁর পূর্ব্বোক্ত জীবজগতে অভিব্যক্তিবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুস্পষ্ট উক্তির বিরুদ্ধে যাইয়া তাঁকে উক্ত অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। আর এরূপ সুস্পষ্ট উক্তির বিরুদ্ধে যাইবার কাহারও অধিকারও নাই। এবার তিনি বলিতেছেন বটে, তিনি জীবজগতের অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করেন, কিন্তু সে অভিব্যক্তিবাদ যে কি জিনিস, তাহা কোকিলেশ্বর বাবুই জানেন। আসল কথা হইতেছে—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, কোকিলেশ্বর বাবু জীবজগতের অভিব্যক্তিবাদের (theory of organic evolution এর) কিছুই বুঝেন নাই,—মূল তত্ত্বটী পর্য্যন্ত বুঝেন নাই;—পাঁচজনে যেমন বলে "হাঁ evolution বুঝি বই কি, হাঁ evolution এ বিশ্বাস করি বই কি," উনিও সেই রূপ ভাসা ভাসা,—অতি ভাসা ভাসা রকমে বুঝিয়া, এ সম্বন্ধে নিতান্ত অস্পষ্ট ধারণা লইয়া, অভিব্যক্তিবাদের গায়ে দুটী চারিটী খোঁচা মারিয়া (এবং অন্যান্য যুক্তির দ্বারা) ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ভাল;—অভিব্যক্তির মূলে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা,—বেদান্তের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করা,—এ উদ্দেশ্য ভাল, আর সেরূপ চেষ্টা করিবারও তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু সে অধিকার আছে বলিয়া অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি ছাই ভস্ম কথা সাধারণকে বলিবার অধিকার বোধ হয় তাঁর নাই। বোধ হয়, যিনি যে বিষয়টী

দের বোধ হয়, অজীব জড় জগৎ (inorganic world) সম্বন্ধীয় মোটামুটী অভিব্যক্তিবাদের সহিত সংমিশ্রিত এক প্রকারের স্বতন্ত্র-সৃষ্টি-বাদ,—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল বা হয়, যেমন বেঙ বেঙ্ ভাবেই আবির্ভূত হইয়াছিল, বেঙ মাছ (বা মাছের মত কোন জীব) পরিবর্ত্তিত হইয়া হয় নাই,—এই ভাবটাই আমাদের দেশের দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের সাধারণ ধারণাও তাহাই। আমাদের দেশের শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত ভাব এবং অভাব বোধ হয় কোকিলেশ্বর বাবুর মনে কার্য্য করিয়াছিল, যখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "নিতান্ত বিভিন্ন এক জাতিকে অন্য এক নিতান্ত বিভিন্ন জাতিতে কদাপি পরিবর্ত্তন্ করা যায় না।"

ভাল না বুঝেন, তাঁর সে বিষয়টী লইয়া সাধারণের সম্মুখে গোলমাল না করাই ভাল।

অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে কোকিলেশ্বর বাবুর তৃতীয় ও চতুর্থ আপত্তি।

অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে, কোকিলেশ্বর বাবুর তৃতীয় আপত্তি ছিল, "একই দম্পতীর পাঁচটী সন্তানের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দুইটী মাত্র সন্তানের কেন এরূপ অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল, বিবর্ত্তবাদ একথার উত্তর দিতে কিছুতেই সক্ষম নহে।" আমরা আমাদের প্রতিবাদ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, এরূপ ব্যক্তিগত বিভিন্নতা individual difference—যেমন একই পেঁপের বীজ হইতে সমুদ্ভূত দুইটী গাছের মধ্যে বিভিন্নতা, একই পিতা মাতার পাঁচটী সন্তানের মধ্যে বিভিন্নতা—এরূপ সব ব্যক্তিগত বিভিন্নতা যে প্রাকৃতিক শক্তি বা কারণের (মাধ্যাকর্ষণ, আলোক, তাপ ইত্যাদির) ফল, তাহা সাধারণ ভাবে মোটামুটী রকমে বিজ্ঞান দেখাইতে পারে,—এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধান্ত শক্তি সংস্থিতির নিয়ম (the principle of conservation of energy) হইতেই দেখান যাইতে পারে যে, ওরূপ সব বিভিন্নতা না আসিয়া থাকিতে পারে না। ঠিক যেরূপ সব কারণে বৃষ্টি পড়ে, বায়ু বহে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিয়া জল হয়, ঠিক সেইরূপ সব কারণই জটিলতরভাবে কার্য্য করিয়া ব্যক্তিগত বিভিন্নতা উৎপাদন করে। কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন, তিনি তাহা কখন অস্বীকার করেন না,—তিনিও বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তিগত বিভিন্নতা প্রাকৃতিক শক্তি বা কারণেরই ফল; তবে তাঁর আপত্তি হইতেছে এই যে, উক্ত প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয় কেন ঠিক সেইরূপ ভাবে কার্য্য করে, যেরূপ ভাবে তাহাদিগকে কার্য্য করিতে দৃষ্ট হয়, বিবর্ত্তবাদ এ প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম। যদি তাহাই হইল, তবে তাঁর তৃতীয় আপত্তিটীকে জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদের (organic evolution এর) বিরুদ্ধে খাড়া না করিয়া বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সাধারণ ভাবে খাড়া করিলে ভাল হইত। মাধ্যাকর্ষণ কেন দুইটী পরমাণুকে পরস্পরের দিকে টানে, এ "কেন"র উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না বলিয়া ইহাকে meteorologyর বিরুদ্ধে আপত্তি বলিয়া খাড়া করা যেমন; অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিশিয়া কেন জল হয়, এ "কেন"র উত্তর কেহ দিতে পারে না বলিয়া ইহাকে utiliterian theory of morals এর বিরুদ্ধে আপত্তি স্বরূপ খাড়া করা যেমন; প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় কেন ঠিক সেই ভাবে কার্য্য করে, যে ভাবে তারা কার্য্য করে, এ "কেন"র উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না বলিয়া ইহাকে জীবজগতে ক্রমবিকাশবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি স্বরূপ খাড়া করাও ঠিক সেইরূপ। জীবজগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদ যদি দেখাইতে পারিল যে, ব্যক্তিগত বিভিন্নতা উক্ত প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের কার্য্যের ফল—আর কোকিলেশ্বর বাবু তাহা অস্বীকারও করেন না—যদি তাহা দেখাইতে পারিল, তাহা হইলেই উক্ত অভিব্যক্তিবাদের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যতদূর ব্যাখ্যা আশা করা যাইতে পারে, তাহা উক্ত অভিব্যক্তিবাদ দিল। এখন তুমি যদি কেন উক্ত প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় ঠিক সেই ভাবে কার্য্য করে, যেরূপ ভাবে তাহাদিগকে কার্য্য করিতে দৃষ্ট হয়,—কেন মাধ্যাকর্ষণ দুইটী পরমাণুকে পরস্পরের দিকে টানে, কেন

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিলিত হইয়া জলই হয়, আর কিছু হয় না,—এখন তুমি যদি এ সকল "কেন"কে "আপত্তি" স্বরূপ উত্থাপিত করিতে চাও, সে "আপত্তি" প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিজ্ঞানের (Science as a whole এর) বিরুদ্ধে স্পষ্ট করিয়া খাড়া করাই ভাল। তাহা হইলে পাঠক বুঝিতে পারেন, লেখক কোথায় আর তিনি নিজে কোথায় দণ্ডায়মান।

যাহা হউক, এখন আসল কথা হইতেছে, সমস্ত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেই উক্ত "আপত্তি" উত্থাপিত হইতে পারে কি না ; আর তাহা অপেক্ষাও আসল কথা হইতেছে, কোকিলেশ্বর বাবু উক্ত "আপত্তি" হইতে যে সিদ্ধান্ত (ইচ্ছা-বিশিষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা) প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, উক্ত আপত্তি হইতে সে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি না? আমরা এক মুহূর্ত্তেরও জন্য এ কথা অস্বীকার করি না, যে বিজ্ঞান পূর্ব্বোক্তরূপ অনেক "কেন"রই উত্তর দানে আজ অক্ষম। ভবিষ্যতেও কখন মানুষ সে সকল "কেন"র নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিবে কি না, তাহাও ভবিষ্যৎই জানে। বিজ্ঞানের এ অক্ষমতাকে তুমি সমস্ত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে "আপত্তি" স্বরূপ খাড়া করিতে চাও, কর। বিজ্ঞান তার এ অক্ষমতা কখনও অস্বীকার করে নাই ; বরং উচ্চৈঃস্বরে তাহা চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এ অক্ষমতা হইতে কোকিলেশ্বর বাবু যে ইচ্ছা-বিশিষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টার ফলাফল সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানের উক্ত অক্ষমতা হইতে, মানবজ্ঞানের বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ অবস্থায়, ইচ্ছা-বিশিষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কেন অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিশিয়া জল হয়, কেন মাধ্যাকর্ষণ দুইটী পরমাণুকে পরস্পরের দিকে টানে,—এ সকল "কেন"র বিজ্ঞান উত্তর দিতে অক্ষম বলিয়া যে ঐ সকল ব্যাপারে ইচ্ছা-বিশিষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা বর্ত্তমান, এ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কেহই স্বীকার করিবেন না,—তিনি উক্ত প্রকার ঈশ্বরে বিশ্বাসীই হউন আর অবিশ্বাসীই হউন। এখানে একজন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন, "এখানে ত কোন কথাই চলে না ; কেবল এই কথা চলে যে, 'আমি কিছু জানি না।' যদি কোন কথা চলে, তবে কি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতে পারি না—'তুমি কি বলিতে পার এক ভাগ অক্সিজেন আর দুই ভাগ হাইড্রোজেন যে অবস্থায় জল হয়, সে অবস্থায় পড়িলে উহারা মিলিত হইয়া কেন জল হইবে না? কেন হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না ; কিন্তু কেন হইবে না, তাহা কি তুমি বলিতে পার?—তুমি কি বলিতে পার, যে শক্তিবলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়, সে শক্তি (বা তাহার প্রাকৃতিক ভিত্তি) "কেন"-বিরহিত, নিত্য (eternal) শক্তি হইতে পারে না? তুমি কি বলিতে পার, সে শক্তির যে ধর্ম্মের জন্য উক্ত প্রক্রিয়া সাধিত হয়, সে ধর্ম্ম (বা তাহার প্রাকৃতিক ভিত্তি) সে শক্তির "কেন"-বিরহিত, নিত্য ধর্ম্ম হইতে পারে না? কে বলিতে পারে, সমস্ত বিশ্ব ব্যাপারের মূলে এরূপ এক বা ততোধিক (একেরই দিকে আধুনিক বিজ্ঞানের গতি) প্রাকৃতিক শক্তি (energy) বর্ত্তমান নাই? কে বলিতে পারে, সে শক্তি

"কেন"-বিরহিত, নিত্য শক্তি হইতে পারে না? কে বলিতে পারে, বিশ্বব্যাপার সেই শক্তির "কেন"-বিরহিত, নিত্য গুণের কার্য্য হইতে পারে না?" আর একজন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-ব্যাপারকে একটু ভিন্ন ভাবে দেখিয়া বলিতে পারেন,—"তুমি যে সব বিষয়ে কথা কহিতেছ, সে সব বিষয় সম্বন্ধে আমি কেবল জানি এই মাত্র যে, আমি কিছু জানি না। আমাকে যদি পীড়াপীড়ি করিয়া কথা কহাইতে চাও ত আমি বলিব——'বিশ্ব-ব্যাপারের "প্রথম কারণ" (যে কারণ অনাদিকাল ধরিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া—কোন কার্য্য না করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট কালে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন) কি, সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তোমার "প্রথম কারণ" আছে কি না, তাহাও জানি না। মাটী ভিজিল, তাহার কারণ বৃষ্টির পতন। বৃষ্টি পড়িল, তাহার কারণ মাধ্যাকর্ষণ। আবার মাধ্যাকর্ষণেরও কারণ থাকা অসম্ভব নহে,——বিজ্ঞান সে কারণ আবিষ্কারের জন্যও চেষ্টা করিতেছে। এই রূপে দেখিতেছি, প্রাকৃতিক কারণের পশ্চাতে প্রাকৃতিক কারণ, আবার তাহার পশ্চাতে প্রাকৃতিক কারণ। কে বলিতে পারে, সমস্ত বিশ্বব্যাপার এইরূপ কার্য্যকারণের এক অনাদি বিশ্বব্যাপী স্রোত নহে? যদি জিজ্ঞাসা কর, এ বিশ্বব্যাপী অনাদি স্রোত কেন আসিল, আমি বলিব—এখানে কোন "কেন" আছে কিনা—তাহাই জানি না, যদি থাকে, সে "কেন" এক অজ্ঞানিত প্রাকৃতিক কারণ হইতে পারে, আর যদি না থাকে, তাহা হইলে উক্ত স্রোতই শেষ, "কেন"-বিরহিত, অনাদি, নিত্য অস্তিত্ব।'*

বাস্তবিক এখানে আমরা যে রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম, তাহা অন্ধকারের রাজ্য—ঘোর অন্ধকারের রাজ্য। এখানে ক্ষুদ্র মানবের জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি সকলই পরাস্ত হইয়া যায়। এখানে যে সব গভীর "কেন" উত্থিত হয়, সে সব "কেন"র উত্তর মানব কখন দিতে পারিবে কি না, জানি না। এখানে সে সব "কেন" আদৌ উত্থিত হইতে পারে কি না, তাহাও আমরা জানি না। কে বলিবে, কোকিলেশ্বর বাবু যে "কেন" উত্থাপিত করিয়াছেন, সে "কেন"র সন্তোষজনক উত্তর পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ভ্রাতাদের উক্তি? কিন্তু কোকিলেশ্বর বাবু যে ঐশী সঙ্কল্প কল্পনা করিয়াই বিশ্বরহস্য অধিকতর সন্তোষজনক রূপে উদ্ভেদ করিলেন মনে করেন,—তাহা কি রূপে করেন, তাহাও ত বুঝিতে পারি না। যদি এ রাজ্যে যুক্তির কথা চলে, তাহা হইলে কি কেহ সসম্ভ্রমে বলিতে পারে না—"ভাই, প্রথম কথা হইতেছে, তুমি যে ঐশী-সঙ্কল্পের কথা বলিতেছ, মনে রেখ সে সঙ্কল্প তোমার একটী "ধরিয়া লওয়া" (hypothesis) মাত্র। উক্ত সঙ্কল্প যে বিশ্বব্যাপারের মূলে বর্ত্তমান, তাহার প্রমাণ কি? তুমি বলিবে, তাহার প্রমাণ এই যে, উক্ত সঙ্কল্প দ্বারা বিশ্বব্যাপারের মধ্যে যে বন্দোবস্ত, শৃঙ্খলা (order) আছে, তাহা বুঝা যায়। তবেই তাহা প্রমাণ হইল না। একটী অজ্ঞাত কারণ (unknown cause) ধরিয়া লইয়া তাহার কার্য্যপ্রণালী মনের মত করিয়া কল্পনা করিয়া সকল ব্যাপারই ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু সেরূপ ব্যাখ্যা

* কোকিলেশ্বর বাবুর তৃতীয় "আপত্তি" সম্বন্ধে আমরা উপরে যা বলিলাম, একটু আধটু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলে সেই সব কথাই তাঁর চতুর্থ আপত্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

করা যায় বলিয়াই ইহা বলা যায় না যে, উক্ত কারণটী সত্য*। যাহা হউক, এখন কথা হইতেছে, উক্ত সঙ্কল্প ধরিয়া লওয়াতেই যে বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যস্থিত উক্ত শৃঙ্খলা অধিকতর সন্তোষজনক রূপে ব্যাখ্যাত হইল, তাহাও ত বুঝিতে পারি না; এরূপ সঙ্কল্প ধরিয়া লওয়াতে যে বিশেষ কি লাভ হইল, তাও ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয়, তুমি প্রশ্নটীকে কেবল স্থানান্তরিত করিলে। প্রশ্ন হইতেছে, বিশ্বব্যাপার মধ্যে যে শৃঙ্খলা (order) দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে কেন আসিল? তুমি বলিবে, ঐশী-সঙ্কল্প হইতে।—কিন্তু আবার সেই জিজ্ঞাসাই হইতেছে—ঐ ঐশী সঙ্কল্প বা ঈশ্বর কোথা হইতে কেন আসিলেন? এখানে তোমাকে বলিতে হইবে, এ "কোথা হইতে"র, এ "কেন"র, উত্তর নাই। তবে আর তোমার "কেন"র তুমি অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর দিলে কি প্রকারে? গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখ, দেখিবে তুমি তোমার "কেন"কে কেবল স্থানান্তরিত করিলে। ভাবিয়া দেখ, তুমি যে সঙ্কল্পের কথা বলিতেছ, সে সঙ্কল্পটী কি। ঐ সৃষ্টি-সঙ্কল্পের মধ্যে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির—ভবিষ্যৎ জগতের একটী ভাব (অর্থাৎ একটী ideal world, একটী plan of creation) নিহিত আছে।* ফল কথা হইতেছে, তুমি জড় জগৎকে একটী ভাবজগৎ (ideal world) হইতে উৎপন্ন করিতে চাও†। আচ্ছা তাহাই যেন হইল; কিন্তু এ ভাব-জগৎ (ideal world)——ইহাকে ক-ভাব-জগৎ বলা যাউক——কোথা হইতে আসিল? যদি জড়জগতের কারণ থাকে, তবে ভাব-জগতের কারণ থাকিবে না কেন? ‡ (বিশেষতঃ তুমি ভাই অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক,—তোমার কাছে জড়রাজ্য ও ভাবরাজ্য বস্তুতঃ একই জিনিস।) যদি বল, ক-ভাবজগৎ খ-ভাবজগৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে খ-ভাবজগৎ আবার আর এক ভাব-জগৎ——গ-ভাব-জগৎ হইতে উৎপন্ন হউক। এই রূপে তুমি শৃঙ্খলার নিয়ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভাবজগতের এক অনাদি ক্রমে (infinite series এ) উপনীত হইলে। জড়জগৎ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এক ভাবজগৎ কল্পনা করিলে; আবার এই ভাবজগৎ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আবার এক দ্বিতীয় ভাবজগৎ কল্পনা করিলে,—আবার এই

* "...if we give ourselves the license of inventing the causes themselves as well as their laws, a person of fertile imagination might devise a hundred modes of accounting for any given effect while there are probably a thousand more which are equally possible but which for want of anything analogous in our experience our minds are unfited to conceive." J. S. Mill.

"It is wholly impossible to prove that any phenomenon whatever is not produced by the interposition of some unknown cause. But philosophy has prospered exactly as it has disregarded such possibilities, and has endavoured to resolve every event by ordinary reasoning." Huxley.

* তুমি যখন মাটী থেকে ঘট করিতে ইচ্ছা কর,—সঙ্কল্প কর, তখন তোমার ঐ ইচ্ছার,—ঐ সঙ্কল্পের মধ্যে ঘটের একটী ভাব, একটী idea, নিহিত আছে। তুমি যখন সন্দেশ খাইতে ইচ্ছা কর, তখন তোমার ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের মধ্যে সন্দেশের একটী ভাব——সন্দেশের একটী idea— নিহিত আছে। সব ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সম্বন্ধেই ঐ কথা।

† কোকিলেশ্বর বাবু ঐশী-সঙ্কল্প নিহিত ঐ ideal world কে "prevision of the world that is to be" বলিয়াছেন।

‡ ভাবরাজ্য বা মনোরাজ্যের ব্যাপারও জড়-রাজ্যের ব্যাপারের ন্যায় আইন-কানুনে বদ্ধ। এই মনোরাজ্যে যে কোথাও বেবন্দোবস্তী মহল আছে, তাহা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়।

দ্বিতীয় ভাব-জগৎ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এক তৃতীয় ভাব-জগৎ কল্পনা করিলে; এইরূপে এক অনাদি-ক্রমে (infinite series এ) আসিয়া পড়িলে। ভাই, এরূপ ব্যাখ্যা যদি তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যা (যে বিশ্বব্যাপার কার্য্যকারণের এক অনাদি বিশ্বব্যাপী স্রোত) কি অপরাধ করিল? আর যদি তোমার অনাদি স্রোতের কোথাও থামিতে চাও, তবে গোড়াতেই থাম না?——জড়জগতের শৃঙ্খলার মূল জড়-জগতেই থাকুক না?——এই শৃঙ্খলা বিশিষ্ট তথা-কথিত জড় জগৎই ঈশ্বর হউন না?

"আর যদি বল, ঐশী-সঙ্কল্প নিহিত পূর্ব্বোক্ত ক—ভাবজগৎ ঈশ্বরের মনে "আপনা আপনিই" উঠিয়াছে;——যদি বল, ঐ ভাবজগতের একটী ভাব (idea) আর একটী ভাবের সহিত "আপনা আপনি" কোন সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে তোমার "আপনা আপনি" যে কি জিনিস, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; আর যদি তাহাই হয়, যদি দুইটী ভাব (ideas) "আপনা আপনিই" কোন সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলে জড়জগতে দুইটী পরমাণু সেই ভাবে "আপনা আপনিই" কোন সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িতে পারিবে না কেন?

"আর যদি বল, ঐশী-সঙ্কল্প নিত্য—ইহার আর "কেন" নাই, কারণ নাই;—যদি বল, উক্ত সঙ্কল্প নিহিত কোন দুইটী ভাব(ideas) নিত্যকাল কোন এক সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে, তাহা হইলে জড়জগতের দুইটী পরমাণু কোন এক সম্বন্ধসূত্রে নিত্যকাল গ্রথিত থাকিতে পারিবে না কেন? আর তা যদি পারে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রথম দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের "কেন"—বিরহিত নিত্য শক্তির "কেন"-বিরহিত, নিত্য গুণ কি অপরাধ করিল?

"আরও দেখ, জীবজগতে অভিব্যক্তির মূলে যদি ঐশী-সঙ্কল্প দেখ, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উক্ত সঙ্কল্পই এমন শত শত পরদেহবাসী (parasitic) জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাদের জীবন ও বংশবৃদ্ধি কোটী কোটী নর নারীর ও অন্যান্য জীবের নিদারুণ কষ্টভোগের সহিত সম্বন্ধ। নিদারুণ কষ্ট দেওয়াও কি উক্ত সঙ্কল্পের অংশ?

"আরও দেখ, যদি তুমি জগৎ ব্যাপারে কৌশল (design) দেখিতে চাও, তাহা হইলে তোমার ঈশ্বরকে পূর্ণ ও সর্ব্ব-শক্তিমান বলিতে পার না; কেন না, কৌশ-লের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সম্বন্ধ। এই মনে কর, তুমি যদি রামকে মারিতে চাও, আর তোমার যদি অসীম ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সে যেখানেই থাকুক, আর যাই করুক, তুমি যাবে আর তাকে মারিবে। তুমি যদি দুর্ব্বল হও, তাহা হইলেই একটা মতলব design আঁটিবে। তুমি ঠিক করিবে, "রাম যখন স্কুল হইতে একলা ফিরিয়া আসিবে, সেই সময়ে আমি সেই নির্জন পথে এক লাঠী লইয়া প্রস্তুত থাকিব।" ভাল design এর সঙ্গেও এইরূপ সসীমতা সংযুক্ত। ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন, তাহা হইলে তিনি যা ইচ্ছা করিবেন, তাহা অমনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (directly) সাধিত করিবেন। তাঁর আবার design এর আবশ্যকতা কি?"

তাই আমরা বলিতেছিলাম, কোকিলেশ্বর বাবু নিজে তাঁর নিজের "কেন"র যা উত্তর দিয়াছেন, তাহা যে অধিকতর সন্তোষজনক,

তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না ;—ঐশী-সঙ্কল্প কল্পনা করিবার আবশ্যকতা ত বুঝিতে পারিতেছি না ;—উহাতে খালি মূল প্রশ্নটী স্থানান্তরিত করা হয় মাত্র। তাই আমরা বলিতেছিলাম, আমরা যে রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, এখানে বাস্তবিক ক্ষুদ্র মানবের জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি সকলই পরাস্ত হয়। "বুঝি না, বুঝি না, আমি কিছুই বুঝি না" এই কথাই,—এই গভীর ব্যাকুলতাপূর্ণ আটটী কথাই মানবহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে, গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হয় ;—বাস্তবিক এখানে ঐ কথা বলাই সঙ্গত। বাস্তবিক এ রাজ্যে অন্য কথা অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। বাস্তবিক এখানে নীরব থাকাই প্রশস্ততম পথ। আসুন ভাই কোকিলেশ্বর বাবু এ রাজ্যে আমরাও গভীর ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নীরব হই।*

আমাদের মূল কথা। আধুনিক অভি-ব্যক্তিবাদের,—জীবজগতে ক্রমবিকাশবাদের বিরুদ্ধে কোকিলেশ্বর বাবু যে সকল "আপত্তি" তুলিয়াছিলেন, সে সকল "আপত্তি" কাজের আপত্তি নহে, অর্থাৎ তাহারা আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণে বাধক স্বরূপ দণ্ডায়মান হইতে পারে না ; আর সেই সকল "আপত্তি" হইতে বা বিজ্ঞানের অক্ষমতা হইতে ঐশী-সংকল্প যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। উক্ত সঙ্কল্পে বিশ্বাস করিতে চাও, কর। কিন্তু মানবজ্ঞানের বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ অবস্থায় যুক্তি দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

মা ভৈঃ মা ভৈঃ। ঘোর অন্ধকারের রাজ্য দেখিয়া, ভাই (আমরা এখন আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের বলিতেছি) ভয় পাইও না। সুস্পষ্ট যুক্তি যেখানে লইয়া যাইবে, সত্যপ্রাণ হইয়া সেইখানেই যাইবে, তোমার একটী পবিত্র কর্ত্তব্যই তাহাই। ইচ্ছা-বিশিষ্ট মানবী ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রমাণাভাব বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে কর' না নীতির নিয়ম, ধর্ম্মের রাজ্য অন্তর্হিত হইল। না, কোটীবার না ; ঐ শুন, ঐ "না"ই অনন্ত বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জগতের গঠনরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নৈতিক নিয়ম সংস্থাপিত। দেখিও এক নিমেষের জন্যও যেন ঐ নীতির পথ হইতে পদস্খলন না হয়। আর ধর্ম্মভাব মানবের চিরন্তন ধন। যতদিন এ পৃথিবীতে মানুষ থাকিবে, তত দিন ধর্ম্মভাবও থাকিবে। ঘোর প্রহেলিকাপূর্ণ বিশ্বের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষুদ্র মানব যখন এই অভেদ্য রহস্যের কথা ভাবিবে ; অনন্ত ছায়াপথের অযুত অগণ্য নক্ষত্রলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে ; ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটী আমিবার (amœbar) জীবনক্রীড়া দেখিবে, আর এইরূপ এক বিন্দু প্রটোপ্লাজমের অনন্ত সম্ভাবনার (infinite possibilites এর) কথা ভাবিবে, তখন কোন্ মানবসন্তানের মস্তক নীরবে অবনত না হইবে ? কোন্ প্রকৃতিস্থ মানবের দুটী চক্ষু দিয়া দুটী ধারা নীরবে বহিয়া

* যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের—ইচ্ছা-বিশিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না,—এ কথা ঈশ্বরবিশ্বাসী কাণ্ট বহুদিন পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল স্পষ্টতরভাবে বলিয়াছিলেন, উক্ত অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। বুদ্ধদেবের ধারণাও তাহাই। জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীরেরও ঐ মত। কোকিলেশ্বর বাবু না কি যুক্তি দ্বারা উক্ত অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিলেন, (উপরে উদ্ধৃত চুম্বকটী দেখুন) তিনি না কি "দৃঢতা সহকারে" "কদাপি" "গত্যন্তর দেখিতে পাওয়া যায় না" ইত্যাদি সজোর কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাই আমরা এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিলাম।

না যাইবে? ঐ নীরব অশ্রুধারার প্রত্যেক বিন্দুতে যে ধর্ম্মভাব নিহিত আছে—জানি না ভূলোকে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মভাব কি আছে; জানি না—দ্যুলোকে তাহা অপেক্ষা গভীরতর ধর্ম্মভাব কি হইতে পারে।

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

তমসার প্রতি সীতা।*

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
জানিতাম এতদিন,
এ জীবন ভাগ্যহীন
বহিতেছি! চাহিতেছি দিতে বিধাতায়;
আমার সুখের কেন্দ্র
প্রাণপতি রাঘবেন্দ্র
কি দোষে ত্যজিলা, দাসী কি দোষী সে পায়?
দেবি! কি ক'ব তোমায়?

২

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
রাজ-রাজেশ্বর যিনি,
তাঁর জায়া অভাগিনী,
লু কি' আছে জননীর স্নেহ ঘন-ছায়!
প্রভু মোর শত ধন্য,
কেবলি আমারি জন্য
রহেনি করুণাকণা, একি সহা যায়?
দেবি! কি ক'ব তোমায়?

৩

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
কায়মনবাক্যে আমি,
নাহি জানি বিনা স্বামী,
জাগ্রতে স্বপনে চিত রত সেই পায়;
অদৃষ্টের অপরাধ,
বিনা দোষে অপবাদ!
তাই নাথ তেয়াগিলা নীচ নারী প্রায়!
দেবি! কি ক'ব তোমায়!

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
সে ক্ষোভে সে অভিমানে,
কি বাজে রমণী-প্রাণে,
বুঝাবার নহে সে যে মানব-ভাষায়!
মরতে মরণ বই,
সীতার সুহৃদ্ কই,
কোথা গেলে এ বেদনা এ জ্বালা যুড়ায়?
দেবি! কি ক'ব তোমায়?

৫

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
আজি কি শুনিনু কথা,
ভুলা'তে অসহ্য ব্যথা,
কে শুনালে দৈববাণী দুখিনী সীতায়,
শিহরি উঠিছে দেহ,
বিশ্ব-ভরা দয়া, স্নেহ,
আশা, প্রীতি, স্মৃতি পুনঃ আসিছে হিয়ায়!
দেবি! কি ক'ব তোমায়?

৬

দেবি! কি ক'ব তোমায়?
কি শুনিনু হরি! হরি!
আনন্দ-উল্লাসে মরি!—
গড়িয়া সোণার সীতা, এবে অযোধ্যায়
যজ্ঞ করে রঘুপতি,
নারীকুলে ভাগ্যবতী,
অভাগী জানকী সমা কে আছে কোথায়?
দেবি! কি' ক'ব তোমায়!

* উত্তরচরিত দ্রষ্টব্য।

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
চাহিলে আমার পতি,
আপনি আসিত রতি,
ললিতা ললনা-মালা, দিতে তাঁর পায়;
সাধি কত সুরবালা,
গলে দিত বরমালা,
ফেলিয়া স্বরগ-সুখ কে না তাঁরে চায়?
দেবি! কি ক'ব তোমায়?

৮

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
অযুত নয়নে বিশ্ব,
দেখুক মহান্ দৃশ্য,
বিশুদ্ধা পবিত্রা সীতা পতি দেবতায়,
সীতাময় হৃদি তাঁরি,
আর কি বলিতে পারি?—
জগতে জানকী আর কোন সুখ চায়?
দেবি! কি ক'ব তোমায়?

৯

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
সহস্র বন্ধন টুটে,
পরাণ উথলি উঠে,
তরঙ্গে তরঙ্গে যথা গঙ্গা বরষায়;
শত জন্ম পুণ্যে আমি,
লভিনু সে দেবস্বামী.
তুচ্ছ নির্ব্বাসন-দুঃখ, ভাগ্য-তুলনায়!
দেবি! কি ক'ব তোমায়?

১০

দেবি কি ক'ব তোমায়?—
এ হেন সৌভাগ্য আর,
ধরাতলে আছে কার,
তাঁর মত পতি-রত্ন কেবা কবে পায়?—
ধর্ম্মশীল, সত্যপ্রিয়,
মহাবীর, জিতেন্দ্রিয়,
এক পত্নী ব্রত, রত এক-নিষ্ঠতায়,
আত্মত্যাগী মহাযোগী সিদ্ধ সাধনায়!

১১

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
তুচ্ছ রাজ্য তুচ্ছ ধন,
অযোধ্যার সিংহাসন,
তুচ্ছ সে সাম্রাজ্ঞীপদ সীতা নাহি চায়,
রামের পরাণোপরি,
সীতা রাজ-রাজেশ্বরী,
অলকা অমরা কোথা বৈকুণ্ঠ কোথায়!
দেবি! কি ক'ব তোমায়?

১২

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
সে বিশ্বাস, দয়া, প্রীতি,
সেই প্রেম, সেই স্মৃতি,
বুকে রেখেছেন পতি মণিমালা প্রায়,
এ হেন প্রেমের সীমা
ত্রিভুবনে আছে কি না,
কিবা দিব প্রতিদান কি আছে ধরায়,
দেবি! কি ক'ব তোমায়?

১৩

দেবি! কি ক'ব তোমায়?—
অতৃপ্ত পিপাসা মম,
অগস্ত্যের তৃষা সম,
সীমাহীন রেখাহীন বিশ্বগ্রাসী প্রায়;
বুঝিতে পারি না কেন,
সবি আজি পূর্ণ যেন!
কি যেন অমৃত-স্রোত ছুটিছে শিরায়!
প্রাণে থাক প্রাণপতি,
ধর্ম্মে থাক সীতা সতী,
জগত ভরিয়া থাক রাম-মহিমায়!
আমি তাঁরি, তিনি মোর,
নয়নে বহিছে লোর,
তুচ্ছ নির্ব্বাসন-দুঃখ ভাগ্য-তুলনায়!
জগতে জানকী আর কিছু নাহি চায়।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

৺ শ্যামাচরণ রায়।* (১)

(জন্ম ১৮৭০ সালের জুন মাসে, মৃত্যু ১৯০২ সালের ১১ই মে, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা)।

আজ যাঁহার নামসঙ্কেতে আমরা একত্র সমবেত হইয়াছি, তাঁহার নাম অল্প সংখ্যক লোকেরই বিদিত এবং তিনি স্বয়ং তদপেক্ষাও অল্প সংখ্যক লোকের নিকট পরিচিত ছিলেন। তবে আমরা কোন্ স্পর্দ্ধায় এই প্রচ্ছন্ননামা ব্যক্তির নাম করিয়া আপনাদিগকে আহুত করিয়াছি, কোন্ সাহসে ভর করিয়া যে সভা গৃহে মহাত্মা রামমোহন রায় ও প্রাতঃস্মরণীয় কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিমূর্ত্তি জীবনের অত্যুন্নত লক্ষ্যকে জাগরিত করিয়া দেয়, যে সভাগৃহে দেশের দিগ্বিজয়ী বীরগণের গুণগান কথিত হইয়া থাকে, সেই সভায় দেশের দশ জনকে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের ভবিষ্যৎ আশা ছাত্রমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, সে কথাটা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, সকল সময়ে সেখানে সেরূপ শক্তির সংযোগ হয় না। শ্যাম বাবু যে কি ছিলেন এবং তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সকল কি ছিল, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এই অনতি-অল্প জীবনের মধ্যে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, যদিও বহুসংখ্যক লোকের সহিত পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় মনুষ্য কদাপি চর্ম্মচক্ষে দেখি নাই। আমাকে যদি কেহ দেবতার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিতে চেষ্টা করি, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বে ও দেবত্বে কোন প্রভেদ না থাকে, তবে অসঙ্কোচে তাঁহাকে দেবতা বলিতে পারি। তিনি আজীবন আপনাকে ও আপনার নামকে গোপন রাখিতে বিশেষ যত্ন করিতেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি যে, রোগ, শোক, জরা ইত্যাদি আধিব্যাধির সঙ্গে অনন্যসাধারণ বল ও তেজের সহিত সংগ্রাম করিতেন। দেখিয়াছি যে, অতি প্রত্যুষে ভগবানের নাম লইয়া গাত্রোত্থান করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত সময় দেশের কল্যাণ-কামনায় ও আর্ত্তের দুঃখাপনোদনে ব্যয় করিতেন। দেখিয়াছি যে, দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, রোগীর রোগশয্যা পার্শ্বে তাঁহার সে অমানুষিক স্নেহ ও সেবা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। দেখিয়াছি যে, নরকের দ্বারে দাঁড়াইয়া জগজ্জয়ী বীর অপেক্ষাও অধিক বলের সহিত পাপীকে আকর্ষণ করিয়া পুণ্যপথে আনিয়াছেন। দেখিয়াছি যে, দীন দুঃখীর জন্য, পাপী তাপীর জন্য জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন এবং অবশেষে জীবনদান করিয়া আশৈশব-সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞের আহুতি দিয়াছেন। এত দেখিয়াছি বলিয়াই মনে মনে স্থির বুঝিয়াছি যে, তাঁহার ন্যায় দয়াবীর ও কর্ম্মবীর, তাঁহার ন্যায় মনুষ্য এ পৃথিবীর গৌরব, জগতের

---

* বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর এলবার্টহলে শান্তি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আহূত ৺ শ্যামাচরণের স্মরণার্থ সভায় পঠিত।

অলঙ্কার। এরূপ লোক এই বাঙ্গলাদেশে জন্মিয়াছিলেন, ইহা বাঙ্গালার বিশেষ গৌরবের কথা। বিশেষ আনন্দের বিষয়, সে গৌরব ও সে আনন্দ হইতে দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার বন্ধুগণ নীরবে উপভোগ করিতে চাহেন না। আমি আশা করি যে, যথাসময়ে তাঁহার পবিত্র জীবনকাহিনী রচিত হইবে। তখন প্রত্যেক বাঙ্গালী এই হতভাগ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও শ্যাম বাবুর নাম স্মরণে আপনাকে সৌভাগ্যবান ও সার্থকজন্মা মনে করিবে। তখন প্রত্যেক নরনারী প্রাতঃকালে শ্যাম বাবুর নাম স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিবে, তখন পিতামাতা পুত্রকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ সহোদরকে বলিবেন যে, তোমাদের শুভ পথে চলিবার আদর্শ নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, কর্ম্মযোগী জীবনোৎসর্গকারী আদর্শ তোমাদের স্বদেশেই আছে, সে আদর্শ ৺ শ্যামাচরণ রায়, গুরু শিষ্যকে পরোপকার ব্রতের মন্ত্র দিবেন, সে মন্ত্র শ্যামাচরণ রায়।

কোন্ গুণে শ্যামাচরণকে এরূপ উচ্চ স্থানের অধিকারী মনে করিতেছি? আপনারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে পরলোকগত সুহৃদের প্রতি স্নেহ ও শোক বশতঃ ভাষা অতিরঞ্জিত হইতেছে। কিন্তু সেই সুহৃদ্ জীবিতমানে তাঁহার প্রতি আমাদের যে মনোভাব ছিল, তাহাকে স্নেহ না বলিয়া ভক্তি বলিলেই ঠিক বলা হয়। যাঁহাকে ভক্তি করা যায়, সত্যের অপলাপে তাঁহার তর্পণ অসম্ভব, তাঁহার জীবদ্দশায় তৎসম্বন্ধে যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম, তাহাই যথাযথ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্যামাচরণের জন্মভূমি খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী কাড়াপাড়া গ্রাম। সম্ভবতঃ ১৮৭০ সালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ন্যূনাধিক দ্বাদশ বর্ষকাল তিনি স্বদেশে স্বগৃহে নিজ পরিজনগণ মধ্যে বাস করিয়াছিলেন এবং এই সময়েই যে ব্রত তাঁহার জীবনের সহিত অঙ্গীভূত হইয়াছিল, তাহা অঙ্কুরিত হয়। কি ভাবে এবং কোন্ অনুকূল প্রভাবে তাহা উপ্ত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু স্বদেশের ও নিজগৃহের স্মৃতি চিরদিন তাঁহাকে আনন্দ দিয়াছে। ১৮৯৩ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি বহুকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সেই দিনকার তাঁহার মনোভাব এইরূপ লিপিবদ্ধ আছেঃ—"পুরাতন নূতন দৃশ্যের মধ্যে এলাম। প্রাতে ৫ টার গাড়ী খুলনায় পৌঁছিল,—কত দিন পরে জন্মভূমির এত নিকটে আসিতে লাগিলাম, পুরাণ কথা-সকল স্তরে স্তরে প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ১০½ টার সময় ষ্টীমার বাগেরহাটে নামাইয়া দিল। সেই এক ভাবে, ধীর গম্ভীরভাবে আমার পিতৃদেবত্যক্ত বাটীর দিকে এলেম—স্বর্গ-কুটিরে এলাম, চারিদিকে সকলের দয়া দেখে তাঁর কৃপার পার বুঝিতে পারিলাম না।" তৎপর দিবস লেখেন, —"এমন জন্মভূমি কেন ত্যাগ করিব?" তাঁহার পরিজনগণ মধ্যে তাঁহার পিতৃদেবের প্রভাব অননুমেয়, যে সময়ে শ্যামাচরণের জন্ম হয়, সে সময়ে তাঁহার পিতৃদেবের মনোভাব সাধারণ সংসারী গৃহস্থের ন্যায় ছিল না। সংসারের যাহা কিছু সার ও বন্ধন—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও মাতা সকলেই পর পর অত্যল্প কালের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করায় এ সংসার তাঁহার নিকট নিতান্তই মায়া-

মোহময় ও অসার বলিয়া প্রতীত হয়। সংসারের মানুষ ঘটনাচক্রে ও অবস্থার পীড়নে নিরপরাধী হইয়াও কত মর্ম্মান্তিক দুঃখ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব বন্ধুজনের অনুরোধে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেও যখন তাঁহার মন সাংসারিক বিষাদচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন এবং বৈরাগ্য ও ভগবৎ ভক্তিতে পরিপূর্ণ, সেই সময়ে শ্যামাচরণের জন্ম হয়, এবং শ্যামাচরণ জ্ঞানলাভ করিয়াও স্বীয় পিতৃদেবকে সতত সদনুষ্ঠানে রত, ভগবানে ভক্তিমান এবং সাধারণ মানব যে সকল ক্ষুদ্র কলহে ব্যাপৃত থাকে, তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে আসীন দেখিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। আমৃত্যু শ্যামাচরণও যেরূপ পিতার প্রতি ভক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা লোক-দুর্লভ। একটী সামান্য ঘটনা হইতেই ইহা পরিস্ফুট হইবে। পিতা মাত্রই পুত্রকে হাতের লেখা ভাল করিবার অনুরোধ করিয়া থাকেন কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে শ্যামাচরণ কি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন শুনুন:— "পিতার একটী দয়া। বাবা ছোট বেলায় যখন দারিদ্র্য বশতঃ কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে পারিতাম না, সেই সময়ে সর্ব্বদা লিখিয়া হাতের লেখা ভাল করিবার জন্য বলিতেন,—তাঁহার—আমার দেবের—আদেশে লিখিয়া হাতের লেখা যা একটু ভাল হইয়াছে। তাহা তাঁহারই কৃপা, হাতের লেখার জন্য সুখ হইলে অপর কেহ দেখিয়া সুখী হইলেই বাবার দয়ার কথা মনে পড়ে। আজ যখন শুনিলাম, Commandant Capt Barton আমার হাতের লেখা দেখিয়া বলিয়াছেন, "That is a very good handwriting" আমার অপার করুণাময় দেবের কথা মনে হইয়া হৃদয় প্রসাদভরে অবনত হইল। আমার বাবার আমার প্রতি কত দয়া ছিল! স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ কর "বাবা"। আর একটা ঘটনা শ্রবণ করুন:—শ্যামাচরণ যখন ১৮৯৩ সালে ব্রহ্মদেশে মিচিকা উপত্যকায় ছিলেন, সেই সময়ে ৬ই নবেম্বর তারিখে এমন একটী ঘড়ি ক্রয় করেন, সেই ঘড়ির মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র। ঐ কালের পূর্ব্বে যখন যে থানে থাকিতেন, প্রায়ই পরের ঘড়ি দেখিয়া আফিসে যাইতে বা অন্য কাজ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সেখানে সে সুবিধা আদৌ ছিলনা। ঐ ঘড়িটী কিনিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন:—"জীবনে এই প্রথম ঘড়ি কিনিলাম। পিতৃদেব থাকিবার সময় অনেক অসুবিধা বোধ হইলেও মনে করিয়াছি যে, যে টাকা দিয়া ঘড়ি কিনিব, সে কটী টাকা তাঁহার চরণসমীপে পাঠাইতে পারিলে তাঁহার কত সুবিধা এবং আমার কত পরিতোষ হইবে।" তাঁহার পিতৃভক্তি ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে তাঁহার অসাধারণ তীব্র জ্ঞান-পিপাসাও বুঝাইতে হয়। আশৈশব যেরূপ কষ্টে, অনাহারে, একাহারে, অনিদ্রায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ছাত্রজীবনে সুদুর্লভ। তাঁহার বড় সাধের লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া—যখন প্রায় বিপদসমুদ্রের কূলে আসিয়াছেন, যখন কলেজে third year এ পড়িতেছিলেন—সেই সময় তাঁহার বড় আশার—বড় সাধের লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে চাকরী করিতে গমন করেন। কেন লেখাপড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন? তাঁহার পিতার কষ্ট নিবারণের জন্য—পিতৃ-

দেবকে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা সুখী করিবার জন্য—তাঁহার নিজের কথায় শুনুন ঃ—

"Father says a soothsayer had told him that he will die after two years more. I have certainly have no confidence in the veracity of soothsaying, but I can tell that he will not be many more years here and of what use will this life of me be when he will leave us and I shall do nothing for him. Who is the highest God of me in this world? What more useful thing do I wretched creature intend to do than serving my father?"

যে মুহূর্ত্তে তিনি এই প্রকার সঙ্কল্প করেন, সে এক অখণ্ড মুহূর্ত্ত; তাঁহার যে কি প্রকার জ্ঞানপিপাসা ছিল, যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, তিনি কি মহান্ স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতৃদেব কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে তিনি পুনরায় ব্রহ্ম দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ৪।৫ মাস পিতৃদেবের চিকিৎসা ও সেবার পর তাঁহার পিতৃদেব পরলোকগমন করেন। সে চিকিৎসা ও সেবা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যে দিবস কলিকাতায় আগমন করেন, তৎপর দিবস কলিকাতায় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। কবিরাজ দ্বারিকানাথ সেন ও ডাক্তার নীলরতন সরকার রোগীকে দেখিয়া যান। নীলরতন বাবুই বরাবর চিকিৎসা করেন। উৎকৃষ্ট দোকানের ঔষধ, উৎকৃষ্ট পথ্য রোগীকে সর্ব্বদা দেওয়া হইত। কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতে লাগিল বলিয়া তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করা মনস্থ হয়; কিন্তু তখনও তাঁহার শীঘ্রই মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল না। সে জন্য গঙ্গাতীরে একটী ঘরের আবশ্যক হয়। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, নিমতলার ঘাটের নিকট একটী ঘাটের উপর যে ঘর আছে, তাহা মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার তত্ত্বাবধানে আছে এবং তাঁহার অনুমতিপত্র পাইলে সেই ঘর ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা মহারাজার অনুমতিপত্র পাওয়া সহজসাধ্য নহে বিবেচনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে শ্যাম বাবু উক্ত লাহা বাবুদের বাটীর একজনের নামে এক খানি পত্র লেখেন—আমি সেই পত্র খানি লইয়া গিয়াছিলাম। যাঁহার নামে পত্র লেখা ছিল, তাঁহাকে পত্র দিলে তিনি দুই মিনিটের মধ্যে মহারাজার অনুমতিপত্র আনিয়া দিলেন এবং তিনি আমাকে যেরূপ যত্ন ও সম্মান করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। যে শ্যামাচরণ ছেঁড়া চটী ও ছেঁড়া জামা গায় দিয়া বেড়াইতেন, তাহার পত্র লইয়া যেরূপ আদর ও সম্মান পাইয়াছিলাম, বোধ হয় কোন লক্ষপতির পত্র লইয়া গেলেও ওরূপ পাইতাম না। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কোন না কোন কারণে উক্ত লাহা বাবু শ্যামাচরণকে চিনিয়াছিলেন।

আমি শ্যামাচরণের স্বদেশের কথা বলিতেছিলাম। তিনি স্বদেশে আসিয়াই বাগেরহাট এণ্ট্রেন্স স্কুলে পড়িতে থাকেন এবং শেষে বাগেরহাটেই থাকিতেন। সেই সময়ে বাগেরহাটের পোষ্টমাষ্টার মহাত্মা হরিনাথ দাসের প্রভাব বাগেরহাটের স্কুলের অনেক ছাত্রের উপর বিশেষ প্রতিফলিত হয়—শ্যামাচরণের উপর ত হইয়াছিলই। শ্যামাচরণের জীবনের এই অংশ আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু সতীশচন্দ্র বসু, এম্ এর বিশেষ পরিচিত এবং তিনি তাহা আপনাদের নিকট বিবৃত করিবেন।

শ্যামাচরণ বাগেরহাট স্কুল হইতে

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া বরিশাল গিয়া তত্রস্থ সুপরিচিত ব্রজমোহন ইনিষ্টিউশনে ১৮৮৭ সালে প্রথম বিভাগে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া রিপন কলেজ হইতে ১৮৯০ সালে F. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং ১৮৯১ সনে Free church Institution এ B. A. পড়িতে আরম্ভ করেন।

শ্যামাচরণ বরাবর রীতিমত ডায়েরী লিখিতেন এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলকে ডায়েরী লিখিতে অনুরোধ করিতেন। ১৮৯১।৯২।৯৩ এই তিন বৎসরের ডায়েরী এক্ষণে তাহার পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা বাবু নলিনাক্ষ রায়ের নিকট আছে এবং আমি তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া শ্যামাচরণের মানসিক ভাব কিরূপ ছিল; তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্যামাচরণের অনেক কাগজ পত্র বিশেষ তাঁহার অনেকগুলি ডায়েরী অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ব্রহ্মদেশে রহিয়াছে।

শ্যামাচরণ ১৮৯১ সালে নববর্ষের প্রথম দিবস কি প্রার্থনা করিতেছেন, শ্রবণ করুন এবং তাহা হইতেই মানুষটা কি প্রকৃতির, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

"O Lord thou art my only hope both in this life and in the life to come. What I will I cannot. Oh my ever kind Father allways keep this poor child under your direct care.

Accept, Oh Father, my hearty gratitude and thankfulness for your kind and constant care of me during the last twelve months. I have gone through several vicissitudes have met with many perils and despairs but thy kind grace protects me all along. Enable me now to struggle the fullest vigour and activty for discharging my duties faithfully in this new year."

তার পর শুনুন প্রার্থনা :—

"Bless my father, my brother, any beloved friends and my countrymen. They are and so I am. Bless them and love them and I shall be blessed. To all my friends I wish a happy new year. Thy will be done."

ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া যেমন নূতন বর্ষের কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তেমনি প্রতি দিবস প্রাতে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন এবং প্রতি-চিন্তায় তাঁহাকে সহায় মনে করিতেন এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিতেন। এই ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরতা এবং সতত কার্য্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রধান লক্ষণ ছিল। কিন্তু নিউটন যেরূপ জ্ঞানবারিধির কূলে দাঁড়াইয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছেন ভাবিতেন, তিনিও সেইরূপ ভাবিতেন—"Want of vigorous activity and resignation to the will of God are sadly wanting in me." (3rd January, 1901) সুখ যে জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের দেশে বঙ্কিম বাবু এ কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে অনেক দার্শনিক তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্যাম বাবুর কলেজে তাঁহার দর্শনের অধ্যাপক একদিন ঐ কথা বলিয়াছিলেন—যদি তাহাই হয়, শ্যাম বাবু কিরূপ সুখ চাহেন? "Need we not go through the unbearable difficulties of life." তাহার পরের কথাটী সাধারণের কাণে কেমন একটু বিচিত্র শোনায়:—"Happiness without suffering or misery is nothing." এই একটী মাত্র ছত্রে লোকটীকে চিনিতে পারা যায়। তাঁহার সুখের ধারণা বাড়ীগাড়ীতে নয়, সোণায় রূপায় নয়, যশ মানে নয়, ধনে জনে নয়, তাহার সুখ ছিল Suffering এবং Misery রোগীর জন্য রাত্রি জাগিয়া এবং দরিদ্রকে

নিজের মুষ্টিমেয় অন্নের অংশ দিয়া। ১৮৯১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ডায়েরীঃ—

"Spent great portion to attend over Huricharan Ganguli who is suffering from chickenpox. When he begins to say who is to nurse him here—any heart becomes deeply moved. I consoled him saying that I should do all that was needed for him. He wants to go home to his mother I tell him that "I shall do all that your mother would do for you."

ইহা হইল প্রাণের কথা—কিন্তু বিনয় লেখাইতেছে—"though I was conscious that I should not be able to keep a bit of my words." ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে শ্যাম বাবুর জনৈক বন্ধু বাবু বসন্তকুমার সেন রাজার লেনে একটী মেসে থাকিবার সময় কলেরা—রোগে আক্রান্ত হন। সে ভীষণ কলেরা—তাঁহার জীবনের আশা অত্যল্পই ছিল। সেই সময়ে শ্যাম বাবু ও তাঁহার অন্যান্য অনেক বন্ধু সেই রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করেন। এই সময়ে শ্যাম বাবু প্রাতঃস্মরনীয় রামতনু লাহিড়ীর পুত্র বাবু বসন্তকুমার লাহিড়ীর সহিত পরিচয় এবং তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া লেখেন :—

"I am so glad and happy to be acquainted with Basantokumar Lahiri son of Ramtanoo Lahiry. This gentleman has devoted his whole life to nurse the sick especially in epidemics of cholera like diseases. He is a true philanthropist. He volunteers his services where there is no acquaintance of his and does anything and everything for the patient. He likes me. I am glad to see God's mercy on me."

বসন্ত বাবুর সে সময়ে পীড়িতের সেবা করাই জীবনের উদ্দেশ্য ছিল এবং অনেক লোককে তিনি মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনেন। শ্যাম বাবুর সহিত মিশিয়াছিল ভাল। আমার বিশ্বাস এই সময়েই Faternity মত একটা সমবেত যত্ন ও চেষ্টায় রোগী ও দুঃখীর দুঃখ দুর করিবার ইচ্ছা শ্যাম বাবুর মনে বদ্ধমূল হয়। ১৮৯১ সালের মে মাসে তিনি যশোহর-খুলনা সম্মিলনীর এর delegate হইয়া যশোহর জিলার নানাস্থানে নপাড়া, বিবাকদি, বাগুটিয়া, সিঙ্গা, নড়াইল, দিঘলকান্তি, ধল্লাপাড়া, বিনোদপুর, মাগুরা, নারায়ণপুর, গয়েসপুর প্রভৃতি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সভাসমিতি সংস্থাপন পূর্ব্বক, বক্তৃতা দিয়া, যাহাতে বালকগণের উন্নতিসাধন ও বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি কিরূপ কার্য্য করিতেন এবং এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা এক দিনের ডায়েরী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

ডায়েরী ১১ই মে, ১৮৯১

আজ আমার জীবনের এক নূতন সুখের দিন। দয়াময় ভগবানের ইচ্ছায় যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভার প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়া ৬৭টি গ্রামের সমবেত দেশবাসীদের সম্মুখে বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হই। সভাগৃহ অতি সুন্দররূপে পুষ্প-পত্রে সুসজ্জিত হয়েছিল। সভাস্থলে সকলে উপস্থিত হইলে প্রাতে বেলা ৮টার সময় আমি ও আমার বন্ধু অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীশবাবু সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সভার কার্য্যারম্ভ হয়। সভাপতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া বাবু নলিনীকুমার সেন আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলে আমি প্রথমে ও পরে শ্রীশবাবু সভামণ্ডলীকে যথাসাধ্য প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে চেষ্টা করি। তাঁহার কৃপায় যতটুকু পারিলাম ও উপযুক্ত মনে করিলাম বলিলাম; সকলে নিস্তব্ধ হয়ে মনোযোগ সহ আমার কথা শুনিলেন দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। অনেকেই সভ্য হইলেন এবং চাঁদা ও এককালীন দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। দুইজন দুইটী টাকা নগদ এককালীন দান করিলেন। অনেক যুবক ও বালক চাঁদা দিতে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। আমি সভার উদ্দেশ্য, কার্য্যক্ষেত্র এবং বালকদিগের নীতিপূর্ণ

এবং শিক্ষিত জীবনের আদর্শ এবং আবশ্যকতা বিষয়ে যতটুকু পারি বলিলাম, আমি বাস্পীয়পোতে অবস্থানকালীন কতিপয় এতদ্দেশীয় শিক্ষিত বন্ধুর মুখে এ দেশের শিক্ষার শোচনীয় অভাববার্ত্তা শুনিয়াছিলাম, তাই বালক বন্ধুদিগকে সযত্নে উচ্চ উচ্চ আশার সহিত লেখা পড়া শিখিয়া বড়লোক হইবার জন্য বলিতে চেষ্টা করি। তবে মূর্খ হইয়া বিদ্যার কথা, কলঙ্কপূর্ণ চরিত্রের হইয়া নীতিপূর্ণ চরিত্রের কথা যতদূর সম্ভব হয় ও শোভা পায় তাই হইয়াছে। যদি কোন খারাপ বা পাপী লোকের মুখ হইতে কোন ভাল কথা বাহির হইয়া কাহারও প্রাণে লাগে ও তাহাকে কোন সুফল ফলে, তবে সে কথা ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সকলেই জানেন। তাই সভাতে শুনিলাম, একজন আমাদের বন্ধু ও সভার জন্য বিশেষ উদ্যোগী এই গ্রামবাসী ভদ্রলোক কাঁদিয়াছিলেন আর একজন ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধলোক আমি যখন যুধিষ্টিরের সত্যবাদীতা সম্বন্ধে বলিতেছিলাম, তখন বড়ই moved হইয়াছিলেন।

এই যশোর-খুলনা union উপলক্ষে মাগুরায় অবস্থানকালে এক দিবস একত্র চারিজন অন্ধকে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল:—

"I am really touched to see four blindmen of my country in a place. We all are sons of God. We mutter for want princely luxury they are exceedingly glad to get one pice. Observe the vast difference. Are we better than beasts?"

সতত এই প্রকার কঠিন আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা তিনি স্বীয় গন্তব্য পথ স্থির রাখিতেন নিমেষের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্ট হয়েন নাই।

১৮৯১ সালের মে মাসের জমা খরচে দেখিতে পাইলাম, জমা ৩০৲ টাকা, কর্জ্জ করিয়া—তাহার মধ্যে যশোর-খুলনা union এর দান ১৫৲ টাকা।

বাঙ্গালী জীবনের সর্ব্বপ্রধান দোষ আলস্য—অবশ্য তাহার কারণ আছে। বহু কালের পরাধীনতা এবং জলবায়ুর দোষ তাহার কতক কারণ হইতে পারে, কিন্তু এই দোষে বাঙ্গালী জড়প্রায় ও উন্নতি-বিহীন হইয়া আছে; এই আলস্য পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদা কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি যাহাতে বাঙ্গালীর হয়, তদ্বিষয়ে সকলের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে শ্যামবাবুর দোষ অপর দিকে ছিল। তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার নিজের ভাষায় শুনুন—

"I am being experienced of this great fact that many-things cannot simultaneously be done with full success. I shall attend every sickman I happen to know. I shall be a leader and an instructor of the students of a college or two, I shall be a delegate and a active member of the J. K. union. I shall be a regular student. Now all these are not possible in natural world simultaneously."

শ্যাম বাবুর সুখ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। আর এক দিন কি লিখিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন:—

"আমি নাকি বলি সুখী হইতে পারিলাম না। এর চেয়ে blaspheming আর কি হইতে পারে? পটলডাঙ্গায় one of the first class building এ দোতালায় একটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহে একাকী থাকি—টেবিল চেয়ারে বসি, সম্মুখে Shakespeare, Milton, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Shelly, Sully, Bacon আরও কাদম্বরী, Illiad, ম্যাটসিনির Life, Treasures of British Elouqence গীতা, ভাগবত কত বহই রহিয়াছে"।

তারপরে নিজের কাপড়, জামা, জুতা, আছে বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন এবং অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পুনরায় কহিতেছেন;—

"রাস্তা দিয়া সাধ্য কি এক মুহূর্ত্ত অসাবধান হইয়া হাটিব—এত বেশী লোকে চিনিয়াছে যে, তাহা বলিতে পারি না। এত পরিচয় সহ্য হয় না। বড় mess এ থাকি, বড় কলেজে পড়ি, বড় লোকের আত্মীয়, বড় লোকের ছেলের বন্ধু; সর্ব্বাপেক্ষা ধনীলোকের ছেলেদের সহিত এত মেশামেশি

—সভায় বক্তৃতা করি, সমাজে যাই, প্রতাপ বাবুর শিষ্য, কংগ্রেসের volunteer; এতগুলি চিনিবার কারণ আর সহ্য হয় না—এত পরিচয় সহিতে পারি না—ঘরে দুয়ার দিয়া একাকী থাকিতে ভাল লাগে।”

শ্যামাচরণ আপনাকে লুকাইতে সতত যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু যে অগ্নিকণা তাঁহার হৃদয়ে ছিল, তাহার জন্য তিনি সুস্থির হইয়াও থাকিতে পারিতেন না। যেখানে বিপন্ন আর্ত্ত রোগী, সেখানে শ্যামাচরণ। এত দিন একাকী যুদ্ধ করিতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সমবেত যত্ন ও চেষ্টায় অধিক ফল লাভ হইবে আশায় একটী দল সংগঠিত করিবার ইচ্ছা হয়—তাঁহারই ইচ্ছা ক্রমে, তাঁহারই আশা ভরসায়, তাঁহারই ভাবে প্রণোদিত হইয়া, তাঁহাকে মাথায় করিয়া, তাঁহার কয়েকটী বন্ধু ১৮৯১ সালের ২১ জুন তারিখে Relief Fraternity সংস্থাপন করেন। শ্যাম বাবুর সে দিবসের ডায়েরী :—

“এত দিনে দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় তিনি যে ইচ্ছাটুকু প্রাণের মধ্যে সে দিন সন্ধ্যার সময় ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে এনে দিয়েছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইল—ভবিষ্যৎ তাঁহার হাতে। অদ্য পূর্ব্বদিন নির্দ্দিষ্ট সময় ১টার সময় (punctually) সিটি কলেজে The Relief Fraterintyর প্রথম অধিবেশন হইল। জন্মদিনে অনেকেই—কেন সকলেই মহানন্দ প্রকাশ করেন ও সকলেই কর্ত্তব্য দুরূহ বলিয়া স্বীকার করিলেন। ১২টী ভ্রাতার দশটী উপস্থিত হইয়াছিলেন—১০ জনেই প্রাণের কথা বলিলেন। আমি বাটী হইতে যে ৫০টী নিয়ম লিখিয়াছিলাম, তাহা সংশোধিত করা হইল। রোগীর সেবা শুশ্রূষা এবং গরীব দুঃখীর সাহায্য প্রধান উদ্দেশ্য। sister লওয়া হইবে, brothers এর সংখ্যা বেশী করা যাইবে—“শান্তি সম্প্রদায়” বাঙ্গলা নাম।”*

* উৎসাহী ধর্ম্মভীরু যুবকদল মধ্যে যাঁহারা এই “শান্তি সম্প্রদায়ের” সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ১২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ডাক্তার ফকির চাঁদ সাধুখাঁর নিকট আবেদন করিলে সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

এই ২১ এ জুন তারিখে পুণ্যশ্লোক শ্যামাচরণের বহু দিনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিলাভ করে—তাঁহার কার্য্য করিবার নির্দ্দিষ্ট পথ হইল। এই দিবসের পরে তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেই খানে Relief Fraternityর শাখা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। Relief Fraternityর জন্মের দেড় মাস পরে ১৮৯১ সালের ১১ জুলাই তারিখে তিনি ব্রহ্মদেশের জন্য যাত্রা করেন—মধ্যে মধ্যে অল্প সময় ব্যতীত জীবনের অবশিষ্ট কাল ব্রহ্মদেশে অতিবাহিত করেন এবং ব্রহ্মদেশই তাঁহার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত বলবতী ছিল—যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুননা, গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গী ছিল এবং অধ্যয়ন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। জ্ঞান ভিন্ন মানুষের প্রকৃত নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হইতে পারে না, তাঁহার বিশ্বাস ছিল—তজ্জন্য নিজে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং অপরকেও তজ্জন্য যত্নবান হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। ব্রহ্মদেশে গিয়া তিনি সমস্ত দিন চাকরী উপলক্ষে কঠিন পরিশ্রম করিতেন এবং রাত্রিতে গৃহে আসিয়া night school করিয়া জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করিতেন। প্রথমে বর্ম্মায় তিনি Military police এ চাকরী করিতেন। স্কুলে সিপাহী ছাত্রের সংখ্যাই অধিক ছিল—সেই অমিত বলশালী সিপাহীগণ ক্ষীণ, দুর্ব্বল, রুগ্ন বাঙ্গালীর নিকট শিষ্য ভাবে সমাগত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত, সে দৃশ্য দেখিবার! বিদ্যালয়ের একটু বিবরণ শ্যামাচরণের একখানি পত্র হইতে শ্রবণ করুন।

One two or more of the Native officers, noncommissioned officers, sepoy, shop-

keepers contractors, Hospital Assistants, the mosque priests, steamer seraings and crews, elephant mahoots, peons and coolis, either have been or are attendants of the class

very rarely could I at that early time get young boys as my pupils. As time went on Myitkying was changed a—district was opened here and God granted me too a special favour I got some simple little friends to attend the class, the number of whom through His grace has been increasing during these few months owing to the new people coming to the station and I have now got a small school in my room—18 boys and 14 men (not a pice I am taking from any of them as school-fees) and to all of the boys as well as some men I have given books paid for by me.

ব্রহ্মদেশে কি ভাবে তাঁহার দিবস অতিবাহিত হইত, তাহা এক দিনের ডায়েরী শ্রবণ করিলে কতকটা জানিতে পারিবেন—

"আজ প্রত্যূষে উঠিয়া—দীপ জ্বেলে পড়ি। পূর্ব্ব ফরসা হইলে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া রন্ধন পানার্থ দুই টিন জল আনিতে যাই, পরে হাত মুখ ধুই। প্রার্থনা ও পিতৃপাদোদক। Fort হইতে ration একজন লোক দ্বারা লইয়া আসি। কিছুকাল পড়াই। নিজে পড়িয়া সুখ, পরকে পড়াইয়াও সুখ। রাঁধি, আহার করি, আফিসে যাই। আফিসে আমি একা একটা পর্য্যন্ত কাজ করি—পূজার ছুটী—একজনকে মাত্র যেতে হয়। বাসায় আসিয়া—স্নান, গৃহধৌত ও বাগানের flower and vegetable garden বন্দোবস্ত করি। এখানে মনে করিয়াছি, এই একটা বিশ্রামের কাজ হইবে—এখনকার অভ্যাসে ভবিষ্যৎ জীবনেও কাজ হইতে পারে। পড়ি—R. F. চিঠি—লোক আসেন, নানা কথা। রাত্রে নিমন্ত্রণ, অধ্যয়ন, সন্ধ্যায় তাঁহার নাম।"

একটী মাত্র পতনশীল পত্র দেখিলে যেরূপ বায়ুর গতি বুঝিতে পারা যায়, এই একটী দিনের ডায়েরী দেখিলেই তাঁহার জীবন বুঝা যাইতে পারে। যতদূর সম্ভব দরিদ্র ভাবে থাকিতেন—নিজে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন, তাহাও শেষে প্রত্যহ হইত না। একদিন ডায়েরীতে দেখিলাম:—আজ তিন দিন পরে দুইটী ভাত রাঁধিয়া খাইয়া বড় তৃপ্তি হইল।" কাপড়, জামা, জুতায় অতি যৎসামান্য ব্যয়িত হইত—নিজের পীড়ায় সময় ও অর্থ ব্যয় করিতেন না—১৫০।২০০, টাকা মাসে উপার্জ্জন করিতেন, নিজের যৎসামান্য খরচ ব্যতীত ও ভ্রাতার খরচ ব্যতীত যাহা কিছু থাকিত, তাহা পরের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেন। তিনি মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে advocate হইয়াছিলেন এবং advocateship পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফি যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না—কিন্তু ঐ সময় তাঁহার একটী বন্ধুও ঐরূপ বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে জানান। শ্যাম বাবু নিজের পরীক্ষার ফির জন্য যে ২৫, টাকা যোগাড় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রাপ্তি মাত্র দিয়াছিলেন এবং তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার সম্পত্তির মধ্যে একটী ষ্টীলের বাক্স আছে, তাহাও প্রয়োজন হইলে বিক্রয় করিয়া লইতে পার। পরের কোনও অভাব দেখিলে—স্বাস্থ্য অথবা অর্থ অথবা জ্ঞান কোনও প্রকারের অভাব দেখিলে—তিনি আপনার শারীরিক বা আর্থিক অবস্থার কথা একেবারে বিস্মৃত হইতেন—যাহার অভাব তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অজ্ঞান হইতেন এবং কায়মনোবাক্যে যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। কলিকাতায় মাত্র Relief Fraternity করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন নাই—যখন যেখানে গিয়াছেন, সেই খানে Fraternity স্থাপন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম, কুচবিহার, ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে ১০।১২টী Fraternity হইয়াছে এবং তাঁহার হৃদয়ে জলন্ত আশা ছিল যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র—England, Australia, Japan, America য় Fraternity স্থাপন করিবেন! Fraternity র আবশ্যকতা

আছে কিনা, বোধ হয় সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু Fraternity দ্বারা কাজ হইতেছে কি না, সকলে সে সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। Fraternity দ্বারা কার্য্য সকল সময়ে সমান ভাবে হয় না, তবে যখন শ্যাম বাবু এখানে থাকিতেন, তখন যেরূপ কার্য্য হইত চক্ষে দেখিয়াছি, সে আশ্চর্য্য! প্রত্যহ বৈকালে Fratenityর ভ্রাতাগণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখিতেন, কোন স্থানে সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা? তাঁহারা report দিলে যিনি Frater-Major ছিলেন, তিনি কোন্ স্থানে কোন্ ভাবে কাহার দ্বারা সেবা ও সাহায্য হইবে, স্থির করিতে দিতেন। যুদ্ধের সময় কাপ্তেনের কথা সৈনিক উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, কিন্তু Frater Major এর কথা কখনও কোনও ভ্রাতা লঙ্ঘন করে নাই। শ্যাম বাবুকে অনাহারে, অনিদ্রায় ৩।৪ দিবস সমভাবে কলেরা রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে দেখিয়াছি এবং তাঁহার উজ্জ্বল প্রভাবে শক্তিবান হইয়া তাঁহার ভ্রাতারাও কার্য্য করিয়াছে। শ্যাম বাবুর বড় ইচ্ছা ছিল যে, এই কলিকাতা সহরে Fraternityর একটী নিজের বাড়ী থাকে—যেখানে সকলে রোগ দুঃখের সংবাদ দিতে পারে, যেখানে অসহায় রোগীগণকে আনিয়া সেবা শুশ্রূষা করা যাইতে পারে। তাঁহার সে আশা কি কোন দিন ফলবতী হইবে না?

সেই অলোকসামান্য মহাপুরুষ ব্রহ্মদেশে গিয়া কঠোর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া রাত্রিদিন পরের সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। যখন ব্রহ্মদেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩২ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, তখনই মনে হয় যে, আমরাই তাঁহার জন্য অপরাধী। মনে হয়, কেন তাঁহার চরণে ধরিয়া তাঁহাকে এখানে রাখিলাম না? কেন এই সোণার কলিকাতায় গৃহেগৃহে গিয়া একটী করিয়া টাকা ভিক্ষা আনিয়া তাঁহার Relif Fratenityর বাড়ী করিয়া দিলাম না? এখানে Fratenity র একটী বাড়ী করিয়া দিলে ও এখানকার কাজ কর্ম্ম ভাল করিয়া চলিতে লাগিলে বোধ হয় তিনি অন্যত্র যাইতেন না। তাঁহার সেই অমূল্য জীবন গেল, কিন্তু আমরা তাঁহার জন্য কি করিতে প্রস্তুত আছি? মহাপুরুষেরা চিরকালই স্বীয় জীবন বলি দিয়া সাধারণ মনুষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা আজ কি পাইলাম!

যদি তাঁহার অমর আত্মার অমরত্ব লাভ করিয়া Relief Fraternity এদেশে ও বহুদেশে চিরকাল জীবিত থাকিয়া রোগীর সেবা ও দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে থাকে, তবে তাঁহার আজীবনের দুঃখ, ক্লেশ সার্থক হইল—যদি তাঁহার প্রোজ্জ্বল প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গের শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী ব্যসন-বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নরনারীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, তবেই তাঁহার martyrdom সফল হইয়াছে মনে করিব—যদি তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী মনুষ্যত্ব লাভ করে, তবেই তাঁহার এদেশে জন্ম ও মৃত্যু নিরর্থক হয় নাই বুঝিব। জগদীশ্বর যে তাঁহার ন্যায় লোককে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেই অনুমান হয় যে, এদেশের ভবিষ্যৎ নিতান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে।

শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়।

৺ শ্যামাচরণ রায়। (২)

শোকস্মৃতি।

সুদূর গগন-গায় যে তারকা আলোক বিলায়,
নিভৃত কানন মাঝে পুষ্প কত সুষমা ছড়ায় ;
খনি বক্ষে গুপ্তভাবে, সমুজ্জ্বল মণি কত রয় ;
এ জগতে তাহাদের কয়জন লয় পরিচয় ?

স্বার্থ লয়ে হেথা দেখি, কি সংগ্রাম চলিছে নিয়ত ;
পরনিন্দা, পরচর্চ্চা জীবনের যেন চির ব্রত ;
অশান্তির কি আগুন, জ্বলিতেছে নিশি দিন দহি,
ধরিত্রী জননী মত এ যাতনা আছে তবু সহি।

হেথা যশোলাভ তরে, করে দান, করে উপকার—
উপাধির বিনিময়ে, লক্ষমুদ্রা দেয় উপহার ;
প্রশংসার করতালি, করে সভা কম্পিত যখন ;
মনে হয়, আড়ম্বরে সত্য বুঝি হইল গোপন।

হেথা দেখি সেই বড়, যেই জন গাহে নিজনাম,
গর্ব্বস্ফীত বক্ষ তুলি, বুঝি লয় আপনার দাম ;
কলকণ্ঠে মুখরিত, সসাগরা ধরা তার কাছে,
চারিদিকে দেখ চেয়ে, হেথা তার অভাব কি আছে!

তাই আজ মনে পড়ে, তোমার সে নীরব সাধনা,—
দেবতার প্রিয় তাই, অন্তরের ধ্যান আরাধনা ;
তাই আজ মনে পড়ে, নিষ্কাম সে সেবাব্রত তব
দেখাইবে সুমহান, পথ এক লক্ষ্য অভিনব।

তুষিয়াছ সুখশান্তে ক্ষুধাতুর দেখিলে নয়নে,—
নিজ পিপাসার জল দিতে তুলি পর প্রয়োজনে।
জ্বালাময় প্রাণে তুমি ঢালিয়াছ স্নেহ সুধাধারা,
এ জগতে কে দেখেছে, ভালবাসা হেন আত্মহারা!

চিরদিন পরসুখে সুখী, তাই পাইয়াছ সুখ,
আত্মসুখে মগ্ন মোরা, সুখ তাই এমনি বিমুখ,—
সকলের ছিলে তুমি, তাহাদের তরে ছিল প্রাণ,
কিন্তু হায়! হে ঈশ্বর, অসময়ে হ'ল অবসান।

সুরভিত যে কুসুম, প্রথমে সে কীটদষ্ট হয়,
সুমধুর ফলকুল পাকিবার না পায় সময় ;
জগতের রত্ন যারা কেন তারা আগে চলি যায়,
প্রকৃতির এ রহস্য রবে বুঝি অন্ধতমসায়!

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়।

৺ শ্যামাচরণ রায়। (৩)

> "Full many a gem of purest race serene
> The dark unfathomed caves of ocean bear ;
> Full many a flower is born to blush unseen
> And waste its sweetness in the desert air."

শ্যামাচরণ বাবুর জীবনী অতি সুন্দর। তাঁহার জীবনের ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে যে সমস্ত কার্য্য সাধিত হইয়াছে, যদি তিনি দীর্ঘায়ু হইতেন, তবে আরও অনেক মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন। তাঁহার জীবনের মূল্যবান অংশ ব্রহ্মদেশে যাপিত হইয়াছে। সুতরাং কলিকাতাস্থ অনেকেই তাঁহাকে জানেন না। ছাত্র-জীবনের যে কয়েক বৎসর বঙ্গদেশে যাপন করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে অনেক সৎকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তবে তিনি গোপনে কার্য্য করিতেন বলিয়া বিশেষ নামজাদা হইতে পারেন নাই।

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ রায় সকলের নিকট পরিচিত হইতে পারেন নাই, পরিচিত হই-বার ইচ্ছাও ছিল না। নাম ও যশ ক্রয় করার ইচ্ছা তিনি কখনও করেন নাই; গোপনে কার্য্য করিয়াই তিনি সুখী হই-তেন। আর্ত্তের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি কার্য্য করিতেন। যশোলাভের প্রত্যাশী তিনি ছিলেন না। একখানি চিঠিতে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন ;—

"There are some amongst the *Relief Fraternity* who really deserve the name. I am an exception having no worth at all."

"He that likes to drum that he belongs to such a brotherdood or he that hopes to be landed and talked of by the public is no brother of the Fraternity."

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি গোপনে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য মনে করিতেন। এই গোপনে কার্য্য করার জন্য তাঁহার বন্ধু বান্ধব ব্যতীত তিনি অন্য কাহারও নিকট পরিচিত হইতে পারেন নাই। তবে একবার যিনি তাঁহাকে চিনিয়াছেন, তিনি কখনই তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার সরলতা, সত্যবাদিতা, স্বার্থত্যাগ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, পরোপকার, স্নেহপ্রবণতা, কর্ত্তব্যবোধ প্রভৃতি এত অধিক গুণ ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে লোকসমাজে যশস্বী হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বনের ফুলের ন্যায় বনে ফুটিয়া নীরবে বনেই লুকাইয়া গেলেন—সে কুসুমের সৌরভ দেশব্যাপী হইতে পায় নাই।

শ্যামাচরণ বাবু যখন ফ্রিচার্চ ইনষ্টিটিউসনে বি,এ পড়েন, তখন যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী সভার সংশ্রবে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। উক্ত সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সেনহাটী নিবাসী শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বাবু হরিচরণ সেন মহাশয়ের একটী পুত্রের ব্যাধির সময় তাঁহারই বাটীতে শ্যাম বাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। স্বর্গীয় বন্ধুর মিষ্ট ব্যবহারে আমি এত প্রীত হইয়াছিলাম যে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তিতে আমি যেন আকৃষ্ট হইলাম। সিটি কলেজে আমাদের একটী সমিতি ছিল। আমরা নাম দিয়াছিলাম City College Students Association. ঐ সমিতিতে শ্যামবাবু যোগদান করিলেন। সমিতির উন্নতিকল্পে তাঁহার এত চেষ্টা ছিল যে, ফ্রিচর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসন হইতে তিনি আসিয়া সমিতির কার্য্যে যোগদান করিতেন ও যথেষ্ট উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিতেন। একবার সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তিনি সুন্দর সুন্দর কথা উদ্ধৃত করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং প্রত্যেক সভ্যকে এক এক খানি প্রদান করেন, সমিতির সকল সভ্য তাঁহার উৎসাহপূর্ণ বাণীতে ও তাঁহার প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি আদর করিয়া সমিতির নামকরণ করিলেন Sweet friends association. বাস্তবিকই তাঁহার উপস্থিতিতে সমিতি যেন মধুময় হইয়া উঠিল। সেই সমিতিতে যে শিক্ষালাভ করিয়াছি, এ জীবনে তাহা ভুলিব না। তিনি সমিতিকে কিরূপ ভালবাসিতেন, নিম্নলিখিত পত্রগুলি হইতে তাহা প্রকাশ পাইবে। ব্রহ্মদেশ হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

"Yes, I remember Sweet friends association and that remembrance to me is sweeter than many thing. I am glad to hear that you are meeting again under the same name. I wish you all to be ever sweetest friends and sweetest children of God.

"There is no importance of the name if you lose the spirit. So be sweet in your throughts, deeds and speeches if you are really earnest to call yourselves sweet friends."

অন্য পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—

"জগদীশ্বর কৃপা করে যে কয় দিন আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে মিশিতে দিয়াছিলেন, সেই কয়দিনের কথা স্মরণ করিয়া আজি যে কত অতুলনীয় পবিত্র আনন্দ পাই, কত দুঃখের মধ্যে সে স্মৃতিতে কত যে নির্ম্মল সুখ পাই, তাহা বলিতে পারি না। আপনি অবকাশ সময়ে আপনার Sweet friends রা কেমন আছেন, যদি দয়া করে লেখেন, তবে বড়ই সুখী হইব। Association এর সকলকে আমার most hearty complements জানাইবেন।"

"আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়াছি, মন তাহাতে তৃপ্ত হইল না। মনে হল কত কথা বলা হয় নাই, কত কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

আমাকে ভাল করিয়া পত্র লিখিবেন। আপনাদের সকলের কথা ভাল করিয়া জানাইয়া আপনাদের শ্যামকে সুখী করিবেন। '

প্রাণের আশা কিছুতেই মিটে না। আপনার পত্র পাইলাম, কিছুদিন পরে মার্চ্চ মাসের দাসী আসিল, তাহাতেও দেখি, Sweet friends association এর নাম রহিয়াছে। এটী আপনাদের সমিতি কি না, জানি না; তবু ইহাতেই আপনাদের কত কথা প্রাণ মাঝে জাগাইয়া দিল। তখন ইচ্ছা হইল, এ মধুর বন্ধুদের আরও কিছু শুনি। আমাকে কে বলে? আমি অতি দূরে।

আমাকে লিখিবেন, এ বৎসরেও নব বর্ষের উৎসব করিলেন কি না? করিয়া থাকিলে সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠাইবেন। আপনাদের সেবারকার মিলিত সঙ্গীগণের এবারেও কেহ আছেন, নতুনা কতজন পেয়েছেন বলিবেন।

আপনারা সকলেই অমিয়মাখা সখাগণকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবেন, সর্ব্বদা কর্ত্তব্যসাধনে সযত্ন থাকিবেন; সুখে, অসুখে সকলে সকলকে দেখিবেন। ঈশ্বর না করুন, যদি কখনও কাহারও অসুখ হয়, আপনি দেখিবেন—আপনার ভ্রাতাগণকেও তাঁহাকে দেখিবার জন্য সংবাদ দিবেন। সকলে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া থাকিবেন।"

তিনি যেমন এই সমিতিটীতে এত ভালবাসিতেন। সে সমিতির কোন সভ্যই তাঁহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।

তিনি যশোহর-খুলনা সম্মিলনী সভার কার্য্যকরী সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। একবার স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি মফঃস্বলে প্রেরিত হন। আমাকেও ঐ সময়ে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত একত্র বাসে যে কি আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পদে পদে তিনি আমার দোষ প্রদর্শন করাইয়া মিষ্ট ভাবে আমাকে শিক্ষা দিতেন। উক্ত সময়ে তাঁহার যে কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্ম্মপ্রিয়তা দেখিয়াছি, তাহা প্রকৃতই অমানুষিক; বাস্তবিক তাঁহার ভিতরে যে অমানুষিক শক্তি ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শান্তি সম্প্রদায়ের সহিতই তিনি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ছিলেন। তিনিই Relief Fraternity বা শান্তি সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা।

শ্যামাচরণ বাবুর সহিত আলাপের কিছুকাল পূর্ব্বে আমি আমার একটী অধ্যাপকের ভ্রাতার সুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলাম। একদিন রাত্রি ১টার সময় একটী ভদ্রলোক সেই বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি গিয়াই আমাকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন এবং সমস্ত কার্য্য নিজে করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পীড়িত ব্যক্তি তাঁহার কে? তিনি উত্তর করিলেন পীড়িত ব্যক্তিকে তিনি জানেন না। তবে "শরৎ বাবু তাঁহাকে বাসার নম্বর বলিয়া দিয়া এই রোগীর সুশ্রূষার জন্য পাঠাইয়াছেন, সেই জন্য তিনি আসিয়াছেন। এই কথা তিনি বলিলেন। আমি তখন শান্তি সম্প্রদায় কি, এবং তাহার কার্য্য কি, তাহা জানিতাম না, সুতরাং ভালরূপ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কিরকম? আত্মীয় নহে, পরিচয় নাই, তবে এরূপ করিয়া সুশ্রূষা করিবার উদ্দেশ্য কি? আমার মনে কেমন একটা ধাঁধা রহিয়া গেল। তারপর শ্যামাচরণ বাবুর সহিত আলাপের কিছুকাল পরে শান্তি সম্প্রদায়ের উৎসব উপলক্ষে আমি আহুত হই। সম্প্রদায়ের কার্য্যবিবরণী শুনিয়া আমার ধাঁধা ঘুচিয়া গেল এবং সম্প্রদায়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তারপর ঐ Fraternity র কার্য্যে শ্যামাচরণ বাবুর যেরূপ পরিশ্রম দেখিয়াছি, দুই একটী ভ্রাতা ব্যতীত কাহাকেও এত পরি-

শ্রম করিতে দেখি নাই। শ্যামাচরণ বাবুর অনুপস্থিতিতে সম্প্রদায় কার্য্যের তত সন্ধান পাইতেন না, শ্যাম বাবু আসিলে যেন কোথা হইতে এত কার্য্য সংগ্রহ হইত যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনি সম্প্রদায়ের কার্য্যে কেবল কায়িক সাহায্য করেন নাই, আর্থিক সাহায্যও যথেষ্ট করিয়াছেন।

এই শান্তি সম্প্রদায়ের কয়েকজন উৎসাহী ভ্রাতাদিগের দ্বারা দাসাশ্রমের সৃষ্টি হয়। শান্তিসম্প্রদায় ও দাসাশ্রমে যে পার্থক্য টুকু ছিল, সেটুকু কেবল মতদ্বৈধ ঘটায়। শান্তিসম্প্রদায়ের ভ্রাতারা দাসাশ্রমের অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং মনে হয়, উক্ত আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণও শ্যামবাবুর নিকট ঋণী।

শ্রোতৃবর্গ বোধ হয় শ্যামাচরণ বাবুর বিষয় বিশদরূপে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন, এই জন্য সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

শ্যামাচরণ বাবুর নিবাস খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার নিকটে কাড়াপাড়া গ্রামে। তিনি বাল্যজীবনের ১৩।১৪ বৎসর বাটীতে অতিবাহিত করেন। তারপর আর ৭।৮ বৎসরের মধ্যে কতকদিন বাগেরহাটে, কতক দিন বরিশাল এবং কয়েক বৎসর কলিকাতায় যাপন করেন। যে সময় কলিকাতায় ছিলেন, তখন শিক্ষার্থী ছিলেন তজ্জন্য এদেশে বিশেষরূপে পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার জীবনের মূল্যবান অংশ ব্রহ্মদেশেই যাপিত হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না বলিলেই চলে। ভ্রাতাকে লইয়া তিনি কলিকাতা ছাত্রাবাসে থাকিতেন এবং নিজের পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিয়া উভয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন। অভিভাবকের অভাব ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাঁহার বি, এ পাশের প্রতিবন্ধক হইল। তিনি দারিদ্র্যের সহিত তীব্রভাবে সংগ্রাম করিয়া, নিজের শিক্ষালাভের আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়া ভ্রাতার ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনায় আমাদিগকে না বলিয়া গোপনে ব্রহ্মদেশে যাওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। বন্ধুহীন সুদূর ব্রহ্মদেশে গিয়া শ্রদ্ধেয় বাবু হরিচরণ সেন এম এম্ এস্ মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার অভাব বড় তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, তিনি আমাকে অনেক সময়েই স্মরণ করিতেন এবং তাঁহার জীবনের অনেক গূঢ় কথা আমাকে লিখিতেন। তাঁহার ন্যায় সাধুপুরুষের সহবাস আমার জীবনে খুব অল্পই ঘটিয়াছে। তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস অটল ছিল। একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন---

"দুঃখে কাতর হইবেন হউন, কিন্তু ভগবানকে ভুলিবেন না। তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া দুঃখ কষ্টের সহিত সংগ্রাম না করিতে পারিলে আমাদের কিন্তু এজীবনে কোন আশাই বলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। বড় দুঃখে পড়িলে এক এক বার বলিবেন, "If thou slayest me yet I will trust in thee. এটী আপনার শ্যামের একটী গোপনীয় কথা।"

১৮৯১ সালে তিনি ব্রহ্মদেশের কাথা নামক স্থানে চাকরি করেন। ব্রহ্মদেশে গিয়া যে কিরূপ বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, তাহার প্রমাণ একবার আমি একটী বাঙ্গালী বাবুর নিকট পাই। কাথা হইতে একটী বাবু স্বদেশে আসেন। শ্যামবাবু আমার

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি শ্যামাচরণ বাবুর সাধু চরিত্রের অনেক বর্ণনা করেন এবং এক কথায় বলেন, "শ্যামাচরণ বাবুর মত মানুষ নাই।" বাস্তবিকই শ্যামাচরণ বাবুর মত মানুষ পাওয়া সুকঠিন। তাঁহার অদম্য উদ্যম, বালকের ন্যায় সরলতা, সত্যবাদিতা, বিনয় অলৌকিক ছিল। তাঁহার প্রেমপূর্ণ মুখচ্ছবি, সৌম্যমূর্ত্তি, উৎসাহপ্রদীপ্ত সহাস্য বদন ভুলিবার বিষয় নহে। তাঁহার মুখচ্ছবি এত চিত্তাকর্ষক ছিল যে, একদা আমার একটী প্রিয়বন্ধু একটী বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন যে, এই মূর্ত্তিটী দেখিয়া আমার শ্যামাচরণ বাবুর কথা মনে হয়। তিনি অতি প্রিয়ভাষী ছিলেন। সাধুকার্য্যের জন্য তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। স্বার্থত্যাগ পূর্ণমাত্রায় ছিল। যিনি গভীর প্রেম লইয়া এ জগতে প্রেরিত হন, যিনি কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, তিনিই এজগতে প্রকৃত মানব—তিনিই ভগবানের প্রিয় সন্তান। শ্যামাচরণ বাবুই মানব নামের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন।

ব্রহ্মদেশে অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং তজ্জন্য অগ্নির আশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। শ্যামাচরণ বাবু Fire band নামক একটী দল গঠন করেন। যে স্থানে অগ্নিদাহ হইত, এই দলের লোকেরা গিয়া সেই সব স্থানের অগ্নিনির্ব্বাপিত করিতেন। একবার অন্য বাটীর অগ্নি নির্ব্বাপণ করিতে গিয়া শ্যাম বাবুর যথাসর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া যায়।

অনুমান, ১৮৯৪ সালে তিনি মিচিনা উপত্যকায় ছিলেন। তথায় নিজ ব্যয়ে একটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং নিজেও ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে শেষে ঐ Night Schoolটী Day School এ পরিণত হয়। এই স্কুলের জন্য তিনি যে কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে বাহির হইয়াছিল।

একবার তিনি ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের জন্য ব্রহ্মদেশ হইতে ৮০০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন। ২০০৲ বঙ্গদেশে, ২০০৲ বোম্বাই প্রদেশে, ২০০৲ মাদ্রাজে ও ২০০৲ মধ্যপ্রদেশে পাঠাইয়া দেন। বঙ্গদেশে যে ২০০৲ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু বাবু মুক্তিনাথ দাস দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন।

শ্যামাচরণ বাবু অনেক দিন অবধি ব্রহ্মদেশে মিলিটারি পুলিসের ক্লার্ক ছিলেন। কতক দিন ব্যবসা বাণিজ্য করেন এবং জীবনের শেষ অংশে Advocate হইয়াছিলেন। অর্থ তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্তই সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া কিছুই রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

তিনি ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আপামর সাধারণ সকলের সহিত তিনি মিশিতেন। ব্রহ্মদেশবাসীরা তাঁহাকে সমধিক শ্রদ্ধা করিত। তিনি ব্রহ্মদেশীয় বালকদিগকে পড়াইতেন এবং দরিদ্র রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথী ঔষধ বিতরণ করিতেন। ব্রহ্মদেশে আর যে কত কি করিয়াছেন; তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তবে তাঁহার জীবনের ৩২ বৎসর মাত্র বয়সে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলে করিতে পারে না।

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ নিতান্ত অল্প বয়সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনে করিলে নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হয়।

তাঁহার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাঁহারা তাঁহার স্বর্গারোহণে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষুদ্র ঘটনা জানি, কিন্তু সে সব মনে করিতে এত মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয় যে, মুখে ভাষা আসে না। কবির ভাষায় বলিতে গেলে
"No language but a cry."

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (৮)

যে প্রকার বিশৃঙ্খল ভাবে প্রাচীন অধিবাসীদিগের কথা লেখা হইতেছে, তাহাতে অনেক সময় পাঠক মহাশয়দিগের বিরক্তিকর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এ ত্রুটী তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে, কারণ আমরা যখন যাঁহাদের সন্ধান পাইতেছি, তখনই তাঁহাদের কথা প্রকাশ করিয়া সংগ্রহ রূপে রাখিতেছি ; ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় শ্রেণীবদ্ধ করিব, এখন আমাদের সাধ্যাতীত।

বাগুয়াবাজারে বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে চিৎপুররোড পর্য্যন্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর লেন নামক একটী সংকীর্ণ রাস্তা অনেকে দেখিয়াছেন। এই কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী পরলোকস্থ প্রসিদ্ধ গায়ক বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (নুলো গোপাল) পিতা। কালীপ্রসাদ,বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের দৌহিত্রসন্তান। দুঃখের বিষয়, তাঁহার মাতামহ বংশীয় কেহ আছেন কি না, আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই। তাঁহারা বাগুয়ার অতি প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন। নিজ বাগুয়াবাজারের পূর্ব্বদিকে, এখন যেখানে নিয়োগী বাবুদিগের সুবৃহৎ অট্টালিকা বর্ত্তমান, সেই স্থানে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাস ছিল।

কি কলিকাতা, কি সূতানুটী উভয় পরগণাতেই অনেক মুসলমানের বাস ছিল, কিন্তু তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া সুকঠিন। যে কয়জনের যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

সোণাগাজী একটী সুবিখ্যাত স্থান, অনেকে সোণাগাছী বলেন, কিন্তু প্রকৃত নাম সোণাগাজী। ঐ স্থানে সোণাউল্লা নামক একজন দুর্দ্দান্ত মুসলমান বাস করিত। লাঠালাঠী, মারামারী দাঙ্গা হাঙ্গামই তাহার উপজীবিকা ছিল। সংসারে এক বৃদ্ধা জননী ভিন্ন তাহার আর কেহ ছিল না। বাল্যকালে আমরা বৃদ্ধাদিগের মুখে সোণাউল্লার কত অদ্ভুত গল্প শুনিতাম এবং ভয়ে শিহরিয়া উঠিতাম। যতটুকু মনে আছে, তাহা এইরূপঃ—সোণাউল্লা মরিয়া যাইবার পর তাহার জননী কাঁদিতেছিল, পর্ণকুটীরের ভিতর হইতে সোণাউল্লার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধা রোদনে ক্ষান্ত হইয়া শুনিল, "মা তুই কাঁদিস না, আমি মরিয়া গাজী হইয়াছি ; যত দিন বাঁচিয়াছিলাম, তত দিন অনেক লোককে মারিয়াছি, অনেকের মালপত্র লুঠ করিয়াছি, অনেক ক্ষতি করিয়াছি। এখন আমি ঔষধ দিয়া লোকের প্রাণ দান দিব, আর যে আমায় সিন্নি দিবে, তার খুব ভাল করিব, ইহাতেই তোর খোরাক চলিবে।" এই কথা প্রকাশের পর হাজার হাজার নরনারী সোণাউল্লার বাটীর সম্মুখে আসিয়া জমায়েত হইতে লাগিল। জীর্ণশীর্ণ চিররুগ্ন, অন্ধ, খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং বন্ধ্যা,মৃতবৎসা

ইতর ভদ্র নরনারী, মোকদ্দমা প্রভৃতি বিপদ গ্রস্ত সম্ভ্রান্ত, ধনবান, নির্ধন, সকল শ্রেণীর লোকের ভীড়ে রাস্তা ঘাট,মাঠ বাগান পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। টাকা পয়সা ও বাতাসার পর্ব্বত হইল। সকলেই ব্যাকুল অন্তরে সোণাগাজী সাহেবের দোহাই দিতেছে। এক এক জন সম্মুখে আসিয়া ক্ষমতানুসারে সিন্নি দিয়া নিজের রোগের বা দুঃখের কথা বলিলে, বৃদ্ধা "বাবা সোণাউল্লো" বলিয়া, ডাকিত, অমনি ঘরের ভিতর হইতে নাকী স্বরে "কি মা' বলিয়া মৃত সোণাউল্লা গাজী উত্তর দিত। মা আগন্তুকের কথা বলিবা মাত্র আবার নাকীস্বরে উত্তর আসিত, "পুকুরে কলাপাত মোড়া ঔষধ ভাসিতেছে, প্রত্যহ সকালে উঠে একটু জলে ধুয়ে খেতে বল, আরাম হইবে।" রোগী আহ্লাদে সম্মুখস্থ পুষ্করীতে গিয়া দেখে, কলাপাতা জড়ান কি ভাসিতেছে, তুলিয়া লইল, খুলিয়া দেখে,একটু শিকড়; আনন্দে তাহা লইয়া বাটী গেল, এবং প্রত্যহ ব্যবস্থামত সেবন করিয়া দেখিতে দেখিতে আরোগ্যলাভ করিল।

এইরূপে কাহারও ঔষধ পুকুরে, কাহারও ঔষধ কুটীর হইতে পড়িত, কাহারও ঔষধ অন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে লইয়া যাইতে আদেশ হইত। বিপদগ্রস্ত লোকেরা মৌখিক আশ্বাস ও উপদেশ পাইত। আবার কোন কোন লোকের উপর গাজী সাহেব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইতেন, তাঁহার দন্ত কিড়িমিড়ি তর্জ্জন গর্জ্জন, চালের মড়মড়ানী এবং আস্ফালনে উপস্থিত লোকেরা কম্পিত হইয়া পলায়ন করিত। বিকট নাকীসুরে মহা আস্ফালনের সহিত গাজী সাহেব বলিতেন, "ও আমায় ঠাট্টা করিতে এসেছে, ওর সিন্নি রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দে, আমি ওর সপুরী একগার করিব, দেখি ও কেমন ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করে" ইত্যাদি ভয় দেখাইত।

কয়েক মাস পরেই বৃদ্ধা একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিল। মসজিদটী যেমন বৃহৎ, তেমনি সুন্দর। বৃদ্ধার আর কেহ নাই, পয়সারও অভাব নাই, সুতরাং মসজিদ নির্ম্মাণে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিল। উহা সোণাগাজীর মসজিদ বলিয়া বিখ্যাত হইল। ঐ মসজিদের নামানুসারে মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটের নাম হইয়াছে। অর্ম্মির ১৭৫৬ সালের ম্যাপে ঐ রাস্তার কতক কতক অংশ দেখা যায়,তাহাতে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে খানিক খালি জমীর পর একটী বৃহৎ মসজিদের চিত্র অঙ্কিত আছে। ধর্ম্মপরায়ণ বিজ্ঞ মুসলমানেরা প্রেতাত্মা ও বুজরুকী উভয়েরই ঘোর বিরোধী, সেই জন্য কোন বিজ্ঞ মুসলমান সোণাউল্লার গাজীত্বে বিশ্বাস করেন নাই, এবং অসৎ উপায়ে সংগৃহীত অর্থে মসজিদ নির্ম্মিত হইতে পারে না, সুতরাং সোণাগাজীর মসজিদে তাহার মা এবং উহার অনুগত লোক ও আগন্তুক ঔষধ প্রার্থীরা ছাড়া আর কোন মুসলমান প্রবেশ করিত না। সোণাউল্লার মাতার মৃত্যুর পর বুজরুকী বন্ধ হইয়া গেল, মসজিদও জঙ্গলে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। সোণাউল্লার বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্করণী পাড়ে তাহার কবর হইয়াছিল। ঐ পুষ্করণীটী চিৎপুর রোডে বটতলার সম্মুখে, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটের মোড়ে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের পর নব ভাবে গঠিত লটারি কমিটী সেই পুষ্করণী সংস্কার করিয়া সাধারণ লোকের পানীয় জল রক্ষা করেন। পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে সোণাগাজীর কবর ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত করা হয়। একজন ফকীর থাকিত,

লোকের প্রদত্ত সিন্নির পয়সা সেই লইত। সম্প্রতি সেই কবরটী একটী ক্ষুদ্র সুন্দর ও সজ্জিত ঘরে আচ্ছাদিত হইয়াছে। পুকুরটি ভরাট করিয়া ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবল হইয়াছে। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই পরিত্যক্ত সোণাগাজীর মসজিদের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। এই সোণাউল্লা গাজীর নাম হইতেই সোণাগাজী নামের উৎপত্তি।

এখনকার নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট পূর্ব্বে জোড়াবাগান ষ্ট্রীট বলিয়া পরিচিত ছিল,কিন্তু বহুপূর্ব্বে এই রাস্তাটী সম্পূর্ণ খোলা ছিল না। মধ্যে মধ্যে কাঁচা রাস্তা আবার খানিক মাঠ বা কৃষিক্ষেত্র, আবার খানিক পথ, খানিক বাগান, অর্ম্মির ম্যাপে এইরূপ দেখা যায়। বেলি সাহেবের ১৭৮২ সালের ম্যাপে রাস্তাটী গঙ্গাতীর হইতে চিৎপুর রাস্তা পর্য্যন্ত সরল রেখায় নির্ম্মিত এবং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট নামে পরিচিত হইয়াছিল। তখন ইহার পশ্চিম সীমার ঘাটের নাম ছিল জোড়া বাগান ঘাট, নিমতলা ঘাট তাহার অনেকটা উত্তরে ছিল। জোড়াবাগান ঘাটেই শবদাহ হইত। ঐ স্থানে কোন ব্রাহ্মণ আনন্দময়ী কালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গরাণহাটার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা অনেক দিন হইতে ঐ কালী তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আসিতেছেন। আসল কথা, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান রাধামাধব বর্ত্তমান নিমতলা ঘাট ও কালীর ঘর বেষ্টিক্কের সময় নির্ম্মাণ করেন। ঐ কালীর প্রতিমা ইতিপূর্ব্বে রাস্তা হইতে অনেক নিম্নে স্থাপিত ছিল, কয়েক বৎসর হইল উর্দ্ধে তুলিয়া বসান হইয়াছে। যখন এই কালীর সম্মুখে মিউনিসিপাল ড্রেন বসান হয়, তখন নিম্ন স্থান হইতে রাশি রাশি অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ এবং নরকঙ্কাল বাহির হইয়াছিল। আনন্দময়ীর পশ্চাতে একটী নীচু চাঁদনীওয়ালা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলানযুক্ত পাকা ঘাট ছিল, ঐ ঘাটের উত্তরে কতকগুলি বড় বড় নিম্ববৃক্ষ ছিল। ১৬৮৬ খ্রীঃ জব চার্ণক হুগলি হইতে তাড়িত হইয়া সর্ব্বপ্রথম ঐ নিম্ববৃক্ষের নিম্নে আটচালা বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন।

নিমতলার মসজিদের পার্শ্বে মহম্মদ রামজানের লেন নামে একটী গলি আছে। এই মহম্মদ রামজানের পূর্ব্ব পুরুষেরা এখানকার অতি প্রাচীন অধিবাসী। এমন কি, দত্তচৌধুরীরা আসিবার পূর্ব্বেও তাঁহারা এখানে বাস করিতেন। উপরোক্ত ঘাটটী রামজানের কোন পূর্ব্বপুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মসজিদটী রামজানের নির্ম্মিত। উহাঁকে লোকে রামজানি ওস্তাগার বলিত। তিনি অতি উদার প্রকৃতির মুসলমান ছিলেন। একদিন তাঁহার বাটীর ছেলেরা তাঁহাদের ঘাটে স্নান করিতেছিল, সে সময় যে ব্রাহ্মণেরা ঘাটে বসিয়া স্নানান্তে পূজা করিতেছিলেন, অনাবধানতা বশতঃ তাঁহাদের গায়ে জল লাগিল, ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, মুসলমানের ঘাটে হিন্দুর স্নান পূজা করার এই ফল, চল আবার অন্য ঘাটে গিয়া স্নান করিয়া পূজা করা যাউক। কোন সূত্রে এই কথা রামজানের শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র ঘাটে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া আদেশ দেন যে, আর কোন মুসলমান এ ঘাটে নামিতে পারিবে না।

রসিদ মল্লিক ও নুরজী মল্লিক নামক দুই ভ্রাতা ছিলেন, ইঁহারাও মুসলমান।

এখন ইহাঁদের বংশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে এ অঞ্চলের ইহাঁরা প্রধান একঘর জমীদার ছিলেন। হোগলকুড়িয়া (১) সিমলা, (২) মৃজাপুর বেণিয়াপুকুর, পাগলা ডাঙ্গা, ট্যাংরা ও দলন্দ ইহাঁদের জমীদারীভুক্ত ছিল। ১৭৫৪খ্রীঃ, ৮ই আগষ্ট, হলওয়েল সাহেব সুকৌশলে উক্ত দুই ভ্রাতার নিকট নাম মাত্র মূল্য দিয়া উহার পাট্টা লেখাইয়া লন। ঐ বৎসর ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার কাউন্সিল বিলাতে যে পত্র লেখেন, তাহা এইঃ—"গত ৮ই আগষ্ট মিঃ হলওয়েল অতি কষ্টে ডিহি সিমলার সত্বাধিকারীর নিকট ২,২৮১ টাকায় উহা ক্রয় করিয়াছেন, উহা কলিকাতার একটী প্রধান অংশ, উহা খরিদ করায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। আমরা যে মূল্য দিয়াছি, বর্ত্তমান তহসিলেই জমীর খাজানায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আয় হয়। হলওয়েল বলেন, যখন উহা আমাদের হস্তে বন্দোবস্ত হইবে, তখন আরও অনেক অধিক

(১) সুতাপুটীর পূর্ব্বসীমা হুগুলকুড়িয়া।

(২) পরগণা কলিকাতার উত্তরাংশ, সুতানুটীর দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ মৃজাপুর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে মাণিকতলার দক্ষিণ বর্ত্তমান গড়পার প্রভৃতি সমস্ত স্থান ডিহি সিমলার অন্তর্গত। মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে যে বাজারটীকে টিকটিকি বা পোড়া বাজার বলে, বহু পূর্ব্বে উহা সিমলা বাজার বলিয়া পরিচিত ছিল, ১৭৮৪খ্রীঃ ম্যাপে উহাকে পুরাতন সিমলা বাজার এবং বর্ত্তমান সিমলা বাজারকে নূতন সিমলা বাজার বলিয়া লিখিত আছে। এই সিমলায় বিস্তর তন্তুবায় অতি মূল্যবান ছিট বুনিত, তাহার জন্যই এ প্রদেশের সকল গ্রাম অপেক্ষা সিমলা গ্রামের আয় অনেক অধিক ছিল এবং এই ছিটের জন্যই কোম্পানির এই গ্রামের প্রতি এত লোভ। তাঁহারা ইহা কৌশলে আয়ত্ত করিয়া তন্তুবায়দিগের প্রতি এমন অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাহারা ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিলাতের অধ্যক্ষ সভা হইতে ১৭৫৫খ্রীঃ ৩১ জানুয়ারির পত্রে ঐ তন্তুবায়দিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার জন্য কলিকাতার কাউন্সিলে অনুরোধ আসিয়াছিল। ক্রমে উহাদিগের প্রতি অত্যাচার এবং উহাদের পলায়ন হেতু কোম্পানির ক্ষতি যখন বোর্ডের নিকট বিবিধ সূত্রে পহুছিল, তখন ১৭৫৭ খ্রীঃ, ২৫ মার্চ বোর্ড কলিকাতার কাউন্সিলে লিখিলেন, "আমরা বার বার আগ্রহের সহিত তোমাদের অনুরোধ করিতেছি যে, তোমরা অধিবাসীদিগকে ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দিবে এবং গরিবদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে। ইহার জন্য আমরা তোমাদের বিশেষতঃ মিঃ হলওয়েলের উপর নির্ভর করিয়া আশা করিতেছি যে, সাবধানে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিয়া আমাদের সদভিপ্রায় সাধনে সাহায্য করিবে।" তাহার পর ২৫শে মার্চ আবার লিখিয়াছেন, "আমরা শুনিতেছি, কলিকাতার লোকসংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, আমরা জানিতে চাহি, ইহা সত্য কি না? অতএব তোমরা এবিষয় অনুসন্ধান করিবে। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার প্রকৃত কারণ আমাদিগকে জানাইবে।" ১৭৫৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখে বোর্ড আবার কলিকাতার কাউন্সিলে পত্র লিখিয়া আদেশ করেন যে, "ঢাকা, কাশিজোড়া ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁতীদিগকে আনাইয়া দুর্গের নিকট সহরে এবং কোম্পানির আয়ত্বাধীন ৩৮ খানি গ্রামে বসাইয়া উপরোক্ত স্থান সকলের বস্ত্র বিশেষতঃ কলিকাতার নানা বর্ণের ছিট বুনিতে উৎসাহ প্রদান করিবে।" সিমলার তাঁতিরা অনেকে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল, অনেকে ফরাসীদিগের আশ্রয়ে চন্দননগরে গিয়া বাস করে। কোম্পানির লোকেরা যাহাদিগকে আনিয়া আবার সিমলায় বসাইলেন, তাহারা ছিট বোনা তাঁতী নহে, অনেকে সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিতে পারিত। সেই সময় হইতে সিমলা ছিটের পরিবর্ত্তে ধুতির জন্য বিখ্যাত হইল।

আয়ের সম্পত্তি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্ত্বাধিকারের মধ্যে এখনও অনেক গোল আছে, তাহা আমরা এখনও নিষ্পত্তি করিতে পারি নাই, যখন পারিব, তখন আপনাদিগকে জ্ঞাত করিব"। (৩) ইতি পূর্ব্বেই হলওয়েল বিনা মূল্যে বেনিয়াপুকুর পাগলাডাঙ্গা, ট্যাংরা, এবং দলন্দ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭৫২খ্রীঃ, ১৫ই ডিসেম্বর, তিনি কলিকাতার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহা ৬৪ সালে মুদ্রিত হয়, উহার ১৪ পৃষ্ঠায় স্পষ্টই লিখিয়াছেনঃ—"বেনিয়া পুকুর, পাগলাডাঙ্গা, ট্যাংরা, এবং দলন্দে কোম্পানির কোন অধিকার ছিল না, ক্রমে আপনাপনি আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে।" এ কথার অর্থে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কোম্পানি জমীদারদিগকে কিরূপ "মূল্য দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া" ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিয়াছিলেন। এখন ঐ মুসলমান জমীদারবংশের যদি কোন উত্তরাধিকারী জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি হয় দরজী অথবা খানসামা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি দ্বারা দীন ভাবে জীবন কাটাইতেছে। উহাদের ট্যাংরার জমীদারী দখলের সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আপত্তি করিয়াছিলেন যে, তিনি মুরজী মল্লিকের নিকট তাহা ক্রয় করিয়াছেন, ও তাহার পাট্টা প্রদর্শন করেন। কোম্পানি উক্ত পাট্টা জাল বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং বলেন, মুরজী মল্লিক ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে, তোমার পাট্টার তারিখ ৯ মাস পূর্ব্বে মাত্র, সুতরাং ইহা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। (৪) অথচ কোম্পানি নিজের বেলা ১৭৫৪, খ্রীঃ ৮ই আগষ্ট, সেই মুরজী ও রসিদ মল্লিকের নিকট সিমলার পাট্টা কিরূপে লিখাইয়া লইলেন, বুঝিতে গেলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। সিমলা এবং পাগলাডাঙ্গা (৫) একত্রে ২৭৪৫ বিঘা, তন্মধ্যে ১১৬ বিঘা দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর বাদে কোম্পানি প্রতি বৎসর ৪৯৬১ টাকা খাজানা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

কলিকাতা ও বাগুয়া পরগণায় ১৭শ শতাব্দীর অধিবাসীর আর কোন সন্ধান আমরা পাই নাই। তাই বলিয়া ইহা সম্ভবপর নহে যে, ঐ কয়েক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও মুসলমান এখানে বাস করিতেন। ১৭৫৫ সালের ৩১ জানুয়ারি বিলাতের বোর্ড কলিকাতার কাউন্সিলে একখানি অনুযোগপত্র লিখেন। তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "কলিকাতার ন্যায় জনপূর্ণ স্থান বিশেষতঃ অসংখ্য তাঁতীর বাস সত্ত্বেও যে আমরা কিছু মাত্র লাভবান হইতেছি না, ইহাতে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতেছি।" লং সাহেব লিখিয়াছেন, "অসংখ্য তাঁতীর বাস বলিয়াই এই জলাভূমিতে কুঠী স্থাপন করা জবচার্ণকের প্রধান উদ্দেশ্য।"(৬) বাগুয়া এবং কলিকাতার মধ্যে অনেক ধানজলা ছিল, তাহার মধ্যে মধ্যে গ্রাম গুলি ইতর ও ভদ্রলোকে পূর্ণ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। ইংরাজদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বার বার নানা প্রকার উপদ্রবে জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল। প্রথম উপদ্রব ১৬৯৮সালে যখন কোম্পানি সুতানুটী কলি-

(৩) Selection from unpublished Records of Government Page 52.

(৪) Do. Do. footnote.

(৫) সিমলা এবং পাগলা ডাঙ্গা যখন সংলগ্ন গ্রাম, তখন উহা নিশ্চয় পটলডাঙ্গার পূর্ব্ব নাম হওয়া সম্ভব। আমরা সমস্ত পুরাতন ম্যাপ দেখিলাম, অথচ পাগলা ডাঙ্গা নাম কোথাও দেখিতে পাই নাই।

(৬) U. P. Records footnote Page 121.

কাত্তা ও গোবিন্দপুর ইজারা লইয়া প্রজাদিগের সহিত আপনাদের বন্দোবস্ত করেন। প্রথমে সেই বন্দোবস্তের উপদ্রবে অনেক পুরাতন বাসিন্দা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ১৭১৭ খ্রীঃ পর যখন ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার অধিকার পান, তখন হইতে অনেক লোক পলায়নপর হইয়াছিল। তাহার পর ১৭৩৭ সালের প্রবল দৈব উপদ্রব, অর্থাৎ ঝড়, জলপ্লাবন এবং ভূমিকম্প যাহাতে দক্ষিণ বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহাতে এক কলিকাতার ন্যায় নূতন প্রতিষ্ঠিত সহরের দুই শত পাকা অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং গঙ্গার উপর প্রায় ৪০ হাত জল উঠিয়াছিল। মনুষ্য যে কত মরিয়াছে, সে সময় কে তাহার সংখ্যা করিয়াছে? অনুমানে তিন লক্ষ লোকের বিনাশ লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে পর্ণকুটীরবাসী লোকেরা অধিকাংশই ভাসিয়া গিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। তৃতীয় উপদ্রব ১৭৫২ সালের দুর্ভিক্ষ। কোম্পানি খাদ্য দ্রব্যের উপর টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে মাসুল লইতেন। ঐ বৎসর মাসুল অত্যন্ত অধিক আদায় হওয়ায় কোম্পানি কাল জমীদার গোবিন্দরাম মিত্রের নিকট আয় বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করায় ২০ নবেম্বর তিনি যে কৈফিয়ত দেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, "এ বৎসর যে প্রকার খাদ্য বস্তু দুর্মূল্য হইয়াছে, গত ৬০ বৎসরের মধ্যে সে প্রকার হয় নাই, তজ্জন্য কোম্পানির দুঃখী প্রজারা ক্ষুধায় এই সহরের মধ্যে কত মরিয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন, সকল দ্রব্যই দ্বিগুণের উপর মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতি টাকায় মাসুলের হারে অনেক অধিক আয় হইয়াছে।" ১৭৫১ ও ৫২ সালের খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

	১৭৫১	১৭৫২
চাউল	১৮৮৲সের ১৷০ আনা।	১৬ সের ২৷৷০ আনা
গম	৮৮৲ " ১৷০ "।	১৬ " ২৷৷৴০ "
আটা	১৶৩ " ৩৲ টাকা।	১৶ মণ ৮৲ টাকা
তৈল	১৶ মণ ৫৲ "।	১৶ " ১১৲ "

এইরূপে খাদ্যদ্রব্য এককালে দ্বিগুণের উপর মূল্যবান হওয়ায় কত দরিদ্র লোক মারা গিয়াছে এবং কত অধিবাসী ঘর বাটী বিক্রয় করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল, তাহারকি সীমা আছে? তাহার পর সহরের পূর্ব্বাংশ হুগুলকুড়িয়া হইতে দলন্দ পর্য্যন্ত যখন কোম্পানি অধিকার করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিলেন তখন কি প্রকার অত্যাচার ও প্রজাশোষণ হইয়াছে, তাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহাতেই নূতন সহরের প্রাচীন অধিবাসী তাঁতীকুল নির্ম্মূল হইল। তাহার পর যখন নবাব সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করিয়া লুঠ করিয়াছিলেন, সে সময় পূর্ব্ব হইতে সাধারণ বাঙ্গালী অধিবাসীরা সহর শূন্য করিয়া পলাইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ লং সাহেব দিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বাগুয়া বা সুতানুটী এবং কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা কোন না কোন সূত্রে কোম্পানির কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল না, তাহারাই লোপ পাইয়াছে, আর যাঁহারা 'কোম্পানির লোক' হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রাণভরিয়া দুহাতে দরিদ্র মারিয়া আপনারা বেশ দু পয়সা সংস্থান করিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারাই নিরাপদে আপন আপন পূর্ব্ব পুরুষের বাটীতে সম্মানের সহিত বাস করিয়া আসিতেছেন।

গোবিন্দপুর সম্বন্ধে যদিও পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে, তত্রাচ পুনরায় আমরা তাহার পুনরালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। সেটদিগের গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর বলিয়া বাবু গৌরদাস বসাক যেমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম, গোবিন্দপুর সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দির ভূগোলবেত্তা কবিরাম তাঁহার দিগ্বিজয় প্রকাশে লিখিয়াছেন—

"ইদানীং নৃপশার্দ্দুল চরভূমৌ কথাশৃণু।
কালীদেব্যাঃ সন্নিধৌ চ গঙ্গায়াং প্রাচ্যকে তটে॥
গোবিন্দ দত্তো রাজা চ কলিবেদাব্দ সহস্রগে।
সিন্ধু সঙ্গমতীর্থ যাত্রা করণার্থং সমাগতঃ॥
গোবিন্দদত্তভূপালঃ তীর্থাৎ প্রত্যাগতং শুভম্।
কালীদেবী স্বপ্নচ্ছলে নৌকায়াস্তমুবাচহ॥
অকর্ষণী পুরীং রাজন্ আগচ্ছহি মমাজ্ঞতঃ।
বাদর-রসা-পৃথিব্যাশ্চ ছেদয়িত্বা তৃণাদিকম॥
পুরং * * * মহতীং মৎসকাশতঃ।
প্রাপ্স্যসি শৃণু ভূপালতে কল্যাণং ন চেদপি॥
কালীদেব্যা বচো জ্ঞাত্বা গঙ্গায়াশ্চ তটান্তরে।
বসতিং ভূয়সীং তত্র চকারহি মুদান্বিতঃ॥
পারীন্দ্র গ্রামাৎ সর্ব্বাণী দ্রবিণানি মহীপতিঃ।
আনয়িত্বা চ বসতিং কৃতবান্ সুরসরি তটে॥
লাঙ্গুলী দ্বিস্কন্ধযুতঃ দেব্যা পৃষ্ঠেচ বর্ত্ততে।
যদাদেশেন তন্মূলে * * * ॥
প্রাপ্তা তেনৈব ভূপেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিশি।
কাঞ্চন কর্ষপুরিতাশ্চালভ্যা দেবা সুরৈরপি॥
ভূরীণি দ্রবিণান্যেব প্রাপ্য গোবিন্দভূপতি।
চতুঃষষ্টিসংখ্যকৈশ্চ বলিভিঃ পূজনং কৃতম্॥
গোত্রবৃদ্ধ্যা বিত্তবৃদ্ধ্যা তেজোবৃদ্ধ্যাহি ভূমিপ।
বভুব গোবিন্দদত্তো বর্দ্ধিষ্ঠ প্রবরো মহান॥
ভাগিরথী পূর্ব্বতটে পুরী বর্দ্ধন হেতবে।
বাস্তযাগং দ্বিজান্ নীত্বা চকার বাসহেতবে
(বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা।)

অস্যার্থ—"হে নৃপতি শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্ব্বপারে কালীদেবীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যব্দে গোবিন্দ দত্ত নামক একজন রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আইসেন, সেই সময় কালীদেবী নৌকা মধ্যেই তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করেন, 'রাজন! তুমি আমার আজ্ঞায় অকর্ষণ পুরীতে আগমন কর। আমার নিকটবর্ত্তী বাদর রসা চরের তৃণ গুল্মাদি পরিষ্কার করিয়া একটী মহাগ্রাম সংস্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে। রাজা দেবীর আদেশ অবগত হইয়া পারীন্দ্র গ্রাম হইতে নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করিয়া সুরধুনী তটে বসতি করিলেন। গোবিন্দ দত্ত স্বপ্ন কালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে যে একখানি স্কন্ধদ্বয় যুক্ত লাঙ্গল দেখিয়াছিলেন, পরে দেবীর আদেশে ঐ লাঙ্গল দ্বারা তথাকার ভূমি খনন করিয়া প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ অর্থ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়া গোবিন্দ দত্ত চতুঃষষ্ঠি বলি দ্বারা দেবীর পূজা করেন। ধন ধান্য, বংশ ও ধনের বৃদ্ধি প্রযুক্ত তিনি কালক্রমে ঐ স্থানের বর্দ্ধিষ্ঠ লোক হইয়াছিলেন। এই অচিন্তিত ঐশ্বর্য্যলাভে তিনি পুরীর শ্রীবৃদ্ধি এবং ঐ স্থানে বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বাস্তযাগ করাইয়াছিলেন।"

৩য় প্রস্তাবে এই গোবিন্দ দত্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার যে উচ্চবংশে জন্ম সংক্ষেপে সেই বংশের কতক পরিচয় প্রদান করিতেছি।—খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে মহারাজ আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে কান্যকুব্জ হইতে আনাইয়া বাঙ্গালায় স্থাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আঙ্গিরস প্রবর ভরদ্বাজ গোত্রের পুরুষোত্তম দত্ত কান্যকুব্জের অন্তর্গত কোলঞ্চ

প্রদেশ হইতে আসিয়া ভাগিরথী-তীরে বালি নামক গ্রামে বাস করেন। ইঁহারা মসিজীবি ক্ষত্রিয়। ইঁহার গোবর্দ্ধন নামে একটী মাত্র পুত্র ছিলেন, গোবর্দ্ধনের দুই পুত্র, কনক ও নীলাম্বর। কনক ত্রিংশ বৎসর বয়সে বিশ্বনাথ নামক পুত্রমুখ দেখিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া কনখলে কনখলানন্দ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক হিমালয়ে তপস্যায় জীবন শেষ করিয়াছিলেন। নীলাম্বর গৃহে পিতৃসেবায় রত থাকিয়া গোবিন্দ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। গোবিন্দ সৌর ছিলেন, সূর্য্যের উপাসনা করিয়া দিবাকর নামে একমাত্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। দিবাকর সর্ব্বপ্রথম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মহারাজ বিজয় সেন কর্ত্তৃক গ্রামিক পদে বরিত হন। ইঁহার এক মাত্র পুত্র মহীপতি রাজা বল্লাল সেনের সহিত সমলগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিবাকর দত্ত পুত্রের জন্মের পরেই তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। মহীপতির এক মাত্র পুত্র বিনায়ক, তিনি মহারাজ বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু অধিক কাল রাজসেবায় থাকিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এইরূপ কথিত আছে যে, রাজা বল্লালসেন কায়স্থ ছিলেন, প্রধান কায়স্থ কর্ম্মচারীদিগকে অনেক সময় রাজার সহিত একত্র আহারাদি করিতে হইত, রাজার কোন গুপ্ত দোষ হেতু অপবিত্র হওয়ায় প্রায় সমস্ত কায়স্থ নানা ছলে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। বিনায়ক দত্ত চক্ষুরোগের ছল করিয়া চাকুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালিগ্রামে নিজ বাটীতে আসিয়া বসিয়াছিলেন। কায়স্থদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রাজা আপনার সমস্ত প্রজার জাতিমেলের জন্য তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে রাজসভায় উপস্থিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। বিনায়ক নিজে উপস্থিত না হইয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র নারায়ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ দত্ত পুরুষোত্তমের অষ্টম পুরুষ; তিনি বয়সে বালক হইলেও ক্ষত্রতেজ ও কুল-গরিমায় বৃদ্ধের ন্যায় তেজোবান ছিলেন। রাজাদেশে ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহ মহাশয় সভয়ে অবনত মস্তকে রাজদ্বারে কেবল যে উপস্থিত হইলেন তাহা নহে, রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রভাব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বিনায়ক দত্ত কেবল যে অনুপস্থিত হইলেন তাহা নহে, তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র কোন মতে রাজাদেশে আপনার বংশগৌরব খর্ব্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহাতে রাজা বলপূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া অপর চারি শ্রেণীর কায়স্থকে কুলীনত্ব দিয়া তাঁহাকে নিষ্কুলীন করেন। এইরূপ অপমানে নারায়ণ এ প্রকার মর্ম্মাহত হন যে, নিজ বাটীতে আর না প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দত্তবংশের ন্যায় ঘোষবংশের আদি সমাজ বালি। দত্ত ও ঘোষ-গোষ্ঠি একত্র বাস করিতেন। দৈবযোগে দূরদেশে কোন ঘোষ মহাশয়ের সহিত নারায়ণ দত্তের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি বিস্তর প্রবোধ দিয়া নারায়ণকে স্বদেশে আনয়ন করেন ও বিবাহ দেন। নারায়ণ দত্ত মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই মন্ত্রণাবলে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন পশ্চিমে প্রয়াগ, দক্ষিণে পুরুষোত্তম, উত্তরে সমস্ত হিমা-

পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত একছত্র রাজা হইয়া নানা স্থানে আপনার বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক স্মৃতি-রচয়িতা হলায়ুধ এবং বৈষ্ণব-কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব তাঁহার সমকালিন এবং রাজসভাসদ ছিলেন। লক্ষ্মণসেন হইতে মিথিলায় 'লসং' অব্দ প্রচলিত হয়। বর্ত্তমান ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯৪ লসং চলিতেছে। ইহাতে নারায়ণ দত্তের সময় নিরূপণ অতি সহজে হইতেছে। নারায়ণের গদাধর, হারাধন ও রবি নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গদাধর বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা লাক্ষ্মণেয় সেনের দেওয়ান ছিলেন। আপনার উভয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গ্রামিক পদ প্রদান করিয়া হারাধনকে জেজুড়ে এবং তৎকনিষ্ঠ রবি দত্তকে সপ্তগ্রামের অন্তর্গত গঠুগ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা যবনভয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলে গদাধর দত্ত বালি গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন।

গদাধরের তিন পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠের নাম কানাই বা কানু। তিনি নূতন মুসলমান রাজার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার দশটী পুত্র, সর্ব্বকনিষ্ঠ মুরারি দত্তই পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন, এবং পিতৃবিয়োগান্তে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুরারি বিশ্বাস নামে পরিচিত হন। মুরারি দত্ত বিশ্বাসের দুই পুত্র, গণপতি ও তেকড়ি। পিতা উভয় পুত্রকে উভয় স্থানের চতুর্ধুরী পদে নিয়োগ করেন। তদনুসারে গণপতি কুমারহট্টে এবং তেকড়ি আন্দুলের চতুর্ধরী হন। কিন্তু বালির বাটী, দেবালয় প্রভৃতি রক্ষা হেতু মুরারির সহধর্ম্মিণী তেকড়ির পুত্র রত্নাকরকে লইয়া বাস করিতেন। মুরারি বিশ্বাস মহাশয়কে বার্ষিক কর প্রদান উদ্দেশ্যে দিল্লী গমন করিতে হইত, সম্রাটও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দান করিতেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

পুনাবাসীদের উৎসব ও কার্য্যকলাপ

পুনায় অবস্থিতিকালে যে সকল উৎসবাদি দেখিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত করিতেছি:—

১২৮৯ বঙ্গাব্দে চৈত্রমাসে দেখি নববর্ষের প্রথম দিনে উৎসব হইতেছে। প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে একটী বংশের স্তম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার অগ্রভাগে নিমের পাতা, উত্তম বসন, একটী ঘটী, এক ছড়া মঠের মালা এবং একটী নিশান সংলগ্ন রহিয়াছে। এই স্তম্ভটী এই ভাবে সমস্ত দিন থাকে, পরে সন্ধ্যাকালে বা পরদিন প্রাতে ইহাকে অবতরণ করান হয়। শুনিলাম, ইহা নববৎসরের রাজ্যলাভের জয়ঘোষণা স্বরূপ। কেহ কেহ বলেন, এই তিথিতে শালিবাহন রাজা দিগ্বিজয়ের পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহা স্মরণার্থ এই অনুষ্ঠানটী হইয়া থাকে। একথাটী সম্ভব বটে। কেন না এখানে শালিবাহনের অব্দ প্রচলিত এবং চৈত্রমাসের শুক্লপ্রতিপদে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। এই দিনে সকলে নবপঞ্জিকার ফলাফল শ্রবণ করে। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাসহ

ভোজন করাইতে হয়। ভোজনের পূর্ব্বে সকলকে নিমপাতা চিবাইতে হয়। ধনী ব্যক্তিগণ প্রতিবেশীদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করান। পথিমধ্যে দেখি, একদল বাদ্যকর নানা প্রকার বাদ্য করিতেছে; তাহাদের পশ্চাতে কতকগুলি রমণী এবং তাহাদের পশ্চাতে কয়েকজন পুরুষ গমন করিতেছে। কোন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম যে, তাহারা কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে নিমন্ত্রণে গমন করিতেছে। ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম যে, এখানে সামান্য সামান্য অনুষ্ঠানেও বাদ্যকরগণ আসিয়া থাকে। কেহ কুটুম্ব বাটীতে তত্ত্ব লইয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গে বাজনা; কেহ কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছে, তাহার সঙ্গে বাজনা; কেহ কোন দেব-মন্দিরে পূজা দিতে যাইতেছে, তাহার সঙ্গে বাজনা; আবার বিবাহের সময়ে প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই বাজনা। নূতন বৎসরের প্রথম দিনে জামতার বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। দুই চারি জন আত্মীয়ের সহিত তিনি নিমন্ত্রিত হয়েন। ভোজনান্তে জামতাকে একটী পাগড়ী দিতে হয়। এখানকার পাগড়ীর মূল্য অধিক। একটী মধ্যমগোছের পাগড়ী ১০্ টাকার কমে হয় না। জামাতার মাতাঠাকুরাণী সধবা হইলে তাঁহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়।

এ অঞ্চলে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতার বিশেষ ভাবে পূজা হয় না। এখানে স্থানে স্থানে ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে তাঁহাদের পূজা হয়। রামনবমীতে, শ্রীরামের জন্মোৎসব এবং গোকুল অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব সমাধা হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে কোন কোন নূতন উৎসবও হইয়া থাকে। চৈত্রমাসের পূর্ণিমায়, হনুমানের জন্মোৎসব হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার দিনে দত্তাত্রেয় ঋষির জন্মোৎসব হইয়া থাকে। আবার কোন কোন উৎসব, যাহা বঙ্গদেশে একভাবে সমাধা হয়, তাহা এ অঞ্চলে ভিন্ন আকার ধারণ করে, যথা, গণেশ চতুর্থী, দশহরা, দীপাবলী, মকরসংক্রান্তি এবং মেড়াপোড়া। আমরা এই কয়েকটী উৎসব সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব।

১ম গণেশ চতুর্থী। বঙ্গদেশে, মাঘমাসে শুক্ল চতুর্থীতে গণেশ পূজার দিন, কিন্তু, এ অঞ্চলে, ভাদ্রমাসের শুক্ল চতুর্থীতে গণেশের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। কি ধনী, কি দীন সকলেই গণেশের পূজা করেন। ছোট বড় নানা প্রকারের গণেশ মূর্ত্তি বিক্রয় হয়। সকলে আপন২ ক্ষমতা অনুসারে ইহা ক্রয় করে। বাটীতে ঠাকুরঘরে বসাইয়া ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক দিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত গণপতির পূজা হইয়া থাকে। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন করান এবং রাত্রিতে কথকতা দেন। অন্যান্য সকলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে দেবতার প্রসাদী মিষ্টান্ন ও ফল দিয়া থাকেন। পূজা শেষ হইলে, গণপতিকে পাল্কীতে বসাইয়া বাদ্যোদ্যম সহ কোন নদী কিম্বা পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিসর্জ্জন দেন, কেহ কেহ বা কূপে নিক্ষেপ করেন। একখানি পাল্কীতে অনেকগুলি ছোট ছোট গণেশমূর্ত্তি বসান হয়। যাঁহাদের গণেশ তাঁহারা 'গণপতি মোরিয়া"

"গণপতি মোনিয়া" "বলিতে বলিতে পাল্‌কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। গণেশ-চতুর্থীর রজনীতে চন্দ্র দর্শন নিষেধ। ইহাই এ অঞ্চলের "নষ্ট চন্দ্র।"

২য় দশহরা। এ অঞ্চলে দুর্গোৎসব হয় না, কিন্তু, আশ্বিন মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত দেবীর মন্দিরে চণ্ডীপাঠ হয় এবং নবমীর দিন হোম হইয়া থাকে। ইহার পর দিন আমাদের বিজয়ার পরিবর্ত্তে এখানে দশহরা উৎসব হয়। শ্রীরামচন্দ্রের রাবণজয়ের সহিত এ উৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই। এই দিনে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মগ্রন্থ পূজা করেন এবং ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্র সকল পূজা করিয়া থাকেন। ইহা প্রকৃত পক্ষে সরস্বতী পূজা। মধ্যাহ্নে আত্মীয় স্বজন একত্রে বসিয়া ভোজন করে, পরে, বৈকালে দেবমন্দিরে গমন করত ফুল ও কাঞ্চন পত্রের দ্বারা দেবতার পূজা করে। তথা হইতে প্রত্যাগমন করত পরস্পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাঞ্চন পত্র বিতরণ করে। ইহাকে বলে সুবর্ণ দান, এবং ইহা সৌহার্দ্দ্যের চিহ্ন স্বরূপ। এই দিনে, সকলে সমস্ত বৎসরের বিবাদ ও মনোবাদ ভুলিয়া গিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হয়, এই দিনটীকে সকলে শুভ জ্ঞান করিয়া, সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ইহাতে করিয়া থাকে। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে যখন মারহাট্টাগণ দেশলুণ্ঠন করিত, তখন তাহারা এই দিনে যাত্রা করিত।

৩য় দীপাবলি। এই উৎসবটী তিন দিন স্থায়ী। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর দিনে আরম্ভ হইয়া ইহা অমাবস্যার দিনে শেষ হয় কিন্তু প্রত্যেক দিনের উৎসব ভিন্ন ভাবে সমাধা হইয়া থাকে। প্রথম দিন ধন-ত্রয়োদশী। বঙ্গদেশে যেমন লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী পূজা আছে, এ অঞ্চলেও এই দিনে লক্ষ্মী পূজা হয়। 'মহাজনগণ ধন-রত্ন ও দ্রব্যাদির পূজা' করেন; এবং যমকে আলোক দান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দিন নরক-চতুর্দ্দশী। এই দিনে বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলে, সকলে আপন আপন গৃহ আলোকমালায় শোভিত করিয়াছিল এবং রমণীগণ সুসজ্জিতা হইয়া প্রজ্জ্বলিত দীপ হস্তে লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটী স্মরণার্থে, গৃহস্থগণ আপন আপন গৃহ আলোকমালায় শোভিত করে এবং রমণী ও বালকগণ শরীরে সুগন্ধ দ্রব্য লেপন করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হন। ইহার পর গৃহিণী কোন পাত্রে আলোক লইয়া আরতি করেন, এবং বাটীর প্রত্যেক পুরুষ সেই পাত্রে অর্থপ্রদান করে। ইহার পর, মিষ্টান্ন বিতরণ হয় এবং আত্মীয়বন্ধুগণকে ভোজন করান হয়। তৃতীয় দিনে বিক্রমাদিত্যের প্রচলিত অব্দ অর্থাৎ সংবৎ শেষ হয়। এতদুপলক্ষে মহাজনগণ পুস্তকাদি পূজা করেন এবং খাতা বদ্‌লান। ইহাকে বলে "বহি পূজন"। লোকজনকে মিষ্টান্ন দেওয়া ও দান জনকে দান করিবারও রীতি আছে। এই উৎসব উপলক্ষে প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার বাটী পরিষ্কার করে, বালকগণ বাজি পোড়ায় এবং প্রৌঢ়েরা জুয়া খেলে। এ তিন দিনই লোকে আপন আপন গৃহ আলোকমালায় শোভিত করে।

৪র্থ মকর-সংক্রান্তি। এ অঞ্চলেও মাঘ মাস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে এই দিনটী উৎসবের দিন। সকলে এই

দিনে তিল বাটা মাখিয়া সমুদ্রে, নদীতে কিম্বা সরোবরে স্নান করিতে যায়। তদুপলক্ষে, পুরোহিত মহাশয় মন্ত্রাদি পড়ান। বাটী ফিরিয়া আসিলে সূর্য্যের উপাসনা হয়, এবং পুরোহিত মহাশয় ভোজনান্তে দক্ষিণা স্বরূপ, তিল পূর্ণ তাম্র বা পিত্তল পাত্র, ধুতি, ছত্র ও টাকা প্রাপ্ত হন। এতদুপলক্ষে রমণীগণ পিষ্টক ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন, আত্মীয় বন্ধুগণকে ভোজন করাইবার পদ্ধতিও আছে। একটী ব্যাপারে এই উৎসবটী অতীব প্রীতিপ্রদ। এই দিনে সকলে বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে অবলোকন করিয়া থাকেন। রমণীগণকে দেখা যায়, এ বাটী ও বাটী করিয়া বেড়াইতেছেন। একটী ভাঁড়ের ভিতর আক, কলা, কুল, পেয়ারা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য, এবং একটী ঠোঙ্গায় তিলগুড়ে প্রস্তুত করা কতকগুলি মিষ্টান্ন পরস্পরকে বিতরণ করিতেছেন এবং এই কথা বলিতেছেন—"এই তিল গুড় দিলাম, তোমার মুখের কথা মিষ্ট হউক।" সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পরিবারেরা ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া গমন করেন এবং দাসীগণ উল্লিখিত দ্রব্যগুলি সঙ্গে লইয়া যায়। পশ্চাতে বাদ্যবাদনও হয়। পুরুষগণ, কেবল মাত্র তিলগুড় লইয়া উক্ত বাক্য উচ্চারণ করত পরস্পর পরস্পরকে বিতরণ করেন। এই ব্যাপার অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। রাস্তায়, কার্য্যালয়ে, যিনি যেখানে যাঁহাকে দেখেন, সেই খানে তাঁহাকে এই মিষ্টান্ন প্রদান করেন।

৫ম মেড়াপোড়া। (হোলিকোৎসব)। এ অঞ্চলে ইহাকে শিম্‌গা বা হুতাশিনী বলে। দোলযাত্রা এখানে হয় না। হোলিকা শব্দ হোড্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হোড্রির অর্থ, অনাদর। যে উৎসবে রাক্ষসগণকে অনাদর করা যায়, তাহাকে হোলিকোৎসব কহে। ভবিষ্যোত্তর পুরাণে, এতৎসম্বন্ধে এই বৃত্তান্তটী আছে:—সত্যযুগে মহারাজা রঘুর সময়ে, ঢোণ্ঢানাম্নী রাক্ষসী ঘোর অত্যাচার করিতে লাগিল। এই রাক্ষসীকে কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম হইল না। প্রজাগণ উৎপীড়িত হইয়া রাজার নিকট সমুদয় বর্ণনা করিল। রাজা, বশিষ্ঠদেবের কাছে এ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেন যে, পুরাকালে এই রাক্ষসী মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করিয়াছিল যে, সে অভয়ে বিশ্ব মধ্যে বিচরণ করিতে পারিবে, কিছুতেই তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না, কেবল ঋতুর সন্ধিকালে, বালক ও উন্মত্তদের দ্বারা তাহার ভয় উৎপাদন হইবে। যে সময়ে বশিষ্ঠদেব এই কথা বলিলেন, সে সময়ে, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর সন্ধিস্থল। তখন তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে রাজন! শীত ঋতু তিরোহিত হইয়া গ্রীষ্মের আবির্ভাব হইবে, অতএব আপনি প্রজাগণকে অভয় প্রদান করুন। আর এই আদেশ দিন যে, বালকগণ আনন্দ চিত্তে গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠ ও পল্লব একত্রিত করত তাহা প্রজ্জ্বলিত করুক, এবং এই হুতাশনকে পরিক্রম করিয়া, করতালি প্রদান ও হাস্য ও গান করিতে থাকুক।" রাজা বশিষ্ঠদেবের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিলেন। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, এইরূপ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হউক। কিছু দিন পরে লক্ষিত হইল যে, সর্ব্বত্র রোগের উপশম

হইয়াছে এবং প্রজাগণ মনের আনন্দে কাল-যাপন করিতেছে।

রূপক ভেদ করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে,যে সময়ে ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, সে সময় পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দূষিত বায়ু হইতেই এই পীড়া উৎপন্ন হয়। হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইলে, দূষিত বায়ু সংশোধিত হইয়া সর্ব্বত্র আরোগ্য আনয়ন করে। এই দূষিত বায়ু রাক্ষসী ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং তাহার অত্যাচারেই লোকের পীড়া। সুতরাং এই উৎসবটী, রাক্ষসীরূপী বায়ু সংশোধনের যে প্রকৃষ্ট উপায়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সকলেই অবগত আছেন যে, আশঙ্কা পীড়া বৃদ্ধির কারণ এবং মনের প্রফুল্লতা হইতে অনেক পরিমাণে পীড়া লাঘব হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে যে, বালকগণ আনন্দ চিত্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইবে এবং করতালি ও হাস্য করত হুতাশন পরিক্রম করিবে। যে সময়ে এই উৎসবটী প্রবর্ত্তিত হয়, বোধ হয়, সে সময়ে বালকদিগের মধ্যে পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু ইহা যে সাধারণের পক্ষে কল্যাণপ্রদ, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। অন্যান্য ঋতুর সন্ধিস্থলেও এই উৎসবটী সমাধা হওয়া উচিত।

নগরবাসীগণ কিরূপে সময় অতিবাহিত করেন, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। সমস্ত দিন বিষয়কার্য্যে অতিবাহিত করিবার পর, লোকের মন সহজেই আমোদ-প্রমোদের দিকে প্রধাবিত হয়। সুতরাং এখানকার লোকও কেহ কেহ নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে, কেহ কেহ সঙ্গীত সমাজে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে গমন করিয়া থাকেন। পুনায় অবস্থিতিকালে আমরা একটী বিষয়ের জন্য বড় দুঃখিত ছিলাম। প্রকাশ্য স্থলে মধ্যে মধ্যে "ছক্কড়" হইত। ছক্কড়ের অর্থ খেঁউড়। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে পাঁচালি বা কবিওয়ালারা অশ্লীল ছড়া ও গানের দ্বারা যেমন লোককে আমোদিত করিত, পুনাতেও সেই দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। আশা করি, এখন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে প্রকার জঘন্য রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই যে, অনেকের মন ধর্ম্মের দিকে প্রধাবিত। ধর্ম্মকথা শুনিয়া তাঁহারা অধিক আনন্দলাভ করেন। রামনবমী, হনুমানের জন্মোৎসব, শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, গণপতির জন্মোৎসব প্রভৃতিতে, স্থানে স্থানে কয়েক দিন ধরিয়া কথা ও কীর্ত্তন হইয়া থাকে। লোকে দলে দলে সে সকল স্থানে গিয়া অতি আগ্রহ সহকারে তাহা শ্রবণ করে। আবার, মধ্যে মধ্যে কোন হরিদাস আসিলে, সম্পন্ন ব্যক্তিগণের গৃহে তাঁহারও কথকতা হইয়া থাকে। তিনি প্রথমে আসিয়া, কোন দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া কথকতা আরম্ভ করেন। পরে গৃহস্থগণ একে একে তাঁহাকে তাঁহাদের বাটীতে লইয়া গিয়া কথকতার ব্যবস্থা করিয়া তদুপলক্ষে বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং কেহ কেহ কথার শেষে তাঁহাদিগকে জলপান করাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, দেবালয়ে কিম্বা গৃহস্থের বাটীতে মধ্যে মধ্যে বেদ ও পুরাণ পাঠ হইয়া থাকে। আবার, এখানকার লোকের কেমন ধর্ম্মভাব দেখুন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক তীর্থদর্শনে গমন করেন। এতদ্ভিন্ন, কোন কোন বিদুষী পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া স্ত্রীলোকদের অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিয়া দেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রীলোকগণ গৃহ-

কার্য্য করিতে করিতে পণ্ডিতার পুরাণ কথা শ্রবণ করিতেছে।. এখানকার কথকতার প্রণালী বঙ্গদেশের মত নয়। কথক মহাশয় যিনি "হরিদাস" নামে অভিহিত, কয়েক জন গায়ক ও বাদ্যকর লইয়া উপস্থিত হন। তানপুরা ও পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। কথক মহাশয় ধর্ম্ম কিম্বা নীতি বিষয়ক একটী প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া তাহা নানা প্রকার ধর্ম্মকথা, সদুপদেশ ও উদাহরণের দ্বারা সমর্থন করেন। মধ্যে মধ্যে সংগীত হয়। কথক মহাশয় গাইতে আরম্ভ করিলে বাদিত্র বাজে এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার সহিত যোগ দেয়। কথা শেষ হইলে, শ্রোতাগণ কথক মহাশয়কে কিছু কিছু দক্ষিণা দেন। এক পয়সা দিলেই যথেষ্ট। পরে সকলে প্রসাদ পাইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। কোন কোন হরিদাস রাজনীতি অবলম্বন করিয়া কথকতা করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে, কথকতার আর বিশেষ সমাদর নাই। ইহার দুইটী কারণ লক্ষিত হয়। একটী এই যে, কথক মহাশয়েরা কথকতার মধ্যে অশ্লীল ভাবের অবতারণা করেন বলিয়া কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের ইহার প্রতি আস্থা নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, একে লোকের মন হইতে ধর্ম্মভাব হ্রাস হইতেছে, তাহার উপর বর্ত্তমান সময়ের ব্যয়বাহুল্য জন্য তাঁহারা এতদর্থে অধিক টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হয়েন না। কিন্তু, একথা সকলে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, কথকতার দ্বারা আমাদের সমাজের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। ইহা হইতে, মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবতের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক কথা সকল আপামর সাধারণকে সমুন্নত করিয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার জন্য কথকতা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। ইহার উন্নতিসাধন করা আমাদের কর্ত্তব্য। যে সকল কথক সদ্ভাবপূর্ণ বাক্যের দ্বারা শ্রোতাগণের অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করেন, তাঁহাদিগকে সমধিক উৎসাহ দেওয়া উচিত। আমাদের বিবেচনায়, "হরিদাসের" কথার প্রণালী বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করিলে ভাল হয়।

পৌত্তলিকতার প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহারাও প্রার্থনা সমাজে যোগদান করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। পুনায় অবস্থিতিকালে, আমরা একটী উত্তম দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। মাননীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (যিনি ১৩০৭ বঙ্গাব্দে পরলোকগমন করিয়াছেন) এবং ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও নিয়মমত সমাজে যোগদান করিয়া তথায় উপদেশ ও বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতাগণকে প্রবুদ্ধ করিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনা ব্যতীত, বার্ষিক উৎসবে এবং গ্রীষ্মকালীন অবকাশের সময় বিশেষ ভাবে ধর্ম্মালোচনা হইত। সে সময়, বোম্বাই এবং অন্যান্য স্থানের বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত লোক সকল সমাগত হইয়া উৎসবে যোগদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যসেবায় এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় পুনা-নগরবাসীগণকে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত দেখিয়াছিলাম। গ্রীষ্মকালে (বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে) বিদ্যালয় সমূহ এবং কয়েকটী কার্য্যালয় বন্ধ হইলে, কয়েকটী সদনুষ্ঠান হইয়া থাকে। দূরদেশ হইতে বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত লোক সকল আসিয়া এ সকল ব্যাপারে যোগ দেন।

একটী অনুষ্ঠান, বক্তৃতা-উত্তেজকসভা। কয়েক দিবস ধরিয়া এই সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে সম্ভ্রান্ত লোক সকল পরিদর্শক ও সভাপতি রূপে তথায় উপস্থিত থাকেন। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ, ও বিদ্যালয়ের উন্নত ছাত্রগণ এই সকল অধিবেশনে মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করেন। যাঁহাদের বক্তৃতা ভাল হয়, যোগ্যতা অনুসারে তাঁহাদিগকে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত পারিতোষিক দেওয়া হয়।

অন্য একটী অনুষ্ঠান, মিত্রালাপ। প্রার্থনা-সমাজ গৃহে ইহার অধিবেশন হয়। এতদুপলক্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ ও বক্তৃতা হইয়া থাকে।

আর একটী অনুষ্ঠান, সাহিত্য-সভা। ইহার অধিবেশন প্রায় বিংশতি দিবস ধরিয়া হইয়া থাকে। প্রায় প্রতিদিবসই সন্ধ্যার সময় বিদ্বান লোক সকল কেহ মৌখিক, কেহ লিখিত, ইংরাজী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় নানা-বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। নগরের বাহিরে প্রায় ১½ ক্রোশ দূরে হীরাবাগ নামক একটী উদ্যানের মধ্যে একটী সভা-গৃহ আছে। ইহার ভিতরে এই সভার অধিবেশন হয়। দূর দেশ হইতে বড় বড় লোক আসিয়া এই সভার কার্য্যে যোগদান করেন। বিখ্যাত বিদ্বান ও সমাজ-সংস্কারক, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও পণ্ডিত, ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, পণ্ডিতপ্রবর ও বাগ্মী ৺কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, দার্শনিক, কবি ও বাগ্মী ৺মহাদেব মুরেশ্বর কুনতে, পণ্ডিত ও স্বদেশ-হিতৈষী, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই সভার অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করিতেন।

এই সকল অনুষ্ঠান ভিন্ন, দেকান্ কলেজে একটী সম্মিলনী সভা হইত, তাহাতেও বক্তৃতা প্রদত্ত হইত এবং বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ তথায় উপস্থিত থাকিতেন।

পুনানগরবাসীগণকে যেমন সাহিত্য অনুশীলনে আগ্রহবান দেখিয়াছিলাম, তাহাদিগকে সেইরূপ কার্য্যপটুও অবলোকন করিয়াছিলাম। ইহারা সহজে পরমুখাপেক্ষী হইতে চাহে না। ইহাদিগকে যন্ত্র সহকারে পেন্‌সিল, সাবান, দীপকাঠী, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতে দেখিয়াছিলাম। এখানকার চিত্রশালায় অতি উত্তম ছবি প্রস্তুত হয়। পুনার মাটীর খেলনাও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানকার দোকানে নানা প্রকার দেশজাত দ্রব্য বিক্রয় হয় এবং লোকে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। দেশীয় মোজা বেশ স্থায়ী, আমরা তাহা ব্যবহার করিতাম। কটকে জুতার ন্যায় এখানে এক প্রকার জুতা প্রস্তুত হয়। ইহা প্রায় সকলেই পায়ে দেয়। এই চটী জুতা সম্বন্ধে আমরা একটী নূতন কথা শুনিয়াছিলাম। কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয় মুচি উড়িষ্যায় বাস করে, তাহারাই নাকি কটকে জুতা প্রস্তুত করে। এই কথা শুনিয়া একজন মহারাষ্ট্রীয় বলিয়াছিলেন যে, এ বড় আশ্চর্য্য ঘটনা! এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িয়াদিগকে শাসন করিয়াছিল; এখন তাহারা তাহাদিগকে জুতা পরাইতেছে। এখানকার কত লোকে ইউরোপে ও আমেরিকায় গমন করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার কত কৌশল শিখিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের চাল চলন সৌখীন নহে, এই জন্য ইঁহারা দেশজাত বস্ত্রাদি মোটা হইলেও, অনায়াসে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের বাবুরা যেখানে শাল, দোশালা বা রামপুরী চাদর গায়ে না দিয়া যাইতে পারেন না, পুনার বড় লোককে সেখানে মোটা চোগা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। অধিক কি বলিব, আমরা মহা বিদ্বান কুনতেকে দেখিয়াছি, হাই স্কুল হইতে প্রত্যাগমনকালে, তাঁহার স্থাপিত পেন্‌সিল কুঠীতে নিজে কল চালাইতেছেন, ও কারিকরদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অব্রহ্মণ্যম্

গভর্ণমেণ্ট, এ দেশের জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছেন দেখিয়া, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেতর বর্ণেরা স্বীয় স্বীয় জাতির প্রাধান্য এবং গৌরব ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেশপ্রবাদে কায়স্থেরা শূদ্র; কিন্তু তাঁহারা বলিতেছেন, আমরা ক্ষত্রিয়। বৈদ্যেরা দেখিলেন, তাঁহাদের বৈশ্যত্বের অভিমানটুকুতে আর কুলাইল না; কায়স্থের উপর উঠিতে হইলে ব্রাহ্মণ না হইলে আর চলে না; কাজেই তাঁহারাও ধুয়া তুলিয়াছেন, "আমরা ব্রাহ্মণ"। গল্প শুনা যায় যে, কোন পল্টনের একজন তালপাতের সেপাই, পয়সা না দিয়া, ধমক্ চমকে, এক মুদির দোকান হইতে জিনিস পত্র কিনিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; মুদি যখন কোমর বাঁধিয়া পয়সা আদায় করিতে বসিল, সেপাহিটী তখন মুদির সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করিয়া বলিল, "তোম্‌ভি মিলিটারি, হাম্‌ভি মিলিটারি।" ইতিহাস যখন উভয় জাতির কুলজি খুলিয়া বসিবে, তখন কায়স্থ এবং বৈদ্যেরাও বিবাদ এবং গৌরব-হুঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বলিবেন,"তোম্‌ভি মিলিটারি, হামভি মিলিটারি"।

মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ জাতির নাম গন্ধও নাই। পরবর্ত্তী যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় কায়স্থের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের গৌরব ঘোষিত হয় নাই। সে সময়ের সমাজের অবস্থা অনুসারেই হউক, কিম্বা যাজ্ঞবল্ক্যাদির নির্দ্দেশ অনুসারেই হউক, মৃচ্ছকটিক নাটকে, কায়স্থ গণিকা এবং ভিক্ষু, অবজ্ঞার সহিত এক নিশ্বাসে বিত হইয়াছেন, দেখিতে পাই। মুদ্রা রাক্ষসের আখ্যান-বস্তু পুরাতন হইলেও, নাটকখানি নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। ঐ নাটকে দেখিতে পাই যে, চাণক্য, কায়স্থ শকটদাসের নাম হইবা মাত্র বলিতেছেন যে,কায়স্থ অতি হীন জাতি, এবং হীনজাতির হীনবুদ্ধিই হইয়া থাকে। কায়স্থেরা অন্যান্য নীচ জাতির মত মদ্যপ প্রভৃতি বলিয়াও ঐ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। উৎপত্তিতে ক্ষত্রিয়ই হউন, আর বৈশ্যই হউন, প্রাচীন কালের প্রবাদ এবং সামাজিক গৌরব বড় সুবিধা জনক ছিল না। এ কালের হাইকোর্টেও ইঁহারা শূদ্র বলিয়াই স্থিরীকৃত।

সমাজে কায়স্থদিগের সে হীনতা আর নাই। সদ্‌গুণে, বিদ্যায়, এবং পদ-সম্ভ্রমে ইহাঁরা এখন সমাজের অলঙ্কার। নীচ বলিয়া ঘৃণা করা দূরে থাকুক, সকলেই উচ্চ বলিয়া সম্মান করে। কায়স্থেরা এখন প্রকৃত পক্ষে কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহেন। তবে আর বৃথা ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান তুলিয়া, পুরাতন কথা বাহির করান কেন? কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির করা ভাল কথা?

কোন প্রাচীন সংহিতায় বৈদ্য বলিয়া একটা জাতি পাওয়া যায় না। এ কালেও বঙ্গদেশ ব্যতীত, অন্য কুত্রাপি বৈদ্য বলিয়া কোন জাতি নাই। দ্বিজ হউক, ক্ষত্র হউক, বৈশ্য শূদ্র, আর, যে কেহ ভিষক্ বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারই নাম "বইদ্"। প্রবাদ আছে, যে বঙ্গের সমতট বিভাগের রাজারা যে জাতীয় ছিলেন, বাঙ্গালী বৈশ্যেরা সেই

জাতীয়। তাহা হইলে এই রাজকুলের একটু অনুসন্ধান করা যাউক।

কনিংহাম এবং রাজেন্দ্রলাল, এ বিষয় লইয়া অনেক তর্ক করিয়াছেন; সে কথা আর তুলিব না। সহসা একদিন আবু-পর্ব্বতের শিখরে রাজপুতের জন্মগ্রহণের মত, সেনরাজগণ বাঙ্গলার ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়েন নাই। যথা সম্ভব, ভাল কথাটাই ধরিয়া লওয়া যাউক যে, আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজবংশ হইতে ইঁহাদের উৎপত্তি। সে কোন্ রাজবংশ? একে একে সে কথার অনুসন্ধান করিতেছি।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, যে চন্দ্রগুপ্তাদি মৌর্য্য রাজগণ শূদ্র। মৌর্য্যবংশে যবনরক্ত সংক্রমণ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সুঙ্গ এবং কাম্ব রাজাদের কৌলিন্যও জগৎ বিখ্যাত। তাহার পর অনার্য্য অন্ধ্রেরা মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গুপ্ত রাজারাও নীচ জাতীয়; এবং মগধের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত রাজগণ আরও নীচ জাতি বলিয়াই সন্দেহ হয়। তবও তাঁহারা সোমকুলতিলক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এমন কি, দক্ষিণ কোশলের তিবরদেব, শিবগুপ্তদেব প্রভৃতিও আপনাদিগকে সোম কুলতিলক বলিতেন। রাজা হইলেই ক্ষত্রিয় হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের যশ কীর্ত্তন করিতেন। বিদেশীয় যবনবংশীয়েরা পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কানোজের রাজারা চিরদিনই গুপ্ত রাজাদের বৈবাহ্য কুল। কাজেই তাঁহাদের জাতি-গৌরব বুঝিতে বিলম্ব হয় না। শক-রাজাদের পাদোপজীবী, সৌরাষ্ট্রের বৌদ্ধরাজারা, সকল রাজবংশের সঙ্গেই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। বলভী রাজারা যে বংশ-গৌরবে গুপ্ত রাজাদের নিম্নে, তাহাও জানা যায়। কাশ্মীরের জাতিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা নিতান্ত অনাবশ্যক। সত্য ইতিহাসে যাহা পাই, কালিদাস-বর্ণিত স্বয়ম্বর সভাতেও তাহাই দেখি। অবন্তী, মগধ, অঙ্গ, মাহেষ্মতী, মথুরা, কলিঙ্গ, অনার্য্য পাণ্ড্য, এ সকল রাজারাই পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেন। এই ত গেল আমাদের কলিযুগের রাজবংশের বিবরণ।

এখন যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, যখন মহাকুলীন রাজপুতেরা আর্য্যাবর্ত্ত এবং সৌরাষ্ট্র অধিকার করিলেন, তখন পরাভূত বা তাড়িত প্রাচীন রাজবংশীয়দের অন্তর বা প্রত্যন্তর পুরুষেরা আসিয়া বঙ্গে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইলেই বা বংশগৌরব বাড়ে কই? যে রাজা হইত, সেই ক্ষত্রিয় হইত; তথাপি বঙ্গের রাজাগণ কখনও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। এ কথাটা বেশ রহস্যজনক। যাহা হউক, এই রাজগণ, বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম পরিপ্লুত বঙ্গে, বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। মন্দিরে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইবার পর, মনুর অনুশাসন অবলম্বন করিয়া, মহারাজ গুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি, প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞের পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু সময় এবং অবস্থার আনুকূল্যে, বাঙ্গালার সেনরাজারা, ক্ষুদ্র হইয়াও, অধিক কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। দেশ বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিল; কাহারও বড় জাতি ছিল না; এরূপ স্থলে বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বা অভিনয় করিতে হইলে, যাত্রার দলে বা নাটকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিতে

হইয়াছিল। দেশের লোক, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, এবং কেহ আর কিছু সাজিয়া, নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিল। এত করিয়াও কিন্তু সেনগুপ্ত মহাশয়দের উপবীত, গুপ্তই রাখিতে হইয়াছিল। গলায় পৈতা, কেবল ব্রাহ্মণেরই ছিল। সেই জন্যই বাঙ্গালার হেঁয়ালিতে "গলায় পৈতা বামুন নয়," বিশুদ্ধ হেঁয়ালি ছিল। যদি ক্ষত্রিয় গৌরব থাকিত, যদি মনে মনে শূদ্রত্বের ভয় না থাকিত, তাহা হইলে কি লুকাচুরি চলিত? ধীরে ধীরে হাতের বাঁশী অসি হইয়াছে; কোমরের চাপরাস, বক্ষভূষণ হইয়াছে। ইহাতে সম্মান বাড়িয়াছে কি?

এই ইংরাজি মুলুকে, এ কালের হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী অনেক মতবাদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, অনেকে, কায়স্থ এবং বৈদ্যদের এই সকল আন্দোলন, সমাজের অনুকূল ভাবিয়া, অসার বলিয়া জানিয়াও, উহার পৃষ্ঠপোষণ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, ব্রাহ্মণেরা যে উপবীত ফেলিয়া দিতেছেন, তাঁহারা হিন্দুর গৌরবরক্ষার জন্য তাহা কুড়াইয়া পরিতেছেন। যাঁহারা প্রকাশ্যে জাতি মানেন না, তাঁহারাও যেমন শাস্ত্রবিরোধী, ইঁহারাও তেমনি। ইঁহারা ভাবেন যে, আমরা সুশিক্ষিত, উচ্চ পদস্থ এবং ধনসম্পদযুক্ত, আমরা কেন ছোট থাকিব? শাস্ত্রে যাহাই বলুক, দেশপ্রসিদ্ধি যাহাই হউক, আমরা এখন হয় ব্রাহ্মণ হইব, না হয় ঐরূপ একটা কিছু হইব। যাঁহারা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম লোপ করিতে চাহেন, তাঁহারাও যে জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করেন, ইঁহারাও সেই জন্যই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন।

চিরদিন যে যাহার জাতিতে আপনার মত বড় ছিল; গুণবান হইলে সকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিয়াছেন; তথাপি এই আন্দোলন কেন? কেহই আর ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন না; তবে এদেশের অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ইতিহাসকে, মিথ্যা কথার মেঘ সাজাইয়া, অধিকতর অন্ধকারময় করিয়া লাভ কি?

যাঁহার জাতিগৌরব যাহা আছে, তাহাই থাকুক; না হয় ক্ষমতা থাকিলে জাতি ভাঙ্গিয়া দিয়া বড় হইয়া উঠুন। হে পদাভিলাষীগণ! যাহা করিতে হয় কর; কিন্তু ইতিহাসকে বধ করিও না। তোমাদের বিপুল আন্দোলন দেখিয়া, ইতিহাস, ত্রাসযুক্ত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছে:— "অব্রহ্মণ্যম্"।

শ্রীইতিহাস।

বারভূঞা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য।

দেববংশের রাজত্ব অবসান হইলে, রাজা জয়দেব দেবের দৌহিত্র প্রেমানন্দ বসু বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোন কোন মতে জয়দেব দেবের নাম একবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয়দের বহু কারিকায় অপুত্রক বলিয়া তাঁহারা প্রেমানন্দ বসুকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রেমানন্দ যে দেববংশের পরবর্ত্তী রাজা, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মতই বলিতে হইবে।*

* নব্যভারত, কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় প্রবন্ধ (১৩০৮, অগ্রহায়ণ)

বাকলাতে দেববংশের রাজত্ব স্থাপনাবধি তথায় বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান হইয়া দাড়ায়। ঘোষ, বসু, গুহ, এই কুলীনগণ তথায় রাজবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে থাকেন। দেববংশের রাজত্ব কালে তাঁহারা সসম্মানে বাস করিতেছিলেন। রাজা বংশমর্য্যাদায় ন্যূন হওয়া প্রযুক্ত কুলীনদিগকে বিশেষ মান্য করিয়া চলিতেন, কুলীনেরাও রাজাকে রাজোচিত সম্মানদান করিয়া সমাজপতিত্ব পদে বরণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে বসু কুলীনবংশই চন্দ্রদ্বীপের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সময় কিন্তু অন্যান্য কুলীনেরা বড়ই চিন্তা সমস্যায় পতিত হইলেন। মনুষ্য সকলই করিতে পারে, কিন্তু সমকক্ষ লোকের নিকট কদাচও ন্যূন হইয়া থাকিতে চাহে না। নীচ বংশকে বরং উচ্চাসন দিয়া বা তাহার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকা যায়, তথাপি আপনার জ্ঞাতি বা সমকক্ষ মর্য্যাদাশালীর নিকট, কখনও কেহ অবনত হইতে চাহে না, কথায় বলে—

"অসহ্যং জ্ঞাতি দুর্ব্বাক্যংমেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ"

বসু বংশ রাজা হইলেও সেইরূপ হইয়া পড়িল।

পরমানন্দ বসুর রাজত্ব কালে সমাজ সমীকরণ লইয়া গোলোযোগ হয়। কুলীনেরা বিবাহাদি কার্য্যে যেরূপ রাজার অনুমতি লইত, বসু রাজার নিকট তাহারা সেইরূপ অনুমতি লইতে অস্বীকৃত হয়। এই কারণে রাজা কুলীনদিগকে নানারূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করেন, যাহারা উহা সহ্য করিতে পারিল, তাহারা রাজ আজ্ঞা মান্য করিয়াই চলিতে লাগিল, কিন্তু রাজজ্ঞাতি বসু-বংশ উহাতে যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অন্য বংশ মধ্যে গুহ বংশীয় রামচন্দ্র নিয়োগী তৎপথাবলম্বী হইলেন। এই সময় বিক্রমপুরে আর একটী রাজবংশের বিকাশ হওয়ায়, বসু বংশীয়েরা সেই রাজবংশের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। বিক্রমপুরাধিপতি রায়-রাজগণ তখন সাদরে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে "মালখানগর" গ্রামে স্থাপন করিলেন। গুহবংশীয়দের মধ্যেও একশাখা বিক্রমপুরাধিপতির বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া "রাইসবর" নামক স্থানে বাস করিতে লাগিল। রামচন্দ্র নিয়োগী আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্ব-বাঙ্গলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপ্তগ্রামে প্রস্থান করিলেন। জন্মভূমি-বিচ্যুতি ও দারিদ্র্যতা নিবন্ধন রামচন্দ্র বড়ই বিপদে পতিত হইলেন, কিন্তু যতদিন তাঁহার গ্রহ-প্রতিকূল ছিল, তত দিন কোন মতে শত চেষ্টা করিয়া কাহারও আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না, পরে যে সময় ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন, সে সময় শ্রীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক পদস্থ কায়স্থ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আশ্রয় প্রদান করিলেন। পরে রামচন্দ্রের বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের মধুরতা প্রভৃতি অবগত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার কন্যা সম্প্রদান করিলেন। শ্বশুরের অনুগ্রহে ও চেষ্টায় পরে রামচন্দ্র সপ্ত গ্রামের কাননগুহের সেরেস্তায় এক মোহরের পদে নিযুক্ত হন।

কালক্রমে রামচন্দ্র বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। এ সময় তাহার ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই বালকেরা পরে সপ্তগ্রামের কাননগুইর সেরেস্তায় কার্য্যগ্রহণ করে। ঘটনা চক্রে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তার সহিত

রামচন্দ্রের মতান্তর ঘটে। রামচন্দ্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুত্রগণ সহিত গৌরে প্রেস্থান করেন। এই সময় নবাব জালালুদ্দীন অন্তিম শয্যায় শায়িত, তাঁহার শিশু পুত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। রামচন্দ্র সুযোগক্রমে রাজসরকারে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই নবাবের দেহাবসান হয় ও তাঁহার পুত্র শত্রু হস্তে নিহত হয়, তৎপর করাণী বংশীয় সুলেমান ১৫৬৩ খ্রীঃ অঃ গৌরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সৌভাগ্যের আলোকচ্ছটায় এই সময় রামচন্দ্রের প্রতিভাকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়া নূতন নবাবের নিকট পরিচিত করিয়া দিল। দিন দিন তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু রামের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় অধিক কাল তাঁহাকে আর নবাবের অনুগ্রহ ভোগ করিতে হইল না। রামচন্দ্রের দেহাবসানে নবাব সুলেমান তাঁহার পুত্রদিগকে সদয় ভাবে গ্রহণ করিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময় ভবানন্দের শ্রীহরি ও গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নবাবপুত্রের সহিত একই মৌলবীর নিকট পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিত। এই সূত্রে নবাবপুত্র দায়ুদের সহিত তাহাদের বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে।

পরে যে সময় দায়ুদ পিতৃসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন শ্রীহরি ও জানকী বল্লভকে প্রধান অমাত্যপদে বরণ করিয়া তাহাদিগকে যথাক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায় উপাধি প্রদান করেন। * এ স্থলে বোধ হয়, যেমন রাজা আদিশূরকে বীরসেন এবং দনুজ মাধবকে দনুজমর্দ্দন ঠিক করিয়া ইতিহাসের কল্পনা স্রোত পরিচালিত করা হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীহরিকে বিক্রমাদিত্য ও জানকী বল্লভকে রাজা বসন্তরায় বানাইয়া গুহ বংশেরও বনিয়াদ ঠিক করা হইয়া থাকিবে। অন্যথা নামের উপাধি আবার নাম হয়, উহার ভাব আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে হিন্দু মাত্রেরই নামকরণ কালে দুইটী নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, হয়ত বা ঐ রূপ ভাবেই তাহাদের দুইটী নাম হইয়া থাকিবে।

দায়ুদের সহিত মোগলসম্রাট আকবরের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। দায়ুদ আপনার ধনবল ও জনবলের আধিক্যতা সন্দর্শনে একটী মোগল দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। এই জন্য বাদসাহ তাহাকে দমন জন্য ১৫৭৫ খ্রীঃ অঃ সেনাপতি মুনেম খাঁ ও রাজা তোডর মল্লকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। মোগল পক্ষের বিপুল বাহিনীর পরিচয় পাইয়া নবাব দায়ুদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। পরে যুদ্ধে পরাজয় হওয়ায় দায়ুদ মোগল সেনাপতিদ্বয়ের সহিত সন্ধি করেন। তদনুসারে সমগ্র বঙ্গ বিহার বাদসাহের হস্তগত হয়। মুনেম খাঁ গৌরের রাজধানীতেই অবস্থান করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। এই সময় গৌরে মহামারী উপস্থিত হইয়া উহাকে জনশূন্য করিয়া তুলে, মুনেম খাঁও গতায়ুঃ হন। দায়ুদ সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় বাঙ্গলা আক্রমণ করে ও আগমহলের যুদ্ধে ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে নিহত হয়।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় ছদ্মবেশে নানা স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। পরে যে সময়

* মহারাজ প্রতাপাদিত্য, ১১ পৃষ্ঠা।

তোডরমল্ল বাঙ্গালা জরিপ করিয়া কর সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ঐ দুই ভ্রাতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব নবাবের সময়ের যাবতীয় কাগজ পত্র বুঝাইয়া দেন। এজন্য তোডরমল্ল সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, কয়েকখানা পরগণার আধিপত্য প্রদান করেন।

দায়ূদ যে সময় উড়িষ্যায় পলায়ন করেন, তৎকালে তাঁহার বহু মূল্যবান সম্পত্তি সকল অমাত্য বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের হস্তে রক্ষা করিয়া যান। অমাত্যদ্বয় তখন গৌর বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থান করা শুভকর নয় মনে করিয়া দক্ষিণ বঙ্গে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কার করিয়া তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন (পরে যাহা যশোহর নামে খ্যাত হয়)। শিবানন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত যশোহর না যাইয়া পৈতৃক পূর্ব্ব স্থান বাকলাতেই অবস্থান করিতে থাকেন।

এই স্থলে প্রসঙ্গত আর একটী বিষয়ের অবতারণা করা গেল। ইতিহাস পাঠ করিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, বঙ্গদেশে পাঠান শাসন কালের অন্তিমে ও মোগল শাসনের অভ্যুদয় কালে যে সকল ভূমাধিকারীরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ কায়স্থ। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, বোধ হয়, তৎকালে হিন্দু সম্প্রদায়, মুসলমান রাজগণের সংশ্রবে অতি অল্পই মিশিতেন। যাঁহারা ঐ সময় রাজসেবী ছিলেন, তাঁহারাই চিরপ্রথানুযায়ী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায়, কায়স্থ সম্প্রদায় মধ্যে বঙ্গজ কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণই অধিক পরিমাণে মুসলমানের দাসত্ব স্বীকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্যান্য ভদ্র হিন্দুরা উহা তত সম্মাননীয় মনে করিতেন না, বরং ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে উহার কতকটা আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা নিম্নে কতকাংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পাদসাহের উৎসাহে রাজদ্বারে চাকুরী পাইবার আশায় পাদসাহের সেবা করিবার আশায় অনেক হিন্দু পারস্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে, উহার পূর্ব্বে কিন্তু হিন্দুরা পারস্য ভাষা শিখিত না, মুসলমানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিত না, মুসলমানের নিমক খাইত না।"

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। সেকালে হিন্দুসমাজ যবন সংস্পর্শকে যারপরনাই ঘৃণার্হ মনে করিত, বিশেষত বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়ন, বিজাতীর নিমক গ্রহণ ও পদসেবা করাকে যারপরনাই হীনতার কার্য্য মনে করিত। যদি কেহ উচ্চপদ বা অর্থের প্রলোভনে ঐরূপ কার্য্য করিত, তবে সমাজে তাঁহার নিন্দার ইয়ত্তা থাকিত না। অতএব যাহারা অনন্যোপায় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই ঐরূপ কার্য্যে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। পরিণামে কিন্তু তাহাদেরই মান-মর্য্যাদা সমাজে শ্রেষ্ঠ হইয়া দাড়াইল, দেখিয়া অপরাপর লোকও ক্রমে ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ সকল রাজসেবীরাই পরিণামে বড় বড় জমীদার হইয়া দাড়াইলেন। বোধ হয় তৎসময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে যাহারা কতকটা অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথমে মুসলমানের দাসত্ব স্বীকার করেন। এই জন্যই বঙ্গীয় দ্বাদশ জন ভৌমিকের মধ্যে ছয় জন কায়স্থ ও তিন জন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের নাম দৃষ্ট হয়। যাহা

হউক, যশোহর স্থাপয়িতা রায়-রাজগণও এইরূপে রাজসেবা করিয়া উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় তোডরমল্লের অনুগ্রহে বাদসাহের নিকট হইতে জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যশোহর আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের রাজ্য পদ্মার দক্ষিণ ভাগীরথী হইতে ভৈরব কপোতাক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আসমুদ্র বঙ্গাংশ, অর্থাৎ হিন্দুরাজার আমলের বাগড়ী বিভাগ, মুসলমান আমলের সপ্তগ্রাম ও যশোহর সরকার, ইংরাজের প্রথমামলের যশোহর জিবিজান ও বর্ত্তমান কালের প্রেসিডেন্সী ডিবিজন ভুক্ত ছিল। কালীঘাট তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল, এবং সে সময় অরণ্যময় ছিল। কালীর প্রথম সেবক ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে রাজা বসন্ত রায় প্রথম কালীর ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কালীঘাট প্রকাশিত করিয়া, কালীর সেবা সৌকর্য্যার্থ, রাজা কালীঘাট গ্রাম গুরুকে দান করেন। (১) বর্ত্তমান কালে কালে ভাগীরথীবক্ষে ইংরাজ-প্রদত্ত কণ্ঠহার রূপী যে জুবিলী সেতু শোভমান আছে, সেই সেতুর পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী বর্ত্তমান হুগলী নগরের পর-পারস্থিত নৈহাটি গ্রামে যশোহর রাজ-বংশের গ[illegible]বাসের বাটী [illegible] অদ্যাপি তাঁহা[illegible] আছে। [illegible] ডায়মণ্ড-হারবার সব ডিবিজনের [illegible] মথুরা-পুর থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর গ্রামে বসন্ত রায়ের অপর গঙ্গাবাসের বাড়ী ছিল। এইক্ষণ সুন্দর বন মধ্যে নানা স্থানে যশোহর রাজবংশের বহুতর কীর্ত্তি-কলাপ অতীতের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান আছে। ধ্বংসাবশিষ্ট উচ্চ উচ্চ প্রাসাদ তোরণ, প্রাচীর ও গড় সহ প্রাচীন যশোহর নগর হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল ভয়াবহ ভীমা অটবীরূপে বিদ্যমান আছে, এবং নৌকাবক্ষ হইতে তদ্দর্শনে বঙ্গবাসীর হৃদয় এখনও পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি সহকারে আন্দোলিত হইয়া থাকে। এইরূপ চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জিলার অন্তর্গত সুন্দর বন অঞ্চলের বহুতর স্থানে এইক্ষণ পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্য উপলক্ষে বহুতর প্রস্তরময় কড়ি কাঠ ও জানালা দরজাদি বিশিষ্ট মন্দির ও নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে মোগলাধিকারের মধ্য কালে, বর্ত্তমান শ্বাপদ সঙ্কুল, জনসমাগম পরিশূন্য, অস্বাস্থ্যকর লবণাম্বু জলাভূমি বিশিষ্ট অরণ্যানী সমাচ্ছন্ন সুন্দর বন অঞ্চল বহুতর জনপদে সমালঙ্কৃত ছিল।

বোধ হয়, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সুন্দর বনের বর্ত্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের প্রভাবে, বহুতর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও তদিতর জাতীয়গণ, পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে উঠিয়া আসিয়া বিত্তলাভ সহকারে বঙ্গের এই অংশে বাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পূর্ব্ব তটবাসী বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ,

---

(১) ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র বংশ সম্ভূত কালীর বর্ত্তমান সেবক হালদার মহাশয়েরা রাজা বসন্ত রায় প্রদত্ত সেই ব্রহ্মত্র অদ্যাপি উপভোগ করিতেছেন। যশোহর রাজবংশের পতন সহকারে যখন কালীঘাট অঞ্চল সাবর্ণ চৌধুরীদিগের হস্তগত হয়, তখন সেই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ্য বংশকৃত কালীর মন্দির প্রভৃতি কীর্ত্তিকলাপ সৃষ্ট হইয়াছিল। বঙ্গীয় সমাজ, ১৪০ পৃষ্ঠা।

কায়স্থ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজা বসন্ত রায়ের প্রভাবে তথায় স্থাপিত হইয়াছিলেন। (১) এই সময় বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় আর একটী বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহাদের পিতামহ রামচন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপাধিপতির সহিত সামাজিক বিষয়ে বিবাদ করিয়া দেশ পরিত্যাগ করেন। এখন সেই সমাজে যাহাতে চন্দ্রদ্বীপ-রাজ সম্যক প্রভুত্ব পরিচালন না করিতে পারেন, তৎ প্রতিকারে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রচুর অর্থ ও ভূমির অধিপতি হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ বলীয়ান হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের চেষ্টা যে তৎ সময় ফলবতী হইবে, তৎ বিষয়ে সন্দেহ কি? যাহাতে কুলীন কায়স্থেরা আপনাদের বংশ বিশুদ্ধ রাখিয়া আদান প্রদান করিতে পারে ও নীচ সংসর্গ সংস্পর্শ না হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিল। এই সময়ের পূর্ব্বে বাকলা সমাজ ভিন্ন বিক্রমপুর ও ভূষণা বা ফতেয়াবাদ নামক আরও দুই সমাজ পৃথক সৃষ্টি হইয়া দুটী রাজবংশের সাহায্যে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছিল। যশোহরাধিপতিরা ভিন্ন সমাজ সৃজনের মানস করিয়া উহার সফলতাও লাভ করিতে পারিলেন। বিভিন্ন সমাজ হইতে নানা সম্প্রদায়ী কুলীনেরা সমাগত হইয়া যশোহর সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। রাজারা তাহাদিগকে প্রচুর ভূবৃত্তি ও অর্থ দান করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

বসন্তরায় কর্ত্তৃক যদুনন্দন বসু বিক্রমপুর মালখানগর হইতে এবং তাঁহার জ্ঞাতি ভবানী দাস চৌধুরী বাকলা হইতে উঠিয়া আসিয়া যশোহরের অন্তর্গত মাগুরপাড়া ও মাইহাটি নামক স্থানে সংস্থাপিত হয়। এইরূপে বাকলা বিক্রমপুর ও ভূষণা সমাজ হইতে অনেকানেক কুলীন আসিয়া ক্রমে যশোহর সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। এই নব সংস্থাপিত সমাজের সমাজপতি পদে বিক্রমাদিত্য বরিত হইয়া বসন্ত রায়ের সাহায্যে সামাজিক শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য যথাক্রমে দুই বিবাহ করেন। ১ম উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যা, ২য় জগদানন্দ ঘোষের কন্যা। অনুমানিক ১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রথম পক্ষে প্রতাপাদিত্য ও ২য় পক্ষে মুকুটমণি নামে দুইটী পুত্র হয়।

গৌড় নগরে প্রতাপের জন্ম হয়। তৎকালে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় রাজামাত্য পদে বরিত থাকিয়া নিতান্ত যশের সহিত কাল কর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রবাদ শুনা যায় যে, প্রতাপ জন্মগ্রহণ করিয়াই বিকট শব্দে নিনাদ করিয়া উঠেন, তাহাতে রাজপরিবারস্থ সকলেই ভীত হন, পরে জ্যোতির্ব্বিদেরা কোষ্ঠী-গণনাফলে নির্দ্দেশ করেন যে, প্রতাপ পিতৃঘাতী হইবে। এই সকল মনক্ষোভকর বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বিক্রমাদিত্য নবজাত শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত রায়ের ও স্বীয় বনিতার কাতরতায় অভিভূত হইয়া ঐ কার্য্য হইতে নিরত হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক ইহাতে স্বভাবতঃ কুরুপতি দুর্য্যোধনের বিষয় মনে পড়ে, এবং পরে এই কায়স্থ রাজবংশও যে কুরুকুলের ন্যায় আত্ম, জ্ঞাতি, পুত্র কলত্রাদির রুধিরে উহার শেষ যবনিকা পাতিত করিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য।

(১) বঙ্গীয় সমাজ, ১৪৩ পৃঃ ও ১৪৪ পৃঃ।

ক্রমে প্রতাপাদিত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এক দিকে যেমন তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যা-বুদ্ধি সঞ্চারের লক্ষণ সকল পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, অপর দিকে আবার ঔদ্ধত্য, একগুয়ে প্রকৃতি, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ও তাঁহার প্রবৃত্তির অন্যতর উপকরণ স্বরূপ লক্ষিত হইতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য কোন মতেও পুত্রের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। পুত্রের মুখাবলোকনে কোথায় তাঁহার হৃদয়ে সন্তোষ উদ্ভাসিত হইয়া পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে, তাহা না হইয়া তৎবিপরীত নানা অসন্তোষকর বিষয়ের নায়ক বিবেচনায় তিনি পুত্রকে বরং কুগ্রহবৎ অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিদ্যা-বুদ্ধির কথঞ্চিত ন্যূনতা থাকিয়াও যদি প্রতাপ সচ্চরিত্রতার উচ্চ পরিচয় দিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে সস্নেহে হৃদয়ের অন্তঃস্তলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ রাখিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

পরে এরূপ হইয়া দাড়াইল যে, তিনি পুত্রকে দূরতর প্রদেশে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বিদ্যা-গবেষণার সহিত বহুদর্শিতা লাভ হইলে ভবিষ্যতে পুত্র নিজ হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা কোমল প্রবৃত্তিশালী হইতে পারিবে, এই ভাবিয়া প্রতাপকে দূরদেশে রাখাই ঠিক হইল।

অচিরে উপযুক্ত লোক সহিত পিতৃ-নিদেশ ক্রমে প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন।

এ স্থলে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়, অপর একটী কারণ লিখিয়াছেন যে, প্রতাপ রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্য্যব্যপদেশেই বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এ স্থলে তদনুকূলে মত প্রদান করিতে পারি না। অন্যান্য বিষয়ের সহিত বারান্তরে এ বিষয় আলোচনা করিত ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

তমাল লতার

তমাল-লতার

শত অহি করি অন্ধ, শিরে নাহি বেণীবন্ধ,
তিলফুল জিনি শোভা নাহি নাসিকার ;
উর্ব্বশী মেনকা প্রায়, নাহিক সুচারু কায়,
কুরঙ্গ জিনিয়া নাহি নয়ন তাহার ;
জিনিয়া শরতচাঁদ, নাহি বদনের ছাঁদ,
নাহিক মুকুতা জিনি দশনের সার ;
মৃগরাজ জিনি কোটী, নাহিক তাহার কটি,
মৃণাল জিনিয়া নাহি বাহু সুকুমার ;
জিনিয়া মাতঙ্গ-পতি, নাহি তার মৃদু গতি,
চম্পক সদৃশী নাহি অঙ্গুলি তাহার,
তাহার অধরে নাহি ফুট বিম্বহার।

তমাল-লতার

দুটী শ্যাম আঁখি মাঝে, বিশ্বের মাধুরী রাজে,
নীরব কোকিল, শুনি স্বরের ঝঙ্কার ;
সে তরল করস্পর্শে, পরাণ উছলে হর্ষে,
চলিলে কুসুম ফোটে পদতলে তার ;
আছে তার সুধাহাসি, জিনিয়া কৌমুদীরাশি
প্রভাব-প্রভায় তার মলিন মন্দার ;
প্রীতি-সিন্ধু তার বুকে, মমতা মাখান মুখে,
সে যেন জীবন্ত মূর্ত্তি ঈশ-করুণার ;
তার আধ প্রেম-আসে, নয়ন মুদিয়া আসে,
তরঙ্গে চকল হয় সোহাগ পাথার
মায়া ধরা জ্যোতিভরা লাবণ্যে তাহার।

কিবা দিব পরিচয় তমাল লতার ?
নন্দন-কাননজাত, সে পবিত্র পারিজাত,
আশার নিকুঞ্জে সে যে সুরম্য মন্দার ;
শিথিল অঞ্চলে তার, বাসন্তী পবন তার
সে দীপ্ত ললাটে লেখা, শিখা গরিমার ;
সে থাকিলে পাশে পাশে, স্বর্গ যেন নেমে আসে,
না থাকিলে মনে হয় ভুবন আঁধার ;
নবীন জীবনভাগে, আনন্দ-অরুণ জাগে,
সে হেসে চাহিলে হয় সিদ্ধি সাধনার ;
ঘুচে যায় শত দুখ, পূর্ণ হয় ভগ্ন বুক
শান্তির প্রশান্ত বিন্দু লভিলে তাহার ;
নীরস জগতে ফোটে তটিনী দয়ার।

কি আর শুনিবে বল তমাল সভার ?
মরুভূমে বারিসিন্ধু, মোহের বিনোদ ইন্দু,
হৃদয়ের শৈলশৃঙ্গে প্রেমের তুষার ;
মৃত্যুকালে হরিনাম, অতুল প্রণয়-ধাম
সে, অম্লান ইন্দ্রধনু হৃদি-নীলিমার ;
বসুধা তৃষিত বক্ষে, সে ঠাম নিরখে চক্ষে,
গগনে গগনে বাজে যশোগীতি তার ;
পুণ্যময়ী, ধর্ম্মরতা, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা,
সৃষ্টির ললাম ভূত রচনা ধাতার ;
বিশ্বের সৌন্দর্য্য সার, অমূল্য মাণিক হার
আমার অক্ষয় সত্তা চরণ তাহার,
স্মরণে কবির চক্ষে বহে অশ্রুধার।

——গিরিজাকুমার—

কামিখ্যা-শৈলে

(অবশিষ্টাংশ)

এইবারে কামরূপ কামিখ্যা পাহাড়ের উপরিভাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। পাহাড় যত লোক বাস করে, এবারের সেন্সাসে তাহাদের সংখ্যা প্রায় নয়শত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দেড়শত ঘর ব্রাহ্মণ, এই সকল ব্রাহ্মণ বৈদিক শ্রেণী ভুক্ত ; অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখানে নাই। শূদ্রের সংখ্যা ব্রাহ্মণাপেক্ষা অধিক, কিন্তু জলাচরণীয় শূদ্র ভিন্ন অর্থাৎ যে সকল শূদ্রের হস্তে ব্রাহ্মণবর্গ জল গ্রহণ করিতে পারেন না, সে প্রকারের শূদ্র এখানে বাস করিতে পারে না। বর্ত্তমান বৎসরে পাণ্ডার সংখ্যা ১২০। ব্রাহ্মণ পুরুষ এবং কামরূপ পর্ব্বতবাসী ভিন্ন কেহই পাণ্ডা হইতে পারে না। এই পাণ্ডাদিগের মধ্য হইতেই কামিখ্যা দেবীর পূজারী, ধনাধ্যক্ষ, তত্ত্বাবধারক প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হয়, পাণ্ডারা শর্ম্মা উপাধি ব্যবহার করে এবং দেবীর বরপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। এখানে মুসলমান নাই, মুসলমান থাকিবার নিয়মও নাই। মন্দিরের নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম সৌভাগ্যকুণ্ড। এই স্থানে যাত্রীদিগকে স্নান করিতে হয়। পাণ্ডারা বলিয়া দেয়, এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে মানবের দুর্ভাগ্য অর্থাৎ দুরদৃষ্ট খণ্ডন হইয়া যায় এবং স্নানকারী ব্যক্তি সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়। কুণ্ডে গিয়া আমি দেখিলাম, অতি পুরাকাল হইতে এই কুণ্ডের সংস্কার হয় নাই। নানা প্রকার যাত্রীর স্নান, আচমন, বস্ত্রধৌতকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ায় এই ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর স্বল্প পরিমাণ জল এতই মলিন ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়াছে যে, তাহা একেবারেই অব্যবহার্য্য এবং সেই কুণ্ডের ধারে দাঁড়াইয়া থাকাও অকল্যাণকর। বর্ষার সময়ে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু দুই এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলেই সৌভাগ্যকুণ্ড হইতে যে বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত হয়,

তাহাতে অনেক সৌভাগ্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে হতভাগ্য হইতে হয়। কুণ্ডের পার্শ্বে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা স্কুল, তাহাতে কামরূপের বালকেরা বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িতে পারে। পাহাড়ে দোকানের সংখ্যা ৫টী, তাহাও অতি সামান্য দোকান মাত্র। খ্রীষ্টীয় ১৭৭২ অব্দে ব্রহ্মদেশের নরপতি ইংরাজসেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যে সন্ধিপত্র করেন, তাহাতে কামরূপ ইংরাজের হস্তগত হয়, সেই অবধি ইহা ইংরাজেরই অধিকৃত। এই কামিখ্যা পর্ব্বত এক্ষণে গৌহাটী জেলার অন্তর্গত; থানা ও পোষ্টাফিস উভয়েই গৌহাটীতে। মন্দিরের পার্শ্বে একটী চিঠী দিবার বাক্স আছে; গৌহাটী হইতে প্রতিদিন ডাক ঘরের পিয়ন চিঠী পত্র লইয়া আইসে। কামিখ্যা পর্ব্বত এবং কামিখ্যা বন, পাণ্ডাদিগের নিষ্কর সম্পত্তি। পাহাড়ের সপ্ত ক্রোশ দূরে "হয়গ্রীব মাধব" নামে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। পরশুরামকুণ্ড নামক তীর্থ গৌহাটী হইতে অপর দিকে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বশিষ্ঠাশ্রম গৌহাটী হইতে হইতে ছয় ক্রোশ। গৌহাটীতে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইলে সম্মুখস্থ শৈলে "অশ্বক্রান্ত গয়া" নামক তীর্থ দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে অনেকে পিতা মাতার শ্রাদ্ধ করেন। ইহারই কিঞ্চিৎ দূরে পাহাড়ের উপরে উমানাথ তীর্থ। জাহাজে চড়িয়া ব্রহ্মপুত্র নদ-বক্ষ দিয়া যখন যাত্রীরা গৌহাটী আইসে, তখন এই তীর্থগুলি জাহাজ হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল তীর্থের কোনও স্থানেই এখন নরবলি হইতে পায় না, পুরাকালের নরবলি প্রথা ইংরাজের শাসনে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ে খুব মশা, মশার আকারও খুব বড় বড়। কামিখ্যা দেবীর মন্দির হইতে আর একদিকে অতি অল্প দূরে পাহাড়ের আরও কিছু উপরে উঠিলে সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখিতে পাইবেন। কামিখ্যার মন্দির হইতে এই স্থানে ১৫ মিনিটের মধ্যে আসা যায়। অনেকে শুনিয়াছেন—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।"

এই সেই ভুবনেশ্বরীর দেবালয়। পুরাতন মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, দ্বারভাঙ্গার মহারাজের ব্যয়ে ইহার আবার সুন্দর সংস্কার হইয়াছে। এই মন্দিরের নিকটে একটী ঝরণা আছে, তাহা হইতে সুন্দর সুস্বাদু জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে স্বামী অভয়ানন্দ নামে একজন বাঙ্গালী সাধু প্রায় সপ্ত বর্ষ কাল হইতে বাস করিতেছেন। এই সাধু ভিন্ন কামিখ্যা শৈলে আর কোনও বাঙ্গালী নাই। বাঙ্গালী নাই বটে, কিন্তু কামিখ্যা পাহাড়ে বাঙ্গালা ভাষার খুব ছড়াছড়ি! বাঙ্গালা স্কুল আছে, বাঙ্গালা পাঠশালা আছে, অসংখ্য বাঙ্গালা পুস্তক আছে এবং প্রয়োজনীয় পত্রাদি বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত হয়। বালক বালিকা, দাস দাসী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা জানে। পাণ্ডারা এত পরিষ্কার বাঙ্গালা বলিতে পারে এবং কোনও কোনও পাণ্ডার বাঙ্গালা ভাষায় এমন আশ্চর্য্য অধিকার জন্মিয়াছে যে, অনেক বাঙ্গালীকে তাহাদের কাছে হারি মানিতে হয়। এখানকার লোকেরা বাঙ্গালা ভাষাকে খুব ভালবাসে এবং বাঙ্গালীর সংসর্গ খুব প্রিয়। পাহাড়ের সর্ব্বত্রই বাঙ্গালা ভাষা খুব চলে। কামিখ্যা পাহাড়ে একটী ভয়ানক অসুবিধা এই যে, এখানে অত্যন্ত জলকষ্ট। কূপখনন এখানে অসম্ভব। সৌভাগ্য

কুণ্ড নামক একমাত্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি; পাহাড়ের সমুদয় লোককে পানীয় জলের জন্য ভুবনেশ্বরী মন্দিরের ক্ষুদ্র ঝরণার উপরে নির্ভর করিতে হয়। ফাল্গুন মাসে এই ঝরণা শুকাইয়া যায়, অতি সামান্য মাত্র জল থাকে; এদিকে ফাল্গুন চৈত্র মাসে নানা প্রকার উৎসব বশতঃ জলের খুব প্রয়োজন হয়, সুতরাং এখানে জলের খুব অভাব এবং খুব কষ্ট আছে। ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এই কয়েক মাসের মধ্যে যাত্রী আসিলে জলাভাবে কষ্টভোগ করে। পর্ব্বতের নীচে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত সত্য, কিন্তু পর্ব্বতের উপর হইতে নদীতে আসিবার পথ নাই। পথ প্রস্তুত হইলেও নদী হইতে পাহাড়ে জল লইয়া যাওয়া নানা কারণে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আসামের কায়স্থেরা "কলিতা" বলিয়া পরিচয় দেয়; কামরূপ পাহাড়ে অনেক কলিতা বাস করে। ভুবনেশ্বরীর মন্দির হইতে পাণ্ডার বাটীতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে একদিন এক কলিতার বাটীতে দুই এক ঘণ্টা উপবেশন করিয়াছিলাম। এই কলিতার সহোদর আমাকে এক প্রকার চাউল দেখাইয়াছিল, ঐ চাউলের নাম "বোকা"; প্রায় ১৫ মিনিট কাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিলে এই চাউল "ভাত"রূপে পরিণত হয়। অগ্নি বা কাষ্ঠের আদৌ আবশ্যক হয় না। ইহা এক টাকায় পাঁচ সের বিক্রীত হয়। জলে ইহা জন্মে এবং অগ্রহায়ণ মাসে ইহা পাকে। বোকা চাউলের এই ভাত, ডাল বা তরকারী দিয়া খাওয়া যায় না; দধি, কদলী এবং চিনি সহ খাইতে হয়। আসামের সর্ব্বত্র ঠিক একই রূপ ভাষা প্রচলিত নাই। কাছাড়ের কাছারী ভাষা, মণিপুরের মণিপুরী ভাষা, গারো বা কুকিদিগের ভাষা আসামী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র; কামরূপের ভাষাও আসামী ভাষা নহে; কামরূপের ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

বাঙ্গালা	কামরূপী	আসামী
বালক	আপ্পা	নরুয়া
বালিকা	আপ্পী	ছোয়ালী
মসি	মহী	সেহি
পথ	বদ	বাদ
নিদ্রা	ঘুমতী	তুপনী
মনুষ্য	মানু	মনু
দুগ্ধ	ফুতীরাক্ষীর	গাক্ষীর
লঙ্কা	ভজকুলু	ঝিলিকা

কাটিয়াবাড়ের লোকদিগের ন্যায় কামরূপের লোকেরা স স্থানে হ এবং হ স্থানে স উচ্চারণ করে, এই জন্য সাপ হাপ, সোণা হোনা, সরু হরু, হীরা শীরা, হাত শাত, হত্যা শত্যা উচ্চারিত হইয়া থাকে; কিন্তু চ ছ প্রায়ই স রূপে উচ্চারিত হয়, যথা, আছে আসে, কাচ কাস, চমৎকার সমৎকার, ছিন্ন সিন্ন, ইত্যাদি।

এইবারে মন্দিরের কথা বলিব। পুরাণে লিখিত আছে;—দক্ষাপমানে সতী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার দেহখানি ৫১ অংশে বিভক্ত হইয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হয়। যে যে স্থানে উহা পতিত হইয়াছে, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছে। কামরূপে সতীর যোনি পতিত হয়, এই জন্য ইহা যোনিপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কামরূপ পর্ব্বতের কোন্ স্থানে যোনি পতিত হইয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না, সুতরাং তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দিহান ছিল। যোগিনীতন্ত্র মতে কামরূপের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলে, কামরূপকে একটা মহাদেশ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। পাণ্ডাদিগের মতে উত্তরে

দেওয়ানগাড়ী, পূর্ব্বে নওগাঁ-দুয়ার, দক্ষিণে খাসিয়া এবং পশ্চিমে করতোয়া নদী, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত দেশের নাম কামরূপ। যাহা হউক, কামরূপ কামিখ্যার মন্দির সম্বন্ধে পাণ্ডাদিগের গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, এবং পাণ্ডাদিগের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহা এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

"শিববংশাবতংশ মহারাজাধিরাজ কোচবিহারাধিপতির মল্লধ্বজ ও শুক্লধ্বজ নামে দুই পুত্র আসাম দেশে শিকার করিতে আসিয়া কামরূপ পর্ব্বতে উপনীত হয়েন। পিপাসায় কাতর হইয়া মল্লধ্বজ জলান্বেষণ করেন এবং অনেক কষ্ট ও অনুসন্ধানের পর গহন বনের মধ্যে এক স্থানে ভূগর্ভ হইতে নির্ম্মল নীর নিঃসৃত হইতেছে, দেখিতে পান। ঐ জলপান করিয়া শুক্লধ্বজের পিপাসা শান্তি হয় এবং তাঁহার বহুবর্ষ কালের একটী কঠিন রোগ একদিবসের মধ্যেই আরোগ্য হয়। তৃতীয় রাত্রে রাজকুমার স্বপ্ন দেখেন, ভগবতী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "বৎস! কোচবিহারের রাজবংশ শিববংশসম্ভূত, সুতরাং আমার অত্যন্ত প্রিয়; আমি এক্ষণে আর কোচবিহারে নাই, এই পর্ব্বতে কামিখ্যা নামে আখ্যাত হইবার জন্য আসিয়াছি, আমার এই পীঠস্থান যোনিপীঠ নামে আখ্যাত হইবে। তুমি যেস্থানে জলপান করিয়াছ, আমি সেই স্থানে আছি, ঐ স্থানের উপরে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া রাজকুমার মল্লধ্বজ বলেন, "হে মাতঃ! এই স্থান যে প্রকৃত যোনিপীঠ, তাহা কিরূপে জানিব? ইহার প্রমাণ কিছু আছে কি? আর তুমিই যে যথার্থ ভগবতী, তাহাই বা কিসে জানিব?" রাজকুমারের প্রতি দেবীর আদেশ হইল, "হে বৎস! তোমার অঙ্গুলীস্থ হীরকাঙ্গুরী ঐ ভূগর্ভস্থিত কুণ্ডে ফেলিয়া দাও এবং তাহার পরে তুমি কাশী গমন কর। তথায় গঙ্গায় স্নান করিবার সময় তোমার কেশের মধ্যে যদি এই অঙ্গুরী দেখিতে পাও, তাহা ইহাই প্রকৃত যোনিপীঠ বলিয়া বিশ্বাস করিও।" রাজকুমার তাহাই করিলেন, কাশীর গঙ্গায় তাঁহার কেশে ঐ অঙ্গুরী পাওয়া গেল, তক্ত রাজকুমার অনেক টাকা ব্যয়ে দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং নির্ম্মাণকার্য্যে শুক্লধ্বজও অনেক সাহায্য করেন। এই জন্য শুক্লধ্বজ ও মল্লধ্বজের মূর্ত্তি দেবীর মন্দিরের ভিতর অতি সম্মানের সহিত রক্ষিত হইয়াছে।" ইত্যাদি।

কিন্তু পাণ্ডাদিগের পুরাতন পুঁথিতে ইহাও লেখা আছে যে,—

"শুক্লধ্বজ এবং মল্লধ্বজের অনেক পরে কোচবিহারের এক রাজকুমার দেবী দর্শনার্থ আগমন করিয়া কোনও অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই জন্য সেই অবধি কোচবিহার রাজবংশের কোনও লোক কামিখ্যায় আসিতে পারেন না, ঐ বংশের প্রতি দেবীর অভিশাপ আছে।

পাঠক মহাশয়! এই সকল পুঁথির কথা কতদূর সত্য বা মিথ্যা কিছুই জানি না, দুইটী কথা সত্য নিশ্চয় বলিয়া জানি। মন্দিরের ভিতরে পাণ্ডারা মল্লধ্বজ ও শুক্লধ্বজের পাষাণময় মূর্ত্তি এখনও অতি সম্মানের সহিত দেখাইয়া দেয় এবং অতি পুরাকাল হইতে কোচবিহার রাজবংশের কোনও লোক এই স্থানে আইসে নাই, বিশেষতঃ তত্রত্য রাজবংশ এই অভিশাপের কথা জ্ঞাত আছেন।

মন্দিরের আকার খুব বড় নহে। পাণ্ডার সঙ্গে ভিন্ন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ বা মাতাকে দর্শন করা নিয়মবিরোধী। ইহা নিরপেক্ষভাবে বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষের অন্যান্য তীর্থের পাণ্ডাদিগের তুলনায় এখানকার পাণ্ডারা খুব ভাল এবং খুব ভদ্র লোক। এখানে অত্যাচার বা জুলুম নাই এবং পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে ঘরে লইয়া গিয়া খুব যত্ন করে। সময়ে সময়ে সুবিধা বা সুযোগ হইলে পাণ্ডারা ধনবান যাত্রীকে শোষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না বটে, কিন্তু অত্যাচার নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে। পাণ্ডাদিগের দোকান, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি কিছুই নাই, ইহারা কেবল

যাত্রিদিগের উপরে নির্ভর করিয়া বংশ পরম্পরায় সুখ-স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। মন্দিরে প্রবেশ করিলে প্রথমে বোধ হয়, যেন কোনও প্রকাণ্ড ভূগর্ভে বা গিরিগুহায় অবতরণ করিতেছি। মন্দিরের প্রথম দ্বারের সন্নিকটে সুবর্ণময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি; তাহার একটু দূরে দশভূজা মূর্ত্তি। ইহার একটু দূরে আরও অবতণ করিতে হয়, কিন্তু এবার কিছুই দেখা যায় না——চারিদিকে ঘোর ঘন অন্ধকার। সেই খানে প্রদীপ জ্বলে। পাণ্ডারা প্রদীপ হাতে লইয়া সেই অন্ধকার পূর্ণ গহ্বর মধ্যে যোনিপীঠ দেখাইয়া দেয়; তন্ত্রোক্ত ভগযন্ত্রের মধ্যে যোনিপীঠ দর্শন করিতে হয়, তদনন্তর ইহার পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তাহার পরে আর এক দিকে দেবীর নাটামন্দির। এই নাটামন্দিরে শুক্রধ্বজের ও মল্লধ্বজের পাষাণময় সুবৃহৎ মূর্ত্তি, তদনন্তর নৃত্যশালা, পাকশালা এবং আর একটী অপেক্ষাকৃত অল্প অন্ধকারময় গুহায় ভৈরব মূর্ত্তি। মন্দিরের বাহিরের চারিদিকে প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত দলে দলে কুমারী কন্যাদিগকে দেখিতে পাইবেন। মন্দিরস্থ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেই মন্দিরের দ্বারদেশে এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণে দলে দলে কুমারী কন্যাগণকে দেখিতে পাইবেন। এই কুমারীদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণকন্যা কিন্তু শূদ্রা কুমারীও থাকে; ইহাদের বয়স ৬ বৎসর হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত। কুমারীরা আসিয়া আপনার নিকটে পয়সা ভিক্ষা করিবে। কামিখ্যা তীর্থে কুমারীকে গো, রজত, সুবর্ণ বস্ত্র প্রভৃতি দান করা মহাপুণ্যজনক কর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে। পয়সা না দিলে কুমারীরা আপনাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে, অগ্রসর হইতে দিবে না; ক্রমে আপনার জামা বা কোটের পকেটে পর্য্যন্ত হাত দিবে, তাহার পরে গলা ধরিয়া কোলে উঠিবে, তাহাতেও পয়সা না দিলে আপনাকে অভিশাপগ্রস্ত করিবে। তদনন্তর আপনাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া যাহা দেখাইবে বা যাহা বলিবে, তাহার এস্থলে উল্লেখ না করাই ভাল। অশ্লীলতায় বাঙ্গালী লেখকের লেখনী যত কম কলঙ্কিত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। কামিখ্যা তীর্থে কুমারীর সাত খুন মাপ! প্রকৃত পক্ষে কামিখ্যার অধিপত্নী, অধিনায়িকা ও সাক্ষাৎ দেবী—এই কুমারীগণ!! ইহারা এখানকার The observed of all observers, ইহারা এখানকার The most important factor—সংক্ষেপতঃ এই কুমারীগণই কামিখ্যা তীর্থ-সরোবরের শারদীয় কমল। ইহাদের অদ্ভুত ইতিবৃত্তে এক মহাভারত প্রস্তুত হইতে পারে; সে অপূর্ব্ব মহাভারত লিখিবার সময় বা প্রবৃত্তি নাই। পাঠক মহাশয় এখানে স্বয়ং আসিয়া এই অদ্ভুত তীর্থের অদ্ভুত লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া যাউন, ইহাই অনুরোধ। কুমারীরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কুমারীরা অত্যন্ত রূপবতী; পাহাড়ের এই কুমারীগণ অতি অল্পবয়সেই পূর্ণ যুবতীবৎ (Prematurely developed) হইয়া পড়ে। কামরূপ পাহাড়ের স্ত্রীলোক মাত্রেই অপূর্ব্ব রূপবতী এবং খুব বলবতী ও সুস্থা (Healthy), কিন্তু তেমনি কামাতুরা। স্ত্রীলোকমাত্রেই বিশেষতঃ কুমারীগণ এখানকার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। কুমারী বা স্ত্রীলোককে প্রহারিতা, অপমানিতা, লাঞ্ছিতা বা অসন্তুষ্টা করা এখানকার নিয়ম ও ধর্ম্মের বিরোধী। কুমারীদিগের অথবা এখানকার স্ত্রীলোকদিগের

মধ্যে বিবাহপ্রথা নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পাহাড়ের যাহারা অধিবাসী,তাহারা একটা স্ত্রীলোক রাখে, তাহাই তাহাদের পত্নী বা গৃহস্বামিনী; বিবাহটা নামমাত্র বা লোক দেখান মাত্র! এখানে ব্যবসায়িনী বেশ্যা নাই,কারণ বাজার-ওয়ালী বেশ্যার আর প্রয়োজন কি? কুমারীকে যিনি বিবাহ করেন, তাঁহাকে এই পাহাড়ে থাকিতে হইবে; থাকুক বা না থাকুক, পাহাড়ের স্ত্রীলোক পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া নিম্নে যাইবে না, ইহা নিশ্চয় এবং ইহাই নিয়ম। পাহাড়ের লোকেরা পাহাড়ের মধ্যে স্ত্রীলোক না পাইলে অন্যান্য স্থান হইতে স্ত্রীলোক আনিতে পারে, কিন্তু সে স্ত্রীলোক আর কখনও ঐ পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। পাহাড়বাসী বা অপর স্থানের কেহ পাহাড়ের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে তাহাকে পাহাড়েই থাকিতে হইবে। ব্রাহ্মণ হইলে পাণ্ডাগিরি করিতে পার, ব্রাহ্মণ না হইলে মনোমত জীবিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লইতে বাধ্য। পুরুষগণ পাহাড়ে থাকুক আর নাই থাকুক,স্ত্রীলোকগণ পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ের নীচে যাইবে না; স্ত্রীলোক তোপের মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না, ইহা নিশ্চিত সত্য। দেশীয়, বিদেশীয় যে কোনও (প্রকৃত) হিন্দু যে কোনও সময়ে, যে কোনও কুমারীকে ইচ্ছামত পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কুমারীর বিবাহ তাহার নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে, ইহাতে তাহার পিতা মাতার হস্তক্ষেপের অধিকার নাই; কিছু টাকা, কিছু অলঙ্কার, কিছু বস্ত্র এবং কিছু মিষ্ট দ্রব্য কুমারীর হাতে দিয়া তাহার গলায় মাল্য প্রদান করিলেই কুমারী আপনার পত্নী হইল!! কিন্তু আপনি প্রকৃত হিন্দু না হইলে এইরূপ সংঘটন হওয়া অসম্ভব। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আপনাকে যদি বিদ্বেষী দেখে এবং আপনার আচার ব্যবহার, ক্রিয়া কাণ্ড, বিশ্বাস ভক্তি প্রভৃতি যদি প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় না হয় এবং হিন্দুবংশে যদি আপনার জন্ম না হইয়া থাকে,অথবা আপনি যদি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী না হয়েন, তাহা হইলে এরূপ বিবাহের আশা করা অসম্ভব। কুমারীর অনিচ্ছায় বিবাহ হয় না, কুমারীর ইচ্ছা হইলে তাহার পিতামাতা নিষেধ করিতে পারে না। যদি আপনি ব্রাহ্মণ হয়েন, তাহা হইলে কুমারী যে কোনও জাতিই হউক না কেন, আপনার অপত্য ব্রাহ্মণ হইবে; আপনি অব্রাহ্মণ হইলে এবং কুমারী ব্রাহ্মণী হইলে অপত্যও ব্রাহ্মণ হইবে। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে অ-ব্রাহ্মণ হইলে অপত্যের ব্রাহ্মণ বর্ণ ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি আপনার টাকা বা অলঙ্কারাদি দিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে কুমারীর কেবল প্রণয় অনুসারেও বিবাহ হইতে পারে। কুমারীদিগকে একটু ইঙ্গিত করিয়া দিলে নানা প্রকার প্রলোভনে তাহারা আপনাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে। সে প্রলোভনের মায়া হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া মহা সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই সক্ষম হয় না। কুমারীরা বাল্যকাল হইতেই পুরুষের মন-ভোলান কৌশল শিক্ষা করিয়া থাকে। কামরূপের প্রত্যেক স্ত্রীলোকই স্বাধীনা, কে কাহার পতি তাহার ঠিক নাই; পিতা মাতা বা পতি ইহারা টাকা পাইলেই সকল কর্ম্ম করিতে পারে। ধর্ম্মের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই; অথবা স্ত্রীলোকের

বাসনা হইলে সেও যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, বাধা দিবার কেহই নাই। যাহারা বিবাহিতা বলিয়া পরিচিতা, তাহাদের নামে মাত্র একটা পতি থাকে, তাহাদের পুত্র কন্যা এবং গৃহস্থ থাকিলেও পতি তাহাদের নিকটে "গোলাম"(Slave) মাত্র। কুমারী প্রতিপালন করা এখানকার ধর্ম্ম। কুমারীর উত্তম বস্ত্র, উত্তম অলঙ্কার সর্ব্বাগ্রে হওয়া আবশ্যক। এই কুমারীদিগের অনুগ্রহেই পাণ্ডারা এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। সাহেবগণও বলিতেছেন—These virgins have a right to extort; you have no right to hide your money. তোমার ধন মান, চরিত্র লজ্জা এ সকল পতঙ্গবৎ; এই প্রদীপ্ত কুমারী-অগ্নির সম্মুখে পতঙ্গ কতক্ষণ স্থির থাকিবে? কামরূপের স্ত্রীলোক তোমাকে গ্রাস না করিয়া ছাড়িবে না। কামরূপের স্ত্রীলোক কামরূপিণী, তাহার যেমন চরিত্র, দেশের নামটীও ঠিক তাহাই।

কামরূপে মৎস্য যেমন খুব সস্তা, স্ত্রীলোকও তেমনি খুব সস্তা। কামরূপে কদলী কাঁদি কাঁদি ফলে, স্ত্রীলোকের সংখ্যাও তদ্রূপ? পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোক হইতে অনেক কম। কামরূপের কদলী গাছের "পেটো" হইতে মোটা মোটা রশি প্রস্তুত হয়, তাহাতে বড় বড় জাহাজ টানা যায়। কামরূপের স্ত্রীলোকের মনোরজ্জুতে বড় বড় জমিদার, রাজা ও মহারাজা টানা গিয়াছে ও যাইতেছে। কামরূপে রাত্রি বারটার সময় কোয়াসা আরম্ভ হয়, সেই কোয়াসা পরদিন প্রাতঃকালে বেলা নয়-ঘটিকা পর্য্যন্ত মেঘের ন্যায় ঘন হইয়া থাকে; কোয়াসায় আর কিছুই দেখা যায় না। কামরূপের কামিনী-কোয়াসায় এমন মায়া-মোহ জন্মে যে, হতভাগা বিদেশী যাত্রী সেই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিশাহারা হয়, সর্ব্বস্বান্ত হয় অথবা স্বদেশ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ভুলিয়া যায়, এবং শেষে জন্মভূমিতে আর পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করে না; কামরূপী স্ত্রীলোকের তাহারা গোলাম হইয়া থাকে। সারমেয়-তাড়িত মেষশাবকের ন্যায় অথবা রজকের লম্বকর্ণের ন্যায় আজীবন তথায় বাস করে। এখন পাঠক মহাশয় বুঝিলেন কি, কামরূপ কামিখ্যা পাহাড়ে পুরুষেরা কেমন করিয়া ভেড়া, ছাগল ও গাধা তৈয়ার হয়? হে বিদেশী পথিকগণ! এখন বুঝিলেন কি, কামরূপের যাদু ও ভোজবিদ্যায় পুরুষে কেমনে পাগল হয়? বাস্তবিক যাদুই বটে!

তাহার পরে আর এক কথা। "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া সেকালে যাত্রীদিগকে এই দুর্গম দেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় ও অরণ্যের মধ্য দিয়া কামিখ্যায় আসিতে হইত। তখন এদেশের ভাষাও কেহ বুঝিত না এবং প্রায়ই হিংস্রক, শ্বাপদ, দুর্দ্দান্ত তস্কর এবং অসভ্য গারো ও কুকিদিগের আক্রমণে নিহত হইত, সুতরাং কামিখ্যায় আসিলে ফিরিয়া যাওয়ার প্রায়ই সম্ভাবনা থাকিত না। তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের যাদুত আছেই! এই জন্য প্রবাদ ছিল, "কামরূপে গেলে মানুষ ফিরিয়া আসে না।" শুনা যায়, আসামে বৃটিশ শাসনারম্ভকালে যে সকল স্ত্রীলোকেরা ডাকিনী (ডাইন) বলিয়া লোককে ভয় দেখাইত বা বঞ্চনা করিত, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এক সময়ে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া গৌহাটীতে ফাঁসি দেন। গৌহাটী সহরের মধ্যে ফাঁসি বাজার এখনও বর্ত্তমান আছে।

করাচি বন্দর হইতে বহুকষ্টে, অনেক দিনের বহু পরিশ্রমসাধ্য-ভ্রমণে, হিঙ্গলাজ নামক সুদূর ও সুপ্রসিদ্ধ তীর্থে উপস্থিত হওয়া যায়। অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, হিঙ্গলাজে কেহ যাইতে পারে না, কেহ যাইয়া ফিরিয়া আসিলেও অনেকে তাহা বিশ্বাস করে না। পথকষ্টে অনেক লোক মরিয়া যায় এবং তথাকার স্ত্রীলোকেরাও কামরূপের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় রূপবতী এবং মায়ামোহিনী, সুতরাং অনেকে জীবিতাবস্থাতেও মৃতবৎ হইয়া থাকে এবং প্রায়ই তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষে অনেকের এখনও বিশ্বাস, লঙ্কায় কেহ যাইতে পারে না!! মুসলমানদিগের মধ্যে খুব বিশ্বাস এই যে, কাবায় (মক্কায়) কোনও হিন্দু বা খ্রীষ্টান যাইতে পারে না। বেদুই নামক ডাকাইতদিগের অত্যাচারে অনেক পথিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অনেক হিন্দু ও খ্রীষ্টান যাত্রী (নিজ দোষে) তথায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। স্বদেশে বা স্বসমাজে তাহাদের ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা থাকে না। আরব্যের স্ত্রীলোকেরাও কামরূপের স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা মোহিনী বিদ্যায় কম নহে, বিশেষতঃ পুরুষের সুন্দর বেশ দেখিলে অতি অল্প সময়েই ইহারা পুরুষকে হস্তগত করিয়া ফেলে, সুতরাং বিদেশী হিন্দু ইহাদের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অনেকের বোধ হয় একথা জানা নাই যে, কোরাণের ইংরাজি অনুবাদক সেল (Sale) সাহেব, কাবায় (মক্কায়) ত্রিংশ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। অনেকের বোধ হয় একথা জানা নাই যে, শিখধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত নানক মহাশয়ের অমূল্য জীবনের প্রায় সাত মাস কাল মক্কায় অতিবাহিত হইয়াছিল। পুরাণপুরী নামক এক প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী মক্কায় অনেক দিন বাস করিয়াও হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে" এই পুরাণপুরীর উল্লেখ করিয়াছেন; উইলসন সাহেবও তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থে ইঁহার ভূয়ো প্রশংসা করিয়াছিলেন। পুরাণপুরী স্বহস্তে পাক করিতেন এবং মুসলমানের হস্তের পাকদ্রব্য স্পর্শও করিতেন না। পুরাণপুরীকে মুসলমানেরা যথার্থ "স্বধর্ম্মানুরাক্ত পুরুষ" ও পবিত্র বলিয়া অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিত। কামরূপে সর্ব্বত্রই দেবী উপাসনা এবং সর্ব্বত্রই প্রায় তান্ত্রিকের ও মাংসাশী শৈবের বাস। ব্রাহ্মণ, হইতে নিম্ন শ্রেণীর জাতি পর্য্যন্ত সকলেই মৎস্য মাংস, পলাণ্ডু প্রভৃতি আহার করে এবং তান্ত্রিক ব্যবস্থানুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, কিন্তু এদেশে কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ কিম্বা গোস্বামী কিম্বা অপর জাতির হিন্দু আসিয়া স্বহস্তে পাক করতঃ আহার করিলে কিম্বা জাতিভেদ রক্ষা করিয়া শুদ্ধাচারে নিরামিষাশী ও জিতেন্দ্রিয় সাধুর ন্যায় অবস্থান করিলে, এদেশের লোকেরা তাহাকে প্রকৃত সাধু, এমন কি, অবতার বলিয়া সম্মান ও ভক্তি করে। এদেশে বৈষ্ণবের অথবা বৈষ্ণব মতানুসারী ব্রাহ্মণের খুব মান্য; বৈষ্ণব যদি ব্রাহ্মণ এবং নিরামিষাশী ও গৈরিক বসনধারী হয়েন, তাহা হইলে স্ত্রীলোক এবং পুরুষেরা তাহার অত্যন্ত ভক্ত ও অনুগত হয়। এমন সাধুর নিকটে ইহাদের অদেয় কিছুই থাকে না। কামরূপের লোকেরা ঘোরতর তান্ত্রিক,

ঘোরতর মাংসাশী, ঘোরতর মদ্যপায়ী এবং ঘোরতর ইন্দ্রিয়াসক্ত, তথাপি বৈষ্ণবের এবং নিরামিষাশীর ও জিতেন্দ্রিয়ের পূজা করে। প্রকৃত স্বধর্ম্মানুরাগীর সর্ব্বত্রই সম্মান; স্বধর্ম্মবিরোধী ভ্রষ্টাচারী কপটের সম্মান কোথায়? চোরের নিকট সাধুর, ইন্দ্রিয়াসক্তের নিকট জিতেন্দ্রিয়ের এবং ভ্রষ্টাচারীর নিকট স্বধর্ম্মবিবেকীর চিরকালই সম্মান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আসামের সর্ব্বত্রই পর্ব্বত ও অরণ্য; ধুবড়ী হইতে উপর-আসামের (Upper Assam) শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মণিপুরের প্রান্তঃ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন পাহাড় ও জঙ্গল। অনেক স্থানের নাম পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। শিলাহট্ট (Sylhet), শিলামার (Chilimar), শিলাহং (Shillong,) শিলাচর (Silchar) প্রভৃতি। ব্রহ্মপুত্রনদতীরবাসী আসামীদিগের হৃদয়ও ঠিক কঠিন পাষাণবৎ, দয়াধর্ম্ম, স্নেহ মমতা কিছুই নাই। উপর-আসামের স্ত্রীলোকেরা যেমন রূপবতী, তেমনি চতুরা, মোহিনী, ইন্দ্রিয়াসক্তা এবং কপটাচারিণী; আতিথেয়তা আদৌ নাই। পুরুষেরাও সর্ব্বাংশে স্ত্রীলোকদিগের সমতুল্য। কামরূপের পাণ্ডাদিগের দুই একটী গুণ থাকিলেও, দুই শত দোষ বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মপুত্র! ব্রহ্মপুত্র! তুমি জলাকারে ঈশ্বর না হইলেও, তোমার তটে ব্যভিচার, দুষ্ক্রিয়া, ভ্রষ্টাচার প্রভৃতি দর্শন করিয়া দুঃখিত ও লজ্জিত চিত্তে যখন স্মরণ করি যে, জীবন্মুক্ত যোগী ও ঋষিদিগের করস্পর্শে তোমার জল পবিত্র এবং ভক্ত তপস্বীদিগের আচমনে তোমার জল ও নিষ্কলঙ্ক, তখন তোমার অনন্ত তরঙ্গতন্ত্রা শ্বেত সলিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারি না। মনে করি, যে দুরাচার সে তাহার দুষ্ট আচরণের ফলভোগ করে; মহাপাপী জাহ্নবী জলে নিমজ্জিত হইলেও গঙ্গাজলের মহিমা যায় না; তোমার তীরে বাস করিয়া দুষ্ট ও দুষ্টারা যাহা করিতেছে, তাহার ফল তাহারা অবশ্যই ভোগ করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার পবিত্রতা নষ্ট হইতে পারে না।

আর একটা হাসির কথা বলি। এক দিন অপরাহ্নে কামিখ্যা পাহাড়ের একপার্শ্বে নির্জ্জনে একান্তমনে পদচারণ করিয়া বায়ু সেবন করিতেছি, এমন সময়ে পার্শ্ব দেশ হইতে এক ব্যক্তি "মহাশয়" বলিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। জানিলাম সে ব্যক্তি একজন পাণ্ডা, কয়েক দিবস হইতে তাহার গৃহে যাত্রী আইসে নাই এবং তাহার কিছু প্রাপ্তিও হয় নাই। পাণ্ডা বলিল "মহাশয়! আপনার বিমর্ষ বদন দেখিয়া আমার মনে দুঃখের উদয় হইতেছে; বলিতে পারেন এই বিমর্ষতার কারণ কি?" আমি বাস্তবিক তৎকালে বিমর্ষ বদন ছিলাম না, সুতরাং বলিলাম "বিমর্ষ হইবার কোনও কারণ নাই, আমি আনন্দান্তঃকরণে এখানে অবস্থান করিতেছি।" পাণ্ডা বলিল, "অনেকে মনের ভাব নানা কারণে গোপন করে; যাহা হউক, বুঝিয়াছি, আপনি চিন্তিত হইবেন না, দেবী কামিখ্যার কৃপায় সকল দুঃখেরই অবসান হয়। এখন বলুন দেখি, আপনার পুত্র কন্যার সংখ্যা কত?" আমি বলিলাম, পুত্র কন্যার সংখ্যা শূন্য অর্থাৎ কিছুই নাই। পাণ্ডা বলিল, "বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, ইহাই আপনার বিষাদের কারণ। এইরূপ বিষাদ অনেকেরই ছিল, কিন্তু যাহাদের ছিল, তাহা-

দের সকলেই এখন পুত্র কন্যার পিতা হইয়াছে। আপনি কি ঋতু বস্ত্রের কথা শুনিয়াছেন?" আমি বলিলাম, ঋতুবস্ত্রটা কি? পাণ্ডা বলিল, সাধারণ কথায় ইহাকে লালকাপড় বলে। আমি বলিলাম, এই কাপড়ের কিছু বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি; তখন পাণ্ডা আমাকে এক বৃহৎ প্রস্তর মণ্ডের উপরে বসিতে বলিয়া যে অপূর্ব্ব আষাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিল, তাহারই বিয়দংশ এস্থলে বর্ণনা করিতেছি। পাণ্ডা বলিল, "প্রতি বৎসর একদিন—কেবল একদিন—দেবী কামাখ্যা ঋতুমতী হয়েন, ঐ দিবসে তাঁহার গাত্রে একখানি বস্ত্র আবরণ স্বরূপে দেওয়া হয়, ঐ বস্ত্রকে পর দিন প্রভাতে রক্তাক্ত দেখা যায়। ঐ লোহিত বর্ণের বস্ত্র (ঋতুবস্ত্র বা লালকাপড়) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কর্ত্তিত হইয়া পাণ্ডাদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। বস্ত্রের অতি সামান্য অংশ মাত্র মাদুলী মধ্যে রাখিয়া গলায় ধারণ করিলে অপুত্রকের নিশ্চয় পুত্র হয়।" এই বলিয়া সাক্ষ্যরূপে, রামকান্ত, শ্যামাকান্ত, নিধিরাম, ফটিকচাঁদ, ভোলাদাস, ক্ষেতু ময়রা, হৃদয় কৈবর্ত্ত, পরেশ চাটুর্য্যে, সাথুকে তেলী, গদাধর তামুলী, ব্রজকিশোর ঘোষ, গগন হাজরা, ক্ষুদীরাম গুঁই এবং তাহার সঙ্গে দুই একজন অপুত্রক রাজা ও মহারাজার নামোল্লেখ করিল। পাণ্ডা আরও বলিল, "ঐ বস্ত্রের কিয়দংশ পাইবার জন্য অনেক মহারাজা পর্য্যন্ত পাণ্ডার খোসামোদ করে।" বস্তুতঃ খোসামোদ করার কথাটা অসত্য নহে, কারণ এই বিশ্বাস ও বহু দেশব্যাপী বটে। আমি যখন আসাম হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, তখন নানা স্থানের স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা আমার নিকটে ঐ বস্ত্র আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিল এবং কেহ কেহ বহুমূল্য দিয়া ঐ কাপড় খরিদ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। আমাদের একজন সুরসিক বন্ধুকে একদা একথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "অপুত্রক পুরুষেরা স্বয়ং কামরূপে আসিলে, এইরূপ বস্ত্রের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থাকে না; পাহাড়ে আসিলেই পুত্র হয়!!"

মা কামিখ্যা! মা কামিখ্যা! আমি যখন তোমার পবিত্র মন্দিরের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই মহাঘন অন্ধকার পূর্ণ গহ্বরাভ্যান্তরে তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" রূপ—সেই আদ্যাশক্তি, জীবনীশক্তি, মহাশক্তির বিশ্বজনীন মহাসাত্বিক সত্বা—তোমার প্রতিভাষিত দেখিতে পাই, কিন্তু মা! তোমার ঐ মহাপবিত্র তীর্থক্ষেত্রে এই দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা কেন? বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, কবি বলিয়াছেন "কুপুত্র হলেও, কুমাতা কভু নয়"; তাই বুঝি এই কুপুত্রগুলিকে পোষণ না করিয়া পোষণ করিতেছ!! মা! আমি তোমার মন্দিরের নিকটে এবং এই (কামরূপ) পর্ব্বতের শিখরে বসিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি; যাহা কিছু লিখিয়াছি, তুমি তাহার "অমর সাক্ষী"! আমি হিন্দু; "সদা সত্যং ব্রুয়াৎ" হিন্দুর ইহাই ধর্ম্মনীতি। বিদেশী শাস্ত্রকারেরাও বলেন, Fiat Justitia ruet caelum (Let Justice reign though heaven should fall) অর্থাৎ "স্বর্গের রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু ন্যায়ের রাজ্য (সত্যের রাজ্য) যেন চূর্ণ না হয়।"

শাস্ত্রকারদিগের এই আজ্ঞা, এই প্রবন্ধের আদ্যন্ত বিবেকের (conscience) সহিত পালন করিয়া আসিয়াছি।

পাঠক মহাশয়! প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। পরিশেষে একটী দুঃখের কথা বলিয়া ইহার পরিসমাপ্তি করিব। যে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতির সতীত্ব, মর্য্যাদা ও স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতা রক্ষণ জন্য পৃথিবীতে একসময়ে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও শিক্ষক স্বরূপ পরিগণিত ছিল, যে হিন্দুজাতি স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষা জন্য সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, যে হিন্দুজাতি ভগবানকে মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণ শীতল করে, যে হিন্দুজাতি ভগবানকে দুর্গা কালী ভগবতী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি নারী মূর্ত্তিতে উপাসনা করেন, হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে সেই হিন্দুজাতির স্ত্রীলোকের চরিত্রের আজি কি অসহনীয় অবনতি !! কেবল কামিখ্যায় নহে; প্রায় সকল হিন্দুতীর্থেই এইরূপ। ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, হিন্দুশাস্ত্রের নামে, যে জাতি এরূপ মহাপাপের প্রশ্রয় দিতে পারে, সে দেশের জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনের আর কিছু বাকী আছে কি ?

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বল্লালের কৌলীন্য-প্রথার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কেন ?

বুঝি বা কৌলীন্য-প্রথার ন্যায় অনিষ্টকারী প্রথা জগতে আর কুত্রাপি নাই। এই বিষ-জননী হইতে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, এবং বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কত অনিষ্টজনক ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক সময়ে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যায় এদেশের উচ্চতম শ্রেণীর লোকের মুখমণ্ডল প্রায় অহরহ কালিমায় অবনত থাকিত; হিন্দুর পবিত্র শাস্ত্র পদদলিত হইত। এই প্রথার প্রভাবে এক ব্যক্তি শত শত নারীর পাণিপীড়ন করিয়া বঙ্গভূমিকে যে পিশাচ-ভূমিতে পরিণত করিয়াছিল, সে কথা কি বঙ্গের লোকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে? ইহার গৌণ প্রভাবে অন্য এক শ্রেণীর লোক বিবাহ করিতে না পারিয়া অথবা অসময়ে বিবাহ করিয়া ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, এ কথা কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবিদিত ? শতবর্ষ পূর্ব্বে যে গ্রামে যত ব্রাহ্মণ বাস করিত, এক্ষণে সে গ্রামে তাহার সিকি সংখ্যাও নাই। আমাদের নিকটবর্ত্তী বারালা নামক এক খানি গ্রামে ১০০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিল, এক্ষণ সেখানে ৪৪ ঘরের অধিক নাই—তন্মধ্যেও ১৬ ঘরের বংশ থাকিবে না। কায়স্থ গ্রাম গুলির অবস্থাও বড় ভিন্ন রূপ নহে। এইরূপ ব্রাহ্মণ কায়স্থের কত শ্মশানভূমে আমি বিচরণ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই জন্য এক সময়ে বলিয়াছিলাম ;—

গত শত বর্ষ সমাজ কলঙ্ক
কি কালি মেখেছে হিন্দুর মুখে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বসতি ভিটায়
বাস করে চাঁই চামার সুখে।

যেখানে ত্রিতলে বসিয়া দাম্ভিক
নিরন্ত হানিত ঘৃণার বাণ।
সেখানে এখন নগের ধানুক
পত্নী পুত্রী সহ গাইছে গান॥
কুলীন সধবে বালিকা বিধবে
ফলেছে তোদের অভিসম্পাত।
জন গণনায় স্পষ্ট দেখা যায়,
উচ্চ হিন্দুবংশ হতেছে পাত॥

নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

যে বিষ-জননী কৌলীন্য প্রথা হইতে বঙ্গের উচ্চ শ্রেণী হিন্দুর ধ্বংসের পথ এইরূপ প্রশস্ত হইয়াছে, তাহারই পুনরুদ্ধার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সংস্কারব্রত! এই ব্রতে হাইকোর্টের বিচারপতি, ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন-জজ, মাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, কত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ও মুন্‌সেফ ব্রতী হইয়াছেন। প্রভাত-চিন্তা ও বিবিধ গভীর চিন্তার গ্রন্থকার, কত কবি, উকীল, ভাবুক ও বৈজ্ঞানিক অঞ্জলি হস্তে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান। তাহার বর্ণনা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

কেহ হয়ত বলিবেন, কায়স্থগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা তত ভয়াবহ ফল উৎপন্ন করে নাই। একথা সত্য। ব্রাহ্মণগণের গৃহে গৃহে যেরূপ অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, কায়স্থের গৃহে তদ্রূপ হয় নাই বটে, কিন্তু কায়স্থের গৃহে যাহা হইয়াছে, তাহাও মঙ্গলজনক নহে। অনেক মৌলিক কায়স্থ আজীবন বিবাহ করিতে না পারিয়া ভ্রষ্টাচারে জীবনপাত করিয়া নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছেন, তথাচ কুলীন সংশ্রবের অভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অনেকে দশম বর্ষীয়া: কন্যাকে অশীতিবর্ষীয় কুলীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রেতের ন্যায় উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছেন—এ দৃশ্য কি বঙ্গ হইতে একেবারে বিদূরিত হইয়াছে? এই যে কন্যাদায় উচ্চ হিন্দু সমাজের একটী বিশেষ বিপদকর হইয়া উঠিয়াছে, ইহা কি এই বিষ-জননী কৌলীন্য-প্রথার ফল নহে? তোমার কুলের মূল্য হইবে, বিদ্যার মূল্য হইবে না কেন? এইত ইহার মূল-তত্ত্ব। যে স্থলে কৌলীন্য ও বিদ্যা একত্রিত হইয়াছে, মৌলিক গৃহে তাহার অত্যাচার কত, ইহা কি কায়স্থগণ অবগত নহেন? হয়ত একজন কুলীন সন্তান মৌলিক মাতুলের অর্থে এম্ এ পাস করিলেন,—মৌলিকের অর্থ ও তাঁহার নিজের বংশ এক যোগে অন্য কোন কুলীন সংশ্রব প্রিয় মৌলিককে সবংশে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তাঁহার বিত্ত সম্পত্তি নীলাম হইল, স্ত্রীর গায়ের গহনা বিক্রয় করিতে হইল এবং নিজের পুত্রগণ শিক্ষাভাবে চিরকাল মূর্খ থাকিল কিম্বা অনাহারে বা অল্পাহারে প্রাণত্যাগ করিল। অথচ তাঁহার কৌলীন্য ক্রয়ের মূল্যে তাঁহার পরপুরুষ বিশেষ কোন ফললাভ করিতে পারিল না। মৌলিকের অর্থ মৌলিকের গ্রীবাই ছেদন করিল। এক সময়ে এই বঙ্গদেশে মৌলিক কায়স্থগণ জেতা ও রাজা স্বরূপে রাজত্ব করিতেন, এবং ব্যাস সিংহ, ভৃগুনন্দী এবং নারায়ণ দত্ত প্রভৃতি মৌলিকেরা অতি উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কি মৌলিক কায়স্থগণের অবস্থা তদ্বিপরীত নহে? কৌলীন্য-প্রথা যে ইহার এক প্রধান কারণ, কায়স্থগণ কি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না? তবে এই কৌলীন্য সংরক্ষণ জন্য এত চেষ্টা কেন? মৌলিকগণ ইহা সমর্থন করিবে কেন?

তাহার পর এই প্রথার প্রবর্ত্তক এক

জন নর-পিশাচ। তাঁহার অতি কদর্য্য বুদ্ধি ইহার মাতৃস্থানীয়া।

"এক দিন মনে কৈলা বসি সিংহাসনে।
অনাচার আচরিব ভাবে মনে মনে॥
নীচ অন্ত্যজ জাতির জল নাহি খায়।
তাহাকে আচারে রাজা হইয়া নির্ভয়॥
কুক্রিয়া করিতে রাজার নাহি ধর্ম্ম ভয়।
যে কেহ নিন্দয়ে তারে দূর করি দেয়॥
আপনি যে মতে কন্যা আনিল হরিয়া।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন মন দিয়া॥
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেল লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি॥
অতি শুভ্র দধি বাঁশের বেতিতে লৈলা।
পরম যতন করি রাজভোগ দিলা॥
তাহাতে সন্তুষ্ট রাজা হইলা বহুতর।
দিলা রাজা ধন রত্ন, বস্ত্র অলঙ্কার॥
বিবাহ করিব বলি লইয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী।
সর্ব্বস্ব হারিয়া তারে তাড়ায় তখনি॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করয়ে বিচার।
শাস্ত্রমতে কার্য্য করি কি দোষ আমার॥"

যদুনন্দনের মূল ঢাকুর* ২০।২১ পৃষ্ঠা।

রাজা বল্লাল সেনের ডোমকন্যার এই বিবাহ বা উপবিবাহ কেবল বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থ উক্ত ঢাকুরে আছে এমত নহে। উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও ইহা স্বীকার করেন।

"উত্তর বারেন্দ্রগণ কহেন, বল্লাল সেন এক অজ্ঞাত কুলশীলা সুন্দরী কন্যাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন, তন্নিবন্ধন লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। সেই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিকাংশ বল্লাল সেনের পক্ষাবলম্বন করেন, কিয়ৎ সংখ্যক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ সেনের মতাবলম্বন করিয়া, তাঁহার নিবাসভূমি গৌড়ের নিকট বাস করেন।"

মহিমাচন্দ্র মজুমদারের গৌড়ে ব্রাহ্মণ ১৫৯ পৃষ্ঠা।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণও বলেন ;—

"ব্রাহ্মণ সহ ব্যাস সিংহ'ও নীচকুলোদ্ভবা স্ত্রীগ্রহণ অপবাদে বল্লালের বাটিতে জলপান করিতে পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। স্বীয় মন্ত্রী ব্যাস সিংহের এবম্বিধ আচরণে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে করাত দ্বারা শিরচ্ছেদনের ভয় দেখান। কিন্তু ব্যাস সিংহ ক্ষত্রোচিত তেজস্বিতায় রাজাজ্ঞা অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করাতে করাত দ্বারা তাঁহার শিরচ্ছেদন করা হয়। তদবধি তিনি "করাতিয়া ব্যাস সিংহ" নামে স্বীয় সমাজে পূজিত হন। জানি না, বঙ্গদেশের কোন সমাজ এতাদৃশ অলৌকিক তেজস্বিতার পরিচয় দেখাইতে পারিয়াছেন কি না।"

কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, কায়স্থ-পত্রিকা, ভাদ্র সংখ্যা।

বৈদ্য কুলজী গ্রন্থে বল্লালের এই ডোমকন্যা গ্রহণের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। রীজলী সাহেবও তাঁহার বিখ্যাত Bengal Castes and Tribes গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বল্লাল-চরিত্রে এই ডোমকন্যার সংশ্রব একটী অতি প্রধান ঘটনা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই ডোমকন্যার সহিত সংশ্রব কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তক কারণ। রাজা এই ডোমকন্যা গ্রহণ করিয়া এক শ্রেণী ব্রাহ্মণ কায়স্থের নিকট ঘৃণিত হইয়াছিলেন এবং এই ঘৃণাকারী শ্রেণী যে অতি তেজস্বী স্বভাবের লোক ছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ব্যাস সিংহ শিরচ্ছেদ স্বীকার করিলেন, তথাচ তাঁহার বাটীতে জলগ্রহণ করিলেন না। কতকগুলি ব্রাহ্মণও তাঁহার ইঙ্গিতে রাজবাটী হইতে উঠিয়া আসিল। অন্যতম প্রধান

* এই পুস্তক ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

মন্ত্রী (দেওয়ান) ভৃগুনন্দী এবং মহাসন্ধি-বিগ্রহিক (war-minister) নারায়ণ দত্ত ও মুরহর দেব প্রভৃতি অনেকে দেশান্তর গমন স্বীকার করিলেন, তথাচ রাজার সংশ্রবে যাইতে চাহিলেন না। অত্যাচার ও অবিচারেও যখন কোন বিশেষ ফল ফলিল না, তখন রাজা সহায়তাকারী-গণকে বংশানুক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের চেষ্টা করিলেন। এই প্রকারে কৌলীন্যের সৃষ্টি হইল।

তবে আর এক কথা আছে। ডোম-সংশ্রব তদানীন্তন জনসমাজে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এত নিন্দনীয় না হইতে পারে। কারণ আমরা দেখিতেছি, বল্লা-লের সময়েও বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে তিরোহিত হয় নাই। বল্লাল ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এদেশের বৌদ্ধ মঠগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও উত্তর-ত্রিপুরায় কোন না কোন প্রকারে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চলিতেছিল, তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ সংন্যাসী বুদ্ধগুপ্ত নাথ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন।

"When Hiuen Tsiang travelled in India about the middle of the seventh century there were 97 Buddhist monasteries with 115000 monks in the cities visited by him between Monghyr and the Sea. The Pala Kings favoured Buddhism and although much discouraged it was not actively persecuted by the Sen dynasty. If was only when the Muhammadan invasion took place in 1199 that its monasteries were ovrthrown and its monks scattered or slain. Even then it was not utterly destroyed and as recently as the beginning of the seventeenth century a Tibetan monk Buddha Gupta Nath found Buddhism of some sort flourishing in some remote part of Bengal and stayed in a Buddhist monastery in the upper part of Tippera.

In Lama Tara nath's history of Buddhism, it is stated that a certain Domacharya preached the Tantrik doctrine of Buddhism called Dharma to the people of Tippera and obtained numerous followers. The Dharma Buddhism, in its Tantrik phase, became greatly honoured and followed by the people of Bengal, Rarh and Tippera.

Traces of Buddhism in Bengal—a paper published by Govt. 9. 9-1901.

যখন একজন ডোমাচার্য্য ত্রিপুরা জেলায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বহু শিষ্য সেবক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যখন বঙ্গ, রাঢ় ও ত্রিপুরা প্রদেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রভাবই দৃষ্ট হইতেছে, তখন শূরবংশীয় একজন ক্ষমতাশালী রাজা সাহস পূর্ব্বক ডোমকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন বা তাহাকে অন্যতমা পত্নীরূপে ব্যবহার করিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি ? যদি সেন বংশের সহিত বৈদ্যোৎপত্তির কোন সংশ্রব থাকে, যদি বৈদ্য বসতিগুলি ক্রমশঃ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া থাকে, যদি কোন কোন নিকৃষ্ট কায়স্থ সম্প্রদায়ের সহিত বৈদ্যের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত থাকে, তবে এই সেন বংশের আদি পুরুষ আদিশূরের উৎপত্তিস্থান দরদের পর্ব্বতমালার মধ্যে অন্বেষণ না করিয়া, ত্রিপুরার পাহাড়ের মধ্যে অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য ; কেন না, ত্রিপুরাদি দেশে অদ্যাপি সুর উপাধিধারী কায়স্থ সম্প্রদায় উচ্চ স্থানীয়। শূর বংশ হইতে আদিশূরাদির উদ্ভব, ইহাই এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে কি? বিশেষতঃ ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যেমন শূর বংশের তেমন বৈদ্য সম্প্রদায়ের স্থানীয় ভাব (indegenous) অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তথায় বৈদ্যগণের মধ্যে কৃষকের কাজ ও অন্যান্য হীন কাজ

দৃষ্ট হয়। বৈদ্য-কায়স্থে বিবাহ হয়, উভয়েই সেন বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া দাবি করে। সুতরাং আদিসুরের উৎপত্তি স্থানীয়, বিদেশীয় নহে। বিদেশীয় হইলে তদ্বংশ হইতে যখন কৌলীন্য স্থাপিত হয়, তখন বল্লাল সেনের ন্যায় দাম্ভিক নরপতি নিজ বংশকে অকুলীন করিতেন না।

সে যাহা হউক, ডোমকন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজা খেদ করিতেছেন ;—

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি কররে বিচার।
শাস্ত্রমত কার্য্য করি কি দোষ আমার॥

অনেকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সভাসদ ও স্বজাতীয় লোকে তাঁহার ডোমকন্যা গ্রহণ-শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমর্থন বৌদ্ধ ধর্ম্মানুগত হইয়াছিল, ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং বল্লাল সেনের সভাসদ মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায় দুটী দল ছিল—হিন্দু ও বৌদ্ধ। রাজার মত দ্বিভাবাশ্রিত ছিল বলিয়া বোধ হয়, নচেৎ তিনি ডোম কন্যার গ্রহণ বিচারার্থ উপস্থিত করিতেন না।

এই রাজা কৌলীন্য স্থাপন করিতে গিয়া কোন পক্ষকে সমাদৃত করিয়াছিলেন, তাহা আর বলিতে হইবে কেন ?

পূর্ব্বেতে আছিল এক মিছিলে করণ।
উত্তম অধমে হইল কার্য্য প্রয়োজন॥
তদন্তরে বল্লাল মর্য্যাদা যার হইল।
ছোট বড় ভেদাভেদ কিছু না রহিল॥
কলিতে বল্লাল সেন রাজা মহাশয়।
পরাক্রমে মহাজন গৌড় ভূমে হয়॥
* * *
কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীনপদ কাড়িয়া লইল॥
পুত্রান্তে কন্যাতে কুল বাঁধিতে লাগিল।
এইত অধর্ম্ম বীজ সঞ্চর হইল।
কেহ কেহ রাজ আজ্ঞা করিল গ্রহণ॥
কেহ নবকৃত পদ করিলা নিন্দন॥
বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লইলা তিন জন।
উৎপাৎ করিয়া রাজা না থুইল দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ॥
বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত॥
মূল ঢাকুর, ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠা।

এই প্রথানুসারে যাহারা শূদ্র ছিল, তাহারাই কুলীন হইল এবং যাঁহারা কায়স্থ ছিলেন, তাঁহারা নিন্দাভাজন হইলেন। যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, বল্লাল চরিত্রের সঙ্গে এই কথার বেশ সামঞ্জস্য আছে। তিনি হিন্দুই হউন কিম্বা বৌদ্ধমত-সমর্থকই হউন, ডোমকন্যা গ্রহণকালে যাহারা তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিল, (রাজস্তাবক ও নগণ্য লোকেই প্রায় এইরূপ করিয়া থাকে) তাহাদিগকে তিনি পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে কৌলীন্য প্রদান করিয়াছিলেন। আর তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলে শূদ্রগণকে সম্মানিত করা তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মানুগত এবং উপস্থিত স্বার্থানুমোদিত। ফলে বল্লাল কর্ত্তৃক যদি কায়স্থের কৌলীন্য স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে শূদ্রেরাই কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঢাকুরে অন্য এক স্থানে আছে ;—

যাহার বিংশতি লোকে বল্লালমর্য্যাদা।
নয়শ চৌরানব্বুই শকে না ছিল একদা॥
ঢাকুর, ৬১ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ যে বিংশতি জন লোকের ৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে, মর্য্যাদা ছিল না, বল্লালের অনুগ্রহে তাহারই মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইল। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ১০৭৮

খ্রীষ্টাব্দে এই মর্য্যাদা প্রথম প্রদত্ত হইয়াছিল।

ইহার দ্বারা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলীন্য প্রথাস্থাপনে কতকগুলি অপ্রধান লোক প্রধান স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। হইতে পারে তাহারা রাজার চাটুকার, হইতে পারে তাহারা বৌদ্ধভাবাশ্রিত, কিন্তু ইহা হইতে যে বিষোৎপত্তি সংঘটিত হয়, তাহাতে যে সমস্ত কায়স্থগণকে ক্রমশঃ শূদ্রত্বে অপগত করিয়াছিল,এমত নহে। ইহার সদ্যফল হইয়াছিল বঙ্গের রাজনৈতিক অধঃপতন। যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা বল্লাল কর্ত্তৃক অপমানি বোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তানগণ কৌলীন্যের নব প্রভাব বশতঃ ক্রমশঃ রাজপরিবারের উপর বীতরাগ হইতে বাধ্য হইয়া উহার ধ্বংস সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহাদের এ বিশ্বাস অসঙ্গত নাহ যে, সেনরাজত্বের বিলোপ সাধন ভিন্ন বৌদ্ধ প্রভাব দূরীভূত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অগ্রসর হইবে না। এজন্য তাঁহারা তাঁহার পুত্রের সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মুসলমান-বিজেতা বক্তিয়ার খিলিজীকে আনয়ন করেন এবং সেই সময়েই বৌদ্ধমঠ গুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মৃত্যুঘণ্টা গভীরতর ভাবে নিনাদিত হইতে থাকে।

এই বিষ-জননী কৌলীন্য প্রথার পুনরুদ্ধার ভিন্ন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সমাজসংস্কার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, ৪ শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে ১১ ঘর কুলীন থাকিবেক।

দক্ষিণ-রাঢ়ীয়	ঘোষ, বসু, মিত্র।
বঙ্গজ	ঘোষ, বসু, গুহ।
উত্তর-রাঢ়ীয়	সিংহ, ঘোষ।
বারেন্দ্র	দাস, নন্দী, চাকি।

এতদ্ভিন্ন প্রায় ২৫৭২ ঘর কায়স্থ তাঁহাদের কুলের তোয়াজ করিবার জন্য নিম্নস্তরে থাকিল। ১১ ঘরের স্বার্থের জন্য ২৫৭২ ঘরের স্বার্থ বলিদানের ব্যবস্থা হইল।

কি প্রকারে বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা ৪ শ্রেণীর সম্মিলন ঘটিবেক, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১। বারেন্দ্র, দক্ষিণ-রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও উত্তর-রাঢ়ীয় এই শ্রেণী চতুষ্টয়ের কায়স্থগণ তুল্য মর্য্যাদাবিশিষ্ট,—সুতরাং শ্রেণী চতুষ্টয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। পূর্ব্ব হইতে শ্রেণী পরস্পরের মধ্যে ন্যূনাধিকরূপে বিবাহাদি হইয়াছে, অতএব ভবিষ্যতে হওয়া উচিত।

২। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ বল্লালী কুল-নিয়মের অধীন ও পরস্পরের কুল-প্রথার অধিক প্রভেদ না থাকায় ও কেবল বাসস্থান ভেদ ও তন্নিবন্ধন পরস্পরের বিবাহাদি কঠিন হওয়ায় শ্রেণিবিভাগের কারণ। সেই জন্য উক্ত দুই শ্রেণী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করা হইল।

(ক) দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যে যে ঘোষ, বসু ও মিত্র-বংশ কুলীন বলিয়া পরিগণিত আছেন, তাঁহারা বঙ্গজ সমাজে কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং সেই মত বঙ্গজ সমাজে যে যে ঘোষ, বসু ও গুহ বংশ কুলীন বলিয়া পরিগণিত আছেন, তাঁহারও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

(খ) উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত পর্য্যায় ও ভাব প্রভৃতি ঘটিত কৌলীন্যনিয়ম রক্ষা করিয়া বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীনগণের পরস্পরের কুল কর্য্য হইতে পারিবেক।

(গ) উভয় সমাজে কুলজ বা বংশজ ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ এবং মধ্যল্য মহাপাত্র, মৌলিক ও নিম্ন মহাপাত্র সংজ্ঞক যে যে বংশ আছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সামাজিক মর্য্যাদা উভয় সমাজে পরস্পরের মধ্যে স্বীকৃত হইয়া আদান-প্রদান হইবেক।

আমরা পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিলাম,

যে প্রকারে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে, উহাতে যখন মৌলিকের সংখ্যা কম, তখন এই সম্মিলন কার্য্যে মৌলিক কায়স্থগণের উপকার হইবে না। এক্ষণ কার্য্যেও তাহাই দেখিতেছি। সেই বিষ-জননী কৌলীন্য প্রথার সেবার জন্য মৌলিকগণকে আহ্বান করা হইতেছে। তবে এজন্য মৌলিকেরাই প্রধানতঃ দোষী। গত সাধারণ অধিবেশনে যখন রায় যতীনাথ মুনসী পূর্ব্ব স্থিরীকৃত সম্মিলন প্রস্তাব মধ্যে কৌলীন্য রক্ষা করিয়া সম্মিলন করিতে হইবে, ইত্যাকার বিশেষণ শব্দ সংযোজনের অনুরোধ করেন, তখন কোন মৌলিক কায়স্থ ইহার প্রতিবাদ করিলেন না। রায় যতীন্দ্রনাথেরই বা ইহাতে কি ইষ্টলাভ হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই; অথচ মৌলিক কায়স্থগণের তিনি যে ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা তাহারা চিরকাল স্মরণ রাখিবে। দুঃখের বিষয়, মৌলিকেরা কেহ তখন আপত্তি করেন নাই, এখনও করিবেন কিনা বলিতে পারি না।

রাজা বল্লাল সেনের কুপ্রবৃত্তি ও স্বার্থ সিদ্ধির দোষে মৌলিক বা গৌড়ীয় কায়স্থদিগকে প্রায় ১০০০ বৎসর ধনে বংশে ও সর্ব্বপ্রকারে, কৌলীন্য প্রথা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে হইয়াছে। নিকৃষ্টতার পাট্টা পুনর্গ্রহণের পূর্ব্বে ইহা কি ভাবিতে হয় না? বিশেষতঃ বঙ্গজ মৌলিক কায়স্থগণের নিকট আমার এই নিবেদন যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় অনেকগুলি মৌলিক বংশ কৌলীন্যের উৎপীড়নে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে*, অপর কতকগুলির সহিত কুলীনের আদান প্রদান নাই। এই শ্রেণীর মৌলিকের সহিত সমধর্ম্মে স্থাপিত হইয়া বঙ্গজ মৌলিকগণের যে কি পরিণাম হইবে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে? বঙ্গজ মৌলিক কায়স্থ মধ্যে পাঁচজন স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের অন্ততঃ ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

বারেন্দ্র কায়স্থের মধ্যে কর্কট নাগ অতি বিখ্যাত স্বাধীন রাজা। উত্তর-রাঢ়ায় "বিশ্বাস খান" বংশীয় স্বাধীন রাজা সীতারামের জীবনচরিত এই নব্যভারতে আমিই এক সময় প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ দক্ষিণ রাঢ়ায় পাতালভেদী নামক রাজা সিংহ গ্রামে † বাস করিতেন। বোধ হয়, তিনি সিংহবংশীয় রাজা ছিলেন। ইঁহাদের কোন বংশই মর্য্যাদাসম্পন্ন হইলেন না এবং হইবেন না। হইলেন এবং চিরকাল থাকিবেন, বল্লালের দুষ্প্রবৃত্তির সহায়কারী কুলপুত্রগণ। এ সকল কথা সুধীর চিত্তে ভাবিতে হয়।

এ জন্য আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে, সর্ব্বশ্রেণীর মৌলিক কায়স্থগণ এ বিষয়ে মত দেওয়ার পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় গ্রামে অথবা ১০।১২ গ্রাম একত্রে কোন স্থানে সভা করিয়া কিংকর্ত্তব্য আলোচনা করুন। সর্ব্বশেষে অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় আসিয়া পূর্ব্বে একটী বৈঠক দিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই বঙ্গদেশীয় বিরাট সভায় ব্যক্ত করিবেন। বিষয়টী খেলার বিষয় নহে। পূর্ব্বে রাজ-অত্যাচারে কৌলীন্য-স্বীকার করিয়া মৌলিক বা গৌড়ীয় কায়স্থগণের যে অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছিল, তাহা স্বেচ্ছাধীন হয় নাই। এক্ষণে নিকৃষ্টতর কবুলিয়ত যদি স্বেচ্ছাক্রমে দেওয়া হয়,

* সংস্কার সম্বন্ধীয় শাখা সমিতির মন্তব্য ১২ দেখ।

† যশোহরে নড়াইল উপবিভাগে।

তাহা হইলে আমরা ঈশ্বর সমক্ষে পরবর্ত্তী পুরুষগণের নিকট দায়ী থাকিব। বিশেষতঃ কায়স্থগণের এই কৌলীন্য রক্ষার সহায়তা করিয়া আমরা ব্রাহ্মণ, নবশাক প্রভৃতিরও কৌলীন্য রক্ষা বা প্রচলনের সহায়তা করিতেছি। ইহাতে যে কি সর্ব্বনাশের অঙ্কুরোদ্গম করিয়া দেওয়া হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া একতারনামে যে অনৈক্যতার বীজ বপন করিলেন, ইহাতে আবার এ দেশে ঘরে ঘরে অনল প্রজ্জলিত হইবে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন—দাও, কৌলীন্য রক্ষার কথা থাকিতে দাও। কৌলীন্য ত গিয়াছে, প্রস্তাবের অঙ্গে রক্ষার কথা থাকিলেও উহার রক্ষা হইবে না। তবে যদি একটা স্তোভ বাক্যে সব মিটিয়া যায়, আপত্তি কর কেন ? এই কথার মধ্যে যে অসারল্য বা ঔদাসীন্য আছে, আমি তাহার কিছুরই সমর্থন করি না। অসারল্য বা অধর্ম্মের যোগে কোন সংস্কার চলিতে পারে, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ এই রূপ অসরল ও উদাসীন ভাবে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি জাতি পরস্পর আদান প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইয়াছে কি ? যদি সরল ভাবেই এই প্রস্তাব গৃহীত হইত, তবে ১৫ বৎসর মধ্যে অবশ্যই দুটী একটী করণ কারণ দেখিতাম। কায়স্থ-সভায়ও কি এই নির্লজ্জতার অভিনয় দেখিতে চাও ? যদি তাহা না চাও, তবে অসরল বা উদাসীন ভাবে কোন কার্য্য করিও না।

[illegible] আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, কায়স্থগণের-সম্মিলন সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত জেদ অন্য কাহার অপেক্ষা কম নহে। অনৈক্যের আমি বিষম শত্রু। তবে এই মিলন যে কৌলীন্য রক্ষার কথা না তুলিয়া হইতে পারে না, তা নয়। তবে এই অনিষ্টজনক ও নিন্দনীয় প্রথার পুনঃসংস্থাপনের কি প্রয়োজন ? গড়াই ও মধুমতী তীরে বারেন্দ্র ও বঙ্গজ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীতে আদান প্রদান চলিতেছে। এই স্বাভাবিক গতিকে অবলম্বন করিয়া, কুলপ্রথার বিচার স্থানীয় ভাবে নিষ্পত্তি করিয়া, কার্য্যের ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত। যাহা করার চেষ্টা হইতেছে, হয় ইহাতে কোন কার্য্য হইবে না, নয় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণেরও প্রতিবন্ধকতা হইবে। শত্রুর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আমরা ইহা না বুঝি, এমন নহে যে, কুলীনগণকে তাঁহাদের অর্জ্জিত সত্ত্ব গুলি হইতে বঞ্চিত হইতে বলা যায় না ; যদি তাহা না বলা যায়, তবে মৌলিকগণের কালক্রমে যে সামাজিক উন্নতি হইয়া আসিতেছে, ইংরেজী শিক্ষা ও শাসনগুণে তাঁহাদের পুত্রগণের মূল্য যে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার প্রস্তাব কেন করা হইল ? কুলীনের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, মৌলিকের স্বার্থ বিনষ্ট হইবে, এই নীতিইত অবলম্বিত হইল। আমি আশা করি, আগামী সাধারণ অধিবেশনে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা না হইয়া ৪ শ্রেণীর সম্মিলন প্রস্তাব গৃহীত না হয়। সম্মিলন প্রস্তাবটী এই ভাবে গৃহীত হইলে ভাল হয়। অন্ততঃ ২৬৮২ কায়স্থের মধ্যে

২৫৭১ কায়স্থের উহাতে বিশেষ স্বার্থ আছে।

"৪ শ্রেণীর আহার ব্যবহারে ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা থাকিল না। বরং সমাজের হিতকল্পে যাঁহারা এরূপে সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, তাঁহারা প্রশংসার্হ হইবেন। কুলপ্রথার বিচার-সম্বন্ধ-স্থাপযিতৃগণ স্থানীয় করিয়া লইবেন। কুল-মর্য্যাদার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে, বিদ্যা ও সম্পত্তিশালীত্বের মূল্যও নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা অসম্ভব। এজন্য বিবাহ ব্যয় লাঘবের প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত থাকা ভাল। তবে এই ব্যয় কমাইয়া যাঁহারা সদৃদাহরণ প্রদর্শন করিবেন, তাঁহারা প্রশংসার্হ হইবেন।"

এতদধিক বোধ হয়, ২৫৭১ কায়স্থের স্বীকার করা কর্ত্তব্য হইবে না।

কায়স্থ ভিন্ন অন্যান্য জাতিগুলিও এই কুলপ্রথার কথা মীমাংসা না করিয়া সম্মিলিত হইতে পারিবেন না। এজন্য ইহার বিস্তৃত সমালোচনার আবশ্যক হওয়ায় আমরা এই প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। নব্যভারতের নামের ভিতর যে বীজ-মন্ত্র আছে, তাহাও উদীয়মান সমাজের উন্নতি ও সম্মিলনের সহায়তা করা, অনৈক্যের সহায়তা করা নহে।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ডাক্তার রামদাস সেন।

এক দিন বাঙ্গালার পূর্ব্ব আকাশে অসাধারণ নক্ষত্রমালা উদিত হইয়াছিল। সে দিন বুঝি আর হইবে না, বঙ্কিম ও সঞ্জীব, চন্দ্রনাথ ও চন্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, নটনারায়ণ ও দীনবন্ধু। এই নক্ষত্রপুঞ্জে রামদাস শুক্রতারা-এমন কোমল কিরণ এত উজ্জ্বল, এত অকালে অস্তমিত আর কেহ হয় নাই। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রামদাসের আবির্ভাব, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

কার্য্যের ঘনত্ব অনুসারে সময়ের পরিমাণ হয়। কাহারও শূন্যময় দীর্ঘজীবন অকিঞ্চিৎকর, কাহারও কার্য্যময় হ্রস্ব জীবন পঞ্চমীর চাঁদের মত জগৎ উদ্ভাষিত করিয়া হৃদয় প্রাণ পুলকিত করিয়া অস্তমিত হয়। রামদাস পরিমিত বয়সে যাহা করিয়াছিলেন, আমরা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াও কোন দিন তাহা করিতে পারিব, ভরসা নাই। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে কুসুম মালা, তত্ত্ব সঙ্গীত লহরী, চতুর্দ্দশ পদী কবিতামালা, কবিতা লহরী, ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত-রহস্য, রত্ন-রহস্য, বাঙ্গালীর ইয়ুরোপ দর্শন ও বুদ্ধদেব বিখ্যাত, এতদ্ভিন্ন সংস্কার রহস্য নামে আর এক খানি গ্রন্থ কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারী, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন ভারতী, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রে কতই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এত তাঁহার জীবনের এক দিক। মিউনিসিপাল কমিসনর, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরম কলেজের ট্রষ্টী, ইণ্ডিয়া সভার, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভার, মুরশিদাবাদ সভার, এসিয়াটিক সোসাইটীর, এগ্রিকলচরাল সোসাইটীর, লণ্ডন সংস্কৃত টেকস্ট সোসাইটীর, ফ্লরেন্সের ওরিএণ্টাল আকাডেমির,

ও ইটালির সোনায়েটা এসিয়াটিকার মেম্বর রূপে কত কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি কোন সভার নীরব সভ্য, অলঙ্কার মাত্র থাকিতে সন্তুষ্ট হইতেন না। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদকদিগের সহিত, দেশের রাজনৈতিক সমাজ নৈতিক, গণ্য মান্য অগ্রণীদিগের সহিত, বিদেশীয় সাহিত্য আচার্য্যগণের সহিত ও বিখ্যাত রাজপুরুষগণের সহিত গুরুতর বিষয়ে সর্ব্বদা পরামর্শ ও আন্দোলন করিতে হইত। যজ্ঞেশ্বর ভিন্ন যেমন যজ্ঞ পূর্ণ হয় না, তখনকার দিনে রামদাসের সাহায্য ভিন্ন যেন কোন কর্ম্মই হইতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন নিজের বিস্তৃত জমিদারীর ও শ্রীমান বনবিহারীর বিস্তৃত জমিদারীর ও কুমারের শিক্ষার তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত।

এই সহস্র কার্য্যের মধ্যে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকাগার যেন বৎসারাই গোলাপবাগ। এখানে বসিলে তাঁহার শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হইত। সাধু সংসর্গে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা তিরোহিত হইত। কোন দিন রামদাস বাবুকে অপ্রফুল্ল দেখি নাই। আয়ত লোচনদ্বয় হাস্যে উৎফুল্ল রহিত, মিষ্ট স্বভাবে, মিষ্ট হাস্য ও মিষ্ট কথায় তাঁহার সেই কোমল মুর্ত্তিখানি হৃদয়ে পাষাণরেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে। এই মহাজনের সংসর্গ এই সংসারজ্বালার মধ্যে এত সাহিত্যধারার প্রস্রবণ, চট্টগ্রামে সহস্র ধারার জ্যোতিবিকাশ যাঁহারা দেখিয়াছেন, রামদাসের সহস্র বিকাশ তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন।

রামদাসের তিন রহস্য—ঐতিহাসিক, ভারত ও রত্ন রহস্য। রামদাসের তিন পুত্র মণিমোহন, হিরণ্ময় ও বোধিসত্ত্ব। রামদাসের পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে তিন জন মহাপুরুষ দানধর্ম্মে ভারতবিখ্যাত, দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত, দেওয়ান রাধামোহন এবং ভুবন মোহন। একদিন উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম-প্রণেতা বলিয়াছিলেন, "রামদাস বাবুর স্মৃতিচিহ্ন বহরমপুরে স্থাপিত হইতেছে, ইহা রামদাস বাবুর সৌভাগ্য নহে, বহরমপুরের সৌভাগ্য।" চন্দ্রশেখর বাবুর কথায় আমরা বলিতে পারি যে, রামদাস বাবুর পুত্রত্রয় রামদাস গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা রামদাস বাবুর ত সৌভাগ্য নহেই, তাঁহাদেরও সৌভাগ্য নহে, ইহা বঙ্গবাসীর সৌভাগ্য।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পল্লবগ্রাহী শিক্ষার দোষে বাঙ্গালীর লিখিতে পড়িতে অরুচি জন্মিতেছে। দর্শন ইতিহাস, গণিত বিজ্ঞানে কাহারও রুচি নাই। যে দেশে জাগদীশী ও অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের জন্ম হইয়াছিল, সে দেশে "মেজবৌ" ও "কনেবৌ" জন্মিতেছে। গোলাপী নেশার মুখে চানাচুর বেশ লাগে। সাহিত্যে মস্তিষ্ক শীতল ও হৃদয় উন্নত হয়। প্রকৃত সাহিত্য পাঠে মনুষ্যত্ব লাভ করি। সে সাহিত্য কেহ পড়ে না, কেহ লিখে না। প্রহসন ও হাসির গানের তাই এত আদর। অথচ উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, ঐতহাসিক রহস্যের নূতন সংস্করণ বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের বিষয়।

ঐতিহাসিক রহস্যে যে সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; আমরা যে সেগুলি সব সত্য বলিয়া স্বীকার করি, এরূপ নহে। ডাক্তার রামদাস সেন যে সময়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাহার অনতিপূর্ব্বে ডাক্তার ভাওদাজী বোম্বায়ে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, ভগবানলাল ইন্দ্রাজী ও ডাক্তার

রাজেন্দ্রলাল মিত্র রামদাসের সম সাময়িক। ইন্দ্রাজীর অধ্যবসায় তাম্রলিপিতে ও রাজেন্দ্র-লালের স্থাপত্য ও ভাস্কর কার্য্যে প্রধানতঃ চালিত হইয়াছিল।

আজ প্রভাতে গিরিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, কর্ণফুলীর অপর পারে এক বিস্তৃত নদী অদূরে বিশাল সাগরে মিশাইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, দুবার, চারিবার দেখিলাম, তবুও সেই নদী। অথচ দিনে দুপহরে কখন তাহা দেখি নাই। প্রান্তরের কুয়াসায় উষার আভাস পড়িয়া আমার দৃষ্টিভ্রম ঘটাইয়াছিল। যে সময়ে রামদাস প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন, তখন কুয়াসা কাটে নাই, উষার আভাসে নবীন পান্থ কত কি দেখিয়াছিলেন। মায়াময়ী কল্পনা পদে পদে নবীন পান্থদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল। নদীতে মাঠ ও মাঠে নদী দেখাইতেছিল, এখনও সে সব সত্যের তথ্য নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় ভ্রম ঘটিলে বিশেষ দোষের কারণ হয় না।

প্রত্যুত সেই প্রভাতে প্রত্নতত্ত্বের কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে তিনি একাকী ভবিষ্যপুরুষগণের মঙ্গল হেতু আয়স স্কন্ধে যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায়কে শত ধন্যবাদ। সে কি সাহস! দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি, উইলসন ও মোক্ষমুলার সত্যের পথে যে মায়াজাল রচনা করিয়াছিলেন, লূতাতন্তুর ন্যায় রামদাস সে সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলেন। তাঁহার পরে এই পঁচিশ বৎসরে মহাজন ক্ষুণ্ণপথে অনতি-আয়াসে প্রবেশ করিয়া অনেকে নূতন নূতন মরকতশিলার আবিষ্কার করিয়াছেন। রামদাসের অপেক্ষা এখন অনেকে প্রত্নতত্ত্বের সমীচীন সত্য অবগত হইয়াছেন, তজ্জন্য রামদাসের লজ্জার কারণ নাই। প্রাইমারী বিদ্যালয়ের অনেক বালক পদার্থ বিদ্যায় নিউটনকে পরাস্ত করিতে পারে, তজ্জন্য নিউটনের মহত্ত্বের অপলাপ হয় নাই। দিবা দ্বিপ্রহরের জ্যোতিতে কাণা মানুষেও যাহা দেখে, প্রভাতের কুয়াসায় চক্ষুষ্মানও তাহা দেখিতে পায় না, তা বলিয়া কেহ কাণাকে চক্ষুষ্মান অপেক্ষা দৃষ্টিসম্পন্ন মনে করিবে না; বরং সে কুয়াসায় রামদাস এতগুলি সত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই তাঁহার গৌরবের কারণ।

প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে ঐতিহাসিক রহস্য অসামান্য সহায়। অন্ধকার হইতে সহসা নির্গত হইয়া মধ্যাহ্ন কিরণে সকলি অন্ধকার দেখায়। ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে যাঁহারা অধ্যবসায় করিবেন, ঐতিহাসিক রহস্য দিয়া তাঁহাদিগকে আরম্ভ করিতে হইবে। প্রত্নতত্ত্ব স্বভাবতঃ কঠোর। রামদাসের লেখার গুণে তাহাও মনোহর হইয়াছে। বিনা-আয়াসে প্রথম পথিক নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। পথ চিনিয়া লইতে কষ্ট হইবে না।

তখনকার দিনে ইংরাজীতে লিখিবার সকলের প্রয়াস হইত। সম্প্রতি সার জন উডবরণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইংরাজীতে না লিখিয়া আমি বাঙ্গালায় লিখি কেন? তিনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাও বলিয়াছেন, আমি মানব-প্রকৃতি ইংরাজিতে লিখিলে তিনি পড়িয়া সুখী হইতেন। ইংরাজিতে লিখিলে অনেক

পাঠক পাওয়া যায় এবং অতি অল্লায়াসে পৃথিবী-বিস্তৃত যশোলাভ ঘটে। ভাওদাজী ও ইন্দ্রাজী, ভাণ্ডারকার ও রাজেন্দ্রলাল ইংরেজীতে লিখিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকায় যশোলাভ করেন। ইংরাজীতে লেখা রমেদাসের অনায়াসসাধ্য ছিল। কিন্তু রামদাস যশোলিপ্সু ছিলেন না, স্বদেশের জন্য, বাঙ্গালার জন্য, তাহার হৃদয় কাঁদিত। ইংরাজীতে লিখিবার অনেক লোক ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিবার কেহ ছিল না। মাতৃবৎসল সন্তান মায়ের অলঙ্কার যোগাইতে আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তবে সৎকার্য্যের সহায় ভগবান। লাঞ্ছিত বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক রহস্য লিখিয়াও রামদাস পৃথিবী-বিস্তৃত যশ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক রহস্যের গুণে তিনি লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী, ফ্লরেন্সের আকাডেমিয়া ওরিয়েণ্টেল এবং ইটালির সোসায়েটা এসিয়াটিকার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন এবং ইটালি হইতে ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। বহরমপুর কালেজের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘাটে, গঙ্গার ধারে, তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার যে পাষাণময়ী-প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়া দিয়াছেন—

To the memory
of
Dr. Ram Das Sen
An eminent oriental scholar, a learned antiquarian and a staunch friend of education.

ডিজিওনেরিও বাওগ্রাফিকো নামক ইতালীয় অভিধানে প্রতিমূর্ত্তি সহ তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্য মোক্ষমূলর ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন, রামদাসের লেখা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অতি যত্ন ও আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

রামদাস ধনীর সন্তান। বিভববৈভবের তাঁহার কোন অভাব ছিল না। প্রেমময়ী প্রণয়িনী, সুকুমার পুত্র কন্যা, সুখের যাহা—তাঁহার সকলি ছিল। বৈষ্ণব পরিবারে তাঁহার জন্ম। কোকিলকণ্ঠ কীর্ত্তনে তাঁহার গৃহ ঝঙ্কারিত। বাল্যাবধি কবিতা-রচনায় তাঁহার প্রবৃত্তি। তাঁহার কোমল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভাগীরথীতটে কুসুম-কাননের বিরল প্রাসাদে বিলাপ ও লহরী-রূপে, কখন বা উদাসী সঙ্গীত রচনায় মুখরিত হইত। সেই সুকুমার দেহ, নবনীত হৃদয় রামদাসকে কুঠার হস্তে বীরের ন্যায় বন্ধুর গিরিবর্ত্ম বিনির্ম্মাণে নিয়োজিত দেখিতে গ্রীকদেবতা হর্কিউলিসের স্মরণ হয়। ধন্য স্বদেশ-হিতৈষিতা, ধন্য স্বজাতি-বাৎসল্য।

আমার মানবপ্রকৃতি রচনার প্রধান সহায় রামদাস বাবু। বয়সে জ্যেষ্ঠ হইলেও, ধনে বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ হইলেও, মতের সহস্র পার্থক্য থাকিলেও, তেমন প্রাণভরা ভালবাসা, সাহস ও উৎসাহ কয়জনে দিতে পারিয়াছে! যখন বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধি আলোচনা আরম্ভ করি, তাঁহার নিকট অসামান্য সাহায্য পাইয়াছিলাম, ঐতিহাসিক রহস্যের প্রবন্ধগুলি যখন বঙ্গদর্শনে বাহির হইত, আমার ন্যায় সহস্র জন কত আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। বঙ্কিমের উপন্যাস ও রামদাসের রহস্য কাহার আদর অধিক ছিল, বুঝিতে পারা যাইত না।

"তেহিনো দিবসাঃ গতাঃ।" জীবনোপায় সন্ধানে ব্যগ্রতার আধিক্য হেতু, অবসর অভাবে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অকিঞ্চিৎকর অধ্যাপনায় বাঙ্গালী-প্রকৃতির

গাম্ভীর্য্যের অভাব হইতেছে, অকিঞ্চিৎকর যৎকিঞ্চিতে রুচি জন্মিয়াছে। বঙ্গদর্শনের দিনের সে শিক্ষার আগ্রহ আর নাই। এই চপলতার স্রোতে রামদাসের ঐতিহাসিক রহস্য যদি স্রোতভঙ্গের ন্যায় কার্য্য করে, পুরাতন স্রোত যদি নূতন পথে চলে, রামদাসের পুত্রগণের ন্যায় আমরা কৃতার্থ হইব। ঐতিহাসিক রহস্য আমার মনে অনেক পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছে। যদি ইহাতে বঙ্গীয় পাঠকের নবীন অনুরাগ উদ্দীপিত করিতে পারে, কুরুচির পরিবর্ত্তন করিতে পারে, বঙ্গের শুভদিনের অভ্যুদয় হইবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

কয়লার খনি। (২)

দুই প্রণালী অনুযায়ী খাদে কয়লা কাটাই হইয়া থাকে। বিলাতে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে গিরিডির করারবাড়ী প্রভৃতি খনিতে Long wall system অর্থাৎ (main) সুঁদ চালাইয়া কয়লা কাটাই হইয়া থাকে, কিন্তু বঙ্গদেশের রাণীগঞ্জে এবং ঝাড়িয়া খনি সমূহে (stall এবং pillar) অর্থাৎ সুঁদ এবং কাঁথি (pillar) এবং ডাল সুঁদ ও পিলার রাখিয়া কয়লা কাটাই হইয়া থাকে।

খাদে প্রথম কয়লা লাগিলে পর কি প্রকারে মূল সুঁদ চালাইতে হইবে, তাহা ঠিক করিবার পূর্ব্বে কয়লার গতি কোন দিকে অধিক রহিয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। অতঃপর কয়লার নিম্নের পাথরের চালের গতি দেখিয়া ছয় ফুট ব্যবধান পূর্ব্বক দুইটী পিন্ কয়লার মধ্যে বসাইয়া দিয়া পরে মাইনিং ডায়ালের দ্বারা সাইট্ লইয়া দেখিতে হইবে যে, ঐ দুইটীর মধ্যস্থানের কত ডিগ্রীতে কয়লার গতি চলিতেছে। ঐ মধ্যস্থিত ডিগ্রীকে ডিপ এঙ্গল কহে।

ডিপ এঙ্গল দেখিবার আর একটী নিয়ম আছে তাহা এই—চানকের তলস্থিত পাথরের উপরে একটী বাউতি জলে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, বাউতির যে দিক দিয়া জল গড়াইতেছে, সেই পার্শ্বে একটী ঝাণ্ডি ধরিয়া ডায়েল দিয়া এঙ্গল নির্ণয় করিতে হইবে এবং ঐ ঝাণ্ডি যে এঙ্গলে হইবে, কয়লার গতি সেই এঙ্গলে হইবে। এই এঙ্গলকে ডিপ এঙ্গল কহে। ঐ ডিপ্ এঙ্গলের সেণ্টার ধরিয়া main গ্যালারি অর্থাৎ মূল সুঁদ চালান হইয়া থাকে। এবং ঐ ডিপ্ এঙ্গলের (rightangle) অর্থাৎ সমকোণ ধরিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে main গ্যালারী অর্থাৎ মূল সুঁদ ৬ ছয় ফুট পরিসর করিয়া চালাইতে হইবে এবং উত্তর দিকের মূল সুঁদ দক্ষিণ সুঁদের বিপরীত অর্থাৎ Back bearing এ চালাইতে হইবে। এই প্রকার সুঁদ চালাইয়া কয়লা কাটাইকে লঙ ওয়ালে কার্য্য করা কহে। উপরোক্ত (main gallery র) মূল সুঁদের parallel করিয়া ডালসুঁদ চালাইতে হইবে। সুঁদ লাগিবার পূর্ব্বেই চানকের অবস্থা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে এবং তদনুযায়ী চালে কয়লা রাখিয়া সুঁদ চালাইতে হইবে। চালে ৩´।৪´´ ইঞ্চি কয়লা রাখিয়া সুঁদ চালাইলে চাল ঠিক থাকিবে। চালের পাথর নরম ও

শক্ত অবস্থায় আছে কি না, তাহা সর্ব্বদা চাল ঠুকিয়া পরীক্ষা করতঃ সুঁদ চালাইতে হইবে। চাল কোন প্রকারে নরম হইলে সেই স্থানের কয়লা ঝাড়াইয়া দিয়া ঐ স্থানে শক্ত কাষ্ঠ (prop) লাগাইয়া দিতে হইবে। মূল সুঁদের প্রতি ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সুঁদ ঠিক সোজা ভাবে চলিতেছে কি না ? সুঁদ ঠিক সোজাভাবে চালাইবার জন্য, প্রথম সুঁদ আরম্ভ করিবার স্থানের মধ্যে অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে একটী পিন চালে পুঁতিয়া রাখিতে হইবে এবং সুঁদ কিছু দূর চলিলে পর কার্য্যস্থানের মধ্যদেশে এবং প্রথম পিনের নীচে একটী আলো ঝুলাইয়া পরে অপর একটী আলো প্রথম পিনের এক লাইনে রাখিবে। কার্য্যস্থানের আলোটীকে সোজা করতঃ ঐ দুটী আলোর সহিত এক লাইন করিয়া কার্য্য স্থানের আলোর উপরের চালে একটী খড়ির দ্বারা দাগ করিয়া উহা সেণ্টার করিয়া উভয় পার্শ্বে ৩ তিন ফুট ধরিয়া সুঁদ চালাইতে হইবে এবং খড়ি মাটীর দ্বারা সূতলী করিয়া কার্য্যস্থান এবং প্রথম পিনের মাথায় দাগ করিয়া সুঁদ চালান কর্ত্তব্য। উপরোক্ত প্রণালীতে সমস্ত সুঁদ চালাইলে সুঁদ কখনও বক্রভাবে চলিবে না।

চানকের পিলার রাখিবার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত দৃষ্ট হয় এবং উহা পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে দেওয়া হইল। সাধারণতঃ জমী ও পাথরের যত ফুট নিম্নে কয়লা পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ এবং কয়লার খাড়াই অর্থাৎ উচ্চতা একত্রে যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইবে, উহার ⅓ অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ সমচতুষ্কোণ করিয়া চানকের প্রথম চারিটী পিলার রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ সুঁদ ৬ ছয় ফুট হইতে ১২ বার ফুট পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাখিয়া চালাইতে হয়।

খাদের ঢাল জানিতে হইলে লেভেলিং যন্ত্র এবং ষ্টাপ্ (এক প্রকার সাদা এবং কাল দাগ বিশিষ্ট লাঠি, লেভেল্ করিবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে) দ্বারা উহা সূক্ষ্মভাবে জানিতে পারা যায়। যদি উক্ত যন্ত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, খাদে কয়লার স্তরের মধ্যে পাথর আছে কি না ? অনেক খাদে কয়লার ভিতর ১″ এক ইঞ্চি হইতে ৬″ ছয় ইঞ্চি পরিমাণেরও বেশী আকারের পাথর থাকে এবং পাথরের ঢাল দক্ষিণাভিমুখী হইলে উক্ত পাথর দ্বারা খাদের ঢাল জানিবার সুবিধা হয়। ১০′×৩″×১″ একখানি কাষ্ঠ ঢালের পাথরের সহিত লাগাইয়া একটি স্পিরিট লেভল বা (T) টি লেভল উহার উপরে রাখিয়া কাষ্ঠখানি লেভল করিয়া লইতে হইবে, তৎপরে কাষ্ঠখানির অপর প্রান্তে ঢালের পাথর হইতে কত ফুট কিম্বা ইঞ্চি ব্যবধান আছে, উহা দেখিয়া পরিমাণ করিতে হইবে। যথা :—কাষ্ঠের অপর প্রান্ত যদি ঢালের পাথর হইতে এক ফুট অন্তর হয়, তাহা হইলে ১০′ দশ ফুটে, যখন ১′ এক ফুট ঢাল হইল, তখন ১০০′ শত ফুটে ১০′ দশ ফুট ঢাল হইবে। এই প্রকারে প্রত্যেক খাদের কয়লার ঢাল বাহির করিতে হয়।

খাদ সার্ভে করিতে হইলে প্রথমতঃ উপরের চতুঃসীমা সমস্ত সার্ভে করিতে হইবে, এবং সীমান্তর্গত পিট, সিঁড়ি খাদ, আফিস, বাড়ী প্রভৃতি ঐ সীমার মধ্যে চিহ্নিত করিয়া নক্সা করিতে হইবে। সিঁড়ি-

খাদ সার্ভে করিতে হইলে সিঁড়ির মুখে কম্পাস সেট করিয়া চানকের মধ্যস্থানে একটী আলো রাখিয়া উহার ব্যারিং ও সিঁড়ির মুখ হইতে চানকের মধ্যস্থিত আলোর দূরত্ব মাপিয়া লইতে হইবে। এবং দুই পার্শ্বের অফসেট লইয়া সিঁড়ির স্থান স্কেল অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া বসাইতে হইবে। এক নম্বর আলো হইতে ষ্টেশন করিয়া যে পর্য্যন্ত সুঁদের মধ্যের আলো দৃষ্টিগোচর হয়, সেই পর্য্যন্ত আর একটী আলো রাখিয়া ষ্টেশন করতঃ উহার এঙ্গল নির্ণয় করিবে এবং চেন দ্বারা মাপিয়া সুঁদের ও কাঁথির উভয় পার্শ্বের অফসেট লইয়া ফিল্ড্ বুকে লিখিয়া রাখিতে হইবে। উপরোক্ত প্রকারে ডালসুঁদ প্রভৃতির জরিপ করিয়া নকসা স্কেল অনুযায়ী প্রোট্রাক্টর ও প্যারালাল রুল দ্বারা ফিল্ড্-বুকে লিখিত প্রথম ষ্টেশন হইতে এক-খণ্ড ড্রয়িং কাগজে আরম্ভ করিতে হইবে এবং আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কাগজের এরূপ স্থলে প্রথম ষ্টেশনে একটী নর্থ লাইন টানিতে হইবে যেন, সমস্ত জরিপের লাইন-গুলি সঙ্কুলান হয়। প্রথমে যে নর্থ লাইনটী টানা হইবে, তাহাতে প্রোট্রাক্টর সংলগ্ন করিয়া যত ডিগ্রী এঙ্গল প্রথম ষ্টেশনে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা চিহ্নিত করিয়া প্রথম ষ্টেশন হইতে এঙ্গেলের চিহ্নের মধ্য দিয়া একটী সোজা লাইন টানিয়া লইতে হইবে এবং প্রথম ষ্টেশন হইতে দ্বিতীয় ষ্টেশনের দূরত্ব যত ফুট হইবে, তাহা স্কেল হইতে মাপিয়া লইয়া উক্ত লাইনের উপর দ্বিতীয় ষ্টেশনটী বসাইতে হইবে। সেই দ্বিতীয় ষ্টেশনের চিহ্ন হইতে প্রথম ষ্টেসনের নর্থ লাইনের সমান্তরাল (প্যারালেল) একটী নর্থ লাইন টানিতে হইবে, তৎপরে উপরোক্ত প্রকারে প্রোট্রাক্টর নর্থ লাইনে সংলগ্ন করতঃ দ্বিতীয় ষ্টেশনের এঙ্গলটী চিহ্নিত করিয়া উহার মধ্য দিয়া সোজা লাইন টানিতে হইবে এবং এই প্রকারে ফিল্ড-বুকে লিখিত সমস্ত লাইন গুলি বসাইতে হইবে এবং উভয় পার্শ্বের পিলার ও সুঁদের অফসেট্ লইয়া পরিমাণ অনুযায়ী স্কেল দিয়া মাপ করতঃ চিহ্নিত লাইন সমূহের সমকোণে বসাইতে হইবে।

প্রোট্রাক্টর নর্থ লাইনে সংলগ্ন করিয়া বসাইবার সময়ে দেখিতে হইবে যে, ১৮০ ডিগ্রীর অধিক এঙ্গল না হয়। ১৮০ ডিগ্রীর ন্যূন হইলে ঐ প্রোট্রাক্টর খানি নর্থ লাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিবে এবং ১৮০ ডিগ্রীর অধিক হইলে নর্থ লাইনের বাম পার্শ্বে বসিবে।

খাদে কম্পাস সেট্ করিবার সময়ে এমন স্থানে ষ্টেশন গুলি করিতে হইবে, যেস্থলে কোন লৌহের আকরের চিহ্ন না থাকে। ষ্টেশন লাইনের দূরত্ব অধিক হওয়া আবশ্যক। লাইনের দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্বের পিলার অঙ্কিত করিবার সময়ে, যেন কোন অসুবিধা না হয়। চেন লাইনের অভ্যন্তরস্থিত স্থান যখন অঙ্কিত করিবে, সেই সময়ে পূর্ব্বে যে ষ্টেশন করা হইয়াছে, সেই ষ্টেশনের সহিত যোগ করিবে। প্রথম ষ্টেশন হইতে দ্বিতীয় ষ্টেশনে যে এঙ্গল হইল, ঐ এঙ্গল ঠিক হইল কি না, ইহা জানিবার জন্য দ্বিতীয় ষ্টেশনে কম্পাস বসাইয়া প্রথম ষ্টেসনটীর এঙ্গল দেখিতে হইবে। দ্বিতীয় ষ্টেশনের এঙ্গলটী প্রথম ষ্টেশনের এঙ্গেলের বিপরীত ব্যারিং হইলেই বুঝিতে হইবে যে, প্রথম ষ্টেশনের এঙ্গল নির্ণয়ে ভুল হয় নাই

প্রথম ষ্টেশন হইতে দ্বিতীয় ষ্টেশনের এঙ্গল যদি উত্তর পূর্ব্ব ১৫° হয়, তাহার বিপরীত এঙ্গল দক্ষিণ পশ্চিম ১৫° হইবে,ইহা মাইনিং ডায়ালে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রিস্‌মেটিক কম্পাসে ১৫° ডিগ্রী প্রথম ষ্টেশনে হইলে দ্বিতীয় ষ্টেশনটী উহার বিপরীত এঙ্গল ১৯৫° হইবে অর্থাৎ ১৮০°+১৫°=১৯৫°।

১৮০°র বেশী এঙ্গল হইলে উক্ত এঙ্গলটী হইতে ১৮০ বিয়োগ করিলে যে এঙ্গল হইবে, উহা বিপরীত ব্যারিং জানিবে।

যথা :—২৭৫° বিপরীত এঙ্গল, ২৭৫°—১৮০°=৯৫°।

একটী খাদ হইতে অপর আর একটী খাদ সংযোগে করিতে হইলে প্রথমতঃ উপরে একটী খাদ হইতে অপর খাদ কত এঙ্গল এবং কত দূরে তাহা পরিমাণ করিয়া নক্সায় অঙ্কিত করিবে এবং প্রথম খাদ হইতে দ্বিতীয় খাদের যে এঙ্গল লওয়া হইয়াছে, সেই এঙ্গল অনুযায়ী প্রথম খাদের সুঁদ চলিলে এবং অপর খাদের সুঁদ উহার বিপরীত এঙ্গলে চালাইলে দুটী খাদ এক সোজা লাইনে সংযুক্ত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চানকের পিলার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র এস্থলে পাঠকের অবগতির জন্য এস্থলে লিখিত হইল:—

(১) মিঃ গ্রিনওয়েল বলেন :—২৪০ খনির গম্ভীরতা দুই শত চল্লিশ ফুট হইলে ন্যূন সংখ্যায় ১০২ এক শত কুড়ি বর্গ ফুট চানকের পিলার রাখিতে হইবে এবং ২৪০° অতিরিক্ত পিটের গভীরতা হইলে প্রত্যেক অধিকন্তু ৬০´ ফুটের অধিকন্তু ১৫´ ফুট সমচতুষ্কোণ যোগ করিয়া পিলার রাখিতে হইবে।

(২) মিঃ এণ্ড্রি বলেন :—২৫০´ ফুট খাদের গভীরতা হইলে ন্যূন সংখ্যায় ১০৫ ফুট সমচতুষ্কোণ চানকের পিলার রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক অধিকন্তু ৭৫ ফুটে ১৫ ফুট সমচতুষ্কোণ যোগ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) মিঃ প্যামলী বলে :—৩০০ শতফুট খাদের গভীরতা হইলে ন্যূন সংখ্যায় ১২০ ফুট সমচতুষ্কোণ চানকের পিলার রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক অধিকন্তু ৬০ ফুট গভীরতায় ১৫´ সমচতুষ্কোণ যোগ করিয়া পিলার রাখিতে হইবে।

(৪) মিঃ ওয়ার্ডেল বলেন :—১৮০ ফুট খাদের গভীরতা হইলে ন্যূন সংখ্যায় চানকের পিলার ১২০´ ফুট রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক অধিকন্তু ১২০ ফুটে ৩০´ ফুট সমচতুষ্কোণ যোগ করিয়া পিলার রাখিতে হইবে।

(৫) মিঃ ৫ ডেন বলেন :—এমন ভাবে সার্ভে করিয়া একটী রেখা টানিতে হইবে, যাহাতে চানকের উপরিস্থিত এঞ্জিন ঘর, বয়লার, কামারশালার ঘর প্রভৃতির নিম্নে কয়লা রাখা হয় এবং সেই লাইনের অভ্যন্তরে কয়লা কাটিয়া তোলা বৈধ নহে।

(৬) মিঃ কেম্পি বলেন :—৪৮০ ফুট হইলে চানকের পিলার ১৫০ ফুট, ৬০০ ফুট হইলে ১৮০ ফুট, ৭৭৪ ফুট হইল ২১০ ফুট, এবং ৯৬০ ফুট হইলে ২৭০ ফুট রাখিতে হইবে।

চানকের পিলার সম্বন্ধে উপরের লিখিত নিয়মগুলি যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা নহে। চানকের এবং খাদের প্রকৃত পিলার সম্বন্ধে কোন বাঁধা-বাঁধি নিয়ম সুবিধাজনক নহে। চানকের এবং খাদের পিলার রাখার

কিরূপ অবস্থা, চানকের কিরূপ অবস্থা, কয়লার সিম ভূগর্ভের কত নিম্নে, কয়লার থাড়াই কত, ঢাল কি প্রকার, চালের পাথর শক্ত কি নরম, এই সমস্ত বিষয় বিশেষ দৃষ্টি করিয়া যে প্রণালীতে পিলারের আয়তন রাখিতে হইবে, তাহা স্থির করা যুক্তিযুক্ত। কয়লার খাদে সুঁদ চালাইবার পূর্ব্বে ইহা দেখা আবশ্যক যে, যে স্থানে কয়লা কাটিতে হইবে, সেই স্থানে কি পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন হইবে, প্রথমতঃ উপরিস্থ জমীর দীর্ঘ ও প্রস্থ উভয়ে গুণ করিয়া যে গুণফল হইবে, সেই গুণফলকে কয়লার থাড়াই দিয়া গুণ করিলে কত ঘন ফুট কয়লা আছেন, তাহা পাওয়া যাইবে। ১০০ ঘন ফুটে যদি দুই টন কয়লা হয়, সমস্ত স্থানের ঘন ফুটে কত কয়লা হইবে, ইহা হইতে ধরিয়া লইতে পারা যায়।

উদাহরণ,

জমীর দীর্ঘ ৩০০ শত ফুট

প্রস্থ ১৫০´

থাড়াই ১০´

৩০০´ × ১৫০´ = ৪৫০০০´ বর্গফুট স্থানের কালি

৪৫০০০´ × ১০´ = ৪৫০০০০ ঘন ফুট

অনুপাত অনুসারেঃ—

১০০ : ৪৫০০০০ :: ২ : টন

ধন = ৪৫০০০০ × ২ / ১০০ = ৯০০০ টন

৯০০০ হাজার টন কয়লা হইল।

কয়লা রেজিং—সিড়ি খাদ হইতে মাথায় করিয়া কুলিরা উপরে তুলিয়া কয়লার গাদা বাঁধিয়া থাকে। প্রতি গাদা ১০০ শত ঘন ফুট হিসাবে বাঁধা হয় অর্থাৎ ১০ ফুট দৈর্ঘ, ১০ ফুট প্রস্থ এবং ১ ফুট থাড়াই কিম্বা ২০ ফুট দৈর্ঘ ৫ ফুট প্রস্থ এবং ১ ফুট থাড়াই ষ্টিম্ কয়লার প্রত্যেক ষ্টিম কয়লার গাদা ইনক্লাইনের দূরতা এবং কয়লার কঠিনতা অনুসারে ৷৵০ দশ আনা হইতে ১৷৷০ দেড় টাকা পর্য্যন্ত কুলিদিগকে ঠিকায় মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক গাদায় ৬০ মণ করিয়া রবলের কয়লার পরিমাণ ধরা হইয়া থাকে। ষ্টিম্ গাদা ।০ আনা হইতে ৷৷০ আট আনা পর্য্যন্ত মূল্যে কুলিদিগকে দেওয়া যায়, এবং প্রত্যেক গাদায় ২০ মণ হিসাবে ধরা হইয়া থাকে।

পিট খাদে রবলের ষ্টিম কয়লার বাউতি দুই আনা হইতে ৶০ তিন আনা পর্য্যন্ত এবং টব ।০ আনা হইতে ।৶ আনা পর্য্যন্ত কয়লার কঠিনতা ও বহন করিবার দূরত্ব অনুসারে মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যক বাউতিতে ৬ মণ এবং টবে ১২ মণ ষ্টীম রবল কয়লার পরিমাণ ধরিয়া লওয়া হয়, এবং ময়লা অর্থাৎ ডাষ্ট বাউতিতে ২ মণ হিসাবে এবং টবে ৪ মণ হিসাবে ধরা হইয়া থাকে এবং উহার জন্য কুলিদিগকে দূরতা অনুসাদ /০ এক আনা এবং ৵০ দুই আনা মূল্য ঠিকায় প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

কোন্ দল মালকাটার বাউতি কিম্বা টব উপরে উঠিয়া আসিল তাহা জানিবার জন্য পূর্ব্বে মালকাটার দলপতিদিগের নাম খাদসরকারের বহিতে লিখিয়া রাখিবে। যে দলে যত টব কিম্বা বাউতি কয়লা দিতে পারিবে, তাহা আন্দাজ করিয়া সাঙ্কেতিক চতুষ্কোণ টিন এক হইতে পর্য্যায়ক্রমে যত খাতি অর্থাৎ দল মালকাটা থাকিবে, ঐ অনুসারে বিলি করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য খাদসরকারের বহিতে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

অনেক সময় মালকাটাগণ গাদা, টব এবং বাউতি ফোপা দিয়া থাকে অর্থাৎ দুই

পার্শ্বে দুইটী বড় কয়লার চাপ দিয়া তাহার মধ্যে ফাঁক রাখিয়া উপরে পুনরায় বড় কয়লার চাপ সাজাইয়া দেয়। খাদ সরকারের ইহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। মালকাটাগণ খাদে নামিবার পূর্ব্বে ষ্টোর কিপারের নিকট দলপতির নাম লিখিয়া দেয় এবং নিম্নলিখিত হিসাবে তাহারা কেরাসিন তৈল লইয়া থাকে।

ষ্টীম কোল—১ গাদার কাত ⁄॥ অর্দ্ধ সের।
,, ১ বাউতির কাত ⁄ এক ছটাক।
,, ১ টবের কাত ৵ দুই ছটাক।
রবলকোল—১ গাদার কাত ⁄৹ এক পোয়া
,, ১ বাউতির কাত ৴৹ অর্দ্ধ ছটাক।
,, ১ টবের কাত ⁄৹ এক ছটাক।

ডাইক কাটা কুলি—ডাইকের কাঠিন্য অনুসারে ৵৹ ছটাক হইতে ⁄।৵ দেড় পোয়া পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

মুলসুন্দ চালান—১ ফুটের কাত ⁄৹ এক পোয়া।

খাদের নিম্নের সর্দ্দার	⁄৹ এক পোয়া।
খাদ চাপরাসী	৵৹ ছটাক।
ডিপো	⁄॥৹ অর্দ্ধ সের।
জাল খালাসী	৵৹ দুই ছটাক।
এঞ্জিন খালাসী	⁄৹ এক পোয়া।
স্পেশিয়াল খালাসী	⁄৹ এক পোয়া

প্রত্যেক দিন কয়লা উত্তোলন করিবার পর ষ্টোর কিপার যে মালকাটাকে যে পরিমাণে তৈল দিয়াছে, উহার হিসাবের সহিত কয়লার পরিমাণ ঐক্য করিয়া লইবে এবং যদি তৈলের পরিমাণ অনুসারে কম কয়লা উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তৈলের মূল্য কাটিয়া লইয়া তাহার টিপে (খাদ সরকার প্রদত্ত কয়লার পরিমাণ লেখা ফর্দ্দ) বাদ দিয়া দিবে এবং ক্যাসিয়ারও তদনুযায়ী তৈলের মূল্য কাটিয়া লইয়া মজুরী প্রদান করিবে। উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত মালকাটাগণের মজুরি প্রদানের পর খাদ সরকার, ষ্টোর কিপার, এঞ্জিন খালাসী প্রভৃতির উত্থিত কয়লার রিপোর্টের সহিত ক্যাসিয়ারের পেমেণ্ট অনুযায়ী কয়লার পরিমাণ প্রত্যহ মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য।

খাদ সরকারের টিপে লিখিত কয়লার পরিমাণ অনুযায়ী প্রকৃত পক্ষে সেই কয়লা উঠিয়াছে কি না, তাহা প্রত্যহ আউট্‌ডোর ইনেস্পেক্‌টরের দেখা উচিত।

প্রত্যেক ম্যানেজারের এবং তদধনীস্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর প্রত্যেক কুলির হিসাব এবং সমস্ত টিপ পরীক্ষা করিয়া দেখা, প্রত্যেক কার্য্য ঠিক ভাবে চলিতেছে কিনা তাহাও বিশেষরূপে তত্ত্বাবধান করা উচিত।

কুলিদিগকে যে সমস্ত কুনি, মার্ত্তুল, গাঁইতি প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার হিসাব ষ্টোরকিপার রাখিবেন এবং কুলিদিগের কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে উহা তাহাদিগের নিকট ফিরাইয়া লইবেন। ষ্টোরকিপারের হিসাব ম্যানেজার কিম্বা তৎক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে।

ক্যাসিয়ার প্রত্যহ টিপ অনুসারে কুলিদিগের পেমেণ্ট করিয়া তাহার হিসাব ঠিক করতঃ প্রত্যহ টাকা কড়ির জমা লিখিয়া কৈফিয়ৎ টানিয়া মজুদ তহবিলের জমা সহ তহবিল মিলাইয়া নিজের নাম হিসাবের নিম্নে সহি করিয়া রাখিবে।

শ্রী এম, এন্, রায়।

ধ্বংসের পথে

সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
কেহ অশ্ব কেহ গজে,
কেহ যায় পদব্রজে,
কেহ স্বর্ণ চতুর্দ্দোলে কেহ যায় পুষ্পরথে !
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
কেহ সুখে কেহ দুখে,
কেহ ফুল্ল হাস্য মুখে,
কেহ যায় দগ্ধ বুকে জ্বলিয়া মরম ক্ষতে !
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
কি বসন্ত কি বরষা,
সকলেরি এক দশা,
কেহ কোথা নহে বসা হেমন্তে শীতে শরতে,
গ্রহ উল্কা উপগ্রহ,
কত সূর্য্য শশী সহ
চলেছে ব্রহ্মাণ্ড কত অনন্ত সৌরজগতে !
কি অমর কি অপ্সর,
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
নন্দনে ক্রন্দন শুন সুমেরু—স্বর্ণ পর্ব্বতে !
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
যাগ যজ্ঞ পুণ্য পাপে,
আশীর্ব্বাদ অভিশাপে,
অনিরুদ্ধ মহাগতি কি স্বরগে কি মরতে !
কি স্থাবর কি জঙ্গম,
নাহি কোন ব্যতিক্রম,
চলিয়াছে এ নিয়ম অনাদি অনন্ত হ'তে !
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
এ ভীষণ ভীমাবর্ত্তে,
যায় যে গহ্বরে—গর্ত্তে,
তিলে তিলে এত যাত্রী অর্ব্বুদে অযুতে শতে,
কে কবে দেখেছে উহা,
সে কন্দর অন্ধ গুহা,
কত গেছে কত আছে কত যাবে ভবিষ্যতে !

কত সত্য কত ত্রেতা,
কত ঋষি ঊর্দ্ধরেতা,
করিল তপস্যা কত এ বিশ্বে—পুণ্য ভারতে,
কে কবে জেনেছে সত্য,
কে পেয়েছে ধ্রুব তথ্য,
কোথা সে গতির গতি মিলন অসতে সতে !
জননী ভগিনী জায়া,
যাদের মমতা মায়া,
হৃদয়ে রয়েছে ভরা হীরা মণি মরকতে,
এমন প্রকাণ্ড স্থূল,
সারাটা বিশ্বাস ভুল,
পারিনা ভাবিতে ইহা কোন রূপে কোন মতে,
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
আতঙ্কে কাঁপিছে হিয়া,
উঠে প্রাণ শিহরিয়া,
কি উদ্দেশ্য কি সংকল্প এ অনন্ত মহাব্রতে,
এ রহস্য অতি গূঢ়,
এখানে সকলি মূঢ়,
অভেদ বেদান্ত বেদ বৈশেষিক ভাগবতে !
সকলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে !
ওহে ভগবান হরি,
দেও হে করুণা করি,
তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি অধম শরণাগতে,
দেও হে চরণ রাঙ্গা,
ভীত চিত ভয় ভাঙ্গা,
হে মুকুন্দ ! হে মুরারে ! হে কৃষ্ণ ! কমলাপতে !
জীবনের নাহি বাকি,
কাতরে সভয়ে ডাকি,
দেখা দেও কমলাখি যমুনা শ্যাম-সৈকতে !
তোমাতে দিলাম ঝাঁপ,
লহ পুণ্য লহ পাপ,
নম নারায়ণ হরি, নমঃ কৃষ্ণ ভগবতে !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

আমার বক্তব্য।

কোন লেখক একটী বিষয় প্রতিপদান করিতে গেলে, সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝিয়া থাকেন,—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। জগতে ইহার দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নাই। অল্পদিনের একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। মহাত্মা ডারউইন্ কৃত "Origin of Species" নামক গ্রন্থ পড়িয়া অধ্যাপক Huxley এবং অধ্যাপক Kolliker, দুই জনে দুই রূপ বুঝিলেন। দুই জনেই পণ্ডিত, দুই জনেই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। একজন ডারউইনকে Teleologist বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন; আর একজন বলিলেন যে, ডারউইনের গ্রন্থ, Teleologyর মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। একজন বলিতেছেন যে, "Darwin is, in the fullest sense of the word, a teleologist." আর একজন স্থির করিলেন যে,

"Nothing can be more entirely and absolutely *opposed* to Teleology than the Darwinian theory."

ইহাদের মধ্যে কাহার কথা ঠিক্, তাহা আমরা বলিতে চাই না। এতদ্দ্বারা আমরা বলিতে চাই যে, মহা পণ্ডিত ব্যক্তিও একই বিষয় দুই প্রকারে বুঝিতে পারেন, ইহা অসম্ভব নহে। তাই, মাননীয় শ্রীযুক্ত শশি বাবু যে আমাদিগকে ভিন্নভাবে বুঝিয়াছেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি; কিন্তু বিস্মিত হই নাই।

হিন্দুদর্শন কি বিবর্ত্তবাদের বিরোধী? যাঁহারা হিন্দুদর্শনের মূলতত্ত্ব বুঝেন, তাঁহারা বলেন যে, হিন্দুদর্শন বিবর্ত্তবাদের বিরোধী নহে। ইহা শুধু আমাদের কথা নহে। বিবর্ত্তবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহা বৈজ্ঞানিক দুইজন পণ্ডিত একথা স্বীকার করেন। সুপ্রসিদ্ধ Encyclopedia Brittanica. নামক গ্রন্থে, মহাত্মা Sully বিবর্ত্তবাদ লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,

"In the latter system of emanation of Sankhya, there is a more marked approach to a materialistic doctrine of evolution."

অধ্যাপক Huxleyও এই উক্তির অনুমোদন করিয়া, তাঁহার "Controverted questions" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে,

"In some of the philosophies of ancient India, the idea of Evolution is *clearly* expressed."

যদি এইরূপই হইল, তবে আমরা যে বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করি বলিয়াছি, তাহা অসঙ্গত হইবে কেন? শশি বাবু বিদ্রূপ করিয়া আমাদের এ স্বীকার-উক্তিকে উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ইহা সংসারে খুবই সম্ভব যে, বিবর্ত্তবাদের বিশেষ বিশেষ অংশে মতভেদ থাকিলেও, মূলতঃ এক ব্যক্তি বিবর্ত্তবাদ মানিতে পারে।

বিবর্ত্তবাদকে মহাত্মা ডারউইন যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাহারই বিশেষ বিশেষ অংশে কতকগুলি আপত্তি আছে। সেই আপত্তি গুলির মধ্যে প্রধানতঃ চারিটীমাত্র আপত্তি আমরা দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে, বিবর্ত্তবাদ ইহাদের ঠিক্ সন্তোষপ্রদ উত্তর দিতে পারে নাই। কোন কোন অংশে আপত্তি থাকিলেই, মতটী মূলতঃ উড়িয়া যায় না।

বিশেষতঃ, এ আপত্তিগুলি নূতন নহে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এ সকল আপত্তি তুলিয়াছেন; বিশেষ সন্তোষপ্রদ উত্তর আজ্ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই। ডারউইন, তাঁহার গ্রন্থে প্রধানতঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকেই (Natural selection) প্রাণী বিবর্ত্তের মূলে দেখিতে পাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে, মানবীয় নির্ব্বাচনের (Artificial selection) কথা তুলিয়া পরীক্ষা দ্বারা, নিজের অনুমানের দৃঢ়তা করিতে চাহিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি যে, উভয় নির্ব্বাচনের ফলে যখন তারতম্য আছে দেখা যায়, তখন মানবীয় নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্তের বিশেষ মূল্য নাই। যখন দেখা যাইতেছে যে, অধিক সৌসাদৃশ্যযুক্ত কতকগুলি প্রাণীর সংযোগফলে, বংশবিস্তারক্ষম প্রাণী উদ্ভূত হয়, অথচ বিভিন্ন রকমের বিসদৃশ প্রাণীর সংযোগ ফলে তাহা হয় না, তখন গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাইলেই, তাহাতে বিশেষ লাভ নাই। ইহা নূতন আপত্তি নহে। অধ্যাপক Huxley এই আপত্তিটীকে যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াও, ইহার উত্তরে কতকগুলি প্রমাণ দিয়াছেন। মোটামোটী তাঁহার প্রমাণ এইরূপ:—(১) আবদ্ধ রাখিলে, একই জাতীয় বন্য প্রাণীর এমন দৈহিক পরিবর্ত্তন হয় যে, উহা নিজজাতীয় স্ত্রীতেই সংযুক্ত হইতে চায় না। (২) প্রকৃতিতে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি (Species) দেখা যায়, উহারা আদৌ মিলিতেই চায় না। যখন মিলিতেই চায় না, তখন মিলিলে যে বংশবিস্তারক্ষম সন্তান জন্মিতে পারে না, একথার প্রমাণ থাকিল কৈ? (৩) ক্রমাগত বহু সহস্র বৎসর পরীক্ষা না চালাইলে, ইহা ঠিক্ করিয়া বলা যায় না যে, বংশবিস্তারে সক্ষম বা অক্ষম সন্তানই জন্মিবে। (৪) অধ্যাপক Huxley এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন (ডারউইন্‌ও এ কথা বলেন) যে, যাহাতে বুঝা যায়, অনেক ভিন্ন জাতীয় উদ্‌ভিদ্ স্ত্রীপুংরেণুযোগে উর্ব্বর (Fertile) হইয়া থাকে, আবার এমন অনেক এক জাতীয় উদ্‌ভিদের রেণুযোগে উর্ব্বরতা দেখা যায় না। বহুদিন পরীক্ষা না করিলে, কাজেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে না। সেইজন্য তিনি বলিতেছেন যে,

"But it is not as yet proved that a race *ever* exhibits when crossed with another race of *same* species, those phenomena of hybridation which are exhibited by many species when crossed with *other* species. On the other hand, not only is it not proved that *all* species give rise to hybrids infertile *inter se*, but there is much reason to beleive that in crossing species exhibit every *gradation* from perfect sterility to perfect fertility."

এ কথার অবশ্যই খুব গুরুত্ব আছে। হয়ত কালে এ ভিন্নতাটুকু অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু তথাপি ডারউইনের বিবর্ত্তবাদের বিরুদ্ধে ইহা একটী গুরুতর আপত্তি। Huxley এই সকল প্রমাণ দিয়াও, ইহা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,

"Still, as the case stands at present, this little rift within the lute is not to be disguised nor overlooked." এবং এই স্থলেই ডারউইনের বিবর্ত্তবাদের "Weak point" বলিয়াছেন। অধ্যাপক Kollikerও ইহাকে প্রধান আপত্তি মনে করেন। যথা—

"Great weight must be attached to the objection brought forward by Huxley, otherwise a warm supporter of Darwin's theory, that we know of no varieties which are sterile with one another, as is rule among sharply distinguished animal forms."

অধ্যাপক Huxley ও এই আপত্তির গুরুত্ব অনুভব করিয়া বলিয়াছেন যে "The weight of this objection is obvious." সুতরাং যতদিন ইহা পূর্ণরূপে প্রমাণিত না

হইতেছি, তত দিন এ আপত্তি থাকিবেই। শশি বাবু যাহাই বলুন, তত দিন আমরাও বলিব যে, বিবর্ত্তবাদ ইহার "সন্তোষপ্রদ" উত্তর দিতে পারেন্ নাই।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ আপত্তি প্রায় একই প্রকারের। মূলতঃ আপত্তি এই যে, প্রাণীতে যখন প্রথম কোন পরিবৃত্তি (variation) দেখা দেয়, সে পরিবর্ত্তনেরও ঠিক্ কারণ নির্দ্দেশ করিতে, বিবর্ত্তবাদ সন্তোষপ্রদরূপে, পারেন না। অবশ্য পরিবর্ত্তন কিছু বিনা কারণে spontaneously হয় না, ইহা সত্য বটে। ডারউইন্, ব্যাহ্যিক নানাবিধ ক্রিয়া, অবস্থা, জলবায়ু ও খাদ্য প্রভৃতিকেই প্রধানতঃ কারণ বলিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সরও এই গুলিকেই প্রধানতঃ কারণ বলেন। ইহা অংশতঃ ঠিক্ হইলেও, অনেকে ইহাকে যথেষ্ট কারণ বলিতে চান না। তাই আমরা ইহাকেও "সন্তোষপ্রদ" কারণ বলিতে পারি নাই। প্রত্যেক দেহই এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার শক্তি বহন করে, ইহাতে কাহারই আপত্তি নাই। হক্সলি বলেন,

"In neither case is it possible to point out any obvious reason for the appearance of the variety."

তিনি আরো বলেন যে,—

"Varieties arise we know not why." "Indeed there seems to be in many instances a *prepotent* influence about a newly variety what gives it an unfair advantage over the normal descendants."

মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেন্সরও বাহ্য অবস্থা ও শক্তি প্রভৃতিকেই মোটামোটি কারণ বলিয়াও, বলিতেছেন যে,—

"There must have been a *tendency* to variation."

তিনি আরো বলেন যে,—

"We are still *in the dark* respecting those mysterious properties which make the germ, when subject to fit influences, undergo special changes beginning this series of transformations."

যদিও বাহ্য-অবস্থা, আহার প্রভৃতিকেই তিনি প্রথম কারণ বলিয়াছেন এবং ইহা হইতেই যে পরিবৃত্তি সুরু হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে repeated হইতে হইতে, ক্রমে একজাতি রূপে consolidated হইয়া পড়ে, এই কথা প্রধানতঃ বলিয়াছেন, তথাপি ইহাই যে সন্তোষজনক উত্তর নহে, তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। এই জন্যই, ডারউইন বলিয়াছেন যে,—

"Our ignorance of the law of *variation* is profound."

আবার এমন অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পরিবর্ত্তন হইল বলিয়াই, প্রাণীর জীবন ধারণ সম্ভব হইল। সে পরিবর্ত্তন, সেই প্রাণী স্বয়ং উৎপাদন করে নাই। ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "অধ্যাত্ম ধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ" পুস্তকের ৯৬ ও ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শশি বাবু যাহাই বলুন, এ আপত্তি দুইটী অসঙ্গত আপত্তি নহে।

আরও একটী কথা আছে। ডারউইন্ এই পরিবৃত্তির কারণকে মোটামোটি বাহ্য শক্তি ও খাদ্যাদিকে মাত্র স্থির করাতে, আর একটী অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়িতেছে। সেই দিক্‌টী দেখিলে, এই আপত্তিকে আরো গুরুতর বলিয়া মনে না হইয়া পারে না। সেই অনিবার্য্য দিক্‌টীর ব্যাখ্যা, অধ্যাপক হক্সলি করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক হক্সলি দেখাইয়াছেন যে, ডারউইনের সিদ্ধান্তে এ কথা আইসে না যে, যদিও ঐ পরিবৃত্তি (variation) সেই জাতির বা তাহার পূর্ব্বপুরুষের প্রয়োজনে লাগিয়াছিল,

তথাপি ইহা যে তাহার কেবল উপকার বা উন্নতি সাধনের জন্যই হইয়াছিল, ইহা মনে করা ভুল। হক্সলি এই পরিবৃত্তির বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,—

"If better, it will tend to supplant the parent stock ; if worse, it will tend to be extinguished by the parent stock."

এতত্ত্বে ক্রমশঃ উন্নতির কথা পাওয়া যাইতেছে না। তবে যে উন্নত হইয়া পড়িয়াছে, উহা আগন্তুক (accidental মাত্র। অধ্যাপক হক্সলি বলেন যে, –

"It appears to us to be of the many peculiar merits of that hypothesis that it involves no belief in a necessary and continual progress of organisms."

কেবল ইহাই নহে। একটী জাতি যে জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া আছে, ইহার অর্থই এই যে, সঙ্গে সঙ্গে আরো কত শত জাতি, ইহার অভ্যুদয়ের জন্য, জাতি-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া মরিয়া গিয়াছে। ডারউইনের বিবর্ত্ত-বাদে এইটী কম গুরুতর কথা নহে।

"Organisms vary incessantly ; of these variations, *the few* meet with surrounding conditions which suit them and thrive ; *the many* are unsuited and become extinguished."

সুতরাং ক্রমে এই যে পরিবর্ত্তনপ্রবাহ জগতে চলিতেছে, ইহা অন্ধশক্তির ক্রিয়া মাত্র। ইহা যে কোন এক উন্নত-উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া, জীবের মঙ্গলের জন্য, ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা নহে। ডারউই-নের thoryর অর্থ ইহাই।

হিন্দুদর্শন পরিবৃত্তি মানেন, কিন্তু এরূপ অন্ধপরিবৃত্তি মানেন না। এই জন্যই আমরা বিবর্ত্তবাদের পরিবৃত্তির কারণে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। অবশ্য, ইহা আমাদের নিজের কথা। কেহ যদি আমাদের এ মন্তব্য না গ্রহণ করেন, তাঁহাতে ক্ষতি নাই। আমরা এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে, এরূপ বিবর্ত্ত-বাদ না মানিলেও, হিন্দুদর্শনকে বিবর্ত্ত-বাদের বিরোধী বলা যায় না। আবার, এরূপ পরিবৃত্তি মানেন না বলিয়া, একথা বলাও সঙ্গত নহে যে, হিন্দুদর্শন সঙ্কীর্ণ প্রজ্ঞা-বাদের (Teleology) পক্ষপাতী। হিন্দু-দর্শন সেরূপ প্রজ্ঞাবাদও মানেন না। সুতরাং special creation যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, হিন্দুদর্শনে সূক্ষ্মশরীরের কথা থাকিলেও, সেরূপ special creation স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু এ সকল কথা বলিবার ইহা স্থান নহে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বিবর্ত্তবাদের পূর্ব্বোক্ত অংশগুলি না মানিতে পারিলেও হিন্দুদর্শন বিবর্ত্তবাদের বিরোধী নহে। মিসেস্ য়্যানি বেসান্ত ইউরো-পীয় বিবর্ত্তবাদে বিশ্বাস করেন, অথচ তিনি হিন্দুদর্শনও মানেন।

"It is not that the man is descended from animal *as such*, that is the Western blunder" (Building of the cosmos).

আবার তাঁহার "Evolution of life" নামক গ্রন্থে বলেন যে,

"Do not fall into the mistake of the Western way of thinking and say that the man descends from the animal ; that is not true. It is only a fragment of truth."

আমাদের প্রসিদ্ধ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেন যে, "এমন একদিন আসিবে, যে দিন বিজ্ঞান অধ্যাত্মতত্ত্বের নিকটে যাইয়া বলিবে যে, 'আমি তোমারই অঙ্গমাত্র"। তাই বলিতেছিলাম যে, বিবর্ত্তবাদের সর্ব্বাংশ মানিতে না পারিলেও, বিবর্ত্তবাদকে লোকে গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে বিদ্রূপ করিবার আবশ্যকতা ছিল না।

এক বিশ্বব্যাপী পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তি ব্রহ্ম-চৈতন্য বিশ্বে বর্ত্তমান। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির স্বরূপ প্রকাশের জন্যই তাঁহার বিশ্বসৃষ্টি। হিন্দুদর্শন বলে, জ্ঞানই জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশ করিতে গিয়া, নিজেরও

স্বরূপ প্রকাশ করে। আমরা কথাটা বুঝাইবার জন্য, একটু ঘুরাইয়া বলিতেছি। জ্ঞেয়মাত্রেই, জ্ঞানেরই স্বরূপ অংশতঃ প্রকাশ করে, সূচিত করে। এই স্বরূপ বুঝাইবার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে; সেই স্তরই "জাতি"। যদ্দ্বারা যতটুকু, জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করা আবশ্যক, ততটুকুই তাহার প্রয়োজন। এই আত্মস্বরূপের প্রকাশ রূপ প্রয়োজন আছে বলিয়াই পরিবৃত্তি হয়। কেননা, পরিবৃত্তি না হইলে, জ্ঞানের অন্য স্বরূপগুলি প্রকাশিত হইবে না। একথা, এবং ডারউইনের পরিবৃত্তি, যাহা অন্ধভাবে বহুজাতির ধ্বংস সাধন করিয়া, কতকগুলি জাতিকে বিনা উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাইতেছে,—ইহা এক কথা নহে। এক অন্ধশক্তি বা শক্তিনিচয়, জীবের প্রয়োজন হউক্ বা না হউক্, ক্রমাগত পরিবৃত্তি উৎপাদন করিতেছে। যদি তাহা বাহ্যাবস্থার অনুকূল হয়, প্রাণী বাঁচিবে ও উন্নতও হইতে পারে। আর যদি প্রতিকূল হয়, প্রাণী মরিবে। ইহা ডারউইন্ বলেন। হিন্দুদর্শন বলেন, এক পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির ক্রম-প্রকাশের জন্যই পরিবৃত্তি। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সমষ্টি (accumulations) একত্র হইয়া যে জাতীয় পরিণাম ঘটিল, সেই জাতি, সেই জ্ঞানও শক্তির কতকগুলি স্বরূপ বুঝাইয়া দিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। পশুপক্ষী অপেক্ষা, মনুষ্যের ক্রিয়াকলাপেও ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার আরও স্পষ্টরূপে অনেকগুলি স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। অন্য লোকে যাইয়া মানুষ আরো অধিকতররূপে, আরো উন্নত ভাবে, তাহারই অন্য স্বরূপ বুঝিবে। এইরূপে ক্রমে উন্নত জীব ও ক্রমে উন্নত রূপে সেই স্বরূপের বিকাশ। এই উদ্দেশ্যেরই অপর নাম ঈশ্বরের "সঙ্কল্প"। নতুবা সংকল্প অর্থ "special creation" এর idea নহে। পরমাণুতে এমন শক্তি নিহিত আছে যে, তাহা ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবে পরিণত হইয়া, তদ্দ্বারা সেই পূর্ণজ্ঞানকেই প্রকাশ করিতে থাকিবে। যাহা হউক্, এ সকল কথা, এ প্রবন্ধের পক্ষে তত প্রাসংগিক নহে।

আমাদের যাহা বক্তব্য, আমরা বলিলাম। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকে, তিনি ইহা গ্রহণ না করিতে পারেন। কিন্তু আমরা আপত্তিগুলির উল্লেখ করিয়া, তিরস্কারের যোগ্য অপরাধ করিয়াছি কি না, তাহা পাঠকই বিচার করিবেন।

পরিশেষে, আমরা আর একটী মাত্র কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। হিন্দুদর্শন প্রবাহরূপে "জাতির" নিত্যতা স্বীকার করেন। এইরূপ নিত্য "জাতি" স্বীকার করিলেই, তাহা যে বিবর্ত্তবাদের বিরোধী হয় কেমন করিয়া, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। জাতির অভিব্যক্তির মূলে "ঐশ-সংকল্পকে" নিহিত দেখিলেও, তাহা বিবর্ত্তবাদের ঠিক্ বিরোধী হইতে পারে না। বেদান্তের যাহা নাম-রূপ, সাংখ্যের তাহাই জাতি ও ব্যক্তি। পূর্ণজ্ঞানময় পুরুষের সংযোগে, প্রকৃতি জাতি হইতে ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এ কথাও যাহা, বেদান্তের প্রত্যেক নামরূপের মূলে ঐশ-সংকল্পও তাহাই। বিষয় একই, কেবল শব্দভেদ মাত্র। প্রকৃতি, জাতি হইতে ক্রমে ব্যক্তিতে পরিণত হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ বর্ত্তমান। অধ্যাপক সলি (Sully) যাহাকে Emperical Idealist বলিয়াছেন, সাংখ্য

ও বেদান্ত তাহাই। ইহা যে বিবর্ত্তবাদের বিরোধী হইতে পারে না, সলিও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"The Emperical idealist can accept and give a meaning to the doctrine of Evolution as formul ating the order of sensations, actual and possible, of conscious minds."

সাংখ্যের "জাতি" কি? মনে কর, একটী উদ্ভিদদেহে প্রথমতঃ একটী সামান্য পরিবৃত্তি দেখা দিল। এই পরিবৃত্তি পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতে হইতে, কালে একটী বিশেষ জাতিতে পরিণত হইল। এই সকল ব্যক্তিগুলি, যাহাদের প্রত্যেকেতে এই পরিবৃত্তি-লক্ষণ বর্ত্তমান আছে, উহাদের "সমষ্টি"কেই জাতি বলে। সাংখ্যমতে, এই নবোৎপন্ন জাতীয়-বীজের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ বর্ত্তমান। এই জ্ঞানময় পুরুষের বর্ত্তমানতা বুঝাইবার জন্য বেদান্ত তাহার নাম দেন "ঐশ-সংকল্প"। এই অভিব্যক্তি কিরূপে বিবর্ত্তবাদের বিরোধী হইতে পারে, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। বরং প্রতি জাতির মূলে পুরুষ বর্ত্তমান, এ কথা বলাতে, একটী গুরুতর মীমাংসার সিদ্ধান্ত হয়। কিরূপে প্রাণীদেহে প্রথমে "জ্ঞান" উৎপন্ন হয়, এবং ক্রমে তাহা কিরূপেই বা ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ জ্ঞানে পরিণত হয়, বিবর্ত্তবাদ তৎসম্বন্ধে নীরব।

"The dawn of the first confused *feeling* is as much a mystery as the genesis of a *distinct* sensation."

যদি বলা যায়, জ্ঞান প্রকৃতির প্রত্যেক স্তরের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান; কেবল বিকাশের তারতম্যানুসারে, জ্ঞানেরও তারতম্য মাত্র,—ইহা স্বীকার করিলে. বিবর্ত্তবাদ বরং সহজ হয়। এ সম্বন্ধে সলি কি বলেন শুনুন্ঃ—

"We may no doubt avoid this difficulty (*i.e.* genesis of feelling) by assuming that all material processes down to the vibration of individual atoms are accompanied with a mode of feelling." আবার "the hypothesis of the uniform correlation of the physical and the mental enables us to assign an element of actuality (mental life) to the remote periods (in which there existed no mind to experience sensations).

হিন্দুদর্শন পুরুষ ও প্রকৃতিকে একসঙ্গে দেখাতে এবং প্রকৃতির প্রতিবিকাশকে সেই পুরুষেরই জ্ঞানদ্বার মাত্র বলাতে, বিবর্ত্তবাদের এ তত্ত্ব উত্তম মীমাংসিত হইয়াছে। জাতি কি? জাতি একটী আদর্শ বা ideal; ইহা মিথ্যা পদার্থ নহে। যাহা "জাতি" তাহা ব্যক্তির সাধারণ-ধর্ম্মেরই মাত্র সমষ্টি নহে, বিশেষ ধর্ম্মেরও সমষ্টি। এই জাতি বা সমষ্টি বীজ যদি মিথ্যা হয়, তবে ঈশ্বরও মিথ্যা হইয়া পড়েন। ব্যক্তির যাহা বস্তুত্ব, তাহাই উহার জাতি। এ জাতি যে নিত্য, তাহা অধ্যাপক Seth তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "Ethical Principles"নামক পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। শশি বাবু তাহাকে অনিত্য বা মিথ্যা বলিলে চলিবে কেন?

"The Empericist who subordinates *ideal* to the *actual*, who sees in the actual (ব্যক্তি) the only real and in the whole (জাতি) only the sum of the parts. The ideal or potential is not simply what the actual is not, it is also the prophecy and gurantee of what in its essence it is."

সুতরাং শশি বাবু যাহাই বলুন্. আমরা দেখিতেছি, "জাতির" নিত্যতা স্বীকার করিলে, এবং প্রতি জাতির অভিব্যক্তির মূলে পুরুষকে বা ঐশ-সংকল্পকে দেখিলে, তাহা বিবর্ত্তবাদের বিরোধী হয় না; বরং বিবর্ত্তবাদ বুঝিতে আরো উত্তমরূপে সাহায্য করে। "special creation এবং "ঐশ-সংকল্পকে" এক মনে করাতেই বোধ হয় শশি বাবু এই ভ্রমে পড়িয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ মনুষ্যকে এক

"অজ্ঞেয়ের" রাজ্যে উপনীত করে। একথা শশি বাবু বলেন। কিন্তু শশি বাবু ইহাও বলেন যে, "মাভৈঃ, তাই বলিয়া ধর্ম্ম ও নীতির রাজ্য অন্তর্হিত হইবে না। পাঠক জানেন যে, এ কথার সঙ্গতি নাই। অধ্যাপক সেথ্ তাঁহার গ্রন্থে এ কথার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বলিতেছেন যে,

"Agnosticism, if it is true, must carry with it the ultimate disappearance of religion, and with religion, of all morality higher than utility."

সুতরাং যাঁহারা কেবল বিবর্ত্তবাদ ধরিয়া অজ্ঞেয়ের রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের উচ্চ ধর্ম্ম ও নীতি কেবল কথার কথা মাত্র। সেথ্ ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং আমরা তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাই না। ধর্ম্ম ও নীতির মূলসূত্র চাহিতে গেলে, এক পূর্ণজ্ঞানময়, প্রেমময় জলন্ত পুরুষে বিশ্বাস করিতে হয় এবং সেই পূর্ণ পুরুষের মধ্যে, এই প্রকৃতিকে ও মনুষ্যকে দেখিতে হয়। জড়জগৎ যেমন সেই পূর্ণ শক্তিকেই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করে, প্রাণীরাজ্য যেরূপ সেই পূর্ণজ্ঞানকেই ক্রমে প্রকাশ করে, তদ্রূপ এই মানবরাজ্য সেই পূর্ণ প্রেমময়কেই প্রকাশ করে। সর্ব্বনিম্ন হইতে সর্ব্বোচ্চ বিকাশ পর্য্যন্ত, সেই পূর্ণতা প্রাপ্তিরই চেষ্টা। তিনিই পূর্ণ আদর্শ। জড়রাজ্য, প্রাণীরাজ্য,—ক্রম-উচ্চ স্তর দিয়া সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। উভয় রাজ্যের সহিতই তাঁহার নিত্য-সম্বন্ধ আছে। তিনি নিঃসম্বন্ধ পৃথক্ অজ্ঞেয় পদার্থ নহেন। তিনিই পূর্ণ আদর্শ, নিত্য-সত্য। প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া সেই পূর্ণতা প্রকাশের জন্যই অনন্তকাল ক্রিয়াশীল।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

যাঁহারা অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ, জগতের পাপী তাপী জীবকুলের ভবযন্ত্রণা নির্ব্বাপিত করিয়া, তাহাদিগকে পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন করিতেছে, যাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত বিমোহিত, সেই প্রবীণ পণ্ডিত পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পবিত্র জীবনের কথা জানিতে কাহার না আগ্রহ হয়? কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মহাত্মার জীবনের সকল কথা জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে ও বিশ্বস্ত সূত্রে তাঁহার জীবনের যে অংশটুকু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা অদ্য ভক্তমণ্ডলীর কর-কমলে উৎসর্গ করিলাম।

নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই বৈষ্ণব ও গৌরভক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-পদে অচল ভক্তি ছিল। এক দিবস অহোরাত্র কীর্ত্তন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য মীনকেতন রামদাস গোস্বামী তাঁহাদের বাটীতে আগমন করেন। কৃষ্ণদাসের ভ্রাতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতি সুদৃঢ় ভক্তি থাকিলেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে কিছু দ্বিধা ছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কথা লইয়া রামদাস গোস্বামীর সহিত তাহার বাদানুবাদ হয়। ভ্রাতার এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে কৃষ্ণদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। এই সময়

স্বপ্নযোগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম গমন করেন। এ বিষয় তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দরাম॥
দণ্ডবত হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হনু চমৎকার॥
* * * *
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবন যাহ তাহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥
এত বলি প্রেরিল মোরে হাতছানি দিয়া।
অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়া বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥

কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট অবস্থান করিয়া, শ্রীদাস, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহোদয়গণের নিকট কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ও ভক্তি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং সাধন ভজন শিক্ষা করেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নামক এক মহাকাব্য ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের সারঙ্গরঙ্গদা নামক এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য দর্শনে একান্ত প্রীত হইয়া বৃন্দাবনবাসী মহান্তগণ "কবিরাজ" এই উপাধিতে তাঁহাকে বিভূষিত করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কবিরাজ গোস্বামীর শেষ বয়সের রচনা। শ্রীবৃন্দাবনধামের মহান্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের পাঠ ও ব্যাখ্যা বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিতেন। চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর শেষ লীলার বিস্তার বর্ণনা না থাকায়, হরিদাস পণ্ডিত, গোবিন্দ গোস্বামী, যাদবাচার্য্য, ভূগর্ভ গোস্বামী, চৈতন্যদাস গোস্বামী, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহান্তগণ, কবিরাজকে মহাপ্রভুর শেষ লীলা বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন; এই সময় কৃষ্ণদাস অশীতিপর বৃদ্ধ। এ প্রাচীন বয়সে তাঁহাদ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে ছিল না। কিন্তু তাঁহা দ্বারা সম্পাদনের সম্ভাবনা না থাকিলেও মহান্তগণের অনুরোধ না পালন করিলে নয় ইত্যাদি নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণদাস তদীয় আরাধ্য দেব শ্রীমদনগোপাল জীউর শরণাপন্ন হইলেন। এই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদন গোপাল গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥
দর্শন করিয়া কৈনু চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করেন চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু কণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞা মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাহাতে করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥

তখন শ্রীমুরারী গুপ্ত কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, শ্রীপরমানন্দ দাস কবিকর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল ইত্যাদি

গ্রন্থ ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহান্তগণ হইতে মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার সুদীর্ঘকাল অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে ১৫৩৭ শকাব্দাতে এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হয়। গ্রন্থের সমাপ্তি কাল সম্বন্ধে গ্রন্থ শেষেই লেখা আছে—

শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যোহসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধীয় এক বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শুধু মহাপ্রভুর শেষ লীলা বলিয়া নয়, আদ্য ও মধ্য লীলার যে যে অংশ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভালরূপ বর্ণনা করেন নাই, সেই সব অংশ অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরী, ন্যায়াচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতির সঙ্গে মহাপ্রভুর বিচার, রায় রামানন্দের সঙ্গে ভক্তি কথার আলোচনা, রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর শিক্ষা দান ইত্যাদি বর্ণনাতেও পাণ্ডিত্যের একশেষ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত-সন্দর্ভ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, গরুড় পুরাণ, কূর্ম্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, আদি পুরাণ, বরাহ পুরাণ, নৃসিংহ পুরাণ, মনুসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, গোবিন্দ লীলামৃত, গীত গোবিন্দ, উত্তর চরিত, উজ্জ্বল নীলমণি, দানকেলী কৌমুদী, পদ্যাবলী, পঞ্চদশী, কৃষ্ণকর্ণামৃত, নারদ পঞ্চরাত্র, গৌতমীয় তন্ত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, জগন্নাথ বল্লভ নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের বহু শ্লোক প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। শেষ লীলা বর্ণনাতে মহা প্রভুর প্রেমোন্মাদ ও আরাধ্য আরাধক সম্বন্ধে যে সকল ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতি নিগূঢ় ভক্তি ও প্রেমরসাত্মক। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কি বলিব! কি ভাবের গভীরতায়, কি দার্শনিক তত্ত্বে, কি ভক্তি ব্যাখ্যায়, কি প্রামাণিকতায়, ইহা বঙ্গ ভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। ভাগবতগণ প্রত্যহ ফুল চন্দন দ্বারা যে গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকেন; রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভবধামের অমৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াও যে গ্রন্থের সম্যক্ প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই মহাগ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোন ক্রমেই সাধ্যায়ত্ত নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা করেন। এক চরিতামৃত ভিন্ন ভাষা গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস এই গ্রন্থে নিজের দৈন্য যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। গ্রন্থের প্রায় স্থলেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ও প্রতি অধ্যায়ের শেষে নিজ ইষ্টদেবতার বন্দনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে নিজের দীনতা ও বৈষ্ণব মহান্ত এবং শ্রোতৃবৃন্দের প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিলে আর চক্ষের জল রাখা যায় না—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপীষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যে তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয়-যে তার পাপ হয়॥

মূর্খ [illegible] মুক্তি বিষয় লালচ।
বৈষ্ণব [illegible] শ্রী[illegible]লে করি এতেক সাহস॥

* * *

যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরি সবার চরণে॥

* * *

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
সে সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুইয়া করি মুক্তি পানে॥

জয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু! ধন্য তাঁহার "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক! আর ধন্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামী! বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার মর্ম্ম তুমি যথার্থই বুঝিয়াছিলে।

কৃষ্ণদাস অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। অতি প্রাচীন বয়সে, আশ্বিন মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে তিনি লোক-লীলা সম্বরণ করেন। অদ্যাপি তাঁহার কুটীর ও সমাধিস্থল বিদ্যমান আছে, তিনি কোন্ সময়ে কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পিতা ও মাতার নাম কি ছিল, কোন্ শকে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন, এবং তাঁহার রচিত আর কোন গ্রন্থ আছে কি না, ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে অথবা বিশ্বস্তরূপে কিছুই জানিতে পারি নাই। শুধু অনুমান বা প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে সাহসী হইলাম না। কেহ কেহ বলেন, চরিতামৃত ১৫০৩'শকে রচিত হয়। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, প্রেম বিলাস গ্রন্থে আছে, শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন, তখন সেই সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আনিয়াছিলেন। পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থ সকল অপহৃত হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়া বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী শোকে দুঃখে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু নানা কারণে প্রক্ষিপ্তাংশ পরিপূর্ণ প্রেম বিলাসের এই কথা আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীগোপাল চম্পূ গ্রন্থ ১৫১০ শকে রচিত বলিয়া উক্ত গ্রন্থেই লেখা আছে। চরিতামৃতে যখন গোপালচম্পূর নাম উল্লেখ দেখা যায়, তখন চরিতামৃত যে গোপালচম্পূর পরে রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গোপালচম্পূ রচিত হওয়ার অনেক পূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্য বৈষ্ণব গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন করেন। এমতাবস্থায় ঐ সঙ্গে চরিতামৃত আনয়ন, পথে অপহরণ, তৎশ্রবণে কবিরাজের মৃত্যু ইত্যাদি কথা একান্তই অযৌক্তিক। বিশেষতঃ কবিরাজ গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ শ্রীনিবাস আচার্য্য আনয়ন করেন নাই। তাহা বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে ছিল; অদ্যাপি সেই স্থানেই আছে।

কৃষ্ণদাস নিজের কোন বিশেষ পরিচয় না দিলেও, অথবা অন্য কোন গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তার জানিতে না পারিলেও, তাঁহার শ্রীগোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য, সারঙ্গরঙ্গদা-টীকা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁহাকে চির-দিন বিদ্বৎ-সমাজে পরিচিত রাখিবে ও ভাগ-বতগণের গৃহে চরিতামৃতের সঙ্গে তাঁহার নাম নিত্য গন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ।*

(শ্রীম-কথিত)

ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীযুক্ত অধরলাল সেনের বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ ঠাকুর অধরের বাড়ী আসিয়াছেন, ২২শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা ৪র্থী তিথি, শনিবার, ইংরাজী ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খৃঃ অঃ। ঠাকুর পুষ্যা নক্ষত্রে আগমন করিয়াছেন।

রাখাল, শরৎ, দেবেন্দ্র, সান্যাল, মাষ্টার অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল গান করিতেছিলেন।

অধর ভারি ভক্ত, তিনি ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট। বয়ঃক্রম ২৯।৩০ বৎসর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন। অধরেরও কি ভক্তি! সমস্ত দিন আফিসের খাটুনির পর, মুখে ও হাতে একটু জল দিয়াই, প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার বাড়ী শোভাবাজার—বেনেটোলা, সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুরের কাছে গাড়ী করিয়া যাইতেন। এইরূপে প্রত্যহ ২।৩ টাকা গাড়ী ভাড়া দিতেন। কেবল ঠাকুরকে দর্শন করিবেন,এই আনন্দ। তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিবেন,এমন সুবিধা প্রায়ই হইত না। পৌঁছিয়াই ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন; কুশল প্রশ্নাদির পর মেজেতে মাদুর পাতা থাকিত, সেখানে বিশ্রাম করিতেন। ঠাকুর নিজেই তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিতেন। অধরের শরীর পরিশ্রম জন্য এত অবসন্ন থাকিত যে, তিনি অল্পক্ষণ মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইতেন। রাত্রি ৯।১০ টার সময় তাঁহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইত। তিনিও উঠিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আবার গাড়ীতে উঠিতেন। তৎপরে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেন।

অধর, ঠাকুরকে প্রায়ই শোভাবাজারের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। ঠাকুর গেলেই উৎসব পড়িয়া যাইত। অধর, ঠাকুর ও ভক্তদের লইয়া খুব আনন্দ করিতেন ও নানারূপে তাঁহাদিগকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছেন, অধর বলিলেন, আপনি অনেক দিন এ বাড়ীতে আসেন নাই, ঘর মলিন হয়ে ছিল, যেন কি এক রকম গন্ধ হয়ে ছিল; আজ দেখুন ঘরের কেমন শোভা হয়েছে! আর কেমন একটী সুগন্ধ হয়েছে, আমি আজ ঈশ্বরকে ভারি ডেকেছিলাম। এমন কি, চোক দিয়ে জল পড়েছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'বল কি গো!' এবং অধরের দিকে সস্নেহে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

আজও উৎসব হইবে। ঠাকুরও আনন্দময় ও ভক্তেরাও আনন্দে পরিপূর্ণ; কেন না, যেখানে ঠাকুর উপস্থিত, সেখানে ঈশ্বরের কথা বই আর কোনও কথা হইবে না। ভক্তেরা আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবার জন্য আজ অনেকগুলি নূতন নূতন লোক আসিয়াছে। অধর নিজে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি তাঁহার কয়েকটী বন্ধু ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন ও বলিবেন, যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কি না?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন, এমন সময় অধর কয়েকটী বন্ধু লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

অধর। (বঙ্কিমকে দেখাইয়া, ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বই টই লিখেছেন। আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন। ইঁহার নাম বঙ্কিম বাবু।

* প্রথম ভাগ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, মূল্য ১৲টাকা। ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্তে)। বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম। (হাসিতে হাসিতে)। আর মহাশয়! জুতোর চোটে! (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

[বঙ্কিম ও রাধাকৃষ্ণ;—যুগলরূপের ব্যাখ্যা]

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। প্রেমে বেঁকে গিয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণ রূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে। রাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কালো কেন জান? আর চৌদ্দোপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে করে তুল্‌লে আর কালো থাকে না। তখন খুব পরিষ্কার, শাদা। সূর্য্য দূরে আছে বলে খুব ছোট দেখায়। কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক্ জান্‌তে পারলে আর কালোও থাকে না, ছোটও থাকে না। সে অনেক দূরের কথা। সমাধিস্থ না হ'লে হয় না। যতক্ষণ আমি তুমি আছে, ততক্ষণ নামরূপও আছে। তাঁরই সব লীলা। আমি তুমি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তিনি নানারূপে প্রকাশ হন।

"শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি। আদ্যাশক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগল মূর্ত্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। তাঁদের ভেদ নাই। পুরুষ, প্রকৃতি না হলে থাক্‌তে পারেন না। প্রকৃতিও পুরুষ না হলে থাক্‌তে পারেন না। একটী বল্‌লেই আর একটী তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। তাই যুগল মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে ও শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌরবর্ণ, বিদ্যুতের মত। তাই কৃষ্ণ পীতাম্বর পরেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বরণ নীল মেঘের; তাই শ্রীমতী নীলাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী নীলকান্তমণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পায়ে নুপুর, তাই শ্রীকৃষ্ণও নুপুর পরেছেন। অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরে বাহিরে মিল।"

এই কথাগুলি সাঙ্গ হইল, এমন সময় অধরের বঙ্কিমাদি বন্ধুগণ পরস্পর ইংরাজীতে আস্তে আস্তে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে বঙ্কিমাদির প্রতি) কি গো! আপনারা ইংরাজিতে কি কথাবার্ত্তা কর্‌ছো? (সকলের হাস্য)

অধর। আজ্ঞে, এই বিষয় একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে বঙ্কিমাদির প্রতি)। একটা কথা মনে পড়ে, আমার হাসি পাচ্ছে। শুন একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছে, এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটী (damn) ড্যাম্ বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম্ বল্‌লে, এর মানে কি এখন বল। সে লোকটী বল্লে, আরে তুই কামা না, ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস্। নাপিত সে ছাড়বার নয়। সে বল্‌তে লাগ্‌ল, ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম্, আমার বাবা ড্যাম্, আমার চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য) আর ড্যাম্ মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্, তোমার চৌদ্দো পুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য) আর শুধু ড্যাম্ নয়। ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্, ড্যাড্যাম্ ড্যাম্। (সকলের উচ্চ হাস্য)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও প্রচারকার্য্য]

সকলের হাস্য থামিলে পর বঙ্কিম আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

বঙ্কিম। মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) প্রচার! ও গুলো অভিমানের কথা। মানুষত ক্ষুদ্র জীব, প্রচার তিনিই করবেন; যিনি চন্দ্রসূর্য্য

সৃষ্টি ক'রে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা! তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাচ্ছ; ঐ দুদিন লোকে শুনবে। তার পর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি! যতক্ষণ তুমি বল্‌বে, ততক্ষণ লোকে আহা ইনি বেশ বল্‌ছেন। তুমিও থাম্‌বে, তারপর কোথায় কিছু নাই।

"যতক্ষণ দুধের নীচে আগুনের জাল রয়েছে, ততক্ষণ দুধটা ফোঁস্ করে ফুলে উঠে। জালও টেনে নিলে,—আর দুধও যেমন তেমনি, কমে গেল।"

"আর নিজের শক্তি সাধন করে, বাড়াতে হয়। তা না হ'লে প্রচার হয় না। আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে!' আপনারই শোবার জায়গা নাই, আবার ডাকে, ওরে শঙ্করা,আয় আমার কাছে শুবি আয়!"

"ওদেশে * হালদার পুকুরের পাড়ে রোজ বাহ্যে করে যেতো; লোকে সকালে এসে দেখে গালাগালি দিত। রোজ গালাগাল দেয়, তবুও বাহ্যে আর বন্ধ হয় না। শেষে পাড়ার লোকে দরখাস্ত করে, কোম্পানিকে জানালে। তারা একটা নোটিস্ মেরে দিলে——"এখানে বাহ্যে প্রস্রাব করিও না, তা করিলে শাস্তি হবে।" তখন একবারে সব বন্ধ! আর কোনও গোলযোগ নাই! কোম্পানীর হুকুম সকলের মান্‌তে হবে।"

"তেমনি ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন, তবেই প্রচার হয়, লোকশিক্ষা হয়, তা না হলে কে তোমার কথা শুন্‌বে?"

এই কথাগুলি সকলে গম্ভীর ভাবে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, কত বই লিখেছ, আপনি কি বলো—মানুষের কর্ত্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?

বঙ্কিম। পরকাল! সে আবার কি?

হাঁ জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না, পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে ফিরে আস্‌তে হবে—কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে।

"জ্ঞানলাভ হলে, ঈশ্বরদর্শন হলে, মুক্তি হয়ে যায়, আর আস্‌তে হয় না। সিধোনো* ধান পুত্‌লে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেউ হয়, তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার করতে পারে না—তার তো কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি নাই! সিধোনো ধান আর ক্ষেতে পুত্‌লে কি হবে?

বঙ্কিম। (হাসিতে হাসিতে) মহাশয়, তা আগাছাতেও তো কোন গাছের কাজ হয় না—ফল হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানী তা'বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে—লাউ, কুমড়ো ফল নয়। তার পুনর্জ্জন্ম হয় না; পৃথিবী বল, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক কোন জায়গায় তার আস্‌তে হয় না।

"উপমা † একদেশী। তুমি পণ্ডিত, ন্যায় পড়ো নাই? বাঘের মত ভয়ানক বল্লে, যে বাঘের মত একটা ন্যাজ, কি হাঁড়ী মুখ থাকবে তা নয়! (সকলের হাস্য)।

"আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম, কেশব জিজ্ঞাসা করলে; মহাশয়, পরকাল কি আছে? আমি না-এদিক, না উদিক, বল্লাম। বল্লাম, কুমোররা হাড়ী শুকো দেয়—তার ভিতর পাকা হাঁড়ীও আছে, আবার কাচা হাঁড়ীও আছে। কখনও কখনও গরুটরু এসে রাস্তার হাঁড়ী মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ী ভেঙ্গে গেলে কুমোর সে গুলোকে ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ী ভেঙ্গে গেলে সেগুলি কুমোর আবার ঘরে আনে, এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নূতন গড়ন করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বল্লুম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে, কুমোর

* ওদেশে—ঠাকুরের জন্মস্থান কামার পুকুরে-হুগলি জেলা।

* সিধোনো ধান—যে ধান অগ্নিতে সিদ্ধ।

† উপমা একদেশী—*Vide* chapter on Analogy, Inductive Logic.

ছাড়্‌বে না—যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বরদর্শন [illegible]। গো ! কুমোর আবার চাকে দেবে, (হাসিতে) ।—অর্থাৎ ফিরে এ সংসারে আস্‌তে [illegible]কলেস্তার নাই। তাঁকে লাভ ক'রলে তবে কা[illegible] হয়, তবে কুমোর ছাড়ে ; কেন না, তাঁর দ্বারা মায়ার সৃষ্টির কোন কাজ আসে না। জ্ঞানী মায়াকে পার হয়ে গেছে—সে আর মায়ার সংসারে কি করবে?

"তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন মায়ার সংসারে—লোক শিক্ষার জন্য। জ্ঞানী লোক শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যা মায়া আশ্রয় করে থাকে। সে তাঁর কাজের জন্য তিনিই রেখে দেন। যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বঙ্কিমের প্রতি) আচ্ছা আপনি কি বলো, মানুষের কর্ত্তব্য কি ?

[বঙ্কিম, শুধু পাণ্ডিত্য ও কামিনীকাঞ্চন]

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)। আজ্ঞে, তা যদি বলেন, তা হলে, আহার নিদ্রা ও মৈথুন !

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। এহ ! তুমি তো বড় ছ্যাঁচ্‌ড়া ! তুমি যা রাত্‌ দিন্‌ করো ; তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে ! লোকে যা খায়, তার ঢেঁকুর উঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর উঠে ! ডাব খেলে ডাবের ঢেঁকুর উঠে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রাত্‌ দিন্‌ রয়েছো ; আর ঐ কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্চে ! কেবল বিষয় চিন্তা ক'রলে পাটয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বর চিন্তা করিলে সরল হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে ? যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে, পাণ্ডিত্য কি হবে ? যদি কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে ?

"চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর ! 'পণ্ডিত' অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, শোলক ঝাড়্‌তে পারে, কি বই লিখেছে, কিন্তু মেয়ে মানুষে আসক্ত, টাকা, মান সারবস্তু মনে করেছে ; সে আবার পণ্ডিত কি ? ঈশ্বরে মন না থাকলে পণ্ডিত কি ?

"কেউ কেউ মনে করে, এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করছে, পাগলা ! এরা বেহেড্‌ হয়েছে ! আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি—টাকা, মান, ইন্দ্রিয়-সুখ ! কাকও মনে করে, আমি বড় স্যায়না, কিন্তু সকাল বেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে ! কাক দেখো না, কত উড়ুড় পুড়ুর করে, ভারি স্যায়না। (সকলে নিস্তব্ধ)।

"যারা কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা করে, যারা বিষয়ে আসক্তি, কামিনীকাঞ্চনে ভালবাসা চলে যাবার জন্য রাত্‌ দিন প্রার্থনা করে, যাদের বিষয় সব তেঁতো লাগে, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাদের স্বভাব যেমন হাঁসের স্বভাব। যেমন হাঁসের সমুখে দুধে জলে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে ! আর হাঁসের গতি দেখেছো ? এক দিকে সোজা চলে যাবে। শুদ্ধ ভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। সে আর কিছু চায় না—তার আর কিছু ভাল লাগে না।

(বঙ্কিমের প্রতি, কোমলস্বরে) আপনি কিছু মনে কোরো না।

বঙ্কিম। আজ্ঞা, মিষ্টি শুন্‌তে আসিনি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কামিনীকাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া—ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে, দেয় না। দু একটী ছেলে হ'লে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই ভগিনীর মত থাকতে হয়—তার সঙ্গে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তাহলে দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে, আর স্ত্রীধর্ম্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বর আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী শুনবেনই শুনবেন—যদি আন্তরিক হয়।

"আর 'কাঞ্চন'। আমি পঞ্চবটীর *

* পঞ্চবটী——৺রাসমণির কালীবাড়ীতে পঞ্চবটীর তলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ অনেক সাধন-তপস্যা করিয়াছেন। অতি নির্জ্জনস্থান—সহজেই ঈশ্বর উদ্দীপন হয়

তলায় গঙ্গার ধারে বসে 'টাকা মাটী,' টাকা মাটী, 'মাটীই 'টাকা,' টাকাই মাটী, বলে জলে ফেলে দিস্লুম'।

বঙ্কিম। টাকা মাটী! মহাশয়, চারটে পয়সা থাক্‌লে একটা গরীবকে দেওয়া যায়! টাকা যদি মাটী তা হ'লে দয়া, পরোপকার করা হবে না?

[বঙ্কিম, 'জগতের উপকার,' ও কর্ম্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। দয়া? পরোপকার? তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরের উপকার করো? মানুষের এ্যাতো নপর চপর, কিন্তু যখন ঘুমায় তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয় তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়! তখন অহংকার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়!

"সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে হয়। আর গ্রহণ করতে পারে না। থুথু ফেলে থুথু আবার খেতে নাই। সন্ন্যাসী যদি কারুকে কিছু দেয়, সে নিজে দেয় মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কি দয়া করবে? 'দান' টান সবই রামের ইচ্ছা। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে, বাহিরেও ত্যাগ করে। যে গুড় খায় না, তার কাছে গুড় থাকাও ভাল নয়। গুড় থেকে, যদি সে বলে 'গুড় খেও না' তো লোকে শুনবে না।

"সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে। কেন না মাগ ছেলে আছে। তাদের সঞ্চয় করা দরকার, মাগ ছেলেদের খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না, কেবল 'পঞ্ছী আউর্ দরবেশ' অর্থাৎ পাখী আর সন্ন্যাসী। কিন্তু পাখীর ছানা হলে, সে মুখে করে খাবার আনে—তারও তখন সঞ্চয় করতে হয়। তাই সংসারী লোকের টাকার দরকার।—পরিবার ভরণপোষণ করতে হয়।"

"যে শুদ্ধ ভক্ত, সেরূপ সংসারী লোক অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করে। কর্ম্মের ফল—লাভ, লোকসান—সুখ দুঃখ—ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে; আর কিছু চায় না। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম—অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম্ম নিষ্কাম করতে হয়; তবে সন্ন্যাসী বিষয়কর্ম্ম সংসারীদের মতন করে না।"

"সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কারুকে দান করে, সে নিজেরই উপকারের জন্য নয়; 'পরোপকারের' জন্য নয়। সর্ব্বভূতে হরি আছেন, তাঁরই সেবা করা হয়। হরিসেবা হলেই নিজেরই উপকার হলো। তুমি করলে না বলে তার কাজ আটকাবে না। 'পরোপকার' নয়। এই সর্ব্বভূতে হরির সেবা, শুধু মানুষে নয়, জীব জন্তুর মধ্যেও হরির সেবা, যদি কেও করে, আর যদি সে মান্ চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের ভিতর সেবা করছে, তাদের কাছ থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না—এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তা হ'লে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটী পথ। কিন্তু বড় কঠিন—কলিযুগের পক্ষে নয়।

"তাই বল্‌ছি যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম্ম করে, 'দয়া', 'দান,' করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল এ ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, বাপ মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য করেচেন। বাপ, মার ভিতর যা স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া, নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোনও সূত্রে তাঁর কাজ করেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।

"তাই জীবের কর্ত্তব্য কি? আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া; আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেই জন্য ব্যাকুল হয়ে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

[তিনিই বস্তু, আর সব অবস্তু।]

"শম্ভু বলেছিল, আমর ইচ্ছে যে খুব কতকগুলো ডিস্পেন্সারী, হাঁসপাতাল করে দিই, তা হ'লে গরীবদের অনেক উপকার হয়। আমি বল্লুম, "হাঁ অনাসক্ত হয়ে যদি এ সব করো ত মন্দ নয়। তবে ঈশ্বরের

উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার, অনেক কাজ জড়ালে, কোন দিক্ থেকে আসক্তি এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না; মনে করছি নিষ্কাম ভাবে করছি, কিন্তু হয়তো যশের ইচ্ছা হয়ে গেছে, নাম বার করবার ইচ্ছা হয়ে গেছে। আবার বেশী কর্ম্ম করতে গেলে, কর্ম্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। আরো বল্লুম, শম্ভু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎ-কার হন, তাহলে তুমি তাঁকে চাহিবে? না কতক গুলো ডিস্‌পেন্সারী বা হাঁসপাতাল চাইবে! তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরির পানা পেলে, আর আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না।

"যারা হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্সারী করবে, আর ঐতেই আনন্দ করবে, তারাও ভাল লোক, কিন্তু থাক্ আলাদা। যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না; বেশী কর্ম্মের ভিতর যদি সে পড়ে, সে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর কৃপা করে, আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও; তা না হলে, যে মন তোমাতেই নিশি দিন লেগে থাক্‌বে, সেই মন বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে! সেই মনে বিষয় চিন্তা করতে হচ্ছে! শুদ্ধ ভক্তের থাক্ একটী আলাদা থাক্। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু, এ বোধ না হলে শুদ্ধ ভক্তি হয় না। এ সংসার অনিত্য, দুই দিনের জন্য, আর এ সংসারের যিনি কর্ত্তা তিনিই সত্য, নিত্য, এ বোধ না হলে শুদ্ধ ভক্তি হয় না।"

ক্রমশঃ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

রূপরাগ।

(১)

আশৈশব দরিদ্রের সামান্য ভবনে,
লালিত হইতেছিনু প্রফুল্লিত মনে;
দুঃখ কি ছিল না কিছু? ছিল বটে দুখ
ছিল সে শত্রুর মত, নিতান্ত বিমুখ,
শিবব্রত পরায়ণা আছিল ধীরতা
বিস্তারিয়া মা'র মত প্রগাঢ় মমতা।

(২)

সহসা জীবন-পথে অলি গুঞ্জরিয়া
আনিল মাধুর্য্যময়ী উষারে ডাকিয়া;

(৩)

দেখিলাম শুধু রূপ কিবা জ্যোতির্ম্ময়!
কিবা স্নিগ্ধ! কিবা রম্য! চারুতা আশ্রয়!

(৪)

যৌবন-প্রণয়-প্রাণে নৈবেদ্য রচিয়া—
দিলাম দেবতাপদে উৎসর্গ করিয়া।

(৫)

মেঘ ছেড়ে সৌদামিনী এসেছিল ভুলে,
চ'লে গেল রহস্যের গুপ্ত দ্বার খুলে।
নীরদের দূতিগণ খুঁজিতে তাহায়,
এসে প'ল চারিভিতে প্রবল বন্যায়:
একটুকু আলো ছিল দরিদ্র কুটীরে,
সেটুকু মিশিয়া গেল নিবিড় তিমিরে।

(৬)

এখন যে ধৈর্য্য নাহি, নাহি সে সন্তোষ,
নাহি সেই অন্নতায় মহা পরিতোষ।

(৭)

বক্ষমাঝে শব্দমাম, হতেছে স্পন্দন,
লেগে আছে মর্ম্মচক্ষে রূপের অঞ্জন,
হৃদয় জাগিয়া দেখে রূপের স্বপন,
গাঢ়তম অন্ধকারে জীবন মগন।

(৮)

রূপরেখা হ'তে মুক্তি পাবে না হৃদয়?
আঁধার খসিয়া কহে—'এ জীবনে নয়'
বিদ্রূপের তীব্র হাসি দৈন্য হাসি কয়,
রূপরাগ জন্মান্তরে চিত্তে জেগে রয়।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

বঙ্গবধূ।

অভিশপ্ত বাঙ্গালীর বিষাক্ত জীবনে
কে ঢালে শান্তির বারি? কার আগমনে
নন্দন-কুসুম ফুটে আঁধার সংসারে?
ধৈরযে ধরিত্রীসম, বিপদে কল্যাণী;
করুণার মন্দাকিনী, চির প্রেমময়ী,
চির স্নেহ পূর্ণ প্রাণ। বিজন বিপিনে,
অরণ্য কুসুমসম কে থাকে ফুটিয়া
ক্ষুদ্র গৃহ-কোনা মাঝে? চির বহমান
কার চিত্তে সন্তোষের অমৃত নির্ঝর?
বিপদ কণ্টকাকীর্ণ শুষ্ক মরুভূমে
কে দেয় পাতিয়া বক্ষ অম্লান অন্তরে?
নীরবে, অচলসম কে সহে দাঁড়ায়ে
অত্যাচার, অবহেলা! কার কাম্য শুধু
সংসারের সুমঙ্গল? অয়ি বঙ্গ বধূ।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

মাইকেল মধুসূদনের সমাধি স্তম্ভ দর্শনোপলক্ষে।

প্রণম, প্রণম, সখে, এ সমাধি স্থলে
বাঙ্গালীর মহাতীর্থ সম্মুখে তোমার ;
মহানিদ্রাবৃত ওই মর্ম্মরের তলে
শ্রীমধুসূদন কবি ; ঝঙ্কার যাহার
মন্ত্রমুগ্ধ গৌড়জন শুনিলা সাদরে
মুগ্ধ-বৃন্দাবন যথা বাঁশরীর স্বরে।
বঙ্গভাষা—হৃদয়ের শোণিতের সনে
কত কথা, কত ব্যথা, নৈরাশ্য দারুণ
মরীচিকা মায়া মুগ্ধ 'আশার ছলনে'
সুচঞ্চল প্রতিভার কাহিনী করুণ
ও মর্ম্মরে লেখা আছে স্তরে স্তরে স্তরে ;—
লেখা আছে স্তরে স্তরে জ্বলন্ত অক্ষরে—
বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কবি নষ্ট হতাদরে
তারি স্মৃতিস্তম্ভ ক্ষুদ্র মর্ম্মর প্রস্তরে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩০। বুয়র যুদ্ধ। ৺ কালীপ্রসন্ন দত্ত প্রণীত, মূল্য ১৲। বুয়রযুদ্ধের ইতিহাস লেখাই যেন এই মহাত্মার জীবনের শেষ কার্য্য ছিল ; উহা সমাপ্ত হওয়ার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। নব্য-ভারতের পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, এই কার্য্যে তিনি কি অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত পাঠে সকলেই মোহিত হইয়াছেন। নব্যভারতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাদে ৬৮ পৃষ্ঠা-ব্যাপী পরিশিষ্টে এই যুদ্ধ সম্বন্ধীয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য বহু কথা উক্ত হইয়াছে। কালী-প্রসন্ন বাবুর স্বর্গারোহণে কয়েকটী বালিকা-সহ তাঁহার পত্নী নিরাশ্রয় হইয়াছেন ; কোন সংস্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানা কারণে এই পুস্তক সম্বন্ধে অধিক কথা লিখিতে আমরা সঙ্কুচিত ; কিন্তু এ কথা না লিখিয়া পারি না যে, এই গ্রন্থ যাঁহারা ক্রয় করিবেন, একটী নিরাশ্রয় পরিবারকে তাঁহাদের সাহায্য করা হইবে। দয়ার অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই ; পাঠকগণ কৃপা করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

৩১। বাণী। শ্রীরজনীকান্ত সেন প্রণীত, মূল্য ॥০ ; শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহ। রজনী বাবুর সরস লেখা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। একটী নমুনা এই—

"কোলের ছেলে, ধুলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস নে মা, ধুলো কাদা মেখেছি ব'লে।
সারা দিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত, গিয়াছে চ'লে।
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) পড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে।
কেউ তো আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার এল ঘিরে ;
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে।

৩২। বাল্মীকি চরিত। গীতি-নাট্য ; শ্রীঅম্বিকাচরণ বসু কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ।৵০। মহাজনের কথা যেরূপেই ব্যক্ত হউক, পাষাণ সদৃশ হৃদয়ও তাহাতে বিগলিত হইয়া থাকে। আমাদের তাহাই হইয়াছে। লেখকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

৩২। ভাগ্যলক্ষ্মী। প্রবন্ধ পুস্তক। শ্রীহরিনাথ মিত্র, প্রণীত মূল্য ॥৵০। ৪৭টী ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে পদ্যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এত সংক্ষেপে গুরুতর বিষয় সকল অভিব্যক্ত হইয়াছে যে, বিষয়ের সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা হয় নাই। প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু খুব সরল ভাবে ব্যক্ত হয় নাই।

৩৩। গান। শ্রীবিহারিলাল সরকার। মূল্য ॥০। বিহারিলালের গদ্য রচনার পূর্ব্বে আমরা অনেক প্রশংসা করিয়াছি ; পদ্যেও তিনি সিদ্ধহস্ত, ইহার পরিচয় এই প্রথম পাইলাম।

"কাজ কি গো তন্ত্র মন্ত্রে,—কাজ কি গো সাধনে ?
হরিই বলো, কালীই বলো,—ডাকা চাই একমনে ;
তাই বলি, প্রাণ খুলি, বল কালী বদনে ;
মনে রেখো অধিকার,—ব্যভিচার করো না।"

এইরূপ জমাট-ভাবময় উদার সঙ্গীত পাঠে আমরা যারপরনাই তৃপ্তি পাইলাম।

৩৪। অভিষেক-গীত। ভারত-সম্রাটের অভিষেকোপলক্ষে রচিত। রাজ-ভক্তির উচ্ছ্বাস ইহার প্রতি পংক্তিতে অভিব্যক্ত।

৩৫। আজগুবি গল্প। শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল প্রণীত ; মূল্য ।৵০। এইরূপ গল্প পাঠে লোকের যে কোন উপকার হইতে পারে, আমাদের সে ধারণা নাই।

৩৬। বিবিধ সঙ্গীত। পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ; শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ৵০। মনোমোহন বাবু ভাবুক, সুগায়ক, স্বদেশানুরাগী, বিশ্বাসী ব্যক্তি। তাঁহার রচিত সঙ্গীত সমূহে তাঁহার হৃদয়ের ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

৩৭। শান্তি-সুধা। ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য ।/০।

৩৮। জ্ঞানকুসুম। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৵১০। প্রথম খানি গদ্যে ; দ্বিতীয় খানি পদ্যে লিখিত। পুস্তক দুই খানি বালকদিগের জন্য লিখিত। বিশেষত্ব কিছু নাই।

৩৯। চরিত্র-গঠন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত ; মূল্য ॥০। নানা পত্রিকা এবং গ্রন্থকারের সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ সংগ্রহে এই সুন্দর পুস্তকখানির কলেবর ভূষিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত কিরূপে হইল, বুঝিলাম না। প্রণয়নের অর্থ সংগ্রহ নহে, জ্ঞানেন্দ্র বাবুর ইহা জানা উচিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের ছাত্রগণ দিন দিন যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র হইয়া উঠিতেছে, এইরূপ পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই মঙ্গল। সংগ্রহ সুন্দর হইয়াছে।

৪০। আভাষ। কুমার শ্রীসুরেশচন্দ্র দেববর্ম্মা প্রণীত, স্বাধীন ত্রিপুরা। কলিকাতার মহর্ষির বাড়ী যেরূপ বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর, পূর্ব্ব বঙ্গের স্বাধীন ত্রিপুরা বঙ্গভাষা প্রচলনে তেমনি উৎসাহান্বিত। এই জন্য মহর্ষির বাড়ী এবং স্বাধীন ত্রিপুরা আমাদের নিকট বড় আদরের জিনিস্। বঙ্গের, এবং তৎসহ ভারতের ভাবী উন্নতির মূল শক্তি, জাতীয় ভাষার উন্নতিতে নিবদ্ধ ; এই কাজে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহারাই দেশের প্রকৃত বন্ধু। এদেশে একটী রাজ্য আছে ; যেখানে রাজভাষা বঙ্গভাষা। সে দেশ স্বাধীন ত্রিপুরা। এই কারণে স্বাধীন ত্রিপুরা বঙ্গের গৌরব। আমরা মনোযোগ সহ আভাষ পড়িলাম, লেখকের সকল কথার সহিত মিলিতে পারি নাই, কিন্তু এ কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ হয়, রাজপরিবারের অনেকেই যে বঙ্গভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সচেষ্ট, এই গ্রন্থ তাহার নিদর্শন। বিধাতা স্বাধীন ত্রিপুরাকে এবং তৎসহ কুমারগণকে আশীর্ব্বাদ করুন,—তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল হউক।

৪১। কয়েকখানি পত্র। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ, প্রণীত মূল্য ৷৵০। পত্রে অনেক সদুপদেশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িয়া সকলে সুখী হইবেন।

৪২। খাঁটুটার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী। ৺ বিপিনবিহারি চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিতের যত্নে সংগৃহীত, মূল্য ৩৲। খাঁটুরা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তক খানি গবেষণা পূর্ণ।

৪৩। অরুণ। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। দেবকুমার, দেবশিশু, কাব্য-রাজ্যের অনিন্দিত স্ফুট কুসুম। দেব কুমারের ভাষা ভাল, রুচি ভাল, শিল্পনৈপুণ্য ভাল ;—কিন্তু বয়সে তিনি শিশু,—এই জন্যই বুঝিবা অনুকরণে তাঁহার আসক্তি বড় বেশী। মৌলিকতার রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে স্বাধীনতাকে অবলম্বন করিতে হইবে। তিনি স্বদেশী ব্যক্তি, তাঁহার নিকট অনেক আশা রাখি, এই জন্য এই কথা বলিলাম। তাঁহার অনেক কবিতায় অনুকরণের গন্ধ পাইলাম। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল। কি সুন্দর কবিতা তিনি লিখিতে জানেন, পাঠক দেখুন।

"তোমরা ত সুধাওনি মোরে
তবু কেন গাহি এত গান!
কেন তবে মিছে ঘুম ঘোরে
মোর প্রেম করি শত খান?
যত গাহি তত কাঁদে প্রাণ,—
মনে হয়, বুঝানো গেল না!
যত কাঁদি বাড়ে অভিমান ;
হায় সখি, একি বিড়ম্বনা! ইত্যাদি।

ডাক্তার রামদাস সেন। (১)

রামদাস বাবু একটী সম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ ব্রজবল্লভ সেনের আদিম নিবাস পূর্ব্ববঙ্গের ইদিলপুরে। ইদিলপুরের কুলীন কায়স্থেরা পূর্ব্ববঙ্গে বিখ্যাত। পূর্ব্বে ইদিলপুর বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। তখন পদ্মা ইদিলপুরের পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। এখন পশ্চিম দিয়া বহিতেছে। তাই ইদিলপুর এখন ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মে একাগ্রতার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ চিরবিখ্যাত। এত মুসলমান বাঙ্গালার কুত্রাপি নাই। খ্রীষ্টিয়ানের সংখ্যাও অসামান্য। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্য পূর্ব্ববঙ্গের। হিন্দুধর্ম্মের দুর্গ এখন পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত। ধর্ম্মে একাগ্রতার সহিত বিষয়বুদ্ধির প্রখরতা পূর্ব্ববঙ্গের লোকে অদ্ভুতরূপে মিলাইতে পারিয়াছে। রামদাস বাবুর পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে এই দুইটী গুণ যুগপৎ বিরাজিত ছিল। তিনি নিজেও এই দুইটী গুণের অসামান্য অধিকারী ছিলেন।

ব্রজবল্লভ তিনটী সন্তান লইয়া ইদিলপুরে বাস করিতেন। পুত্রগণের শিক্ষার জন্য তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া তিনি সস্ত্রীক বালুচরে বাস করেন। তখন মুরসিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী। গুণের আদর রাজধানীতে। এবং মুরসিদাবাদ জাহ্নবীতটে। গঙ্গাবাস ও উপার্জ্জনের উপায়, পুত্রগণের শিক্ষা ও দীক্ষা, ধর্ম্ম ও অর্থ, ব্রজবল্লভকে মুরসিদাবাদে আকর্ষণ করে। সে অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে। নবাব মুরসিদ্ কুলী খাঁ হিন্দু বাঙ্গালীদিগকে রাজ-সরকারে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার উত্তরাধিকারী নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ গুণানুসারে হিন্দু মুসলমান অভেদে সকলকেই গ্রহণ করিতেন। সেই সময়ে রাজ সরকারে চাকরি পাইবার প্রত্যাশায় অনেক হিন্দু মুরসিদাবাদে উপস্থিত হন। ব্রজবল্লভের শিক্ষা ও বিষয়-বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তিনিও মুরসিদাবাদে আসিয়াছিলেন। বালুচরে ইদিলপুরের একটী লোক বাস করিত।

এই সময় রাজ্য বিনাশ ও রাজ্য গঠনের সময়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৫ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে সাত জন নবাব বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পাঠান রাজত্ব অন্তিমকালে প্রলয়ের ঘূর্ণচক্রে ঘুরিতে থাকে। আজি যে শিখরে দেশে, কাল সে গভীর গহ্বরে। কালিকার লক্ষপতি আজ পথের ভিখারী। আজিকার কৃতদাস কাল রাজমন্ত্রী। এই বিষম সময়ে মক্কের মত কোন মনিষীর অভ্যুদয় হইলে বাঙ্গালার ইতিবৃত্তের রূপান্তর ঘটিত। দুর্ব্বল স্বার্থপর সারমেয়গণ আপনার লইয়াই ব্যস্ত হইল। বুদ্ধিমানের এই অবসর।

মুরসিদাবাদে ব্রজবল্লভের লক্ষ্মী লাভ ঘটে। তাঁহার তিন পুত্র, কৃষ্ণগোবিন্দ, কৃষ্ণকান্ত ও রামকান্ত উত্তমরূপে পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। নাম হইতেই বুঝা যাইবে যে, ব্রজবল্লভ পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন।

মুরসিদাবাদের এজেণ্ট ক্যালভার্ট সাহেবের অধীনে নিমকমহলের দেওয়ানী করিয়া কৃষ্ণকান্ত যথেষ্ট সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি লাভ

করেন। কলিকাতা বটতলা দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে তিনি একটী বাসভবন প্রতিষ্ঠিত করেন। উহা অদ্যাপি দেওয়ান বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণকান্ত ও রামকান্ত দুই ভাই নিঃসন্তান ছিলেন। কৃষ্ণকান্তের বিষয় সম্পত্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণগোবিন্দের ছয় পুত্র অধিকার করেন। তাঁহাদের নাম গুরুদাস, শিবপ্রসাদ, রাধামোহন, মদনমোহন, ভুবনমোহন ও লালমোহন। রামদাস কনিষ্ঠ লালমোহনের একমাত্র সন্তান।

দান ধর্ম্মে বহরমপুরের সেন পরিবার আজিকার ন্যায় চিরদিন প্রসিদ্ধ। রাধিকা বাবুর প্রাসাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণির মৃদঙ্গতালে গায়কের মধুর কীর্ত্তনে আজ যেমন নিনাদিত, চিরদিন এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। অতিথি বৈষ্ণব সাধু ও ভিখারীর কলরবে আজ যেমন কল্লোলিত, চিরদিন এরূপ হইয়া আসিয়াছে।

বালক পুত্র চৈতন্য চরণের মৃত্যুতে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রামদাসের জ্যেষ্ঠতাত রাধামোহন বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। তিনি বৃন্দাবনে বলদেব জীউর সেবা, একটী পান্থশালা ও কয়েকটী কূপ খনন করাইয়াছিলেন। রাধামোহন বাবুর কুঞ্জ এখনও বৃন্দাবনে বিখ্যাত। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে মহাভাগবত আখ্যান প্রদান করিয়াছিল। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্মে, মৃদঙ্গ বা সেতার বাজাইয়া ও কীর্ত্তন করিয়া বলদেব জীউর সেবায় তিনি জীবন পাত করিয়াছিলেন। লালা বাবুর বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রধানসহায় মহাভাগবত ব্রজবাসী রাধামোহন।

রামদাস বাবুর অপর জ্যেষ্ঠতাত ভুবন মোহনও দান ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সদাব্রত ও ধর্ম্মশালা অদ্যাপি বহরমপুরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

রামদাস বাবুর পিতা লালমোহন বিষয় বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই রসাল বৃক্ষের নাতি কোমল রসাল ফল রামদাস।

রামদাস বাবুর তিন বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য পুলিন বিহারী শৈশবে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করেন। পুলিন বিহারী অসাধারণ বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। রামদাসের পৈতৃক শক্তি বিষয়-বুদ্ধি পিতৃব্যের কর্ষণে বিলক্ষণ ব্যাকৃতি লাভ করিয়াছিল। সাহিত্যানুরাগ ডাক্তার সেনের বিষয়-বুদ্ধি সংযত করিয়াছিল। এবং সাহিত্য যশে তাঁহার সম্পত্তিশাসনের জ্যোতি ক্ষীণ করিয়াছিল। মুরসিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া,যশোহর, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, মেদিনীপুর ও দিনাজপুর জেলায় এবং কলিকাতা সহরে তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তি ছিল। এতদ্ভিন্ন পুলিন বাবুর মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র শ্রীবনবিহারীর বিস্তৃততর সম্পত্তির তাঁহাকে তত্ত্বাবধান করিতে হইত। বাঙ্গালা দেশে রামদাসের ন্যায় প্রজারঞ্জক জমীদার অল্পই ছিল। তাঁহার প্রজাগণ আপনাদিগকে রামরাজ্যের প্রজা বলিয়া পরিচয় দিত। ছোট লাট মেকেঞ্জী সাহেব তাঁহাকে মুরসিদাবাদের অলঙ্কার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার লিখিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় সদয় ভাবে প্রজাপালন অল্প জমীদারেই করিয়া থাকে। প্রজার সহিত মোকদ্দমা করিবার অপবাদ বহরমপুরের সেন বংশে কেহ কখন আরোপ করে নাই।

বহরমপুর দলাদলির জন্য এক সময়ে

বিখ্যাত ছিল। এক পক্ষে মহারাণী স্বর্ণময়ী, অপর পক্ষে সেন পরিবার। রাণী আর্ণাকালী সেন পরিবারের দলে ছিলেন। দলাদলির সময়ে সকল দেশেই এক দল লোক দেখা যায়, যাহারা আপন স্বার্থ লইয়াই কখন এদলে কখন ওদলে ঘুরিতেছে, আজ যাহাদের পদলেহন করিতেছে, কাল তাহাদের মুখে থুৎকার দিতেছে। লুণ্ঠন তাহাদের বৃত্তি, কুৎসা তাহাদের অস্ত্র। এই রবাহূত দলের সংখ্যা বহরমপুরে সামান্য নহে। দলাদলির অত্যাচার ও অনাচার ইহারাই ঘটায়, ইহাদের প্ররোচনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ সহজে ঘটে না। অথচ ইহারা এমন ভাবে বিচরণ করে যে, পক্ষান্তর গ্রহণ করা ইহাদের অনায়াস-সাধ্য।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর কালেজের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়ে। তখন লিভিংষ্টোন সাহেব প্রিন্সিপাল এবং বাবু নীলমণি গঙ্গোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক। লিভিংষ্টোন সাহেবের মত উদার হৃদয়, স্নেহশীল ও পরোপকারী সচ্চরিত্র ইংরাজ এ দেশে অল্পই দেখা গিয়াছে। কিন্তু অধ্যক্ষতা করিবার শক্তিশাসন কর্তৃত্ব তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। টাকার সুদ কসিয়া যে সময় টুকু অবশিষ্ট থাকিত, অভিধান আবৃত্তি করিয়া নীলমণি বাবু অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং কালেজ ও স্কুলের পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হইতে লাগিল। খাজানার আইন পাশ করিবার বিলম্ব এবং লক্ষ্ণৌর ক্যানিঙ্ কালেজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই প্রকার কুফলের কারণ বলিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ওদিকে মিষ্ট কথায় সাহেবকে ভুলাইয়া চোরেরা ছাত্রদের গ্রাসের অন্ন লুঠ করিতে লাগিল। ছাত্র সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। ব্যয়ভার খুব বেশী হইল। গবর্ণমেণ্ট বহরমপুর কালেজ উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। যদি কোন ব্যক্তি বা সভা কালেজের ভার লইতে চান, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কালেজ দিবেন, নতুবা কালেজ বন্ধ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় মন্দ নহে। দেশে শিক্ষা বিস্তার করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। এক দিন খুব বিচার হইয়াছিল, কি উপায়ে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে। দেশে মূর্খতা বিপদের কারণ। মূর্খ লোকে না বুঝিয়া দল বাঁধিয়া শান্তির বিঘ্ন ঘটায়। সিপাহিদের যদি বুঝিবার শক্তি থাকিত, তবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অসংখ্য পতঙ্গ অনলে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিত না। ভবিষ্য বংশকে সন্দেহের ভাগী করিয়া যাইত না। এখনও এদেশে শত করা নব্বই জন লোক নিরক্ষর। কেহ কেহ মনে করিতেন, উচ্চ শ্রেণীকে শিক্ষা দিলে তাহাদের দ্বারা নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষার বিস্তার হইবে। এরূপ বিস্তার অতি সামান্য এবং ব্যয় অনুসারে আয় অকিঞ্চিৎকর হয়। ফলে যাহারা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে পারে, তাহারা সাহায্য পায় এবং যাহারা পারে না, তাহারা সাহায্য পায় না। এজন্য উচ্চ শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করিয়া তাহাদের ব্যয়ের সাহায্য করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় না কমাইয়া নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় না কেন ? ইহারা বুঝেনা যে, বিদ্যাবিস্তারের ব্যয় অন্য সকল প্রকার ব্যয়ের ন্যায় শান্তিরক্ষা, যাতায়াতের সুবিধা বিধান ইত্যাদি ব্যয়ের ন্যায় দেশীয় লোক-

কেই বহন করিতে হয়। যদি এই সকল কার্য্যে ব্যয় ভার যুগপৎ বাড়িয়া যায়, কর ভারে দেশীয় লোক নিষ্পেষিত হইবে। অগত্যা উচ্চ শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করিয়া নিম্ন-শিক্ষাবিস্তারে ব্যয় বৃদ্ধি করাই যুক্তিসঙ্গত।

"কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী সুসঙ্গত নহে। এক এক জন শাসনকর্ত্তা এক একটী বিদ্যালয় গ্রাস করিয়া সাধারণের তাড়নায় নিরস্ত হন। আবার অন্যকে সেই অপ্রিয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তাড়না করিয়া সফল হইলে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তার প্রতি তাড়না বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বহরমপুর কালেজ উঠাইয়া দিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হ্যাণ্ড সাহেবের কর্ত্তৃত্বে কালেজের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে,লোকে রহস্য করিয়া বলিত"Where hand is the head how can a college perosper"? সে সময় রামদাস সেন কৃষ্ণদাস পালের সাহায্যে হিন্দু পেট্রিয়ট ও অন্যান্য পত্রিকায় এমন আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, কালেজ উঠাইয়া দিতে গবর্ণমেণ্টের সাহস হয় নাই। কিন্তু কালেজের পরিচালনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন সুব্যবস্থাও করেন নাই। কাণ্ডারীহীন ভগ্নতরীর ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া ছয় বৎসর পরে চড়ায় লাগিয়া বহরমপুর কালেজ চূর্ণ হইল।

হিল সাহেবের প্রমুখাৎ বহরমপুরের পাদরিরা কালেজের ভার লইতে চাহিলেন। মাননীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পরামর্শে মহারাণী স্বর্ণময়ী একা সমস্ত ভার লইতে স্বীকার করিলেন। সাধারণ লোকে কর্ত্তৃত্ব পাইবার লোভে চাঁদা করিয়া কালেজ লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দু এক বৎসর হিসাব করিয়া চালাইতে পারিলে কালেজ লাভের বস্তু হইবে, ইহাও অনেকে কল্পনা করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে ব্যবসায় উদ্দেশে কয়েকটী কালেজ স্থাপিত হইয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ী ভার না লইলে চাঁদায় যে কালেজ চলিত না, রামদাস বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকে অগ্রণী হইয়া সাধারণের পক্ষে প্রস্তাব করিতে এত পীড়াপীড়ী করিয়াছিল যে, বিষয়বুদ্ধির অল্পতা কি মানসিক দুর্ব্বলতা থাকিলে রামদাস তাহাদের মতে মত দিয়া মুরসিদাবাদে উচ্চশিক্ষার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন। মুরসিদাবাদের একজন গণনীয় লোক সে সময়ে ডাক্তারকে যে গুপ্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

২৫শে নবেম্বর, ১৮৮৬।

প্রিয় রামদাস,

স্থানীয় ব্যক্তিগণ বহরমপুর কালেজের ভার না লইলে গবর্ণমেণ্ট বহরমপুর কালেজ উঠাইয়া দিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। আমার বাড়ীতে যে সভা হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশানুসারে আমি এ বিষয়ে প্রার্থনা জানাইলে গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, স্থানীয় লোকে আপন বক্তব্য জানাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অবসর দিবেন এবং তাহাদের কথা না শুনিয়া সহসা কালেজের পরিচালন ভার হস্তান্তর করিবেন না। আমার ইচ্ছা ছিল, বহরমপুরের যাইয়া তোমার অভিপ্রায় জানিয়া আসিব। নানা কারণে পারিলাম না। সেখানে রোগের লাঘব হইয়াছে শুনিলেই আমি যাইব। ইতি মধ্যে মহারাণী কালেজের ভার লইবার জন্য উদার হৃদয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এই—

১। তিনি কালেজের বাড়ী ও হোষ্টেল চান।

২। লাইব্রেরী ম্যাপ জিনিষ পত্র সব চান।

৩। পাঁচজন ট্রুষ্টীর হাতে কালেজের পরিচালন ভার থাকিবে। জজ, কালেক্টর এবং মহারাণীর তিনজন প্রধান কর্ম্মচারী।

৪। কালেজ চালাইবার সমস্ত ভার এই পাঁচ জনের হাতে থাকিবে।

৫। স্কুল ইন্‌স্পেক্টার, শিক্ষা বিভাগীয় কোন কর্ম্মচারী বা দেশীয় আর কোন লোক কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করি যে, মহারাণী এই-রূপ সর্ত্তে কালেজ লন। তোমার মত আছে কি না? যদি তোমার মত না থাকে, তুমি কি প্রস্তাব করিতে চাও? সবিস্তারে তোমার অভিপ্রায় সোমবারের মধ্যে বা যত শীঘ্র পার আমাকে জানাইবে এবং তোমার পত্র ব্যবহার করিতে আমাকে অধিকার দিবে।

আর যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা কর জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাঁহার বা তাঁহা-দের লিখিত অভিপ্রায় পাঠাইবে। মিসন-রিরাও চেষ্টায় ফিরিতেছে।

তোমার ইত্যাদি—

চাটুবাদ বা প্ররোচনায় রামদাস সেন কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে কখন বিচলিত হন নাই। তিনি মহারাণীর প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। স্বর্ণময়ী কালেজের তিনিও একজন ট্রুষ্টী হইয়াছিলেন।

এখনও ডাক্তার রামদাস সেনের জীবন-চরিত লিখিবার সময় হয় নাই। যাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখন জীবিত আছেন বা সকল কথা প্রকাশ করিলে তাঁহাদের বা তাঁহাদের অন্তরঙ্গগণের হৃদয়ে ব্যথা জন্মিতে পারে। সাধ্যমত তাঁহাদের পরিচয় গোপন করিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য যত সাধন করিতে পারি-চেষ্টা করিব।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের একখানি পত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"মহাশয়, যদ্যপিও আপনকার সহিত আমার সাক্ষাদ্দর্শন নাই, তথাপি আপনকার যে দেশীয় ভাষার উপর নিতান্ত অনুরাগ, এবং এ লেখকের প্রতিও যে স্নেহ সম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ আছে, তাহা সে লোকমুখে সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকে। সেই হেতুই এ ব্যক্তি মহাশয়কে আপনার বর্ত্তমান দুরবস্থা এই ভরসায় জানাইতেছে যে, যদিও আপনি তাহাকে এ বিপদরূপ রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিতে অসম্মত হন, তবুও এ আবেদনপত্র তাহার পক্ষে অবমাননার কারণ হইবেক না।

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা। অদ্য ১॥০ দেড় বৎসর হইল, আমি নিজের এবং পরি-বারদিগের শারীরিক অসুস্থতা বশত, কাজ কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারি নাই। সাংসারিক ব্যয় অধিক, তন্নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত হইয়াছি, এবং মহাজনেরা যতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে কষ্ট দিয়াছে। এবং দিতেও ত্রুটি করিতেছে না, এমন কি, ২।১ জন আমাকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টাতেও আছে, এবং কেহ কেহ আমার যা কিছু সম্পত্তি ছিল, প্রায় সকলি বিক্রয় করিয়া লইয়াছে, আমি ভয়ে এক প্রকার গতি-হীন হইয়া রহিয়াছি, মহাশয় যদ্যপি ঋণরূপে ৬।৭ হাজার টাকা আমাকে পাঠাইয়া দেন, তবে যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হই, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। ঋণ পরিশোধ করিবার প্রণালী আপনকার হস্তে, হয়ত, বিচারালয় সম্পর্কীয় কার্য্য দ্বারা মহাশয় অতি অল্প-দিনের মধ্যেই উক্তটাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন, না হয় আমিও বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু দিয়া ২।৪ বৎসরে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে পারি, আপনকার প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় যে আমি কতদূর ব্যগ্রতার সহিত পথ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলাম, তাহা আপনিই বুঝিয়া দেখিবেন, ভরসা করি যে আপনি আমার এ প্রার্থনায় বিরক্ত হইবেন না; আর মহাশয় আমার বিপদ্তারক রূপ ধারণ করিলে আরও ২।১ জন হিতৈষী মহোদয়ের সহকারে এ বিপদজাল হইতে মুক্ত পাইতে পারি, কিন্তু মহাশয়, যদি আপনি

এজনের প্রতি সদয় হন, তবে যেন কালিদাসের মেঘদূতের কবিতাটী স্মরণ থাকে।"

নিঃশব্দোঽপি প্রদদাসি জলং যাচিতঃ চাতকেভ্যঃ।

ইতি ৩০ জানুয়ারী ১৮৭২।

নিঃ শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তস্য (সদর দেওয়ানি)

বঙ্গের প্রধান কবি দারিদ্র্যদায়ে দ্বারস্থ—কারাগরে যাইবার সময়ে ধনবান্ সহৃদয় রাম দাসের সাহায্যপ্রার্থী। একদিন রিচার্ড ষ্টীল আডিসনকে এইরূপ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সহৃদয় আডিসন ষ্টীলকে উদ্ধার করিবার জন্য তখনই নিজের বহু যত্নলব্ধ সর্ব্বস্ব ষ্টীলকে পাঠাইয়া দেন। দিবার পরে বন্ধুকে দেখিতে গিয়া দেখেন, সেই অর্থে বন্ধু যত অসৎ সহচর একত্র করিয়া সুরাপান, আমোদ ও নৃত্যে উন্মত্ত। তাঁহার সরলতাকে ষ্টীল প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন। শেষে আডিসন বেলিফ পাঠাইয়া ষ্টীলের নিকট প্রাপ্য আদায় করিয়াছিলেন। মাইকেলের বুভুক্ষা শান্ত করিতে অনেককেই প্রবঞ্চিত হইতে হইয়াছে। তাঁহাকে সাত হাজার টাকা ধার দিলে ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। জেল বাঁচাইতে সাহায্য করিয়া নিজে আবার জেলে দিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হইত না। সাত হাজার টাকা দান করাও রামদাসের সাধ্য ছিল না, দিলেও মাইকেলের ব্যভিচারের প্রসার ও জীবনশক্তির ক্ষুণ্ণতা সাধন করা হইত। রামদাস সাধ্য মত সাহায্য করিয়া উভয় সঙ্কটে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।
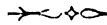
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।*

(শ্রীম-কথিত)

ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীযুক্ত অধরলাল সেনের বাটীতে ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে কথোপকথন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[আগে বিদ্যা না আগে ঈশ্বর।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। কেউ কেউ মনে করে, শাস্ত্র না পড়্‌লে, বই না পড়লে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জান্‌তে হয়, আগে সায়েন্‌স্ (Science) পড়তে হয় (সকলের হাস্য)। তারা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল! আগে Science না আগে ঈশ্বর?

বঙ্কিম। হাঁ, আগে পাঁচটা জান্‌তে

* প্রথম ভাগ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, মূল্য এক টাকা, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলিতে ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, প্রাপ্তব্য।

হয়, জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জান্‌বো কেমন করে। আগে পড়াশুনা ক'রে জান্‌তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওই তোমাদের এক! আগে ঈশ্বর তারপর তাঁর সৃষ্টি! তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয়ত সবই জান্‌তে পারবে।

"যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে পার যো সো করে, তা হলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে যদুমল্লিকের কখানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান, এও জান্‌তে পারবে। যদু মল্লিকই বলে দেবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ী ঢুকতে গেলে দরওয়ানরা যদি না ঢুকতে দেয়, তা হলে তার কখানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান, এসব ঠিক্ খবর কেমন করে জানবে? তাঁকে জানলে সব জানা যায়, কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বেদেও এ কথা আছে।

"যতক্ষণ না লোকটীকে দেখা যায়, ততক্ষণ তার গুণের কথা কওয়া যায়; সে যেই সাম্‌নে আসে, তখন ওসব কথা বন্ধ হয়ে যায়। লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়; তার সঙ্গেই আলাপ করে বিভোর হয়, তখন আর অন্য কথা থাকে না।

[মানুষ জীবনের এক উদ্দেশ্য (End of Life, ঈশ্বরলাভ।]

"আগে ঈশ্বরলাভ তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা।* বাল্মীকিকে রাম মন্ত্র যপ করতে দেওয়া হলো, কিন্তু তাকে বলা হলো তুমি 'মরা' 'মরা' যপ কর। 'ম' মানে ঈশ্বর আর 'রা' মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ। একৃকে জানলে সব জানা যায়। ১ এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে, অনেক হয়ে যায়। ১ কে পুঁছে ফেল্লে কিছুই থাকে না। ১কে নিয়েই অনেক। ১ এক আগে, তারপর অনেক, আগে ঈশ্বর তারপর জীব, জগৎ।

"তোমার দরকার ঈশ্বরকে লাভ করা। তুমি অতো জগৎ, সৃষ্টি, Science সায়েন্স এসব করছো কেন? তোমার আঁম খাবার দরকার, তোমার বাগানে কতশ আম গাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটী পাতা, এসব খবর তোমার কাজ কি? তুই আঁম খেতে এসেছিস্, আঁম খেয়ে যা! এ সংসারে মানুষ এসেছে ভগবান লাভের জন্যে, সেটী ভুলে নানা বিষয়ে মন দেওয়া ভাল নয়। আঁম খেতে এসেছিস আঁম খেয়েই যা।

বঙ্কিম। আম পাই কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আন্তরিক হলে তিনি শুনবে-নই শুনবেন। হয়তো এমন কোনও সৎ সঙ্গ জুটিয়ে দিলেন, যাতে সুবিধে হয়ে গেল। কেউ হয়তো বলে দেয়, এমনি এমনি করো, তাহলে ঈশ্বরকে পাবে।

বঙ্কিম। কে! গুরু! তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে, আমায় খারাপ আম দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন গো! যার যা পেটে সয়! সকলেই কি পোলওয়া কালিয়া খেলে হজম করতে পারে? বাড়ীতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পোলওয়া কালিয়া দেন না। যে দুর্ব্বল, পেটের অসুখ, তাকে মাছের ঝোল দেন; তা বলে কি মা সে ছেলেকে ভালবাসেন কম?

* আগে ঈশ্বর—"Seek ye first the kingdom of heaven and all other things shall be added unto you".—*Jesus.*

[উপায় – ব্যাকুলতা ; বালকের বিশ্বাস]

"গুরু বাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ—সচ্চিদানন্দই গুরু ; তাঁর কথা বিশ্বাস করলে—বালকের মত বিশ্বাস করলে, ঈশ্বর লাভ হয়। বালকের কি বিশ্বাস ! মা বলেছেন, 'ও তোর দাদা হয়' অমনি জেনেছে, 'ও আমার দাদা' একেবারে পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস ! তা সে ছেলে হয় তো বামুনের ছেলে, আর 'দাদা' হয় তো ছুতোর কামারের ছেলে ! মা বলেছে ও ঘরে জুজু ! তো পাকা জেনে আছে ও ঘরে জুজু ! এই বালকের বিশ্বাস ! গুরুবাক্যে এমন বিশ্বাস চাই ! স্যায়না বুদ্ধি, পাটয়ারি বুদ্ধি, বিচার বুদ্ধি, করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস, আর সরল হওয়া। কপট হলে হবে না। সকলের কাছে তিনি খুব সহজ—কপট থেকে তিনি অনেক দূর !

"কিন্তু বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও, কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, বলে 'না, আমি মার কাছে যাবো',—সেই রকম ঈশ্বরের জন্ম ব্যাকুলতা চাই। আহা ! কি অবস্থা ! বালক যেমন মা মা করে পাগল হয় ! কিছুতেই ভোলে না ! যার সংসারের এ সব 'সুখ' ভোগ আলুনি লাগে, যার আর কিছু ভাল লাগে না—টাকা, মান, দেহের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ,—যার কিছুই ভাল লাগে না, সেই আন্তরিক মা মা করে কাতর হয় ! তারই জন্তে মার আবার সব কাজ ফেলে দৌড়ে আস্‌তে হয় !

"এই ব্যাকুলতা ! যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব ; ব্রহ্মজ্ঞানী ;—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা ! তিনিতো অন্তর্যামী, ভুল পথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভাল পথে তুলে লন।, আর সব পথেই ভুল আছে—সব্বাই মনে করে আমার ঘড়ী ঠিক যাচ্চে কিন্তু কারু ঘড়ী ঠিক যায় না। তা বলে কারু কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে হয়তো সাধুসঙ্গ জুটে যায়—সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ী অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ত্রৈলোক্য গান করিতে লাগিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কীর্ত্তন একটু শুনিতে শুনিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান ও ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য হইলেন। একেবারে অন্তর্মুখ ; সমাধিস্থ। দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। সকলে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিম ত্রাস্ত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরের কাছে গিয়া এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তিনি সমাধি কখনও দেখেন নাই !

কিয়ৎক্ষণ পরে একটু বাহ্য হইবার পর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন—যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস মন্দিরে ভক্ত সঙ্গে নাচিতেছেন। মাঝে অদ্ভুত নৃত্য ! বঙ্কিমাদি ইংরাজী পড়া লোকেরাও দেখিয়া অবাক্। কি আশ্চর্য্য ! এরি নাম কি প্রেমানন্দ ! ঈশ্বরকে ভালবেসে মানুষ কি এত মাতোয়ারা হয় ! এইরূপ কাণ্ডই কি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ করেছিলেন ! এই রকম করেই কি তিনি নবদ্বীপে আর শ্রীক্ষেত্রে প্রেমের হাঠ বসিয়েছিলেন। এঁর ভিতর তো ঢঙ্ হ'তে পারে না। ইনি সর্ব্বত্যাগী এঁর টাকা মান, নাম বেরুনো কিছুরই দরকার নাই !

তবে এই কি জীবনের উদ্দেশ্য! কোনদিকে মন না দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসাই কি জীবনের উদ্দেশ্য! এখন উপায় কি? ইনি বল্লেন, মার জন্য দিশেহারা হয়ে ব্যাকুল হওয়া! ব্যাকুলতা, ভালবাসাই উপায়, ভালবাসাই উদ্দেশ্য! ঠিক ভালবাসা এলেই দর্শন হয়।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ও সেই অদ্ভুত দেবদুর্লভ নৃত্য ও কীর্ত্তনানন্দ দেখিতে লাগিলেন। সকলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের চারিদিকে, দণ্ডায়মান, আর একদৃষ্টে তাঁকে দেখিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। 'ভাগবতভক্ত ভগবান' এই কথা উচ্চারণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলের চরণে প্রণাম।

আবার সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[বঙ্কিম ও ভক্তিযোগ ; ঈশ্বরে প্রেম।]

বঙ্কিম (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়? ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐ যা বলেছি—ব্যাকুলতা। ছেলে যেমন মার জন্য, মাকে না দেখ্‌তে পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে, সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্যে কাঁদ্‌লে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

"অরুণোদয় হলে পূর্ব্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই। সেইরূপ যদি কারু ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে, ব্যক্তির ঈশ্বরলাভের আর বেশী দেরী নাই।

"একজন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মহাশয় বলে দি'ন্ ঈশ্বরকে কেমন্ করে পাব। গুরু বল্লে, এসো, আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তাকে সঙ্গে করে একটা পুকুরের কাছে নিয়ে গেল, দুজনেই জলে নাব্‌লো। এমন সময় হঠাৎ গুরু শিষ্যকে ধরে জলে চুবিয়ে ধর্‌লে। খানিক ক্ষণ পরে ছেড়ে দেবার পর শিষ্য মাথা তুলে দাঁড়ালো। গুরু জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিল! শিষ্য বললে, প্রাণ যায় যায় বোধ হচ্ছিল, প্রাণ আটু পাটু করছিল। তখন গুরু বল্লে, ঈশ্বরের জন্য যখন এইরূপ প্রাণ আটু পাটু করবে, তখন জানবে যে তাঁর সাক্ষাৎকারের আর দেরী নাই।

"তোমায় বলি, উপরে ভাস্‌লে কি হবে! একটু ডুব দাও! গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত পা ছুড়্‌লে কি হবে! ঠিক্ মাণিক ভারি হয়, জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। ঠিক্ মাণিক লাভ করতে হলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।

বঙ্কিম। মহাশয় কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে। (সকলের হাস্য) ডুবতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে স্মরণ করলে সব পাশ্ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কাল পাশ কাটে। ডুব দিতে হবে, তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শোন :—

(গান)।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে, পাবি রে প্রেম রত্ন ধন।
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি, হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে সদা অনুক্ষণ।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে, চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্, ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

ঠাকুর তাঁহার সেই দেবদুর্ল্ভ মধুর কণ্ঠে এই গানটী গাইলেন। সভাশুদ্ধ লোক আকৃষ্ট হইয়া একমনে এই গান শুনিতে লাগিলেন। গান সমাপ্তে আবার কথা আরম্ভ হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বঙ্কিমের প্রতি) কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে "ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে, শেষ কালে কি পাগল হয়ে যাব ?" যারা ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত,তাদের তারা বলে বেহেড্ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সব লোক এটি বোঝে না যে, সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর।

"আমি নরেন্দ্রকে * জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম। বলেছিলাম, মনে কর্ যে এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্, তুই কোন্খানে বসে খাবি ! নরেন্দ্র বল্লে, আড়ায় (কিনারায়) বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বল্লুম, কেন ? মাঝখানে গিয়ে ডুব দিলে কি দোষ ? নরেন্দ্র বল্লে, তা হলে যে রসে জড়িয়ে মরে যাব। তখন আমি বল্লুম, বাবা ! সচ্চিদা-নন্দরস তা নয়; এ রস অমৃতরস, এতে ডুব্লে মানুষ মরে না, অমর হয়।

"তাই বলছি ডুব দাও। কিছু ভয় নাই। তাঁতে ডুবলে অমর হয়।"

এইবার বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রণাম করি লেন—বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। কিগো ! তুমি আমায় কিরকম দেখ্লে ?

বঙ্কিম। মহাশয়, যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেছেন তত নয় ! একটী প্রার্থনা আছে—অনুগ্রহ করে কুটীরে একবার পায়ের ধূলা——

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা,সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

বঙ্কিম। সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে——

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কি গো ! কি রকম সব ভক্ত সেখানে ? যারা 'গোপাল, গোপাল' 'কেশব কেশব' বলেছিল, তাদের মতন কি ? (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত। মহাশয় গোপাল, গোপাল ও গল্পটী কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) তবে গল্পটী বলি শোন।

"এক জায়গায় একটী সেকরার দোকান আছে, তারা পরম বৈষ্ণব; গলায় মালা, তিলক-সেবা, প্রায় হাতে হরি নামের ঝুলি, আর মুখে সর্ব্বদাই হরি নাম। সাধু বল্লেই হয়, তবে পেটের জন্য সেকরার কর্ম্ম করা। মাগ ছেলেদের ত খাওয়াতে হবে। তারা পরম বৈষ্ণব; এই কথা শুনে অনেক খরিদ-দার তাহাদেরই দোকানে আসে, কেননা তারা জানে যে এদের কাছে সোণা, রূপোর গোলমাল হবে না। খরিদদার দোকানে গিয়ে দেখে যে মুখে হরিনাম করছে, আর বসে বসে কাজ কর্ম্ম কর্‌ছে। খরিদদার যাই গিয়ে বসলো, একজন বলে উঠ্লো "কেশব! কেশব! কেশব!"। খানিকক্ষণ পরে আর একজন বলে উঠ্লো "গোপাল! গোপাল! গোপাল!" আবার একটু কথাবার্ত্তা হতে না হতে আর একজন বলে উঠ্লো, "হরি, হরি, হরি।" গয়না গড়াবার কথা যখন এক রকম ফুরিয়ে এলো, তখন আর একজন বলে উঠ্লো "হর, হর হর, হর।" কাজে কাজেই ভক্তি প্রেম দেখে সেকরাদের কাছে টাকা কড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো—জানে যে এরা কখন ঠকাবে না।

"কিন্তু কথাটা কি জান ? খরিদদার

* নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ।

দোকানে আসার পর যে বলেছিল "কেশব, কেশব" তার মানে এই—এরা সব কে? অর্থাৎ যে খরিদদারেরা আস্‌লো এরা সব কে? যে বল্লে "গোপাল, গোপাল" তার মানে এই—এরা দেখ্‌ছি, গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বল্লে "হরি, হরি, হরি", তার মানে এই—এরা যে কালে দেখছি গোরুর পাল, সে স্থলে তবে হরি, অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বল্লে" "হর, হর" তার মানে এই—যেকালে গোরুর পাল দেখ্‌ছ, সেকালে সর্ব্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরম ভক্ত, সাধু"। (সকলের উচ্চ হাস্য)।

বঙ্কিম বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একাগ্র হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। ঘরের দরোজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসিয়াছেন। গায়ে শুধু জামা। একটী বাবু চাদর খানি কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া চাদর তাঁহার হাতে দিলেন। বঙ্কিম কি ভাবিতেছিলেন?

রাখাল শ্রীবৃন্দাবনধামে বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন—সবে সেখান হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার কথা ঠাকুর শরৎ ও দেবেন্দ্রের কাছে বলিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা রাখালের সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসুক ছিলেন। শুনিলেন, এঁরই নাম রাখাল!

শরৎ ও সান্যাল :এঁরা ব্রাহ্মণ, গৃহস্বামী সুবর্ণবণিক; —পাছে তিনি খাইতে ডাকেন, তাই তাঁহারা তাড়াতাড়ি পালাইয়া গেলেন। তাঁহারা এখনও জানেন না, ঠাকুর অধরকে কতো ভালবাসেন আর অধর তাঁহাদের কত আপনার লোক! ভক্তের আবার জাতি কি!

অধর ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তদের অতি যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন।

ভোজনান্তে ভক্তগণ ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধুর কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার অদ্ভুত প্রেমের ছবি হৃদয়ে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দিবাশেষে।

১

অই দিবা যায়—
পশ্চিম-অচল রাঙ্গা বরাঙ্গ-আভায়,
অলস অবশ রবি,
সাগরে ডুবার ছবি,
হাসিছে সোণার শশী আকাশের গায়।
এমনি এমনি বেলা,
এমনি সায়াহ্ন-খেলা,
কে যেন আসিয়াছিল কি জানি কোথায়,
আজোতো তেমনি করে দিবা চলি যায়।

২

অই দিবা যায়—
কত যুগ যায় আসে
এম্লান বসুধা-বাসে,
আর সে হীরার তারা জ্বলে না তো হায়,
ফুলে ফুলে বনবধূ,
ভরে না সুবাস মধু,
মন্দারের গন্ধ আর বহে না ধরায়!
শুধু দিবা যায়!

অই দিবা যায়—
ওগো! তুমি এস কাছে,
কত কথা বাকী আছে,
একটী একটী করে ক'ব সমুদায়
নিতি যে মল্লিকা যূঁই,
মালা গেঁথে তুলে থুই,
সে শুভ কুসুমাঞ্জলি দিব রাঙ্গা পায়
অই দিবা যায়।

৪

অই দিবা যায়—
চাঁদের অমিয় নিতে,
চকোর আকুল চিতে,
অতৃপ্ত নয়নে যথা নীলাকাশে চায়,
তোমারি করুণা লাগি,
আমিও তেমনি জাগি,
কত বর্ষ, কত যুগ, ফাঁকি দিয়া যায়!
শুধু দিবা যায়।

৫

অই দিবা যায়—
তুমি যে সে নিশাশেষে,
চলি গেলে দেব-দেশে,
ফুলময় পথ দিয়ে মৃদু জ্যোছনায়,
কি শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে
মিলিলে অমরগণে,
ভুলে গেলে মর ধরা স্বরগ আভায়!
অই দিবা যায়।

৬

অই দিবা যায়—
এ দেশে পাপিয়া পিক
সেই গীতি গাহে ঠিক,
এ দেশে তেমনি করে যামিনী পোহায়;
কেবলি সে তুমি বই
আমি আর আমি নই,
বসন্ত ডুবিয়া গেছে ঘোর বরষায়!
অই দিবা যায়!

৭

অই দিবা যায়—
কত নিশা আসে ভবে,
সে নিশা আসিবে কবে,
যে আমারে নিয়েছিল সৌভাগ্য সীমায়!
প্রেম, পুণ্য, অপবর্গ,
আরাম, অমৃত, স্বর্গ,
যে আমারে দিয়েছিল, সে গেল কোথায়?
অই দিবা যায়।

৮

অই দিবা যায়—
তাই ভাবি নিরবধি,
সেই নিশা পাই যদি,
আসে যদি সুখময়ী স্নেহ-করুণায়;
কি আছে এ অবনীতে
পারি না তাহারে দিতে,
শত পূজা, আরাধনা, যোগ, তপস্যায়,
জানি না কি মূল্যে তারে ফিরে পাওয়া যায়!

৯

অই দিবা যায়—
উজলিয়া দেবছবি,
এস ত্রিদিবের কবি!
ধরণী হউক ধন্যা পরশি তোমায়!
দূরে যা'ক পাপ তাপ,
জীবনের অভিশাপ,
সকল যাতনা যা'ক্ ডুবিয়া গঙ্গায়!
ও চরণ পরশিলে,
পুণ্য, প্রেম, সিদ্ধি মিলে,
অমর অমৃত মাঝে পরাণ ঘুমায়,
এস এস পায়ে পড়ি দিবা চলি যায়।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

বারভূঞা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য। *

১। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—

দূরতর দেশে অবস্থান করিলে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব-বিয়োগজনিত বেদনা তাঁহার (প্রতাপের) হৃদয়ের কঠোরতাকে দূর করিয়া তাহার স্থলে স্বজনপ্রীতি আনয়ন করিবে, বিবেচনা করিয়া, আগ্রাতে তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে, প্রতাপকে প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন।"

মানিলাম, জমীদারগণের রাজধানীতে, একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকা অসম্ভব নয়, কারণ রাজ্যের যে কোন বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি, রাজধানীতে রাজসকাশেই হইয়া থাকে। কিন্তু কি কার্য্য উপলক্ষ করিয়া, প্রতাপকে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখা যাউক। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে আগরাতে রাজস্ব আদায় উপলক্ষ করিয়াই, প্রতাপ প্রেরিত হয়েন। যথা,—

"প্রতাপ যখন দেখিলেন, মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত, তাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় হইয়াছে, তখন তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, তাঁহাদিগের বার্ষিক দেয় কর প্রদান রহিত করিয়া দেন। এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে রাজস্ব না আসার কথা, সম্রাটের কর্ণগোচর হয়।"

অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক, বোধ হয়, শাস্ত্রীকৃত গ্রন্থে, পাঠকমাত্রেই জানেন যে, প্রতাপ এই রাজস্ব বন্ধ করার কারণ, আপন পিতৃব্য বসন্তরায়ের স্কন্ধে চাপাইয়া, ও পিতা বিক্রমাদিত্যকে উদাসীন বানাইয়া পাকে প্রকারে, জমীদারিটা আপন হস্তে আনয়ন করেন। প্রতাপ ছলে-বলে জমীদার হউন, তাঁহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু তৎসাময়িক বঙ্গীয় জমীদারগণকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিল্লীতে কর প্রদান করিতেন, না তাঁহারা প্রদেশীয় নবাব বা দেওয়ানদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিতেন, এই বিষয়টা দেখা আবশ্যক।

প্রতাপাদিত্য যখন দিল্লীতে রাজকর আদায় করিতে বরিত হন, তৎসময় মোগলকুলগৌরব আকবর সাহ দিল্লীর রাজাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই বাদসাহের সমসাময়িক মহাত্মা আবুল ফজেল, তৎকৃত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে, রাজস্ব আদায়ের বিধান সম্বন্ধে, যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"যখন পাতসাহ রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আতমাদ খাঁ নামক একজন খোঁজা, রাজার এই সকল কার্য্যের সহায় ছিলেন। রাজার খাসমহাল এবং জায়গীর জমি পৃথক রাখা হইল। যে যে মহালের রাজস্ব এক কোটি দাম, সেই সকল মহালের উপর একজন করিয়া তহসিলদার নিযুক্ত হইল। এই সকল মহালের পরগণার উপর একজন প্রধান কোষাধ্যক্ষ দারগা নিযুক্ত হইয়াছিল।"

দেখা গেল, তহশিলদার, কোষাধ্যক্ষ, ও দারোগা, ইহারা মহাল, পরগণা প্রভৃতি রাজস্ব আদায় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এখন দেখা যায়, তৎসময়ে বঙ্গদেশে কতটা মহাল ছিল, ও কয়জন তহশিলদার থাকিয়া উহার আদায় তহশীল কার্য্য সম্পাদন করিত। তৎসময়ে বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশে ২২ বাইশটি

* পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০১ পৃষ্ঠার পর।

সরকার নির্দ্দিষ্ট ছিল। * তন্মধ্যে যশোহর বা রসুলপুর সরকার খালিফেতাবাদের অন্তর্গত ছিল। এই সরকারের মহালের সংখ্যা ৩৫, রাজস্ব ৫৪০২১৮০ দাম, তন্মধ্যে যশোহরে (রসুলপুরে) ১৭২৩৫৬০ দাম অর্থাৎ ৪৩০৮৯ টাকা কর আদায় হইত। আমরা বুঝিলাম না, যশোহরের এই অল্প রাজস্ব হাবেলী খালিফেতাবাদের তহশিলদারের নিকট আদায় না করিয়া, কি জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিল্লীর রাজকোষে দেওয়া হইত।

২। প্রতাপ আদিত্য উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং অন্যান্য নৃপতিবর্গকে করদ করিয়া নানাদেশ হইতে নানা প্রকার বিজয়লব্ধ দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন প্রাচীন গ্রন্থকার প্রতাপের বর্ণনাকালে কহিয়াছেন, তিনি বঙ্গীয় নৃপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া, রাঢ়দেশীয় রাজন্যবর্গকে অধীনস্থ করেন।"

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন গ্রন্থকার হয়ত, তখন ইতিহাস লিখিবার অধিক সরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়েন নাই। এইজন্য সেই সময় ইতিহাস পাঠানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে একটা উপকথা লিখিয়া, প্রবোধ দিয়া গিয়াছেন। তাহা বলিয়া এই গবেষণা পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার দিনে, সেই উপকথা প্রকাশ ও ব্যক্তিগত অত্যুক্তিপূর্ণ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া জনগণ সমক্ষে প্রকাশ করা কতদূর সুসঙ্গত হইয়াছে, তাহা কি আমাদের মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় একটুকুও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? তিনি যদি বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিতেন, তবে উড়িষ্যা কেন, বঙ্গবিজেতা বলিয়াও প্রতাপের বর্ণনা করিতেন না। তবে স্বাধীনতা-প্রয়াসী ও স্বদেশ-বৎসল বলিয়াই প্রতাপের উপযুক্ত প্রশংসাবাদ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন। সেই গৌরবাত্মক কথা কয়েকটী বরং ঐ সকল অত্যুক্তি হইতে, অধিক উজ্জলতর থাকিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমধিক প্রতিফলিত হইত।

যে সময়ে প্রতাপাদিত্যের পূর্ণ বিকাশ, তৎকালে বঙ্গদেশ মোগলকরতলগত। উহা ২২ সরকারে বিভক্ত ও নবাবগণ দ্বারা শাসিত ছিল। বঙ্গদেশীয় জমীদারেরা তখন সেই সকল শাসনকর্ত্তাদের অধীনে থাকিয়াই কালযাপন করিতেন। পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহাদের ছিল না। তন্মধ্যে মাত্র দ্বাদশ জন ভূম্যধিকারী স্বদেশ-স্বাধীনতা-মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া, জন্মভূমির উদ্ধার সাধনব্রতে কৃতসঙ্কল্প হন। অন্যান্য ভূম্যধিকারীরা নবাবকে পূর্ব্বে যেরূপ মান্য করিয়া চলিতেন, পরেও তদ্রূপই করিতেন, এই কারণেই অর্থাৎ সমুদয় জমীদারগণ একমতাবলম্বী না হওয়া প্রযুক্ত বিদ্রোহী জমীদারেরা অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হন। এস্থলে সমুদয় বঙ্গীয় রাজগণকে করায়ত্তকারী বলিয়া, প্রতাপ আদিত্যকে অধিক বাড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল? অবশ্য প্রতাপের বুদ্ধিবলে ও মন্ত্রণাগুণেই এই ভূঞাগণের পুষ্টি সাধিত হয়, কিন্তু প্রথম সূত্রপাতের কারণ, মুসলমান পাঠানগণ।

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় ঈশাখাঁ মসনদ আলি ও ঈশা খাঁ মছলন্দি, দুই ব্যক্তি ঠিক করিয়াছেন, উহা কোন্ ইতিহাস

* ১ম টাণ্ডা, ২ জেলেতাবাদ (গৌর), ৩ ফতেহাবাদ, ৪ খালিফেতাবাদ, ৫ বাকলা, ৬ পূর্ণিয়া, ৭ তাজপুর, ৮ ঘোড়াঘাট, ৯ পিঞ্জিরা, ১০ বারকাবাদ, ১১ বাজুহার, ১২ সোণার গাঁ, ১৩ সিলেট, ১৪ চট্টগ্রাম, ১৫ সেরিফাবাদ, ১৬ সলিমাবাদ, ১৭ সাতগাঁ, ১৮ মাদারন ১৯ জলেশ্বর, ২০ ভদ্রক, ২১ কটক, ২২ কুলেনদণ্ডপৎ, এই বাইশটি সরকার।

অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, তাহা জানান উচিত ছিল। কিন্তু পুস্তকপাঠে হঠাৎ উভয়কে এক বলিয়াই ধারণা হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়, ঈশা খাঁকে নিহত করিয়া উড়িষ্যায় তাঁহার কবর দিলেন, তৎপর প্রতাপ দ্বারা বিক্রমপুরাধিপতিকে দমন জন্য, পদ্মাপার পর্য্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করিলেন, এবং একটা রণাভিনয় করিয়া চাঁদ ও কেদার রায় দ্বারা প্রতাপ আদিত্যকে কতকগুলি অনুনয় বিনয় করাইয়া, পরে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু এই কথাটী শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রতাপ কখনও যে রায়-রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া বিক্রমপুরে সৈন্যপরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই মাত্র প্রথম শুনিলাম। যদি ইহার স্বপক্ষে ঐতিহাসিক কোনও তথ্য থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া লেখাই কর্ত্তব্য। অন্যথা এইরূপ কল্পিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠা বর্দ্ধিত করা কোন ক্রমেও সুসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ মিত্রগণের সহিত শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে নির্যাতন করিতে যাওয়ায় প্রতাপের চরিত্রে একটা দোষ প্রবেশ করান ব্যতীত, উহা তাঁহার সুখ্যাতির পরিচায়ক হয় না। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর, তাহেরপুরের কংসনারায়ণ ও দিনাজপুরের গণেশ রায়কে বারভূঞার অন্তর্গত করাও নির্ভুল হয় নাই। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমাদের কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, কারণ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত বিশদভাবে তৎকর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও বহু বিষয়ে তদনুসরণ করিয়াই প্রবন্ধ পরিপূরণ করিতে পারিব। এ পর্য্যন্ত বারভূঞা লিখিতে বসিয়া অন্য কাহারও নিকট কিছুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই; বিষয়টী যে কতদূর গুরুতর, তাহা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, এজন্য ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, রাজসাহী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কত লোকের নিকট বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য কত প্রশ্ন করিয়াছি, কিন্তু সদুত্তর বড় পাই নাই। অনেক খ্যাতনামা লেখকগণের নিকট আশা পাইয়াছিলাম, তাঁহারা কতকটা অনুসন্ধান লইয়া কোন কোন বিষয় যতদূর জানিতে পারেন, তাহা আমাকে জানাইবেন, পরে কিন্তু চিঠী লিখিয়াও তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ উত্তর পাইলাম না। আমার যতদূর ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছি, অর্থশালী বা উপাধিধারী লেখকেরাই একমাত্র সাধারণের সাহায্য পাইবার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। "দরিদ্র ভর" কথাটীর প্রযুক্তি যেন বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইতে চলিল। যাহা হউক, এখনও যদি কোন সহৃদয় মহাত্মা বার-ভূঞা সম্বন্ধে কোন নূতন ঘটনা লেখককে জানাইতে পারেন, তবে আজীবন তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।

প্রতাপাদিত্য দিল্লী হইতে দেশে প্রত্যাগমন করার কিছুদিন পরেই রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা, পুত্র প্রতাপকে দশ আনা ও ভ্রাতা বসন্ত রায়কে ছয় আনা জমিদারী বিভাগ করিয়া দেন। এই সময় হইতে কতক দিন পর্য্যন্ত খুল্লতাতের সহিত প্রতাপ বড়ই সদ্ভাবে

কাটাইয়াছিলেন। তৎকালে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি ও সৌষ্ঠব সংসাধিত হইয়া, যশোহর বঙ্গের একটী প্রধান নগরী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

বসন্ত রায়ের অভিমতে প্রতাপাদিত্যই রাজোপাধি ধারণ করেন। এই সময় তাঁহার সকল কার্য্যই পিতৃব্যের পরামর্শ গ্রহণান্তর সম্পন্ন হইতেছিল। কার্য্যও সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়াছিল। প্রতাপ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, খুল্লতাত কেবল নিজহিতকল্পেই সময় ব্যয় না করিয়া তাঁহার উন্নতি ও হিতজনক কার্য্যেও সম্পূর্ণ মনোযোগী হইয়া তৎসম্পাদনে নিরত নিযুক্ত রহিয়াছেন। একারণে পিতৃব্যের প্রতি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব সংশ্লিষ্ট ছিল; তৎপরিবর্ত্তে বিশ্বাস ও ভক্তি চক্ষেই তৎকার্য্য সমুদয় এখন প্রতিফলিত হইতে লাগিল। এই সুখময় সুদিনে যশোহর রাজবংশের দ্বারা যে যে শুভকর ও পুণ্যজনক কার্য্যকলাপ সম্পাদিত হইয়াছিল, আমরা উহার সংক্ষিপ্ত তালিকা ক্রমে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

ক্রমশঃ।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (৯)

তেকড়ির প্রকৃত নাম দেবদাস দত্ত, তিনি আন্দুলে আসিয়া স্বরস্বতী-তীরে বৃহৎ অট্টালিকা, দেবালয় প্রভৃতি রাজোপযুক্ত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কবিরাম তাঁহার দিগ্বীজয় প্রকাশ গ্রন্থে আন্দুলের প্রকৃত নাম এক স্থলে “চান্দোল” অপর স্থানে ‘পারিন্দ্র’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেবদাস দত্তের ভবন এক্ষণে ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গলে পরিণত হইয়া রহিয়াছে এবং কতক অংশে মিশ্র মহাশয়েরা বাস করিতেছেন। দেবদাসের সময় হইতে ইঁহারা চৌধুরী উপাধিতে পরিচিত হইয়াছেন। আন্দুলের অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণাদি চৌধুরীদিগের দ্বারা তাঁহাদের প্রদত্ত ভূমিতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আন্দুলের যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা এবং আন্দুলের মল্লিক বংশ চৌধুরীদিগের দ্বারাই ৫ বলিয়া শুনা যায়।

দত্তবংশে একটী অদ্ভুত কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে। তেকড়ি দত্তের পুত্র রত্নাকর যিনি পিতামহীর সহিত বালির বাটীতে বাস করিতেন, তাঁহার সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে একদিন স্নানান্তে গঙ্গাতীরে পূজাহ্নিক করিতেছেন, এমন সময় জোয়ার আসিয়া ক্রমে তাঁহার কোষা স্পর্শ করিল, সেই সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড আসিয়া তাম্রকোষায় পড়িবামাত্র কোষা সুবর্ণ হইয়া গেল। নির্লোভী রত্নাকর প্রস্তরখণ্ড লইয়া গঙ্গাজলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, দ্বিতীয়বারও ঐরূপ হইল, তৃতীয় বার প্রস্তরখণ্ড আসিয়া কোষায় পড়িলে বুঝিলেন, ইহাতে মা লক্ষ্মীর গূঢ় অভিপ্রায় আছে, তখন তাহাকে লইয়া পিতামহীকে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা প্রস্তরখণ্ড লৌহে স্পর্শ করিবা মাত্র দেখিলেন, লৌহ স্বর্ণ হইল, তখন তাহাকে স্পর্শমণি নিশ্চিৎ জানিয়া গোপন করিয়া লক্ষ্মীর কৌটায় রক্ষা করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পরে রত্নাকরের পিতার মৃত্যু হইলে তিনি আন্দুলে গিয়া মহা আড়ম্বরে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই ব্যাপারে কাশি, কাঞ্চি, মিথিলা, দ্রাবিড় প্রভৃতি যে যে স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর অধিষ্ঠান ছিল, সর্ব্বত্র হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভিক্ষাজীবীরা আহুত হইয়া প্রচুর ভোজ্য ও অপরিমিত সুবর্ণ লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ইহাতেই রত্নাকরের স্পর্শমণি প্রাপ্তির কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে এই কথা বাদসাহেরও কর্ণগোচর হয়, তিনি স্পর্শমণি সহ রত্নাকরকে রাজধানিতে আনিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। রত্নাকর ভাবিলেন, স্পর্শমণির কথা অস্বীকার করিলে বাদসাহের সৈন্যেরা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে এবং জাতি ধর্ম্ম সমস্ত নষ্ট হইবে, প্রাণ অপেক্ষা মান ও ধর্ম্ম বড়, সুতরাং মণিসহ বাদসাহের লোকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজধানি যাত্রা করিলেন। কাঞ্চন নগরের সম্মুখে আসিয়া রত্নাকর ভাবিলেন, দেবদত্ত মণি আমি কেমন করিয়া মুসলমানের হস্তে প্রদান করিব, তাহা কখনই পারিব না; অথচ মণি আমার গৃহে আছে সন্দেহ করিলে গৃহ, পরিবার রক্ষা হইবে না, অতএব ইহাদিগকে মণি দেখান আবশ্যক। এই ভাবিয়া উহা বাহির করিয়া তাহাদিগকে দেখাইলেন, সত্যতা প্রমাণের জন্য লৌহখণ্ডকে স্বর্ণে পরিণত করিলেন, শেষে নিজে মণিসহ নদীতে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই কিম্বদন্তি হইতে অন্ততঃ ইহা বুঝা যায় যে, রত্নাকর অত্যন্ত ধনবান থাকায় পিতৃশ্রাদ্ধে এত ব্যয় করিয়াছিলেন যে, দৈব সাহায্য ভিন্ন সে প্রকার ব্যয় করা সম্ভব নহে। তাহাতেই উক্ত স্পর্শমণির কথা উঠিয়া থাকিবে।

রত্নাকরের পুত্র কামদেব দত্ত চৌধুরী পিতৃমৃত্যু শ্রবণান্তে যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান প্রধান সমস্ত তীর্থই তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। গয়া তীর্থে গমন করিয়া প্রেত-শৈলে আরোহণ করিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব করেন, অপর যাত্রীদিগেরও কষ্ট দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, "আমি অবশ্য এই পর্ব্বতে উঠিবার জন্য নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত সোপান প্রস্তুত করিয়া দিব, যদি আমার পরমায়ু শেষের পূর্ব্বে ইহা সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে আমার পরবংশে কেহ না কেহ যেন এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমায় প্রতিজ্ঞা-পাশ হইতে মুক্ত করে। বহুকাল পরে তাঁহার সপ্তম নিম্ন পুরুষ হাটখোলার পুণ্যশ্লোক মহাত্মা মদনমোহন দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা ১১৮২ সনে বহু ব্যয়ে ৩৯৫টী সোপান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

কামদেবের পুত্র কৃষ্ণানন্দ। ইহাঁর সময়ে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা শ্রীচৈতন্যদেবের হরি-ভক্তি-স্রোতে প্লাবিত হয়। আন্দুলের চৌধুরী-গৃহেও তাহার তরঙ্গ পহুছিয়াছিল। নিত্যানন্দ দেব এক দিন উড়িষ্যা-যাত্রাকালে আন্দুলে পদার্পণ করেন। কৃষ্ণানন্দ দত্ত চৌধুরী সাদরে তাঁহাকে কয়েক দিন নিজালয়ে রাখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সগোষ্ঠি বান্ধবে সেবা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের উদ্দাম কীর্ত্তনে আন্দুল নগর টলমল করি-

য়াছিল। (অবশ্য ইহা ১৫১০ হইতে ৩৩ খ্রীঃ মধ্যে) তদবধি কৃষ্ণানন্দ চৌধুরী বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা পূর্ব্ব পুরুষের গুরুমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব গুরুর মন্ত্রগ্রহণ করেন নাই। চৌধুরী কৃষ্ণানন্দের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মাধবরাম পিতার বর্ত্তমানেই আন্দুল ছাড়িয়া চৌয়াগ্রামে গিয়া বাস করায়, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কন্দর্পরামকে বিষয়াদি বুঝাইয়া দিয়া আপনি বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষোত্তমে প্রস্থান করিলেন। তথায় আন্দুল মঠ নামে একটী মঠস্থাপন করিয়া দিবানিশি হরিনাম-সাধনায় জীবন পাত করিয়াছিলেন।

কন্দর্পরাম অতি যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আন্দুলের দুই ক্রোশ দক্ষিণে সুগভীর জলবেষ্টিত দ্বীপাকার সুবিস্তৃত ভূখণ্ড তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করায় তিনি তথায় একটী সুন্দর নগর স্থাপন করিয়া তাহার নাম কন্দর্পনগর রাখিয়াছিলেন। সেই সুগভীর জলরাশি ক্রমে ভরাট হইয়া এক্ষণে বিস্তৃত বিলরূপে পরিণত হইয়াছে। কন্দর্প নগর "কেঁদো" বা "কেন্দু" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহার অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে, বেঙ্গল নাগপুর রেল কোং "আবাদা" নামে ষ্টেশন খুলিয়াছেন। কন্দর্পরামের তিন পুত্র, রামশরণ, গোবিন্দশরণ ও হরিশরণ।

দুর্ভাগ্যক্রমে জ্ঞাতিবিরোধই ভারতের চিরদিন সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে। কুরু-কুল হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেই আবহমানকাল জ্ঞাতিবিরোধাগ্নিতে জ্বলিয়া ছারখার হইয়াছে। এপর্য্যন্ত আন্দুলের চৌধুরীবংশে জ্ঞাতিবিরোধ হইবার অবসর আইসে নাই; কারণ তেকড়ি হইতে কন্দর্পরাম পর্য্যন্ত এক এক পুরুষই উত্তরাধিকারি হইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং বিবাদাগ্নি জ্বলে নাই। কন্দর্পরামের তিন পুত্রে অতি ভয়ানক বিবাদ বাধিয়া উঠিল। রামশরণ জ্যেষ্ঠ বিধায় সমস্ত বিভবের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, অগত্যা মধ্যম ও কনিষ্ঠ গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মধ্যম গোবিন্দশরণ কলিকাতার দক্ষিণ "বদররসা" নামক চরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন এবং নিজনামে তাহার গোবিন্দপুর নাম প্রদান করিলেন। কবিরাম তাঁহার দিগ্বীজয় প্রকাশ নামক ভূগোল গ্রন্থে গোবিন্দপুর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। কনিষ্ঠ হরিশরণ দত্ত চৌধুরী মুড়াগাছা পরগণার বরদা নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। হরিনাভির দক্ষিণাঞ্চলে তাঁহার বংশের অল্প পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দশরণ নিজে চৌধুরী উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অপর দুই ভ্রাতার বংশ আজিও উক্ত উপাধিতে পরিচয় দান করিয়া থাকেন। (১)

১৫৮৪ খ্রীঃ রাজা টোডরমল্ল, বাদসাহ আকবরের নবজীত বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার খাজানা বন্দোবস্ত করিতে আসিলে গোবিন্দশরণ দত্ত তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার এইবার তিনি বিশেষ সুবিধা পাইলেন, রামশরণের খাজানার হার

(১) গোবিন্দশরণের পরপুরুষেরা কেহ কেহ চৌধুরী উপাধি পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন রেকর্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠায় গঙ্গারাম দত্তপতির নাম রহিয়াছে, ইহাতে বোধ হয় উহাঁদের কেহ কেহ উক্ত উপাধি লইয়াছিলেন। বিশেষত ইনি বংশ মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। গোবিন্দ দত্তের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র ছিলেন। রামশরণের এক পুত্রের বংশ কলিকাতায় আসিয়া এখানকার জ্ঞাতিদিগের দৃষ্টান্তে চৌধুরী উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অসম্ভব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে অনেক ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি দেখাইয়া তিনি টোডরমল্লের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দপুর জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ শরণ কেবল জ্যেষ্ঠের খাজানা বৃদ্ধি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কবিরাম লিখিয়াছেন, 'রাজা গোবিন্দ দত্ত পারিন্দ্র গ্রাম হইতে বিবিধ সম্পত্তি আনিয়া স্বগ্রামের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।' আন্দুলের চৌধুরীবংশেও শুনা যায়, তিনি বাদসাহের সৈন্তদিগের সাহায্যে আন্দুল লুণ্ঠন করিয়া বিবিধ সম্পত্তি সহ কুলবিগ্রহকে লইয়া যান। পরে রামশরণ 'রাজ রাজেশ্বর' নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন, এখন তিনিই আন্দুলে আছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আন্দুলের অপর নাম "পারিন্দ্র গ্রাম"।

এক্ষণে আন্দুলের চৌধুরীবংশের অবস্থা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। একে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, অন্য দিকে অতিরিক্ত হারে খাজানা বৃদ্ধি,তদুপরি উড়িষ্যার পাঠানেরা ও আরাকাণের মগেরা আসিয়া প্রায়ই উপদ্রব করায় রামশরণ বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র, মহেশচন্দ্র, শিবরাম, জগন্নাথ, পার্ব্বতী, পরমচাঁদ ও কাশীশ্বর। পিতার মৃত্যুকালে সর্ব্বকনিষ্ঠ কশীশ্বর মাতৃগর্ভে ছিলেন। যাঁহারা সাবালক হইয়াছিলেন, তাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন যে, জমীদারী রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিল। অগত্যা দেবোত্তর ভিন্ন অপর সমস্ত জমী হস্তান্তর হইয়া গেল। কাশীশ্বর চৌধুরীর বয়স যখন ১৭ বৎসর, সেই সময় সম্রাটপুত্র সাজিহান উড়িষ্যা হইতে ফিরিবার সময় সপ্তগ্রাম দেখিবার জন্য সরস্বতীর মধ্য দিয়া বজরাযোগে গমন করিয়াছিলেন। অতি সুন্দর পারস্যভাষাবিদ্ কাশীশ্বর এক খানি দরখাস্ত লিখিয়া তাহাতে আপনার বংশমর্য্যাদা ও বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া নদীতীরে দণ্ডায়মান থাকেন। একটী সুন্দর বালককে একখানি দরখাস্ত হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া বাদসাহ নিকটে আহ্বান করিলেন। সাহসী কাশীশ্বর অকুতোভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত আবেদন পত্র প্রদর্শন করিলে তিনি কতক জমীদারী প্রত্যর্পণ করেন। ইহার আয় হইতে কয় ভ্রাতা সচ্ছলরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পুরাতন বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন অট্টালিকা ও সুউচ্চ বৃহৎ পাকা চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া পরম সুখে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত গৃহ ও চণ্ডীমণ্ডপ আজিও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু মগ ও পর্টুগীজদিগের হস্তে তাঁহারাও বার বার লাঞ্ছিত হইতেন, শেষে উহঁাদের পুত্র পৌত্রদের সময় ১৭৪১ খ্রীঃ বর্গীরা আসিয়া তাঁহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লওয়ায়, অনেকেই কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। কাশীশ্বরের নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমচাঁদ চৌধুরীর পৌত্র বিনোদবিহারী কলিকাতায় আসিয়া হাটখোলায় গোবিন্দশরণের পৌত্র রামজীবন দত্তের বাটীতে বাস করেন। গোবিন্দশরণের পৌত্রেরা অনেকে কোম্পানির অধীনে চাকুরী পাইয়াছিলেন, রামজীবন দত্তও কোন এক বিভাগে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি অতি সহজে আশ্রিত জ্ঞাতি ভ্রাতষ্পুত্রকেও একটী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। বর্গির হাঙ্গামা থামিয়া গেলে অপর চৌধুরীরা আন্দুলে ফিরিয়া

গেলেন বটে, কিন্তু বিনোদ চাকুরীর মায়া ছাড়িয়া আর গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। তদবধি রামশরণের বংশের মধ্যে কেবল তাঁহার একজন প্রপৌত্র আসিয়া কলিকাতায় বাস করিলেন এবং তাঁহারই বংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে তাঁহা হইতে সপ্তম পুরুষ কলিকাতার অধিবাসী হইয়াছেন, নতুবা আর সকল গোষ্ঠীই আন্দুলে বাস করিতেছেন।

গোবিন্দ শরণ দত্ত প্রকৃত রাজার ন্যায় বাস করিতেন, তাঁহার আহ্বানে চারিদিক হইতে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, নবশাক প্রভৃতি আসিয়া গোবিন্দপুর পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু এই গ্রামে সুবর্ণবণিক, মুসলমান ও উত্তর পশ্চিমের কোন লোক বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গোবিন্দপুরকে গড় গোবিন্দপুর বলিত, কারণ ইহা চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টিত ছিল। পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে আদি গঙ্গা, (যাহাকে গোবিন্দপুরের খাল বলিত) পূর্ব্বদিকে চৌরঙ্গীর জলা ও জঙ্গল এবং উত্তরে গঙ্গা হইতে বাদা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ খাল, অবস্থিত ছিল। বাস্তবিক এইরূপে জল বেষ্টিত থাকায় ইহা প্রকৃত স্বাভাবিক দুর্গরূপে নিরাপদ ছিল। মগ এবং অপরাপর দস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় ছিল না। কালীঘাটের সংলগ্ন হওয়াও এই গ্রাম হিন্দুদিগের আর একটী আকর্ষণের স্থান। তাহার উপর আবার সেই সময় সরস্বতী নদী মজিয়া যাইতেছিল, ত্রিবেণীর নিকট হইতে গঙ্গা একেবারে দক্ষিণদিকে ধাবিত হইয়া বদররসা হইতে সাঁকরাইল পর্য্যন্ত যে নিমকির অপ্রশস্ত খাল ছিল, (১) তাহাকে বিস্তৃত করিয়া তন্মধ্য দিয়া, প্রবাহিত হওয়ায় লোকে বুঝিল, সামুদ্রিক পোত সকল নিশ্চয় এই পথে আসিতে বাধ্য হইবে, সুতরাং গোবিন্দপুরের ঘাটে খরিদ বিক্রী যথেষ্ট হইবে। এই আশায় সপ্তগ্রাম হইতে শেঠ বসাকেরা আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিলেন। সুবর্ণ বণিকেরা ও পঞ্জাবের দু একজন শিখ মহাজন প্রভৃতি আসিয়া কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহাদের অনুমান সত্য হইল, সমস্ত অর্ণবপোত আসিয়া গোবিন্দপুরের ঘাটে দাঁড়াইতে লাগিল। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম পর্টুগীজদিগের জাহাজ আসিয়া গোবিন্দপুরের হাটে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে গোবিন্দপুরের হাট অতি বৃহৎ হইয়া উঠিল এবং জন-সমাগমের বাহুল্যে ইহার উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমে লোকের

(১) শাল্‌তি করিয়া হিজলি হইতে অতি সহজে লবণ আনিবার জন্য বদর রসাচরের সম্মুখস্থ গঙ্গা হইতে সাঁকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী সহ একটী নালা কাটা হইয়াছিল, কে কোন্ কালে এই কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না, কিন্তু এই পথ দিয়া অতি অল্প দিনে উড়িষ্যায় যাওয়া যাইত। ১৫০৯ খ্রীঃ চৈতন্যদেব এই পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুও এই পথ দিয়া সাঁখরাইল হইতে সরস্বতী বহিয়া আন্দুলে কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীর অতিথি হইয়াছিলেন। ১৫৪৪ খ্রীঃ লিখিত মুকুন্দরামের চণ্ডী গ্রন্থে লিখিত আছে, শ্রীমন্তের নৌকা কলিকাতা ও বেতড় পার হইয়া কালীঘাট যাইবার সময় "ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলির পথ।" গঙ্গা এই পথে প্রবাহিত হইলে লোকে ইহাকে কাটি গঙ্গা এবং কালীঘাটের নিকটস্থ সুতিকে আদিগঙ্গা বলিতে লাগিল। নর্দ্দমা দিয়া গঙ্গাজল প্রবাহিত হওয়ার ন্যায় কাটি গঙ্গার কোন মাহাত্ম্য নাই। অনেকের বিশ্বাস, ইংরাজেরা এই অংশটী কাটিয়া দিয়া গঙ্গাকে সরল পথে চলাইয়া দিয়াছেন, ইহা নিতান্ত ভ্রম। ১৫২০ হইতে ৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গঙ্গা এই গতি লইয়াছে।

বসবাস আরম্ভ হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পোস্তার হাট যে কতকালের প্রাচীন, তাহার কোন স্থিরতা নাই; কিন্তু এখানে বিশিষ্ট লোকের বসবাস না থাকায় সে হাটে কোন মূল্যবান বস্তু বিক্রয় করিতে কেহ আসিত না, কেবল গণ্ড গ্রামের উপযোগী তরি তরকারি বিক্রয় হইত মাত্র। ঐ পোস্তার হাটও লোক-সমাগমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু সেই তরি তরকারি ভিন্ন আর কিছুতে নহে। গোবিন্দপুরের হাটের লভ্য গোবিন্দশরণের সম্পত্তি। শেঠ বসাকেরা বড় ব্যবসাদার, তাঁহাদিগকে জমীদারের তহবিলে অনেক মাসুল দিতে হয়। এই মাসুল দেওয়া অপেক্ষা অন্যত্র ব্যবসার স্থান খুলিলে মাসুল বাঁচিয়া যায় মনে করিয়া, তাঁহারা আহীরিটোলা গ্রামের ঘাটের নিকট নূতন হাট খুলিয়া ব্যবসায় করিতে লাগিলেন, তাহা হইতেই সূতানুটীর হাট স্থাপিত হয়। ১৬২৬ খ্রীঃ ডেনমার্কবাসী ভলেণ্টাইনের ম্যাপে ইহাকে "চিটানুটী" বলিয়া লিখিত আছে। শেঠেরা নূতন হাট বসাইলেও গোবিন্দপুরের হাটের কোন ক্ষতি হয় নাই, বণিকেরা সকল হাটে ঘুরিয়া জিনিষ পত্র ক্রয় করিত। যব চার্ণকের প্রেরিত পত্রে সে সময় কলিকাতার উল্লেখ থাকিত না, কোন পত্রে সূতানুটী কোন পত্রে গোবিন্দপুর ঠিকানা থাকিত।

বিভার্লি সাহেব ১৮৭৬ খ্রীঃ জন সংখ্যার পরিশিষ্টে অর্ম্মির ইতিহাস হইতে লিখিয়াছেন, ১৬৯৮ খ্রীঃ কোম্পানি নবাবের নিকট হইতে তিন খানি গ্রাম তৎকালের জমীদারদিগের নিকট ক্রয় করিবার অধিকার পান এবং তাহার জন্য প্রতি বৎসর ১ হাজার ১৯৫৲ টাকা নবাব সরকারে খাজানা দিবার বন্দোবস্ত হয়। এই তিন খানি গ্রাম সূতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর। আমরা পূর্ব্বে অনুমানে বলিয়াছি, উহা গোবিন্দপুর নহে, বাগুয়া হওয়াই সম্ভব। আবার অর্ম্মির ২য় ভাগের ১৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, উহা দীর্ঘে ৩ মাইল মাত্র। পূর্ব্বে যে পুরাতন সীমা-স্তম্ভের কথা উল্লেখ করা গিয়াছিল, অর্থাৎ উত্তরে বাগুয়া বাজারের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী, আর আধুনিক পুলিস ঘাটে একটী, তাহা মাপিলে ঠিক তিন মাইল হয়, কিন্তু গোবিন্দপুরের খালের মুখ পর্য্যন্ত মাপিলে পাঁচ মাইলের কম হয় না। গবর্ণমেণ্টের পুরাতন রেকর্ড অতি অল্পই পাওয়া যায়, ১৭৪৮ সালের পূর্ব্বের কোন রেকর্ড এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রেল গবর্ণর কাউন্সিলে হুগলির ফৌজদারের চারি মাসের খাজানা প্রদান মঞ্জুর হয়, উহাতে দেখা যায়ঃ—

সূতানুটি, কলিকাতা	৩২৫৲
গোবিন্দপুর পাইকার (১)	৭০৲
গোবিন্দপুর কলিকাতা	৩৩৲
বক্সিস	১ ৷৹ (২)

উপরে বলা হইয়াছে, ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিন খানি গ্রাম জমীদারদিগের নিকট খরিদ করিয়া নবাবকে বার্ষিক ১১৯৫৲ টাকা কর দিবার বন্দোবস্ত হয়। রেকর্ডে পাওয়া যাইতেছে, সূতানুটী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর পাইকানের চারি মাসের কর ৩৯৫৲, ইহাকে তিন গুণ করিলে ১১৮৫ হয়, ৯৫ হয় না।

(১) "পাইকার শব্দটী "পাইকান" হওয়া সম্ভব। পুরাতন রেকর্ডে ব্যক্তি ও স্থানের নামে এইরূপ বিস্তর ভুল আছে, ইহা লংসাহেব উক্ত গ্রন্থের সূচনার পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন।

(২) Unpublished Government Record. Page. 43.

সুতরাং অর্ম্মি ৮কে ভ্রম ক্রমে ৯ করিয়াছেন, অনেক ইতিহাসই অর্ম্মির ভ্রমটী তুলিয়া আসিতেছেন, আমরা অবশ্য রেকর্ডকে সমধিক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিব যাহা হউক, এক্ষণে আমরা উক্ত ভ্রম লইয়া বিতর্ক করা আবশ্যক মনে করি না, কিন্তু উক্ত হিসাবে ইহারই প্রমাণ হইতেছে যে ১৬৯৮ খ্রীঃ কোম্পানি সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর পাইকান প্রথম ক্রয় করেন, পরে কোন সময় গোবিন্দপুর কলিকাতা ক্রয় করিয়াছিলেন। অন্য একখানি ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, ১৭১০ খ্রীঃ উহা ক্রীত হইয়াছিল, যাহার জন্য নবাব সরকারে আরও ৯৯৲ টাকা বার্ষিক খাজানা দিতে কোম্পানি বাধ্য হইয়াছিলেন। গোবিন্দপুর পাইকান ও গোবিন্দপুর কলিকাতা এই দুইটী স্বতন্ত্র নাম হওয়ার ভাবেও বুঝা যায়, দুইটী দুইবার ক্রীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, চৌরঙ্গীর কতক অংশ কলিকাতার মধ্যে অপর, কতক অংশ পাইকান পরগণার ভিতর ছিল। অনেক ইতিহাসেই দেখা যায়, পূর্ব্বে চৌরঙ্গীর জলা জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে ইতর লোকদিগের সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর দেখা যাইত। বলা যাইতে পারে, ইহা উক্ত গোবিন্দপুরেরই প্রান্তভাগ। সমস্ত প্রাচীন গ্রামেরই নিয়ম যে, অস্পৃশ্য জাতিরা গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করে, সেই জন্য নিকৃষ্ট জাতিদিগের সাধারণ নামই প্রান্তবাসী। ঐ প্রান্তভাগ পাইকান পরগণার মধ্যে, আর গঙ্গার ধারের প্রকৃত গ্রামটী যাহাকে আমরা এক সময় বার্ব্বাকপুর পরগণার মধ্যে বলিয়াছিলাম, তাহা কলিকাতা পরগণার মধ্যে হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রথমে কোম্পানি দত্ত মহাশয়দিগের নিকট হইতে প্রকৃত গ্রামটী ক্রয় করিতে সক্ষম হন নাই, তবে প্রান্তভাগের জলা জঙ্গলটী প্রদান করিতে তাঁহাদের আপত্তি না হইতে পারে। ইংরাজ চিরন্তন কৌশলে প্রথমতঃ উক্ত জলা জঙ্গলটী বার্ষিক ২১০৲ টাকা খাজানা দিয়া গ্রহণ করিয়া আপনাদের কৌশলজাল ক্রমে বিস্তার করিতে লাগিলেন। দত্ত বাবুদিগের যে যুবা বুদ্ধিমান, কোম্পানি তাঁহাদিগকে আপনাদিগের অধীনে চাকুরী দিয়া বশীভূত করিতে লাগিলেন, গোবিন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণেশ্বরের তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্র দত্ত কোম্পানির মাল আমদানী রপ্তানির দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন, আর গোবিন্দ দত্তের চতুর্থ পুত্র রাম নারায়ণের একমাত্র পুত্র রামজীবনকে আর একটী উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরেই কোম্পানি তাঁহাদিগের নিকট তাঁহাদের বাসভূমি ক্রয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এবং সেই সঙ্গে সুতানুটী গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের আবশ্যক মত নিষ্কর জমী প্রদানেরও প্রলোভন দেওয়া হয়। কোম্পানির প্রথম আমলের চাকুরী এক অদ্ভুত ব্যাপার, দত্তজেরা কি সেই চাকুরীর লোভ ছাড়িয়া কোম্পানির সহিত গ্রাম লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? কখনই নহে। গ্রামখানি কোম্পানিকে বেচিয়া রামচন্দ্র দত্ত জোড়াসাঁকো (১) হইতে রামবাগান পর্য্যন্ত

(১) বৃদ্ধ পাঠকদিগের অনেকেরই স্মরণ আছে, জোড়াসাঁকোর মৃত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের বাটীর উত্তরে কিরূপ ভয়ানক একটী বিস্তৃত এবং গভীর নর্দামা ছিল। এই নর্দামাটী পাথুরিয়া ঘাটার পোস্তার উত্তরে গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া, পাথুরিয়া ঘাটা, বৈদ্যপাড়া লেন, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট হইয়া চিৎপুরের রাস্তার মধ্য দিয়া প্রাচীন রামচন্দ্র দত্তের বাটীর উত্তরে পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করিয়া রামবাগানের ভিতর দিয়া

বিস্তীর্ণ জমী দখল করিয়া লইয়া বাড়ী ও বাগান প্রস্তুত করিলেন, রামজীবন দত্ত আহিরীটোলা হইতে জোড়াবাগান পর্য্যন্ত ভূমি লইয়া গঙ্গার ধারে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (২)। রামচন্দ্র ও রামজীবনের অপর ভ্রাতারা গোবিন্দপুরেই রহিলেন। নূতন বাটীতে রামচন্দ্র দত্ত একটী শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেটী বাণলিঙ্গ, নর্ম্মদা নদীর মূল স্রোত বাণগঙ্গা হইতে তাঁহাকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়, উহার নাম "রামচন্দ্রেশ্বর শম্ভু।" পাঠকগণ চিৎপুর রোড জোড়াসাঁকোর স্বর্গীয় বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে গুপ্তস্ লেনের মোড়ে রাস্তার ধারে যে শিবের ক্ষুদ্র ঘর ও বাণলিঙ্গ মহাদেব দেখিয়া থাকেন, ইনিই সেই "রামচন্দ্রেশ্বর শম্ভু." আজিও হাটখোলার দত্তবাটী হইতে ইহাঁর পূজা আসিয়া থাকে। শ্যামাচরণ মল্লিকের বাটী হইতে জোড়াসাঁকোর মোড় পর্য্যন্ত রাম-দত্তের বাটীর পশ্চিম সীমা, এবং পূর্ব্বে রাম-বাগান পর্য্যন্ত সমস্তই রামচন্দ্র দত্তের বসত বাটী ও বাগান ছিল। সিরাজ উদ্দৌলার আক্রমণকালে রাস্তা দিয়া সৈন্যের গতিবিধি হওয়ায় ইহাঁরা বিশেষ বিপদগ্রস্ত হন। রামজীবন দত্তের পুত্রেরা গঙ্গার ধারে বাটী থাকায় অনায়াসে নৌকাযোগে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের পুত্রেরা তাহা পারেন নাই। প্রাণ হাতে করিয়া সপরিবার লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেক সম্পত্তি লুটও হইয়াছিল। রামচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনন্তরামের পুত্র দুর্গারাম ও গঙ্গারাম, সহরবাসীরা যুদ্ধকালে যে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা কোম্পানি পরিশোধ করিতে চাহিলে যে সকল কমিসনার নিযুক্ত হয়, ইহাঁরা দুই জনে তন্মধ্যে ছিলেন। গঙ্গা-রাম দত্তপতি নিজ হিসাবে ২৫১৩৶ প্রার্থনা করিয়া ৫১৩৲ টাকা, আর দুর্গারাম ৬৪৭ টাকার স্থানে ১০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে সেই জন্য তাঁহারা আপনাদের সমস্ত বাটী পাথুরীয়া ঘাটার মল্লিকদিগকে বিক্রয় করিয়া আপনারা রামজীবনের কতক জমী লইয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। কেবল রাম বাগান নামে উদ্যানটী একজন জ্ঞাতিকে বাস করিবার জন্য দিয়া যান। (১) যে সময় গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়

আশুতোষ দেবের লেন ভেদ করিয়া বলরামদের ষ্ট্রীটে গিয়া পড়ে, তথা হইতে যে অংশ পূর্ব্বমুখে সিমলা ষ্ট্রীটে গিয়া পড়িয়াছিল, এখন সেই অংশ গোসাঁয়ের লেন নাম হইয়াছে, সিমলা ষ্ট্রীট হইতে পূর্ব্বদিকে গিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভেদ করিয়া পূর্ব্বমুখে আম-হর্ষ্ট ষ্ট্রীট ভেদ করিয়া নবাবদি ওস্তাগরের লেন হইয়া বরাবর বাদায় গিয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে এই নালা খুব প্রশস্ত ছিল, কলিকাতায় লোকের বসতি বৃদ্ধির সহিত ইহার অনেক অংশ পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা সুবিধামত আপন আপন জমীর মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। এখনও অনেক অংশ সুন্দর প্রশস্ত গলিরাস্তায় পরিণত হইয়াছে। সাহেবেরা পূর্ব্বে ইহাকে ইলিয়ট ক্রিক বলিত। চিৎপুর রাস্তায় যে স্থান ইহার দ্বারা ছেদিত হইয়াছিল, সেই স্থানে পাশা পাশি দুইটী কাঠের সাঁকো ছিল, তাহা হইতেই জোড়াসাঁকো নামের উৎপত্তি হয়।

(২) রামজীবন দত্তের বাটীর কোন কোন অংশ এখনও ভগ্নাবস্থায় দেখা যায়, ঐ অঞ্চলে উহা ভাঙ্গা-বাড়ী বলিয়া পরিচিত, এখন গো-শকটের আড্ডা হইয়াছে।

(১) রামবাগান, ডোমপাড়ার দক্ষিণে এই দত্তের বাটী ছিল, অল্প দিন হইল তাঁহারা উহা বিক্রয় করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন। এখন যাঁহারা রামবাগানের দত্ত-পরিবার বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা ঐ প্রাচীন বংশ বা বালির দত্ত নহেন। যে রসময় দত্ত এই বংশের তিলকরূপে কথিত হন, তাঁহার পিতামহ হুগলি জেলা হইতে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন।

সেই সময় অপরাপর দত্ত মহাশয়েরাও আসিয়া রামজীবনের বংশধরদিগের সহিত এক পল্লীতে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে গোবিন্দশরণ দত্তের বংশ হাটখোলার দত্তবংশে পরিণত হন।

প্রাইস নামক জনৈক ভারতহিতৈষী পার্লামেণ্ট সভায় ভারতবাসীর প্রকৃতি রাজভক্তি, আতিথ্য প্রভৃতি বিবিধ গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া, তাহাদের প্রতি যাহাতে অত্যাচারের পরিবর্ত্তে ন্যায় বিচার হয়, তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে লিখিত আছে, "গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্ম্মাণকালে অনেক সহস্র কুটীর ভাঙ্গিয়া তাহাদের বাটীস্থ যে সকল গর্ত্ত (পুষ্করিণী) হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ভরাট করিয়া রাস্তা এবং গড়ের মাঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে সকল লোকের ঘর ভাঙ্গা হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই নূতন ঘর নির্ম্মাণার্থ অন্যত্র পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত জমী এবং ঘরের মূল্য স্বরূপ অনেক টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।"

১৭৫৮ খ্রীঃ ১০ই জানুয়ারি, কলিকাতার কাউন্সিল বিলাতের বোর্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আছে,—"গোবিন্দপুরের সমস্ত অধিবাসীদিগকে আমরা স্থানান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, সেই স্থানে নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইবে। তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত সহরে বা সহরতলিতে গৃহ নির্ম্মাণ জন্য যথেষ্ট ভূমি দেওয়া হইয়াছে, সমস্ত পাকা বাটীর জন্য তাহাদের সন্তোষ জনক মূল্য দেওয়া হইয়াছে, কাঁচা গৃহেরও ঐরূপ মূল্য প্রদত্ত হইল, তদ্ভিন্ন তাহাদের দ্রব্যাদি স্থানান্তর করা ও অন্যান্য অসুবিধার ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছে। বোর্ডে হিসাব প্রেরণ করিয়া তাহাদের সমস্ত টাকা দেওয়া হইবে"। (১)

নবাব মিরজাফরের সহিত ইংরাজের যে বন্দোবস্ত হয়, তাহার মধ্যেও গোবিন্দপুরের হাট ও গঞ্জ যে বিলক্ষণ লাভবান সম্পত্তি, তাহার উল্লেখ দেখা যায়। দুর্গ নির্ম্মাণারম্ভ হইলে ঐ হাট ভাঙ্গিয়া কতক হাটখোলায়, পোস্তায়, খিদিরপুরে এবং বেলিয়াঘাটায় চলিয়া যায়, এবং হাটটী উঠিয়া চেতলায় গিয়া বসিয়াছে।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

শঙ্করাচার্য্য ও সমন্বয়ভাষ্য। (১)

"নব্যভারতের" প্রিয় পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কয়েকমাস পূর্ব্বে আমরা নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ-প্রচারিত গীতা সমন্বয়ভাষ্যের একটী সমালোচনা করিয়াছিলাম। সেই সমালোচনায় আমরা তাঁহার ভাষ্যের কতিপয় অংশে যে শঙ্করাচার্য্যের বিরোধী সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করি। তাহাতে গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা শঙ্করের মতে একই পদার্থ কিনা এবং পরকাল সম্বন্ধে শঙ্করের মত কিরূপ, এই কয়েকটী প্রধানতঃ বিচারের স্থল ছিল। এই কয়েকটী বিষয়ে সমন্বয়ভাষ্যকার যে

(১) Unpublished Government Record. Page 117.

শঙ্করের বিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখাইয়াছিলাম। কিছু দিন গত হইল, উপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষ হইতে, ঐ সমস্ত প্রবন্ধ একত্রিত করিয়া, "সমন্বয়ভাষ্য সমালোচনার পূর্ব্বোত্তর পক্ষ"—এই নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করা হয়। গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনে অধিকার আছে কি না, এ সম্বন্ধে শঙ্করের প্রকৃত অভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়া "নব্যভারতে" আমরা যে শেষ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, * এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই প্রবন্ধটী মুদ্রিত করা হয় নাই। ইহা দেখিয়া, এরূপ করিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলেন যে, উহা ভ্রমবশতঃ ছাপান হয় নাই এবং এই ভ্রমসংশোধনের জন্ত তিনি ঐ পুস্তক প্রচার বন্ধ রাখিয়া, তৎসম্বন্ধে এবং আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধ সম্বন্ধে † সম্প্রতি তাঁহার যাহা বক্তব্য, তাহা নব্যভারতে প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠক তাহা জানেন।

শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয়ের স্থায় পণ্ডিত এ দেশের মুখোজ্জ্বলকারী, মহাগৌরবের পাত্র। এ দেশ, বিশেষতঃ শাস্ত্র সমূহের প্রচারব্রতে তিনি যে ভাবে ব্রতী আছেন, তাহাতে হিন্দুশাস্ত্র ও বঙ্গভাষা, তাঁহার কাছে ঋণী। এই জন্তই আমরা তাঁহার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে তিনি যে বিষয় অবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে, সেই অবিচারই, সত্যপ্রকাশের সহায় হইবে বলিয়া, অনিচ্ছা সত্বেও, তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে। আর একটী কথা এই যে, তিনি কয়েকটী বিষয়ে আমাদের প্রতিও অবিচার করিয়াছেন। তাই, আবার কয়েকটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

আমরা গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে শঙ্করের অভিপ্রায় কি,—এই বিষয়টী দেখাইতে গিয়া ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকাদির ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলিয়াছিলাম, উপাধ্যায় মহাশয় তাহার উত্তর দিতে গিয়া, আমাদিগের উপরে একটী অবিচার করিয়া ফেলিয়াছেন। এজন্য আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। তিনি বলিতেছেন যে, আমরা না কি বিচারের বিষয়টী উল্টাইয়া দিয়া, তিনি যাহা বলেন নাই, তাহা লইয়া বাকাব্যয় করিয়াছি!! তিনি বলেন যে, তিনি নাকি "গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞানালোচনার প্রতিকূলে কোন কথা বলেন নাই।" আমরা এ বিষয়ের বিচারভার নিজে না লইয়া, পাঠকবর্গকেই প্রদান করিতেছি। পাঠক, গীতা ভাষ্যের যে স্থলটী লইয়া এই বিচারাংশটী উপস্থিত হইয়াছে, দয়া করিয়া সেই স্থলটী একবার দেখুন্। দেখিয়া বলুন, আমরা বিচারের বিষয়টীকে ঘুরাইয়া দিয়াছি কি না? গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের দশম শ্লোকের ভাষ্য লিখিতে গিয়া, উপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন:—"অত্র শ্রীমচ্ছঙ্করেণ একাকীত্যাদি বিশেষণ বলেন গৃহিনো ধ্যানযোগানধিকারত্বং যৎ সাধিতং তত্তু স্বকৃতভাষ্যবিরোধি।" অর্থাৎ উপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 'গীতোক্ত ধ্যানযোগে গৃহীর অধিকার নাই,'—এই যে শঙ্করের সিদ্ধান্ত

* "নব্যভারত," ১৩০৮ সাল, ১৯ সংখ্যা. "আমার প্রত্যুত্তর" শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "নব্যভারতে "প্রকাশিত, ১৩০৮ সাল; আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা দেখুন্।

ইহা, তিনি ছান্দোগ্যভাষ্যে নিজেই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার বিরোধী। শুধু ইহাতেই উপাধ্যায় মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই। গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যেও তিনি আরো দৃঢ়তা সহকারে, শঙ্করের এই সিদ্ধান্তকে তাচ্ছল্য করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। পাঠক, সে স্থলটীও পড়ুন্ :—"ধ্যানযোগে নাস্তি গৃহিণোঽধিকার ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করস্য প্রতিপত্তিং স্বয়মাচার্য্যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) গৃহস্থস্যাচরং প্রতিবদতীতি বিফলোঽত্র বিচারাবতারঃ।" অর্থাৎ উপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই যখন গৃহী হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতেন, তখন শঙ্করের যে গৃহীর ধ্যানযোগে অধিকার নাই, ইহা বিচার করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই। প্রিয় পাঠক! আপনিই এখন বলুন, আমরা বিচারের বিষয়টীকে ঘুরাইয়া লইয়াছি কি না। 'গীতোক্ত ব্রহ্মধ্যানে গৃহীর অধিকার নাই,'—শঙ্কর এই সিদ্ধান্ত করিয়া নিতান্ত অন্যায় করিয়া গিয়াছেন, ইহাই কি উপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষ্যের অর্থ নহে? আমরা তাই বলিয়াছিলাম যে, শঙ্করের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর গৃহীকে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার দিয়াছেন, অথচ সেই শঙ্করই গৃহীকে গীতোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার দেন নাই, ——এরূপ করাতে শঙ্কর কোন প্রকার বিরোধী কথা বা সিদ্ধান্ত করেন নাই। আমরা এই কথাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। সগুণ হউক্ বা নির্গুণ হউক্, শঙ্করাচার্য্য সকল গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান নিষেধ করেন নাই। শঙ্করের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারাতেই, অনেকে যথাশ্রুত অর্থ করিয়া, মনে করিয়া লইয়াছেন যে, শঙ্কর বুঝি ব্রহ্মজ্ঞানকে কেবল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েই ভুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। একথা যে ঠিক্ নহে, শঙ্কর যে তাহা করেন নাই, ইহা আমরা নব্যভারতে "আমার প্রত্যুত্তর" নামক প্রস্তাবে বিস্তারিত ভাবে, ছান্দোগ্য প্রভৃতি বহুবিধ উপনিষদের ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য জানিতেন যে, শাস্ত্রে যে অগ্নিহোত্রাদি কাম্য বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী গৃহীর কথা উল্লেখ আছে, তাঁহারা সাধারণ technical গৃহী মাত্র। প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে গৃহস্থাশ্রমে শ্রেণীবিভাগ ছিল। কাম্য যজ্ঞাদি করেন না, কেবল ইন্দ্রিয়জয়—প্রণবাভ্যাসাদি নিত্যকর্ম্ম করেন ও ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ গৃহীর সংখ্যাও গৃহস্থাশ্রমে কম ছিল না। * মনুতেও গৃহস্থাশ্রমের এই ঐতিহাসিক শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ আছে, একথা আমরা দেখাইয়াছিলাম। উপাধ্যায় মহাশয় তাহার উত্তরে যে কুল্লুকভট্ট টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উপাধ্যায় মহাশয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না, বরং সেই শ্রেণী-বিভাগেরই পোষক হয়। উপাধ্যায় মহাশয় যে অর্থ করেন যে "গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে গেলেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান অপরিহার্য্য", এ অর্থ সঙ্গত নহে। কুল্লুকভট্ট এ স্থলে কেবল ইহাই বলিতেছেন যে, গৃহস্থাশ্রমের এক শ্রেণীর গৃহী, শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ, কেবল ব্রহ্মধ্যান, উপনিষদাদি পাঠ ইত্যাদি নিষ্কাম ক্রিয়া

* বাণপ্রস্থাশ্রমও, গৃহস্থাশ্রমেরই উৎকৃষ্ট শাখা মাত্র। একথা আমরা "নব্যভারতে" প্রমাণ করিয়াছি। (নব্যভারত, ১৩০৮ সাল, ২৯২—২৯৩ পৃষ্ঠা)।

করিতে যত্নশীল হইবেন। কুল্লুকভট্ট এতদ্দ্বারা গৃহস্থাশ্রমস্থ উত্তম গৃহীর কথাই বলিয়া দিয়াছেন। গৃহীর মধ্যে এরূপ ব্রহ্মপরায়ণ-সাধক ভারতে চিরকালই ছিল। * গীতার উপদেশ এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মপরায়ণ গৃহীর জন্যই। অর্জ্জুন স্বয়ং এইরূপে গৃহীই ছিলেন। তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণ গৃহী-অর্জ্জুনকে 'বৈদিক কাম্য কার্য্য ত্যাগ কর,' পুনঃ পুনঃ এরূপ উপদেশ দিতেন না। এ কথা কেহই বলিবেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে পরিব্রাজক হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। ইঁহারা যাজ্ঞিক কর্ম্মপরায়ণ গৃহী ছিলেন না; ইঁহারা ব্রহ্মানুশীলনকারী গৃহী। উপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যারণ্যের যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও এই শ্রেণীর গৃহীর পক্ষে অনুকূল। গৃহস্থমাত্রেই যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। একথা আমরা পরে বিশেষ করিয়া দেখাইব।

যে স্থলেই শঙ্কর কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন, সেই স্থলেই উহাকে "কাম্য" কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনেকে এইটী বুঝেন না। বুঝেন না বলিয়াই মনে করেন যে, শঙ্কর বুঝি ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেরই নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। কেন যে শঙ্কর কেবল পরিব্রাজকাশ্রমকেই চরম ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রম বলিয়াছেন, তাহাও লোকে ভুল বুঝিয়া মনে করে, তবে বুঝি শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞানকে কেবলমাত্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে ভুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই দুইটী বিষয়েই লোকে অনেকে শঙ্করের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে। শঙ্করের এ বিষয়ে বাস্তবিক অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা নব্যভারতের শেষ প্রবন্ধে * প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। পাঠক দয়া করিয়া, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবন্ধটীও পাঠ করিয়া দেখিবেন। ইহার সঙ্গে সেটী পাঠ না করিলে আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি, সেটী ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, এখন আমরা, উপাধ্যায় মহাশয়,—আমাদের উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ভাষ্যের স্থল গুলির যেরূপ ব্যাখ্যা ও উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি না, তাহাই বিচার করিতে অগ্রসর হইতেছি। ইহা আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, উপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থ সঙ্গত হয় নাই; তিনি কেবল যথাশ্রুত অর্থমাত্র করিয়াছেন; শঙ্করের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের কথা ঠিক্ কি না, পাঠকই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের মূল অংশটী এই:—

"ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধাঃ। যজ্ঞোঽধ্যয়নংদানমিতি প্রথমঃ। তপএব দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ।
* * সর্ব্বএতে পুণ্যলোকা ভবন্তি।
ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি।"

ইহারই ভাষ্য লিখিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য কি ভাবে ভাষ্যটী লিখিয়াছিলেন, তাহার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ শঙ্কর

* বেদান্তদর্শনে ৩।৪।৪৯ সূত্রের ভাষ্যের টীকায় গোবিন্দানন্দ গৃহীকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, তাহার এক শ্রেণীর নাম "ঘোর-সন্ন্যাসী গৃহী" বলিয়াছেন। এস্থলটী গৌর বাবু ভুলিলেন কেন?

* "আমার প্রত্যুত্তর" নামক প্রবন্ধের শেষ সংখ্যা দেখুন।

এই ভাষ্য সম্বন্ধে প্রাচীন বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা তুলিয়াছেন এবং তাহাকেই পূর্ব্বপক্ষ রূপে ধরিয়া লইয়া, নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃত্তিকারের অভিপ্রায় ছিল এই যে,—গৃহস্থাদি আশ্রমস্থ ব্যক্তি সকলেরই, অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম পরায়ণ গৃহীরও "ব্রহ্মসংস্থ" হইবার অধিকার আছে; কেবল যে পরিব্রাজকই "ব্রহ্মসংস্থ" বলিয়া গণ্য হইবেন, অন্যান্য আশ্রম পারিবে না, তাহা নহে।

তস্মাদ্ য এব ব্রহ্মসংস্থঃ স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মবতাং সোঽমৃতত্বমেতীতি।

ইহাই বৃত্তিকারের মত। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এই মতটীর খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কাম্যযজ্ঞাদি ক্রিয়াপরায়ণ গৃহী প্রভৃতির "ব্রহ্মসংস্থ" হইবার যোগ্যতা নাই। তাঁহার ভাষ্যটীতে তিনি ক্রমে ক্রমে এই কথাই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। কাম্য কর্ম্মের অনিষ্ট নিবারণ করাই শঙ্করের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কেন এরূপ হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। লোকে যজ্ঞের ধূমজালে অন্ধ হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল। নিষ্কামকর্ম্ম ভুলিয়া, ব্রহ্মোপাসনা ছাড়িয়া দিয়া, লোকে কেবল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে মত্ত হইয়াছিল। এই কাম্য কর্ম্মের সহিত চরমব্রহ্মজ্ঞানের পার্থক্য, মানুষের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, তিনি মোটামোটি পরিব্রাজকাশ্রমকে, একমাত্র চরমব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া, কাম্য-যজ্ঞাদি কর্ম্ম যে নিতান্তই ভিন্ন, ইহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞানকে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীর সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কাম্য কর্ম্ম হইতে লোককে বিরত করা যাঁহার উদ্দেশ্য এবং তৎপরিবর্ত্তে বৌদ্ধের শূন্যবাদের স্থলে নির্গুণ ব্রহ্মস্থাপন করা যাঁহার লক্ষ্য, তিনি যে গৃহীদিগকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। একথা যাঁহারা বলিতে সাহসী হন, তাঁহারা ভারতের ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের অবমাননা করেন।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের বিচারস্থলগুলি সেই কাম্যকর্ম্মেরই নিন্দা উদ্‌ঘোষণ করিবার জন্য লিখিত। কিন্তু কাম্যকর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়া যে, গৃহস্থাশ্রমস্থ যে সকল উত্তম গৃহী ও বানপ্রস্থী ব্যক্তিগণ, উপাসনা, ইন্দ্রিয়বিজয়, উপনিষদাদির শ্রবণ, মনন ও ব্রহ্মের ধ্যানাদি করিতেন, তাঁহাদিগকেও শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞানলাভে অধিকার নাই বলিয়া গিয়াছেন, ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক কথা। ছান্দোগ্যের এই ভাষ্যেও, তাঁহার লিখন-ভঙ্গী হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয়। শঙ্কর এস্থলে কি বলিতেছেন, পাঠক অনুধাবন করুন্। শঙ্কর বলিতেছেন যে, বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। কেন নহে? নহে এই জন্য যে, সকল আশ্রমেই "কর্ত্তাদি কারক ক্রিয়াফল" এবং "ভেদ প্রত্যয়" বর্ত্তমান। কিন্তু পরিব্রাজকের কাম্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান নাই এবং ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে। শঙ্করের ভাষ্যের উক্তি ও ভাষা দেখুন:—তিনি বলিতেছেন,

"সর্ব্বোপনিষদাং তৎপরত্বাৎ কর্ম্মবিধীনাম প্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতিচেন্ন।"
"অনুপমর্দ্দিতভেদ প্রত্যয়বৎ পুরুষে প্রামাণ্যোপপত্তেঃ।"

প্রশ্ন এই যে যদি কর্ম্মানুষ্ঠান না করাই ব্রহ্মসংস্থা প্রাপ্তির হেতু হয়, তবে ত কর্ম্ম-বিধিরই প্রামাণ্য বিলুপ্ত হইয়া পাড়ে। শঙ্করের উত্তর এই যে, না, সে আশঙ্কা করিবার হেতু নাই। কেন না, যাহার ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হয় নাই (যেমন কাম্য-কর্ম্মশীল সাধারণ গৃহীবর্গ), তাহার নিকটে ত কর্ম্মের প্রামাণ্য রহিলই। যাহারা ব্রহ্ম-বিদ্ নহে, কাম্যকর্ম্মের আচরণ তাহারাই করিবে; তাহা হইলেই কাম্যকর্ম্মের উচ্ছেদ হইল না। এই স্থলেই শঙ্কর আবার প্রশ্ন তুলিতেছেন যে,

"পরিব্রাজকানাং ভিক্ষাচরণাদিবৎ উৎপন্নৈকত্ব প্রত্যয়ানামপি গৃহস্থাদীনাং অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানিবৃত্তি-রিতি চেন্ন।"

প্রশ্ন এই যে, পরিব্রাজকের ত কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, তথাপি তাঁহারা যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ভিক্ষা-চরণাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন; সে কর্ম্ম করায় পরিব্রাজকের যেমন দোষ সম্ভাবনা নাই; তদ্রূপ যে গৃহস্থের ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করুন্ না কেন? সেরূপ গৃহী অগ্নিহোত্রাদি করিলেও দোষ সম্ভাবনা নাই, কেন না, তাঁহার ত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে সেরূপ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইতে পারিবে না। শঙ্কর এ প্রশ্নের এই ভাবে সমাধান করিতেছেন,

"প্রামাণ্যচিন্তায়াং পুরুষপ্রবৃত্তেরদৃষ্টান্তাৎ।

অর্থাৎ পরিব্রাজক যেমন ক্ষুধা দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া ভিক্ষাচরণ করেন, গৃহস্থের পক্ষে সেরূপ কোন প্রবর্ত্তক ত তখন নাই। গৃহস্থ তখন কেন তবে আর অগ্নিহোত্রাদি করিবেন? শঙ্করের ভাষার কি ইহাই তাৎপর্য্য নহে যে, গৃহস্থ যেন কাম্যকর্ম্ম মোটেই না করেন; যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু গৃহস্থের এইরূপে ক্রমে চরম ব্রহ্মবিজ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারও পরিব্রাজকের ন্যায়, কেবল কাম্য কেন, কোন কর্ম্মেরই আবশ্যকতা নাই। গৌর বাবু এস্থলের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা যথাশ্রুত (superficial) ব্যাখ্যা মাত্র। আমরা শঙ্করের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য লইয়াই ব্যাখ্যা করিতে চাই। আমাদের এরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী কথা কেহই শঙ্কর ভাষ্য হইতে দেখাইতে পারিবেন না, বরং এইরূপ অভিপ্রায় না হইলেই, শঙ্করের অন্যান্য ভাষ্য সঙ্গত করা কঠিন হইয়া উঠে (প্রতিবাদের শেষ সংখ্যা নব্যভারতে দ্রষ্টব্য)। যদি এইরূপই অভিপ্রায় না হইবে, তবে শঙ্কর একটু পরেই একথা বলিলেন কেন যে, "কর্ম্মে অধিকার কাহার? না, যাহার ভেদবুদ্ধি যায় নাই।"

"যো হি অধিকৃতঃ কর্ম্মণি তস্য তদকরণে প্রত্যবায়ঃ।"

অর্থাৎ যাহার কাম্য-কর্ম্মে অধিকার তাহারই তাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া, কাম্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কেবল মাত্র উপাসনাদি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভে ক্রমে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহার পক্ষে কাম্য-কর্ম্মের কোন আবশ্যকতা নাই। শঙ্করের তাৎপর্য্যই এইরূপ। গৌর বাবু যে বলেন যে, আমরা নাকি ছান্দোগ্য ভাষ্যের অর্থ করিতে গিয়া শঙ্করের ব্যাখ্যার বিপরীত অর্থ করিয়াছি, পাঠক সেই স্থলগুলি দেখুন্।

"ন নিবৃত্তাধিকারস্য গৃহস্থস্যেব ব্রহ্মচারিণো বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে।'

শঙ্করের অর্থ এস্থলে এই যে, যাহার ভেদপ্রত্যয় অন্তর্হিত হয় নাই, কাম্যকর্ম্মের

অধিকার তাহারই। সুতরাং যাহার কাম্য-কর্ম্মে অধিকার, সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ কর্ম্ম পরিত্যাগ পাপজনক। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ শঙ্কর উপরিউক্ত ভাষ্যাংশটুকু লিখিয়াছেন। উহার অর্থ এই যে, "গৃহস্থ" যদি "ব্রহ্মচারীর" পক্ষে যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা না করেন, তবে সে গৃহস্থের কোন পাপ সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ যাহার যাহাতে অধিকার, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে, তাহা না করিলেই তাহার প্রত্যবায় হয়। এস্থলে গৌর বাবু যে বলিয়াছেন যে "নিবৃত্তাধিকারস্ত" এই বিশেষণটী গৃহস্থের সঙ্গে অন্বিত নহে,—উহা ব্রহ্মচারীর সঙ্গে অন্বিত,—এ ব্যাখ্যা নিতান্ত অসঙ্গত। মান্দ্রাজ হইতে ছান্দোগ্যভাষ্যের যে অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতেও পাঠক দেখিবেন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝাঁ এম্-এ, মহোদয় আমাদেরই অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এই-রূপ :—

"For instance, the non-performance by a "householder" of the duties of the "student" does not constitute a sin"

গৃহস্থমাত্রেরই যে কর্ম্মে অধিকার নিবৃত্ত হয় না, গৌর বাবুর এ ধারণা হিন্দু-শাস্ত্রের বিরোধী।

তার পরেই শঙ্কর প্রশ্ন তুলিতেছেন যে,—

"এবং তর্হি সর্ব্বঃ স্বাশ্রমস্থঃ উৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ঃ পরিব্রাড়িতি চেন্ন"।

পাঠক! শঙ্কর এই প্রশ্নের উত্তর কি ভাবে দিয়াছেন, তাহা দেখিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। শঙ্করের উত্তর এই :—

"স্বস্বামিত্বভেদবুদ্ধ্যনিবৃত্তেঃ,কর্ম্মার্থত্বাচ্চেতরাশ্রমানাম্"।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সঙ্গত নহে, কেন না, অন্যান্য আশ্রমে কাম্যযজ্ঞাদি কর্ম্মের আচরণ আছে এবং ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, গৃহস্থাদি আশ্রমে গৃহী যদি গোড়া হইতেই শ্রুত্যুক্ত কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, শ্রবণ-মননাদি নিত্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে এবং তাহার পরিপকাবস্থায় ক্রমে যখন তাহার ভেদবুদ্ধি চলিয়া যায়, তবে সে গৃহীত পরিব্রাজকের তুল্য হইবেনই। কেবল যে সকল গৃহস্থ "অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি" ইত্যাদি শ্রুতি-প্রেরণা দ্বারা কাম্যযজ্ঞাদির আচরণ করে, কেবল তাদৃশ গৃহীই পরিব্রাজকোচিত হয় না। অর্থাৎ শাস্ত্রে সাধারণ গৃহস্থাশ্রমীর প্রতি কাম্যকর্ম্মের বিধান দিয়াছেন, শঙ্কর কেবল সেই technical গৃহীদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নতুবা তিনি"ভেদবুদ্ধ্যনিবৃত্তেঃ এবং "কর্ম্মার্থত্বাচ্চ" এই দুই হেতু নির্দ্দেশ করিতেন না। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ যে বলেন যে, গৃহস্থ হইলেই, তাহাকে অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম করিতেই হইবে, গৃহস্থের কর্ম্মে কদাপি অধিকার নিবৃত্ত হয় না,—এ মীমাংসা শঙ্করের বিরোধী মীমাংসা, তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। এই উপলক্ষে আমরা পাঠককে "বেদান্ত-পরিভাষা" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একটী স্থল দেখাইব। "শ্রবণা-দিষু চ মুমুক্ষূণামধিকারঃ"। বেদান্ত পরি-ভাষার এইস্থলে পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চা-নন মহোদয় যে টীকা করিয়াছেন, তাহা পাঠক দেখুন্।

"ননু অবিশেষাৎ শ্রবণাদিষু সর্ব্বেষাং অধিকারোঽস্তু মুমুক্ষূণামেবাধিকারিত্বে প্রমাণাভাবাদিত্যত আহ কাম্যে ইতি। ফলজনকত্বেন কাম্যে কর্ম্মণি তৎফলকামস্যৈবাধিকারঃ। তথাচ * * * শ্রবণাদৌ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানরূপমোক্ষকামস্যৈবাধিকারঃ সম্ভবতি নান্যেষাং।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বর্গাদি চায়, কেবল তাহা-রই কাম্যকর্ম্মে অধিকার। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা চায় না, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানপ্রার্থী, তাহা-রই শ্রবণ-মননাদিতে অধিকার। পাঠক দেখুন্ গৌর বাবুর অর্থ "বেদান্ত-পরিভাষার ও বিরোধী কি না!! এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গৃহস্থ হইলেই যে তাহাকে অগ্নিহোত্রাদি করিতে হইবে, তাহা নহে। গৃহস্থ শ্রবণাদি নিত্যকর্ম্মও করিতে পারেন এবং এরূপ গৃহীর কাম্যকর্ম্মে অধিকার নাই। শঙ্করেরও মত এইরূপ। তাহা পরে দেখাইব। "বেদান্ত পরিভাষা" এই স্থলে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে,"সর্ব্বাশ্রম সাধারণং শ্রবণাদিবিধানং"। অর্থাৎ গৃহস্থাদি সকল আশ্রমেরই এই নিত্য শ্রবণাদিতে অধিকার আছে। কেবল যে সকল সাধা-রণ গৃহীর "পুত্র পশু স্বর্গাদিস্পৃহকটরাগদ্বেষা মনধিকারঃ" (ন্যায়পঞ্চাননের টীকা) অর্থাৎ যে গৃহীর পুত্র স্বর্গাদির প্রার্থনা আছে,কেবল তাহাদেরই ইহাতে অধিকার নাই। পাঠক দেখিতেছেন যে, উপাধ্যায় মহাশয়ের মীমাংসা নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ ও অসঙ্গত হই-য়াছে কি না।

যাহা হউক, এখন ছান্দোগ্য ভাষ্যের উদ্ধৃত আর একটী স্থল দেখিতে হইতেছে :—

"এতেন কর্ম্মছিদ্রে ব্রহ্ম সংস্থাসামর্থ্যম্"।

আমরা ইহার অর্থ করিয়াছিলাম যে, কর্ম্মছিদ্র থাকিলে ব্রহ্মসংস্থার অসামর্থ্য হয়, অর্থাৎ আমরা বলিয়াছিলাম যে, যতদিন কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকিবে, ততদিন গৃহীর ব্রহ্মসংস্থ হইবার সামর্থ্য জন্মে না। "সামর্থ্যম্" শব্দটীর পরে, আমাদের পুস্তকে একটী ছেদ বা দাঁড়ি ছিল। কাজেই অর্থ করিবার সময়ে আমরা একটী লুপ্ত অকার অধ্যাহার করিয়া লইয়াছিলাম। টীকাকার আনন্দগিরি "প্রত্যুক্তং" শব্দের সহিত "সামর্থ্যং" শব্দটীর যোগ করিয়াছেন। কিন্তু পাঠক দেখিবেন, অর্থে কোন পার্থক্য হয় নাই। আনন্দগিরির অর্থ এবং আমাদের অর্থ একই রূপ হইয়াছে। সুতরাং লুপ্ত অকারটী যোগ করিয়া দেওয়াতে, অর্থে কিরূপে "ভুল" হইল, তাহাত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। "ব্রহ্মসংস্থ হইবার সামর্থ্য থাকে না," এ অর্থও যাহা ;—আর "এতদ্দ্বারা ব্রহ্মসংস্থ হইবার যোগ্যতা খণ্ডিত হইল," এ অর্থও তাহা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এ স্থলেও আমাদেরই অর্থ স্থির থাকিয়া যাইতেছে।

আমরা উপরি উদ্ধৃত ভাষ্যাংশগুলির দ্বারা শঙ্করের প্রকৃত তাৎপর্য্য যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা আরো সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে, পাঠককে একটু মনোযোগ দিয়া শঙ্করভাষ্যের এই বিচারটীর সর্ব্বশেষ অংশ-টুকুও দেখিতে হইবে। আমরা প্রথম প্রতি-বাদে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া উপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাই নাই। সমস্ত কথা বলিয়া আসিয়া, শঙ্করাচার্য্য এইরূপে ভাষ্যটী সমাপ্ত করিতেছেন যথা :—

"তস্মাদ্বেদান্ত প্রমাণ জনিতৈকত্বপ্রত্যয়বত এতৎ কর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণং পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মসংস্থত্ব সিদ্ধমিতি।"

অর্থাৎ যে পরিব্রাজকের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া, একত্ব প্রত্যয় জন্মিয়া গেল, তিনিই পরিব্রাজক এবং তিনিই ব্রহ্মসংস্থ। তারপরেই শঙ্কর বলিতেছেন যে—

"এতেন গৃহস্থস্যৈকত্ববিজ্ঞানে পারিব্রাজ্যং অর্থ সিদ্ধম্।"

অর্থাৎ গৃহস্থেরও যদি এইরূপ একত্ব-বিজ্ঞান হয়, তবে সে গৃহস্থও পরিব্রাজকের তুল্য হয়। পাঠক দেখুন, ইহা অপেক্ষা

স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে ? ইহাতে একথা আসিতেছে না যে, তখন গৃহস্থকে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া দিয়া, পরিব্রাজক হইয়া যাইতে হইবে। ছান্দোগ্য ভাষ্যের এই অংশটী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তাঁহার "বেদান্তপরিভাষা"র টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রবণাদি-পরায়ণ গৃহীর যে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে, কর্ম্ম-সন্ন্যাস উপস্থিত হইয়া, গৃহস্থাশ্রমেই চরম একত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই, ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এই স্থলটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাঠক বেদান্ত পরিভাষা গ্রন্থের ঐ স্থলটী দেখিবেন। সে স্থলে আমরা ভাষ্যের যে অর্থ করিয়াছি, মূলে ও টীকায় সেই অর্থই করা হইয়াছে। কর্ম্ম-ত্যাগই পরিব্রাজকের বিশেষ লক্ষণ; গৃহীরও যখন সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ হইয়া যায়, তখন সেই বিশেষ লক্ষণ গৃহস্থেতেও হইতে পারে, এই অর্থই সে স্থলে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের অর্থই সঙ্গত হইতেছে। উপাধ্যায় মহাশয় যে বলেন যে, গৃহস্থের একত্ব-বিজ্ঞান জন্মিলে, পরিব্রজ্যায় অধিকার জন্মে, এরূপ অর্থ কেবল জোর করিয়া করা হইয়াছে। শঙ্করের অভিপ্রায় বুঝিতে তিনি নিতান্তই ভ্রমে পড়িয়াছেন।

গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে প্রত্যেক স্থলেই শঙ্করের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় এইরূপ। কাম্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, তিনি এই কথা লোকের মনে দৃঢ়-মুদ্রিত করিবার জন্যই, ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্করের বাস্তবিক তাৎপর্য্য কি তাহা দেখিলাম। ছান্দোগ্যের এই দীর্ঘ ভাষ্যাংশটীর সমগ্র স্থানটীর মোটের উপর তাৎপর্য্য কি, তাহা বলা এখানে আবশ্যক হইতেছে, তাহা হইলেই অভিপ্রায় সুব্যক্ত হইয়া পড়িবে। বৈদিক যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্ম-পরায়ণ সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তির "ব্রহ্মসংস্থ" হইবার অধিকার আছে কি না, এই প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া শঙ্কর বিচার করিয়া দেখাইলেন যে, না,—সকাম যাজ্ঞিক গৃহীর কখনও ব্রহ্মসংস্থ হইবার উপায় নাই। কেন নাই ? নাই এইজন্য যে, সে কামনা-পরায়ণ; কামনাই তাহার লক্ষ্য। যাহার কামনা লক্ষ্য, সে তাহারই ফল পাইবে। কিন্তু শঙ্কর একথাও বলিয়া যাইতেছেন যে, যে গৃহীর কামনা লক্ষ্য নহে, যে উপাসনাদি নিত্যকর্ম্মপরায়ণ ও ব্রহ্ম যে গৃহীর লক্ষ্য,—সে গৃহীর ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মসংস্থতার অধিকার জন্মিতেছে। কেন না, তাহার ক্রমে "ভেদবুদ্ধি", "স্বস্বামি-ভাব", চলিয়া যাইতেছে এবং "একত্ব প্রত্যয়" জন্মিতেছে। এইরূপে যখন সম্পূর্ণরূপে ভেদ-জ্ঞান চলিয়া গিয়া, পূর্ণ একত্বজ্ঞান জন্মিয়া গেল, তখন আর সে গৃহস্থের নিষ্কাম নিত্য-কর্ম্মেরও আবশ্যক নাই। এ অবস্থায় শঙ্কর "উপাসনা" পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। এ অবস্থায় গৃহী আর গৃহী থাকেন না, তিনি পরিব্রাজকের ন্যায়ই হন, কেন না, তখন তাঁহার "স্বস্বামিত্বাদি ভেদবুদ্ধি" এবং কর্ম্মাদি" চলিয়া গিয়াছে। এইরূপে গৃহীর "ব্রহ্মসংস্থতা" লাভ হয়। শঙ্কর এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ গৃহী ও যে উত্তম গৃহী কেবল নিষ্কাম কর্ম্মের আচরণ মাত্র করিতেছেন, কিন্তু এখনও চরম ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিতে বাকী আছে, এরূপ গৃহী এবং পরিব্রাজক একান্ত ভিন্ন বটে। কিন্তু "গৃহস্থ হইতে গেলেই যে তাঁহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে," অর্থাৎ গৃহস্থমাত্রকেই যে যজ্ঞাদি করিতেই হইবে,

উপাধ্যায় মহাশয়ের এ সিদ্ধান্ত, আমরা শঙ্কর ভাষ্য হইতে পাইতেছি না। যদি গৃহস্থমাত্রেরই কদাপি "কর্ম্মে অধিকার নিবৃত্ত হয় না," এই কথাই হয়, তবে আর উপাধ্যায় মহাশয় উদ্ধৃত ভাষ্যে যে অর্থ করিয়াছেন যে—"গৃহস্থের বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয় না, কেন না কর্ম্মে তাঁহার অধিকার নিবৃত্ত হইয়াছে,"—এ অর্থ তিনি করেন কেমন করিয়া? "অনুপমর্দ্দিত ভেদবুদ্ধি বিদ্যয়া যঃ স কর্ম্মণ্যধিকৃত ইত্যবোচাম,"—শঙ্করই বা এ কথা কেমন করিয়া বলিতে পারেন? যাহার আদৌ কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগের অধিকার নাই, তাহার সম্বন্ধে—'বিদ্যার দ্বারা যাহার ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় নাই, সেই ব্যক্তিই কেবল কর্ম্মে অধিকারী'—একথা বলা খাটে কি? কেন না, ভেদবুদ্ধি চলিয়া যাওয়াইত তাহার পক্ষে অসম্ভব; আর ভেদবুদ্ধি চলিয়া গেলেই বা তাহার কর্ম্মের অধিকার যাইবে কিরূপে? যেহেতু উপাধ্যায় মহাশয়ই বলিতেছেন যে, "গৃহস্থ হইতে গেলে তাঁহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে।" পাঠক, কেবল ইহাই নহে। উপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থের আর একটী স্থলও দেখুন। "শত্রুর প্রতি অভিচার,"—এ স্থলে উপাধ্যায় মহাশয় "অভিচার" অর্থ "অত্যাচার" করিয়াছেন। মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি কার্য্যকেই যে সংস্কৃত শাস্ত্রে "অভিচার" বলে, উপাধ্যায় মহাশয় তাহা ভুলিলেন কেন?

যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে, গৃহীমাত্রেরই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই, শঙ্কর এ কথা কোথাও বলেন নাই। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান পাইতে হইলেই যে, গৃহীমাত্রকেই সংসার ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে, এরূপ নিদারুণ ও ভয়াবহ সিদ্ধান্ত শঙ্কর স্থাপন করিয়া যান নাই। শঙ্কর এত নির্দ্দয় ও কঠোর সন্ন্যাসী নহেন যে, গৃহীকে তিনি এত ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন। কেবল যথাশ্রুত অর্থ করাতেই শঙ্করের উপরে এই অবিচার করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের আরো কয়েকটী কথা বলিতে আছে, কিন্তু তাহা আগামী বারে বলিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু রসায়নের ইতিহাস।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত হিন্দু-রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস প্রভুত অধ্যবসায়ের ফল, ভারতবাসীর অতি গৌরবের ধন। রসায়ন-পণ্ডিতকে হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ, চরক, সুশ্রুত, বাগভট, শার্ঙ্গধর ও চক্রপাণী, বেদ-পুরাণ, তন্ত্র, হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান শাস্ত্র ও ইতিহাস কাব্য ও দর্শন মন্থন করিয়া এই অপূর্ব্ব কোহিনুর উদ্ধার করিতে হইয়াছে। তাঁহার ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও গবেষণার যথেষ্ট প্রশংসা করা যায় না।

একদিন ছিল, যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা কিছু ভারতবর্ষীয়, দেবতার প্রসাদের ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। যখন আর্য্যবংশীয় বলিয়া গণ্য হইতে তাঁহারা

লালায়িত হইতেন, যখন গ্রীক ও লাটিন ভাষাকে সংস্কৃতের দুহিতা বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিতেন, হিন্দু দেবনিবাসের উপনিবেশী বলিয়া জুপিটর ও প্রমিথিউস আদৃত হইতেন। এখন সে দিন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা কিছু হিন্দু, তাহাই ঘৃণিত ও পদদলিত, ব্রাহ্মণের কুহক-কালিমায় হিন্দুসমাজ বিকৃত, হিন্দুশাস্ত্র বিকারের প্রলাপ, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ছায়া, সকলি এত নূতন যে, এখনও সূতিকাগন্ধ পাওয়া যায়। হিন্দুর নিজের কিছুই নাই, সকলই ঋণ-গৃহীত। অক্ষরের উদ্ভব ফিনিসিয়ায়, জ্যামিতি, গণিত, বীজ-গণিত গ্রীক বা আরেবিয়ায়, দর্শন মিসরে, ব্যাকরণ বিতশিয়ায়। স্কচ দার্শনিক ডুগাল ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছিলেন,—

"Not only sanskrit literature but also sanskrit language was a forgery made by the crafty Brahmans on the model of Greek after Alexander's conquest"

কেবল সংস্কৃত সাহিত্য নহে, সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত কুটিল ব্রাহ্মণেরা সিকন্দরের আক্রমণে গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের অনুকরণে জাল করিয়াছে। জার্ম্মাণ পণ্ডিত হেয়াস বলেন, বাগভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়, মাধবকরের নিদান ও শার্ঙ্গধর পদ্ধতি পড়িয়া চরক ও সুশ্রুত রচিত হইয়াছে। আর কয়েক দিন পরে শুনিব, মুগ্ধবোধ ও প্রক্রিয়া কৌমুদী পড়িয়া পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। জষ্টিস আমির আলি লিখিয়াছেন,—

"The Arabs invented chemical pharmacy and were the founders of those institutions which are now called dispensaries."

অর্থাৎ রসায়ন-শাস্ত্র আরবেরা আবিষ্কার করিয়াছিল। চিকিৎসালয় বা হাঁসপাতাল তাহারাই প্রতিষ্ঠা করে। অথচ গিরিগাত্রে অশোকের লিপিমালা, চিকিৎসালয় স্থাপনের বিধান আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘোষিত করিয়াছিল এবং সাধারণের অবগতির জন্য কোন্ রোগের কি ঔষধের ব্যবস্থা, তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। তাহারও শত শত বর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধ বিনয়পিটকে চিকিৎসা ও চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। তাঁহারও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদে লিখিত হইয়াছিল যে, বিপ্লবে কুমারী বিষফলার একখানি পা কাটিয়া যাইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে একখানি লোহার পা গড়াইয়া দিয়াছিলেন।

গণিতের ঐতিহাসিক কাণ্টর গ্রীক ও হিন্দু জ্যামিতির সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, হিন্দুসুলভ সূত্রগুলি গ্রীক পণ্ডিত হেয়ারোর জ্যামিতি দেখিয়া খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ ২১৫ পরে লিখিত হইয়াছে, অথচ সুলভ সূত্রগুলি খ্রীষ্ট জন্মিবার আট শত বৎসর পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, উক্লিদের সাত চল্লিশ প্রতিজ্ঞা পিথাগোরাস আবিষ্কার করেন। বস্তুতঃ পিথাগোরাসের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা এ প্রতিজ্ঞা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্রডার সাহেব বলেন, পিথাগোরাস হিন্দুদিগের কাছে এই প্রতিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট জন্মিবার সাত আট শত বৎসর পূর্ব্বে ধ্বনিগত বর্ণমালা ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়, স্বর ও ব্যঞ্জন বিভিন্ন হয়। খ্রীষ্ট জন্মের দুই সহস্র বৎসর পরেও য়ুরোপীয়েরা ইহার সমতুল্য বর্ণমালা আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

হেয়াস সাহেব বলেন যে, হিন্দু বৈদ্যক শাস্ত্র খ্রীষ্টের দশম ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে

গ্রীক বৈদ্য শাস্ত্রের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। তাঁহার প্রমাণ যে গ্রীকেরা বায়ু, পিত্ত, কফ প্রকোপ সকল রোগের নিদান বলিত, হিন্দুরাও তাহাই করে। গ্রীক বৈদ্য বিখ্যাত হিপোক্রেটীসকে আরবেরা বুক্রত বলিত। এই বুক্রত নাম হিন্দুরা সুশ্রুতরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাগভটের অষ্টাঙ্গ হৃদয়, চরক ও সুশ্রুতের সংক্ষিপ্তসার, তাহার সঙ্গে হারিত ও দু একখানি অন্য গ্রন্থের কোন কোন কথা যোগ করা হইয়াছে। বাগভট পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন, শেষ বয়সে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ, তখন অষ্টাঙ্গহৃদয় রচিত হয়। চীন পরিব্রাজক ৎসিং অষ্টাঙ্গহৃদয়ের মত একখানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বোগদাদের খলিফাগণ চরক, সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গহৃদয় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঞ্জুর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে তিব্বতদেশে রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে চরক, সুশ্রুত ও বাগভটের অনুবাদ গ্রথিত হইয়াছে। কুন্তে অনুমান করিয়াছেন যে, খ্রীষ্ট জন্মের অন্যূন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাগভটের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

বাগভট, চরক ও সুশ্রুতকে অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হরণলী ও বুহলার বলেন যে, মধ্য-আসিয়ায় যে হস্ত লিখিত গ্রন্থরাশি (Bower Manuscripts) পাওয়া গিয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয় চারি শত ও পাঁচ শত অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে চরক, সুশ্রুত ও হারিতের কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে রোগের যে সকল ব্যবস্থার কথা লেখা আছে, তাহা অবিকল চরকে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলিও চরক ও সুশ্রুতকে অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কাত্যায়ন খ্রীষ্ট জন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সুশ্রুতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সুশ্রুতেরও পূর্ব্বে চরক। সুশ্রুত অস্ত্র-চিকিৎসা ও চরক ঔষধ চিকিৎসার গ্রন্থ। চরকের অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত গদ্য ব্রাহ্মণ যুগের ভাষা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা যে ভগবান শাক্যসিংহের জন্মের পূর্ব্বকার গ্রন্থ, তাহার সন্দেহ নাই।

চরকেরও পূর্ব্বে অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি বৈদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরও পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদে শত শত রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধ বিনয় পিটক খ্রীষ্ট জন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তাহা পড়িলে দেখা যায়, তখন হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্র পূর্ণাবয়ব লাভ করিয়াছে।

বায়ু পিত্ত কফ রোগের নিদান বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মহাবর্গে ও পাণিনির ব্যাকরণে বৈদ্যগ্রন্থের পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাত্যায়ন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চারি শত অব্দে বাতপিত্ত শ্লেষ্মার উল্লেখ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় রসায়নের আরম্ভ হয় নাই। পারা সেলসস ইহারও তিন শত বৎসর পরে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় রসায়নের আরম্ভ। এতদিন পর্য্যন্ত আরব্য রসায়ন য়ুরোপ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল।

আরবীয়েরা তাহাদের রসায়ন হিন্দু-

দিগের নিকট শিক্ষা করে। কিতাব উল ফিরিস্ত নামক আরবী গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত হয়। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, খলিফা হারুণ উল রসিদ ও খলিফা মানস্থর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বিবিধ সংস্কৃত বৈদ্যগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। আচার্য্য উইলসন লিখিয়াছেন;—

"In medicine it is clear that the Charaka, the Susruta, the treatise called Nidan on diagnosis, and others on poisons, diseases of women and therapeutics all familiar to Hindu Science, were translated and studied by the Arabs in the days of Harun and Mansur."

ফ্লুগেল সাহেব বলেন, মানখ নামে একজন হিন্দু বৈদ্য সঙ্কট রোগে হারুণকে আরোগ্য করেন। হারুণ তাঁহাকে আপন চিকিৎসালয়ের ভার দিয়া বোগদাদে বাস করান। এই মানখ সুশ্রুত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। হাজী খলিফা বলেন যে, তাঁহার সময়ে আরবীয়েরা হিন্দু জ্যোতিষ গণিত ও বৈদ্যশাস্ত্রের প্রভূত আলোচনা করিতেন। হিন্দু পণ্ডিতগণ বোগদাদে যাইয়া মুসলমানদিগকে এই সকল শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এবং অনেক মুসলমান শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে যাইতেন। এইরূপ একজন শিক্ষার্থী আলবিরুণী। তাঁহার পরিপালক মামুদ গজনী যখন দেবভঙ্গে ও দেশ লুণ্ঠনে পরিব্যস্ত ছিলেন, বিরুণী তখন জ্যোতিষ ও উপনিষদের চর্চ্চা করিতেছিলেন। মুলর বলেন, চরক, সুশ্রুত, নিদান, অষ্টাঙ্গহৃদয় এবং শনক প্রণীত বিষ চিকিৎসার গ্রন্থ অর্থাৎ বিশিষ্ট সকল বৈদ্যগ্রন্থই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, এবং হিন্দু অনেক বৈদ্য বোগদাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যবসা করিতেন। নসিরবানের সমকালবর্ত্তী বার্জ্জয়েরা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। আচার্য্য সাশৌ লিখিয়াছেন;—

"The cradle of Arabic literature is not Damascus but Bagdad...The foundation of Arabic literature was laid between 750—850 A.D...Greece, Persia and India were taxed to help the sterility of the Arab mind."

যে সকল হিন্দু-শাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি প্রত্যক্ষে সংস্কৃত হইতে, অন্যগুলি পরোক্ষে পহ্লবী হইতে অনূদিত হইয়াছিল। বোধ হয়, চরক, পহ্লবী পথে আরব্যে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। খলিফা মানস্থরের সময়ে (৭৫৩—৭৭৪) হিন্দুদেশ মুসলমানেরা অধিকার করে। সিন্দু হইতে রাজোপঢৌকনের সহিত অনেক পণ্ডিত বোগদাদে যাইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত ও খণ্ডক খাদ্য লইয়া যান। অলফাজারী ও যাকুবতারিক পণ্ডিতদিগের সাহায্যে গ্রন্থ দুই খণ্ড আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এইরূপে আরবেরা টলেমীর রোমক জ্যোতিষ শিখিবার পূর্ব্বে হিন্দু জ্যোতিষ শিখিয়াছিল, তাহার পর খলিফা হারুণ উল রসিদের সময় (৭৮৬—৮০৮) বালখ হইতে পরমক বংশীয় একজন মুসলমান বোগদাদে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বালখ নগরের নববিহার নামক বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু বা পরমক ছিলেন। মুসলমান হইলেও এই পরমক বংশের হিন্দুশাস্ত্রে শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই। তাঁহারা লোক পাঠাইয়া ভারতবর্ষ হইতে অনেক গ্রন্থ ও অনেক পণ্ডিত হারুণের দরবারে উপস্থিত করেন। সেই সকল গ্রন্থ হারুণ আরবী ভাষায় অনু-

বাদিত করিয়াছিলেন। আচার্য্য মাকডোনেল বলেন ;—

"During the 8th and 9th centuries the Indians became the teachers of the Arabs ...and through them of the nations' of the West."

লাঞ্ছিত ভারতকে সিংহাসনে বসাইতে যাঁহার প্রয়াস, তিনি ভারতের সুসন্তান। ধৃষ্ট পাশ্চাত্য অপণ্ডিতগণের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এমন শান্ত মূর্ত্তিতে এমন বীরবল, রাসায়নিকের এমন ঐতিহাসিকতা আমাদিগকে বিস্মিত ও পুলকিত করিয়াছে। ধৃতি, অধ্যবসায় ও গবেষণা তাঁহার নিত্য সাধনা, তাঁহার প্রশংসা করিবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ রসায়নের ইতিহাস মাতৃভূমির ন্যায় রত্নভাণ্ডার। যে যত্ন করিয়া আগরে প্রবেশ করিবে, সে ধনী হইবে। একটী বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল কি না? শুক্রাচার্য্য প্রণীত শুক্রনীতিতে নালিক অস্ত্রের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা দেখিলে নালিক যে বন্দুক, শুক্রনীতি রচনার সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা যে বন্দুক ও বারুদের ব্যবহার জানিত, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিকের সঙ্গে একমত হইয়া গ্রন্থকার অনুমান করিয়াছেন যে, মোগলেরা ভারতবর্ষে বন্দুক আনয়ন করে। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাপার হইয়া কনোজ আক্রমণ করিবার সময় সুলতান বাবর সর্ব্বপ্রথমে বন্দুক ও কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তীরে এক প্রকার দাহ্য পদার্থ সংযোগ করিয়া নিক্ষেপ করিত। এই দাহ্য পদার্থ গ্রীক ফায়ার বা যবনাগ্নি নামে য়ুরোপে প্রচারিত হয়। গ্রন্থকার অনুমান করেন, সুবর্চ্চ লবণ, বা সোরা হইতে দাহ্য পদার্থ প্রস্তুত হইত। এলিয়টের ভারতেতিবৃত্ত পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল, কেরোসিনের মত কোন পদার্থকে যবনাগ্নি বলিত। হিন্দুরা যবনাগ্নিকে ঔষধি তৈল বলিতেন।

সে যাহা হউক, শুক্রনীতির প্রমাণ অগ্রাহ্য করিবার কারণ কি? ডাক্তার রায় বলেন, উহার বর্ণনা বারুদ ও বন্দুককে এত স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বারুদ ও বন্দুক সম্বন্ধে লোকের তাদৃশ জ্ঞান ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সম্ভবতঃ ও অংশটী প্রক্ষিপ্ত, পরবর্ত্তী সময়ে কেহ যোগ করিয়া দিয়া থাকিবে। সন্দেহ করিবার আরো কারণ যে, কামন্দকীয় নীতি সূত্রে ও অগ্নিপুরাণে বন্দুকের কোন উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন :—

From the circumstantial details given above, especially of the method of preparing charcoal, one is naturally led to suspect that the lines relating to gunpowder as quoted above are later interpolations. The suspicion is further enhanced when it is borne in mind that in the Polity of kamandaki, an ancient work of undoubted authority, there occurs no reference whatever to fire arms nor is there any in the Aginpurana in which the subject of training in the use of arms and armours takes up four chapters, archery forming the leading element.

গ্রন্থকার আরো বলেন যে, ভ্রাতৃবিনাশ যুদ্ধের জন্য যুধিষ্ঠির যে আয়োজন করিয়াছিলেন, মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব পড়িলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক দাহ্য পদার্থ ছিল, কিন্তু বন্দুক বা বারুদ ছিল না।

অর্থাৎ শুক্রনীতিতে ঠিক ঠিক বর্ণনা আছে, তাই বিশ্বাস করা যায় না এবং কামন্দকীয় নীতি ও অগ্নিপুরাণে কিছুই নাই, তাই বিশ্বাস করা যায় না। একখানি গ্রন্থে কোন বিষয়ের বর্ণনা যদি থাকে এবং তৎসাময়িক

বা তৎপরবর্ত্তী অন্য গ্রন্থে যদি তাহার বর্ণনা না থাকে, তাহা হইলে প্রথম গ্রন্থের বর্ণনা যে অবিশ্বাস করা উচিত নহে, গ্রন্থকার তাঁহার উপক্রমণিকার ৫৭ পৃষ্ঠায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সেখানে স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"This is another apt illustration of the dangers of the *argumentum ex silenitio.*"

আগ্নেয়াস্ত্র (বন্দুক ও কামান) উদ্ভাবনের গৌরব ভারতবর্ষের প্রাপ্য কি না, ইহার প্রকৃতরূপ মীমাংসা হয়, এজন্য আমরা এ সম্বন্ধে কিছু আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আচার্য্য গষ্টেভ অপার্ট প্রকাশিত শুক্রনীতি ও বৈশম্পায়ন-নীতি ডাক্তার রায় পড়িয়াছেন কি না, আমরা জানি না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সুসন্তান ডাক্তার রামদাস সেন আর্য্যজাতির আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-রহস্যে সে প্রবন্ধটী ছাপা হইয়াছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে ডাক্তার রামদাস সেনের রহস্যত্রয় উপেক্ষা করিতে কাহারও অধিকার নাই।

শুক্রনীতি ও বৈশম্পায়ন নীতি-প্রকাশিকা প্রকাশ করিয়া আচার্য্য গষ্টেভ অপার্ট ডাক্তার রামদাস সেনকে লিখিয়াছিলেন—

"I have traced the gun to the Veda.

নালীক ও অগ্নিচূর্ণ সম্বন্ধে ডাক্তার আচার্য্যকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তদুত্তরে আচার্য্য লিখিয়াছিলেন—

"You refer to the difficulty you experienced in finding support for the explanation of nalika and Agnichurna, I hope to have supplied you with the desired information from the Netiprakasika and the Naisadha. It is very difficult to find carroborative historical evidence in sanskrit writings, as history is a subject not much regarded by ancient writers."

আমরা আশা করি, আচার্য্য অপার্ট ও ডাক্তার সেনের যুক্তিগুলি ডাক্তার রায় একবার বিচার করিয়া দেখিবেন।

বন্দুক ও বারুদের বর্ণনা কেবল শুক্রনীতিতেই সমাবদ্ধ নহে। শুক্রনীতির অধ্যায়টী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। তর্কের খাতিরে একথা মানিয়া লইয়াও আমরা দেখাইব, নীতিপ্রকাশিকা, রামায়ণ ও মহাভারতেও বন্দুকের বর্ণনা আছে। উদ্ধৃত স্থানগুলি ভারত-রহস্য হইতে সংগ্রহ করিলাম। যাঁহারা এতর্কের সম্যক মীমাংসা করিতে চান, তাঁহারা ভারত-রহস্য খানি পড়িয়া দেখিবেন।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ১।৫।৬।৭ শ্লোকের সায়নাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ, "সেই লৌহময়ী স্থূণা, যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র, তন্মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যাহা বহিরাগত হয়, তাহাও জ্বলন্ত।"

বৈশম্পায়ন নীতি-প্রকাশিকায় আছে—

"নলিকা ঋজু দেহা স্যাৎ তন্বঙ্গী মধ্যে রন্ধ্রিকা
মর্ম্মচ্ছেদকরী"

গ্রহণং ধ্যাপনং চৈব ন্যাতক্ষেতি গতিত্রয়ম
তামাশ্রিতং বিদিত্বাতু জেতাসন্নান্ রিপুন যুধি"

নলিকার কায়া ঠিক সোজা ও সরু ইহার মধ্যে রন্ধ্র আছে; বর্ণ কাল এবং ইহা হইতে ক্ষুদ্র লৌহগুলিকা, তীরের ন্যায় সবেগে প্রেরিত হইয়া শক্রর মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া থাকে। প্রথমে গ্রহণ পরে প্রজ্জ্বলিত করণ, পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ, এই ত্রিবিধ ক্রিয়া নলিকার আশ্রিত, ইহা জানিলে আসন্ন শক্রকে অনায়াসে জয় করা যায়। এই নলিকা বা নলিকাস্ত্রের কথা বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর ধৃত বীরচিন্তামণি গ্রন্থে রামায়ণ

ও মহাভারতে উল্লেখ আছে। এই অস্ত্রের অপর নাম অয়ঃকণপ ও তুলাগুড়া, আদি পর্ব্বে উল্লিখিত অয়ঃকণপের নীলকণ্ঠ এই রূপ অর্থ করিয়াছেন ;—"অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তৎতথাবিধং লৌহময়ং যন্ত্রং যেন আগ্নেয় ঔষধ বলেন গর্ভসম্ভূতা লৌহগুলিকা ক্ষিপতন্তে।"তুলাগুড়ার নীলকণ্ঠ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"তুলাগুড়াঃ ভাণ্ডগোলকাঃ ভাণ্ডানি আগ্নেয় দ্রব্য বলেন গোলনিক্ষেপ পাত্রানি। তুলান বন্দুখ ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষা প্রসিদ্ধানি।"

গুলি করিয়া বাঘ মারা আজিও রাজপুতানায় অগৌরবের কারণ, ভীরুতার লক্ষণ। তরবারী হস্তে রাজপুত ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া ব্যাঘ্র হত্যা করা গৌরবের কারণ বলিয়া মনে করেন। এজন্য শৌর্য্য সম্পন্ন হিন্দুভারতে কূটযুদ্ধে ভিন্ন বন্দুক ব্যবহার নিন্দনীয় হইয়াছিল। এজন্যই সকল গ্রন্থে নালিকাস্ত্রের উল্লেখ করা হয় নাই। বৈশম্পায়ন নীতিপ্রকাশিকায় লিখিয়াছেন ;—

> যন্ত্রাণি লৌহ সোসানি গুলিকা ক্ষেপকাণি চ
> তথা চোপল যন্ত্রাণি কৃত্রিমাণা পরাণি চ
> কূটযুক্ত সহয়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ নৃপ
> অধর্ম্ম বৃদ্ধ্যা চৈতানি ভবিষ্যন্ত্যুত্তরোত্তরম্।

কলিকালের পৌরুষহীন, অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময় লৌহ গুলিকাক্ষেপক যন্ত্র, প্রস্তরক্ষেপক যন্ত্র এবং অপরাপর কৃত্রিম যন্ত্র সকল কূটযুদ্ধের উপকরণ হইবে। যতই অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, ততই লোকে কূটযুদ্ধ ও তদুপযুক্ত প্রহরণের আশ্রয় লইবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ভক্তকবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর।

দীনতার প্রতিমূর্ত্তি বৈষ্ণব-কবিগণের জীবনী সংগ্রহ করা যে কতদূর দুরূহ কার্য্য, তাহা এক মাত্র ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। ঋষিতুল্য নিস্পৃহ এই সকল পুণ্যশ্লোক মহাত্মারা পাণ্ডিত্যে ও চরিত্রগুণে অসংখ্য লোকের গুরুস্থানীয় হইয়াও সর্ব্বদা সকলের নিকট নত থাকিতে ভালবাসিতেন ও নিজকে এত দীনহীন মনে করিতেন যে, নিজের সম্বন্ধে প্রায় কোন কথাই প্রকাশ করিতেন না। এ জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণও তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। আজ সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পরে তাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করা যে একেবারেই সাধ্যাতীত, একথা বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন। এজন্য আমরা মহানুভব শ্রীলোচন দাস ঠাকুর ও পরমভাগবত শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবনী প্রকাশ করিয়াও তাঁহাদের সাধুজীবনের সকল কথার উল্লেখ করিতে সমর্থ হই নাই। আজ আমরা যে মহাত্মার বিষয় বলিতেছি, তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম বঙ্গবাসী মাত্রের নিকটই বিশেষরূপে সুপরিচিত। ভক্তকবি ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নাম যদিও বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহার পবিত্র জীবনের মধুমাখা কথা অনেকের নিকটই অজ্ঞাত। এবিষয় সম্পূর্ণরূপে জানা আমা-

দের ভাগ্যেও ঘটিয়া উঠে নাই। তবে যে পর্য্যন্ত অবগত আছি, তাহা ভক্তমণ্ডলীর করকমলে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

বৈষ্ণব মহান্তগণের মধ্যে শ্রীবাস আচার্য্য একজন প্রধান ও মহাপ্রভুর প্রধানতম পারিষদ। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপে যত কিছু লীলা খেলা, তাহা প্রায় সমস্তই শ্রীবাসের বাটীতে হইয়াছিল। শ্রীবাস বৈদিক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ, জন্মস্থান শ্রীহট্ট। সেই সময় অনেক শ্রীহট্টবাসী অধ্যয়ন উপলক্ষে নবদ্বীপে আসিয়া শেষে একেবারে নবদ্বীপবাসী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিও এ প্রকারে অথবা অন্য কোন কারণে নবদ্বীপবাসী হইয়া থাকিবেন। তাঁহার নবদ্বীপের বাটীতে শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি নামক আরও তিন সহোদর ছিলেন। শ্রীবাসের জীবনের প্রথম ভাগ বড় ভাল ভাবে যায় নাই। ষোড়শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় বিষয়াসক্ত ও ভগবদ্ভক্তি-বিমুখ ছিলেন। তৎপর তিনি মহাপ্রভুর কৃপায় নবজীবন লাভ করিয়া কি প্রকারে প্রধান মহান্ত মধ্যে পরিগণিত হন, তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে—

শ্রীচৈতন্য ভগবান ঈশ্বর আবেশে।
পুনর্ব্বার হাসি কহে পণ্ডিত শ্রীবাসে॥
অরে শ্রীনিবাস কিছু স্মৃতি কর তুমি।
বাহির হৈতে তোমার প্রাণ রাখিল যে আমি॥
চাপড় মারিয়া তোরে কৈনু সাবধান।
স্মৃতি হৈল শ্রীনিবাস বলে বিদ্যমান॥
মৃত্যু হৈতে আমারে রাখিল কোন জন।
এই মোর চিত্তে প্রভু আছয়ে স্মরণ॥
শুনিয়া বিস্ময় সবে হৈলা চমৎকার।
প্রভু কহে মূল হৈতে কহত বিস্তার॥
সে প্রসঙ্গ শুনেন সকল ভক্তগণ।
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিবাস কথা কন॥
যখন না ছিল প্রভু তুঁয়া অবতার।
তখন আমার ছিল বড় দুরাচার॥
এ ষোড়শ পর্য্যন্ত বৎসর হৈল বয়।
মত্ত হৈয়া ভ্রমি আমি চিত্ত স্থির নয়॥
দ্বিজ গুরুজনে কভু না করি বন্দন।
কাষ্ঠ হেন কঠোর নির্দ্দয় মোর মন॥
কলহ করিয়া আমি ভ্রমি যথা তথা।
সদাই অস্থিরবুদ্ধি সদাই কুকথা॥
সপ্নেহো কখন কৃষ্ণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
না করিলু লোকে বলে এ বড় দুর্জ্জন॥
এক দিন অচেতন হৈয়া নিদ্রা যাই।
পূর্ব্বজন্ম পুণ্য ফল ধরিল তথাই॥
সকরুণ কোন মহাপুরুষ আসিয়া।
স্বপ্ন হেন আমারে কহিল ডাক দিয়া॥
অরে অরে নিন্দিত ব্রাহ্মণ দুরাচার।
কেবা তোবে কহে উপদেশ বাক্য সার॥
তবু কহি তোরে দেখি, সার্দ্র চিত্ত মোর।
অতঃপর বর্ষ মাত্র পরমায়ু তোর॥
অতঃপর কৃষ্ণ ভজ সাবধান হৈয়া।
বৃথা আয়ু ক্ষয় না করিহ মদ পাইয়া॥
এত বলি সেই পুরুষ করিল গমন।
জাগিয়া আমার হৈল সুদুঃখিত মন॥
প্রাতঃকাল হৈতে সেই উপদেশ কথা।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ করি মনে জানিল সর্ব্বথা॥
অল্প আয়ু জানি অতি বিমনা হইনু।
পুর্ব্বের চাপল্য যত সব তেয়াগিনু॥
দুঃখিত হইয়া সে দিন কৈলু উপবাস।
সেই উপদেশামৃত করিলু আশ্বাস॥
পুরুষের নিঃশ্রেয় সে কি করিলে হয়।
ভাবিতে ভাবিতে হৈল ভাগ্যের উদয়॥
নারদীয় পুরাণে পাইল এই শ্লোক।
তাহা পাইয়া সুখী হৈলু গেল দুঃখ শোক॥
হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
অন্যথা কলিতে গতি নাই নাই আর॥

তথাহি বৃহন্নারদীয় পুরাণে——

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

"দনুজ দমন কৃষ্ণ উপদেশ করি।
এই শ্লোকে জানিলাম মনেতে বিচারি॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি নিল নামের শরণ।
হরেকৃষ্ণ গোবিন্দাদি বলি অনুক্ষণ॥
নামরসে মত্ত আমি পাসরিলু ঘর।
লোকে দেখি পরিহাস করয়ে বিস্তর॥
না শুনি লোকের বাক্য শাস্ত মন হৈয়া।
অন্য বৃত্তি ছাড়ি বুলি কৃষ্ণ নাম গাইয়া॥
দিন গণি মাস গণি হৈয়া অপ্রমাদ।
নিকট হইল মৃত্যু অন্তর বিষাদ॥
এই মত বর্ষ গেল মৃত্যু যে আইল।
সেই দিন আমি মনে বিচার করিল॥
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম বন্ধু জন।
নিজ গৃহে ভাগবত করায় অধ্যাপন॥
আজি মৃত্যু দিন মোর অবশ্য মরিব।
মৃত্যু দিনে ভাগবত শ্রবণ করিব॥
এত ভাবি গেলু দেবানন্দের ভবনে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কথা হৈল সেই দিনে॥
প্রহ্লাদ চরিতামৃত শুনিতে শুনিতে।
মৃত্যুর সঙ্গত আমি হৈলু আচম্বিতে॥
আনন্দে আছিনু কথা শুনিবার তরে।
জ্ঞান নাহি ঢালিয়া পড়িলু সে সত্বরে॥
হেন কালে কেহ এক অপূর্ব্ব শরীর।
প্রাণ যে আমার হৈয়া গিয়াছিল বাহির॥
পুনঃ তাহা আনি পরমায়ু সঞ্চারিয়া।
জীয়াইয়া গেল মোরে মনে পড়ে ইহা॥
জ্ঞান প্রাণ পাইয়ে পুনঃ উঠিনু বসিয়া।
সব লোক ঘরে তবে আনিল উঠাইয়া॥
এত শুনি ভক্তগণে হৈল চমৎকার।
গৌর ভগবান তাঁরে কহে পুনর্ব্বার॥
রাত্রি মধ্যে আমি তোরে স্বপ্ন দেখাইনু।
জীউ দান দিয়া তোরে পুনঃ বাঁচাইনু॥
ইহা শুনি সর্ব্বজনে হইলা বিস্ময়।
হাসি হাসি ভগবান পুনঃ তারে কয়॥
স্পর্শমণি স্পর্শে যেন লৌহ সোণা হৈল।
ঐছে তুয়া সেই দেহ এমন হইল॥
তোমাতে নারদ শক্তি প্রবেশ করিল।
সে হেতু এ দেহ সর্ব্ব শক্তি যুক্ত হৈল॥"

শ্রীবাসের নারায়ণী নামে এক ভ্রাতৃকন্যা ছিলেন। নারায়ণী দেবী অতি বাল্যকাল হইতেই একান্ত ভক্তিমতী ও শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহপাত্রী। এই ভাগ্যবতী বালিকার কথা শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কাব্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াহভ্রাতৃকা মধুরদ্যুতিঃ।
হরেঃ প্রাশ্য প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা॥"

এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও লিখিত আছে—

"সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ।
আজ্ঞা দিলা "নারায়ণী কৃষ্ণ বলি কাঁদ"॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ! বলিবা মাত্র পড়িলা ভূমিত॥
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হলো স্থল নয়নের জলে॥"

যখন শ্রীবাসের ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর মহাপ্রকাশ হয়, তখন প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া এই পুণ্যবতী বালিকা কৃতার্থ হইয়াছিলেন—

"ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।"
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥
পরম আহ্লাদে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয় "নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি শুনি॥"
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কাঁদে অতি বালিকা স্বভাব॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনী।
গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥"

এই নারায়ণী দেবীর পবিত্র গর্ভে সাহিত্যকাননের কলকণ্ঠ-কোকিল বৈষ্ণব-

কবি-কহিনুর ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণী শ্রীবাসের কোন্ ভ্রাতার কন্যা—শ্রীরাম, শ্রীপতি শ্রীনিধি অথবা তাঁহাদের শ্রীহট্টের বাটীতে স্থিত অপর কোন ভ্রাতার কন্যা, আর কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে, কাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং কোন্ শকের কি মাসে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন আর তিনিই বা কোন্ সময় শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা বিশস্ত রূপে কিছুই জানি না। এ বিষয়ে বহু লোকের নিকট যে বিস্তর প্রবাদ-বাক্যের উল্লেখ শুনা যায়, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তবে নবদ্বীপের অন্তর্গত মামগাছী গ্রামে শ্রীনারায়ণী-সেবা নামে একটা সেবা ও তন্নিকটবর্ত্তী ৫।৬ ক্রোশ পশ্চিমে দেনুড় গ্রামই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট বাটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে দেখিয়া, মামগাছী অথবা দেনুড় গ্রামই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মভূমি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আর যখন শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স অষ্টাদশ কি বিংশ বৎসর তখন নারায়ণী চারি বৎসরের বালিকা মাত্র; সুতরাং এই প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহার কিছুকাল পরে নারায়ণী দেবী বিবাহ ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ৮।১০ বৎসর পরে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ ত্যাগের পর যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ প্রভুর নবদ্বীপলীলা দর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ করিয়াছেন—

"হইল পাপিষ্ঠ, জন্ম নহিল তখনে।
বঞ্চিত হইনু সেই সুখ দরশনে।"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কয়েক বৎসর পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আগমন করিয়া প্রেমভক্তি প্রচারার্থ অধিকাংশ সময় গৌড়-দেশে অতিবাহিত করেন। সে সময় যে সকল মহান্ত তাঁহার সঙ্গ ও শিষ্যত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরই সকলের শেষে শিষ্যত্ব লাভ করেন। তাঁহার আগমনের পর আর অধিক দিন নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট লীলা ছিল না। ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু অদর্শন হন। ইহার কিছু কাল পরেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাব হয়। এই সময়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বয়স ১৫ কি ১৬ বৎসর। সুতরাং তিনি শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গসুখ দীর্ঘকাল লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। অন্ততঃ তাঁহার গ্রন্থরচনা সময়ে যে নিত্যানন্দ প্রভু এ মরজগতে ছিলেন না, তাহা তাঁহার এই আক্ষেপ উক্তিতেই পরিষ্কার বুঝা যায়—

"জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ।"

শিশুকাল হইতেই বৃন্দাবন দাস মাতা নারায়ণী দেবী ও শ্রীবাস আচার্য্য, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি প্রভৃতি মহান্তগণের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের অমিয়মাখা মধুর লীলা শ্রবণে মন প্রাণ শীতল করিয়া আসিতেছিলেন; তাহাতে আবার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিলে নিতাইচাঁদের শ্রীমুখে গোরাচাঁদের মধুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-প্রেমে এমনই মাতোয়ারা হইলেন যে, তখন আর একা তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। মানবগণকে গৌর-নিতাইর মধুর কাহিনী জানাইয়া সুখ-শান্তির অধিকারী করিতে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়া, এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। তাঁহাতে তিনি চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন ;—

"অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যের লীলা কিছু লিখিতে পুস্তকে।

* * *

নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শীরে।
সূত্র মাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে ॥

* * *

বেদগুহ্য চৈতন্য-চরিত কেবা জানে।
তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে ॥

* * *

নিত্যানন্দ প্রভুমুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য ॥"

বৃন্দাবন দাস যে সময় শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন, তখন বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লেখার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। সকলেই সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিতেন। শ্রীমুরারি গুপ্ত ও শ্রীপুরীদাস কবিকর্ণপূর শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কাব্য এবং শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য নামক যে দুই খানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সে দুই খানাই সংস্কৃতে। কিন্তু বৃন্দাবন দাস সে প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। যখন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেমভক্তি প্রচারার্থ গৌড়দেশে পাঠান,তখন অধম পতিতাদির কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াদিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও মহাপ্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন নাই ; যত দীন হীন, অধম ও নীচ জাতির মধ্যে প্রেম-ভক্তির অধিক প্রচার করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও ইষ্টদেবের পদানুসরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিলে পণ্ডিত ভিন্ন অপরের বোধগম্য হইবে না। যাহাতে আপামর সকলেই বুঝিতে পারে, এজন্য অতি সরল বঙ্গভাষাতে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল বঙ্গভাষাতে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধীয় আদি গ্রন্থ। মহাপ্রভুর লীলামাধুর্য্য ও প্রেম-ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব ইহাতে অতি সরল সুললিত পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাগ্রন্থের প্রতি ছত্র যে কি এক মহাশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহা যাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ের সম্যক পরিচয় পাইয়াছেন। এইরূপ শক্তি সম্পন্ন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর দ্বিতীয় নাই। এই গ্রন্থ পাঠে অতি শুষ্ক হৃদয়ও প্রেম-ভক্তিরসে আর্দ্র হয়। এই মহাগ্রন্থের মহিমা ও ইহার আভ্যন্তরিক পরিচয় বর্ণনা করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাধ্য নাই। প্রেমের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-মাধুরী, প্রেমিক কবি বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন ; ইহার আমরা কি বুঝিব ? আর এ সম্বন্ধে কিই বা বলিব ? প্রবীণ পণ্ডিত পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন। মাত্র তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

"ওরে মূঢ় লোক শোন চৈতন্য মঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিবে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার ॥
চৈতন্য মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটী নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তিঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ হইল ত্রিভুবন॥"

সত্য সত্যই এই মহাগ্রন্থ পাঠকালে সকলের মনেই উদয় হয়;—

'মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।'

পূর্ব্বে এ দেশের গায়কেরা মন্দিরা চামরাদি যোগে সুমধুর স্বরে এই গ্রন্থ গান করিতেন; আর লক্ষ লক্ষ শ্রোতা শ্রবণ করিয়া মন প্রাণ শীতল করিতেন। শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পাঠ ও ব্যাখ্যাদি হইত। গ্রন্থের ভাবগাম্ভীর্য্য ও অলৌকিক শব্দশক্তি এবং শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন শ্রীকৃষ্ণলীলা বিস্তার বর্ণিত আছে, এই গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যলীলা সেই প্রকার বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ইত্যাদি দেখিয়া একান্ত প্রীত মনে শ্রীবৃন্দাবনবাসী মহান্তেরা এই মহাকাব্যের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম রাখেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে মহাপ্রভুর আদি ও মধ্যলীলাই বিস্তৃত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ খণ্ডে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বর্ণনে এতই আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহাতে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় যে সকল লীলা বর্ণনা করিবেন বলিয়া সূত্রে উল্লেখিত ছিল তাহার আর বর্ণনা করেন নাই। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন।
সূত্র ধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥"

শুধু আবিষ্ট হইয়াই যে এরূপ করিয়াছিলেন এমতও নহে। ইহার আরও একটা গূঢ় কারণ ছিল। সে কথা শ্রীঘনশ্যাম দাস ঠাকুর ভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন;—

"পরম রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করেন বর্ণন॥
পশ্চাতে বর্ণিব করি মনে বিচারিয়া।
রাখয়ে সে সকলের সুখের লাগিয়া॥
প্রভুর লীলা বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন।
দক্ষিণ ভ্রমণ আদি না কৈল বর্ণন॥
ব্যাসরূপ তেঁহ তাঁর কে বুঝে আশয়।
পশ্চাৎ বর্ণিব বেদব্যাস ঐছে কয়॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহে দৈন্য করি।
দক্ষিণ ভ্রমণ আদি বর্ণিল বিস্তারি॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিব যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥
যৈছে ইষ্টদেব সুখে অন্নাদি ভুঞ্জিয়া।
পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া॥"

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও এই কথার পোষকতা করিয়া গিয়াছেন;—

"তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
প্রভুর লীলামৃত তেঁহ কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ॥

* * *

চৈতন্য লীলামৃত ঘন দুগ্ধাদি সমান।
তৃষ্ণারূপ ঝারি ভরি তিঁহ কৈল পান॥
তাঁর ঝারি শেষামৃত মোরে কিছু দিলা।
তাহাতে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥"

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া এই "বিজ্ঞবর বৃন্দাবন দাস" শ্রীজাহ্নবা দেবীর

সঙ্গে খেতরী গ্রামে গিয়াছিলেন। উৎসবের পর জাহ্নবা দেবীর বৃন্দাবন গমন সময়ে, দেবীর আদেশে মীনকেতন রামদাস কমলাকর পীপলাই প্রভৃতি মহান্তগণের সঙ্গে তিনি খরদহ গ্রামে গমন করেন। তৎপর আর তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কি না এবং কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে তিনি লোকলীলা সমাপন করেন, তাঁহার রচিত আর কোন গ্রন্থ আছে কি না, ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা প্রামাণিক গ্রন্থে কিছুই পাই নাই। তবে তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা সম্বন্ধীয় অনেকগুলি মধুর পদ আছে। তাহা পদকল্পতরু, পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আর তিনি যে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষাতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ, পদাবলী এবং সিদ্ধান্ত সমূহই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। সেই অধ্যয়ন-সুখ স্মরণ করিয়া সময় সময় এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত ॥"

বৃন্দাবন দাসের রচিত বলিয়া যে সম্প্রতি কয়েকখানা গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রচিত কি না, তদ্বিষয় বিশেষ বিবেচনা ও বিচার সাপেক্ষ, আমরা দুঃখের সহিত ইহাও জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান সময়ে যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত দেখিতে পাই, তাহার কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীগোপাল মিশ্র, মহাপ্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে অচেতন হইয়া প্রভুর আদেশে পুনঃ চৈতন্য লাভ করেন; এ কথা বিস্তৃতরূপ বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রচারিত চৈতন্যভাগবতে এ বিষয় দেখা যায় না। এইরূপ যে গ্রন্থের আর কোন অংশ লুপ্ত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

অধুনা কোন কোন লেখক ও সমালোচক গ্রন্থের যথার্থ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, কেহ কেহ বা গ্রন্থ না পড়িয়াই, "বৃন্দাবন দাস উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন, নারায়ণীর বিধবা অবস্থায় তাঁহার জন্ম হয়, তজ্জন্য লোকের শ্লেষোক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া গ্রন্থে বিবিধ কটূক্তি করিয়াছেন" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা লিখিয়াছেন। বড় দুঃখের বিষয়, এই সকল কথা তাঁহারা কি সূত্রে সংগ্রহ করিলেন, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না; মাত্র প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করেন। ছল ও অপধর্ম্মপ্রবল বঙ্গদেশে নানা স্থানের দুষ্ট মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হয়। ঐ সমস্ত জঘন্য কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ঋষিতুল্য মহাত্মাদের চরিত্রে কোনরূপ দোষারোপ করা যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

বঙ্গ-সাহিত্যের ধ্রুবতারা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বঙ্গের আদি কবি, ঐতিহাসিক কাব্যের আদি লেখক। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তিনি ব্যাসাবতার বলিয়া পূজিত। যথা শ্রীকবিকর্ণপূর কৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়;—

"বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।"

তিনিই প্রথম বঙ্গভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা লিখিয়া পাপী তাপী ও অধম পতিতগণের মধ্যে মহাপ্রভুর লীলা-মাধুরী প্রচার

করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীলোচন দাস ঠাকুর প্রভৃতি সকলই তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্য লীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥"

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন ;—

"বৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥"

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"নারায়ণীসুত বন্দি বৃন্দাবনদাস।
যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ॥"

শ্রীঘনশ্যাম দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন ;—

"জয় বৃন্দাবন দাস গুণের সাগর।"

শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নহে, যত কাল বঙ্গভাষা থাকিবে, ততকাল শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অক্ষয় কীর্ত্তি সাহিত্য-জগতে দেদীপ্যমান থাকিবে। আর ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সেবী মাত্রেই বঙ্গ সাহিত্যের আদিগুরু এবং ঐতিহাসিক কাব্যের আদি লেখক বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে সাষ্টাঙ্গে কোটী কোটী প্রণাম করিবেন।

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

'সিন্ধু-সঙ্গীতের' কবি।

১৯০২ সালে কবিবর শশাঙ্কমোহন সেনের 'সিন্ধু-সঙ্গীত' (১) প্রকাশিত হইয়াছে। এত দিন পরে কেন যে আমি তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সংক্ষেপে তাহার দুই একটী কারণ দেখাইব।

বহু পুণ্যফলে প্রকৃতির স্নেহের সন্তান কবির অপূর্ব্ব বীণা-ঝঙ্কার, সংসার-সমুদ্রে লাঞ্ছিত কত কঠোর, নিরাশ প্রাণকে জাগাইয়া তুলে। যিনি আমাদের কথা, সমস্ত জগতীর কাহিনী বলিতে বলিতে আত্মহারা হন; আমাদিগকে পৃথিবীর প্রকৃত উপভোগ্য বস্তুর সন্ধান করিয়া দেওয়াতেই যাঁহার অসীম সুখ, সেই পরম আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসার পরিবর্ত্তে যদি অবজ্ঞা প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদের হইতে অধিক অকৃতজ্ঞ আর কে আছে? আজ সাত বৎসর হইল, 'সিন্ধু-সঙ্গীত' প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, বাঙ্গালার অতি অল্প সংখ্যক লোকের সহিতই কবির প্রকৃত পরিচয় হইয়াছে। যদিও জানি, এখনও আমাদের রুচি ও শক্তি প্রতিভার সম্মান করিবার উপযুক্ত হয় নাই, তথাপিও ক্ষমতাবান্ কবিকে অজ্ঞাতভাবে দিন কাটাইতে দেখিলে কবির কোন্ হৃদয়বান্ ভক্ত স্থির থাকিতে পারে? আমি সিন্ধু-সঙ্গীতের একজন ভক্ত; আমার লেখনী, সিন্ধু-সঙ্গীত এবং তাহার কবির প্রকৃত পরিচয় দিবার জন্য যে ব্যগ্র হইবে, তাহা স্বাভাবিক। যদি আমার অনবধানতায় তাঁহার কবিতা-রাণী ব্যথিতা হন,

(১) সিন্ধু-সঙ্গীত, শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, বি-এ, বি এল প্রণীত। চট্টগ্রাম—"জ্যোতিঃ" আফিসে পাওয়া যায়।

তাহা আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ মনে করিয়া কবির রসজ্ঞ ভক্তগণ আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

একদিন প্রখর সূর্য্য-কিরণে যখন সফেন তরঙ্গায়িত নীল-সিন্ধু ভৈরব নৃত্যে আপনার কর্ম্মপ্রবণ হৃদয়কে পৃথিবীর নিকট উন্মুক্ত করিতেছিল; সেই উন্মত্ত তরঙ্গকে অবহেলা করিয়া একখানি বাষ্পীয়-পোত হেলিয়া দুলিয়া আপনার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পোতে কত লোক আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু একটী প্রাণ সেই অসীম সমুদ্র দেখিয়া আপনার প্রাণে সমুদ্রের বিশালতা ও মর্ম্মগান অনুভব করিতে লাগিলেন। ভাবের প্রথম উন্মেষেই তিনি বলিলেন—

"সলিল সাগর বুকে অনিল সাগর স্থির,
প্রীতির সঙ্গীত গায় যুগে যুগে লহরীর;
তলাভরা মেঘচয়
ধীরে অতি ধীরে বয়;—
উপর গগনে রবি হরষে বরষে করে;
চলেছে সমুদ্র যান মন্থর নর্ত্তন ভরে।"

সহসা আকাশ মেঘাচ্ছাদিত হইল। কাহার ইঙ্গিতে সিন্ধুর অতলস্পর্শী হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া আসুরিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিল! সমস্ত বিশ্বে 'সাজ' 'সাজ' হুঙ্কারে সমরতুরী বাজিল! সংক্ষুব্ধ অকূল সমুদ্র; ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ তমসাচ্ছন্ন; তরণীর যাত্রী ক্ষুদ্র মানবগণ সেই অসীমতায় আপনাদের আশ্রয়স্থান পাইবে না ভাবিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল! কবি স্থির নেত্রে ঊর্ম্মির তাণ্ডব নৃত্য, চপলার বিকট হাসি দেখিয়া বলিলেন—"কঠোর আনন্দে মম ভরিয়া গিয়েছে প্রাণ।" সম্মুখে মৃত্যু হস্ত প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে;—এ সময় আপনার প্রাণরক্ষার চেষ্টাই বহু লোকের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু কবির প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। কবি স্বপ্নমদিরা জড়িত চক্ষে প্রকৃতিতে জন্ম ও মৃত্যুর যে তত্ত্ব সংগ্রহ করেন, তাহা পৃথিবীর বহু লোকের নিকটে দুর্ব্বোধ্য। প্রতি মুহূর্ত্তে বিশ্বে কত কোটী কোটী অমর আত্মা, জন্ম ও মৃত্যুর কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মৃত্যু যেন কি এক রহস্যের অন্তরায়। এক একটী আত্মা মৃত্যুর পরে জাগ্রত হইয়া কত নির্জ্জীব প্রাণকে জাগাইতেছে। আমরা যাহাকে 'মৃত্যু' বলি, তাহাত অবস্থার রূপান্তর মাত্র। এজগতে কিসের মৃত্যু হয়? বৃক্ষপত্র রূপান্তরিত হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। মেঘ বৃষ্টিতে পরিণত হয়! কিন্তু শক্তির মৃত্যুও নাই—জন্মও নাই! তাই আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়াও কবি সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয় লইতে কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা দেখুন—

সমুদ্রে মরণ! সেত শান্তির আশ্বাস বাণী!
প্রবাল মুকুতা হর্ম্ম্যে বরুণের রাজধানী;
হীরক মাণিক আলা,
বারুণী প্রবাল বালা,
গাহিবে মণ্ডলী নৃত্যে ঘুম-পাড়ানিয়া গান!
মুকুতা-কুসুম শয্যা, মুকুতার উপাধান!"

যিনি উন্মত্ত সমুদ্রতলে 'প্রবাল মুকুতা হর্ম্ম্যে বরুণের রাজধানীতে' বাস করিতে প্রস্তুত, তাঁহার হৃদয় সমুদ্রের ন্যায়ই অতলস্পর্শী এবং হীরক, মুকুতার ন্যায় উজ্জ্বল। এখানে কল্পনার দেবশিশু শেলির, সমুদ্রে দেহত্যাগের কথা মনে পড়িতেছে। সেই ঘটনার ভিতর যে কত জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য্য আছে, তাহা শেলির ন্যায় হৃদয়ই সম্যকরূপে বুঝিতে পারে। Don Juan

নামক বোটে চড়িয়া শেলি কি ভাবে সমুদ্র-বিহার করিতেছেন, তাহা ট্রিলনির (Trel lawny) মুখেই জানিতে পারিয়াছি—"

"Shelley was intent on catching images from the ever-changing sea and sky he heeded not the boat."

ক্রমে কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্র কষাঘাতে উন্মত্ত হইয়া এই সুন্দর ধরণীর ঐশ্বর্য্য এবং আত্মীয়দিগকে ভুলিয়া সমুদ্রের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন! জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল;—কেবল আর একটী জলন্ত অগ্নিশিখা আপনার ভাববহ্নিতে পুড়িয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি বাইরন্। সিন্ধু-সঙ্গীতের কবির ভিতরেও শেলির জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্য ও উধাও কল্পনা স্বাধীনভাবে দেখিতে পাই; ক্রমে ক্রমে তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে। তবে শেলির উন্মত্ত আন্তরিকতা যে, জগতে দুর্লভ, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

আলোক, বায়ু ও রস-সংযোগে পুষ্প যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, মানব হৃদয়ের ভাবগুলিও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। পুষ্পের বিকশিত হওয়া যেমন সাধনা সাপেক্ষ, আমাদেরও তাহাই। সেইজন্য সিন্ধু-সঙ্গীতের কবি সর্ব্ব প্রথমেই বিশ্বে আপনার বিম্ব দেখিতে পান নাই। সিন্ধুর সহিত প্রথম পরিচয়ে কেবল সিন্ধুর বিশাল শরীর, উর্ম্মির নৃত্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন। একটু ঘনিষ্টতা জন্মিলে পর, সিন্ধুর তলদেশে "কোলাহল শূন্য বরুণের রাজধানী" কল্পনা করিলেন। তার পর কবি অসীম সিন্ধুকে দেখিতে দেখিতে আপনার দেহ, শক্তি ও অবস্থাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—

"এ মহা শক্তির তীরে কে আমরা ক্ষীণ প্রাণী;
যুগ যুগান্তর ব্যাপী জড়তার রাজধানী।
জনম জনম ধরি,
শক্তি হীন উঠি পড়ি।
ঘৃণ্য জন্ম, ঘৃণ্য মৃত্যু, দুইটীর অন্তরালে
নিরাহার দাসত্বের কুঙ্কুম চর্চ্চিত ভালে।"

স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমিক কবি সিন্ধুর অসীম ক্ষমতা এবং অবিরাম কর্ম্মশীলতা দেখিয়া বঙ্গদেশ ও তাহার অধিবাসীদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তখন তিনি দিব্যকর্ণে সমস্ত ধরণীতে 'উন্নতির ভেরির' মঙ্গলগান শুনিতে পাইলেন। কিন্তু তন্দ্রালস জড়িত, বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালীকে জগতের পদতলে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া সমুদ্রকে সম্বোধন করিলেন;—

* * *

"হে সমুদ্র তব তীরে,
মোদের বসতি কিরে!
বাজে কি মোদের কর্ণে এ মেঘ মল্লার গান?
শঙ্খের সুদূর শ্রুত নেপথ্য গম্ভীর ধ্বান?"

ক্রমে আমাদের নির্জ্জীবতা কবির অসহ্য হইল; তাই সমুদ্রকে, বঙ্গ গ্রাস করিয়া ফেলিতে আহ্বান করিলেন। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন যে, যাঁহারা সাম্, ঋক্ গানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করিয়াছিলেন; এই সিন্ধু অতিক্রম করিয়া সিংহল জয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ! এই ভোগবিলাসী, অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালীদের পূর্ব্বপুরুষ!! যে জাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের অবমাননা করে, তাহাদের উন্নতি কোথায়? মৃত জাতির পুনরুত্থানের প্রধান সহায়ই পূর্ব্ব পুরুষগণের চিহ্নিত পথ। যে জাতি সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে দিন দিন প্রাণকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করে, তাহাদের ইতিহাস ধরণীর

বক্ষ হইতে মুছিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কবি চাহেন, আমরা সজীব হইব। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দাঁড়াইবার একটু স্থান হইবে। আমাদের এক একটী প্রাণ শত শত প্রাণকে জাগাইয়া তুলিবে—আমরা সৌন্দর্য্যের আধার হইব। আমাদের বিকৃত অবস্থা দেখিয়া কবির প্রাণের তন্ত্রীগুলি ছিঁড়িতে চাহে; তাই তিনি সংক্ষুব্ধ চিত্তে বলেন—"শতগুণে মহাসিন্ধু তোল বিশ্বনাশী বাণ।" কিন্তু আমাদের উন্নতিই যে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য; এ জগতে প্রিয় বস্তুর অধঃ-পতন দেখিলে কে স্থির থাকিতে পারে? কবি সমুদ্রের নিকট শক্তি ও জ্ঞানের যে সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাহাই আমাদের উত্থা-নের একমাত্র অবলম্বন বুঝিয়া বলিলেন;—

"তব আত্মা, তব বল ঢাল প্রাণে বাঙ্গালীর;
সে উচ্ছ্বাস, সে সংঘাত ভাঙ্গিতে পাষাণ তীর!
এ উদ্যম, একাগ্রতা,
এ অতল গভীরতা,
এ লহরী-রুদ্র নৃত্য, উচ্চে উচ্চে টলাটলি,
এ ভীম উন্মত্ত রঙ্গ আসুরিক গলাগলি!"

কি সরলপ্রাণ-সঞ্জীবনী প্রার্থনা! তার পর কবি আমাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে উন্নতির মূল সূত্র রাজনৈতিকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমাদের কংগ্রেসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"কি মহা শকতি আজি মহাবায়ু ঘূর্ণিমান—
এক মহা চন্দ্রাতপে পঞ্চবিংশ কোটী প্রাণ
উড়ায়েছে রাশি রাশি,
জড়াজড়ি, পাশাপাশি—
জাতিভেদ, দেশভেদ, সম্প্রদায় ভেদ ভুলি,
ইচ্ছা অনিচ্ছায় হোক করিতেছে কোলাকুলি।"

বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন কবির চক্ষে আশাপ্রদ; কারণ ইহাদের সহিত সমুদ্রের 'জাতিভেদ,' 'দেশ ভেদ,' 'সম্প্রদায়ভেদ' ধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সিন্ধুতে যেমন অসংখ্য লহরী গলা-গলি করিয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে, আমরা এই মহা আন্দোলনের ফলে 'ভাই, ভাই হাত ধরাধরি করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিব, ইহাই কবির আন্তরিক ইচ্ছা। আমরা সেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিলে,—

"তখন ভারতবর্ষ, তখন বাঙ্গালী জাতি,
ইয়োরোপ, আমেরিকা, একগোষ্ঠী, এক জাতি।
এক সূত্রে বাঁধাবাঁধি
হাসাহাসি কাঁদাকাঁদি!
অত্যাচার আক্রমণ লক্ষ্য খুঁজি হবে শেষ।
এসিয়া সামান্য গ্রাম! সৌরবিশ্ব ক্ষুদ্র দেশ।"

হায়, কবে কবির এই মহাবাণী সত্যে পরিণত হইবে! কবির হৃদয় ভ্রাতৃধর্ম্মে উত্তেজিত হইয়াছে; তিনি আমাদের দুর্ব্বল হস্ত ধারণ করতঃ "গঠিব উদয়াচল মিলি-মিশি পাশাপাশি" বলিয়া উন্নতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহেন। অনেকে 'আমরা অধীন জাতি' বলিয়া আমাদের উন্নতি চেষ্টাকে উপহাস করেন। শশাঙ্কমোহন স্বাধীনতা এবং অধীনতার কিরূপে অর্থ করেন, দেখা যাউক—

* * * *

প্রাণে বল নাহি যার,
স্বাধীনতা কিবা তার?
আজি স্বাধীনতা পেলে অপরের পায়ে পড়ি,
অন্ন বস্ত্র জ্ঞানাভাবে কালি দিবে গড়াগড়ি।"

এ পৃথিবীতে কেহই একেলা দাঁড়াইতে পারে না। প্রকাণ্ড পর্ব্বতও একটী বালুকা-কণার নিকট সাহায্যপ্রার্থী। আজ যদি আমেরিকা রোষ প্রদর্শন করে, হয়ত ইংল-ণ্ডের কপালে চিন্তার রেখা পড়িবে। এরূপ স্থলে স্বাধীন রাজ্যও প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন নহে। এই সেই দিন, স্পেনের অত্যাচারে

দমন করিবার জন্য আমেরিকা সমরাগ্নি জ্বালিয়াছিল ; ক্রীটের খ্রীষ্টানগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য গ্রীস্‌রাজ, তুর্ক সুলতানের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিলেন। এখনও মিশনারি হত্যার সূত্র ধরিয়া প্রাচীন চীন্‌ রাজ্য বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক খণ্ড বিখণ্ডিত হইতেছে। কবি জ্ঞানবৃদ্ধ রাজনৈতিকের ন্যায় বলিতেছেন ;—

"ধরমের ধরাধরি কে দাঁড়াতে পারে একা।"

তারপর বিশ্বের সৃষ্টি-নীতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—

"সৃষ্টির এ মহানীতি, অণু পরমাণু করি—
যে নিজে চলিতে নারে অন্যে চালাইবে ধরি।"

আজ কাল স্বাধীনতার নামে পৃথিবীতে রক্তের স্রোত বহিতেছে। কবি সেই স্বেচ্ছাচাররূপী স্বাধীনতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে উপদেশ দিতেছেন। কারণ, তিনি জানেন যে, আমরা প্রত্যেকে ধরামধ্য ভ্রাতৃধর্ম্ম বিলাইতে বিলাইতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে আমাদের অধীনতা শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে। তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"উন্নতি উন্নতি গতি, বিশ্বনীতি জগতের!
ঠেকিবে কি তালে,শুধু যন্ত্র-প্রভু ভারতের?"

জানি না, কয়টী হৃদয়ে কবির এই মর্ম্মস্পর্শী কাতরোক্তি স্পর্শ করিবে!

নিমেঘ পূর্ণিমা নিশি! জ্যোৎস্নাবিধৌত ধরণী ধ্যানমগ্না! সমীরণ অতনু জ্যোৎস্নাকে জড়াইতে না পারিয়া ধরাময় খুঁজিতেছে ;—কখন শুভ্র ফুল, কখন বা শুভ্র লহরীর বুকে ঢলিয়া পড়িতেছে! এমন সময় ;—

(১)

"যেন ভাবে এ ধরার সমুদ্রের মহাবক্ষ জুড়ি
কোটী কোটী শঙ্খ যেন বাজাইল আনন্দের তুরী।
সে গম্ভীর উৎসবের রোলে,
ধরার সমস্ত দেহ দোলে,
অসীম অকূল সিন্ধু, দেখিতে শুনিতে কেহ নাহি ;
একটী চন্দ্রমা চক্ষু মেলি মহাকাশ আছে শুধু চাহি।

(২)

সিন্ধুর সমস্ত ঊর্ম্মি শুনিল সে জাগরণ ধ্বনি ;
ঘুম ছাড়ি, শয্যা ছাড়ি, তাড়াতাড়ি আসিল অমনি ;
সুপ্রশান্ত ঘননীল বুকে,
যাহার অতল তলে সুখে
মুকুতা শয়নে সদা শুয়ে থাকে প্রবালের বালা,
তথায় মিলিল আসি পাশাপাশি লহরীর মেলা।

(৩)

সারি সারি দাঁড়াইল সবে, রাশি রাশি মুক্ত আঁখি মেলি;
কেহ কারো কাঁধে চড়ি কেহ কারো হৃদয়েতে হেলি।
সহসা থামিল শঙ্খধ্বনি,
ধীর ধীর মৃদু রণরণি
মুহূর্ত্তের তরে যেন সিন্ধুবুকে বেড়াল কাঁপিয়া,
তার পরে মধুর সঙ্গীত সুমধুরে উঠিল ফুটিয়া।

(৪)

প্রথমে দেখিল, ভাসি উঠিতেছে জলের উপর
প্রবাল কঙ্কণ পরা শত শত হিরণ্ময় কর ;
সবারই রঞ্জিয়াছে ধরা
একখানি নীলালোক ভরা
তরল কুঞ্চিত মেঘ, রাশি রাশি মুকুতার ঝাড়
হেথা হোথা ঝুলিতেছে নীলাম্বরে তারার আকার!

(৫)

সেই মেঘ মাঝে বসি, পবিত্র গম্ভীর-মুখছবি
অপার রহস্যময় নত আঁখি সমুদ্রের কবি!
মুকুতার কুসুমের মালা
শিরটুকু করিয়াছে আলা,
জলবালাগণ ঘিরি নাচে গায় চৌদিকে তাহার,
ভাসিয়া উঠিছে যেন রাশি রাশি চাঁদের বাজার।"

বোধ হয়, বঙ্গদেশে—পৃথিবীতে এরূপ সাহিত্যানুরাগী অতি বিরল, যিনি উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিয়া কবির উধাও কল্পনা এবং অপূর্ব্ব সৃষ্টির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়াপন্ন হইবেন না। মনে হয়, সবাই

যেন আমি সিন্ধুতীরে দাঁড়াইয়া 'আনন্দের তুরী' কোটী কোটী শঙ্খধ্বনি শুনিতেছি। আমার সম্মুখে অসীম সিন্ধু; আর কেহ নাই —কেবল পূর্ণচন্দ্র 'মহাকাশ' হইতে সমস্ত দেখিতেছেন। সমস্ত সিন্ধুর ঊর্ম্মি আজ কাহার আহ্বানে জাগরিত হইয়াছে। হিরণ্ময় কর-শোভিত কুঞ্চিত তরল মেঘ মাঝে 'অপার রহস্যময় নত আঁখি সমুদ্রের কবি' ধীরে ধীরে সিন্ধুর তলদেশ হইতে উঠিতেছেন! কি আশ্চর্য্য কল্পনা! আমরা কবিতায় Grandeurর কথা অনেক শুনিয়াছি, অনেকেরই বিশ্বাস Grandeur কেবল মহাকাব্য এবং কাব্যে সম্ভব। আমি তাঁহাদিগকে উদ্ধৃত অংশটুকু মাত্র একবার মনোযোগের সহিত পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা হইতে অধিক Grand যে আর কি হইতে পারে, তাহা আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বুঝিতে অক্ষম। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ অভিনব কল্পনা অতি বিরল। কল্পনা, ভাষা এবং সৌন্দর্য্য-শিল্প এই তিনটী কিরূপে ইহার সহিত একত্র হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন। আজকাল বঙ্গদেশের উদীয়মান কবিগণ যেরূপ অস্বাভাবিক কষ্টকল্পিত শিল্পের সৃষ্টি করিতেছেন, ইহাতে তাহার বিন্দু মাত্রও দোষ নাই। কবিতা অনেকেই পাঠ করেন; ভাবের গাম্ভীর্য্যে অনেকেই বিচলিত হয়েন; কিন্তু ভাষার সহিত ভাবের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, অনেকে তাহা জানিয়াও বুঝিতে চেষ্টা করেন না। এক একটী শব্দ যে সময় সময় লেখকের বক্তব্যের উপর মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ এখনও বহু বাঙ্গালীর নিকট দুর্ব্বোধ্য। যে শব্দের দ্বারা আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি, তাহার প্রয়োগ, প্রভৃতি যদি না বুঝি, তাহা হইলে কবির অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যই আমাদের নিকট লুক্কাইত থাকিবে। আমি উদ্ধৃত চরণ হইতে কেবল দুইটী শব্দ লইয়া ক্ষমতাবান্ শিল্পী শশাঙ্কমোহনের শক্তির পরিচয় দিব। যখন 'পবিত্র-গম্ভীর-মুখচ্ছবি" লইয়া সমুদ্রের কবি সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার আঁখি 'নত'! "নত আঁখি" কেবল এই একটী কথায় সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, রহস্যময় কবির মূর্ত্তি এবং সমুদ্রবক্ষে সাময়িক আন্দোলনের জীবিত চিত্র, সুদক্ষ চিত্রকরের একটী তুলিকা স্পর্শে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমার কাব্য-পিপাসু-বন্ধু সিন্ধু-সঙ্গীতের প্রকৃত গুণগ্রাহী বাবু বঙ্কিমচন্দ্র গুহ, বি, এ মহাশয় 'নত-আঁখি' সম্বন্ধে বিস্মিত বদনে বলেন—"ইহা পড়িলেই বুদ্ধের ধ্যানের মূর্ত্তি মনে পড়ে।" যখন হঠাৎ শঙ্খধ্বনি থামিয়া গেল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য 'ধীর ধীর মৃদু রণরণি' সিন্ধুবক্ষে কাঁপিয়া বেড়াইল। অতি সাবধানে, ধীরে ধীরে একবার সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াও, এখনও শঙ্খের অস্পষ্ট শব্দ শুনা যাইতেছে—তাহা অতি কোমল, অতি মৃদু! সে শব্দের গতি সহ্য করে কাহার সাধ্য? সমস্ত প্রকৃতি সেই 'রণরণি' শব্দে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! 'মৃদু রণরণি'—একটী শব্দের কি অদ্ভুত শক্তি! যিনি সেই অমূল্য সঙ্গীতের একটী ক্ষীণ কম্পন লইয়া আমাদের প্রাণের সুপ্ত ভাবগুলিকে জাগাইতে পারেন, তিনিই ক্ষমতাবান্ কবি। যেমন শশধরের চরণস্পর্শে সিন্ধুর সমস্ত ঊর্ম্মি

এক সঙ্গে নাচিয়া উঠে, তেমনি ক্ষমতাবান কবির এক একটী শব্দ উচ্চারণে শত শত প্রাণে অসংখ্য ভাবের লহরী নৃত্য করিয়া উঠে। তাহা উপভোগ্য, আলোচ্য নহে। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে,তাহাতে এত মাদকতা আছে যে, একবার সেই 'মৃদু রুণরুণি' কর্ণে প্রবেশ করিলে সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়—সমস্ত বিশ্বে সেই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কাঁপিয়া উঠিতে হয়। সেই কম্পন প্রকাশ করিবার একমাত্র ভাষা—নীরবতা। সিন্ধু-সঙ্গীতের নানাস্থানে বিশেষতঃ 'মেঘ নাদে' এরূপ অব্যর্থ শব্দ প্রয়োগ, উন্মুক্ত কল্পনা, গভীর ভাব যে কত রহিয়াছে, তাহা সিন্ধুসঙ্গীত পাঠ না করিলে বুঝান যায় না। শশাঙ্কমোহনের হৃদয় ভাবপ্রবণ—বড় অন্তঃস্পর্শী। কবির সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তিনি বাছিয়া বাছিয়া শব্দ-যোজন অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন না। তিনি বলেন—"আমি ভাবের ভিতর প্রবেশ করি; ভাব আমার হাত ধরিয়া লইয়া যায়; সেই সময় আমি যাহা লিখি, তাহাতে কষ্ট কল্পনা বা অস্বাভাবিকতা থাকা অসম্ভব। আমি কখনও 'ইহা আরও সুন্দর হ'ক বলিয়া কাটিতে ছাঁটিতে পারি না। আমার বিশ্বাস যে, কেহ যদি কোন বিষয় সাপটিয়া ধরিতে পারেন, তিনি মনোভাব প্রকাশক বহু সুন্দর ও শক্তিশালী শব্দের সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই সাধারণের নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা তাহা পারেন না, কেবল অল্প আস্বাদন পান মাত্র, তাঁহারাই নিজেদের বক্তব্যে নানা উপায়ে জটিলতা আনয়ন করেন।" ইহাই যথেষ্ট; আমার অভিমত নিষ্প্রয়োজন। শশাঙ্কমোহন দুই চারিটী কথায় সমস্ত প্রকৃতিকে আমাদের নিকট উন্মোচন করিতে কিরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহা তাঁহার অপ্রকাশিত শঙ্খ নদী নামক (১) কবিতার চারিটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কবি একদিন এই শঙ্খের তীরভূমে বনপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অপূর্ব্ব কামিনীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; বনদেবী মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তারপর স্থির নেত্রে কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন;—

> "কুসুমের মৌন তৃপ্তি ছিল সে বদনে—
> আকাশের অসীমতা ছিল সে নয়নে;—
> ছিল সর্ব্ব শরীরের লাবণ্য লীলায়
> বন-প্রকৃতির শান্তি অসীম শোভায়।"

প্রতিভাশালী কবি ভিন্ন অন্যের নিকট কি এইরূপ বিশ্বব্যাপী অসীম কল্পনা প্রত্যাশা করিতে পারি? কেবল চারিটী চরণে কাহারো স্নিগ্ধ করোজ্জল গম্ভীর পবিত্র ছবি অঙ্কিত করিতে পারে, এরূপ উদাহরণ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। আজ বঙ্গভাষা শশাঙ্কমোহনকে পাইয়া যে কিরূপ ধনবতী হইয়াছে, তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এখানে ঋষি কবি Wordsworth হইতে চারিটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, শক্তিশালী কবিগণ কিরূপে দুই একটী কথায় প্রকাণ্ড ঘটনা বুঝাইয়া দিতে পারেন,—

> "There was a roaring in the wind all night;
> The rain came heavily and fell in floods;
> But now the sun is rising calm and bright;
> The birds are singing in the distant woods. &c.

(১) চট্টগ্রামে শঙ্খ নামক একটী নদী আছে। এই কবিতাটী শশাঙ্ক বাবুর "শৈল সঙ্গীতের" জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে; তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এই চারিটী চরণ পড়িলেই রজনীতে ঝটিকার সংহার মূর্ত্তি; অবিরল ধারে বারি পতন; তারপর বারিসিক্ত পৃথিবীতে সূর্য্য দেবের উজ্জ্বল অথচ ধীর কটাক্ষ; আর সুদূর বনানিতে পক্ষিগণের সঙ্গীত—সমস্তই আমাদের অন্তরে কতই কল্পনা ও নূতন চিন্তা লইয়া ভাসিয়া উঠে! আমরা দেখিতে পাই, কেহ কেহ ইহাই প্রকাশ করিতে গিয়া ৪০ চরণেও কৃতকার্য্য হন না।

তরল কুঞ্চিত মেঘ, সমুদ্রের কবিকে লইয়া ক্রমে নক্ষত্রের দেশে চলিল। মেঘেরা বিহ্বল নেত্রে পথ ছাড়িয়া দিল! কেহবা কুতুহলী হইয়া পাছে পাছে কিছু দূর গেল। তথা হইতে কবি, "সেই পুরাতন ধরা, সেই হাসি-অশ্রুময় দেশের" দিকে অনিমেষ-লোচনে চাহিয়া রহিলেন! ধীরে ধীরে অতীতের সুখ দুঃখ প্রভৃতির স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কবি দেখিলেন, ধরণীর বুক হইতে পুরাতন দুঃখরাশি এখনও মুছিয়া যায় নাই,—"এখনো যে ধরণীর বুকে তপ্তবহ্নি রয়েছে জাগিয়া!" ইউরোপ নররক্ত-পিপাসু অসি লইয়া ধরণীর নির্ম্মল সৌন্দর্য্য গ্রাস করিতেছে। তারপর আফ্রিকার দিকে চাহিয়া কবি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃধর্ম্মের প্রচারক কবি, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের অত্যাচার দেখিয়া অতি কঠিন উত্তেজনা পূর্ণ ভাষায় বলিলেন;—

"হোথা আফ্রিকার শব, পূতিগন্ধে পূর্ণ চারিধার।
কলরবে কোলাহলে ইউরোপ করিছে আহার।
শকুনি গৃধিনী আর দানা
মৃগেন্দ্রের তথা এক খানা;
স্কন্ধে ধরমের ঝুলি চিবাইছে করি কড়মড়
রক্তহীন কাল শিরগুলি, প্রস্তর কঙ্কালময় ধড়।"

শশাঙ্কমোহন যে ভাষায় আফ্রিকার হীনাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতে অধিক উপযোগী ভাষা আর কি হইতে পারে? উদ্ধৃত অংশের শেষ দুইটী চরণ পড়িলেই কবির বর্ণনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিশাল হৃদয়ের প্রকৃত আন্তরিকতা না থাকিলে কেহই এরূপ ভাষায় অবস্থার প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না। কবি দেখিলেন, "আপনার অতীতের কুজ্ঝটিকা-স্বপন নিরত হইয়া মহাকায় এসিয়া মহিষের মত শুইয়া আছে।" মহিষ তাহাতেই শান্তি-সুখ অনুভব করিয়া চক্ষু মুদিয়া মহাজ্ঞানীর ন্যায় পড়িয়া আছে। কে কোথায় হাত পা কাটিতেছে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার বহু দূরে স্থিত এসিয়ার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত উক্তি। সমস্ত পৃথিবীর মাঝে কবি কেবল সাধারণ তন্ত্রের (Republic) লীলাভূমি আমেরিকার দিকে চাহিয়া কতকটা ভবিষ্যৎ মঙ্গল কল্পনা করিতেছেন। কারণ তথায় রাজতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী একটী অঙ্গুলী-সঙ্কেতে শত শত লোক শির অবনত করিতেছে না,—সাধারণের মতসমষ্টিই একটী বৃহৎ মতের সৃষ্টি করিতেছে। ভাবের শিশু, প্রকৃতির মুক্ত আত্মা কবি যে স্বাধীনতাকে সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'কবিরা কল্পনা ও ভাব লইয়া দিন কাটাইলে ভাল হয়; রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে; কারণ ইহা তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চা।' যাঁহারা কবি-হৃদয় চিনিতে ও বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উক্তি উপযুক্ত বটে! বোধ হয়, তাঁহারা জানেন যে, কবি কল্পনা ও ভাবের বেড়ি পায়ে দিয়া এক স্থানে খোদিত পাষাণের ন্যায়

বসিয়া থাকেন না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার উন্মুক্ত আত্মা ভ্রমিয়া বেড়াইতেছে। সে আত্মা সদা প্রফুল্ল, কি এক আনন্দে অধীর; তাহা সংসারীর চক্ষে 'সৃষ্টিছাড়া'। কবি চাহেন, পৃথিবী হইতে অত্যাচার পলায়ন করুক, শান্তি আসুক। আমরা স্বভাবের ভিতর পুষ্ট হইয়া সুন্দর হই; সুন্দরী পৃথিবী আরও সৌন্দর্য্য লাভ করুক। কাজেই অত্যাচার, অবিচার, কুৎসিৎ কিছু দেখিলেই কবির বক্ষে ও চক্ষে শেলের সমান বিদ্ধ হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলির কথা কি ভুলিয়া গিয়াছি? যখন ফরাসিরাষ্ট্রবিপ্লব সমস্ত ইউরোপের রাজনৈতিক সূত্র ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিয়াছিল, তখন Wordsworth সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া বিপ্লবকারীদের পক্ষাবলম্বন করিলেন। কিন্তু আবার যখন বিপ্লবের ফলে দেশে শান্তির পরিবর্ত্তে অরাজকতা এবং অত্যাচার প্রবল হইল, তখন ন্যায়ানুগামী কবি আপনার গন্তব্য পথে দাঁড়াইয়া অল্পকাল চিন্তা করিলেন; তারপর বিপ্লবকারীদের প্রতি উৎসাহ ও সহানুভূতির পরিবর্ত্তে ঘৃণা প্রদর্শন করিলেন। কারণ—

"Wordsworth's original sympathy was with the aspirations, and the legitimate rights of the people."*

ইহা ভিন্ন আরও অনেক লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ও সুস্মৃষ্টি প্রবেশ করিয়াছিল।†

যখন "The Press" নামক আইরিশ পত্রিকার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী মিঃ পিটার (Mr. Peter) Lord Castlereagh সম্বন্ধে স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া ১৮ মাসের জন্য Lincoln হাজতে বাস করিতে আদিষ্ট হইলেন, শেলির হৃদয়ে তাহা সহ্য হইল না। স্বাধীনতার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ শেলির পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। তিনি "Address to the Irish People" লিখিয়া আয়ারলণ্ডে যাত্রা করিলেন। তথায় স্ত্রীর (Harriet) সহিত একত্র হইয়া সর্ব্বসাধারণের ভিতর আপনার মত প্রচারিত করিবার জন্য পুস্তক (Pamphlets) বিতরণ আরম্ভ করিলেন। কারণ, কবি চাহেন সত্য, সুন্দর ও প্রেম। যাহাতে ঐ তিনটী আছে, তাহাই কবির প্রিয়। আইরিশদের বহুদোষ থাকিলেও, বিজয়ীরা যে তাহাদের সমস্ত স্বাধীনতা অপহরণ করিতে চাহে, তাহা সত্য, সুন্দর ও প্রেমের উপাসক কবির চক্ষে পাপ কার্য্য। শেলি বলিয়াছেন;—

"All religions are good which make men good; a Protestant is my brother and a Catholic is my brother. Be fair, open, and you will be terrible to your enemies."

বিশ্বপ্রেমিক শেলির ধর্ম্ম ও লক্ষ্যের সহিত শশাঙ্কমোহনের কতকটা সাদৃশ্য আছে। শশাঙ্কমোহন পৃথিবীতে ভ্রাতৃধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন,—

"আমি মানবের কাণে গাহিব সে সামুদ্রিক বেদ
সুমধুর ভ্রাতৃধর্ম্ম, যাহে ঘুচে সর্ব্ব ভেদাভেদ।"

সমুদ্রের কবি বুঝিলেন, হৃদয়, চরিত্র ও হৃদয়-রুধির দিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে না পারিলে জগতে ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না; তাই জগতের কোটী কোটী নরনারীকে আপনার বিশাল হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। এখানে

* Prose writings of Wordsworth, edited with an Introduction, by W. Knight L. L. D.

† "In an appendix to his Poems, published in 1835, Wordsworth discussed the subject of "Legislation for the poor, the working classes, and the clergy." Under the second head, his vindication of the root-principle of Trades Unions, and the formation of joint-stock Companies by the poor, is special noteworthy." Ibid.

কবির প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনা কত সরল, কত মর্ম্মস্পর্শী ;—

"আমি লক্ষ কোটী অতিথির
পাতে দিব হৃদয়-রুধির,"
বায়ুস্তরে বরিষার মেঘ ধরা জুড়ি যাইব মিশিয়া,
জগতের মহাশক্তি কোথা, লও মোরে লও উড়াইয়া।'

ক্রমে কবি আপনার ভাবে উত্তেজিত ও অধৈর্য্য হইলেন ; আবেগে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন ; তাঁহার দুইটী সজল নয়ন যেন উষাতারার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; মেঘোপরে আসীন কবি নক্ষত্রের দেশ হইতে ধরণীর আত্মাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া জলদের স্বরে বলিতে লাগিলেন—

"অগ্রসর, অগ্রসর, ধীরে ধীরে কমিছে আঁধার
ঘুমাইছে ঝঞ্ঝাঝড়, এস এস বিশ্ব-পরিবার!
ভাই ভাই দাও দাও কোল,
বল মুখে জয় জয় বোল,
তারাহীন মহাকাশে ভাসে শশী মহা পূর্ণিমার :
ক্ষিতি ব্যোম একাকার, এই মহা মহোৎসবে
ভাই ভাই হও একাকার।"

"একবার একবার ওরে হৃদয়ের পক্ষ সাপটিয়া
উড়ে আয় নীলাকাশে, দাঁড়া হেথা দাঁড়ারে আসিয়া।
দেখিবি তোদের ধরাধাম,
শুধু একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম,
ডুবিয়াছে উচ্চ নীচ বিজাতীয় বিভেদ অন্তর,
কি মধুর ঐক্যতানে ব্যাপিয়াছে বিশ্ব চরাচর।

"ঘুরে চন্দ্র, ঘুরে তারা, ঘুরে সূর্য্য, ঘুরে শনৈশ্চর—
ধরণীর এ দুর্দ্দশা হেরি, প্রাণে তারা কত না কাতর!
এখনও হাতে উঠে খাড়া,
এখনও আছে শত কারা,
এখনো ভায়ের রক্তে লোলুপ ছুটিছে শত ভাই,
থেকে থেকে মার বুকখানি কাঁপি কাঁপি উঠিছে সদাই!

কি জ্বালাময়ী ভাষা! ইহার এক একটী শব্দ বিশ্ব-প্রেমিক কবির হৃদয়ের বিশালতা যেরূপ ভাবে প্রকাশ করিতেছে, তাহা বঙ্গ-ভাষায় দুর্লভ। এখনও কবির সুগম্ভীর বাণী "অগ্রসর, অগ্রসর" কাণের কাছে বাজিতেছে। যুদ্ধের সময় সেনাপতির এক একটী আদেশের ন্যায় ইহা আমাদের মনের উপর কার্য্য করিতেছে। আমাদের প্রিয়বন্ধু, চট্টগ্রামের একটী পবিত্র আত্মা ৺ নলিনী-কান্ত সেনের জীবনে "অগ্রসর, অগ্রসর" কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহা গত ১৩০৮ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের "নব্য-ভারতে"—"৺ নলিনীকান্ত সেন" নামক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি। বহুবার তাহার মুখে ঐ উদ্ধৃত চরণগুলি শুনিয়াছি। সে বলিত—"ইহা আমার সুপ্ত জীবনকে অনেকটা জাগাইয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনকে জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা গঠিত করিবার একমাত্র ভাষা শশাঙ্কমোহনের 'সিন্ধু-সঙ্গীত'। এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যখন 'সিন্ধু-সঙ্গীত' প্রত্যেক বাঙ্গালীর অতি আদরের বস্তু হইবে।" আরও শুনিয়াছি। কোন যুবক শশাঙ্কমোহনের 'সিন্ধু-সঙ্গীত' পড়িয়া আপনার বিশ্বাসানুযায়ী সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কবির বিপুল শক্তির পরিচয়। এ জগতে কে কাহাকে বাঁচাইতে পারে? কে আপনার স্বার্থ, ভেদাভেদ জ্ঞান ভুলিয়া অপরকে সত্যপথ ও ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে উত্তেজিত করে? নক্ষত্রের দেশে থাকিয়া কবি, যখন মনঃকর্ণে কোটী কোটী গ্রহমুখে অনন্তের বিশ্বনীতি গীতি শুনিতে পাইলেন, তখন তাহার হৃদয়ের ডোর ছিঁড়িয়া প্রাণ মহাকাশে হারাইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু কবি অতি কষ্টে তাহা রোধ করিতে লাগিলেন। কারণ বিশ্বের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছে ;—

"সহস্র কলিকা আজি ধরণীতে যাব ফুটাইয়া।
জগতের মহা রাজপথে উচ্চ নীচ দিব ঘোচাইয়া।

কবি যখন এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপনার শান্তি ও সুখের জন্য কিরূপে মহাকাশে নক্ষত্রের দেশে ভ্রমিয়া বেড়াইবেন ?

"বলিতে বলিতে কবি তীব্রবেগ-পক্ষ করি ভর
নামিতে লাগিল যেন উল্কাপিণ্ড ধরণী উপর।
তখন ঘুমের ঘোর ত্যাগি
মর্ত্ত্যবাসী উঠিতেছে জাগি,
সহসা দেখিল চাহি, ধরার অন্তরতন্ত্রী ধরি
স্থাবর জঙ্গম সব কাঁপিতেছে থর থর করি।"

কি Grand বর্ণনা! সিন্ধুগর্ভ হইতে কবির উত্থান ও নক্ষত্রের দেশত্যাগ করিয়া ধরণীতে ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রচারার্থে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় পতন পর্য্যন্ত সমস্তই এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। আমি ক্ষণকাল চিন্তা না করিয়াই বলিতেছি, সমস্ত বঙ্গভাষায় উহার তুলনা নাই। যেমন প্রবলস্রোতের মুখে তৃণখণ্ড পড়িলে তাহাকে স্রোতের বশীভূত হইতে হয়, সেইরূপ শশাঙ্কমোহনের এক একটী ভাব ও বর্ণনা আমাদের প্রাণকে সজোরে আকর্ষণ করে। বঙ্গদেশে কয়জন কবির ভাগ্যে এই ক্ষমতালাভ ঘটিয়াছে ?

প্রত্যেক জীবনেরই একটা লক্ষ্য আছে। যাহার কোন লক্ষ্য নাই, তাহার জীবন আছে কি না সেইটাই সন্দেহ! আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে আশার মায়া বলে। কেহ কেহ মনে করে যে, এই বিশাল পৃথিবীতে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ; আমাদের উত্থান, স্থিতি ও বিলয় তিলেকের মধ্যেই হয়; সুতরাং ধরণীর বক্ষে আমাদের কোন চিহ্ন থাকে না। আমরা পৃথিবীতে হৃদয়ের যে সৌন্দর্য্য ও সৌরভটুকু রাখিয়া যাই, তাহাই যে শত শত প্রাণকে সুন্দর করিয়া তুলে; তবে আমরা কিরূপে পৃথিবী হইতে একবারে মুছিয়া গেলাম ? যাহারা পৃথিবীতে নানা অত্যাচার, অবিচার দেখিয়া ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রচার অসম্ভব মনে করিতেছেন, কবি তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—

"এক করি দেহ, আত্মা, শকতি, উদ্যম,
এস সবে চেষ্টা করি তুলিবারে শির,
অতিক্রমি হিমাদ্রির শৃঙ্গ উচ্চতম
উঠিব, লাগিবে শিরে স্বরগ সমীর।"

ইহাতে কবির অটল বিশ্বাস আছে। প্রাণের লক্ষ্য ও হৃদয়ের আশা একত্র হইয়া কার্য্য করিলে আমরা হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিতে পারিব, ভ্রাতৃধর্ম্মের প্রচার হইবে না কেন? সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি, অত্যাচার-পীড়িত মূর্চ্ছিত প্রাণগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"কেবলে পৃথিবীখানি শুধুই পিশাচময়?" এই বিশ্বের লক্ষ্যই যে সৌন্দর্য্যসাধনা,—জড় ও অজড় তাহারই স[illegible] ছুটিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের বক্ষমাঝে সৌন্দর্য্যের তন্ত্রী বাজিতেছে; এখানে কুৎসিত কিরূপে বাঁচিতে পারে? "একটী সুন্দর প্রাণে বাঁচে শত প্রাণপাখী"। আর "কুৎসিত নিজের ভরে মরে হাহাকার করে।" এখানেই পার্থক্য। কিন্তু সুন্দরের প্রধান ধর্ম্মই কুৎসিতকে সুন্দর করা; তাহাদের নিকট বিশ্বের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা। কবি সেই সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট উন্মোচন করেন। 'সিন্ধু-সঙ্গীতের কবি আমাদিগকে পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃধর্ম্মের প্রধান অবলম্বনই 'সৌন্দর্য্য-সাধনা। আর এই সৌন্দর্য্যই আমাদের প্রাণে আশা ও লক্ষ্য আনিয়া দেয়। কবি সৌন্দর্য্যকে কিরূপভাবে অনুভব করিয়াছেন, দেখুন—

"একটী সুন্দর ওষ্ঠ, অধরের পরিমল
বন, নদী, মাঠ, গিরি করে দেয় সমতল।"

ইহা হইতে অধিক সত্য আর কি আছে?

বক্ষ হইতে মুছিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কবি চাহেন, আমরা সজীব হইব। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দাঁড়াইবার একটু স্থান হইবে। আমাদের এক একটী প্রাণ শত শত প্রাণকে জাগাইয়া তুলিবে—আমরা সৌন্দর্য্যের আধার হইব। আমাদের বিকৃত অবস্থা দেখিয়া কবির প্রাণের তন্ত্রীগুলি ছিঁড়িতে চাহে; তাই তিনি সংক্ষুব্ধ চিত্তে বলেন—"শক্তগুণে মহাসিন্ধু তোল বিশ্বনাশী বাণ।" কিন্তু আমাদের উন্নতিই যে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য; এ জগতে প্রিয় বস্তুর অধঃপতন দেখিলে কে স্থির থাকিতে পারে? কবি সমুদ্রের নিকট শক্তি ও জ্ঞানের যে সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাহাই আমাদের উত্থানের একমাত্র অবলম্বন বুঝিয়া বলিলেন;—

"তব আত্মা, তব বল চাল প্রাণে বাঙ্গালীর;
সে উচ্ছ্বাস, সে সংঘাত ভাঙ্গিতে পাষাণ তীর!
এ উদ্যম, একাগ্রতা,
এ অতল গভীরতা,
এ লহরী-রুদ্র নৃত্য, উচ্চে উচ্চে টলাটলি,
এ ভীম উন্মত্ত রঙ্গ আসুরিক গলাগলি!"

কি সরলপ্রাণ-সঞ্জীবনী প্রার্থনা! তার পর কবি আমাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে উন্নতির মূল সূত্র রাজনৈতিকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমাদের কংগ্রেসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"কি মহা শকতি আজি মহাবায়ু ঘূর্ণিমান—
এক মহাচক্রাতপে পঞ্চবিংশ কোটী প্রাণ
উড়ায়েছে রাশি রাশি,
জড়াজড়ি, পাশাপাশি—
জাতিভেদ, দেশভেদ, সম্প্রদায় ভেদ ভুলি,
ইচ্ছা অনিচ্ছায় হোক করিতেছে কোলাকুলি।"

বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন কবির চক্ষে আশাপ্রদ; কারণ ইহাদের সহিত সমুদ্রের 'জাতিভেদ,' 'দেশভেদ,' 'সম্প্রদায়ভেদ' ধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সিন্ধুতে যেমন অসংখ্য লহরী গলাগলি করিয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে, আমরা এই মহা আন্দোলনের ফলে 'ভাই, ভাই হাত ধরাধরি করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিব, ইহাই কবির আন্তরিক ইচ্ছা। আমরা সেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিলে,—

"তখন ভারতবর্ষ, তখন বাঙ্গালী জাতি,
ইয়োরোপ, আমেরিকা, একগোষ্ঠী, এক জ্ঞাতি!
এক সূত্রে বাঁধাবাঁধি
হাসাহাসি কাঁদাকাঁদি!
অত্যাচার আক্রমণ লক্ষ্য খুঁজি হবে শেষ।
এসিয়া সামান্য গ্রাম! সৌরবিশ্ব ক্ষুদ্র দেশ।"

হায়, কবে কবির এই মহাবাণী সত্যে পরিণত হইবে! কবির হৃদয় ভ্রাতৃধর্ম্মে উত্তেজিত হইয়াছে; তিনি আমাদের দুর্ব্বল হস্ত ধারণ করতঃ "গঠিব উদয়াচল মিলিমিশি পাশাপাশি" বলিয়া উন্নতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহেন। অনেকে 'আমরা অধীন জাতি' বলিয়া আমাদের উন্নতি চেষ্টাকে উপহাস করেন। শশাঙ্কমোহন স্বাধীনতা এবং অধীনতার কিরূপে অর্থ করেন, দেখা যাউক—

" * * * *
প্রাণে বল নাহি যার,
স্বাধীনতা কিবা তার?
আজি স্বাধীনতা পেলে অপরের পায়ে পড়ি,
অন্ন বস্ত্র জ্ঞানাভাবে কালি দিবে গড়াগড়ি।"

এ পৃথিবীতে কেহই একেলা দাঁড়াইতে পারে না। প্রকাণ্ড পর্ব্বতও একটী বালুকাকণার নিকট সাহায্যপ্রার্থী। আজ যদি আমেরিকা রোষ প্রদর্শন করে, হয়ত ইংলণ্ডের কপালে চিন্তার রেখা পড়িবে। এরূপ স্থলে স্বাধীন রাজাও প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন নহে। এই সেই দিন, স্পেনের অত্যাচার

দমন করিবার জন্য আমেরিকা সমরাগ্নি জ্বালিয়াছিল; ক্রীতের খ্রীষ্টীয়গণের স্বার্থ রক্ষার জন্য গ্রীস্‌রাজ. তুর্ক সুলতানের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিলেন। এখনও মিশনারি হত্যার সূত্র ধরিয়া প্রাচীন চীন্ রাজ্য বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক খণ্ড বিখণ্ডিত হইতেছে। কবি জ্ঞানবৃদ্ধ রাজনৈতিকের ন্যায় বলিতেছেন ;—

"ধরমের ধরাধরি কে দাঁড়াতে পারে একা।"

তারপর বিশ্বের সৃষ্টি-নীতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—

"সৃষ্টির এ মহানীতি, অণু পরমাণু করি—
যে নিজে চলিতে নারে অন্যে চালাইবে ধরি!"

আজ কাল স্বাধীনতার নামে পৃথিবীতে রক্তের স্রোত বহিতেছে। কবি সেই স্বেচ্ছাচাররূপী স্বাধীনতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে উপদেশ দিতেছেন। কারণ, তিনি জানেন যে, আমরা প্রত্যেকে ধরাময় ভ্রাতৃ-ধর্ম্ম বিলাইতে বিলাইতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে আমাদের অধীনতা শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে। তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"উন্নতি উন্নতি গতি, বিশ্বনীতি জগতের!
ঠেকিবে কি ভালে শুধু রত্ন-প্রসূ ভারতের?"

জানি না, কয়টী হৃদয়ে কবির এই মর্ম্ম-স্পর্শী কাতরোক্তি স্পর্শ করিবে!

নিৰ্মেঘ পূর্ণিমা নিশি! জ্যোৎস্না-বিধৌত ধরণী ধ্যানমগ্না! সমীরণ অতনু জ্যোৎস্নাকে জড়াইতে না পারিয়া ধরাময় খুঁজিতেছে;—কখন শুভ্র ফুল, কখন বা শুভ্র লহরীর বুকে চলিয়া পড়িতেছে! এমন সময় ;—

(১)

"হেন কালে এ ধরায় সমুদ্রের মহাবক্ষ জুড়ি
কোটী কোটী শঙ্খ যেন বাজাইল আনন্দের তুরী।
সে গম্ভীর উৎসবের রোলে,
ধরার সমস্ত দেহ দোলে,
অসীম অকূল সিন্ধু, দেখিতে শুনিতে কেহ নাহি;
একটী চন্দ্রমা চক্ষু মেলি মহাকাশ আছে শুধু চাহি।

(২)

সিন্ধুর সমস্ত উর্ম্মি শুনিল সে জাগরণ ধ্বনি;
ঘুম ছাড়ি, শয্যা ছাড়ি, তাড়াতাড়ি আসিল অমনি;
সুপ্রশান্ত ঘননীল বুকে,
যাহার অতল তলে সুখে
মুকুতা শয়নে সদা শুয়ে থাকে প্রবালের বালা,
তথায় মিলিল আসি পাশাপাশি লহরীর মেলা।

(৩)

সারি সারি দাঁড়াইল সবে, রাশি রাশি মুক্ত আঁখি মেলি;
কেহ কারো কাঁধে চড়ি কেহ কারো হৃদয়েতে হেলি।
সহসা থামিল শঙ্খধ্বনি,
ধীর ধীর মৃদু রণরণি
মুহূর্ত্তের তরে যেন সিন্ধুবুকে বেড়াল কাঁপিয়া,
তার পরে মধুর সঙ্গীত সুমধুরে উঠিল ফুটিয়া।

(৪)

প্রথমে দেখিনু, ভাসি উঠিতেছে জলের উপর
প্রবাল কঙ্কণ পরা শত শত হিরণ্ময় কর;
সবারই রহিয়াছে ধরা
একখানি নীলালোক ভরা
তরল কুঞ্চিত মেঘ, রাশি রাশি মুকুতার ঝাড়
হেথা হোথা ঝুলিতেছে নীলাম্বরে তারার আকার!

(৫)

সেই মেঘ মাঝে বসি, পবিত্র গম্ভীর-মুখছবি
অপার রহস্যময় নত আঁখি সমুদ্রের কবি!
মুকুতার কুসুমের মালা
শিরটুকু করিয়াছে আলা,
জলবালাগণ ঘিরি নাচে গায় চৌদিকে তাহার,
ভাসিয়া উঠিছে যেন রাশি রাশি চাঁদের বাজার।"

বোধ হয়, বঙ্গদেশে—পৃথিবীতে এরূপ সাহিত্যানুরাগী অতি বিরল, যিনি উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিয়া কবির উধাও কল্পনা এবং অপূর্ব্ব সৃষ্টির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়াপ্লুত হইবেন না। মনে হয়, সত্যই

যেন আমি সিন্ধুতীরে দাঁড়াইয়া 'আনন্দের তুরী' কোটী কোটী শঙ্খধ্বনি শুনিতেছি। আমার সম্মুখে অসীম সিন্ধু; আর কেহ নাই—কেবল পূর্ণচন্দ্র 'মহাকাশ' হইতে সমস্ত দেখিতেছেন। সমস্ত সিন্ধুর ঊর্ম্মি আজ কাহার আহ্বানে জাগরিত হইয়াছে। হিরণ্ময় কর-শোভিত কুঞ্চিত তরল মেঘ মাঝে 'অপার রহস্যময় নত আঁখি সমুদ্রের কবি' ধীরে ধীরে সিন্ধুর তলদেশ হইতে উঠিতেছেন! কি আশ্চর্য্য কল্পনা! আমরা কবিতায় Grandeurর কথা অনেক শুনিয়াছি, অনেকেরই বিশ্বাস Grandeur কেবল মহাকাব্য এবং কাব্যে সম্ভব। আমি তাঁহাদিগকে উদ্ধৃত অংশটুকু মাত্র একবার মনোযোগের সহিত পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা হইতে অধিক Grand যে আর কি হইতে পারে, তাহা আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বুঝিতে অক্ষম। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ অভিনব কল্পনা অতি বিরল। কল্পনা, ভাষা এবং সৌন্দর্য্য-শিল্প এই তিনটী কিরূপে ইহার সহিত একত্র হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন। আজকাল বঙ্গদেশের উদীয়মান্ কবিগণ যেরূপ অস্বাভাবিক কষ্টকল্পিত শিল্পের সৃষ্টি করিতেছেন, ইহাতে তাহার বিন্দু মাত্রও দোষ নাই। কবিতা অনেকেই পাঠ করেন; ভাবের গাম্ভীর্য্যে অনেকেই বিচলিত হয়েন; কিন্তু ভাষার সহিত ভাবের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, অনেকে তাহা জানিয়াও বুঝিতে চেষ্টা করেন না। এক একটী শব্দ যে সময় সময় লেখকের বক্তব্যের উপর মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ এখনও বহু বাঙ্গালীর নিকট দুর্ব্বোধ্য। যে শব্দের দ্বারা আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি, তাহার প্রয়োগ প্রভৃতি যদি না বুঝি, তাহা হইলে কবির অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যই আমাদের নিকট লুক্কাইত থাকিবে। আমি উদ্ধৃত চরণ হইতে কেবল দুইটী শব্দ লইয়া ক্ষমতাবান্ শিল্পী শশাঙ্কমোহনের শক্তির পরিচয় দিব। যখন 'পবিত্র-গম্ভীর-মুখছবি" লইয়া সমুদ্রের কবি সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার আঁখি 'নত'! "নত আঁখি" কেবল এই একটী কথায় সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, রহস্যময় কবির মূর্ত্তি এবং সমুদ্রবক্ষে সাময়িক আন্দোলনের জীবিত চিত্র, সুদক্ষ চিত্রকরের একটী তুলিকা স্পর্শে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমার কাব্য-পিপাসু-বন্ধু সিন্ধু-সঙ্গীতের প্রকৃত গুণগ্রাহী বাবু বঙ্কিমচন্দ্র গুহ, বি, এ মহাশয় 'নত আঁখি' সম্বন্ধে বিস্মিত বদনে বলেন—"উহা পড়িলেই বুদ্ধের ধ্যানের মূর্ত্তি মনে পড়ে।" যখন হঠাৎ শঙ্খধ্বনি থামিয়া গেল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য 'ধীর ধীর মৃদু রণরণি' সিন্ধু-বক্ষে কাঁপিয়া বেড়াইল। অতি সাবধানে, ধীরে ধীরে একবার সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াও, এখনও শঙ্খের অস্পষ্ট শব্দ শুনা যাইতেছে—তাহা অতি কোমল, অতি মৃদু! সে শব্দের গতি সহ্য করে কাহার সাধ্য? সমস্ত প্রকৃতি সেই 'রণরণি' শব্দে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! 'মৃদু রণরণি'—একটী শব্দের কি অদ্ভুত শক্তি! যিনি সেই অমূল্য সঙ্গীতের একটী ক্ষীণ কম্পন লইয়া আমাদের প্রাণের সুপ্ত ভাবগুলিকে জাগাইতে পারেন, তিনিই ক্ষমতাবান কবি। যেমন পবনের চরণস্পর্শে সিন্ধুর সমস্ত ঊর্ম্মি

এক সঙ্গে নাচিয়া উঠে, তেমনি ক্ষমতাবান কবির এক একটী শব্দ উচ্চারণে শত শত প্রাণে অসংখ্য ভাবের লহরী নৃত্য করিয়া উঠে। তাহা উপভোগ্য, আলোচ্য নহে। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে, তাহাতে এত মাদকতা আছে যে, একবার সেই 'মৃদু রণরণি' কর্ণে প্রবেশ করিলে সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়—সমস্ত বিশ্বে সেই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কাঁপিয়া উঠিতে হয়। সেই কম্পন প্রকাশ করিবার একমাত্র ভাষা—নীরবতা। সিন্ধু-সঙ্গীতের নানাস্থানে বিশেষতঃ 'মেঘ নাদে' এরূপ অব্যর্থ শব্দ প্রয়োগ, উন্মুক্ত কল্পনা, গভীর ভাব যে কত রহিয়াছে, তাহা সিন্ধুসঙ্গীত পাঠ না করিলে বুঝান যায় না। শশাঙ্কমোহনের হৃদয় ভাবপ্রবণ—বড় অন্তলস্পর্শী। কবির সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তিনি বাছিয়া বাছিয়া শব্দ-যোজন অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন না। তিনি বলেন—"আমি ভাবের ভিতর প্রবেশ করি; ভাব আমার হাত ধরিয়া লইয়া যায়; সেই সময় আমি যাহা লিখি, তাহাতে কষ্ট-কল্পনা বা অস্বাভাবিকতা থাকা অসম্ভব। আমি কখনও 'ইহা আরও সুন্দর হ'ক বলিয়া কাটিতে ছাঁটিতে পারি না। আমার বিশ্বাস যে, কেহ যদি কোন বিষয় সাপটিয়া ধরিতে পারেন, তিনি মনোভাব প্রকাশক বহু সুন্দর ও শক্তিশালী শব্দের সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই সাধারণের নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা তাহা পারেন না, কেবল অন্ন আস্বাদন পান মাত্র, তাঁহারাই নিজেদের বক্তব্য নানা উপায়ে জটিলতা আনয়ন করেন।" ইহাই যথেষ্ট; আমার অতিরিক্ত নিষ্প্রয়োজন। শশাঙ্কমোহন দুই চারিটী কথায় সমস্ত প্রকৃতিকে আমাদের নিকট উন্মোচন করিতে কিরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহা তাঁহার অপ্রকাশিত শঙ্খনদী নামক (১) কবিতার চারিটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কবি একদিন এই শঙ্খের তীরভূমে বনপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অপূর্ব্ব কামিনীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; বনদেবী মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তারপর স্থির নেত্রে কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন;—

> "কুসুমের মৌন তৃপ্তি ছিল সে বদনে—
> আকাশের অসীমতা ছিল সে নয়নে;—
> ছিল সর্ব্ব শরীরের লাবণ্য লীলায়
> বন-প্রকৃতির শান্তি অসীম শোভায়।"

প্রতিভাশালী কবি ভিন্ন অন্যের নিকট কি এইরূপ বিশ্বব্যাপী অসীম কল্পনা প্রত্যাশা করিতে পারি? কেবল চারিটী চরণে কাহারো স্নিগ্ধ করোজ্জল গম্ভীর পবিত্র ছবি অঙ্কিত করিতে পারে, এরূপ উদাহরণ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। আজ বঙ্গভাষা শশাঙ্কমোহনকে পাইয়া যে কিরূপ ধনবতী হইয়াছে, তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এখানে ঋষি কবি Wordsworth হইতে চারিটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, শক্তিশালী কবিগণ কিরূপে দুই একটী কথায় প্রকাণ্ড ঘটনা বুঝাইয়া দিতে পারেন,—

> "There was a roaring in the wind all night;
> The rain came heavily and fell in floods;
> But now the sun is rising calm and bright;
> The birds are singing in the distant woods. &c.

(১) চট্টগ্রামে শঙ্খ নামক একটী নদী আছে। এই কবিতাটি শশাঙ্ক বাবুর "শৈল সঙ্গীতের" জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে; তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এই চারিটী চরণ পড়িলেই রজনীতে ঝটিকার সংহার মূর্ত্তি; অবিরল ধারে বারি পতন; তারপর বারিসিক্ত পৃথিবীতে সূর্য্য দেবের উজ্জ্বল অথচ ধীর কটাক্ষ; আর সুদূর বনানিতে পক্ষিগণের সঙ্গীত—সমস্তই আমাদের অন্তরে কতই কল্পনা ও নূতন চিন্তা লইয়া ভাসিয়া উঠে! আমরা দেখিতে পাই, কেহ কেহ ইহাই প্রকাশ করিতে গিয়া ৪০ চরণেও কৃতকার্য্য হন না।

তরল কুঞ্চিত মেঘ, সমুদ্রের কবিকে লইয়া ক্রমে নক্ষত্রের দেশে চলিল। মেঘেরা বিহ্বল নেত্রে পথ ছাড়িয়া দিল! কেহবা কুতূহলী হইয়া পাছে পাছে কিছু দূর গেল। তথা হইতে কবি, "সেই পুরাতন ধরা, সেই হাসি-অশ্রুময় দেশের" দিকে অনিমেষ-লোচনে চাহিয়া রহিলেন! ধীরে ধীরে অতীতের সুখ দুঃখ প্রভৃতির স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কবি দেখিলেন, ধরণীর বুক হইতে পুরাতন দুঃখরাশি এখনও মুছিয়া যায় নাই,—"এখনো যে ধরণীর বুকে তপ্তবহ্নি রয়েছে জাগিয়া!" ইউরোপ নররক্ত-পিপাসু অসি লইয়া ধরণীর নির্ম্মল সৌন্দর্য্য গ্রাস করিতেছে। তারপর আফ্রিকার দিকে চাহিয়া কবি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃধর্ম্মের প্রচারক কবি, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের অত্যাচার দেখিয়া অতি কঠিন উত্তেজনা পূর্ণ ভাষায় বলিলেন;—

"হোথা আফ্রিকার শব, পূতিগন্ধে পূর্ণ চারিধার।
কলরবে কোলাহলে ইউরোপ করিছে আহার।
শকুনি গৃধিনী আর দানা
মৃতক্ষেত্রে তথা এক খানা;
অস্থে গ্রন্থের বুঝি ছিবাইছে করি কড়মড়
রক্তহীন কাল শিরগুলি, প্রস্তর কঙ্করময় ধড়।"

অক্ষয়মোহন যে ভাষায় আফ্রিকার হীনাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতে অধিক উপযোগী ভাষা আর কি হইতে পারে? উদ্ধৃত অংশের শেষ দুইটী চরণ পড়িলেই কবির বর্ণনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিশাল হৃদয়ের প্রকৃত আন্তরিকতা না থাকিলে কেহই এরূপ ভাষায় অবস্থার প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না। কবি দেখিলেন, "আপনার অতীতের কুজ্ঝটিকা-স্বপন নিরত হইয়া মহাকায় এসিয়া মহিষের মত শুইয়া আছে।" মহিষ তাহাতেই শান্তি-সুখ অনুভব করিয়া চক্ষু মুদিয়া মহাজ্ঞানীর ন্যায় পড়িয়া আছে! কে কোথায় হাত পা কাটিতেছে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার বহু দূরে স্থিত এসিয়ার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত উক্তি। সমস্ত পৃথিবীর মাঝে কবি কেবল সাধারণ তন্ত্রের (Republic) লীলাভূমি আমেরিকার দিকে চাহিয়া কতকটা ভবিষ্যৎ মঙ্গল কল্পনা করিতেছেন। কারণ তথায় রাজতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী একটী অঙ্গুলী-সঙ্কেতে শত শত লোক শির অবনত করিতেছে না,—সাধারণের মতসমষ্টিই একটী বৃহৎ মতের সৃষ্টি করিতেছে। ভাবের শিশু, প্রকৃতির মুক্ত আত্মা কবি যে স্বাধীনতাকে সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'কবিরা কল্পনা ও ভাব লইয়া দিন কাটাইলে ভাল হয়; রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে; কারণ ইহা তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চা।' যাঁহারা কবি-হৃদয় চিনিতে ও বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উক্তি উপযুক্ত বটে! বোধ হয়, তাঁহারা জানেন যে, কবি কল্পনা ও ভাবের বেড়ি পায়ে দিয়া এক স্থানে খোদিত পাষাণের ন্যায়

বসিয়া থাকেন না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার উন্মুক্ত আত্মা ভ্রমিয়া বেড়াইতেছে। সে আত্মা সদা প্রফুল্ল, কি এক আনন্দে অধীর; তাহা সংসারীর চক্ষে 'সৃষ্টিছাড়া'। কবি চাহেন, পৃথিবী হইতে অত্যাচার পলায়ন করুক, শান্তি আসুক। আমরা স্বভাবের ভিতর পুষ্ট হইয়া সুন্দর হই; সুন্দরী পৃথিবী আরও সৌন্দর্য্য লাভ করুক। কাজেই অত্যাচার, অবিচার, কুৎসিৎ কিছু দেখিলেই কবির বক্ষে ও চক্ষে শেলের সমান বিদ্ধ হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলির কথা কি ভুলিয়া গিয়াছি? যখন ফরাসিরাষ্ট্র-বিপ্লব সমস্ত ইউরোপের রাজনৈতিক সূত্র ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিয়াছিল, তখন Wordsworth সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া বিপ্লবকারীদের পক্ষাবলম্বন করিলেন। কিন্তু আবার যখন বিপ্লবের ফলে দেশে শান্তির পরিবর্ত্তে অরাজকতা এবং অত্যাচার প্রবল হইল, তখন ন্যায়ানুরাগী কবি আপনার গন্তব্য পথে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন; তারপর বিপ্লবকারীদের প্রতি উৎসাহ ও সহানুভূতির পরিবর্ত্তে ঘৃণা প্রদর্শন করিলেন। কারণ—

"Wordsworth's original sympathy was with the aspirations, and the legitimate rights of the people."*

* ইহা ভিন্ন আরও অনেক লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ও সুক্ষ্ম-দৃষ্টি প্রবেশ করিয়াছিল। †

যখন "The Press" নামক আইরিশ পত্রিকার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী মিঃ পিটার (Mr. Peter) Lord Castlereagh সম্বন্ধে স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া ১৮ মাসের জন্য Lincoln হাজতে বাস করিতে আদিষ্ট হইলেন, শেলির হৃদয়ে তাহা সহ্য হইল না। স্বাধীনতার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ শেলির পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। তিনি "Address to the Irish People" লিখিয়া আয়ারলণ্ডে যাত্রা করিলেন। তথায় স্ত্রীর (Harriet) সহিত একত্র হইয়া সর্ব্বসাধারণের ভিতর আপনার মত প্রচারিত করিবার জন্য পুস্তক (Pamphlets) বিতরণ আরম্ভ করিলেন। কারণ, কবি চাহেন সত্য, সুন্দর ও প্রেম। যাহাতে ঐ তিনটী আছে, তাহাই কবির প্রিয়। আইরিশদের বহুদোষ থাকিলেও, বিজয়ীরা যে তাহাদের সমস্ত স্বাধীনতা অপহরণ করিতে চাহে, তাহা সত্য, সুন্দর ও প্রেমের উপাসক কবির চক্ষে পাপ কার্য্য। শেলি বলিয়াছেন;—

"All religions are good which make men good: a Protestant is my brother and a Catholic is my brother. Be fair, open, and you will be terrible to your enemies."

বিশ্বপ্রেমিক শেলির ধর্ম্ম ও লক্ষ্যের সহিত শশাঙ্কমোহনের কতকটা সাদৃশ্য আছে। শশাঙ্কমোহন পৃথিবীতে ভ্রাতৃধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন,—

"আমি মানবের কাণে গাহিব সে সামুদ্রিক বেদ
সুমধুর ভ্রাতৃধর্ম্ম, যাহে ঘুচে সর্ব্ব ভেদাভেদ।"

সমুদ্রের কবি বুঝিলেন, হৃদয়, চরিত্র ও হৃদয়-রুধির দিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে না পারিলে জগতে ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না; তাই জগতের কোটী কোটী নরনারীকে আপনার বিশাল হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। এখানে

* Prose writings of Wordsworth, edited with an Introduction, by W. Knight L. L. D.

† "In an appendix to his Poems, published in 1835, Wordsworth discussed the subject of "Legislation for the poor, the working classes, and the clergy." Under the second head, his vindication of the root-principle of Trades Unions, and the formation of joint-stock Companies by the poor, is special noteworthy." Ibid.

কবির প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনা কত সরল, কত মর্ম্মস্পর্শী ;—

"আমি লক্ষ কোটী অতিথির
পাতে দিব হৃদয়-রুধির,"
বায়ুভরে বরিষার মেঘ ধরা জুড়ি যাইব মিশিয়া,
জগতের মহাশক্তি কোথা, লও মোরে লও উড়াইয়া।"

ক্রমে কবি আপনার ভাবে উত্তেজিত ও অধৈর্য্য হইলেন ; আবেগে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন ; তাঁহার দুইটী সজল নয়ন যেন ঊষাতারার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; মেঘোপরে আসীন কবি নক্ষত্রের দেশ হইতে ধরণীর আত্মাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া জলদের স্বরে বলিতে লাগিলেন—

"অগ্রসর, অগ্রসর, ধীরে ধীরে কমিছে আঁধার
ঘুমাইছে ঝঞ্ঝাঝড়, এস এস বিশ্ব-পরিবার !
ভাই ভাই দাও দাও কোল,
বল মুখে জয় জয় বোল,
তারাহীন মহাকাশে ভাসে শশী মহা পূর্ণিমার ;
ক্ষিতি ব্যোম একাকার, এই মহা মহোৎসবে
ভাই ভাই হও একাকার।"

"একবার একবার ওরে হৃদয়ের পক্ষ সাপটিয়া
উড়ে আয় নীলাকাশে, দাঁড়া হেথা দাঁড়ারে আসিয়া।
দেখিবি তোদের ধরাধাম,
শুধু একখানি ক্ষুদ্র প্রাণ,
ডুবিয়াছে উচ্চ নীচ বিজাতীয় বিভেদ অন্তর,
কি মধুর ঐকতানে ব্যাপিয়াছে বিশ্ব চরাচর।

"ঘুরে চন্দ্র, ঘুরে তারা, ঘুরে সূর্য্য, ঘুরে শনৈশ্চর—
ধরণীর এ দুর্দ্দশা হেরি, প্রাণে তারা কত না কাতর।
এখনও হাতে উঠে খাড়া,
এখনও আছে শত কারা,
এখনো ভায়ের রক্তে লোলুপ ছুটিছে শত ভাই,
থেকে থেকে মার বুকখানি কাঁপি কাঁপি উঠিছে সদাই !

কি জ্বালাময়ী ভাষা ! ইহার এক একটী শব্দ বিশ্ব-প্রেমিক কবির হৃদয়ের বিশালতা যেরূপ ভাবে প্রকাশ করিতেছে, তাহা বঙ্গ-ভাষায় দুর্লভ। এখনও কবির সুগম্ভীর বাণী "অগ্রসর, অগ্রসর" কাণের কাছে বাজিতেছে। যুদ্ধের সময় সেনাপতির এক একটী আদেশের ন্যায় ইহা আমাদের মনের উপর কার্য্য করিতেছে। আমাদের প্রিয়বর, চট্টগ্রামের একটী পবিত্র আত্মা ৺ নলিনী-কান্ত সেনের জীবনে "অগ্রসর, অগ্রসর" কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহা গত ১৩০৮ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের "নব্য-ভারতে" —"৺ নলিনীকান্ত সেন" নামক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি। বহুবার তাঁহার মুখে ঐ উদ্ধৃত চরণগুলি শুনিয়াছি। সে বলিত—"ইহা আমার সুপ্ত জীবনকে অনেকটা জাগাইয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনকে জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা গঠিত করিবার একমাত্র ভাষা শশাঙ্কমোহনের 'সিন্ধু-সঙ্গীত'। এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যখন 'সিন্ধু সঙ্গীত' প্রত্যেক বাঙ্গালীর অতি আদরের বস্তু হইবে।" আরও শুনিয়াছি। কোন যুবক শশাঙ্কমোহনের 'সিন্ধু-সঙ্গীত' পড়িয়া আপনার বিশ্বাসানুযায়ী সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কবির বিপুল শক্তির পরিচয়। এ জগতে কে কাহাকে বাঁচাইতে পারে ? কে আপনার স্বার্থ, ভেদাভেদ জ্ঞান ভুলিয়া অপরকে সত্যপথ ও ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে উত্তেজিত করে ? নক্ষত্রের দেশে থাকিয়া কবি যখন মনঃকর্ণে কোটী কোটী গ্রহমুখে জগতের বিশ্বনীতি গীতি শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের ডোর ছিঁড়িয়া প্রাণ মহাকাশে হারাইয়া যাইতে চাহিল ! কিন্তু কবি অতি কষ্টে তাহা রোধ করিতে লাগিলেন। কারণ বিশ্বের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছে ;—

"সহস্র কলিকা আজি ধরণীতে যাব ফুটাইয়া !
জগতের মহা রাজপথে উচ্চ নীচ দিব ঘোচাইয়া !"

কবি যখন এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপনার শান্তি ও সুখের জন্ম কিরূপে মহাকাশে নক্ষত্রের দেশে ভ্রমিয়া বেড়াইবেন ?

"বলিতে বলিতে কবি তীব্রবেগ-পক্ষ করি ভর
নামিতে লাগিল যেন উল্কাপিণ্ড ধরণী উপর।
তখন ঘুমের ঘোর ত্যাগি
মর্ত্ত্যবাসী উঠিতেছে জাগি,
সহসা দেখিল চাহি, ধরার অন্তরতন্ত্রী ধরি
স্থাবর জঙ্গম সব কাঁপিতেছে থর থর করি।"

কি Grand বর্ণনা! সিন্ধুগর্ভ হইতে কবির উত্থান ও নক্ষত্রের দেশত্যাগ করিয়া ধরনীতে ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রচারার্থে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় পতন পর্য্যন্ত সমস্তই এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। আমি ক্ষণকাল চিন্তা না করিয়াই বলিতেছি, সমস্ত বঙ্গভাষায় উহার তুলনা নাই। যেমন প্রবলস্রোতের মুখে তৃণখণ্ড পড়িলে তাহাকে স্রোতের বশীভূত হইতে হয়, সেইরূপ শশাঙ্কমোহনের এক একটী ভাব ও বর্ণনা আমাদের প্রাণকে সজোরে আকর্ষণ করে। বঙ্গদেশে কয়জন কবির ভাগ্যে এই ক্ষমতালাভ ঘটিয়াছে ?

প্রত্যেক জীবনেরই একটা লক্ষ্য আছে। যাহার কোন লক্ষ্য নাই, তাহার জীবন আছে কি না সেইটাই সন্দেহ ! আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে আশার মায়া বলে। কেহ কেহ মনে করে যে, এই বিশাল পৃথিবীতে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ ; আমাদের উত্থান, স্থিতি ও বিলয় তিলেকের মধ্যেই হয় ; সুতরাং ধরণীর বক্ষে আমাদের কোন চিহ্ন থাকে না। আমরা পৃথিবীতে হৃদয়ের যে সৌন্দর্য্য ও সৌরভটুকু রাখিয়া যাই, তাহাই যে শত শত প্রাণকে সুন্দর করিয়া তুলে ; তবে আমরা কিরূপে পৃথিবী হইতে একবারে মুছিয়া গেলাম ? যাহারা পৃথিবীতে নানা অত্যাচার, অবিচার দেখিয়া ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রচার অসম্ভব মনে করিতেছেন, কবি তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—

"এক করি দেহ, আত্মা, শকতি, উদ্যম,
এস সবে চেষ্টা করি তুলিবারে শির,
অতিক্রমি হিমাদ্রির শৃঙ্গ উচ্চতম
উঠিব, লাগিবে শিরে স্বরগ-সমীর।"

ইহাতে কবির অটল বিশ্বাস আছে। প্রাণের লক্ষ্য ও হৃদয়ের আশা একত্র হইয়া, কার্য্য করিলে আমরা হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিতে পারিব, ভ্রাতৃধর্ম্মের প্রচার হইবে না কেন ? সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি, অত্যাচার-পীড়িত মূর্চ্ছিত প্রাণগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"কেবলে পৃথিবীখানি শুধুই পিশাচময় ?" এই বিশ্বের লক্ষ্যই যে সৌন্দর্য্যসাধনা,—জড় ও অজড় তাহারই সন্ধানে ছুটিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের বক্ষমাঝে সৌন্দর্য্যের তন্ত্রী বাজিতেছে ; এখানে কুৎসিত কিরূপে বাঁচিতে পারে ? "একটী সুন্দর প্রাণে বাঁচে শত প্রাণপাখী"। আর "কুৎসিত নিজের ভরে মরে হাহাকার করে।" এখানেই পার্থক্য। কিন্তু সুন্দরের প্রধান ধর্ম্মই কুৎসিতকে সুন্দর করা ; তাহাদের নিকট বিশ্বের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা। কবি সেই সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট উন্মোচন করেন। 'সিন্ধু-সঙ্গীতের' কবি আমাদিগকে পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃধর্ম্মের প্রধান অবলম্বনই 'সৌন্দর্য্য-সাধনা। আর এই সৌন্দর্য্যই আমাদের প্রাণে আশা ও লক্ষ্য আনিয়া দেয়। কবি সৌন্দর্য্যকে কিরূপভাবে অনুভব করিয়াছেন, দেখুন—

"একটী সুন্দর ওষ্ঠ, অধরের পরিমল
বন, নদী, মাঠ, গিরি করে দেয় সমতল।"

ইহা হইতে অধিক সত্য আর কি আছে ?

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদের বা অভিব্যক্তি-বাদের মূল প্রশ্ন হইতেছে, কোন একটী জাতি পঞ্চাশ বৎসরেই হউক, আর লক্ষ বৎসরেই হউক, নৈসর্গিক কারণমালার দ্বারা কতকটা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কি না। কতকগুলি জীব আর কতকগুলির সহিত পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া বংশ-বিস্তার করিতে পারে কি না—এ প্রশ্নের গুরুত্ব তত অধিক নহে, আর মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে এ প্রশ্নটী কতকটা অপ্রাসঙ্গিকও বটে।'

ফল কথা, কোকিলেশ্বর বাবুর প্রথম আপত্তি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদের বিরুদ্ধেই কার্য্যকর নহে; অভিব্যক্তিবাদকে—জীব-জগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদকে ত স্পর্শই করে না।

অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে কোকিলেশ্বর বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি।

পাঠক মহাশয় দেখিবেন, এবার কোকিলেশ্বর বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। আর সে "হাড় পেশী আদি"ও নাই; আর সে "মস্তিষ্কের গঠন প্রভৃতি"ও নাই। উক্ত "আপত্তি" সম্বন্ধে পাঠক মহাশয়ের এবং আমাদের মস্তিষ্কের জ্বালাও নাই। কথাটা এই;—এ আপত্তিটী কোকিলেশ্বর বাবু ধরিতে ছুঁইতে পারা যায়, এমন একটী জিনিসের উপর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, আমরা যখন সে জিনিসটী টানিয়া ভাঙ্গিলাম, তখন কোকিলেশ্বর বাবু তাতে সন্তুষ্টই হউন আর অসন্তুষ্টই হউন, চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন তাঁর আর গত্যন্তর নাই। যে সকল আপত্তি কেবল বচনের উপর সংস্থাপিত, সে সকল আপত্তি আপত্তিকারীদের (বিশেষত) যাঁরা খালি আপত্তি করিবার জন্য আপত্তি করেন) সন্তোষ-জনকরূপে ভাঙ্গা তত সহজ নহে।

অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে কোকিলেশ্বর বাবুর তৃতীয় ও চতুর্থ আপত্তি।

কোকিলেশ্বর বাবু এবার তাঁর দ্বিতীয় ও চতুর্থ আপত্তিকে "একই প্রকারের" বলিতেছেন। (গত শ্রাবণ মাসের "নব্য-ভারতে" তৃতীয় ও চতুর্থ আপত্তিকে অনেকটা একভাবে দেখিয়াছিলেন।) আমাদের বোধ হয়, এবার যে স্থানে "দ্বিতীয়" লিখিয়াছেন, সে স্থানে "তৃতীয়" বসিবে। সম্ভবতঃ এটী লেখার বা ছাপার ভুল। যাহা হউক, আমরা তাঁর তৃতীয় আপত্তিটী তাঁর নিজের কথায় তুলিয়া দিতেছি। তাঁর তৃতীয় আপত্তি হইতেছে "একই দম্পতীর পাঁচটী সন্তানের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দুইটী মাত্র সন্তানের কেন এরূপ অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল, বিবর্ত্ত-বাদ এ কথার উত্তর দিতে কিছুতে সক্ষম নহে।" আমরা এরূপ সব ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সম্বন্ধে (একটী পেঁপের দুইটী বীজ হইতে যে দুইটী গাছ উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে বিভিন্নতা; একই মা বাপের পাঁচটী সন্তান পাঁচ রকমের হয়,—এই যে বিভিন্নতা এরূপ সব বিভিন্নতা সম্বন্ধে) আমাদের প্রথম প্রতিবাদে বলিয়াছি যে, "সাধারণ ভাবে" দেখাইতে পারা যায় যে, এরূপ সব বিভিন্নতা বাহ্য অবস্থা (Conditions of life) ও লোকে যাহাদিগকে প্রাকৃতিক শক্তি বলে, সেই সব শক্তিরই কার্য্যের ফল। আমরা আরও বলিয়াছি, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যের (বিভিন্নতার) কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না বটে—ব্যাপারটী এত

জটিল যে, বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অসম্ভব,—কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখাইতে পারি যে, উক্তরূপ বৈলক্ষণ্য না আসিয়া থাকিতে পারে না; আর অনেক স্থলে প্রত্যেক বিশেষ বৈলক্ষণ্যেরও কারণ দেখান যাইতে পারে।' যে সকল ব্যক্তিগত বিভিন্নতার নির্দ্দিষ্ট (definite) কারণ আজ বিজ্ঞান স্পষ্টরূপে দেখাইতে পারে না, সে সকল বিভিন্নতাও যে প্রাকৃতিক কারণমালার ফল, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কতকগুলি ব্যক্তিগত বিভিন্নতার নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক কারণ বিজ্ঞান ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছে; প্রতিবৎসর এ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে; দুই বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তিগত বিভিন্নতার নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক কারণ বুঝা যাইত না, আজ তাহা অনেকটা বুঝা যাইতেছে; সাধারণ ভাবে (on general, principles) দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তিগত বিভিন্নতা (প্রাকৃতিক কারণমালার ফল স্বরূপ) না আসিয়া থাকিতে পারে না,—জড়জগতের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানই একথার সাক্ষ্য দিতেছে;—এরূপ স্থলে কতকগুলি (হউক না তারা অনেক, অনেকগুলি) ব্যক্তিগত বিভিন্নতার নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক কারণ আজ বিজ্ঞান দেখাইতে পারিতেছে না বলিয়া বিজ্ঞানের এ অক্ষমতাকে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি স্বরূপ খাড়া করা কতদূর সঙ্গত, তাহা পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিবেন। আমরা বলিতে চাই, বিজ্ঞানের এ অজ্ঞতা অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিরূপে কিছুতেই দণ্ডায়মান হইতে পারে না—একেবারেই না। কোকিলেশ্বর বাবু বা তাঁর মত আপত্তিকারীরা যদি একটী মাত্রও (বেশী চাই না কেবল একটী মাত্র) ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সম্বন্ধে দেখাইতে পারিতেন যে, উক্ত বিভিন্নতাটী প্রাকৃতিক কারণপুঞ্জ(Natural causation)দ্বারা উদ্ভূত হইতে পারে না;—যদি দেখাইতে পারিতেন, উক্ত বিভিন্নতার আবির্ভাবের জন্য প্রাকৃতিক কারণপুঞ্জের অতিরিক্ত কোন কারণ বা "ঐশসংকল্প" আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানের উক্ত অজ্ঞতা জীবজগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি স্বরূপে উত্থাপিত হইতে পারিত। তা যখন পারিতেছেন না, তখন বিজ্ঞানের অজ্ঞতা লইয়া বৃথা চীৎকারে কোন ফল নাই। এরূপ "আপত্তি". হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে অশিক্ষিত খ্রীষ্টান পাদরী (আমরা সুশিক্ষিত পাদরীদের কথা বলিতেছি না) তাহাদের "আপত্তি"র ন্যায়;—আপত্তির মাথা নাই মুণ্ড নাই। এরূপ আপত্তি যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না।

কোকিলেশ্বর বাবু এখানেও যুক্তিতে কুলাইতে না পারিয়া নিজপক্ষ সমর্থনার্থে হক্সলি, স্পেন্সার, ডারউইনকে আহ্বান করিয়াছেন। জলে ডুবিতেছি, এরূপ ব্যক্তির কুটো গাছটা ধরিতে চেষ্টা করাও যা, আর অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি সমর্থনের জন্য হক্সলি, স্পেন্সার, ডারউইনকে ডাকাও তাই। সুশিক্ষিত পাঠক মহাশয় অগ্রেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের যে দুই একটী উক্তি কোকিলেশ্বর বাবু তাঁর নিজ আপত্তি সমর্থনার্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের অর্থ আর কিছুই নহে,—তাহাদের অর্থ এই যে, অনেক ব্যক্তিগত বিভিন্নতার নির্দ্দিষ্ট কারণ আমরা আজ

সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারি না; এখনও অনেক জানিবার, বুঝিবার আছে;—আর বিজ্ঞানের কোন্ বিভাগেই বা তাহা নাই, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। উক্ত উক্তি-সকলের অর্থ ইহা নহে যে, প্রাকৃতিক কারণপুঞ্জ সে সকল ব্যক্তিগত বিভিন্নতা উৎপাদনে অসমর্থ; অথবা প্রাকৃতিক কারণপুঞ্জের অতিরিক্ত কোন agencyর আবশ্যক। তিন শত quotation দ্বারা আমরা দেখাইতে পারিতাম যে, হক্সলি, স্পেন্সর, ডারউইনের পূর্ব্বোক্ত উক্তি সকলের অর্থ উহাই। কিন্তু এরূপ সিদ্ধ সাধন করিবার আমাদের সময় নাই, আর এরূপে মিছে পুঁথি বাড়াইয়া পাঠক মহাশয়েরও সময় নষ্ট করিতে চাই না।*

পাঠক মহাশয়, বোধ হয় এখন দেখিলেন, কোকিলেশ্বর বাবুর কোন আপত্তিই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ গ্রহণেই বাধক স্বরূপ দাঁড়াইতে পারে না; জীবজগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদকে ত তারা স্পর্শও করিতে পারিতেছে না।

কোকিলেশ্বর বাবু উক্ত অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে ঐ সব আপত্তি হইতে যুক্তি দ্বারা "পরমেশ্বরের" ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁর এ চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিবেন। আমরা কেবল বলিতে চাই, অভিব্যক্তির মূলে বা সঙ্গে সঙ্গে যে ঈদৃশ 'ঐশ-সঙ্কল্প' বর্ত্তমান, তাহার প্রমাণাভাব; উক্ত ঐশ-সঙ্কল্পের অর্থ "procession of the world that is to be"ই হউক (যে অর্থ কোকিলেশ্বর বাবু প্রথমে করিয়াছিলেন), আর "ইচ্ছা" হউক, (যে অর্থ মাঝে করিয়াছিলেন) আর "উদ্দেশ্যই হউক (যে অর্থ শেষে করিয়াছেন), কোকিলেশ্বর বাবুও এবার উক্ত অভিব্যক্তির মূলে বা সঙ্গে সঙ্গে উক্ত "ঐশ-সঙ্কল্পের" বিদ্যমানতার কোন প্রমাণ বা যুক্তি দেন না। যুক্তির পরিবর্ত্তে কতকগুলি উক্তি দিয়াছেন। তিনি যত ইচ্ছা উক্তি করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই; পাঠক মহাশয় কেবল দেখিবেন যে, উক্তি আর যুক্তি এক জিনিস নহে।

আমাদের মূল কথা আর শেষ কথা আমরা বলিলাম। প্রসঙ্গক্রমে যে দুই চারিটী বিষয় উঠিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রসঙ্গ ক্রমে অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে হিন্দু দর্শনের কথা উঠিয়াছিল। হিন্দুদর্শন যে অভিব্যক্তিবাদের বিরোধী নহে, ইহা দেখাইবার জন্য—এ সিদ্ধ সাধনের জন্য, কোকিলেশ্বর বাবু এবার যে কেন এত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হিন্দুদর্শনে যে এক প্রকারের অভিব্যক্তিবাদ দেখা যায়, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। সকলেই জানেন, আর আমরাও পুনঃপুন আমাদের বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শনের একটী সৌন্দর্য্যই এই যে, সাংখ্যদর্শন অভিব্যক্তিবাদ-মূলক। প্রথম প্রতিবাদের অনেক পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ আলবার্টহলে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সে সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য বলিবার সময় আমরা স্পষ্ট বলিয়াছিলাম যে, সাংখ্যদর্শন একটী evolutionary system। নব্যন্যায়েতে বা অন্য কোথাও

* একটু আধটু বদলাইয়া লইলে আমরা কোকিলেশ্বর বাবুর তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা তাঁর চতুর্থ আপত্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

আমরা বলি নাই যে, হিন্দুদর্শনে এক প্রকারের অভিব্যক্তিবাদ নাই। যাহা হউক, হিন্দুদর্শন অভিব্যক্তিবাদের বিরোধী নহে, কোকিলেশ্বর বাবুর এসিদ্ধ সাধনের মধ্যে পাঠক মহাশয় এ সম্বন্ধে আসল কথাটী ভুলিয়া যাইবেন না। আমরা আমাদের "ভুল কোকিলেশ্বর বাবুরই" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি যে, যাকে জীবজগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদ বলে—Biological evolution বা Organic evolution বলে—সেই অভিব্যক্তিবাদের মূলতত্ত্বটী হিন্দুদর্শনের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সে তত্ত্বটী এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নিতান্ত বিভিন্ন একটী জাতি ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, বংশ-পরম্পরায় পরিবর্ত্তিত হইয়াই পরবর্ত্তী একটী জাতি হইয়াছে;—মাছ বা মাছের মত এক জাতীয় জীবই ঐরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বেঙ্ হইয়াছে;—গোসাপ, টিকটিকী প্রভৃতি সরীসৃপের মত এক জাতীয় জীবই ঐরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসরে পক্ষী জাতি হইয়াছে, ইত্যাদি। আমাদের মতে জীবজগৎ সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদের উক্ত মূলতত্ত্বটী হিন্দুদর্শনে পাওয়া যায় না। আমাদের একথার বিরুদ্ধে যদি কোন সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় বচন থাকে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়দিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম। সেরূপ বচন ত কেহ দেখাইলেন না। হিন্দুদর্শন যাঁহারা ভাল জানেন, সেই দর্শন আলোচনায় যাঁহারা তাঁদের মূল্যবান জীবন কাটাইলেন, এরূপ শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক আচার্য্য মহাশয়দিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তাঁরা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন, উক্ত মূল তত্ত্ব হিন্দুদর্শনে নাই। কোকিলেশ্বর বাবুও কোন শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। তাহা না করিয়া কতকগুলি বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন। কোকিলেশ্বর বাবু এখানে মনে রাখিবেন অভিব্যক্তিবাদ কথাটী নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়;—সাধারণ ভাবে, বিশেষ ভাবে এবং অন্যান্য ভাবে। এক প্রকারের সাধারণ ভাবের অভিব্যক্তিবাদ যে হিন্দুদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা কেহ অস্বীকার করে না কিন্তু জীবজগৎ সম্বন্ধীয় আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ—যার মূলতত্ত্ব হইতেছে নিতান্ত বিভিন্ন একটী জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়াই পরবর্ত্তী একটী নিতান্ত বিভিন্নজাতি হইয়াছে—এই বিশেষ অভিব্যক্তিবাদের মূলতত্ত্বটী যে হিন্দুদর্শনে নাই, এ কথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; আর আমরা এই কথাই পূর্ব্বেও বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি। আমরা আরও বলিয়াছি যে, বরং এক প্রকারের" স্বতন্ত্র সৃষ্টিবাদেরই আভাস হিন্দুদর্শনে বা বা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কোকিলেশ্বর বাবু "এক প্রকারের" এই কথাটী মনে রাখিবেন। "অভিব্যক্তি"র ন্যায় "স্বতন্ত্র সৃষ্টি" কথাটীও না না ভাবে, নানারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ও হইয়াছে। "স্বতন্ত্র সৃষ্টি"র মূল কথা এই যে, এই যে 'অশ্ব' জাতিটী আমরা দেখিতেছি, ইহা যে কালেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া থাকুক না, প্রথম হইতেই "অশ্ব" ঠিক অশ্বের ন্যায়ই পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে,—মৎস্য বা সরীসৃপের ন্যায় কোন জাতি ধীরে ধীরে, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী বংশ-পরম্পরায় একটু একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া, অবশেষে 'অশ্ব' রূপে পরি-

গত হয় নাই। "স্বতন্ত্র সৃষ্টি"র মূল কথা এই। এখন এ "স্বতন্ত্র সৃষ্টি" নানা প্রকারের হইতে পারে। ঈশ্বর বলিলেন, 'অশ্ব হউক' আর অশ্ব অমনি শূন্য হইতে ঠিক অশ্বরূপে আবির্ভূত হইল, ইহা অবিমিশ্রিত"আঝাড়া" স্বতন্ত্র সৃষ্টিবাদ। ঐশ সঙ্কল্প দ্বারা ঐশ উপাসনা হইতে অশ্ব একেবারেই প্রথম হইতেই অশ্বরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল, ইহাও "এক প্রকারের" স্বতন্ত্র সৃষ্টি-বাদ ;—ইহাতে অবশ্য অভিব্যক্তিরও একটু ভাব আছে। পুরুষ সংযুক্ত "জড়" প্রকৃতির একটু অংশ নানা পরিণামের মধ্য দিয়া অবশেষে অশ্বরূপে পরিণত হইল,—কিন্তু যখন পরিণত হইল, তখন প্রথম হইতেই একেবারেই অশ্বরূপে পরিণত হইল, মৎস্য বা সরীসৃপ বা অন্য কোন নিতান্ত বিভিন্ন জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া হইল না ;—ইহাকেও "এক প্রকারের" স্বতন্ত্র সৃষ্টি-বাদ বলা যাইতে পারে ;—ইহা অবশ্য আদ্যন্ত "আঝাড়া" স্বতন্ত্র সৃষ্টিবাদ নহে, ইহা "এক প্রকারের" স্বতন্ত্র সৃষ্টিবাদ,—যার মূলে আবার এক প্রকারের অভিব্যক্তিবাদ বর্ত্তমান। আমরা তাই বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি "হিন্দুদর্শনে বরং 'এক প্রকারের' স্বতন্ত্র সৃষ্টিবাদের আভাস পাওয়া যায়।" যাহা হউক, পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিবেন, হিন্দুদর্শনের অভিব্যক্তি বাদ সম্বন্ধে আমাদের বিচার আমাদের পূর্ব্বোক্ত মূল কথা ও শেষ কথা সম্বন্ধে একটী অপ্রাসঙ্গিক বিচার। এ বিষয় লইয়া বেশী কথা বলিবার প্রয়োজনও নাই, আর আমাদের অবকাশও নাই।

কোকিলেশ্বর বাবু প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছেন, "পূর্ণজ্ঞানময় পুরুষের সংযোগে প্রকৃতি জাতি হইতে ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এ কথাও যাহা, বেদান্তের প্রত্যেক নামরূপের মূলে ঐশ-সংকল্পও তাহাই। বিষয় একই, কেবল শব্দভেদ মাত্র।" এক ভাবে দেখিতে গেলে কথাটীতে অনেকটা সত্য আছে সন্দেহ নাই ; আবার ইহাও সত্য যে, বেদান্তের "ঈশ্বর" ও "ঐশসঙ্কল্পের" স্থান সাংখ্যদর্শনে নাই। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা অনেকদিন হইতে অনেকেই করিয়াছেন ও করিতেছেন আর এ চেষ্টা যে খুব সঙ্গত চেষ্টা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবে এ চেষ্টাটী একটু অতিরিক্ত ভাবেও হইতে পারে। যদি এ সংসারে কোথাও প্রভেদ ও বিভিন্নতা আছে, একথা বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, "ঈশ্বর" ও "ঐশ-সংকল্প" সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে প্রভেদ ও বিভিন্নতা আছে —বিশেষ প্রভেদ ও বিভিন্নতা আছে। কথাটা এই :—এক ভাবে প্রভেদ নাই ; আবার আর এক ভাবে খুবই প্রভেদ আছে। সমস্ত জগতের সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। ঐ যে আমাদের পাদাশিদে অশিক্ষিত ভাইটী একটী বৃক্ষের বা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিতেছে ; আর ঐ যে হার্বার্ট স্পেন্সারের উন্নত হইতেও উন্নততর মস্তিষ্ক তাঁর অজানিত, অচিন্ত্য,অবোধ্য বিশ্ব-শক্তির নিকট অবনত হইতেছে, পূজার ভাব সম্বন্ধে এই দুই জনের মনের ভাবের মধ্যে মূলে প্রভেদ কোথায় ? আবার আর একভাবে দেখ, প্রভেদও অনেক। পাঠক মহাশয়, এখানেও অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিবেন,

এ বিষয়টীও আমাদের মূলকথা ও শেষ কথা সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

প্রসঙ্গক্রমে কোকিলেশ্বর বাবু আরও একটী কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "অধ্যাপক সলি Sully যাহাকে Emperical Idealist বলিয়াছেন, সাংখ্য ও বেদান্ত তাহাই।" আমরা বলি সাংখ্য সলির (Sully র) ঐ কাঁটালের আমসত্ব নহে। সাংখ্য-দর্শনকে যদি কোন ইংরাজী নামে অভিহিত করার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে ইহাকে Realism modified by idealism বলিলে আমাদের মতে সাংখ্যের ঠিক ভাব অনেকটা প্রকাশ হয়। আমরা বলি, সাংখ্যদর্শনের মূল ভিত্তি "idealist" নহে; ইহার মূল ভিত্তি "realism" সাংখ্যদর্শন জগতের বাস্তব সত্তায়(objective reality তে) বিশ্বাস করেন। তবে একথাও সত্য "idealism" এর মধ্যে যে টুকু সর্ব্ববাদী-সম্মত সত্য আছে, সে গভীর সত্যও সাংখ্যের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। সে সত্যটী কি? সে সত্যটী এই যে, জগৎকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তুমি তোমার জ্ঞানরূপেই জানিতে পার; আমি আমার জ্ঞানরূপেই জানিতে পারি; তোমার জ্ঞান বা চৈতন্য যদি এখনি অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে তোমার সম্বন্ধে "বাহ্যজগতে"র অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইল, আমার জ্ঞান বা চৈতন্য যদি অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে "বাহ্যজগতে"র অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইল। পাঠক মহাশয়, এখানে "তোমার সম্বন্ধে" "আমার সম্বন্ধে"এ কথাগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। Idealism এর মধ্যে এ সত্যটী কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না,—সাংখ্যদর্শনের হাড়ে হাড়ে এ সত্যটী বিঁধিয়াছিল। এখানে আমরা এ কথাটীও বলিতে চাই যে, Idealism যখন পূর্ব্বোক্ত "তোমার সম্বন্ধে" "আমার সম্বন্ধে" একথার অন্তর্নিহিত ভাবটী ছাড়িয়া দিয়া বলেন, "বাহ্যজগৎ" আর কিছুই নহে, কেবল তোমার আমার জ্ঞান মাত্র, বা তোমার আমার চৈতন্যের অবস্থা মাত্র, তথাকথিত জড়জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, আমরা বলিব Idealism তখন "অনধিকার প্রবেশ" করেন,—আমরা বলিব ও কথা বলিবার Idealism এর কোন অধিকার নাই;—সাংখ্যকার বা সাংখ্যকারেরা এটী বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন। তাই আমরা বলিতেছিলাম, সাংখ্যদর্শনকে Realism modified by idealism বলিলে সাংখ্যদর্শনের ঠিক্ ভাব অনেকটা প্রকাশ করা যায়; সাংখ্যদর্শন সলির Emperical idealism নহে। পাঠক মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিবেন, এ বিষয়টীও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। ইহা লইয়া কাহারও সহিত বাদানুবাদ করিবার আমাদের অবকাশ নাই।

আরও একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোকিলেশ্বর বাবু এবার "জাতি" শব্দটীর এক তাঁর মনোমত অর্থ করিয়া কতকগুলি বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "জ্ঞেয় মাত্রেই জ্ঞানেরই স্বরূপ অংশতঃ প্রকাশ করে, সূচিত করে। এই স্বরূপ বুঝাইবার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে; সেই স্তরই জাতি।" এ সম্বন্ধে আমরা আর বেশী কথা বলিতে চাই না। আমরা কেবল বলিতে চাই, এরূপ জাতির প্রমাণাভাব। এ সম্বন্ধে আরও একটী কথা পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্মরণ রাখিবেন। কোকিলেশ্বর বাবুর বৃথা বাক্যজালের মধ্যে

পাঠক মহাশয় ভুলিবেন না যে, জাতি—লোকে যাকে সচারাচার "জাতি" বলে, বিজ্ঞান যাকে জাতি বলে, টিক্ টিকী জাতি, কাক জাতি,অশ্ব জাতি,হরিণ জাতি, ইত্যাদি—এ জাতি নিত্য বা অপরিবর্ত্তনীয় (immutable) নহে। জীবজগৎ সম্বন্ধীয় আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের ইহা এক মহান্ সিদ্ধান্ত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উক্ত অভিব্যক্তিবাদের মূলতত্বই ইহাই।

পাঠক মহাশয়ের একটু ধৈর্য্য আমরা ভিক্ষা করিতেছি। কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন, "আমরা আপত্তিগুলির উল্লেখ করিয়া, তিরস্কারের যোগ্য অপারাধ করিয়াছি কি না, তাহা পাঠকই বিবেচনা করিবেন।" কোকিলেশ্বর বাবুর একথাটী ঠিক নহে—একেবারেই না। "আপত্তি"গুলির (অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে) আপত্তির কথা তিনি বলিতেছেন) উল্লেখের জন্য আমরা তাঁকে "তিরস্কার" করি নাই। তাঁর চারিটী "আপত্তির" মধ্যে দুইটী আপত্তি এক জিনিস, তাহা না বুঝিয়াই তিনি উক্ত দুইটী আপত্তি উত্থাপন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া,—হেলে ধরিতে পারেন না, কেউটে ধরিতে গিয়াছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (বোধ হয়, আমাদের বয়স কোকিলেশ্বর বাবুর বয়স অপেক্ষা বেশী) ন্যায় তাঁকে শ্রদ্ধাস্নেহের সহিত সাবধান করিয়াছিলাম। তার পর যেমন হইয়া থাকে,—আমাদের এ সাবধান করার জন্য তিনি একটু রাগের সহিত ফিরে দাঁড়াইয়া "ভুল কাহার ?" বলিয়া বড় ভাইকে মারিতে গেলেন। তখন আমরা সত্যের অনুরোধে,কর্ত্তব্যের অনুরোধে—আর অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁকে একটু মিষ্ট "তিরস্কার" করিয়াছিলাম। পাঠক মহাশয়ই বিবেচনা করিবেন,কোকিলেশ্বর বাবু এরূপ "তিরস্কারের"যোগ্য অপরাধ করিয়াছিলেন কি না।

পাঠক মহাশয়ের আর ও একটু ধৈর্য্য আমরা ভিক্ষা করিতেছি। কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন—"তাই বলিতেছিলাম যে, বিবর্ত্তবাদের সর্ব্বাংশ মানিতে না পারিলেও বিবর্ত্তবাদকে লোকে গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে বিদ্রূপ করিবার আবশ্যক ছিল না।" না, ইহাতে বিদ্রূপ করিবার আবশ্যকতা নাই, আর ইহার জন্য তাঁকে বিদ্রূপও কেহ করে নাই। বিবর্ত্তবাদকে আংশিক রূপে মানিবার জন্য আমরা তাঁকে "বিদ্রূপ"করি নাই। বিবর্ত্তবাদকে আংশিক রূপে মানিবার জন্যে আমরা তাঁকে "বিদ্রূপ" করিয়াছি, এ কথা আদৌ ঠিক নহে—একেবারেই না। কোকিলেশ্বর বাবু ও আমাদের মধ্যে প্রথমে কথা উঠিয়াছিল, অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি লইয়া। এ সম্বন্ধে যখন তিনি প্রথমে "নিতান্ত বিভিন্ন এক জাতিকে নিতান্ত বিভিন্ন অপর জাতিতে কদাপি পরিবর্ত্তন করা যায় না" বলিয়া, তার পর যখন নিজকে"জীবজগতের ক্রমবিকাশবাদে" বিশ্বাসী বলিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন;—যখন এইরূপে জীবজগৎ সম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশবাদের মূলতত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আপনাকে আবার সেই জীবজগৎ সমন্ধীয় ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসী বলিলেন :—যখন তিনি এই রূপে কালিদাসকে স্মরণ করাইলেন, তখন পাঠক মহাশয়ই বলুন, কোকিলেশ্বর বাবুর কথাতে কেহ একটু না হাসিয়া থাকিতে পারে কি না। আংশিকরূপে "বিবর্ত্তবাদকে" বিশ্বাস করিবার জন্য তাঁকে কেহ "বিদ্রূপ" করে নাই, এবং করিতেও পারে না।

কোকিলেশ্বর বাবুর আর একটী কথা সম্বন্ধে একটী কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। কোকিলেশ্বর বাবুর অসংযত লেখনীই অনর্থের মূল। কথাটী অতীব গুরুতর। একজন পঞ্চম শ্রেণীর ইংরাজ দর্শন-শাস্ত্র-অধ্যাপকের দুই লাইন উদ্ধৃত করিয়া কোকিলেশ্বর বাবু নিজে বলিতেছেন, "সুতরাং যাঁহারা কেবল বিবর্ত্তবাদ ধরিয়া অজ্ঞেয়ের রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁদের উচ্চ ধর্ম্ম ও নীতি কেবল কথার কথা মাত্র।" কথাটী দুর্ব্বিনীত ধর্ম্মাভিমানে পূর্ণ; কথাটী অসারের অসার কথা; কথাটী বাস্তবিক একটী সুশিক্ষিত স্কুল বয়ও বলিবে না। প্রথমেই কোকিলেশ্বর বাবু স্মরণ রাখিবেন, নিজের মস্তকের পাশে কাণ আছে কি না, তাহা অগ্রে না দেখিয়াই যেমন আমাদের দেশের কতকগুলি অধ্যাপক "ঐ কাকে আমার কাণ লইয়া গেল" "ঐ কাকে আমার কাণ লইয়া গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া মহা গোলযোগ করেন, ইংলণ্ডেও সেরূপ দর্শন-শাস্ত্র-অধ্যাপকের অভাব নাই। তার পর কোকিলেশ্বর বাবুর কথাটী যে নিতান্তই অসার কথা—অবিমিশ্রিত, বিশুদ্ধ ভস্ম, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের বেশী দূরে যাইতে বা বেশী চেষ্টা করিতে হইবে না। এই বুদ্ধদেবের কথা ভাবুন। যে দিক দিয়াই হউক, বুদ্ধদেব "অজ্ঞেয়ের রাজ্যে প্রবেশ" করিয়াছিলেন;—তাঁর নীতি অপেক্ষা উচ্চতর নীতি কি জগৎ দেখাইতে পারিয়াছে? না তাঁর নৈতিক-জীবন অপেক্ষা উন্নততর নৈতিক-জীবন জগৎ দেখিয়াছে? এ সব "কথার কথা মাত্র," না? আর "ধর্ম্ম"—প্রকৃত ধর্ম্ম জিনিসটী যে বৈদান্তিক ভায়াদের বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের একচেটে জিনিস, তাহাও আমরা জানিতাম না। যাহা হউক, এরূপ দুর্বিনীত বিশুদ্ধ ভস্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমাদের ইচ্ছাও নাই আর সময়ও নাই। আর পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিবেন, এ বিষয়টীও আমাদের মূলকথা ও শেষ কথা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক;—আমাদের বিনীত অনুরোধ, ঐ সব অপ্রাসঙ্গিক কথায় (side issues এর) জঞ্জালে আমাদের পূর্ব্বোক্ত মূলকথা ও শেষ কথা না ঢাকা পড়ে।

পাঠক মহাশয়, এ যাত্রা আপনার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় আসিয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন, কোকিলেশ্বর বাবুর সহিত তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না; আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক মত বিদূরিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কাহারও ধারণা যদি তিল মাত্রও স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া থাকে, আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব। বিষয়টী অতীব গুরুতর, আমাদের ক্ষমতা নিতান্ত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র। কেবল এই মাত্র বলিতে পারি, আমরা আমাদের প্রবন্ধ তিনটী লিখিতে পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই। পরিশেষে পাঠক মহাশয়ের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে,—কর্ত্তব্যের অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে, অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই অনুরোধ করিতে বাধ্য হইতেছি—অনুরোধ এই যে, আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কোকিলেশ্বর বাবুর কোন কথা যেন অতি সতর্কতার সহিত গ্রহণ করেন। আমরা দেখাইয়াছি, এ অভিব্যক্তিবাদের কতকগুলি প্রথমেই শিক্ষনীয় মূলতত্ত্ব

সম্বন্ধেই তাঁর ধারণা নিতান্তই অস্পষ্ট,—আমরা অত্যন্ত সংযতভাবেই এই কথাটী বলিলাম। আর কোকিলেশ্বর বাবু যদি এ সম্বন্ধে আরও কিছু লেখেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিবেন, তিনি সুর বদলাইতে পারেন আর উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে খুবই চাপাইতে পারেন। কোকিলেশ্বর বাবুর সহিত তাঁর ন্যায় "নেক্রো, আঁকড়াম" ঝগড়া করবার সময় আমাদের নাই।

পরিশেষে আরও একটী কথা। আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে—যদি আমরা ইহা না বলি যে, কোকিলেশ্বর বাবু যে বেদান্ত সাংখ্য, অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধীয় নানা পুস্তক পাঠ করেন ও সেই সব বিষয়ের অনুশীলন করেন, ইহা অত্যন্ত প্রশংসার কথা। তাঁর এরূপ জ্ঞানানুশীলনের শতমুখে প্রশংসা করিতেছি। সংসারে ক জন সেরূপ করেন? আর তিনি যে নানা পুস্তক পড়িয়াছেন, তারও সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কেবল একটু সহৃদয়তা ও সংযত ভাব আবশ্যক। এ সংসারে ভুল কে না করে? কিন্তু প্রকৃত মহত্ব তাঁহার, যিনি ভুল দেখিয়া অম্লান বদনে ভুল স্বীকার করেন। কোকিলেশ্বর বাবুকে আরও একটী বিনীত অনুরোধ, তিনি যেন অমুক কি বলিয়াছেন, তাহা জানিবার বা জানাইবার জন্য বেশী ব্যস্ত না হন; নিজে খুব গভীর ভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া যেন নিজের দর্শন গঠন করেন। আশা করি, আমরা যেরূপ ভাবে (অর্থাৎ শ্রদ্ধা-স্নেহের সহিত) পূর্ব্বোক্ত অনুরোধগুলি করিলাম, তিনি ঠিক সেইরূপ ভাবেই তাহা গ্রহণ করিবেন। আর সর্ব্বদা যেন এ কথাটী স্মরণ রাখেন যে, Biology খুব ভাল করিয়া না জানিলে (আমরা পুঁথিগত বিদ্যার কথা বলিতেছি না) দর্শনের দুর্গম পথে Sure-footed হইয়া চলা আজিকার কালে অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আর তাহা ভালরূপে না জানিলে দর্শনরূপ সুমহান্ পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করা অসাধ্য।

সর্ব্বশেষে আরও একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোকিলেশ্বর বাবুর "ব্রহ্ম ও জগৎ" শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে তাঁর জ্ঞান-পিপাসার, জগতের উচ্চতম ও গভীরতম প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার তাঁর অতি প্রশংসনীয় প্রবল ইচ্ছার সুন্দর ও যথেষ্ট পরিচয় আছে। ঐ প্রবন্ধগুলিতে অনেক জানিবার, শুনিবার, ভাবিবার বিষয় আছে। যদি একজন চিন্তাশীল, সংযত বৈজ্ঞানিককে সেগুলি দেখাইয়া তাহাদের বিজ্ঞান অংশগুলি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত করিয়া লন, আর তিনি নিজে যদি সমস্ত প্রবন্ধগুলি বিশেষ সংযত ভাবে দেখিয়া এক এক স্থান আবশ্যক মত বদলাইয়া দেন, এবং বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের অতিরিক্ত ও অযথা সমন্বয়ের জন্য ব্যস্ত না হন, তাহা হইলে উক্ত প্রবন্ধগুলি একটী উপাদেয় পুস্তক হইবে।*

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

* এ সম্বন্ধে কোকিলেশ্বর বাবু আর কিছুই লিখিবেন না, পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইল। ম, স।

শ্রীমান্ প্রভাত-কুসুমের বিবাহের উপদেশ।

(১)

বধূমাতা-বরণ।

১৮ই মাঘ, রবিবার, ১৩০৯।

ফুল্লনলিনি,

আজ আমি, বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক, সচন্দনে, সপুষ্পে, সস্নেহে, সানন্দে তোমাকে বধূ-মাতৃত্বে বরণ করিতেছি। তোমার পিতৃকুল এবং মাতৃকুল এবং আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল এবং সর্ব্বোপরি বিশ্ববিধাতা তোমার প্রতি আজ প্রসন্ন হইয়া শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। তোমার হৃদয় আজ প্রেমানন্দে পূর্ণ হউক।

অল্পদিনের পরিচয় হইলেও তুমি আমাদের আচার, ব্যবহার, স্বভাব, প্রকৃতি কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। হৃদয়ঙ্গম করিয়াই,তুমি, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ওকুল হইতে একুলে আসিতে, সম্মত হইয়াছ। আমরা ভাল কি মন্দ, সুন্দর কি কুৎসিৎ, সে বিচার অবশ্যই করিয়াছ। বিচার করিয়াও যখন একুলে মিশিতে প্রস্তুত হইয়াছ, তখন আমরা তোমাকে আমাদের হৃদয়ে সাদরে স্থান দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। তুমি আজ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার প্রসন্নতায় আমাদের হৃদয়ের অপ্রসন্নতা, মলিনতা বিদূরিত হইয়া যাক্।

পৃথিবীর লোকেরা সর্ব্বদাই সুন্দর কুৎসিতের বিচার করিয়া থাকে। তুমি জান কি, এজগতে কি সুন্দর এবং কি কুৎসিৎ? পৃথিবীর কত লোক কতরূপে তোমাকে বুঝাইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও বুঝাইতে পারে, আমরা কুৎসিৎ, মলিন, দরিদ্র, অপদার্থ, আমাদের চেহারা সুন্দর নহে, কথা মিষ্ট নহে, ব্যবহার মধুর নহে, সর্ব্বোপরি, আমরা অত্যন্ত দরিদ্র,—মোটা ভাত খাই, মোটা কাপড় পরি,—সর্ব্বদাই ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রামে প্রপীড়িত। পৃথিবীর বিচারে এসংসারে যাহা ভাল, তাহা আমাদের ঘরে কিছুই নাই। আমরা নিজদিগের অভাব স্মরণে সদা ম্রিয়মাণ,—তদুপরি আত্মীয়গণের,—সর্ব্বোপরি এই দরিদ্র ভারতের অভাবে স্মরণে সদা নিষ্প্রভ, —পৃথিবীর বিচারে যাহা ভাল, আমাদের এখানে তাহা নাই। তবুও, ফুল্লনলিনি, তবুও তুমি, কেন একুলে মিশিতে প্রস্তুত হইয়াছ, আমি তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। মাতৃহারা আমি, বহুদিন যাবত, আমার মাতা কোথায় আছেন, খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম; অবশেষে মেঘনার ওপারে যাইয়া দেখিলাম, সেখানে সরলতা-ভস্ম-স্তূপের মধ্যে কি এক স্বর্গীয় শোভা ফুটিয়া উঠিতেছে। দেখিয়া আমি মজিলাম, শেষে ক্রমে ক্রমে—একুলের যে দেখিল, সে-ই মজিল। মজিয়া, ভাবে বিহ্বল হইয়া, আমরা আজ তোমার নিকটে মনোভাব ব্যক্ত করিতে উপস্থিত। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাদের মধ্যে কি দেখিয়া ভুলিয়াছ? কি দেখিয়া ভুলিয়া, ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ-অট্টালিকা হইতে দারিদ্র্যের পর্ণকুটীরে আসিতে উল্লসিতা হইয়াছ? তুমি আজ আমাকে বল, কি দেখিয়া তুমি ভুলিয়াছ?

তুমি তোমার ঐ ফুল্ল নয়নে এমন কি অঞ্জন লেপন করিয়াছ, যাহাতে পৃথিবীর আর সকল সৌন্দর্য্য তোমার নিকট মলিন হইয়াছে, কেবল বালারুণের নিষ্কলঙ্ক কিরণ-রঞ্জিত প্রভাত-কুসুম সকল সৌন্দর্য্যের সার হইয়াছে? তুমি ঐ মুখে কি দেখিয়াছ, আজ ব্যক্ত কর। তুমি কি সকল সৌন্দর্য্যকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছ? ধীর ভাবে বিচার কর, চিরকালের জন্য পৃথিবীর আর সকল শোভা ভুলিতে পারিবে কি না? ঐ ললাটে তোমার অদৃষ্ট-সুখ-দুঃখ লিখিত আছে, তাহা আজ পাঠ কর এবং বিচার কর, তুমি আমার বাবার সহিত একাত্মক হইবার গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে কি না?

কি ব্রতের কথা বলিতেছি? ব্রত—মাতৃত্বসাধন। জগন্ময়ী যিনি, তিনি সুন্দর কুৎসিৎ বিচার করেন না, সকলকেই অবিচ্ছেদে আশ্রয়-কোল দেন, ভালবাসেন। সন্তান কুৎসিৎ হইলেও, শত অপরাধ করিলেও, মাতার চক্ষে তাহা ক্ষমার্হ। জগন্ময়ীর চন্দ্র সূর্য্য বিষ্ঠা চন্দনকে সমভাবে আলোকিত করে; জল বায়ু, পাপী পুণ্যাত্মা অবিচ্ছেদে, সকলের জীবন রক্ষা করে। তাঁহার কৃপা এত সুলভ না হইলে, অপরাধী আমরা, বাঁচিতাম না। তুমি আজ এই বরণ-মণ্ডপে এই মাতৃত্ব-সাধন-ব্রত গ্রহণ কর এবং আমাকে অভয় দেও যে, আমি শত অপরাধ করিলেও কখনও তাহা মনে রাখিবে না, এবং আমাকে স্নেহ-আশ্রয় দানে কৃতার্থ করিবে। আমি বাল্যকাল হইতে মাতৃহীন; তুমি আজ মাতৃহীনের মাতা হইয়া একবার জগতের দ্বারে আশ্রয়-দান-মন্ত্র-দীক্ষিতা হইয়া দাঁড়াও। এই ধরা মাতৃহীনের নিরাভরণা মাতাকে দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাক্।

হায়, এই পৃথিবীর কত সন্তান আমার ন্যায়, অভুক্ত, বিশুষ্ক, মলিন! ঘৃণা এবং অনাদরে কত সন্তান আজ, পাপের পূতি-গন্ধময় পঙ্কে নিমগ্ন! কে তাহাদিগকে যত্ন করিবে? কে উদ্ধার করিবে? জগন্মাতা, আজ তোমার ভিতরে আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহার মাতৃত্বে তোমাকে ভূষিতা করিয়া, আমার এবং তৎসহ পৃথিবীর সকল পাপী তাপীর উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করুন। তুমি আপনাকে ভুলিয়া, কেবল অক্ষম এবং অধম সন্তানকুলের মঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করিবে, এই মহা-ব্রত গ্রহণ কর।

পিতৃকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগীরথ কত কঠোর তপস্যা করিয়া হিমগিরি হইতে গঙ্গাকে এই বঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, তুমি সন্তান-কুলকে উদ্ধার করিবার জন্য জগন্মাতার চরণ-প্রেম-উৎস-স্নাত হইয়া, উদার-হৃদয় এবং পবিত্র-চিত্ত হইয়া, একবার দাঁড়াও। আমরা সকলে তোমার সংস্পর্শে উদ্ধার হইয়া যাই,—পৃথিবীর উষ্ণতা, কঠোরতা, নির্ম্মমতা দূর হইয়া যাক্। জগন্ময়ীর প্রকট মাতৃরূপ দেখিয়া জগৎ ধন্য হউক।

(২)

বিবাহ-মিলন।

১৯শে মাঘ, সোমবার, ১৩০৯।

বাবা প্রভাত,

এতদিন পর আজ তুমি জগতের নিকট উৎসৃষ্ট হইবার জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছ কেন, একবার স্থির চিত্তে চিন্তা কর। তোমার নিকট একটা নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া যাই-

তেছে,—তুমি এক বৎসর পূর্ব্বেও যাহা ভাবিতে পার নাই, সেই অভাবনীয় ঘটনা আজ তোমার সম্মুখে। এতদিন পর আজ তুমি আপনাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, সন্তুষ্টচিত্তে, বিক্রয় করিলে। তুমি এখন কাহার?—আমার, না তোমার মাতার, না ফুল্লনলিনীর, না জগতের? স্থিরচিত্তে একবার চিন্তা কর।

লোকে বলে, যত দিন মানুষ একাকী, ততদিন মানুষ স্বাধীন, মানুষ যখন বিবাহিত, মানুষ তখন পরাধীন। নিজের বোঝা বহন করা সহজ, অন্যের বোঝা বহন করা বড়ই কঠিন। কেন তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরাধীনতার বাজারে প্রবেশ করিলে, আজ স্থির ভাবে চিন্তা কর। আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলেন, যে জাতি চির-পরাধীন, সে জাতির লোকেরা আবার বিবাহ করে কেন? যে পরাধীনতার পাষাণ বুকের উপর চাপা, ইহা অতিক্রম করা অসম্ভব যখন, তখন আর কেন এ জাতি বংশ বৃদ্ধি করিয়া দাসদল বৃদ্ধি করে? পুত্র কন্যাগণকে চির দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পিতা মাতার আনন্দ করা উচিত কি?

বন্ধুর হৃদয় যেরূপ স্বদেশানুরাগে মাতোয়ারা, আমি এরূপ হৃদয় এ সংসারে অতি অল্পই দেখিয়াছি। বন্ধুর কথা তোমাকে বলিয়াছি, তবুও তুমি প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া এই পথেই অগ্রসর হইলে। তবুও তুমি দাসখত লিখিয়া দিলে। দাস-খত কাহার নিকট? ফুল্লনলিনীর নিকট নহে, কোন রাজার নিকট নহে, কিন্তু দারিদ্র্যের নিকট, জগতের নিকট, পরাধীনতার নিকট—বিধাতার নিকট। স্থির চিত্তে এ কথা একবার ভাবিয়া দেখ।

আমি যখন একাকী ছিলাম, কোন দিন খাইতাম, কোন দিন উপবাসী থাকিতাম, কোন ভাবনা ছিল না, নিশ্চিন্তরূপে দিন চলিয়া যাইত, কিন্তু যখন সংসার পাতিলাম, কিন্তু যখন তুমি এ ধরায় আসিলে,—তখন ক্রমে ক্রমে ক্রমে চিন্তার পর চিন্তা, ভাবনার পর ভাবনা আসিয়া জুটিল, আমি উপবাসী থাকিতে পারি, কিন্তু পরিবারের আর কেহকে উপবাসী থাকিতে দিতে ইচ্ছা হয় না। এইরূপে মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মহা খাটুনির পাকে পড়িলাম। জীবনব্যাপী চেষ্টার পরও খাটুনির হস্ত হইতে মুক্তি পাইলাম না। ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কত পরিবার পরিজনের ভাবনা উপস্থিত হইতেছে, স্বচ্ছলতার মুখ একদিনও দেখিলাম না। তুমি জান, তোমার পিতা দরিদ্র; কিন্তু জান কি, দরিদ্র কি জন্য? নিজের সুখ অন্বেষণ করিলে অনেক সুখ পাইতাম, কিন্তু অন্যের দুঃখ দেখিলে আমার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে; এইজন্য সুখের গোলামীগিরি করা হইল না। অন্যের ভাবনায় আমি দিন দিনই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি; আমার মনে হয়, আমি আর আমার নই, আমি যেন জগতের। এ চিন্তার মূল, তোমার মুখ-সন্দর্শন। বিবাহ না করিলে বুঝিবা আমার এ দশা ঘটিত না। হরি মারিলে কে রাখিতে পারে? বিবাহের পথ দিয়া আমাকে, জগতের কত জনকে, অবশেষে তোমাকেও বিধাতা জগতের নিকট বিক্রয় করিলেন। এ সকল কথা ভাবিতেছ কি? হায়, তুমি কি কঠিন শৃঙ্খলে পা দিলে!!

তোমারও সাধ্য হয় নাই, আমারও সাধ্য ছিল না, কাহারও সাধ্য নাই—বিধাতার বিধানকে অতিক্রম করে। জন্মিলেই বড়

হইতে হইবে, বড় হইলেই যৌবন আসিবে, যৌবন আসিলেই বিবাহের স্পৃহা জন্মিবে, তারপর পুত্র কন্যার মায়ায় পড়িতে হইবে, তারপর জগতের ভাবনা ভাবিতে হইবে, তারপর যৌবন গেলেই মরণের পথ উন্মুক্ত হইবে ;—ঘুরিতে ঘুরিতে মানুষকে ঐ পথে যাইতেই হইবে। আমার বন্ধু বৃথা বিবাহের দোষ দেখেন, বিবাহ যে বিধাতার বিধান, কে ইহাকে অতিক্রম করিবে ?

বিবাহের উদ্দেশ্য, প্রেমের উন্মেষ, প্রেমের বিকাশ। প্রেম ভিন্ন জগতের কথা কে ভাবাইতে পারে ? যে বন্ধু ঐ রূপ বলেন, আমি বলি, তিনি পুত্র কন্যার প্রেমের পথ ধরিয়াই স্বদেশানুরাগের রাজ্যে পৌঁছিয়াছেন। জগতের কথা ভাবিতে হইবে, এই জন্যই বিবাহের সৃষ্টি। ভবের ভাবনার বোঝা মানুষের মস্তকে চাপাইবার জন্যই রঙ্গময়ীর এই বিচিত্র বিধান। বিধাতা তোমাকে, কেবল তোমাকে কেন, জগতের সকলকেই, এইরূপে, পরাধীন করিতেছেন। তুমি আজ বিধাতার বিশেষ বিধানে নত-শির হও, তাঁর কৃপার জয় দেখিয়া কৃতার্থ হও।

বিবাহের পথ ধরিয়া সীমা হইতে অসীমে যাইতে হয়। সীমায় আরম্ভ—অসীমে পরিব্যাপ্তি। ক্ষুদ্রত্বে আরম্ভ—মহত্ত্বে পরিণতি। প্রভাত, স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ—এই ফুল্লনলিনীর সম্বন্ধে আজ তোমার হৃদয়কে কত বিস্তৃত করিতে হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে আরো কত বিস্তৃত করিতে হইবে, কত বংশ-পরম্পরা ইহার বীজ-কোষে লুকায়িত—কত কত ভাবী বংশ ইহার ভিতরে সুষুপ্ত ! কত ভাবনার রাজ্য খুলিয়া যাইতেছে, বুঝিতেছ কি ? এতদিন তুমি কেবল তোমার ছিলে, এখন তুমি কত জনের, কত জাতির, কত বংশের হইতে চলিলে। বিধাতার বিশেষ বিধানের জয়। কিন্তু,—কিন্তু এ সকল বুঝিয়াও যদি তুমি অনুদার হও, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সীমায় মত্ত থাক, অগ্রসর হইয়াও আবার অসার সংসার সুখে মজিয়া পড়, বৃথা তোমার জীবন, বৃথা তোমার শিক্ষা ও প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষা। অতএব সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া কখনও অনুদার, অপ্রশস্ত, সীমাবদ্ধ থাকিবে না, পাপ প্রলোভনের কৃমি-কীট হইবে না, অগ্রসর হইলে যদি, তবে জগতের হইতে সচেষ্ট হও। এই বিবাহের পথ ধরিয়া অনন্ত প্রেমের পথে চলিয়া যাও। অতি যত্নে, কত কষ্টে তোমাকে মানুষ করিয়াছি ;—মানুষ করিয়া তোমাকে কেবল ফুল্লনলিনীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারি না ;—আমার ইচ্ছা এই,—তোমাকে জগতের নিকট বিক্রয় করি। যে পথে হাঁটিয়া আমি একটু জগতের হইতে পারিয়াছি, সেই পথের মায়ায় প্রলুব্ধ হইয়াই তোমাকে এখানে উপস্থিত হইতে পরামর্শ দিয়াছি। বিশ্বপতি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, তুমি যেন একের ভিতরে অনন্তের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া মজিতে পার। বিশ্বপতি তোমাকে এই বর দিন, তুমি যেন অনন্ত মানব-পরিবারের জীবন-ধারণের-কারণরূপে জীবিত থাকিতে পার।

মা ফুল্লনলিনি, আমি বড় সাধে কাল তোমাকে মাতৃত্বে বরণ করিয়াছি, তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তোমার ছেলে তোমাকে কি দিয়াছে ? আমি দরিদ্র সন্তান, আমি তোমাকে কি দিতে পারি ? জগন্ময়ীর বিশ্ববিমোহিনী যে শক্তিতে তুমি মাতৃত্ব পাইয়াছ, সেই শক্তি-সাধনায়

আমি, তোমার অকৃতী সন্তান, যে সাত-রাজার মাণিক পাইয়াছিলাম, সেই অঙ্কের মুদ্রি আজ তোমাকে অর্পণ করিলাম। অর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে কেবল তোমার করিয়া রাখিবে বলিয়া নহে; তুমি ইহাকে অনাবিল ভালবাসার পথ দিয়া অনন্ত প্রেম-জগতে লইয়া যাইবে, এই আশায় তোমাকে দিলাম। আমার যাহা করিবার, তাহা করিয়াছি, এখন তোমার যাহা করার, তাহা তুমি কর। রত্ন লইয়া যে তাহার সৎব্যবহার করে না, তাহার রত্ন স্বায়ত্ত থাকে না, অপহৃত হয়; বিদ্যা পাইয়া যে তাহা দান না করে, অনুশীলনের অভাবে তাহার সে বিদ্যা মূর্খতায় পরিণত হয়। তুমি রত্ন পাইয়া যদি তাহার সৎ-ব্যবহার না কর, তোমার রত্ন-প্রাপ্তিতে কোনই লাভ হইবে না। অতএব সাবধান, অহঙ্কারী হইও না, সাবধান, কৃপণ হইও না, সাবধান আপনার সুখের পথ খুলিল, ভাবিও না। মাতৃত্ব-সাধন বড় কঠিন সাধন। তুমি প্রেমিকা হইবে, কিন্তু আসক্তি থাকিবে না; তুমি নায়িকা হইবে, কিন্তু রিপুর উত্তেজনা থাকিবে না; তুমি পবিত্রা হইবে, কিন্তু অহঙ্কারে মজিয়া পড়িবে না। মনে রাখিবে; বিবাহ উদ্দেশ্য, কিন্তু লক্ষ্য নয়,—লক্ষ্য—অনন্তে পরিণতি, অসীমে পরি-ব্যাপ্তি,—প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে অনন্তের অনন্তত্বের প্রতিষ্ঠা;—এবং জগতে আত্ম-বিসর্জন। একথা সর্বদা মনে রাখিবে, তবেই তোমার মাতৃত্ব-সাধন সহজ হইবে; তবেই তোমার এই সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সুখ পাইয়া উল্লসিত, বা দুঃখ পাইয়া বিষাদিত, রোগ পাইয়া ক্লিষ্ট বা শোক পাইয়া সন্তপ্ত এবং স্বাস্থ্য পাইয়া তৃপ্ত, বা ধন পাইয়া দৃপ্ত কখনও হইবে না; কেন না, মনে রাখিবে, এ সকলই বিধাতার দান, মাতৃত্ব-সাধনের সহায়। জগন্মাতা মানুষকে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

এই কলিকাতায় আনন্দ-আশ্রম নামে একটী দরিদ্রালয় আছে, তাহা আজ হইতে তোমার মাতৃত্ব-সাধনের ক্ষেত্র হইল। সেখানে অনেক অভুক্ত মলিন সন্তান বাস করে। বিবাহের পর এ সংসারে কেহ রাজ-রাণী হয়, তুমি আজ ভিখারিণী মা হইলে। পরকে আপন করিবার ব্রতশিক্ষা দিবার জন্য সেই শিক্ষা-ধাম বিধাতার কৃপায় রচিত; তুমি এতদিন পর সেই দরিদ্রা-লয়ের ভার পাইলে; সেই ক্ষুদ্রালয় হইতে তোমার প্রেম অনন্তে পরিব্যাপ্ত হইবে;—পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত মানব পরিবারে তোমার দয়া পরি-ব্যাপ্ত ও প্রসারিত হইবে, এই আশায় তোমাকে এই গুরুভার দিতেছি। বিধাতা তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমার স্বামীর স্বামী, পরম স্বামীর অসীম প্রেম-রাজ্যে তোমার বিশুদ্ধ প্রেম প্রসারিত হউক—তুমি জগতের হইয়া যাও।

(৩)

নব দম্পতির গৃহ-প্রবেশ।

এস, এস, বাবা মা ঘরে এস, আমরা সপরিবারে, সবান্ধবে, সাদরে আজ তোমা-দিগকে আহ্বান এবং হৃদয়ে গ্রহণ করি-তেছি। এদেশে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা হয়, তাহা শুনিয়াছ কি? আমরা আজ, গঙ্গা-জলে গঙ্গাপূজার ন্যায়, তোমাদের ঘরে আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। যাহা তোমাদের, তাহাই আজ তোমাদিগকে

দিতেছি। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা তোমরা আজ গ্রহণ কর। তোমরা প্রসন্ন চিত্তে আজ আমাদের ভালবাসা, স্নেহ, শুভাকাঙ্ক্ষা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

আমার বাবা, কি অবস্থার ভিতরে তোমার বিবাহের আয়োজন করিয়াছি, তাহা তুমি জান। পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর বহুদিন আমরা পাঁচ ভাই সংসারপ্রান্তরে ঘুরিতেছিলাম;—ধর্ম্মের খাতিরে যদিও কিছু দূরে দূরে থাকি, কিন্তু আমরা একাত্মক,—মনে মনে, হাড়ে হাড়ে, শোণিতে শোণিতে মিলিত। সেই পাঁচ জনের একজনকে রোগ তীব্রবেগে আক্রমণ করিয়াছে, ইহাতে সকলের মনই অবসন্ন। হৃদয় মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কখন কি হয়, এই অবস্থার ভিতর দিয়া এই কদিন চলিয়া আমি ক্লান্ত এবং শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। একদিকে বিষাদের গাঢ় ছায়া, আর এক দিকে, আমার একমাত্র পুত্রের বিবাহের আয়োজন। বিশ্বপতি ঘোর অগ্নিপরীক্ষায় আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার অনন্ত কৃপায় তোমার বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে দেখিয়া আমি তাঁহার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তুমিও আজ প্রাণ ভরিয়া বল, ব্রহ্ম কৃপার জয়।

তুমি আজ নবজীবন লাভ করিয়া প্রথম এই বাড়ীতে পদার্পণ করিতেছ, এই বাড়ীতে কি কি আছে, তাহা আজ তোমার একবার স্মরণ করা উচিত। এই বাড়ীতে কত কত ভক্তের পদরেণু আছে, তাহা একবার স্মরণ কর। একা শ্রীকৃষ্ণের পদধূলিতে বৃন্দাবন, বুদ্ধদেবের পদধূলিতে রাজগৃহ, খ্রীষ্টের পদধূলিতে প্যালেষ্টাইন, মহম্মদের পদধূলিতে আরব, শ্রীচৈতন্যের পদধূলিতে নবদ্বীপ মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ভক্তের পদধূলিতে যদি স্থান-মাহাত্ম্য [illegible], তবে আনন্দ-আশ্রমের মাহাত্ম্য [illegible] কর। যে সকল জীবিত ভক্তের [illegible] এই আশ্রম পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাদের নাম করা সঙ্গত হইবে না, কিন্তু যাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা উল্লেখে কোন দোষ নাই। ভক্ত রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহাত্মার পদধূলিতে এই বাড়ী পবিত্র। এখানে সাধক প্যারীলাল, সাধু নীলকান্ত, সেবক সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভক্তকুল বাস করিতেন, স্মরণ কর। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ বিপিনবিহারী, পরম দেশহিতৈষী দ্বারকানাথ ঘোষ, প্রেম ভক্তির উপাসক জগদীশর গুপ্ত, অশেষ গুণালঙ্কৃত প্রিয়তম বন্ধু কালীপ্রসন্ন দত্ত বাস করিতেন, স্মরণ কর। স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ভুবনমোহন ঘোষ, তোমার ঠাকুরদাদা গৌরচন্দ্র রায়, তোমার দাদা মহাশয় বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, তোমার মাসীমাতা গিরিজাসুন্দরী, তোমার মামা অন্নদাচরণ ও সতীশচন্দ্র, সাধ্বী বিদ্যুল্লতা, সতী মিতস্বিনী, বিশ্বাসী সরলা প্রভৃতি কত সাধু সাধ্বীর পদধূলিতে এই বাড়ী পরিপূর্ণ। ভালবাসার জমাট আকার কখনও দেখিয়াছ কি? ভালবাসা জমাট হইয়া পদরেণুরূপে এই আনন্দ-আশ্রমকে ধন্য করিয়াছে, স্মরণ কর। স্মরণ কর, এই বাড়ীতে তোমার সহোদরা অপরাজিতার দেহের অবশিষ্ট অংশ প্রোথিত। স্মরণ কর, এই বাড়ীর ইতিহাসে তোমার পিতামাতার বিশ্বাস ভক্তির অস্ফুট কথা অস্ফুট ভাষায় লিখিত রহিয়াছে, স্মরণ কর, তোমার পিতা মাতার জীবন

নের সেবার দুঃখময় কাহিনী এই বাড়ীর ইষ্টকে ইষ্টকে, চুণের পরলে পরলে লিখিত। স্মরণ কর, এই বাড়ীতে কত সাধু ভক্তের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। স্মরণ কর, বিধাতার কৃপায়, এই বাড়ীতে, বিধাতার অযাচিত অন্নে কত অভুক্তের ক্ষুধা নিবারিত হইয়াছে! স্মরণ করিয়া বলত, এবাড়ী আর কাহারও নিকট না হইলেও, তোমার নিকট মহাতীর্থ কি না? তুমি ধনীই হও, আর দরিদ্রই থাক, তুমি যদি তোমার পিতা মাতার উপযুক্ত সন্তান হও, কথনও এবাড়ীর অনাদর করিবে না। যদি কর, প্রভাত-কুসুমের পতন হইবে। তোমার জীবনের কত কত মধুর লীলা, হাস্য ক্রন্দন, কত কত খেলা এবং অধ্যয়ন, কত কত কথা এবং গাথা, এই বাড়ীর বায়ুতে বিমিশ্রিত। ছোট ছোট ঘর, অপ্রশস্ত স্থান, ময়লা গন্ধে পূর্ণ, কিন্তু তা হইলে কি হয়, তুমি যদি কথনও এবাড়ীর মমতা ছাড়, তুমি ধর্ম্ম হইতে, পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হইবে। তোমার পিতা মাতার ভস্মরাশি যদি এই বাড়ীতে প্রোথিত হয়, তবে, আর কাহারও নিকট না হইলেও, আমি আশা করি, এই আনন্দ-আশ্রমের প্রতি তোমার কথনও অশ্রদ্ধা, অভক্তি হইবে না; এবং তুমি ইহাকে পুণ্যতীর্থ রূপে গণনা করিবে।

কেন বলিতেছি? এই জন্য যে, এই বাড়ী বিলাসিতা-অসুর বিনাশের বধ্যভূমি। ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দিকে যথন বিলাসিতা-অসুরের পরাক্রম অজেয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল, আমরা তথন বিধাতার নাম লইয়া, দরিদ্র-সেবাব্রত-রূপ খড়্গে, ঐ অসুরকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এ জন্য কত নিন্দিত হইয়াছি, কত অপমানিত হইয়াছি বটে, কিন্তু সামান্য মলিন-বস্ত্র-পরিধান-ব্রত কথনও ছাড়ি নাই। আমি জানি, এথনও ঐ অসুরকে বিনাশ করিতে পারি নাই, জানি, কথনও এ ব্রত সাধনে সিদ্ধ হইব না, কিন্তু তবুও, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, আমি বিধাতার আশীর্ব্বাদে ব্রত পরিত্যাগ করি নাই। পৃথিবীর বড়লোকেরা আমাকে ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু আমি মায়ের দাস, আমার সে জন্য উৎকণ্ঠা নাই। আমি নিজে না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইয়া সুখী, আমি নিজের জন্য কিছু না করিয়াও দেশের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিয়াও অক্লান্ত, ইহাতে লোকেরা আমার কত কত স্বার্থের উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু আর কেহ না জানিলেও বিধাতা জানেন যে, আমি মায়ের দাস, আমি যশ প্রশংসার অতীত হইতে লালায়িত। জানি, সে সাধনায় আমি কথনও সিদ্ধ হইতে পারিব না, কিন্তু আমি না পারিলেও তুমি পারিবে, আমার মনে এ বিশ্বাস আছে। আমি জানি, তুমি যদি কথনও এই আশ্রমের মমতা পরিত্যাগ না কর, তবে এই আশ্রমের পবিত্র বায়ু তোমাকে ঐ সাধনব্রতে জয়ী করিবে। অন্যত্র গেলে, এই সংসারের কলুষিত বায়ুতে, পাপপ্রলোভনের তীব্র আক্রমণে তোমার ধর্ম্মজীবনের পতন হইবে, বিলাসিতা তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আমি যদি কিছুকে সাধনার বিঘ্ন মনে করি, তবে শুনিয়া রাখ, তাহা বিলাসিতা এবং অহংজ্ঞান। বিলাসিতা, অহংজ্ঞানকে পরিবর্দ্ধন করে, ধরাকে শরার ন্যায় জ্ঞান করিতে শিক্ষা দেয়। এই জন্য আমার ইচ্ছা ছিল, কোন দরিদ্র বন্ধুর কন্যার সহিত তোমার পরিণয়ের চেষ্টা করিব, কিন্তু আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, বিধাতা তোমাকে

জনক ঋষির আদর্শে সাজাইবেন, ইহাই বুঝি তাঁহার ইচ্ছা। যদি কখনও ধনী হও, মনে করিবে, ধন তোমার নয়, উহা মাতার দরিদ্র সন্তানদিগের সেবার উপকরণ। তাহা অম্লানচিত্তে অন্যের সেবায় লাগাইবে; নিজের জন্য কিছু ভাবিবে না। পশুপক্ষী আহারের জন্য ভাবে না, আর মনুষ্য সন্তান ভাবিবে? না—কখনও ভাবিবে না। তুবেলায় তুমুষ্টি তিনি যোগাইবেন, যিনি অগণ্য কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষীর আহার যোগাইতেছেন। আমি বিশ্বাস করি, "আমার মা" তোমার এ সাধনার সহায় হইবেন। এদেশের প্রত্যেক হিতৈষীর কর্ত্তব্য, কেবল দরিদ্রের অবস্থা চিন্তা করা। ইহা অতি মহৎব্রত। তুমি যদি কাহারও সহিত একাত্মক হইতে চাও, কেবল দরিদ্রদের সহিত হইবে। মনে রাখিবে, শ্রীচৈতন্য, খ্রীষ্ট সর্ব্বদা ধনীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন, মনে রাখিবে, দারিদ্র্য-সাধন অতি কঠোর সাধন। ম্যাট্‌সিনি, গ্ল্যাডোষ্টোন এই ব্রত সাধনে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তোমার পিতামাতার রক্তবিন্দুর যদি তুমি অধিকারী হইয়া থাক, আমার এই অনুরোধ দরিদ্রদের কথা কখনও ভুলিবে না, সদা পৃথিবীর সকল দরিদ্রদের সহিত তুমি একাত্মক হইতে চেষ্টা করিবে। তোমার এই কঠোর সাধনার প্রধান সহায় হইবে, এই আনন্দ-আশ্রম। দরিদ্রের কথা ভুলিতে যদি চেষ্টা কর, এ ভবন তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি এই ব্রত পালনে বদ্ধপরিকর হও, যেখানেই যাও, ছুটিয়া ছুটিয়া তোমাকে এই ধামে আসিতেই হইবে। এস্থান যে কেবল দরিদ্র ভক্তদের পদরেণুতে পূর্ণ, তাহা নয়, তাহাদের জীবন্ত সহবাসে পূর্ণ। তাঁহারা স্বর্গগত হইয়া থাকিলেও, আমি বিশ্বাস করি, তাঁহারা সর্ব্বদা এখানে বিচরণ করেন, আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহাদের জীবন্ত সহবাস ভিন্ন তুমি কখনও এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। অতএব, চিরদিন এই আশ্রমের প্রতি অনুরাগী থাকিবে। বিশ্বজননী এই আশ্রমের প্রতি তোমার অনুরাগকে দিন দিন জমাট করুন।

আমার মা, এস আজ তোমাকে দরিদ্রের ব্রত-বসন পরাইয়া ভিখারিণী সাজাইয়া দেই, এস মা, এই বাড়ীর সাধু সাধ্বীগণের চরণরেণু তোমার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তোমাকে পূত দারিদ্র্যব্রতে ভূষিত করিয়া দেই। তুমি কোন্ গৃহে পা ফেলিয়াছ? এখানে টাকা নাই, ঐশ্বর্য্য নাই—সমস্ত বাড়ী কেবল দরিদ্রদের উষ্ণ নিশ্বাসে পূর্ণ। এ গৃহে আছে কেবল মায়ের অযাচিত দয়া। চুণের পরলে পরলে কেবল দরিদ্রদের জন্য দয়ার কথা লিখিত। এস মা, আজ তোমাকে দয়ায় ভূষিত করিয়া, তোমার দরিদ্র সন্তানদিগের সহিত একাত্মক করিয়া দেই। তুমি আজ পিতৃকুলের ঐশ্বর্য্য, বেশ ভূষা, সব ভুলিয়া যাও, আজ দরিদ্রের মা অন্নপূর্ণা রূপে ভাতের থালা, হাতে করিয়া অভুক্ত সন্তানগণের নিকট দাঁড়াও। সেবা তোমার অলঙ্কার হউক, পরিচর্য্যা তোমার বসন হউক, বিনয় তোমার মাথার মুকুট হউক, সরলতা তোমার চক্ষের অঞ্জন হউক। এস মা, যদি দয়া করিয়া ভিখারীর মা হইয়া আসিয়াছ, এস মা, তোমাকে নূতন বসন ভূষণ পরাইয়া দেই। তারপর, তোমার সাধনমন্ত্র

কাণে বলিয়া দেই,—সে সাধন-মন্ত্র এ বাড়ীর দ্বারদেশে লিখিত রহিয়াছে। সে মন্ত্র—ব্রহ্ম-কৃপাহিকেবলম্। তুমি তোমার স্বামীর সহিত আজ এই অক্ষয় মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া এই কঠোর সাধন-ব্রত গ্রহণ কর। এই দরিদ্রালয় আজ হইতে তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল, দেখিও যেন, কোন অভুক্ত সন্তান কখনও এ গৃহ হইতে ফিরিয়া না যায়, দেখিও যেন কোন সাধু ভক্ত কখনও বিরক্ত হইয়া এ গৃহ হইতে না যান। তুমি আজ এ কুলের ইহলোকবাসী এবং পরলোকবাসী সকলের সহিত একাত্মক হইয়া বল, ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্। বিধাতা আজ তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সেই প্রসন্নতায় তুমি আমাদিগকে সকল অপ্রসন্নতার হস্ত হইতে উদ্ধার কর। জগন্ময়ী মা আজ তোমাদিগকে বিশেষভাবে দয়া করুন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পৃথা।

(সূর্য্যের প্রতি)

[আবাহন]

কিবা মনোহর নব বিভাকর
উদয় অচলে উদিল;
তরুণ কিরণে সোণার বরণে
কি শোভা গগনে ফুটিল!
কানন অচল নীল সিন্ধু জল
তরল আলোক আভাতে
শোভি' শ্যাম তনু, হে বালক ভানু,
সম্ভাষে তোমার প্রভাতে।
গগনবিহারি! মরতের নারী
ডাকিছে তোমায় আদরে,
মুখপানে তার চাহ একবার,
করহ করুণা কাতরে।

(ধ্যান)

পশ্চিম অচলে কোথা যাও চলে?
কেন বা বিলম্ব আসিতে?
নয়ন-রঞ্জন বালক তপন!
কোথা থাক তুমি নিশিতে?
অতি বিষাদিনী আমি ও ধরণী
আঁধারে বিরহ-মগনা—
কত যে রোদন করি দুই জন
তাহা কি গো তুমি জাননা?
ধরার বদন করিছ চুম্বন
প্রেমের সোহাগে পুলকে;
নয়ন-আসার শিশিরে তাহার
কিরণের হাসি ঝলকে।
এই অভাগিনী প্রেম-ভিখারিণী
কাটাবে জীবন বিরসে?
একাকিনী পৃথা কাঁদিবে কি বৃথা?
প্রেমে কি বঞ্চিতা রবে সে?
ধরার মতন অটুট যৌবন
প্রফুল্ল বদন নাহিরে।
তবুও তোমায় পাগলিনী প্রায়
বুকে ধরিবারে চাহিরে।
স্বরগ-বিহারি! মরতের নারী
তব প্রেম-কর পাবে কি?
পৃথার জীবন নবীন যৌবন
চরণে সঁপিলে লবে কি?

(প্রার্থনা)

রঞ্জিত কর নয়ন সলিল
অঙ্কিত তব কিরণে।
চুম্বন কর বিরস কপোল
প্রভাসি' প্রেমের দীপনে।

উন্নত মম　　উরজ অচল
কনক গঠিত দীপ্ত ;
লহগো আসন ;　　বাসনা বিভল-
যৌবন কর তৃপ্ত।
সুন্দর তব　　দীপ্ত বদন
প্রেমের আবেগে চুমিয়া,
জীবনের সরে　　সরোজিনী সম
আহ্লাদে রব ফুটিয়া।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মাধবী।

রজনী হয়েছে ভোর !
'মাধবী' যেতেছে　　'উজানি' ছাড়িয়া
ফেলিছে নয়ন-লোর।
'অজয়ের' ঘাটে　　আসিয়াছে তরী
মাঝি ডাকে বার বার,
লোহিত কিরণ　　অরুণ উঠেছে
করোনাগো দেরী আর।
কে শোনে সে কথা　　যত গ্রাম-বধূ
ভাসিছে নয়ননীরে,
'মাধবীরে' আজি　　সাজাইছে সবে
রয়েছে তাহারে ঘিরে।
জননী-বিয়োগে　　রাখিবে না গ্রামে
শ্বশুর যেতেছে লয়ে
ত্যজিতে সবারে　　কাতরা 'মাধবী'
কাঁদিছে অধীরা হয়ে।
উজানিতে তার　　মায়ার বাঁধন
সবি ত গিয়াছে টুটি,
তথাপিও আজি　　আকুল হৃদয়
অবশ চরণ দুটী।
প্রতি-গৃহখানি,　　প্রতি তরুলতা,
ভ্রাতা ভগিনীর মত
বাঁধিয়াছে যেন　　হৃদয়ে তাহার
স্নেহের বাঁধন শত।
সেই গৃহ গুলি,　　সেই পিতা মাতা,
সেই গত সুখরাশি,
মরম বিদারি　　পলকে পলকে
উঠিছে নয়নে ভাসি।
চলিছে চরণ,　　মন নাহি চলে
উজানি রেখেছে ধরি ;
শৈশবের মায়া　　পরাণে জড়িত
ভুলিবে কেমন করি ?
আগু পাছু চলে　　বালক বালিকা
সবে তার অনুরাগী,
আরোহিল তরী　　নয়নের জলে
'মাধবী' বিদায় মাগি'।
লইয়া তাহারে,　　ছুটিল তরণী
মৃদু কল কল রবে ;
আকুল নয়নে　　রহিল চাহিয়া
তীরে গ্রামবাসী সবে।
মাধবীও হায়,　　রহিল চাহিয়া
যত দূর দেখা যায়,
আর কতক্ষণ　　লুকাইল গ্রাম
শ্যাম বনরাজি গায়।
উজানিতে আজি　　অকাল-বিজয়া
সকলি বিষাদ মাখা,
এ জগতে হায়　　মরণ অধিক
দারুণ বিরহ-লেখা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অদৃশ্য বাণী।

কেহ ত কোথায় নাই,
বিজনতা চারি ঠাঁই।
সাপিনীর মত বেড়ি'
করিছে বিরাজ !
সেই বিজনতা কোলে,
একাকী আপনা ভুলে,
রয়েছি বসিয়া আজি
নাহি কোন কাজ।
শুধু দূরে—অতি দূরে,
নীলিম আকাশ জুড়ে,
মেঘ গুলি বায়ু ভরে
চলেছে ভাসিয়া।

শুধু ধীরে—অতি ধীরে,
শেফালি তরুর শিরে,
মলয় সুবাস মাখি
খেলিছে নাচিয়া।
আর শুধু কিছু দূরে
মন মাতানিয়া সুরে,
ছুটিতেছে গান গেয়ে
মুগুধা তটিনী ;
আর শুধু মাঝে মাঝে
কুহরিছে দুঃখ লাজে,
বসিয়া শেফালি-শাখে
কোকিলা-রমণী।
আর কোথা কিছু নাই,
নিঝুম বিজন ঠাঁই,
বিজনতা নীরবতা
মিলি দুই সখী,
নিঠুর ধরণী-বুকে,
সাধি যেন মনসুখে,
কোমল আঁচল দিয়ে
আছে মোরে ঢাকি।
তা'দেরি কোলের পরে,
আলস লালস ভরে,
শ্রান্ত দেহ খানি মোর
রয়েছে পড়িয়া,
কি যেন মদিরা ঘোর
নয়ন দুইটী মোর,
একে হয়ে পলে পলে
ঢাকিছে আসিয়া!
কে যেন আড়ালে থাকি,
কহিল সহসা ডাকি—
"জীবনের কাজ গুলি
এস করে যাই,"
ভাঙিল স্বপন ঘোর,
মুছিয়া নয়ন-লোর,
চৌদিকে নেহারি দেখি
কেহ কোথা নাই!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গৃহস্থের কামনা।

হয় হোক ভগ্ন কুড়ে তবু গৃহবাসী,
এ কুটীরে থাকি নিতি তাই ভালবাসি!
স্নেহময়ী মা'র কাছে কত শান্তি পাই,
পেট পুরে দুই মুটো খাই কি না খাই!
ছেড়ে ঘর ছেড়ে বাড়ী যেতে হবে একা,
প্রত্যক্ষ রয়েছে তাহা নয়নের দেখা!
তবু আজি ছেড়ে যেতে প্রাণ নাহি চায়,
কাঁদে প্রাণ মনে করে স্নেহময়ী মায়!
গৃহস্থের ছেলে আমি থাকি গৃহবাস,
সদা পরিশ্রমে যেন কাটে বার মাস।
গৃহাশ্রম হোক মোর পবিত্র সুন্দর,
পাই যেন আশীর্ব্বাদ প্রেমানন্দবর।
দিও না সন্ন্যাস মন্ত্র কাণে কাণে আর,
ক্ষমা কর পারিব না মিনতি আমার।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

প্রার্থনা।

প্রভো,
তুমি বাল্য জীবনে ক্রন্দন মম দুঃখ যাতনা সার,
তুমি মঙ্গলময় মাতৃপরাণ স্নিগ্ধ প্রীতির হার ;
তুমি শৈশবে মম বিদ্যা সুচারু শিল্পে ভূষিত কায়,
তুমি সুখ্যাতি সারা জগত জুড়িয়া কীর্ত্তিকলাপবায় ;
তুমি যৌবনে মম বিরহ মিলন সখী সখা সব মোর,
তুমি মন্ত্র আমার উদ্দাম আশা উচ্চ গম্ভীর ঘোর,
তুমি প্রৌঢ়ে আমার সংসার-নীতি শুভ্র কমলদল,
তুমি ধর্ম্ম আমার কর্ম্ম আমার মোক্ষ ভরসা বল ;
তুমি শক্তি শাসনে শক্ত সহিতে রাজ্য তোমার দান,
তুমি ভক্তি ভকত জীবনের ধন তন্ত্র সহায়ে গান ;
তুমি বৃদ্ধ বয়সে যষ্টি শকতি শান্ত যখন ধীর,
তুমি মৃত্যুর কালে হরিবোল রোল গঙ্গা নদীর তীর ;
তুমি পরকালে মম কি জানি কে হবে বলিবে কি
খুলি আজ,—
তুমি হইও আমার, তোমার হইব, অন্যে নাহিক কাজ।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

বন্দনা।

(বসন্ত বাহার)

অন্ধহৃদয়নন্দন সিত শারদচন্দ্র বদনে !
এনেছি দেবি ! চিত্ত অর্ঘ্য লহ'মা শুভ্রবরণে !
ভক্তি কুসুম গন্ধ মোদিত,
শুভ্র জ্ঞান-চন্দন চিত,
বিবুধ বৃন্দ বন্দিত তব সুন্দর যুগ-চরণে।
ভাব-ভৃঙ্গ গুঞ্জন রত মঞ্জুল হৃদিকুঞ্জে
শিঞ্জিত তব মঞ্জীর গীতি উঠিছে পুঞ্জে পুঞ্জেঃ—
(তাই) সকল তনয় গাহিছে,
(আজি) তোমার উদয় চাহিছে ;
ইন্দুকিরণ নিন্দিত হাসে শান্ত কর মা ক্রন্দনে॥

শ্রীদেবব্রত কবিরত্ন।

সাধনা।

(১)
কত সুখ দিতে চাহ তুমি আর,
সুখের যা কিছু দিয়েছ,
একে একে, প্রভো, তোমার মানবে
সুখের পুতলি গড়েছ !

(২)
বাসনা পুরিতে প্রণয় দিয়েছ,
পিয়াসা পুরিতে মাধুরী,
যাতনার কথা শুনিতে রেখেছ
তোমা—তব স্নেহ-লহরী !

(৩)
চাঁদের জ্যোছনা দিয়েছ, স্বামীন্,
আকাশ ভরিয়া তারকা,
জুড়াতে অবশ পরাণ, রেখেছ
কাননে কুসুম-মালিকা।

(৪)
মলয়ার বায় গড়িয়া রেখেছ
মানবে ব্যজন করিতে,
কোকিলার তানে অমিয় সপেছ,
মানবের কাণে ঢালিতে !

(৫)
তোমারি তপন নিতি নিতি উঠি
সুখের আলোক বরিষে,
তোমারি কৃপায় লভি নব সুখ
নিতি নিতি আছি হরিষে !

(৬)
সুখে থাকিবারে ভাই, বোন, মাতা,
সকলি দিয়েছ গড়িয়া,
তোমারি জগতে আছি সুখে নাথ,
তোমারি আশীষ লভিয়া !

(৭)
উষার আলোকে প্রশান্ত গভীর
তোমার মুরতি' ফুটিছে,
পিক কলকণ্ঠে তোমাতে মিশাতে
তোমারি মহিমা গাইছে !

(৮)
জগতের নাথ ! জগতের পিতা !
তোমাতে হইতে লগনা,
মোর গানে দাও সে মধুর স্বর,
সে লহরী, সেই সাধনা !

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত। *

অভিশপ্ত ত্রিদিবের তুমি কোন্ জন
এ মরতে অবতীর্ণ,—করিনু শ্রবণ
তোমার সুযশ গীতি—পীযূষ অমৃত
দিকে দিকে যেন সদা হ'তেছে বর্ষিত !
ধন্য তুমি পূর্ণাদর্শ পুরুষ রতন
ধন্য আমি ক'রে প্রীতি কুসুম বর্ষণ !
এ পৃথিবী আজো যে না যায় রসাতলে
তোমার মতন লোক রহিয়াছে ব'লে !
অলৌকিক দীপ্ততেজে তুমি পূত প্রাণ
বিশ্বসম জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানে গরীয়ান !

---

*ময়মনসিংহ-সেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরীর ম্যানেজার।

পরের কর্ত্তব্য নিজ কর্ত্তব্যের প্রায়
নিঃস্বার্থ হৃদয়ে কেউ সাধিতে না চায়!
প্রথমে আপন স্বার্থ করি নিরূপিত,
অবশেষে সাধে লোক হেথা পরহিত!
এ নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া জগতে
হইয়াছ অগ্রসর চড়ি কীর্ত্তিরথে!
তুমি ত যাইবে এবে সেই পুণ্যলোকে
ভুলিবে না ধরাবাসী তুমি পুণ্যশ্লোকে।

সুবাতাস।

কেন আজ এ কথা শুনা'লে
ভু'লে কিম্বা—স্বার্থ কামনায়?
না না—আমি মন্দ দিকে যে'তে
নিবারিতে চাই কল্পনায়।
হ'তে পারে অন্তরের কথা
এ একান্ত—হে শান্ত সুধীর!
এমন অমৃত পানে বাছা!
কে না হয় আনন্দে অধীর?
ক'মে গেছে উৎসাহ উদ্যম,
হৃদয় নন্দন মরুস্থলী
অবজ্ঞা অশনি নিত্যপাতে
হ'ল প্রায় বিদগ্ধ সকলি!
ভেবেছিনু সমাধির আগে
কেহ না ভুলিবে কোন কথা,
কোথা হ'তে এ'সে আজ বল
বিসর্জ্জিলে চিরন্তন প্রথা?
শিশুটিরো নাহি পেয়ে সাড়া
থামে যথা কোকিল ঝঙ্কার,
প্রান্তরে বিরহী জন গায়
অস্পষ্ট সঙ্গীত আপনার!
অদূরে দাঁড়ায়ে 'গারোথিন'
যোগাইছে শুধুই ইন্ধন
আপনার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
নারী আছে লইয়া রন্ধন।
নীরবে বহিছে স্রোতস্বতী
বিস্তারিয়া দু'দিকে দুকূল
ফুটে আর লুটে ধরাতলে
যথা কার কাঞ্চন বকুল!
কি যুবক কি বৃদ্ধ সকলে
ভাগ্যদোষে সে সৌভাগ্যহীন,
নাই বুকে সৌন্দর্য্য পিয়াসা
নাই দৃষ্টি নয়নে নবীন!
রূপ রস গন্ধাদির সনে
শৈশবের আদি পরিচয়
যথা চির জীবন ভরিয়া
তত্ত্ব চিন্তা না হয় উদয়!
সেখানে কাব্যেরে সবে জানে
ছন্দোবন্ধ, তামাসা কৌতুক,
ভাঁড় বিদূষক, খ্যাতি দিয়া
কবিরে কৃতার্থ করে লোক!
তথা তব অপূর্ব্ব বচনে
প্রাণে মোর জাগিল ভরসা,
বুঝি এবে সুবাতাস বহি
ঘুচাবে দেশের দুরদশা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাণিক্য।

সুমেরু শিখর হ'তে,
ঘোর অমা রজনীতে,
তমিস্র লুকায় কার কিরণ-ছটায়?
কাহারি সৌন্দর্য্য-বিভা,
শশধরে দেয় শোভা,
নিশীথে হাসির রেখা কৌমুদী-আভায়?
কোন্ সে চপলাবালা,
পেয়ে যার লীলা-খেলা,

দামিনী নীরদ কোলে ছুটিয়া বেড়ায় ?
বলনা, করিয়ে চুরি
কাহার রূপ-মাধুরী,
গোলাপ গরবে হাসে, কুন্দ শোভা পায় ?
রোগ ব্যথা স্মরি কার,
বুকেতে পাথরভার,
ছোটনাগপুর চাপি দুখে কাতরায় ?
কার অন্ত-শোক বাণী,
পবনের মুখে শুনি,
হুতাশে তরঙ্গ তুলি সিন্ধু গরজায় ?
কাহার বিরহ-দাগে,
বিষাদে পুন্দরুবাগে,
গভীর সলিলপাত পাহাড়ের গায় ?
সুবর্ণরেখার জল,
কাহার চরণতল,
ধোয়ায়ে, সুবর্ণ-ঢালে বালুকাকণায় ?
কাহার চিতার ছাই,
অঙ্গে মাখা আছে তাই,
পতিতপাবনী গঙ্গা মণিকর্ণিকায় ?
হায় নাই, নাই নাই !
আমার সর্ব্বস্ব ভাই !
আছিল মাণিক্য এক রতনকৌটায় !!

শ্রীরসিকলাল রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৪৪। মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত।—প্রণেতা —শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। ব্রাহ্মমিশন্ প্রেস্। বিনা মূল্যে বিতরিত। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য নারীতে যে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তার নাম যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতিতে "মাহিষ্য"—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে "কৈবর্ত্ত।" অধুনাতন কৈবর্ত্তেরা নাকি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, হালিক বা কৃষিজীবী ও দোলিক বা মৎস্যজীবী। এই পুস্তিকায় দেখান হইয়াছে, হালিক কৈবর্ত্ত আর ঐ মাহিষ্য বা ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্ত কৈবর্ত্ত এ দুয়েতে কোনও প্রভেদ নাই। সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, বলা বাহুল্য, এ সিদ্ধান্তে সাহিত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

৪৫। বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি-তত্ত্ব এবং তদানুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা।—শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত। ভিক্টোরিয়া প্রেস। মূল্য ২ টাকা। অধুনাতন বঙ্গদেশীয় বৈদ্যেরা স্মৃত্যুক্ত "অম্বষ্ঠ" নহেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে "বৈদ্য" শূদ্র-জাতিবিশেষ, "বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি অম্বষ্ঠাদি বহুজাতি সমবায়ে সংগঠিত হইয়াছে"—গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই। তৎপ্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অবনতি ও পুনরুন্নতির উপায় প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কায়স্থ বলিয়াই বুঝি বৈদ্যদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ রোষযুক্ত। এটী তেমন সুশিক্ষার চিহ্ন নয়। এরূপ গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

৪৬। মাতা পিতা ও যোগাভ্যাস।—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস গুপ্ত সঙ্কলিত। মেট্‌কাফ্ প্রেস। মূল্য ৷৹ আনা। পুস্তকখানির নামটী কিছু অদ্ভুত। কিন্তু পুস্তকের মধ্যে অনেক ভাল ভাল ধর্ম্মোপদেশ আছে। "পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে কতকগুলি টাকা ঋণ হইয়াছিল, এই পুস্তক দ্বারা তাহা পরিশোধ করিবার চেষ্টাও গ্রন্থকারের একতম উদ্দেশ্য।" এ উদ্দেশ্য সফল হইবে কি না, তা অবশ্য বলা কিছু কঠিন।

৪৭। ব্রহ্মগীতা।—তৃতীয় খণ্ড। শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা-কর্ত্তৃক বিরচিত। ভিক্টোরিয়া প্রেস। মূল্য ।৹ আনা। এই গ্রন্থের পূর্ব্ব দুই খণ্ডে ক্রমে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ বিবৃত হইয়াছে। এ খণ্ডের বিষয় ভক্তি-যোগ। গ্রন্থকারও ভক্ত। সর্ব্বসম্প্রদায়-সিদ্ধ না হইলেও এ ভক্তি-হীন যুগে এরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা আছে।

৪৮। দেবীযুদ্ধ।—শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, প্রণীত। বিভাবতী প্রেস। মূল্য ১।৹ সিকা। এই পুস্তকে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত প্রসিদ্ধ দেবীমাহাত্ম্য বাঙ্গালা পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক স্থলঃ মূলেরই অনুবাদ মাত্র। দুই এক স্থানে অনুবাদও মন্দ হয় নাই।

৪৯। কালিদাস।—(আবির্ভাবকাল, জীবনী ও গ্রন্থালোচনা) শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত। নিউ বিটানিয়া প্রেস। মূল্য ৸৹ আনা। লেখক খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতেই কালিদাসের আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালিদাসের জীবনবৃত্তান্ত যাহা সম্ভবে, এ "জীবনী"ও তাই—পিতৃপিতামহাগত আবালবৃদ্ধবিদিত কালিদাসঘটিত বাছা বাছা খোসগল্পের সংগ্রহ! পুস্তকের শেষভাগে কালিদাসকৃত কাব্য নাটকগুলির প্লট্‌ বর্ণিত হইয়াছে।

৫০। সরমার সুখ।—শ্রীভবাণী চরণ ঘোষ প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্র। মূল্য ১৲টাকা ও ১।৹ সিকা। এখানি উপন্যাস। আজিকালিকার অনেক পুস্তকের মত এখানেরও ছাপা কাগজ বড় মনোহর। উপন্যাসখানির ভাষাও বেশ মধুর। কিন্তু উপন্যাসে অপূর্ব্বত্ব নাই। ইহার অনন্তলাল দেবেন্দ্রদত্তের, তেলিবৌ হীরার, শিরীষ পেলবা সরমারও আট আনা কুন্দনন্দিনীর নকল। সকল সাদৃশ্য জ্ঞানকৃত না হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানকৃত হউক আর অজ্ঞানকৃত হউক, সাদৃশ্য সাদৃশ্যই বটে। সাদৃশ্যের অর্থ পুনরাবৃত্তি। পুনরাবৃত্তিতে সাহিত্যের লাভ নাই। সরমার মৃত্যুটাও কিছু হঠাৎ ঘটিল বোধ হয়। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুতে যে সকল বলবৎ কারণ ছিল, সরমার তা নাই। যে কলঙ্কভয় সরমার কাল হইল, তা তো তার বৈধব্যের পর হইতেই একটু একটু করিয়া সহিয়া গিয়াছিল। সুরেশের সহিত বিবাহ হইলে সরমাকে আর পিত্রালয় ফিরিয়া যাইতে হইত না, সেখানকার নিন্দা গঞ্জনাও সুতরাং তাহাকে লাগিত না। পিতার কলঙ্ক রটিবে, এ কথাও সরমা গোড়া হইতেই জানিত। বৈধব্যের পরে আর সে তজ্জন্য বড় একটা ব্যাকুল ছিল বোধ হয় না। অগ্রজ নরেন্দ্রনাথ তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে পর ক্রুদ্ধ পিতা তিরস্কার করিয়া ভ্রাতাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সরমা তা শুনিয়াছিল। শুনিয়াও পরে তেলি বৌ এর সঙ্গে পিতৃগৃহ হইতে পলাইয়া যায়! পক্ষান্তরে সরমার সহিত সুরেশের বিবাহে সুরেশের স্নেহময়ী মাতা সম্মতা হইয়াছিলেন। সরমা তাও জানিত। যার পরিণাম বিপৎসঙ্কুল নয় অথচ যাহা পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্ত, অন্ততঃ যাহা একেবারে আকস্মিক নয়, তার চোটে এইরূপ হঠাৎ মৃত্যু একটু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত ঠেকে। সরমাবধে শুধু সমাজ দোষী নয়, গ্রন্থকারও দোষী।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত।

ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবী স্বয়ং গতিশীল ও সূর্য্য চলচ্ছক্তি-বিহীন। ধরিত্রী আপন মেরু-দণ্ডে অবস্থিত থাকিয়া ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় পরিধি পরিবেষ্টন করে, ইহাই আহ্নিক গতি। এবং ৩৬৫ দিবস ৫ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে যে সূর্য্যকে পরিক্রমণ করে, তাহাই বার্ষিক গতি বলিয়া কথিত। ইউ-রোপে যখন জ্যোতিষের নাম গন্ধমাত্রও ছিল না,—গ্যালিলিও (Gallelio) ও কোপারনিকস (Copernicus) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় মত ও অনুকূল প্রমাণাদি তদীয় গোলাধ্যায় গ্রন্থে বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় ইউরোপভূমে প্রবাহিত হইয়া তাহা ইউরোপীয় মত বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত হওয়া বিচিত্র নহে।

ধরিত্রী অচলা ও সূর্য্য পরিভ্রমণশীল; মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহা মনীষা-সম্পন্ন জ্যোতির্ব্বিদগণ স্বরচিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক স্বনামপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রন্থে বহুবিধ যুক্তি সহকারে ইহা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তাহাই মূল ভিত্তি করিয়া প্রস্তাবিত প্রবন্ধ লিখিত হইল। তবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে বক্ষ্যমাণ যুক্তি-গুলি খণ্ডনযোগ্য কি না, বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত-গণের পক্ষে তাহা বিচার্য্য।

ধরণীর অচলতা সম্বন্ধীয় মত সুদূরবর্ত্তী ইউরোপভূমে সমাদৃত হয় নাই। সুতরাং আর্য্যভট্টের মতের প্রতিধ্বনিই সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। আজকাল পাঠশালার ছাত্র হইতে শিক্ষার সর্ব্বোচ্চতম আদর্শ—কলেজের অধ্যাপক পর্য্যন্ত সকলেই পাশ্চাত্য মতের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং ইহার প্রতি-কূলে কোন কথা বলিতে গেলে তাহা বিকৃত-মস্তিষ্কের উন্মাদ কল্পনা বই আর কি সিদ্ধান্ত হইতে পারে? এ স্থলে পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত সম্প্রদায় দ্বৈপায়ন পণ্ডিতগণের বাক্যরূপ মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ না হইয়া এবং জটা-বল্কলধারী, কমণ্ডলু-মাত্র-সম্বল, পর্ণ-কুটীরবাসী হীনবেশ দীনজনের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন না করিয়া কোন্ পক্ষের যুক্তির মূল কতদূর দৃঢ়, যদি তাঁহারা নির-পেক্ষ ভাবে ইহার বিচার করেন, তবে প্রাতঃস্মরণীয় ভাস্করাচার্য্যের মত যে এক-বারে উপেক্ষা করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

পৃথিবী অথবা সূর্য্যের আহ্নিক গতিতে দিবা রাত্রি এবং বার্ষিক গতির ফলে বর্ষ পরিবর্ত্তন; সুতরাং ঋতুবৈচিত্র ঘটে; ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এস্থলে হয় সূর্য্য, না হয় বসুধার গতি স্বীকার করা স্বতঃ অনিবার্য্য। কিন্তু এরূপ মতদ্বৈধস্থলে কোন্ মতটী সত্যের অধিক সন্নিহিত, আদৌ তাহাই বিচার করা আবশ্যক। ধরিত্রীর সচলতা সম্বন্ধে প্রমাণ সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে সমস্ত সিদ্ধান্তবলে উল্লিখিত মত সম্পূর্ণ খণ্ডিত হইয়াছে, বিবক্ষিত প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধেই যথাযথ ভাবে আলোচনা করিব।

মহাত্মা ভাস্করাচার্য্যের মতে ধরণী অচলা এবং সূর্য্য পরিভ্রমণশীল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাঁহার যুক্তির স্থূলমর্ম্ম এই যে, (১) পৃথিবী যদি চলচ্ছক্তিবিশিষ্টা হয় এবং কল্পিত কেন্দ্রশলাকার উপর অবস্থিত থাকিয়া ২৪ ঘণ্টায় স্বীয় কক্ষ আবর্ত্তন করে, তবে এরূপ প্রবল বেগে বিঘূর্ণন জন্য ধরাতলস্থ অট্টালিকা ও মঠমন্দিরাদি প্রতি মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইত, সন্দেহ নাই। (২) এবং অবিরত বসুধা কম্পিত হওয়াতে মনুষ্য ও পশ্বাদি প্রাণী এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করা দূরে থাকুক, স্থির হইয়া দাঁড়াইতেও সমর্থ হইত না। (৩) অপিচ ভূকম্পন জন্য প্রবল জলকম্প বশতঃ নদনদীর স্রোত—জোয়ার ভাঁটা একবারে বন্ধ হইয়া যাইত। এ সমস্ত যুক্তি অভ্রান্ত কি না, বিগত ৩০শে জুনের ভূমিকম্পে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এ সম্বন্ধে যুক্তির অভাব নাই। (৪) উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে কোন গুরুভার পদার্থ নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা পর্ব্বত-পাদমূলেই নিপতিত হয়। কুত্রাপি এ নিয়মের ব্যভিচার ঘটে না। কিন্তু পৃথিবী গতিশীল হইলে তাহা সম্ভবপর হইত কি? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবীর পরিধি ২৫ হাজার মাইল এবং আহ্নিক গতি অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তন জন্য $\frac{২৫০০০}{২৪}$ ঘণ্টায় গতি ১ হাজার ৬ মিনিটে ১৬ মাইলেরও কিঞ্চিদধিক। সুতরাং গিরি-শিখরচ্যুত পদার্থ ভূমিস্পর্শ করিতে যদি ৩০ সেকেণ্ড সময় লাগে, তবে সেই সময়ে ধরণীর গতিশীলতা প্রযুক্ত উল্লিখিত পর্ব্বত ৮ মাইল দূরে অপসারিত হওয়ার কথা। সুতরাং গুরুভার পদার্থ পর্ব্বত-পাদদেশে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? (৫) এইরূপ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে কোন স্থূল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও উল্লিখিত কারণ বশতঃ সর্ব্বদাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা যে কুত্রাপি ঘটে না, এ কথা বোধ হয় আপামর সাধারণ কাহারও অবিদিত নাই।

এইরূপ আরও বহুতর যুক্তি সিদ্ধান্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। (৬) ধরণীতলে সর্ব্বত্রই বারিবর্ষণ হয়; এবং একই স্থানে দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত হইতেও দেখা যায়। পৃথিবী সচলা হইলে এ নিয়মের ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। কারণ এক মিনিটে ধরিত্রীর গতি ১৬ মাইলের অপেক্ষাও অধিক; তাহাতে নির্দ্দিষ্ট একই স্থানে দুই তিন ঘণ্টাব্যাপী বারিবর্ষণ হওয়া একথা অসম্ভব। কারণ উক্ত সময়ে বৃষ্টিধারাপ্লাবিত সীমাবদ্ধ স্থান দুই তিন হাজার মাইল দূরে অপসারিত হওয়ার কথা। তবে দুই ঘণ্টাব্যাপী বারিবর্ষণে ২ হাজার ও তিন ঘণ্টাব্যাপী বৃষ্টিসম্পাতে অন্যূন তিন হাজার মাইল পরিব্যাপ্ত স্থানে এরূপ অনুপাত অনুসারে যদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বারিবর্ষণ হইত, তবে এ নিয়মের অন্যথা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু তাহা যে কল্পনার অতীত ব্যাপার, এ সম্বন্ধে বোধ হয় মতবৈষম্য নাই।

আমরা সর্ব্বশেষে আর একটী যুক্তির উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ক্ষৌণীর অচলতা সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র চরম সিদ্ধান্ত। (৭) ধরণী যদি সচলা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান বিহগাবলী—যাহারা স্বীয় কুলায়

পরিত্যাগ করিয়া বিমানপথে বিচরণ করে, তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কদাপি স্বীয় নীড় প্রাপ্ত হইত না। গৃধ্র, শকুনি প্রভৃতি পক্ষীগুলি বিমানারোহণে বহুদূর উড্ডীয়মান হইয়া ৭।৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনায়াসে উড়িতে পারে। মনে করুন, ৮ ঘণ্টা পরে যদি তাহারা ব্যোমবিচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবে তাহাদের কুত্রাপি আবাসস্থান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিত না। কারণ যে মহীরুহে তাহাদের কুলায় নির্ম্মিত ছিল, ৮ ঘণ্টা সময়ে তাহাও ৮ হাজার মাইল দূরে অপসারিত হওয়ার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ধরিত্রীর গতিশীলতা প্রযুক্ত ভূ-পৃষ্ঠস্থ সাগর, হ্রদ, নদী, দেশ, মহাদেশ, পর্ব্বতপ্রান্তর বৃক্ষাবলী সমস্তই ভ্রাম্যমান বেগে বিঘূর্ণিত হইতেছে। তবে বিমানারোহী বিহঙ্গমবর্গের আশ্রয়স্থল যে সুদূরে অপসারিত হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধান্ত। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঠিক ২৪ ঘণ্টার পর প্রত্যাগত হইলে তাহাদের আবাসস্থান প্রাপ্তির কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে কোন সময়ে কেন হউক না, কিছুতেই তাহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

প্রস্তাবিত যুক্তির প্রতিকূলে এরূপ কূট তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, অনন্ত মরুৎ সমুদ্রে বসুধা নিমগ্ন রহিয়াছে। তদাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বায়ুরাশিও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই প্রবল বেগে বিঘূর্ণমান। সুতরাং ব্যোমবিহারী খেচর সমূহ পার্থিব গতির অনুকূলে প্রবলতর বেগে বিঘূর্ণিত হইবে, সন্দেহ নাই। তবে তাহাদের কুলায় প্রাপ্ত না হইবার কারণ কি?

এ যুক্তিটী আমাদের মত না প্রতিকূল, তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে অনুকূল বলিতে হইবে। কথঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই এ যুক্তির অসারতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

পাশ্চাত্য ভূগোলবেত্তাদের মতে পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে। বায়ুর গতিও তাহার অনুবর্ত্তী, সন্দেহ নাই। সুতরাং উল্লিখিত আপত্তিটী যদি অভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তবে ইহাও স্বতঃস্বীকার্য্য যে, বিমানচারী বিহঙ্গনিবহ স্রোতনিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় অনুকূল বায়ুতে প্রতিনিয়ত বিঘূর্ণিত হইত। কিন্তু ভূ-বায়ুর প্রতিকূলে তাহারা কুত্রাপি গমনে সক্ষম হইত না। সুতরাং চুম্বকের উত্তরাভিমুখ অবস্থানের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক ভিন্ন তাহাদের প্রতীপ গমনের শক্তি এককালে অবরুদ্ধ হইয়া যাইত। এবং পশ্চিমাভিমুখে শর সঞ্চালন করিলেও উল্লিখিত কারণবশতঃ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাণের গতি নিরুদ্ধ হইত। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, খেচরসমূহ কি নির্ম্মুক্ত গগনে অব্যাহতভাবে সর্ব্বত্র বিচরণে সমর্থ নয়? অথবা পশ্চিমাভিমুখে কি কখনও বাণের গতি হয় না? তবে এ আপত্তিটী কিরূপে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে?

বায়ুর গতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলেও আলোচ্য বিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। বায়ু অপেক্ষা লঘু পদার্থ মাত্রেই ধূম, বাষ্প ও অগ্নিশিখা প্রভৃতি বায়ুস্তর ভেদ করিয়া স্বতঃই ঊর্দ্ধগামী হয়। এবং প্রবহমান বায়ুর গতি অনুসারে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিকেই সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু কুত্রাপি প্রতিকূল গমনে সমর্থ হয় না। সুতরাং বায়ু অপেক্ষা লঘুতর পদার্থপুঞ্জ বায়ুর অনুকূলগামী এবং

নভোমণ্ডলস্থ বায়ুও নানাদিকবাহী, ইহা সহজেই সিদ্ধান্ত হয়। অন্যথা বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ধুম ও বাষ্প নিয়ত পূর্ব্বদিকগামী হইত। অপিচ সম আয়তন বায়ুরাশি অপেক্ষা লঘু পদার্থ ব্যোমযান বাষ্পীয় শক্তি বলে উৰ্দ্ধে উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করে, কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে সঞ্চলন ক্ষমতার অভাবে তাহার বায়ুর গতির অনুকূলে পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে প্রধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু পরীক্ষিত সত্য ইহার প্রতিকূলে সাক্ষ্যদান করিতেছে। সুতরাং বায়ুসমুদ্রে নিমজ্জমান ধরণী ও প্রবহমান বায়ু এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর গতিজনিত বৈষম্যই স্বতঃপ্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ এ যুক্তিটী অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলে গগনমার্গে সঞ্চরমান বিহঙ্গবর্গের কুত্রাপি কুলায় প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। অথচ উভয়ের মধ্যে গতির সামঞ্জস্য প্রমাণিত হইলেও উল্লিখিত কারণ বশতঃ খেচর সমূহ বায়ুর প্রতিকূল গমনে সমর্থ নহে। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত আপত্তিটী যে নিতান্তই ভিত্তিশূন্য, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। বস্তুতঃ পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ প্রমাণের মধ্যে কোন্‌টী বলবত্তর সিদ্ধান্ত, সুবিবেচক পাঠকগণ তাহার মীমাংসা করিবেন।

মীমাংসা-প্রার্থী।

যৌন-বিবর্ত্তন।

ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তনবাদ আজকাল সকলেই অল্প বিস্তর বুঝিয়া থাকেন। বাঙ্গলা ভাষায় ইহা সাময়িক পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছে। যাহা এ পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, তাহাতে মোটামুটি কথা বেশ বুঝা যায়, সুতরাং বিবর্ত্তনবাদ যে কি, তাহা আর নূতন করিয়া এস্থলে বুঝাইতে হইবে না। Evolution বা ক্রমোন্নতিবাদ সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে (Europe) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ বফন (Buffon) কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে ইরাস্‌মস্ ডারুইন মহোদয় এই মত বিস্তৃত ভাবে প্রচার করেন। তৎপরে ইউরোপীয় বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই মত লইয়া নানা বাদ প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীযুক্ত চার্ল্‌স্ ডারুইন সাহেব "Origin of species" এবং "Descent of man" নামক পুস্তকদ্বয়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখেন। তিনি তাঁহার "যৌননির্ব্বাচন" ও "প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন" এই দুই মত বিবর্ত্তনবাদের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক Spencer, Wallace, Hœckel প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঐ মতের পোষকতা করিয়া নানা পুস্তক লিখিয়াছেন। ফলকথা, বিবর্ত্তনবাদ যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে, উহা অতি পুরাতন কালেও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মনে, অন্ততঃ বহুদুরস্থিত দীপালোকের ন্যায় অল্প বিস্তর উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

যেমন নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে ক্রমোন্নতির দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি নিম্ন স্তরস্থিত জীবের শরীরের গঠন

হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর জীবের আবয়বিক গঠন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীরস্থ বিভিন্ন যন্ত্র সকলও ক্রমে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে Reproductive Organ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া এবং পুং ও স্ত্রী জীবের উৎপত্তির কারণ (অধুনা যাহা স্থির হইয়াছে) দেখান উদ্দেশ্য। যদিও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইতে পারি, পাঠক আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, কেন না, বঙ্গভাষায় আজ পর্য্যন্ত এ পথে কেহ ভ্রমণ করেন নাই এবং যদিও দু এক জন এ পথ দিয়া গিয়াছেন, অল্প লোকের গতায়াতের জন্য পথ ততদূর পরিষ্কার হয় নাই। প্রাণীমাত্রেই দুই প্রকারে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে; স্ত্রী ও পুরুষ। এই নির্ব্বাচনের প্রধান সহায় বাহ্যাবয়বের বৈলক্ষণ্য। এই বৈলক্ষণ্য কেবল উচ্চ শ্রেণীর জীবেই দৃষ্ট হয়। নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবে প্রায়ই বাহ্যিক কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং সে স্থলে নির্ব্বাচন ক্রিয়ার সহায়তার জন্য আভ্যন্তরিক গঠন দেখিবার আবশ্যক হয়। ষ্টারফিস্ (Starfish) নামক সামুদ্রিক মৎস্যের শুদ্ধ বাহ্যাবয়ব দেখিয়া স্ত্রী পুরুষ নির্ণয় করা সুকঠিন। নানাবিধ সর্পের স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বাচন আভ্যন্তরিক জনেন্দ্রিয় পরীক্ষা না করিলে হয় না। কোন কোন জীব এত আদিম যে, তাহাদের স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদ জানিতে হইলে, পরীক্ষা দ্বারা হয়ত সামান্য মাত্র গঠনবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ দূরীভূত হওয়া সুকঠিন।

স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ জানিবার জন্য দুই উপায় আছে, প্রথম জনেন্দ্রিয় পরীক্ষা। অন্য উপায়েও স্ত্রী হইতে পুরুষের প্রভেদ জানিতে পারা যায়। যেমন আকার, বর্ণ, চর্ম্ম প্রভৃতি। মনুষ্য ও ছাগের এবং কোন কোন জাতীয় বানরের দাড়ি কেবল পুরুষেরই হয়। সিংহের কেশর, হরিণের শৃঙ্গ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। Charles Darwin (চার্ল্‌স্ ডারুইন) তাঁহার Descent of man নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছেন। নিম্নে ডারুইনের পুস্তক হইতে দু একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। মেরুদণ্ডবিহীন জন্তুর স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বাচন করিতে হইলে বাহিরের গঠন হইতে কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। জননেন্দ্রিয় পরীক্ষা ভিন্ন উপায় নাই। আকারের বৈলক্ষণ্য বিশেষ কিছু নাই। যে সকল জন্তুর মেরুদণ্ড আছে, তাহাদের পুরুষের আকৃতির অনেক বিশেষত্ব আছে। নানা জাতীয় পক্ষীর অবয়ব তাহার দৃষ্টান্তস্থল। স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিলে ডারুইনের মতে এই বৈলক্ষণ্য হওয়ার কারণ sexual selection বা যৌন-নির্ব্বাচন। সহজ কথায় স্ত্রী যাহাতে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই জন্য পুরুষ চেষ্টা করিয়া থাকে এবং সেই চেষ্টার ফলে তাহার আকার যাহাতে স্ত্রীর মনোনীত হয়, সেই প্রকার হইয়া থাকে। সেই জন্য পুং পক্ষীর সৌন্দর্য্য, নানা জাতীয় পক্ষীর সুস্বর অন্যান্য উচ্চতর শ্রেণীর জন্তুর হিংস্র প্রবৃত্তি ও তাহার সহায়তাকারী অস্ত্র শস্ত্র; যেমন চিলের ঠোঁট ও নখ, মোরগের spur বা সূচী ইত্যাদিরও উৎপত্তির কারণ sexual selection. ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে নানা প্রকার বাকবিতণ্ডা হইয়া

গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে, কিন্তু কেহই এখন পর্য্যন্ত কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

আমরা সে সকল বাক্‌বিতণ্ডার ভিতর না গিয়া সোজাসুজি যাহা আজ কালকার সিদ্ধান্ত,তাহাই বলিয়া যাইতেছি। আজকাল (অর্থাৎ ডারুইনের পরে) sexual selection সম্পূর্ণতঃ কেহ মানেন না। বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল natural selectionবা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন মানিয়া চলেন এবং উপরিউক্ত আকার বৈলক্ষণ্যের কারণে তাঁহারা এই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, উপযোগীতা বোধে জীবের যে প্রকার আকার হওয়া উচিত, তাহাই হয়।

মোটকথা, যেমন পুরুষের বিশেষত্ব সৌন্দর্য্য, তেমনি স্ত্রীর বিশেষত্ব এই যে, তাহার কোন সাজগোজ নাই। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সেই জন্য তাহাকে এমন ভাবে থাকিতে হয়, যেন তাহার প্রতি শত্রুর দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। সেই নিমিত্ত সকল জন্তুর স্ত্রী জাতির আকারে বিশেষ চাকচিক্য নাই। সন্তান উৎপাদনে স্ত্রীজাতির বিশেষ শরীর ক্ষয়ের সম্ভাবনা, সেই জন্য স্ত্রী শরীর পুরুষ অপেক্ষা বৃহৎ এবং পরিশ্রম স্ত্রীজাতির ভাগ্যে কম। জীবন-সংগ্রামে পুরুষকেই স্ত্রী অপেক্ষা অধিক (এমন কি কেবল মাত্র পুরুষকেই) পরিশ্রম করিতে হয়। তাই স্ত্রীজাতির শরীরে জীবনী শক্তি অধিক এবং সেই শক্তি সন্তান প্রসবে ও লালন পালনে প্রয়োগ করা হয়।

আজকাল Wallace প্রভৃতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক উপরিউক্ত মতের আংশিক পোষকতা করেন, সম্পূর্ণ ভাবে মানেন না। তাঁহারা বলেন, ডারুইন স্ত্রী পুরুষের আকার বৈলক্ষণ্যের মূল কারণ দর্শাইতে পারেন নাই, কেবল যাহা হইয়াছে, তাহাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এ প্রকার বৈলক্ষণ্য হইবার কারণ তাঁহারা শারীর-বিজ্ঞান দ্বারা বুঝাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে যৌন-নির্ব্বাচন সামান্য ভাবে কতকটা এই বৈল-ক্ষণ্যের সাহায্য করে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সেই বৈলক্ষণ্যের উপর আপন অধিকার বিস্তার করিয়া উপযোগীতা অনুসারে তাহাকে সংযত করিয়া রাখে এবং এই খানে শারীর-বিজ্ঞান তাহার অধিকার বিস্তার করে। ইহার ফলে স্ত্রী ও পুরুষের আকার-গত পরিবর্ত্তন ত হইয়াই থাকে, অধিকন্তু উপযোগীতা অনুসারে উভয়ের সংখ্যা নির্ব্বা-চনও হইয়া থাকে।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য শরীর-তত্ত্বের একটী প্রধান সূত্র অবগত হওয়া আবশ্যক। আধুনিক শারীর-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, জীব-শরীর কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম জান্তব কোষ (Cell) সমষ্টি মাত্র। এই সেল্ যাহার শরীরে যত অধিক, তাহার জীবনীশক্তি সেই পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। আবার নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা জীব-শরীরের এই সকল উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত কোষগুলির পরিবর্ত্তে নূতন কোষ উৎপন্ন হইয়া তাহা-দের স্থান অধিকার করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ক্রমোন্নতির নিয়মের বশ-বর্ত্তী হইয়া স্ত্রী ও পুরুষের আকারগত বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। এই বৈলক্ষণ্য কেবল পূর্ণাবয়ব জীবেই দৃষ্ট হয়। এখন দেখা যাউক, অপরিণতাবয়ব জীবের স্ত্রী এবং পুরুষ প্রভেদ দেখা যায় কি না।

কোন একটী জান্তব পদার্থ (organism)

হইতে স্ত্রী কিংবা পুং জীব হইবে, তাহা উহার অতি শৈশবাবস্থা দেখিয়া বলা যায় না। কিন্তু কি প্রকার অবস্থায় পতিত হইলে উহা স্ত্রী কিংবা পুং জীবে পরিণত হইবে, তাহা বলিবার কতকটা মোটামুটি উপায় আছে। ভ্রূণের অযৌনিক অবস্থা জন্তু বিশেষে অল্প বা অধিক কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। অযৌনিক উৎপত্তির কথা এস্থলে উল্লেখ করা হইতেছে না। কেবল মাত্র এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, পুরু-ভুজাদির যে প্রকারে উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম অযৌনিক উৎপত্তি (A sexual and parthenogenetic reproduction) উক্ত শ্রেণীর জন্তু অর্থাৎ পক্ষী এবং স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ভ্রূণের অযৌনিক অবস্থা অল্প কাল স্থায়ী, সুতরাং ভ্রূণাবস্থায় উহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ শীঘ্রই হইয়া থাকে। নিম্নস্তরস্থ জীবের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কতকগুলি কারণে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়; যেমন পিতামাতার শারীরিক অবস্থা, অণ্ডের পরিপুষ্টি, পুংবীর্য্যের উৎকর্ষ ইত্যাদি। এই নিয়ম প্রমাণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বহুবিধ জীব ও উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে Starkweather এবং Dusing এর পরীক্ষার ফল এস্থলে দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্তের মতে মাতা এবং পিতার আপেক্ষিক উৎকর্ষতা অনুসারে স্ত্রী এবং পুংসন্তান উৎপন্ন হয়। নিকৃষ্ট পিতা হইতে স্ত্রী এবং নিকৃষ্ট মাতা হইতে পুং সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বর্ণনীয় যে, স্ত্রী জীবের অণ্ডাধারে (Overy) অণ্ড উৎপন্ন হইলে যদি সেই অণ্ডের উৎপত্তির অনতিপরেই পুংবীর্য্য সংযোজিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-সন্তান উৎপন্ন হয়। আরও প্রমাণ হইয়াছে যে, পুরাতন অণ্ডে পুংবীর্য্যের সংযোগ হইলে পুংসন্তান জন্মে। হেন্‌সেনের (Hensen) মতে নূতন অণ্ডে নূতন (young) পুংবীর্য্য সংযোগ হইলে স্ত্রী-সন্তান হওয়ার অধিক সম্ভাবনা।

ডুসিং (Dusing) সম্প্রতি এ বিষয়ে বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি উপরি-উক্ত সমুদয় কারণ-সমষ্টিকে ভিত্তি করিয়া উদ্ভিদ ও জীবদেহে নানা পরীক্ষার ফল স্বরূপ দেখাইয়াছেন যে, স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি উপযোগীতা অনুসারে আপনা হইতেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি কোন কারণে স্ত্রী সংখ্যা কম হইয়া যায়, তাহা হইলে স্ত্রী জীবের জন্ম অধিক হয়। কেননা কম সংখ্যক স্ত্রী হইলে স্ত্রী অণ্ডে শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিকা শক্তি প্রয়োগ হয় (fertilization)। অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত পুরুষের অধিক সঙ্গম হইয়া থাকে। অণ্ডাধার হইতে অণ্ড নিস্রবের অনতিপরেই যদি তাহাতে পুংবীর্য্য সংযোগ হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-সন্তান উৎপন্ন হয়। সুতরাং স্ত্রীর সংখ্যা অল্প হইলে স্ত্রী-সন্তান উৎপন্ন হয়। পুরুষ সম্বন্ধেও এইরূপ। ডুসিংএর নিয়মানুসারে সর্ব্বদাই স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা হইয়া থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই মত প্রচলিত।

শ্রীনলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ।

প্রথম অধ্যায়।

মেদিনীপুর জেলায়, রাঢ়ীয়, বৈদিক, ব্যাসোক্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ব্যতীত, অন্য আর এক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বহুল দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা "মধ্যশ্রেণীয়" ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। ইহাঁরা কোন্ সময়ে, কোন্ স্থান হইতে ও কি কারণে মেদিনীপুর প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং কি হেতু ইহাঁদের "মধ্যশ্রেণী" আখ্যা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ইহাঁদের মধ্যে লিপিবদ্ধ নাই; কিম্বা এতদ্বিষয়ক কোন কুল-পরিচায়ক গ্রন্থ, অথবা অন্য কোন প্রামাণিক পুস্তক, ইহাঁদের মধ্যে, প্রচলিত নাই। মধ্য-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের প্রকৃত বিবরণ লিখিতে হইলে তাঁহাদিগের গাঁই, গোত্র, পদবী ও প্রধান সমাজ সমূহের বংশ-পরম্পরাশ্রুত বিবরণ এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি কিম্বদন্তী ভিন্ন, অন্য লিখিত উপাদান সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। জনশ্রুতি আছে যে, মধ্য-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের গঠনকর্ত্তা,—সমসাময়িক ব্রাহ্মণ-শ্রেণী সমূহের দোষ দর্শন করিয়া এবং প্রকৃত সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, এই শ্রেণীর বন্ধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ, তাঁহার সেই সাধু উদ্দেশ্য অদ্যাপি পালন করিতে কতদূর সক্ষম; তাহা এক্ষণে বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলা ব্যতীত, বঙ্গদেশের অন্যত্র, প্রায় মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় না। এমন কি, "মধ্যশ্রেণীয়" ব্রাহ্মণ, এবম্প্রকার পরিচয় শ্রুত হইলে অনেকেই বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং উক্ত পরিচয়ের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন না। সুতরাং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রকৃত বিবরণ অবগত হইলে অনেকের উক্ত বিস্ময় ও অনাস্থা দূরীভূত হইবে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের গাঁই, গোত্র ও তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তীগুলি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, উক্ত শ্রেণী রাঢ়ীয় শ্রেণীর শাখান্তর মাত্র। যে কোন কারণেই হউক, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ, রাঢ়ীশ্রেণী হইতে, এক সময়ে পৃথক্ হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত পৃথক্ শ্রেণীবন্ধনের সমীচীন কারণ নির্দ্দেশ অপেক্ষা কাল নির্ণয় অধিকতর কঠিন ব্যাপার।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের নয়টী গোত্র যথা;—ভরদ্বাজ, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক, পরাশর এবং গৌতম। এতন্মধ্যে প্রথম পঞ্চগোত্রীয় মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের "মুখুটী" প্রভৃতি রাঢ়ীয় ষট্পঞ্চাশৎ গাঁই আছে। উক্ত পঞ্চ-গোত্র সম্ভূত মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা, অবশিষ্ট গোত্র চতুষ্টয়-সম্ভূত ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষা, অনেক অধিক। কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃত-কৌশিক, পরাশর ও গৌতম গোত্রীয় মধ্য-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের কোন গাঁই নাই। উক্ত গোত্র চতুষ্টয় সম্ভূত ব্রাহ্মণগণ, কখন কখনও, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে, পঞ্চগোত্রের বহির্ভূত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। "পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঁই, তা

ছাড়া আর বামন নাই” এই প্রবাদ-বাক্যটী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের ন্যায় মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজেও প্রচলিত আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, কাশ্যপ ও সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক, পরাশর ও গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণের অপেক্ষা সামাজিক মর্য্যাদা অধিক। এক্ষণে মধ্যশ্রেণীয় ঘৃতকৌশিক, পরাশর ও গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ যে আদৌ দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন, কিন্তু কাল-ক্রমে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্তর্নি-বিষ্ট হইয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত কারণে, স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় দাক্ষিণাত্য বৈদিক অথবা উৎকল শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের বাস অধিক। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপনাদের “শাসন জাহাজ-পুর” (যাজপুর) এবম্প্রকার পরিচয় দিয়া থাকেন। (১) মেদিনীপুর প্রদেশবাসী দাক্ষি-ণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক, পরাশর ও গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন। (২) মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক, পরাশর ও গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনে-কেই আপনাদের পরিচয়স্থলে, “শাসন-জাহাজপুর” ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ— কৃষ্ণাত্রেয়গোত্র-সম্ভূত মধ্যশ্রেণীয় “পুরোহিত” উপাধিধারী (অথবা পদবীবিশিষ্ট) ব্রাহ্মণগণের কাহারও কাহারও পূর্ব্বপুরুষ “আত্মারাম পুরোহিত” ছিলেন এবং তিনি যাজপুর ব্রাহ্মণ-শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—ইহা উল্লিখিত হইতে পারে। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক, গৌতম ও পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আদৌ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন; কালক্রমে, আদান প্রদান সূত্রে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্ত-র্নিবিষ্ট হইয়াছেন। সম্ভবতঃ মধ্যশ্রেণীয়-ব্রাহ্মণ-সমাজ-সঙ্গঠনের পরেই, তাৎকালিক মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সংখ্যার অল্পতা-প্রযুক্ত উক্ত আদান প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। “সম্বন্ধ-নির্ণয়কার” শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি এবং “Castes and Tribes of Bengal” নামক পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত রিজলী মহোদয়, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ সঙ্গঠনের বিষয়ে, বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) “এই যুগে পরম পবিত্র বৈতরণী নদীর তীরস্থ যাজি-পুরাদি ব্রাহ্মণ-শাসন-সমূহের বিশিষ্ট বেদপরাগ সাগ্নিক বৈদিকগণ বঙ্গদেশে সর্ব্বদা আগমন করিতেন। ক্রমে তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বঙ্গে আবাস গ্রহণ করেন। মেদিনী-পুর জেলার অধিকাংশস্থলে দাক্ষিণাত্য বৈদিক দেখা যায়। ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার যদিও সর্ব্বত্র তাদৃশ পরিশুদ্ধ নাই; তথাপি অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্যবর্জ্জিত নহেন। দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে অনেকের দশাশ্বমেধী, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী ও ত্রিপাঠী প্রভৃতি উপাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দাক্ষিণাত্যের পরিবর্ত্তে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন।”

সম্বন্ধনির্ণয়—দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩৫।৩৬।

(২) “বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে অনেক গোত্র আছে, তন্মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি গোত্র আদরণীয়। যথা—শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালীন, কপিষ, অগ্নিবেশ্ম, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গাল্য, আলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাস্থকি, রোহিত, বৈয়াঘ্রপদ্য ও জামদগ্ন্য, এই চতুর্ব্বিংশতি গোত্র।” সম্বন্ধ নির্ণয়—দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ৪৪।

সম্বন্ধনির্ণয়ের মতে (৩) রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল ও সাতশতী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের সংমিশ্রণে এবং রিজ্‌লী মহোদয়ের মতে (৪) রাঢ়ী, বৈদিক ও সাতশতী ব্রাহ্মণগণের সংমিশ্রণে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল মত যে ভ্রান্ত ও অসমীচীন, তাহা এই অধ্যায়ের শেষভাগে প্রদর্শিত হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাক্, রাঢ়ীয়শ্রেণীয় ব্রাহ্মণই মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রধান উপাদান কি না। বর্ত্তমান মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রায় সকলেই ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ ও কাশ্যপ গোত্র-সম্ভূত এবং "মুখুটী" প্রভৃতি রাঢ়ীয় ষটপঞ্চাশৎ গাঁই-বিশিষ্ট। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে যেরূপ গোত্র ও গাঁই প্রভৃতি পরিচয় দিবার প্রথা আছে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজেও তদ্রূপ পরিচয় দিবার প্রথা, শ্রেণীগঠনের সময় হইতে, বিদ্যমান রহিয়াছে। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে নিম্নলিখিত গোত্র সমূহের নিম্নলিখিত গাঁই গুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—

(ক) ভরদ্বাজ-গোত্রে-(১) মুখুটী, (২) ডিণ্ডিসাই;

(খ) শাণ্ডিল্য-গোত্রে (১) বন্দ্য; (২) কুশারি; (৩) মাষচটক; (৪) পারিহা; (৫) বটব্যাল; (৬) কুলভি;

(গ) বাৎস্য-গোত্রে—(১) পূতিতুণ্ড; (২) কাঞ্জিলাল; (৩) পিপ্পলী; (৪) ঘোষাল;

(ঘ) সাবর্ণ-গোত্রে—(১) গাঙ্গুলী; (২) সাটেশ্বরী; (৩) পারিহাল;

---

(৩) "মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোক আছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী;—অর্থাৎ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল ও সাতশতী প্রভৃতি বিপ্রগণের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, এই প্রকার শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধবংশের লোকেরা মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন।"সম্বন্ধ নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ,পৃঃ৫৪।

(৪) "On these grounds it is conjectured that the Madhyasreni Brahmans may be a composite group made up of members of the Rarhi, Utkal, and Saptasati subcastes, who for some reason broke off from their own classes, settled in an outlying district and in course of time formede a new sub-caste."
The Tribes and Castes of Bengal, p.155-56

(ক) "আদৌ মুখটী ডিণ্ডী চ সাহরী রাইকস্তথা।
ভারদ্বাজা ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্তনূদ্ভবাঃ॥
"ভরদ্বাজ-গোত্রে শ্রীহর্ষবংশে মুখুটী, ডিংসাই, সাহরি, এই চারি গাঁই।" বহু বিবাহ নিবারণ হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার,—দ্বিতীয় সংস্করণ—পৃঃ ১৮।

(খ) "বন্দ্যঃ কুসুমোদীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী-বটব্যালকঃ।
পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কোগড়ঃ॥
আকাশঃ কেশরীমাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শস্মৃতাঃ॥"
"শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ বংশে বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী,কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, এই ষোল গাঁই।"

বিদ্যাসাগর প্রণীত বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ ১৮।

(গ) "কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈবচ॥
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ॥"
"বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশে কাঞ্জিলাল, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী, সিমলাল এই আট গাঁই।" বহুবিবাহ পৃ ১৯।

(ঘ) গাঙ্গুলিঃ পুংসিকোনন্দী ঘণ্টাকুন্দসিয়ারিকাঃ।
সাটো দায়ী তথা নায়ী পারীবালি চ সিদ্ধলঃ॥
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥"
"সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশে গাঙ্গুলি, পুংসিক

(৬) কাশ্যপগোত্রে—(১) চট্ট; (২) অম্বুলী; (৩) তৈলবাটী; (৪) পালধি; (৫) ভুরিষ্টাল; (৬) হড়; (৭) গুড়; (৮) ভট্ট; (৯) সিমলায়ী; (১০) পূষলী;

যে সকল ব্রাহ্মণের উল্লিখিত (৫) গোত্র ও গাঁই আছে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে আদৌ রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কোন সময়ে পৃথক্ শ্রেণীবন্ধন পূর্ব্বক রাঢ়ী-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন;তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে বহুদিন হইতে বংশপরম্পরায়, অমুক গাঁই, অমুক গোত্র, ও অমুকের সন্তান ইত্যাকার পরিচয় দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বহুদিনের প্রাচীন দলীলপত্রেও, বর্ত্তমান মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের কাহারও কাহারও পূর্ব্বপুরুষের, "অমুক চট্টোপাধ্যায় কি অমুক মুখোপাধ্যায়" বলিয়া উল্লেখ আছে। আদৌ রাঢ়ীয় না হইলে এবম্প্রকার পরিচয় প্রদানের ব্যবস্থা কদাচ বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকিত না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায়, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজেও—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

এই কৌলীন্য-পরিচায়ক শ্লোকটী উচ্চারিত হইয়া থাকে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রে মুখুটী, কাশ্যপ-গোত্রে চট্ট, শাণ্ডিল্য গোত্রে বন্দ্য, বাৎস্য-গোত্রে পূতিতুণ্ড, ঘোষাল ও কাঞ্জিলাল এবং সাবর্ণ-গোত্রে গাঙ্গুলি, এই কয় গ্রামীন ব্রাহ্মণগণের সামাজিক মর্য্যাদা অধিক,মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের যে কয়টী প্রধান সমাজ আছে, তন্মধ্যে ভেমুয়ার ভট্টাচার্য্যগণের মুখুটী গাঁই, এবং গোকুলনগর ও মহারাজপুরের ভট্টাচার্য্যগণের চট্টগাঁই। রাঢ়ীয় মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল, যাদৃশ সামাজিক মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, মধ্যশ্রেণীয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও স্বীয় সমাজে প্রায় তাদৃগ্‌ভাবে আদৃত হন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে বল্লালসেন কর্ত্তৃক কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ষট্‌পঞ্চাশৎ গাঁইয়ের মধ্যে—

"বন্দ্যশ্চট্টো হৎ মুখুটী ঘোষালশ্চততঃপরঃ।
পূতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ॥"

অর্থাৎ—"সমুদয়ে ৫৬ গাঁই; তন্মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী এই আট গাঁই সর্ব্বতোভাবে নবগুণ-বিশিষ্ট ছিলেন, এজন্য কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন।"

বহুবিবাহ। পৃ ২১।

সুতরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায়, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজেও যে ষট্‌পঞ্চাশৎ গাঁয়ের মধ্যে কতিপয় গাঁই অধিকতর মর্য্যাদাপন্ন হইয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়-

নন্দিগ্রামী, ঘণ্টেশ্বরী, কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, সাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরী, পারিহাল, বালিয়া, সিদ্ধল এই বার গাঁই।"

ঐ　　ঐ　　ঐ

(৪) "চট্টোঽম্বলী তৈলবাটী পোড়ারিহড়গুড়কৌ।
ভুরিশ্চ পলিধিশ্চৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা॥
মূলগ্রামী কোয়ারী চ পলসায়ী চ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ।"

"কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশে চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গুড়, ভুরিষ্ঠাল, পালধি, পাকড়াসী, পূষলী, মূলগ্রামী; কোয়ারী, পলসায়ী, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ী, ভট্ট এই ষোল গাঁই।"

বহুবিবাহ, পৃ ১৮।

(৫) মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের গাঁই সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হইতেছে, উহার সংগ্রহ শেষ হইলে, উক্ত তালিকাটি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইবে।

মান হইতেছে। এবং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে যে অদ্যাপি রাঢ়ীয় কৌলীন্যের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা প্রাগুপ্ত অবস্থার দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। অতএব আদৌ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল এবং উক্ত সমাজের প্রধান উপাদান যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইল। বোধ হয়, এবম্বিধ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না। বিশেষতঃ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ সামবেদের কোথুমীশাখাধ্যায়ী এবং "ভবদেব ভট্ট" কৃত "কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি" অনুসারে নিজ নিজ বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার সম্পাদন করিয়া থাকেন। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে "দায়ভাগ" মতে ধনাধিকার নির্ণীত হইয়া থাকে এবং রাঢ়ীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতের সর্ব্বতোমুখী প্রতিপত্তি প্রায় সর্ব্ববিষয়েই দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোন্ সময়ে এবং কি কারণে মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে উক্ত সমাজের প্রচলিত কিম্বদন্তীগুলি আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ।—মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের অনেকেরই মুখে শ্রুত হওয়া যায় যে, মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপনের সময়ে কতকগুলি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বল্লালপ্রদত্ত কৌলীন্যের প্রতি নানা কারণে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, বল্লালের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাঢ়ীশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া, রাঢ় অথবা বঙ্গ এবং উৎকল দেশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাসনিবন্ধন, আপনাদিগকে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তদবধি মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। (৬)

দ্বিতীয়—কিম্বদন্তী, অনেক বৃদ্ধ মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণের মুখে অবগত হইয়া, নিম্নে প্রকটিত করিতেছি। গঙ্গাধর, দেবীবর ও শোভাকর নামে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে তিন ব্যক্তি ছিলেন। উহাঁরা যে তিন সহোদর ছিলেন, কেহ কেহ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক সময়ে, কোনও কারণে, উহাঁদের মধ্যে অতিশয় বিরোধ উপস্থিত হয়। উক্ত বিরোধ বশতঃ, গঙ্গাধব, রাঢ়ী-শ্রেণী পরিত্যাগপূর্ব্বক, বঙ্গ (অথবা রাঢ়) ও উৎকল দেশের মধ্যপ্রদেশ বর্ত্তমান মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন এবং এতদঞ্চলের তাৎকালিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ লইয়া, উক্ত মধ্যপ্রদেশে বাসহেতু, "মধ্যশ্রেণী" নাম দিয়া, রাঢ়ী হইতে পৃথক্ একটী নূতন শ্রেণী বন্ধন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত

৬। "কানাকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া বল্লাল সেন যৎকালে তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ ও কুলমর্য্যাদা বন্ধন করিয়া দেন, সেই সময়ে সেই ব্রাহ্মণগণের কতিপয় মহাত্মা প্রাচীন আর্য্যপ্রণালীকে স্রোতোজলে বিসর্জ্জন প্রদান করিয়া বৈদ্যকুলোদ্ভব নরপতির নিয়মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অযৌক্তিক ও অধর্ম্মের কার্য্য বিবেচনা করায় নরপতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা ও হীনপদ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ সুতরাং সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া বল্লালী ব্রাহ্মণ-বিহীন জনপদে আসিয়া বাস করেন, এবং সেই দেশের নামানুসারে তাঁহারা মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। সামবেদ-সম্মত কার্য্যপ্রণালীতেই ইঁহাদের সমুদয় ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।" তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, পৃ ৪০।

বিরোধের সময়, দেবীবর ও গঙ্গাধর, পরস্পরের প্রতি, নিম্নলিখিত বাক্যটী প্রয়োগ করিয়াছিলেন যথা—

"ক্রোধ বলে দেবীবর, কুল গেলরে গঙ্গাধর।
রোষে বলে গঙ্গাধর, নির্ব্বংশ যা দেবীবর॥"

প্রথমোক্ত কিম্বদন্তী দ্বারা মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে যে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু উক্ত কিম্বদন্তী যে অসমীচীন এবং অনেকাংশে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজের অবস্থার বিপরীত, তাহা নিম্নলিখিত কারণে প্রতীয়মান হইবে। বিশেষতঃ মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উহা যে বল্লাল সেনের অনেক পরে সৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না।

১ম। রাঢ়ীয় ষট্পঞ্চাশৎ গাঁইয়ের মধ্যে যে কয়টী গাঁই বল্লাল সেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রায়শঃ সেই কয়টী গাঁই অদ্যাপি মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে কুলীনবৎ সমাদৃত হইতেছে।

২য়। বল্লাল প্রদত্ত কৌলীন্যের "আচারো বিনয়ো বিদ্যা" প্রভৃতি নয়টী লক্ষণ, অদ্যাপি মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজের, কৌলীন্যপরিচায়ক বলিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিগৃহীত হইতেছে।

৩য়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে বংশগত কৌলীন্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

৪র্থ। দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধনের পূর্ব্বে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে যে প্রকার "সর্ব্বদ্বারী" বিবাহ প্রচলিত ছিল, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজেরও তদ্রূপ আদান প্রদানের বিশেষ কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে বহুবিবাহপ্রথা আদৌ প্রচলিত নাই; ইহা দ্বারা উক্ত সমাজ যে বল্লাল সেনের পরে গঠিত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। (৭)

সুতরাং বল্লাল সেনের সময়ে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ সংগঠনের সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত এক প্রকার নিরাকৃত হইল।

কিন্তু দেবীবর ঘটকবিশারদের সময়ে যে "মধ্যশ্রেণীয়" ব্রাহ্মণ সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা প্রাগুপ্ত দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এবং উক্ত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা ঘটক মানেন, কিন্তু আমরা ঘটক মানি না।" অর্থাৎ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে ঘটকদিগের দ্বারা কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি রাখিবার যাদৃশী ব্যবস্থা এবং তাঁহাদের যে প্রকার আধিপত্য আছে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে তাদৃগ্‌ ব্যবস্থা ও আধিপত্য আদৌ বিদ্যমান নাই।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "ঘটকের"(৮)

(৭) "দেবীবর যে যে ঘর লইয়া মেলবন্ধ করেন, সেই সেই ঘরে আদান প্রদান ব্যবস্থাপিত হয়। মেল বন্ধনের পূর্ব্বে, কুলীনদিগের আটঘরে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ বলিত। তৎকালে আদান প্রদানের কিছুমাত্র অসুবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না। * * এক্ষণে, অল্প ঘরে মেলবন্ধ হওয়াতে, কাল্পনিক কুলরক্ষার্থে এক পাত্রে অনেক কন্যাদান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। এইরূপে, দেবীবরের কুলীনদিগের মধ্যে বহু-বিবাহের সূত্রপাত হইল।"

বহু-বিবাহ, ২৯ পৃ।

(৮) "অংশং বংশং তথা দোষং যে জানাস্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম্॥"

বহুবিবাহ, ২৩পৃ।

অস্তিত্ব পর্যান্ত অদ্যাপি নাই এবং কখনও যে ছিল না, ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক সমগ্র রাঢ় ও বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়া, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে যে প্রকার ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান মেদিনী-পুর অঞ্চলনিবাসী তাৎকালিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণের সহিত যে তাঁহার কোন প্রকার সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল, এবম্বিধ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। (৯) বিশেষতঃ, দেবী বর, তাৎকালিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের দোষ দর্শন করিয়া, দোষের নূনাধিক্য অনুসারে, "দোষো যত্র কুলং তত্র" রূপ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, রাঢ়ীয় কুলীনদিগকে মেলবদ্ধ করিয়া ছিলেন। (১০) সুতরাং মেদিনীপুর প্রদেশস্থ তাৎকালিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের দোষোদ্ঘা-টন করাতেই যে তাঁহাদের সহিত দেবী-বরের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা বিশেষ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। এবং উক্ত বিরোধই যে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠনের একটী অন্যতম কারণ, তাহা প্রাগু-ল্লিখিত দ্বিতীয় কিম্বদন্তীর (১১) দ্বারা কিয়ৎ-পরিমাণে প্রমাণিত হইতেছে। সম্ভবতঃ এই সময়েই মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে ঘটক-দিগের আধিপত্যের মূলোচ্ছেদ হইয়াছিল এবং প্রাগুক্ত "ঘটক না মানার" প্রবাদ-বাক্যটী রচিত হইয়াছিল। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে, "রাঢ়ীয় গাঁই, গোত্র এবং অমুকের সন্তান" বলিয়া পরিচয় দিবার রীতি ভিন্ন, "অমুক মেলভক্ত" ইত্যাকার পরিচয় দিবার কিছু মাত্র ব্যবস্থা নাই।

(৯) "দেবীবর বাক্‌সিদ্ধ হইয়াই কৌলীন্য-মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাঢ় ও বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কুলাংশে কে কতদূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন, তাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিশেষ পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, কুলীনদিগের অধিকাংশই নবগুণ বিহীন হইয়াছেন।"

সম্বন্ধনির্ণয়—দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫২ পৃ।

(১০) "যে যে কুলীন একবিধদোষে দূষিত, দেবীবর তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করেন। সেই সম্প্রদায়ের নাম মেল। মেল শব্দের অর্থ দোষ মেলন, অর্থাৎ দোষানুসারে সম্প্রদায়বন্ধন। দেবীবর ব্যবস্থা করেন, দোষবায় কুলতায়।"

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। পৃ ২৫।

(১১) "মহাত্মা দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন কার্য্যে ব্রতী হইয়া প্রায় সমগ্র বঙ্গভূমির রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেলবন্ধন করতঃ বাঙ্গালার প্রান্তসীমা মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। তথায় "ভামুয়া" গ্রামনিবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ মেলবন্ধন কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত উক্ত গ্রামে তাঁহাদের এক মহতী সভা আহূত করেন। ভামুয়ার নিকটবর্ত্তী পিঙরুই গ্রামনিবাসী ভরদ্বাজগোত্রসম্ভূত গঙ্গাধর ভট্ট উক্ত সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি সমাগত সভাগণের অভিপ্রায়ানুসারে মেলবন্ধনে ভবিষ্যতে বিবিধ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা করিয়া, দেবীবরের মেলবন্ধন কার্য্যের অনুমোদন করিলেন না। তিনি আরও বলিলেন যে, কৌলীন্যপ্রথা ও মেলবন্ধন বিষয়ে আমরা কোন প্রকারে বাধ্য হইতে ইচ্ছা করি না। যেহেতু এতদুভয় প্রচলিত হইলে ভবিষ্যতে বিবাহ বিষয়ে নানা বিভ্রাট ঘটিতে পারে। ইহাতে দেবী-বর ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাধরকে বলিলেন, "অদ্যাবধি তুই নিষ্কুল ও নিকৃষ্ট হইলি।" এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা সম্বন্ধে এদেশে একটা প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী আছে যে—

"ক্রোধে বলে দেবীবর, কুল গেলরে গঙ্গাধর।"
"রোষে বলে গঙ্গাধর, নির্ব্বংশ যা দেবীবর।"

সেই কারণে মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণসমাজে কৌলীন্য বা বা মেলবন্ধন আদৌ নাই। এই ব্যাপারের পর দেবী-বর ঘটক বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষুব্ধান্তঃকরণে এপ্রদেশ হইতে চলিয়া যান। এবং তদবধি মেদিনীপুরজেলার তাৎকালীক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া মধ্যদেশবাসী বলিয়া "মধ্যশ্রেণী' নামে আখ্যাত হই-লেন।' মেদিনীপুর ইতিহাস, পৃ ১৪।১৫।

রাঢ়ায় ব্রাহ্মণসমাজেও দেবীবর ও শোভাকর সংক্রান্ত একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাহার কিয়দংশ "সম্বন্ধনির্ণয়" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"শোভাকর চট্টোপাধ্যায়ের কুলমর্য্যাদা-ব্যবস্থাপন সময়ে দেবীবরের তুণ্ডে রুষ্ট সরস্বতী বিরাজিত হইলেন। তখন দেবীবরের মুখ হইতে পশ্চাল্লিখিত বাক্য বহির্গত হয়। যথা—

"ডাক দিয়ে বলে দেবীবর নিকুল শোভাকর।"

শোভাকরের পক্ষে এইরূপ বজ্রপাত সদৃশ মর্ম্মচ্ছেদি বাক্য বিনির্গত হইবা মাত্র শোভাকরের মুখ হইতেও ঐ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধের পূরণস্বরূপ দেবীবরের বাক্য অপেক্ষাও গরলময় অতি ভীষণ বাগ্বজ্রের প্রতিধ্বনি নিনাদিত হইল। যথা—

"ডাক দিয়ে বলে শোভাকর নির্ব্বংশ দেবীবর।"

সম্বন্ধনির্ণয়—দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ২৪৯—২৫৬।

উদ্ধৃত জনশ্রুতি এবং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত প্রাগুক্ত কিম্বদন্তী তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গঙ্গাধর, দেবীবর এবং শোভাকর এক সময়েই বিদ্যমান ছিলেন। যদি রাঢ়ায় জনশ্রুতির মূলে কিছু মাত্র সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে মধ্য শ্রেণীয় কিম্বদন্তী যে নিতান্ত ভিত্তি-হীন নহে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেবীবর কর্তৃক মেলবন্ধনের সময় নির্দ্ধারিত হইলে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ-গঠনের কালও এক প্রকার নির্ণীত হইতে পারিবে। সম্বন্ধনির্ণয়কার লালমোহন বিদ্যানিধির মতে ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে দেবীবরের মেলবন্ধন হইয়াছিল:—

"কবিকঙ্কণের চণ্ডীরচনার সময় ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দের পরেই ধরিতে হয়। ৩০ বৎসর পুর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণের রচনার সময় নির্দ্ধারণ করিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৫৫৯ খ্রীঃ অব্দে দেখিতে পাই। এই সময়েই দেবীবরের মেলবন্ধন হয়; দেবীবরের দ্বারাই ফুলিয়ার নাম বিখ্যাত হয়।"

সম্বন্ধ নির্ণয়—দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ২৬৬-২৬৭।

"রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিবংশ" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে:—

"দেবীবরের পুর্ব্বে কুলীনদিগের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না। দেবীবর কুলীনদিগকে ৩৬টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া মেলবদ্ধ করিলেন এবং এই নিয়ম করিলেন যে, যিনি যে মেলের লোক, তিনি সেই মেলের মধ্যেই কন্যা আদান প্রদান করিবেন, অন্য মেলে কন্যা আদান প্রদান করিতে পারিবেন না; করিলে মেলান্তর হইয়া সমাজে হীনমান হইবেন এবং স্বমেলে চলিবেন না। কিন্তু কুলীনগণ শ্রোত্রিয়কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কন্যা প্রদান করিতে পারিবেন না। প্রায় ৩৫০ বৎসর হইল, দেবীবর এই নিয়ম প্রচলিত করেন, তাহা অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে।"

রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণদিগের আদিবংশ, পৃঃ ২৫।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে—

"কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, দশপুরুষ গত হইলে, দেবীবর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, মেলবন্ধন দ্বারা নুতন প্রণালী সংস্থাপন করেন। এক্ষণে, মেলবন্ধনের সময় হইতে দশপুরুষ অতীত হইয়াছে * * *।"

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৩২।

দেবীবর ঘটকের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতার মত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে যথা:—

যখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি-সংগ্রহ, গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার এবং রঘুনাথ শিরোমণি (কোণাভট্ট শিরোমণি) মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, তত্রত্য প্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করিয়া ন্যায় শাস্ত্রের দীধিতি নামা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সমকালে ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৬ পুরুষে বন্দ্য

বংশে সর্ব্বানন্দ ঘটকের ঔরসে দেবীবর ঘটক জন্ম-গ্রহণ করেন। শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেবীবরের জন্ম হইয়া থাকিবেক। দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীনগণকে দুষ্কর্ম্মান্বিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে ৩৬ মেলে বিভক্ত করিয়াছিলেন।''

"গৌড় ব্রাহ্মণ", দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৮০-১৮১।

সুতরাং দেবীবর ঘটকের আবির্ভাব ও মেলবন্ধন কালনির্ণয় বিষয়ে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয় না। এবং উক্ত মেলবন্ধন যে ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রবর্ত্তক গঙ্গাধরের সহোদর মুকুন্দ ভেমুয়ার ভট্টাচার্য্যগণের আদিপুরুষ ছিলেন। মুকুন্দের অধস্তন দশমপুরুষ, বর্ত্তমান সময়ে ভেমুয়াতে বাস করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষের কাল গড়ে অন্ততঃ ৩০ বৎসর করিয়া ধরিলে, প্রথম মধ্যশ্রেণীয় মুকুন্দ হইতে ৩০০ বৎসর অতীত হইয়াছে বোধ হয়। সুতরাং ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এবং দেবীবরকৃত মেলবন্ধনের প্রায় সমকালেই যে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত হইয়াছিল, ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ যে যে কারণে গঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু উক্ত সমাজের কেহ কেহ অন্য একটী কিম্বদন্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন বলিয়া এস্থলে তাহা লিখিত হইতেছে। উক্ত জনশ্রুতি এই :—

প্রাগুক্ত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের, তৎকালিক কৌলীন্যপ্রথা বশতঃ বহুবিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শ্বশুরালয়ের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় তিনি সকলের বাসস্থান সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন না। একদা তিনি স্বীয় কোন এক অপরিচিত শ্বশুরালয়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে একগ্রামে উপস্থিত হইয়া পথিমধ্যে কোন যুবতী রমণীকে মাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক আপন শ্বশুর ভবনের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে উক্ত রমণী তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুর ভবন দেখাইয়া দেন। গঙ্গাধর, বহুদিন পরে স্বীয় শ্বশুরগৃহে উপনীত হইয়া, পরমসমাদরে গৃহীত হইলেন এবং রাত্রিকালে আপন পত্নীর সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া তাঁহাকে প্রাগুক্ত রমণী বলিয়া তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন। কিন্তু "যাঁহাকে একবার মাতৃসম্বোধন করিয়াছি, তাঁহাকে পুনর্ব্বার কি প্রকারে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিব" মনে মনে ইহা আন্দোলন করিয়া, তিনি, বহু বিবাহরূপ কুপ্রথার মূলোচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, তৎক্ষণাৎ শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গাধর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া মেদিনীপুর প্রদেশের তৎকালিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণকে একত্র করিয়া, রাঢ়ীয় কৌলীন্য এবং বহুবিবাহ-প্রথা পরিহার পূর্ব্বক, রাঢ়ীশ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী নূতন শ্রেণীবন্ধন করিয়াছিলেন; এবং উক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বাস রাঢ় এবং উৎকল ভূমির মধ্যস্থলে ছিল বলিয়া এই নূতন শ্রেণীর নাম "মধ্যশ্রেণী" হইয়াছিল। (১২)

এই কিম্বদন্তীর দ্বারা মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ যে দেবীবরের মেলবন্ধনের পরে গঠিত হইয়াছিল, এই প্রকার অনুমান হয়।

(১২) ১৩০৪ সালের আষাঢ়ের "কাস্থিতে" 'মধ্য-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ শীর্ষক প্রবন্ধে এই কিম্বদন্তী, কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া, প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধ-লেখক, গঙ্গাধরকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী এবং গাঙ্গুলি গ্রামীণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গঙ্গাধর যে মুখুটী গ্রামীণ এবং মেদিনীপুর প্রদেশবাসী ছিলেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সুতরাং ইহা যে কতদূর সমীচীন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সমাজের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা, কোন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা-প্রসূত বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ক্রমশঃ।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

গুপ্তকালের সাহিত্য।

দ্বিতীয় গৌতমীপুত্রের পর হইতেই মগধে অন্ধ্রাজদিগের গৌরব নির্ব্বাপিত হইয়া আসিয়াছিল। ইনি যদি ২১১ খ্রীষ্টাব্দের পরেও ৮।৯বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকেন, এবং ইহার পরবর্ত্তী তিন জন রাজার রাজত্বকাল যদি ২০ বৎসর করিয়াও গণনা করা যায়, তাহা হইলেও, ২৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরেই যে গুপ্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিতা কর্ত্তৃক, অন্ধ্রেরা মালব এবং রৈবতকে তাড়িত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। সন্দেহস্থলে যদি আরও দশ বৎসর বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও মহারাজ গুপ্তের রাজত্বকালে ২৯০ হইতে ৩১০ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী গুপ্ত রাজগণের সুনিরূপিত সময়ের সহিত, এই গণনায় কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না।

অন্ধ্রাজাদিগের ধ্বংসের পর হইতেই, নূতন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম, বিশেষ প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। এই, নবযুগের গুপ্ত রাজাগণ, যে বড়ই ক্ষমতাশালী ছিলেন, এবং ইহাদের রাজত্বের প্রসারের সহিত যে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের প্রস্তর-লিপিগুলি হইতেই জানিতে পারা যায়। নেপাল হইলে মালব পর্য্যন্ত, এবং গুজ্জর দেশ হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত ইঁহাদের প্রভাব সুবিস্তৃত হইয়াছিল। মৌর্য্যরাজগণের অবনতির পর, ভারতবর্ষে এমন দিন আর হয় নাই। এই সময়ে যে আলঙ্কারিক সাহিত্য সুবিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রচনাকৌশল এবং বহুবিধ ছন্দের সৃষ্টি, কেবল প্রস্তর-লিপি লিখিতে গিয়াই হয় নাই, উহা যে কাব্যরচিত হইবার ফলস্বরূপ, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

মহারাজ গুপ্তের প্রপৌত্র সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকাল ৩৫০ হইতে ৪০১ পর্য্যন্ত। কোন জাতির প্রভাববৃদ্ধি এবং উন্নতির সময়, ৫০ বৎসর বড় কম সময় নহে। ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে কেন, ৩২০খ্রীষ্টাব্দেও কোন লিপিতে মহাভারত এবং রামায়ণে ব্যবহৃত ৪।৫ টী ছন্দ ব্যতীত অন্য ছন্দে রচনা দেখা যায় না। কিন্তু ৩২০ হইতে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে যে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা সমুদ্রগুপ্তের সময়ের হরিসেন কবির রচনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইনি সমুদ্রগুপ্তের একখানি প্রস্তরলিপিতে স্রগ্ধরা, শার্দ্দূল বিক্রীড়িত এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দে পদ্য রচনা করিয়াছেন, এবং অতি সুস্পষ্ট ওজস্বী ভাষায় গদ্য রচনা করিয়াছেন। এই লিপিতে স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত সুকবি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। নূতন নূতন ছন্দ, এবং নূতন ধরণের কাব্যরচনা-কৌশল লইয়া যখন এই সময়ে পণ্ডিতদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক হইত, তখন মনে হয় যে,ঐ গুলি সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে প্রায় নূতন ভাবে আরব্ধ। এই দেখুন, এই লিপির একস্থানে আছে ঃ—

যস্য প্রজ্ঞানুসঙ্গোচিত সুখ মনসাঃ শাস্ত্রতত্ত্বার্থভর্ত্তুঃ
........স্তব্ধো ....নি........নোচ্ছ..........

সংকাব্যশ্রীবিরোধান্ বুধ গুণিতগুণাজ্ঞাহতানেব কৃত্বা
বিদ্বলোকে বি... স্ফুটবহু কবিতা কীর্ত্তি রাজ্যাংভুনক্তি।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে হউক, অথবা এই সময় হরিসেন কর্ত্তৃক হউক, নিশ্চয়ই কোন নূতন ধরণের আলঙ্করিক মহাকাব্য সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ গুণাংশে খুব শ্রেষ্ঠ হয় নাই বলিয়া তাহা লুপ্ত হইয়াছে। কথাটার ভিত্তি কি, তাহা বলিতেছি। বৌদ্ধেরা বহুদিন ধরিয়া কেবল পালি ভাষাতেই রচনা করিয়া আসিতেছিলেন, সংস্কৃতের প্রতি তাঁহাদের কোন অনুরাগ ছিল না; এবং থাকিবার কারণও ছিল না। কিন্তু গুপ্তরাজাদিগের সময়ে যখন হিন্দুদিগের প্রভাব বাড়িয়া উঠিল; এবং সংস্কৃত-চর্চ্চা না করিলে কেহ পণ্ডিত বলিয়া গ্রাহ্য হইতেন না, তখন বৌদ্ধেরাও লোকানুরাগ লাভের জন্য সংস্কৃত পাঠ, এবং সংস্কৃতে রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যুগের বৌদ্ধপণ্ডিতদিগের রচনাই তাহার প্রমাণ। এই সময়ে বৌদ্ধ-কবি অশ্বঘোষ, বুদ্ধচরিত নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। যাঁহারা প্রতিযোগীতার জন্য সংস্কৃত শিখিতেন, তাঁহারা যে নূতন শ্রেণীর মহাকাব্য উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা যায় না। রচনাভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয় যে, কেবল রামায়ণের গৌরব লাঘবের জন্যই এ গ্রন্থ রচিত হয় নাই, কিন্তু উহাও যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। সমুদ্র গুপ্তের কীর্ত্তি কলাপ লইয়া যে মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা যেন এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপির কয়েকটী অর্দ্ধস্ফুট শব্দ হইতে সূচিত হয়। "কাব্যাং...ধ্যানপাত্রং" স্তোত্র ব্যানেকাদ্ভুতোদার চরিতস্য" প্রভৃতি কথা, আমার অনুমানের অনুকূলে। হইতে পারে, যে এটা বড় দুর্ব্বল ভিত্তি, কিন্তু অসম্ভব নহে বলিয়া উহার উল্লেখ করিলাম।

অশ্বঘোষের কাব্য যে খুব উচ্চ শ্রেণীর নহে; এবং হরিসেনের রচনা যে তাঁহার রচনা অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিপ্রদ, তাহাতে কোন ভুল নাই। কালিদাসের কুমার সম্ভবে, কেহ কেহ অশ্বঘোষের কাব্যের ছায়া দেখিয়া থাকেন। কিন্তু শিল্প-কৌশলে এবং কাব্যমাহাত্ম্যে যে বুদ্ধচরিত অপেক্ষা কুমার সম্ভব সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ স্থলে একটু ছায়াপাতে কালিদাসের গৌরবের হানি হয় না।

ইহার পরে ৪৭২ খ্রীষ্টাব্দের একখানি লিপিতে, কবি বৎসভট্টির যে রচনা পাওয়া যায়, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই "রচিতা বৎসভট্টিনা" প্রস্তরলিপির কবিতার কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

> সঃ প্রত্যহং প্রতিবিতাত্যুদয়াচলেন্দ্র
> বিস্তীর্ণ তুঙ্গ শিখরস্খলিতাংশু জালঃ
> ক্ষীবাঙ্গনা জন কপোল তলাভিতাম্রঃ
> পারাৎ স বঃ স্বকিরণাভরণো বিবস্বান্।

মদমত্তা রমণীর কপোলের বর্ণের সহিত সূর্য্যকিরণের তুলনাটা নূতন বটে। নদী-তটস্থ নগরের শোভা বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে:—

> তটোত্থ বৃক্ষচ্যুতনৈক পুষ্প
> বিচিত্র তীরান্ত জলানি ভান্তি।
> প্রফুল্লপদ্মা ভরণানি যত্র
> সরাংসি কারণ্ডব সংকুলানি॥

> বিলোল বীচী চলিতারবিন্দ
> পতদ্রজঃ পিঞ্জরিতৈশ্চহংসৈঃ
> সকেশরোদারভরাবভুগ্নৈঃ
> ক্বচিৎ সরাংস্যম্বুরুহৈশ্চভান্তি।

সপুষ্প তারবনতৈর্ণঘৈস্রে।
মদপ্রগল্ভালি কুল স্বনৈশ্চ
অজস্র গাভিশ্চ পুরাঙ্গনাভি
বনানি যাস্মিন্ সমলং কৃতানি ॥

এখন কথা এই, এই বৎসভট্টি কে? আমার মনে হইয়াছে যে, ইনিই ভট্টিকাব্যের রচয়িতা। কথাটা বড় বেজায় নূতন; এই জন্য কারণগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি।

১। ভট্টিকাব্যে এমন কোন আভ্যন্তরিক প্রমাণ পাই নাই, যাহার বলে ঐ কাব্য ৭ম শতাব্দীর বলিতে পারি। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম লইয়া, দুই তিনটী মত প্রচলিত আছে, এই মাত্র; কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত হয় নাই। ভর্ত্তিহরি অথবা ভট্টনারায়ণ অপেক্ষা বৎসভট্টি নাম যে অধিক গ্রহণীয়, তাহা বলিতে হইবে না। বলভী রাজা ধরসেনের সময়ে ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তৃক এই কাব্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া যে কথা আছে, তাহা অত্যন্ত অসার। ভর্ত্তৃহরি কাণোজে থাকিতেন, কখনও গুর্জ্জররাজার সভাসদ্ ছিলেন, ইহার প্রমাণ নাই। বলভীগণ শৈব ছিলেন। শেষ সময়ের রাজগণ জৈনধর্ম্মের অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৭ম শতাব্দীর ধরসেন, ধর্ম্মাদিত্য এবং শীলাদিত্য প্রভৃতি যে জৈনদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিতেন, তাহা জৈনগ্রন্থেই পাওয়া যায়। এরূপস্থলে, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে, এই কাব্য যে তাঁহাদের সভায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করা যায় না।

২। ভাষার যুগসন্ধিতেই ব্যাকরণ-রচনা, এবং ব্যাকরণ লইয়া অধিক আলোচনা হইয়া থাকে। পাণিনি এ বিষয়ের পুরাতন সময়ের দৃষ্টান্ত। আবার যে সময়ে একালের প্রচলিত ভাষাগুলির আরম্ভ, তাহার পূর্ব্বাহ্নেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সহায়তার জন্য অনেক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। বোপদেব হয়ত এই বৈয়াকরণদিগের সর্ব্বশেষ ব্যক্তি। পঞ্চম শতাব্দী হইতে যখন প্রাকৃত ভাষা বিশেষ প্রবলতা লাভ করিল, সে সময়েও সংস্কৃত ব্যাকরণ যাহাতে সহজে লিখিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। ভট্টিকাব্যে যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার দিকে যথেষ্ট আয়োজন আছে, তাহা সকলেই জানেন।

৩। ভট্টিকাব্যের রচনায় যে, কোন প্রকার জটিলতা নাই, এবং রচনা-রীতিও যে বৈদর্ভি, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাকরণের দৃষ্টান্তের জন্য যে শব্দ গুলি আছে, তাহা ছাড়া ঐ কাব্যে অন্য কোন প্রকার দুর্ব্বোধ্য ভাব বা ভাষার যোজনা নাই। কাব্য-কৌশল এবং কবিত্বও যে ইহাতে যথেষ্ট আছে, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। উপরে যে সকল রচনার দৃষ্টান্ত তুলিয়াছি, ভট্টিকাব্যের রচনা তাহার অননুরূপ নহে। এবং এই বর্ণনা পড়িলে ২য় সর্গের শরদ্বর্ণনা মনে পড়ে।

৪। কালিদাসের সময়ের পূর্ব্বে ভট্টিকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, একথা যেন অনেকের মনে লাগেনা। কিন্তু ইহাতে কোন বাধা উপস্থিত হয়, তাহাওত দেখিতে পাইনা। কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "অথবা কৃতবাক্‌দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ" ইত্যাদি। এখানে যদি শুধু বাল্মীকির নাম করিতেন, তাহা হইলে কোন সন্দেহ থাকিতনা। যখন "পূর্ব্ব সূরিভিঃ" বলিয়াছেন, তখন বাল্মীকি ব্যতীতও অন্য কবি যে রামচরিত্র লইয়া কাব্য লিখিয়া

ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভট্টিকাব্যের রামচরিত্র, ঠিক বাল্মীকির অনুরূপ; ইহাতে কাব্যকৌশলের জন্য নূতন কথা কল্পিত হয় নাই। একারণেও এখানি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, ভট্টিকাব্য সম্বন্ধে অনেক মত চলিতেছে; তাহার সঙ্গে আর একটা মত না হয় থাকুক।

পঞ্চতন্ত্র, এই গুপ্তকালের সাহিত্য। এই গ্রন্থ যখন প্রথম রচিত হয়, তখন ইহার তন্ত্র বা ভাগ, পাঁচটীর স্থলে দ্বাদশটী ছিল; নামও পঞ্চতন্ত্র ছিলনা। সম্ভবতঃ ইহার নাম ছিল, "করটকদমনকৌ" কারণ সিরীয়া এবং আরবে ইহার ঐ নামের অনুবাদ পাওয়া যায়। পুস্তকখানি যখন ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখনও ১২টী ভাগ ছিল। নূতন সংক্ষিপ্ত পঞ্চতন্ত্র ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্রূপের অংশ অনেক পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং উহাতে পরবর্ত্তী সময়ের অনেক শ্লোকও সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যদি যত্নপূর্ব্বক কেহ এই গ্রন্থের সংস্করণ করেন, এবং ঐ সংস্করণে প্রাচীন এবং আধুনিক অংশ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। বেন্‌ফে, এবং কিলহর্ণ ও বুলারের সংস্করণ-দ্বয় অবলম্বন করিয়া, অনায়াসেও এই কার্য্য করা যাইতে পারে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কয়লার খনি। (৩)

কয়লার খনির খাদ পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১। প্রত্যেক কয়লার খাদের ম্যানেজার কয়লা খাদের উপরিস্থ এবং নিম্নস্থ কার্য্য স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন বিশ্বাসী ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারী দ্বারা দৈনিক পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

২। খনির উপরিভাগে এবং নিম্নে যে যে স্থানে কার্য্য চলিতেছে, তাহা কোন প্রকারে আশঙ্কাপ্রদ কি না, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

৩। নিম্নস্থ খাদের জমী সার্ভে দ্বারা প্ল্যান করিয়া যে যে স্থানে তাহার কার্য্য চলিতেছে, সেই স্থান সমূহের বায়ু উত্তমরূপে চলাচল করিতেছে কি না, তাহার বন্দোবস্ত করা এবং খাদ দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর প্রতীয়মান হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করা বিধেয়।

(৪) প্রতি সপ্তাহে খাদের মধ্যে নামিয়া খাদের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বহিতে লিখিয়া রাখিবে।

৫। কয়লা-কুঠির সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়ম মত সমস্ত কার্য্য করিতেছে কি না, তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

৬। কোন দৈব-দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা রিপোর্ট করিতে হইবে।

৭। মাইনিং ইনেস্পেক্টর এবং ওভারম্যান অর্থাৎ হেড সর্দ্দার যে কয়লার কার্য্যে খাদের ম্যানেজার কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইবে, সেই খাদের প্রত্যেক কার্য্য দৈনিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের রিপোর্ট বহিতে লিখিবে।

৮। কেবল রবিবার ভিন্ন প্রত্যহ

মাইনিং ইনেস্পেক্টর এবং হেড্‌সর্দ্দার অন্যান্য অধীনস্থ সর্দ্দারগণকে ডাকিয়া খাদের কোন স্থানে কে কি কার্য্য করিবে, সেই সম্বন্ধে মৌখিক উপদেশ প্রদান করিবে।

৯। খনির নিম্নে কোন অংশ আশঙ্কাপ্রদ অবস্থা বুঝিলে খাদসর্দ্দারগণ তৎক্ষণাৎ তাহা হেড্‌-সর্দ্দারের নিকট রিপোর্ট করিবে এবং হেড্‌-সর্দ্দার অবিলম্বে উহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইবে।

১০। প্রত্যেক মালকাটা তাহার দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে হেড্‌সর্দ্দার কার্য্যস্থান, খাদের নিম্নে, চলিবার রাস্তা, চাল, বগল, কাঁথি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। খাদের যে স্থানে নরম হেতু কাষ্ঠ লাগান রহিয়াছে, সেই সমস্ত কাষ্ঠ উত্তম অবস্থায় রহিয়াছে কি না, তাহা ঠুকিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং কোন স্থানের কাষ্ঠ খারাপ হইয়া থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে; খাদের নিম্নে কোন স্থান আশঙ্কাপ্রদ বলিয়া বোধ হইলে তথায় তৎক্ষণাৎ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

১১। কার্য্য শেষ হইলে হেড্‌সর্দ্দার তাহার একটী বিবরণ লিখিয়া প্রত্যহ ম্যানেজারের নিকট পাঠাইবে।

১২। চালের কয়লা কিম্বা কোন কাষ্ঠ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে ঐ কয়লা এবং কাষ্ঠ পরিবর্ত্তন করিবে।

১৩। ম্যানেজার কোলিয়ারির নিরাপদের জন্য যে সমস্ত আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুযায়ী সর্দ্দারগণ কার্য্য করিতেছে কি না, তাহাও দৈনিক দেখা আবশ্যক।

১৪। ম্যানেজার কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য আদেশ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা সম্পাদন করিয়া লইবে।

১৫। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ যে ব্যক্তির অধীনে কার্য্য করিতেছে, তাঁহার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবে।

১৬। খাদে কয়লা উঠাইবার জন্য কণ্ট্রাকট বিলি থাকিলে কণ্ট্রাকটরগণ উপরিলিখিত নিয়মে বাধ্য থাকিবেন।

১৭। খাদের সর্দ্দার অন্য সর্দ্দার খাদে না আসা পর্য্যন্ত খাদ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

১৮। কোন সর্দ্দারই হেড্‌সর্দ্দারের অনুপস্থিতিতে খাদের কোন কাষ্ঠ টানিয়া ফেলিতে পারিবে না।

১৯। খাদের কোন ফেনসিং অর্থাৎ বেড়া নষ্ট হইয়া থাকিলে যে সর্দ্দারের সীমার মধ্যে ঐ বেড়া আছে, সে উহা তৎক্ষণাৎ মেরামত করিয়া দিবে।

২০। খাদে কোন কুলি আহত কিম্বা জখমী হইলে, কি প্রকারে তাহার আঘাতের প্রতিকার করিতে হইবে, সর্দ্দারগণ তাহা তৎক্ষণাৎ করিবে। কুলিদের হাত কিম্বা পা ক্ষত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ঠাণ্ডা জল দ্বারা ধৌত করিয়া ক্ষতস্থানে কোন ময়লা থাকিলে তাহা আস্তে আস্তে পরিষ্কার করিয়া উহাতে পরিষ্কার কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিবে এবং তাহাতে উপর্য্যুপরি ঠাণ্ডা জল দিয়া ভিজাইয়া দিবে।

২১। বাউতি কিম্বা টব উঠাইবার ও নামাইবার সময় যাহাতে চানকের মধ্যে কোন কুলি-কামিন না থাকে, তাহা লক্ষ্য রাখিবে।

২২। যাহাতে কোন কুলি-কামিন

চানকে না পড়িতে পারে, এরূপভাবে চানকের উপরে উপযুক্তরূপ ফেনসিং দিতে হইবে।

২৩। খাদের নীচে যখন বোঝাই টব, চানকের দিকে আসিবে, তখন প্রত্যেক টবের সম্মুখ দিকের দুই পার্শ্বে মালকাটাদিগের নিকট হইতে দুইটী আলো লইয়া ঝুলাইয়া দিবে।

২৪। কখন আলোক ভিন্ন সর্দ্দারেরা বোঝাই টব ছাড়িতে দিবে না।

২৫। যখন টব উপরে উঠিয়া আসিবে, তখন ঐ বোঝাই টব কেজ হইতে ঠেলিয়া লইবার সময়—টবের সম্মুখের লাইনে কোন কুলি-কামিন থাকিতে দিবে না।

২৬। খাদের তলদেশে চানকে বাউতিতে কুলি-কামিন যখন কয়লা ফেলিবে, তখন যাহাতে কোন বাউতি উঠা নামা না করে, তাহা দেখিয়া কয়লা বোঝাই করিতে দিবে। উপরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাউতি বোঝাই করিতে দেওয়া উচিত।

২৭। খাদের মধ্যে কিম্বা উপরে কোন রাস্তা পিচ্ছিল থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া তাহাতে বালি ছড়াইয়া দিবে এবং কোন প্রকারেই পিচ্ছিল থাকিতে দিবেনা।

২৮। খাদে কাঠ লাগাইবার মিস্ত্রি কাজ করিবার সময় সর্দ্দার অর্থাৎ ওভারম্যানের আদেশ অনুসারে যে যে স্থানে কাঠ লাগান উচিত, সেই সেই স্থানে লাগাইবে।

২৯। কাঠ খাদে লাগাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক কাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং যে কাঠ শক্ত থাকিবে, তাহাই খাদে লাগাইবে।

৩০। খাদে কাঠ লাগাইবার সময় কোন কুলি আহত হইলে তৎক্ষণাৎ সর্দ্দারের আদেশ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহার ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিয়া নেকড়া বাঁধিয়া দিবে এবং মিস্ত্রিগণ ঐ আহত লোককে উপরে আনিবে।

৩১। খাদের ফিটার মিস্ত্রী প্রত্যহ সমস্ত এঞ্জিন, বয়লার পুলিং, হেড্‌গিয়ার, প্রভৃতি সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

৩২। কোন এঞ্জিন, স্যাফ্‌ট, বয়লার, পিট, হেড্‌গিয়ার, পম্প কিম্বা অন্য কোন মেসিনরি খারাপ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মেরামতের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

৩৩। কোন এঞ্জিন, বয়লার, হেড্‌গিয়ার, রোপ, ইত্যাদি খারাপ হইলে কুলি-কামিনদিগকে কোনক্রমে চানকের মধ্যে নামিতে দিবে না।

৩৪। কোন স্থান কিম্বা কোন মেসিনরির অবস্থা আশঙ্কাপ্রদ বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিবে।

৩৫। প্রত্যেক বয়লারের ভিতর এবং উপরিস্থান পরিষ্কার করিবার পর এবং বয়লারের সমুদয় সক্ সমূহ পরিষ্কার করিয়া বয়লারে লাগাইবার পর সমস্ত বয়লার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উহা উপযুক্তরূপ কার্য্যক্ষম হইবে কি না, তাহা বহিতে তারিখ দিয়া লিখিয়া ফিটার মিস্ত্রি বয়লার চালাইবার আদেশ প্রদান করিবে।

৩৬। সমস্ত চানক, কল কব্জা, পিট, হেড্‌প্ল্যাটফরম, খাদ গাড়ি, উপরের প্ল্যাটফরমের কাঠ এবং অন্যান্য কল কব্জা ইত্যাদি দ্রব্য নষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, এবং প্রত্যেক বিপদজনক স্থান বেড়া দিয়া নিরাপদ করিয়া রাখিবে।

৩৭। সপ্তাহের মধ্যে একদিন ফিটার

মিস্ত্রি চানকের উপর, নিম্ন, টবগাড়ির রেলের রাস্তা, ক্রশিং, চানকের উপরের সেড্ এবং নিম্নের কেঁপস্, প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহা একটী বহিতে লিখিয়া রাখিবে।

৩৮। দৈনিক রিপোর্ট ভিন্ন সপ্তাহের মধ্যে যে কোন দিন হউক, ফিটার মিস্ত্রি এঞ্জিনের সকল স্থান এবং খাদের সমস্ত বল্টু, মুহুরী ইত্যাদি সমস্ত কল কব্জা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া রাখিবে। কিছু খারাপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামত করিতে পারে।

৩৯। কোন সর্দ্দার ফিটার মিস্ত্রির বিনা অনুমতিতে খাদে মালকাটা নামাইতে পারিবে না।

৪০। যখন কোন ড্রামে নূতন রোপ লাগান হইবে, তখন উহাতে উত্তম প্রকারে চর্ব্বি ও আলকাতরা দিয়া দুইটী পেঁচ দিয়া ড্রামে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া কোন্ সালের কোন তারিখে ঐ রোপ ড্রামে লাগান হইল, তাহা ফিটার মিস্ত্রির রিপোর্ট বহিতে লিখিয়া রাখিবে।

কোন রোপ ছিঁড়িয়া কিম্বা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা নাছি করিয়া যে তারিখে নাছি করা হইল, তাহা তাহার রিপোর্ট বহিতে লিখিয়া রাখিয়া।

৪১। মেরামত সম্বন্ধে এবং সকল কার্য্য সম্বন্ধে ম্যানেজারের সহিত পরামর্শ করা উচিত।

৪২। প্রত্যহ ওয়ার্কশপে সকালে এবং বৈকালে কার্য্য আরম্ভ হইলে মিস্ত্রিরা কার্য্য করিতেছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে।

৪৩। কয়লার কমিসনারের নিয়ম অনুসারে এবং কয়লার ইনেস্পেক্টরের আদেশ অনুসারে কয়লার চালান হইতেছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে।

৪৪। এঞ্জিন খালাসী, জাল খালাসী বাউতি ও টব ধরিবার জন্য উপরের ও নিম্নের কুলিরা ঐ সমস্ত কার্য্য পরিচালনের নিয়ম বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিবে কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

৪৫। কোন খাদের কয়লার খনিতে লোকোমটিভ্ এঞ্জিন থাকিলে রাত্রে চালাইবার কালিন এঞ্জিনের সম্মুখে উপযুক্তরূপ আলোর ব্যবস্থা করা উচিত।

৪৬। ম্যানেজারের অভিপ্রায় ব্যতীত ফিটার মিস্ত্রি তাহার সহযোগী অন্য কোন ফিটার মিস্ত্রি নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

৪৭। এঞ্জিন খালাসীরা ব্যাঙ্কম্যানের ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া বাউতি কিম্বা টব উঠা নামা করিবে।

৪৮। এঞ্জিন খালাসী ইন্জেক্টর, কয়লার এঞ্জিন, রোপ প্রভৃতি কার্য্য চালাইবার পূর্ব্বে যন্ত্রাদি কার্য্যোপযোগী আছে কি না প্রত্যহ দেখিয়া লইবে।

৪৯। সম্পূর্ণ মেরামত শেষ না হইলে কোন এঞ্জিন খালাসী কোন প্রকারে এঞ্জিন চালাইবে না।

৫০। পুলিব্লকে, রোপে, কেপস্, কেজের ব্লকে প্রত্যহ চর্ব্বি নিয়ম মত লাগাইতেছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে।

৫১। যে প্রণালীতে ঘণ্টা বাজাইতে হইবে, ব্যাঙ্কম্যান তাহা উত্তমরূপ বুঝিতে পারে কি না, দেখিয়া লইবে এবং ঐ ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া এঞ্জিন খালাসী কার্য্য করিতে পারে কি না, তাহা অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য।

৫২। কুলিদিগের হস্তে কোন প্রকার অস্ত্র, লাঠি কিম্বা অনস্ত বাতি দিয়া নামিতে দিবেনা

৫৩। যে ব্যক্তি খাদে নামিবে না, এ প্রকার লোককে চানকের মুখে কদাচ যাইতে দিবে না।

৫৪। বাউতি ও টব তুলিয়া ও নামাইয়া যখন কার্য্য চলিতেছে, এরূপ সময়ে ব্যাঙ্কম্যান এবং অনসেটার কোন ব্যক্তিকে চানকের মুখে যাইতে দিবে না।

৫৫। একটী কেজেতে ৪ চারিজন এবং ডবল কেজেতে ৮ আট জনের অধিক লোক খাদে নামিতে কিম্বা উঠিতে দিবে না।

৫৬। কুলিদিগের উপকারের জন্য তাহাদের নিকট হইতে সাপ্তাহিক দুই এক পয়সা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা আবশ্যক। এবং সেই সংগৃহীত পয়সার হিসাব রাখিয়া বেণীফিট্ ফণ্ডভুক্ত করা উচিত। কারণ সময়ে সময়ে যখন কুলিরা পীড়িত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, কুলিকামিনদিগের সন্তান সন্ততি প্রসব হয়, কোন কুলিকামিনের বিবাহ কিম্বা মৃত্যু হয়, বেণীফিট ফণ্ড হইতে সেই সময় তাহাদিগের সঞ্চিত অর্থ দেওয়া উচিত।

৫৭। কেজ উঠিবার কিম্বা নামিবার সময়—ব্যাঙ্কম্যান এবং অনসেটার ভিন্ন অন্য কেহ ঘণ্টা বাজাইতে পারিবে না।

ক্রমশঃ।

শ্রীএম, এম, রায়।

সাধু জেনিসিয়াস্।

১৬০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আজ রোম নগরে মহাধূম। আজ রোমের পল্লীতে পল্লীতে, পথে পথে, গৃহে গৃহে উৎসবের বাদ্য বাজিতেছে, উৎসবের নিশান উড়িতেছে, উৎসবের আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। নগরে আজ মহা আয়োজন।

কেন? এত আনন্দ কিসের জন্য? আজ সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান্ রোমনগরে পদার্পণ করিবেন। নূতন সম্রাটের আগমনে কোন্ নগর উৎসবানন্দময় না হয়, বরের আগমনে কোন্ গৃহে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত না হয়? কুমারীরা যেরূপ বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া বরের অভ্যর্থনা করেন, রোমনগরবাসীরাও সেইরূপ সজ্জিত হইয়া নূতন সম্রাটের অভ্যর্থনা করিবেন।

মহাবীর নেপোলিয়নের মত সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সামান্য এক সৈনিকের পদ হইতে আরম্ভ করিয়া ডায়োক্লিসিয়ান আপনার প্রতিভাবলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির শ্রেষ্ঠতম সোপানে আরোহণ করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যে ডায়োক্লিসিয়ান্ একজন সামান্য সৈনিক মাত্র, আজ তিনি জগদ্বিখ্যাত রোমের সম্রাট! কিছু দিন পূর্ব্বে যিনি সংসারের কোটী কোটী নগণ্য মানবের মধ্যে একজন ছিলেন, আজ মহাসমৃদ্ধিশালী সুসভ্য রোমবাসীর অগণ্য চক্ষু তাঁহার উপর নিপতিত। প্রতিভা এইরূপে চিরদিনই জগতের দৃষ্টিকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিয়া লয়, জগৎও এইরূপে প্রতিভার সম্মান করিয়া ধন্য হয়।

উৎসবের নানা আয়োজনের মধ্যে রঙ্গালয়ের অভিনয়ও উপেক্ষিত হইল না। সম্রাটের চিত্তবিনোদনের জন্য পরিহাস-পটু সুদক্ষ অভিনেতারা অভিনয় করিবেন। আজ কাল ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে গালি দেওয়ার ও উপহাসাস্পদ করার সভ্য

সমাজের যেমন খুব আমোদের কারণ হইয়া থাকে, সে সময়ে খ্রীষ্টানদিগকে গালি দিতে পারিলে ও লোকের কাছে ঘৃণাস্পদ করিতে পারিলে ও সেইরূপই বাহবা পাওয়া যাইত। এই জন্য সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য বাছিয়া বাছিয়া একটী খ্রীষ্টানের জীবন বিষয়ে অভিনয় হইতে লাগিল, উদ্দেশ্য—খ্রীষ্টশিষ্যদিগকে আরও লাঞ্ছিত, আরও উপহাসাস্পদ করা এবং সকলে তজ্জন্য অতুল আনন্দ সম্ভোগ করা। অভিনয়স্থলে সম্রাট্ ডায়োক্লিসিয়ান ও তাঁর অমাত্যগণ সকলেই উপস্থিত হইলেন।

যিনি নায়ক সাজিলেন, তাঁহার নাম জেনিসিয়স্। ইনি তাঁর কয়েকটী খ্রীষ্টান বন্ধুর নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব শুনিয়াছিলেন, বিশেষতঃ দীক্ষা সম্বন্ধে। আজ তাঁর সেই অভিজ্ঞতা বড়ই উপকারে লাগিল, আজ বড়ই আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল।

অভিনয় আরম্ভ হইল। জেনিসিয়স শয্যায় শায়িত হইয়া পীড়ার ভাণ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন "হায়, বন্ধুগণ, কি যেন এক গুরুভারে আমায় অবসন্ন করেছে, আমি কেমন ক'রে এ ভার হতে মুক্ত হব?"

বন্ধুরা ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর করিল, "বল কেমন ক'রে তোমার ভার হাল্কা ক'রে দিব? তোমার গায়ে র্যাঁদা ঘ'সে দিব কি? তা হ'লে অনেকটা ভার কমে যাবে এখন।"

জেনিসিয়স বলিলেন—পরিহাস করিয়াই বলিলেন, "ওরে অবোধেরা, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আজ খ্রীষ্টানের মত মরিব, তাহা হইলে প্রভু পরমেশ্বর আমাকে গ্রহণ করিবেন ও আমায় উদ্ধার করিবেন।"

খ্রীষ্টানের মত—ঘৃণিত খ্রীষ্টানের মত মরিতে চায়! এ লোকটা কি পাগল হইয়াছে, না ইহাকে ভূতে পাইয়াছে? নহিলে এমন কথা বলিবে কেন? নহিলে এরূপে মরিতে চাহিবে কেন? যাহা হউক, তার ভূত ছাড়াইবার জন্য একজন রোজাকে (চিকিৎসককে) ও একজন পুরোহিতকে ডাকা হইল। এই পুরোহিত ও রোজা আসিয়া তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমাদিগকে ডাকিয়াছ কেন?

কি জানি কি এক কোমলতা ও মধুরতা এই প্রশ্নে মাখান ছিল, কি জানি কোন্ অজানিত রাজ্যের সমাচার এই প্রশ্নের ভিতর নিহিত ছিল, পলকে মহাপ্রলয় সজ্ঘটিত হইল। "বৎস, আমাদিগকে ডাকিয়াছ কেন?" এই কয়টী কথা যেমন বলা, আর অমনি জেনিসিয়াসের সকল কপটতার ভাণ সর্পের গাত্রের খোলসের মত খসিয়া পড়িল। পলকের মধ্যে সেই মহালীলা চক্রী ভগবান ইহাঁর অন্তরে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ইহাঁকে চিরদিনের জন্য চিহ্নিত করিয়া লইলেন। আর তাঁর ব্যঙ্গ করা হইল না, আর রঙ্গ করা চলিল না; যাহা বলিলেন, অকপটে সরল বিশ্বাসেই বলিতে লাগিলেন। "আমি যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাই, পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে চাই।"

অন্যান্য অভিনেতারা পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গই করিতে লাগিলেন, ব্যঙ্গচ্ছলে জেনিসিয়াসকে জলাভিষিক্ত করিলেন, পরিহাস করিয়া তাঁহাকে দীক্ষার প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করি-

লেন। কিন্তু জেনিসিয়াস আর সে জেনিসিয়াস্ নাই, তাঁর নাট্যাভিনয় এখন তাঁর নিজের জীবনের অভিনয় হইতে লাগিল। তিনি দীক্ষান্তে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্ভয়ে অকপটে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। সম্মুখে রোমের সম্রাট ও রাজ্যের যত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ, তবু তাঁর ভয় নাই, ভ্রুক্ষেপ নাই, তিনি আপনার খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসের কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন।

অতঃপর কতকগুলি অভিনেতা সৈনিক পুরুষ সাজিয়া আসিয়া পরিহাসচ্ছলে জেনিসিয়াসকে ধরিয়া বাঁধিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিল। অপরাধ কি? তিনি খ্রীষ্টান হইয়াছেন, এখন তাঁর খ্রীষ্টবিশ্বাসের পুরস্কার স্বয়ং সম্রাটের নিকট গ্রহণ করিতে হইবে। সে সময়ে খ্রীষ্টবিশ্বাসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাহারও জন্য বন্যপশু, কাহারও জন্য অগ্নি, কাহারও জন্য মুদ্গর, কাহারও জন্য অসি অপেক্ষা করিত। খ্রীষ্টশিষ্যেরা রোমে তখন এইরূপ সম্মান ও এইরূপ পুরস্কারই পাইতেন; আর এইরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন বলিয়াই খ্রীষ্টান-বংশ রক্তবীজের বংশের ন্যায় কিছুতেই ধ্বংস হইল না।

যাহা হউক, জেনিসিয়াসকেও সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ানের নিকট তাঁর মত ও বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করিতে হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"হে সম্রাট মহোদয়, হে সভাসদ্‌গণ, আপনারা সকলে আমার কথা শ্রবণ করুন। ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্টানের নাম স্মরণ করিতে আমার মনে ঘৃণা ভিন্ন অন্য ভাব উদিত হইত না, এবং আমার যে সকল আত্মীয় ও বন্ধু খ্রীষ্টবিশ্বাসী, আমি তাঁহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমি তাঁহাদিগের নিকট খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্ম ও মত জানিতে চাহিতাম—খ্রীষ্টান হইব বলিয়া নয়, কিন্তু খ্রীষ্টানদিগকে অধিকতর ঘৃণাস্পদ করিতে পারিব বলিয়া। কিন্তু যখন আমার জলাভিষেক হইল, এবং আমার মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে পরীক্ষা হইতে লাগিল, আমি দেখিলাম, আমার কপটতা কোথায় আমায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আরও দেখিলাম, আমার মাথার উপর জ্যোতির্ম্ময় বেশধারী স্বর্গবাসী দেবগণ একখানি পুস্তক হইতে আমার আশৈশবকৃত পাপ সকল একে একে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তার পর যে জলে আমার অভিষেক হইল, সেই জলে তাঁরা সেই পুস্তক ধুইয়া দিলেন। আমি দেখিয়া অবাক্ হইলাম, সে পুস্তক রূপান্তর হইয়া দিব্য শুভ্র সুন্দর হইয়াছে।

আপনারা যে এই সব ব্যাপার দেখিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন, আমি আপনাদের প্রত্যেকের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, আপনারাও আমারই মত সত্য সত্যই বিশ্বাস করুন, ঈশাই একমাত্র প্রভু, তিনিই সত্য, তিনিই আলোক, এবং তাঁহারই মধ্যবর্ত্তীতে আমাদের পাপের ক্ষমা হইবে।"

সভাশুদ্ধ সকলে অবাক্! রঙ্গালয়ের অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। সকলে ভাবিতে লাগিল, একি ব্যাপার! সামান্য একজন লোক এক জন রঙ্গালয়ের অভিনেতা, অদ্বিতীয় রোমের সম্রাটের মুখের উপর এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করে, এত বড় স্পর্দ্ধা তার? কোন্ সম্রাট এরূপ ধৃষ্টতা সহিতে পারেন? সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান্ সহিবেন কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন "ইহাকে মুদ্গরের দ্বারা অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করা হউক।" তৎপরে তাঁহাকে অধিকতর

নির্য্যাতনের জন্য সেনাপতি প্লটিয়ানের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আজ মহা পরীক্ষা হইবে। বিশ্বাস বড় না দেহের মায়া বড়, ধর্ম্ম বড় না প্রাণ বড়? রঙ্গালয়ের সেই পরিহাসপ্রিয় লঘুচিত্ত অভিনেতাকে আজ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। জেনিসিয়স কি এ মহা পরীক্ষায় জয়ী হইতে পারিবেন? পৃথিবীতে কি এমন কোন বন্ধু আছেন, যিনি আজ তাঁর সহায় হইবেন? স্বর্গে কি এমন কোন দেবতা আছেন, যিনি এই পরীক্ষা স্থগিত বা রহিত করিতে পারিবেন? না, না, কেহ নাই, কেহ নাই।

প্লটিয়ানের আদেশে তাঁহাকে যূপকাষ্ঠে উঠান হইল। তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া লৌহময় বড়শি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করা হইতে লাগিল; আঘাতে আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাপ্লুত হইল, দেহ হইতে মাংস সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তথাপি জেনিসিয়স অচল, অটল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি যাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি ভিন্ন অন্য প্রভু নাই। তাঁহাকেই আমি মানি, তাঁহাকেই আমি পূজা করি। প্রাণ যায় যা'ক, আমি তাঁর জন্য সহস্রবার মরিতে প্রস্তুত।"

নির্য্যাতন আরও বাড়িতে লাগিল। হায় মদগর্ব্বিত মানব, তুমি সুযোগ পাইলে তোমার অসহায় ভ্রাতাকে কি নির্য্যাতনই না কর! হায় রাজশক্তি, তুমি অন্ধবিশ্বাসে চালিত হইয়া দুর্ব্বল প্রজাশক্তিকে চূর্ণ করিতে কি নির্ম্মম আয়োজনই না কর! অনেক মশাল জ্বালা হইল। সেই মশালের অগ্নিতে জেনিসিয়সের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করা হইল। নিদারুণ যাতনায় প্রাণ যায়, তথাপি ধর্ম্মবীর জেনিসিয়স অচল, অটল। তিনি অন্তরে তাঁর সেই ইষ্টদেবতাকে দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, "কোন নির্য্যাতনই আমার প্রাণ হইতে আমার প্রাণের ঈশাকে ছিঁড়িয়া লইতে পারিবে না। আমার কেবল এই দুঃখ, এত দিন এই প্রভুর নিন্দা করিয়া আমার জীবন বৃথায় কাটাইলাম, আর তাঁর সেবায় নিযুক্ত হইতে আমার এত বিলম্ব হইয়া গেল?"

বিশ্বাসীর বিশ্বাসের নিকট পৃথিবী চিরকালই হার মানিয়াছে, সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান হারিলেন, সেনাপতি প্লটিয়ানও হারিলেন। ধর্ম্মবীর জেনিসিয়স যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তার একটী কথাও প্রত্যাহার করিলেন না। একবার সত্য বলিয়া যাহা তিনি প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন, এখন কার ভয়ে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন? একবার ইষ্টদেবতা বলিয়া যাঁহাকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছেন, এখন কোন্ প্রাণে সেই হৃদয়-নাথকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিবেন? কি এক অমানুষিক বলে বলীয়ান্ হইয়া আজ তিনি সকল ভয় ভাবনার অতীত! কি এক দুর্জ্জয় সাহসে পূর্ণ হইয়া আজ তিনি দেশ-কালের ও সংসারের অতীত? কি এক গৌরবের রাজ্য আজ তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত! তাই আজ তিনি অচল, অটল।

কিছুতেই কিছু হইল না। এত আয়োজন, এত নির্য্যাতন সকলই ব্যর্থ হইল। পাশব বলের নিকট, বিশ্বাস-বল পরাজিত হইল না। পরাজিত, উত্তেজিত প্লটিয়ান, কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় প্লটিয়ান আদেশ করিলেন "ইহার মাথা উড়াইয়া দাও"। তদ্দণ্ডেই আদেশ পালিত হইল।

জেনিসিয়সের ছিন্নমুণ্ড দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, ছিন্ন দেহ শোণিতাক্ত হইয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল, কিন্তু বিজয়ী সেই অমর আত্মা বিশ্বাসের জয় ডঙ্কা বাজাইয়া অমরধামে চলিয়া গেল। স্বর্গ বলিল, "সাধু সাধু", পৃথিবী বলিল, "সাধু সাধু"।

১৬০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। সে রোমের প্রতাপ আজ কোথায়? সেই খ্রীষ্ট-বিদ্বেষী সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান্ আজ কোথায়? মহাকালের মহাগর্ভে সব মিশাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালজয়ী সাধু জেনিসিয়সের নাম আজ অমর অক্ষরে লোকের হৃদয়ে খোদিত রহিয়াছে। আজও প্রতি বৎসর ২৬শে আগষ্ট তারিখে খ্রীষ্টজগতের ঘরে ঘরে তিনি কত শ্রদ্ধা, কত পূজা পাইতেছেন। যতদিন পৃথিবীতে খ্রীষ্টধর্ম্মের নাম থাকিবে, যত দিন ধর্ম্মের গৌরব থাকিবে, ততদিন সাধু ভক্তের নাম পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইবে না।

অবোধ শিশুরা অনেক সময় আগুন লইয়া খেলা করিতে ভালবাসে। তাহারা জানে না, কেহ বারণ করিলেও মানে না, আগুন লইয়া খেলা করিলে সময় সময় কি বিপদ ঘটে। হঠাৎ যে দিন অসাবধানতা বশতঃ তাহাদের কাপড়ে আগুন লাগিয়া তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যায়, সেই দিন, সেই ক্ষণে তাহারা কথাটার মর্ম্ম বুঝিতে পারে। এইরূপ ভগবানের নাম লইয়া, ভক্ত-চরিত্র লইয়া যাঁহারা বিদ্রূপ করেন, তাঁহারা জানেন না কোন্ দিন পবিত্রাত্মা কার জন্য কি কাণ্ড বাধাইবেন। সাধু জেনিসিয়স্ বিদ্রূপ করিতে আসিয়া, আমোদ করিতে আসিয়া পবিত্রাত্মার হাতে ধরা পড়িলেন, শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে হইল। কিন্তু ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পবিত্রাত্মার হাতে ধরা পড়ে! আরও ধন্য সেই ব্যক্তি, পবিত্রাত্মার হাতে যার প্রাণ যায়! ভগবান বলিয়াছেন, "যার প্রাণ যায়, সেই প্রাণ পায়।" গৌরবের অক্ষয় মুকুট তাহারই জন্য, অমরধামে দেব-সহবাস তাহারই জন্য, তাহারই নাম লইয়া পৃথিবী বলে "ধন্য," স্বর্গ বলে 'ধন্য'।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

অরণ্যে রোদন।

আর কত কান্দিব? অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে, অথচ ক্রন্দনের কারণ অন্তর্হিত হয় নাই। পূর্ব্বে যাহা দেখিয়া কান্দিয়াছি, তদপেক্ষা বৃহত্তর কারণ উপস্থিত হইয়াছে, দিন দিন অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে, অথচ চক্ষুতে আর জল নাই, এ শুষ্ক গলায় আর স্বর নাই। আবার চক্ষে দেখিতে হইল, জগাই মাধায়েরই নিকট চৈতন্য নিত্যানন্দ পরাজিত, আবার পাইলেটের দল ইশাকে ক্রুশে নিহত করিতে অগ্রসর, এ দুঃখ কাকেই বা বলি, আর কেই বা শুনে।

এক সময়ে দেখিয়াছিলাম, সুরাপান ব্যভিচার মস্তক অবণ করিয়াছিল, দূর না হইলেও ভয়ে ভীত ও কম্পিত, কিন্তু আজি দেখিতে পাইতেছি, ব্যভিচার হুহুঙ্কার করিতেছে, সুরাপান সিংহনাদ করিতেছে, ঘোর পাপানলে দেশ দগ্ধ হইয়া গেল। শিক্ষিত নামধারী সমাজের নেত্রস্থানীয়, আজ আর যুবা নহে, আমাদের ন্যায়ই

বৃদ্ধগণ অগ্রে অগ্রে নরকের কূপের দিকে চলিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সরলমতি কাণ্ডজ্ঞান-হীন, অজাতশ্মশ্রু বা কিঞ্চিদুদ্ভিন্ন-গুম্ফশ্মশ্রু যুবককুল নরক কতদূর, দেখিতে অগ্রসর। হা ধর্ম্ম, তুমি কোথায়? আজি বেশ্যার নৃত্য ভিন্ন নাকি আমোদ হয় না, বেশ্যাভিনীত রঙ্গভূমি ভিন্ন না কি আর সুরুচিকর আনন্দ সম্ভোগ করা যায় না! শাদা চক্ষে নাকি সুখ হয় না, সুরা বন্ধু-অভ্যর্থনার এক প্রধান উপকরণ, আমোদের এক প্রধান সাধন। কাঙ্গালীভোজন, কাঙ্গালকে দুপয়সা দান অপব্যয়, আর আমোদগৃহে সহস্র সহস্র অর্থনাশ সদ্ব্যয়! বিংশ শতাব্দীর এই রুচি, এই সভ্যতা লইয়া বাঙ্গালী আজি জাতি সমূহের নিকট মস্তক উন্নত করিয়া অহঙ্কার করিবে! হা ধরিত্রী, তুমি বিদীর্ণ হও, তোমার বক্ষে প্রবেশ করি।

দেশের যে সমস্ত অভাব পূর্ব্বে ছিল, আজিও সে সমস্ত অভাব রহিয়া গিয়াছে, বরং বাড়িয়াছে। বাল বিধবার ক্রন্দনে আজি প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে, মহামারী, ম্যালেরিয়া, প্লেগ-বিনষ্ট অকালমৃত্যুগ্রস্ত যুবক বালকগণের পত্নীগণ আজ একাদশীতে শুষ্ককণ্ঠ, অর্থাভাবে, অনাহারে জীবন্মৃত, ব্যভিচারী পাপীগণের অত্যাচারে ত্রস্ত, পাষণ্ড নিশাচরগণের নৈশ আক্রমণে বিদীর্ণ-হৃদয়, হীন-সম্ভ্রম, ধর্ম্মচ্যুত, অথচ যাহারা পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলনের স্বপক্ষ ছিলেন, আজি তাঁহারা স্বার্থ নাশ ভয়ে, লোকের অবমাননা ভয়ে ভীত। এই সুবিধাবাদী পাষণ্ডগণ কতদিন এই বঙ্গভূমি-ক্রোড় কলঙ্কিত করিবে? উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্মতি আইনের গোলযোগে যে সমস্ত পাষণ্ড "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল, আজি তাহাদের সে তীব্রস্বর কোথায় রহিল? না-বাঙ্গালীর স্বর সৎকার্য্যের বিরুদ্ধে উঠিবে, অসৎ কার্য্যের সময় চুপ করিবে? যে সমস্ত রাক্ষসের উৎপাতে বঙ্গের ভীমগণ বিষম তেজে তাহাদিগকে বিচূর্ণিত করিয়া অন্ত্যেষ্টি করিয়াছিলেন, আজি তাহাদের ভস্মরাশি হইতে আবার রক্তবীজের ন্যায় সেই সমস্ত ভস্মবীজ মস্তকোন্নত করিতেছে, আবার চাহিয়া দেখ, ঘরে ঘরে সুরাপান। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, যাহারা ভদ্র-নামে পরিচিত, আর যাহারা ভদ্র সংজ্ঞা-বিবর্জ্জিত, কেহ কাহাকেও পশ্চাতে দেখিতে প্রস্তুত নহে, সকলেই ধ্বংসপথে অগ্রসর। সুরা রাক্ষসী আবার মস্তকোত্তোলন করিল, সঙ্গে সঙ্গে পাপ ব্যভিচার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। অজাতশশ্রু অনুদ্ভিন্ন-যৌবদন্ত বালকগণ চুরুট, সিগারেট মুখে লইয়া নরকের এঞ্জিন ফুকিয়া অগ্রসর হইতেছে, দেখিলে কাহার হৃদয় না ক্রন্দন করে? যখন এই সকল বালক ভগ্নস্বাস্থ্য, ক্ষীণ-দেহ, বিকৃত মস্তিষ্ক, ও কৃষ্ণ যক্ষ্মা লইয়া জগতে উপস্থিত হইবে, তখন এই বিনাশ-মার্গগামী সমাজের দারিদ্র্য-তাড়িত দেশের জীবন-সংগ্রামে তাহারা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? দেখিলাম, একটী বন্ধু এই তামাকের মাহাত্ম্য সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়াছেন। হায়, ইহাও চক্ষে দেখিতে হইল! পাপরাজ্যের প্রথম পথ-প্রদর্শক তামাকু, পথে তাহার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গ লয়, গাঁজা ও গুলি, পরে অপেক্ষাকৃত প্রবীন সহযোগী সুরা আসিয়া উপস্থিত হয়, শেষে অহিফেন আসিয়া মুরুব্বিয়ানা করে, অবশেষে কৃতবিদ্য সহযোগী কোকেন

আসিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করেন। হে তামাকুর গ্রাহী ও উৎসাহীগণ, একবার দেখুন, আপনাদের প্রিয় বস্তুর কীর্ত্তিস্তম্ভ, সমাজ-মন্দিরে অক্ষয় ভাবে বিরাজিত!

জাতিভেদ এত দিন মস্তকোত্তোলন করিতে সাহস করে নাই, শীতাগমে বিবরাশ্রয়ী ভুজঙ্গের ন্যায় নিম্ন মস্তকে অবস্থান করিতেছিল! আবার রাজপুরুষগণের ইঙ্গিত পাইয়া মহাতেজে মস্তকোত্তোলন করিতেছে, আজি বৈদ্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ক্ষত্রিয়, বণিক বৈশ্য, বারুই বৈশ্য, ও চণ্ডাল নমঃশূদ্র হইয়া উঠিয়াছেন, ব্রাহ্ম প্রচারক পর্য্যন্ত বল্লাল সেনকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র। সেন্সাসের বংশীধ্বনিতে গঙ্গা-যমুনার জল উজান বহিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ ও জাতীয় মহাসমিতির কার্য্য জাতিভেদের উত্তেজনায় ঢাকিয়া গিয়াছে। কায়স্থ-পত্রিকা, বারজীবী সভা প্রভৃতি এক্ষণে দেশানুরাগ ও ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

দেশ দারিদ্র্যে নিমগ্ন, ৪ কোটী লোক একাহারে, এবং ১ কোটী লোক অনাহারে দগ্ধ হইতেছে, এদিকে রাজপুরুষগণ কামধেনুর ন্যায় ভারতকে ক্রমশঃ দোহন করিতেছেন, রাজার জন্মে টাকা, মৃত্যুতে টাকা, অভিষেকে টাকা, প্রতিনিধির আগমনে টাকা, মৃত্যুতে টাকা, কেবল টাকা টাকা টাকা, এদিকে বলা হয়, ভারতের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, কাশি দুর্ভিক্ষ, আজি উৎসব, কালিঘাটে দুর্ভিক্ষ, কলিকাতায় মহোৎসব, এক ভাই মরে, এক ভাই গান গায়, মা মরে, ছেলে নাচে, হায়, কি উৎসবের উপযোগীতা! রাজা অভিষেক উৎসবে কোথায় অকাতরে ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া কাঙ্গাল গরিবকে দান করিবেন, না রাজভাণ্ডারের দ্বারে চবের তালা, প্রহরী বান্ধা, বলেন, গরিব প্রজা অর্দ্ধাহারের দুই মুষ্টি দাও, গরিবকে দেই!

দেশীয় রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত মনে করেন, ভারত কামধেনু। হায়, চাষার টাকা কত-কষ্টের টাকা, পচা পূতিগন্ধময়, জোঁক পোকা পরিপূর্ণ কর্দ্দমাক্ত জলে পাট তুলিতেছে, শরীর দদ্রুময়, লালমোহন দদ্রুনিধির সুবিধা করিয়া দিতেছে, এই কষ্টের টাকার অর্দ্ধেক মহাজন, সিকি পুলিস, দু আনি জমিদার, বক্রী দুই আনি হইতে যত পার খাও, ছেলের বিবাহ দাও, পূজা কর, দান কর, আর রাজার উৎসবে দুই টাকা দাও।

সকল দিক দেখিতে গেলে মনে হয়, এ ভারতে যজ্জীবতি তন্মরণং জন্মরণং সোহস্য বিশ্রামঃ। হা ঈশ্বর, একবার তুমি এ দীন দরিদ্র জাতির দিকে চাও, লোকের সুমতি প্রদান কর। প্রভু, এমন দেশ আমাদিগকে দিয়াছিলে, কিন্তু নরাধম আমরা ইহার অবনতি-স্রোত বৃদ্ধির জন্যই দায়ী হইলাম। মাতৃভূমির জন্য একটু ত্যাগ-স্বীকার করিলাম না। হায়, আমাদিগকে শত ধিক্।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

পাষাণী

১

দেবি! আমি "পাষাণ প্রতিমা"?
ভেঙেযাব পাষাণের মত?
তোমার দয়ার নাহি সীমা,
পাষাণেও করুণা নিয়ত!

২

তুমি শুধু কাঁদাইয়া যেও
আমি দিব প্রীতি ভালবাসা,
আমারে নিঠুর নেত্রে চেও
জাগাইও মরণের আশা!

৩

আমি দিব কুসুম-অঞ্জলি
তুমি দিও দূরে তা ফেলিয়া,
আমার বাসনা সাধ গুলি,
দিও সব চরণে দলিয়া।

৪

তোমা লাগি আমার নয়নে
ব'বে যবে উষ্ণ অশ্রু রাশি,
দেখিয়া দেখিয়া আনমনে
যেও—দিয়ে উপেক্ষার হাসি!

৫

এত দূরে থেক দিবা নিশা—
যেন ও অমৃত গন্ধ লয়ে,
সমীরণ (হারাইয়া দিশা)
আমারে পারেনা দিতে ব'য়ে!

৬

মোর যত যতনের ধন
পথে রেখ ভাঙিয়া চূরিয়া,
প্রার্থিত বাঞ্ছিত যে রতন
তাই দিও পরে বিলাইয়া!

৭

এইরূপে—দিন কত পরে
এক দিন বাসন্তী সন্ধ্যায়,
পাপিয়ার সুমধুর স্বরে,
চাঁদের মধুর জ্যোছনায়,

৮

যশোদার করুণ বিলাপ
গাহি পথে চলিবে পথিক,
বিধবার লুকানো সন্তাপ
খুঁজিবে "কোথায় প্রাণাধিক"!

৯

তুমি বসি তেমনি সন্ধ্যায়,
মলয়ায় নাহি ঘুচে জ্বালা,
বীণা কেন বাজিতে না চায়,
শুষ্ক নব বেলা যুঁই মালা!

১০

তবু তুমি ধীর—তারপরে
সচকিতে চারিদিকে চাহি,
শুনিবে, বুঝিবে চিরতরে—
এ জগতে আমি আর নাহি!

১১

সেই ক্ষণে বিধির ইচ্ছায়
অকস্মাৎ চিনিবে আমারে
এ বুকে যে কি ছিল কোথায়,
সকলি দেখিবে একেবারে।

১২

তাই তুমি উনমত্ত রূপে
বনে বনে বেড়াবে কাঁদিয়া,
মহাশূন্যে থাকি চুপে চুপে,
আমি তাহা হেরিব হাসিয়া

১৩

এ কবিতা পড়িয়া আমার
তুমি যা বলিবে তাতো জানি,
কিন্তু ভেবে দে'খ একবার
কে আমারে করেছে পাষাণী ?

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

বার-ভূঞা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে জানাইয়াছি যে, অতঃপর যশোহর রাজবংশের, যাবতীয় সদনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব ; এখন এতৎ সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে বিবৃত করা গেল।

প্রতাপ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পিতৃক্রোড় ও জন্মভূমি বিচ্যুত হইয়া, দিল্লী অবস্থান করেন। তৎকালে নানাবিধ কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে, তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। বিশেষতঃ মুসলমানেরা কি উপায় অবলম্বন করিয়া, ভারতের একাধিপত্য লাভ করিয়াছে, কি নীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় রাজন্যবর্গকে ক্রমে পরাজিত করিয়াছে, তৎতৎ বিষয় অতি বিচক্ষণতার সহিত বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

সেই সময়ে মিবারের মহারাণা প্রতাপ সিংহ যেরূপঃ অমানুষিক সাহস সহকারে, সুখ ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে আপনাকে বিমুক্ত রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, এমন কি, মহাবিপদে আত্মহারা না হইয়া, বাদসাহের ও স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের কৌশলজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে নিরত ছিলেন ; যখন জগৎ স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার সেই কার্য্যবত্তার,—পুণ্যকীর্ত্তি সন্দর্শনে উন্মেষিত, যখন সেই পুণ্যশ্লোক নরেশের উচ্ছ্বাসময় ও মহাপ্রাণতার জীবনব্যাপী সমর সন্দর্শনে শত্রুরা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তদীয় গুণগানে নিরস্ত না হইয়া পারে নাই, তৎকালোচিত সেই অদ্ভুত বিবরণ প্রতাপাদিত্যেরও জানিবার বাকী ছিল না।

প্রতাপাদিত্য সেই রাজপুতরাজ্যের বীরচরিত যতই অনুধ্যান করিয়াছিলেন, ততই তাঁহার প্রাণে যেন আর একটী নব দুরাকাঙ্ক্ষাচিন্তা প্রসূত হইয়া তাহাকে এক অভিনব পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। প্রতাপের সেই নব ভাবনা আর কিছুই নহে, কেবল বিজাতির হস্ত হইতে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করা।

মোগল পাঠানের পরস্পর সংঘর্ষণে তখন বঙ্গদেশ প্লাবিত, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রতাপ আত্মচিন্তা-সাফল্যের মহা সুযোগ পাইয়া, উহার প্রসার আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন। তখন পাঠান সামন্তগণ ও হিন্দু জমিদারেরা এক মতাবলম্বী হইয়া মোগলবাদসাহের প্রতিকূলে প্রকাশ্যে দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া প্রথম মনোগত ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না, এমন কি, মোগলরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াই চলিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রাজ্য মধ্যে দুর্গাদি নির্ম্মাণ

কার্য্যে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ধূমঘাটে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। নৈহাটীর অনতিদূরে জগদ্দল, শালিখা, রায়গড়, মাতলার নিকট, এতদ্ভিন্ন কালিন্দী তীরে বংশীপুর প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়। প্রবাদ আছে, ধূমঘাটের দুর্গ পাঁচ বৎসর ধরিয়া বহুসংখ্যক লোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বহু রথ্যা ও জলাশয় যশোহর রাজবংশের কীর্ত্তিস্বরূপ আজিও বিরাজিত আছে। এতন্মধ্যে যশোহর হইতে প্রতাপনগর হইয়া ঘাট্টারায়পুর যাইবার জন্য যে সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদ্যাপী সুন্দরবন প্রদেশে ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু বকুল বৃক্ষ বর্ত্তমান দেখা যায়।

বসন্তরায়ের নামানুসারে বসন্তপুর এবং প্রতাপাদিত্যের নামানুসারে প্রতাপনগর বলিয়া দুইটী জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতাপাদিত্য ধূমঘাটের অনতিদূরে, এক শিলাময়ী কালী সংস্থাপন করেন, ইহা পরে যশোহরেশ্বরী নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই প্রতিমা সংস্থাপন সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প পরিশ্রুত হওয়া যায়। নিশীথে কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ অবলোকন করিয়া যশা পাটনী এই বিষয় মহারাজকে অবগত করায়; রাজাও অনুসন্ধানে ঐ ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন; পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে নিশ্চয় ভগবতী আবির্ভূতা আছেন বুঝিয়া তথায় দেবীপ্রতিমা সংস্থাপন করেন।

এতদ্ভিন্ন এই রাজবংশ দ্বারা উৎকল হইতে আনিত গোবিন্দজী ও উৎকলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় যশোহরের রাজবংশীয়গণের নিকট যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদঙ্কিত শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মায়ং পদ্মযোনি প্রতিষ্ঠিতং।
উৎকলেশ্বর সংজ্ঞক শিবলিঙ্গ মনুত্তমং॥
প্রতাপাদিত্য ভূপেনানীত মুৎকলদেশতঃ।
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চতৎ॥

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত, ৬৪পৃষ্ঠা

যশোহর রাজবংশের দানশীলতার বিষয় বিস্তর পরিশ্রুত হওয়ায় ও রাজদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ভিন্ন স্থল হইতে আসিয়া যশোহরবাসী হন। বিশেষতঃ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের "কল্পতরু" ব্যাপার ত এক অলৌকিক কাণ্ড। একার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিবে, দাতাকে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। মহারাজ এই কার্য্যে যে কত লোকের প্রার্থনীয় কত দান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জনপ্রবাদে শুনা যায়, কোন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার সাত্ত্বিক, কি তামসিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, রাজমহিষীকে প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু সে দেখিল, রাজা অম্লানবদনে, তাহার অভিষ্ট পূরণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে, তৎকরে সম্প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তখন বিপ্রবর ভক্তিভরে মহারাজকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমার রাজমহিষীতে কোন প্রয়োজন নাই, রাণী আমার মাতৃস্থানীয়া, কেবল মহারাজ যথার্থ ধর্ম্মভয়ে কি লৌকিক আড়ম্বরে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, মহারাজা রাণীমাতাকে পুনঃ গ্রহণ করুন; এবং মহারাজ

সর্ব্বতোভাবে অসযুক্ত হউন ?" বলা বাহুল্য, প্রতাপাদিত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা গ্রহণে, নিষ্ক্রয় স্বরূপ ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থদান করিয়া রাণীকে পুনঃগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এত গেল সব শুনা কথা, কিন্তু খুলনাঞ্চল পরিভ্রমণ কালে আমি এতৎসম্বন্ধে যে একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি। তাহার সম্যক্ বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

জেলা খুলনা, বাগেরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত মূলাঘর গ্রাম অতি প্রসিদ্ধ। অনেক সম্ভ্রান্ত, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ তথায় বাস করিতেছেন; তন্মধ্যে বৈদ্যবংশীয় রায়-চৌধুরী উপাধীধারী ব্যক্তিদের পূর্ব্বপুরুষ ঐ স্থানের (খরড়িয়া পরগণার) জমীদার ছিলেন। তাঁহাদের জমিদারী মহারাজা প্রতাপাদিত্যেরই প্রদত্ত। এতৎ সম্বন্ধে তত্রত্য জনসাধারণ মধ্যে যে ইতিবৃত্ত চলিয়া আসিয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বৈদ্যবংশীয় জানকীবল্লভ দাস গুপ্ত মূলঘরের নিকট কোন চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। তৎকালে ঐ স্থানে বহু ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী লোক বাস করিত। উহারা সকলেই জানকীবল্লভকে যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান করিত। অদ্যাপি ঐ প্রদেশের লোকেরা পাঠশালায় শিক্ষকদিগকে "বিশ্বাস বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। জানকীবল্লভও বিশ্বাস মহাশয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

খরড়িয়া পরগণাটী মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যান্তর্গত ছিল। এতন্নিবন্ধন প্রজাদের অভাব, অভিযোগ ইত্যাদি সমোহয়ের রাজসদনেই করিতে হইত। কোন সময়ে বিশেষ জলকষ্টানুভব করিয়া তত্রত্য প্রজাসাধারণ মহারাজকে আপনাদের অভাবের বিষয় পরিজ্ঞাত করায়, রাজা রামদাস দেওয়ান নামক একজন অমাত্যের প্রতি প্রজাগণের অভাব তদন্ত করিয়া যাহাতে উহা নিরাকৃত হয়, তদনুরূপ আদেশ প্রদান করেন।

রামদাস দেওয়ান তৎকালে দক্ষিণ প্রদেশের কর সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া অচিরে খরড়িয়া পরগণায় উপস্থিত হইলেন, পরে প্রজাদের আবেদনের বিবরণ যথার্থ জানিয়া, তথায় এক বৃহৎ জলাশয় খনন করাইতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে দেওয়ানের সহিত, বিশ্বাস মহাশয়ের বেশ আলাপ পরিচয় হয়। জানকীবল্লভ বিশ্বাস মহাশয়কে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, রামদাস দেওয়ান, পুষ্করিণী খনন বিষয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। জানকীবল্লভও বিশেষ মনোযোগের সহিত ঐ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

বিশ্বাস মহাশয়ের উদ্যোগে আরব্ধ কার্য্য অচিরে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। তখন দেওয়ান পরিতুষ্ট হইয়া জানকীবল্লভকে বলেন, "আপনি এতাদৃশ কুৎসিত স্থানে কেন অবস্থান করিতেছেন ? আমার সহিত চলুন, অবশ্য আপনার উন্নতি সংসাধিত হইবে, বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার কথায় আশ্বাসিত হইয়া তদনুসরণে সম্মত হইলেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেওয়ান রামদাস জানকীবল্লভকে এক মোহরের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। কার্য্যপারদর্শিতা গুণে, পরে রাজানুগ্রহে, বিশ্বাস মহাশয় প্রধান কাননগুর পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন।

প্রতাপাদিত্য যখন কল্পতরু হইয়া

ছিলেন, সেই সময় বিশ্বাস মহাশয়ের উপর অনেক কার্য্য সম্পাদনের ভারার্পণ করিয়া রাজা বলিয়াছিলেন, "যদি তাহাতে কোন রূপ ত্রুটি ঘটে, তবে তাঁহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, কার্য্য সুসম্পন্নের সহিত তাঁহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী"। ভাগ্যদেবীর অনুকূলতায় জানকীবল্লভ কিন্তু তৎহস্তে ন্যস্ত কার্য্য সুসম্পন্নের জন্য যশোলাভ করিতেই পারিয়াছিলেন। এজন্য রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কোনরূপ পুরস্কার প্রার্থনার অনুমতি প্রদান করেন। রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া জানকীবল্লভ খরড়িয়া পরগণার জমিদারী প্রার্থনা করেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে ঐ পরগণার জমিদারী সনন্দ ও মজুমদার উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, যখন মাহারাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে, মানসিংহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখনও জানকী বল্লভ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে থাকিয়া প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে নিরস্ত ছিলেন না। পরে রাজা বন্দী হইলে পর, যখন প্রবল মোগলবাহিনী রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিল, তখন জানকীবল্লভ অনন্যোপায় হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া একটী লক্ষ্মীনারায়ণ ও একটী রাজরাজেশ্বর চক্র লইয়া স্বীয়াবাসে প্রস্থান করেন।

জানকীবল্লভ খরড়িয়া পরগণার অন্তর্গত যে স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন, তাহার নাম মুলঘর, অদ্যাপি ঐ স্থানে তাঁহার বংশধর চৌধুরী মহাশয়েরা কালক্রমে ঐ চক্রদ্বয়কে অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। সম্ভবতঃ জানকীবল্লভের ৪র্থ পুরুষে জমিদারী নিলাম হইয়া যাওয়ায়, কলিকাতা হাটখোলানিবাসী, বাবু কাশীনাথ দত্ত উহা খরিদ করিয়া খরড়িয়া পরগণার মালিক হইয়াছিলেন। এখন যৎকিঞ্চিৎ দেবত্তর সম্পত্তি দ্বারা লক্ষ্মীণারায়ণের সেবা চলিতেছে। আরও শুনিয়াছি, টাকীর বিখ্যাত মুন্সীবংশীয়, রায় নরেন্দ্রনাথ যখন বাগেরহাট মহকুমার ভার প্রাপ্ত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তৎসময় নরেন্দ্র বাবু স্থানান্তর যাতায়াত কালে প্রায়ই মুলঘর উপস্থিত হইয়া ঐ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রকে সন্দর্শন করিয়া যাইতেন। স্বদেশ ও স্ববংশীয় মহারাজার সহিত ঐ লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাতেই তিনি উক্ত বিগ্রহকে বড়ই প্রীতি ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ব্যয়ে খনিত বৃহৎ দীর্ঘিকা এযাবৎ ঘোর অরণ্যে আবৃত ছিল, সম্প্রতি চৌধুরীবংশধরগণের চেষ্টায় খুলনা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড উহার পঙ্কোদ্ধার করিয়া গ্রামের মধ্যে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। শুনিলাম, জাহাঙ্গিরের সময় খনিত বলিয়া উহার নামকরণ হইয়াছে "জাহাঙ্গীর ট্যাঙ্ক"। বাস্তবিক, উহা জাহাঙ্গিরের রাজত্ব সময়ে খনিত না হইয়া আকবরের রাজত্ব সময়েই খনিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, আমাদের বিবেচনায় এই নাম না দিয়া পুকুরের নাম "প্রতাপাদিত্য ট্যাঙ্ক" রাখাই কর্ত্তব্য ছিল, অন্যথা যেমন দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথুরায়ের বিনির্ম্মিত অত্যুচ্চ মিনার এখন কুতুব মিনার নামে ঘোষিত হইয়া, হিন্দুকীর্ত্তির অন্তরায় হইয়াছে, উহাও তদ্রূপ হইয়া পড়িবে। উপমাটা যদিও অতিরিক্ত হইয়া পড়িল, তথাপি সময়ানুরোধে ও কর্ত্তব্যবোধে না লিখিয়া পারিলাম না।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এইরূপ দানের

বিবরণ সংগ্রহ করিলে এরূপ কত বিবরণ যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলা যায় না। ভাটকবিগণ তাঁহার যশোগানছলে উচ্চৈঃস্বরে কবিতা পাঠ করিত যে,—

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে।
প্রতাপআদিত্য দাতা অবনী মণ্ডলে॥"

ক্রমশঃ

শ্রীআনন্দনাথ রায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত *

(শ্রীম-কথিত)

[বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে।]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ও তাঁহার ভক্তসঙ্গে আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালীবাড়ীতে আজ জন্মমহোৎসব—ফাল্গুন শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি, রবিবার, ১১ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সাক্ষাৎ তাঁহাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন।

প্রভাত হইতে ভক্তেরা একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। সম্মুখে মা ভবতারিণীর মন্দির। মঙ্গল আরতির পরই প্রভাতী রাগে নহবৎখানায় মধুর তানে রসনচৌকি বাজিতে লাগিল। একে বসন্তকাল, বৃক্ষলতা সকলই নূতনবেশ পরিধান করিয়াছে; তাহাতে ভক্তহৃদয় ঠাকুরের জন্মদিন স্মরণ করিয়া নৃত্য করিতেছিল। চতুর্দ্দিকে যেন আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। মাষ্টার গিয়া দেখিলেন, ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ ইঁহারা উপস্থিত আছেন। তখন খুব সকাল, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ইঁহাদের সঙ্গে বসিয়া সহাস্যে আলাপ করিতেছেন। ঠাকুরের ঘরের পূর্ব্ব দিকের বারাণ্ডায় সকলে বসিয়াছেন। মাষ্টার পৌঁছিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, প্রথমভাগ, মূল্য ১৲ টাকা, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলিতে শ্রীপ্রভাসচন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য।

কথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ—LEAVES FROM THE GOSPEL OF SRI RAMA KRISHNA শীঘ্র বাহির হইবে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীম—কে স্বামী বিবেকানন্দ এই নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন :—

Dehra Dhun
24th November 1897.

Letter I.

My dear M.,—

Many many thanks for your second pamphlet. It is indeed wonderful. The move is quite original and never the life of a great teacher was brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise, so fresh, so pointed, and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange is'nt it? our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted His life before—It has been reserved for you this great work. He is with you evidently. With all love and namaskar.

(Sd) VIVEKANANDA.

Socratic Dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Everybody likes it, here or in the West.

V.

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি এসেছ। (ভক্তদের প্রতি) লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাক্‌তে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু যে শালারা হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য গীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? নে এখন তোরা গা।

ভবনাথ ও তাহার বন্ধু কালীকৃষ্ণ গান গাইতে লাগিলেন।

গান।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।
সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম,
দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন সমাজ আজি স্তুতি করে, তোমারি।
নাহি চাহি ধন জন মান,
নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা ক'রে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ,
কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি।

ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বসিয়া এক মনে গান শুনিতে লাগিলেন। গান শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের মন শুষ্ক দীয়াশলাই, একবার ঘসিলেই উদ্দীপন। প্রাকৃত লোকের মন ভিজে দীয়াশলাইয়ের ন্যায়, যত ঘসো জ্বলে না—কেন না, মন বিষয়াসক্ত। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেন। কয়ৎক্ষণ পরে কালীকৃষ্ণ ভবনাথের কাণে কাণে কি বলিতে লাগিলেন।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন. ঠাকুর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাবে?

ভবনাথ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আজ্ঞা, কালীকৃষ্ণের একটু প্রয়োজন আছে, তাই যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি দরকার?

ভবনাথ। আজ্ঞা ও শ্রমজীবীদের শিক্ষালয়ে (Working men's Institute) যাবে।

(কালীকৃষ্ণের প্রস্থান।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওর কপালে নাই! আজ হরিনামে কত আনন্দ হবে দেখত! কিন্তু ওর কপালে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বা ৯টা। ঠাকুর আজ গঙ্গায় অবগাহন করিয়া স্নান করিলেন না—শরীর তত ভাল নয়। তাঁহার স্নান করিবার জল ঐ পূর্ব্বোক্ত বারাণ্ডায় কলসী করিয়া আনা হইল। ঠাকুর স্নান করিতে লাগিলেন, ভক্তেরা স্নান করাইয়া দিল। ঠাকুর স্নান করিতে করিতে বলিলেন, এক ঘটী জল আলাদা করে রেখে দে। শেষে ঐ ঘটীর জল মাথায় দিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বড় সাবধান, এক ঘটী জলের বেশী মাথায় দিলেন না।

স্নানান্তে মধুরকণ্ঠে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া ২।১টী ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া কালীবাড়ীর পাকা উঠানের মধ্য দিয়া মা-কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। মুখে অবিরত নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দৃষ্টি ফ্যালফেলে—পাখীর দৃষ্টি ডিমে যখন তা দেয়, যেরূপ হয়। মা কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম ও পূজা করিলেন। পূজার নিয়ম নাই—গন্ধ পুষ্প কখনও মায়ের চরণে দিতেছেন, কখনও বা নিজের মস্তকে ধারণ করিতেছেন! অবশেষে মায়ের

নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া ভবনাথকে বলিলেন 'ডাব্ নেরে। মাকালীর প্রসাদী ডাব।' আবার পাকা উঠানের পথ দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও ভবনাথ। ভবনাথের হাতে ডাব। রাস্তার ডান দিকে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির, ঠাকুর বলিতেন বিষ্ণু-ঘর। এই যুগল রূপ দর্শন করিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। আবার বাম পার্শ্বে দ্বাদশ শিব-মন্দির। সদাশিবকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুর এই বারে ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলেন, আরো ভক্তের সমাগম হইয়াছে। রাম, নি—, কেদার চাটুয্যে ইত্যাদি অনেকে আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিলেন।

ঠাকুর নি—কে দেখিয়া বলিলেন 'নি—কিছু খাবি?' নি—র তখন বালক ভাব। নি— বিবাহ করেন নাই, বয়স ২৩।২৪ হবে। সর্ব্বদাই ভাবরাজ্যে বাস করেন। ঠাকুরের কাছে কখন ও একাকী, কখন ও রামের সঙ্গে প্রায় আসেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নি—র ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে স্নেহ করেন। তাই তাঁহাকে গোপালের ন্যায় দেখিতেছেন।

নি—বলিলেন, "খাব"।

কথাগুলি ঠিক্ বালকের ন্যায়।

(সন্ন্যাসী ও নারী।)

খাওয়ার পর ঠাকুর গঙ্গার উপর ঘরের পশ্চিম ধারে গোল বারাণ্ডাটীতে নি—কে লইয়া চলিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

একটী স্ত্রীলোক পরম ভক্ত, বয়স ২২।২৩ হইবে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে প্রায় আসিতেন ও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। সেই স্ত্রীলোকটী ও নি—র অদ্ভুত ভাবাবস্থা দেখিয়া তাহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন ও তাঁহাকে প্রায়ই নিজের আলয় লইয়া যাইতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নি—র প্রতি) সেখানে তুই যাস্।

নি - (বালকের ন্যায়) হাঁ যাই। নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে সাধু সাবধান! এক আধ্ বার যাবি, বেশী যাস্‌নে—পড়ে যাবি। কামিনীকাঞ্চনই মায়া, সাধুর মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে

"ব্রহ্মাবিষ্ণু পড়ে খাচ্চে খাবি।"

নি—সমস্ত শুনিলেন।

একজন ভক্ত(স্বগত)। কি আশ্চর্য্য! নি—র পরমহংস অবস্থা, একথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। এমন উচ্চ অবস্থা সত্বেও কি ইঁহার বিপদ আছে! সাধুর পক্ষে ঠাকুর কি কঠিন নিয়মই করিলেন! সাধু মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করিলে পতন হইবার সম্ভাবনা। এই উচ্চ আদর্শ না থাকিলে জীবের উদ্ধারই বা কিরূপ হইবে? ইনি তো ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের সহিতও বেশী আনাগোনা করিতেছেন। তবুও ভয়! এখন বুঝিলাম, শ্রীচৈতন্য ছোট হরিদাসের উপর কেন অত কঠিন শাসন করিয়াছিলেন। হরিদাস একজন ভক্ত-বিধবার সহিত আলাপ করিয়াছিল। কিন্তু হরিদাস যে সন্ন্যাসী! তাই মহাপ্রভু তাকে ত্যাগ করিলেন! কি শাসন! সন্ন্যাসীর কি কঠিন নিয়ম। আর নি—র উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণের কি ভালবাসা! পাছে উত্তরকালে তাঁহার কোন বিপদ

হয়—তাই তাড়াতাড়ি তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিতেছেন!

মাষ্টার অবাক্ হইয়া 'সাধু সাবধান' এই মেঘগম্ভীর ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[সমাধি-মন্দিরে]

এইবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর-পূর্ব্ব বারাণ্ডায় আসিয়াছেন। ভক্তদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরবাসী একজন গৃহস্থও বসিয়াছিলেন। তিনি গৃহে বেদান্ত চর্চ্চা করেন। তিনি ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্য্যের সঙ্গে শব্দ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

(অবতারবাদ।)

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও Personal God)

দক্ষিণেশ্বর নিবাসী। এই অনাহত শব্দ সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে হচ্চে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু শব্দ হলে ত হবে না, শব্দের প্রতিপাদ্য একটী আছে। তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয়? তোমায় না দেখ্‌লে ষোল আনা আনন্দ হয় না।

দঃ নিবাসী। ঐ শব্দই ব্রহ্ম। ঐ অনাহত শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি) ওঃ বুঝেচ! এঁর ঋষিদের মত। ঋষিরা রামচন্দ্রকে বললেন, "হে রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমায় পূর্ণব্রহ্ম বলেন। তাঁরা তোমায় অবতার জেনে পূজা করুক। আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই"। রাম ঋষিদের এই সকল কথা শুনে হেসে চলে গেলেন।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়।)

কেদার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ঋষিরা রামকে অবতার জানেন নাই, তাঁ'হলে ঋষিরা বোকা ছিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ ([illegible]) [illegible] এমন কথা ব[illegible] [illegible]! যার যেমন রুচি। আবার যার [illegible] পেটে সয়। একটা [illegible] এনে মা ছেলে[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খাওয়ান; কারু[illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু সকলের পেটে পোলাও [illegible] [illegible] তাদের আবার মাছের ঝোল করে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের অম্বল, ভালবাসে। যার যেমন রুচি।

"ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। আবার ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন করবার জন্যে। তাঁকে দর্শন করলে মনের অন্ধকার দূরে যায়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শত সূর্য্যের যেন উদয় হল। তবে সভাসদ্ লোকেরা পুড়ে গেল না কেন? তার উত্তর:এই যে, তাঁর জ্যোতি জড় জ্যোতি নয়, সভাস্থ সকলের হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হ'ল। সূর্য্য উঠিলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ভক্তদের কাছে এই কথা বলিতেছিলেন। বলিতে বলিতেই একেবারে বাহ্যরাজ্য ছাড়িয়া মন অন্তর্ম্মুখ হইল। "হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল!" এই কথাটী উচ্চারণ করিতে না করিতে ঠাকুর একবারে সমাধিস্থ।

ঠাকুর সমাধি-মন্দিরে। ভগবান দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদপদ্ম কি প্রস্ফুটিত হইল! সেই এক ভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু বাহ্য জ্ঞান শূন্য। চিত্রাপিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমুখ উজ্জ্বল ও সহাস্য। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া অবাক হইয়া, একদৃষ্টে এই অদ্ভুত প্রেমরাজ্যের ছবি, এই

অদৃষ্টপূর্ব্ব সমাধি-চিত্র, সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া "রাম রাম" এই নাম বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নামের বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরিতে লাগিল। ঠাকুর উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগের প্রতি)। অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না—গোপনে আসে। দুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বার জন ঋষি কেবল জান্‌ত। তাই অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল "হে রাম, তোমাকে আমরা দশরথের ব্যাটা বলে জানি।"

"অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধর্‌তে পারে? কিন্তু নিত্যে*উঠে যে বিলাসের জন্যে লীলায় থাকে, তারই পাকা ভক্তি। বিলাতে Queen কে দেখে এলে, তখন Queen এর কথা Queen এর কার্য্য এ সকল বর্ণনা করা চলতে পারে। Queen এর কথা তখন বলা ঠিক্ ঠিক্ হয়। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলে ছিলেন "হে রাম তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুত তুমি মানুষ নও। তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে, তোমাকে মানুষের মতন দেখাচ্চে।' ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকাভক্তি।

ভক্তেরা এই অবতার তত্ত্ব অবাক হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! বেদোক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—যাঁহাকে বেদে বাক্যমনের অতীত বলা হইয়াছে, সেই পুরুষ আমাদের সাম্‌নে চোদ্দপোয়া মানুষ হইয়া আসেন! ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে কালে বলিতেছেন, সেকালে অবশ্য হইবে! যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে রাম, রাম করিয়া এই মহাপুরুষের কেন সমাধি হইবে। নিশ্চয়ই ইনি হৃদপদ্মে সেই রামরূপ দর্শন করিতেছিলেন!

দেখিতে দেখিতে কোন্নগর হইতে ভক্তেরা খোল করতালি লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোমোহন, নবাই, বিপিন ও অন্যান্য অনেকে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের কাছে সেই উত্তরপূর্ব্ব বারাণ্ডায় উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাহাদের সহিত সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি হইতে লাগিল। তখন আবার সংকীর্ত্তনের মধ্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই অবস্থায় ভক্তেরা তাঁহাকে পুষ্পমালা দিয়া সাজাইলেন। বড় বড় গোড়ে মালা। ভক্তেরা দেখিতে লাগিলেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। গভীর ভাবসমাধি নিমগ্ন। প্রভুর কখন অন্তর্দ্দশা—তখন জড়বৎ চিত্রার্পিতের ন্যায় বাহ্যশূন্য হইয়া পড়েন। কখন বা অর্দ্ধ বাহ্যদশা—তখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আবার কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় বাহ্যদশা তখন ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন করেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ দাঁড়াইয়া। গলায় মালা। পাছে পড়িয়া যান ভাবিয়া একজন ভক্ত তাঁহাকে ধরিয়া আছেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তেরা

*নিত্য—God, the Absolute.

দাঁড়াইয়া—ঠাকুরের দৃষ্টি স্থির। চন্দ্রবদন প্রেমানুরঞ্জিত। ঠাকুর পশ্চিমাস্য।

এই আনন্দমূর্ত্তি ভক্তেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন ক্রমশঃ।

রোমের পোপ।

ইদানীং পৃথিবীতে যত মঠ বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে রোমনগরীস্থ পোপ-মঠ অনেক বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। উক্ত মঠ ও তাহার মহান্ত সম্বন্ধে কিছু বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের চারিটী শঙ্কর-মঠের মহান্তগণ কম ধনী নহেন, কিন্তু পোপের অতুল ঐশ্বর্য্যের তুলনায় ইঁহাদের সম্পত্তি কিছুই নয় বলিলে চলে।

কাথলিক-খ্রীষ্টান-জগতের পরমগুরুর যেরূপ বিপুল বিভব, তাঁহার উপাধিসমষ্টিও তদুপযুক্ত ঃ—

Vicar of Jesus Christ ; successor of the Apostles ; Sovereign Pontiff of the Church Universal ; Archbishop and Metropolitan of the Roman Province ; Primate of Italy ; Patriarch of the West ; Supreme Governor of the whole Catholic Church of whom the whole World is the territory or diocese ; Sovereign of all the temporal good of the Church.

অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের প্রতিনিধি—ধর্ম্মোপদেশক ; খ্রীষ্টের অনুচর প্রেরিতবর্গের ক্রমবর্ত্তী উত্তরাধিকারী ; সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিনায়ক ; রোমীয় প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক ; ইটালীদেশের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ; পাশ্চাত্য-জগতের ধর্ম্মপতি ; কাথলিক-ধর্ম্মের প্রধান শাসক, যাঁহার এলাকা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ; এবং কাথলিক-চার্চ্চের সমস্ত ঐহিক সম্পত্তির একমাত্র অধীশ্বর—প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টান সম্প্রদায় পোপের উপর বড়ই নারাজ ঃ—কোন সময় ঐ দলের এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, গোসাপের হুল যেমন পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত, স্ত্রীলোকের পত্রের "পুনশ্চ নিবেদন" যেমন আসল-মতলবের কথা, পোপ মহাপ্রভুর উপাধিরাশির শেষটী তেমনই জানিতে হইবে ; অর্থাৎ ধর্ম্মযাজনকার্য্যে যত মনোযোগ থাকুক আর নাই থাকুক, ধনসম্পত্তির প্রতি নজরটা কিছু বেশী পরিমাণে তীক্ষ্ণ। পরন্তু যিনি যাহাই বলুন, ইহা স্বীকার করিতে সবাই বাধ্য যে, সভ্যজগতের বিশ কোটী নরনারী আজ পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বোধে পূজা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা করে না ; এবং তন্মধ্যে বিস্তর পণ্ডিত, জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু, মহাত্মাও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত গুরুভক্তি রোমান-কাথলিক-দিগের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রটেষ্টাণ্টগণ ভক্তিশ্রদ্ধার বড় ধার ধারেন না ; একারণ ইঁহাদের মধ্যে সহস্র দল বর্ত্তমান থাকা সত্বেও নব নব আজগুবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এখনও বন্ধ হয় নাই। নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে রোমান কাথলিক-ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে লোপ পাইলে তৎসঙ্গে সংসারের একখানি প্রকাণ্ড, সুকোমল, সরস ছবি ধর্ম্মজগৎ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। কত স্তরের কত শ্রেণীর জীব—যাহারা পোপ-ধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়ায় শান্তিলাভ করতঃ ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছে, নীরস কাঠ-খোট্টা প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় কি দিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা প্রশমিত করিতে পারেন ? বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, সেবা, বৈরাগ্য প্রভৃতির যে

ভাবে প্রস্তুত বটিকা দ্বারা তাহাদের ভব-ব্যাধির উপশম হইতেছে, তাহার প্রকরণ-প্রণালী, ব্যবস্থাদির বার্ত্তা আজও প্রটেষ্টাণ্টগণের কর্ণগোচর হয় নাই।

কথিত আছে, দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকদৃষ্টি সম্বন্ধে পিতরকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যীশু সর্ব্বদা উল্লেখ করিতেন। তজ্জন্য এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করিবেন; স্বর্গদ্বারের চাবিও পিতরের জিম্মায় দেওয়া হয়। ঐ সকল কারণে মহাত্মা পিতরের গদি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ বলিয়া প্রশংসিত; সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগত প্রাধান্য আবহমানকাল তাঁহার উত্তরাধিকারীবর্গের প্রতি বর্ত্তিয়া আসিতেছে।

খ্রীষ্টের ক্রুশারোহণের পর, তদীয় বিধানানুসারে পল সমভিব্যাহারে পিতর তৎকালিক সভ্যজগতের কেন্দ্রস্থল রোমনগরে আগমন করতঃ তথায় উপাসনামন্দির ও মঠ স্থাপনানন্তর পঁচিশ বৎসরকাল তাহার মহান্তগিরি সম্ভোগ করেন। বলা বাহুল্য যে, পিতর সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী ছিলেন; অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা অন্যায় জানিয়া শিবির নির্ম্মাণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একালের মহান্তদিগের ভোগ বিলাসৈশ্বর্য্যের ছায়াও তাঁহা হইতে শত যোজন দূরে অবস্থিতি করিত।

৬৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টবিদ্বেষী, ঘোর অত্যাচারী, দুর্দ্দান্ত সম্রাট নিরোর * আদেশে পিতর ও পল † একই দিনে নিহত হন। অতি নৃসংশ ব্যবস্থা দ্বারা পিতরের প্রাণ লওয়া হইল, কিন্তু তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভজনালয় ও মঠের কোন প্রকার ক্ষতি হইল না। তাঁহার পরবর্ত্তী আরও কয়েকজন মহান্তকে ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য জীবনবিসর্জ্জন করিতে হয়, তত্রাচ বিধাতার কৃপায় তৎপ্রতিষ্ঠিত গস্তব্যবস্থান উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করতঃ এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। পিতরের পরে এবং বর্ত্তমান পোপের পূর্ব্বে দুই শত বাটী জন পোপ ক্রমান্বয়ে মহান্তের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। (১)

অন্যান্য সম্পত্তি ব্যতীত পোপগণ বহুকাল পর্য্যন্ত রোমনগরের চতুর্দ্দিকে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যও শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সমগ্র ইটালী সেভয় প্রদেশাধিপতি ভিক্টর ইমানুয়েলের (২) অধীনে আনীত হয়, সেই সময়ে পোপ নবম পায়সের (৩) হস্ত হইতে উহা চলিয়া যায়। রাজত্বকালে ইউরোপের অন্যান্য নৃপতিগণের সঙ্গে পোপের রাজোচিত মর্য্যাদাও সমান ছিল। সে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য সৈন্য সামন্ত, সাজসরঞ্জামেরও কোনরূপ ত্রুটি দেখা যাইত না; রাজ্যচ্যুত হওয়ায় একপ্রকার ঢোঁড়া হইয়া বসিয়া আছেন।

পোপের ভজনালয় সেণ্টপিটর গির্জ্জার (৪)

---

* Nero. † Apostles Peter and Paul.

(১) পোপত্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, সমস্তই রোমান কাথলিকদের কথা; প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাচার্য্যগণ উহার এক বর্ণও বিশ্বাস করিতে চাহেন না। উপরন্তু কেহ কেহ এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন যে, পিতর আদৌ রোমেই আসেন নাই। একথা অন্যায়, যেহেতু আধুনিক নিরপেক্ষ গবেষক পণ্ডিতগণ নানারূপ প্রমাণ দৃষ্টে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পিতর রোমে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে তথায় ক্রুশাহত হইয়া তনু ত্যাগ করেন। প্রটেষ্টাণ্টদলভুক্ত অনেক ঐতিহাসিক ইতিপূর্ব্বেও এইরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

(২) Victor Emmanuel II. Prince of Savoy.

(৩) Pius IX.

(৪) বর্ত্তমান হর্ম্ম্য ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল

যথাযথ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য; কয়েক শতাব্দীর পরিশ্রম ও অর্থ দ্বারা উহা বর্ত্তমান বিভবে পরিণত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ঐরূপ মূল্যবান বিরাট ব্যাপার পৃথিবীর অন্য কোথাও নয়নগোচর হয় না। অধিক কি, পূর্ব্ববর্ত্তী পোপ প্রভৃতি মহাত্মাদের যে বিশটী সমাধি উহার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রত্যেকটীতে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে! তদ্ব্যতীত কত বেদী, উপাসনা-প্রকোষ্ঠ, পাপস্বীকারের স্থান, মূরত প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তন্মধ্যে গোলক-ধাঁধার মত অনেককে পথ হারাইতে হয়।*

পোপের বাসভবন "ভাটিকানকে" একটী প্রাসাদ বলিলে দোষ হয়, কারণ উহা ভিন্ন প্রবাদ ভিন্ন কালের নির্ম্মিত অনেকগুলি প্রাসাদের একত্র সমাবেশ। তথায় বিশটী মহল আছে, যাহাতে যাতায়াত জন্য দুই শত আটটী সোপানাবলী প্রস্তুত। অনেকে বলেন, উহার মধ্যে একাদশ সহস্র প্রকোষ্ঠ আছে। কোন পোপ যে সমস্ত ঘরগুলি দেখিয়াছেন, এরূপ সম্ভব হয় না। প্রাসাদান্তর্গত পুস্তকাগারের কথা বলিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ব্যাপারখানা কি! উহাতে লক্ষাধিক মুদ্রিত পুস্তক এবং অতি প্রাচীন সাতাইশ হাজার হস্তলিপি সংগৃহীত—ইউরোপ আসিয়ার সকল জাতির, সকল কালের গ্রন্থ সমূহ তথায় একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভাটিকান-প্রাসাদে অন্যান্য প্রকারের অনেক ব্যাপার আছে—যাহা পৃথিবীর মধ্যে দেখিবার যোগ্য, যথা চিত্রশালা, কয়েকটী মিউজিয়ম, কতকগুলি সুসজ্জিত হল্‌ প্রভৃতি।

বর্ত্তমান পোপের নাম ত্রয়োদশ লিও*;

...নে আরম্ভ হইয়া তেতাল্লিশ জন পোপের রাজত্ব কালব্যাপী তিন শত বৎসরে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। অর্থব্যয় সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি একবার হিসাব হয়। তখন দেখা গিয়াছিল, প্রায় দুই কোটী টাকা খরচ হইয়াছে। তদনন্তর এই সার্দ্ধ তিন শতাব্দীতে আরও কত অর্থ উহাতে ঢালা হইয়াছে, পাঠক ভাবিয়া দেখুন।

* কয়েকটী পর্য্যটকের কথা তুলিয়া দিতেছি। ভিতরের কথা থাকুক, সম্মুখস্থ বহিঃপ্রাঙ্গণের চারি দিকে যে বৃত্তাকার স্তম্ভশ্রেণী দণ্ডায়মান, তৎসম্বন্ধে ওয়ে সাহেব বলিতেছেন:—

"These two hundred and eighty-four colums, which are strong enough to support the palaces of Semiramis, support nothing at all, they are placed there for show; they are the feet of two banqueting tables set for a congress of giants, on which are drawn up in a row ninety-six statues of between three and four yards." —Francis Wey—

২৮৪টা বিশাল সম্ভ দ্বারা রক্ষিত ছাদের উপর, তিন হইতে চারি গজ প্রমাণ ৯৬টী মূরত বিরাজ করিতেছে। কেবলমাত্র শোভার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে এই বিরাট স্থপতিকার্য্য!

ভিতরকার ব্যাপার সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কয় জন পরিদর্শকের মন্তব্য যথেষ্ট অনুমিত হইবে।

"The building of St. Peter's surpasses all powers of description. It appears to me like some great work of nature, a forest, a mass of rocks, or something similar; for I never can realize the idea that it is the work of man, you strive to distinguish the ceiling as little as the canopy of heaven, you lose your way in st Peter's; you take a walk in it, and ramble till you are quite tired".

Mendelssohn.

"The interior burst upon are astonished gaze, resplendent in light, magnificence and beauty, beyond all that imagination can conceive".—C. Eaton

"St. Peter's, that glorious temple, the largest and most beautiful, it is said, in the world, produced upon me the impression rather of a Christian Panthem than of a Christian Church. The asthetic intellect is edified move than the God-loving or God-seeking soul".—

Frederika Bremer

* Leo XIII.

সাংসারিক নাম ছিল পেচ্চি (১) ইনি একজন ইটালীর কাউন্টের (২) পুত্র। ইঁহার বয়স এখন ৯৩ বৎসর। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ডিনাল (৩) পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পোপের গদিতে অভিষিক্ত হন। সম্রাট্, রাজা, জমীদার প্রভৃতি বড়লোকেরা ইঁহাকে এপর্য্যন্ত যত উপঢৌকনাদি (৪) প্রদান করিয়াছেন, তাহার মূল্য তিন কোটী টাকার কম হইবে না। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাত শত যজমান ন্যূনাধিক দেড় কোটী টাকার সম্পত্তি উইল করিয়া গিয়াছেন। (৫)

আমাদের দেশের গদীয়ান মহান্তগণ কি প্রকারে দিনাতিপাত করেন, তাহা সকলেই অবগত, পোপ ত্রয়োদশ লিও কিন্তু সে শ্রেণীর লোক নহেন। অতি বৃদ্ধ হইলেও কাজকর্ম্ম নিয়মিতরূপে করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ভোর ৪টার সময় উঠিতেন, অসুস্থতা বশতঃ আজকাল ৬ টার পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতে পারেন না। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর কাফি ও দুগ্ধপানান্তে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কাগজপত্র পাঠ করেন। বেলা ৮ টার সময় প্রাসাদের কর্ম্মচারিগণ গতরাত্রির রিপোর্ট দিতে আইসেন, তদনন্তর ধর্ম্মরাজ্যের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধীয় উপদেশ লইবার জন্য প্রধান কার্ডিনাল উপস্থিত হন। ১০টা বাজিলে প্রধান ধর্ম্মযাজকগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রাসাদান্তর্গত সুসজ্জিত উদ্যানে কিছুক্ষণ বিচরণান্তে বিদেশ হইতে আগত বিশপ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্ণ ২টার সময়, ভোজনান্তে ৪টা ৪॥ টা পর্য্যন্ত নিদ্রা দেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইবা মাত্র বিদেশীয় সংবাদপত্র সমূহ উপস্থিত করা হয়, সেগুলি কখন নিজেই পড়েন, কখন পড়িয়া শুনাইতে হয়। তার পর কার্ডিনালদের রিপোর্ট শ্রবণান্তে তৃতীয়বার কাগজ পত্র দস্তখত করেন (তৎপূর্ব্বে অন্য কার্য্যের মধ্যে দুইবার কাগজাদি দস্তখত হইয়া থাকে)। অবশেষে রাত্রি ৯টার সময় সামান্য নিশি-ভোজন সমাপনান্তে শয়ন করেন।

শারীরিক অবস্থা এবয়সে এরূপ মেহনতে ভাল হইতেই পারে না। মধ্যে মধ্যে এতদূর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় যে, ঘন ঘন মূর্চ্ছা গিয়া থাকেন, তখন চারিদিক হইতে চিকিৎসকগণ ছুটিয়া আসেন। একদা

(১) Vincent Joachim Pecci.
(২) Count Ludovico Pecci.
(৩) Cardinal.
(৪) তন্মধ্যে মণিমুক্তাখচিত ২৮টী স্বর্ণমুকুট (tiara) এবং ৩০০ স্বর্ণ ক্রশ আছে।

(৫) ইটালির অনেক বিকট উন্নতিশীল মহাপ্রভু পোপের উপর এত বিরক্ত যে, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত দেখিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট নন, তাঁহাদের ইচ্ছা, উনি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হউন। ইটালির নবপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিও সময়ে সময়ে উঁহাকে পার্শ্বস্থিত কণ্টকবোধে কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। পরন্তু ইঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, এরূপ উপার্জ্জনক্ষম পুত্রকে ক্রোড় হইতে ফেলিয়া দিলে ইটালির সমূহ ক্ষতি বই কোনই লাভ নাই। নানা দিগ্দেশ হইতে যে বিপুল অর্থ নিয়ত পোপের দরবারে আসিতেছে, তাহা বন্ধ করিলে বিশেষ অনিষ্টেরই কথা। শুনিতে পাওয়া যায়, কোন সময় ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কেহ কেহ পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, "ইউরোপের সিক্‌ম্যান" কে ইউরোপভূমি হইতে সরাইয়া তৎস্থানে পোপকে স্থাপিত করা হউক; তাহা হইলে কাহারও কোন আপত্তি করিবার কারণ থাকিবে না। কিন্তু পোপ তাহাতে কেন রাজী হইবেন? পিতরের গদি ত্যাগ করিয়া তিনি যাইবেন কেন?

এরূপ সময়ে অনেক বড় ডাক্তার কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করায় মহাত্মা লিও হাসিয়া বলেন, "তাহা হইলে পোপের সিংহাসন শূন্য হইবে। আমার পদের লোককে মৃত্যুর প্রবল আক্রমণ পর্য্যন্ত যথোচিত পরিশ্রম করিতেই হইবে, ইহাই ব্যবস্থা।" লিও একজন পণ্ডিত, বহু ভাষাতে ইঁহার উত্তম দখল আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

একা।

কুঞ্চিত ললাটদেশ, কপোলে, অধরে
নিরাশার ভাষা লেখা দুর্ব্বোধ আখরে;

অবসাদে আঁখি দুটী সদা ছল ছল,
দুনয়নে ভরে আছে ক্লান্তির কজ্জল;

শঙ্কা ছাড়া কাছে নাই অন্য সহচর,
সেও ত শ্রবণে ঢালে ভয়ের মন্তর,
কাঠিন্যে নিখিল বিশ্ব, গিয়াছে ভরিয়া,
শূল হস্তে নির্দ্দয়তা শিরে দাঁড়াইয়া,
পশে কাণে অট্ট হাসি, তাণ্ডবের তান
প্রলয় দামামা কাড়া ঝর্ঝরের শ্বান,
লাবণী-কোমল চেতা—মধুর মরণ
দূর হ'তে দূরে যায় মুদিয়া নয়ন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

শঙ্করাচার্য্য ও সমন্বয়ভাষ্য। (২)

বেদের দুইটী অংশ বড়ই প্রসিদ্ধ। একটী কর্ম্মকাণ্ড, অন্যটী জ্ঞানকাণ্ড;—একথা সকলেই অবগত আছেন। শঙ্করাচার্য্য যেখানেই "কর্ম্ম" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই তিনি এই সকাম বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপকেই "কর্ম্ম" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, ইহা আমরা এই প্রবন্ধের বিগত সংখ্যায় বলিয়াছি। শঙ্করের চির-পোষিত মত এই যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মের কামনাই লক্ষ্যস্থল বলিয়া, ইহা দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে না; একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু। ব্রহ্মপ্রাপ্তির অন্যতর পন্থা নাই। আরো একটী কথা আছে। যেখানেই শঙ্কর "মুক্তি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই স্থলেই তিনি নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, চরমব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তিকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা মুক্তিলাভে কেবল জ্ঞানেরই অধিকার। এই জন্যই তিনি এরূপ মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের প্রবেশ নিষেধ করিয়াছেন, এবং মুক্তি যে কেবল জ্ঞানেরই ফল, কর্ম্মের ফল নহে,—এ কথা আয়াসপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য, উপাসনা, ধ্যানাদি কর্ম্মকে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথাশ্রুত অর্থকারী ব্যক্তি সকল, শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের প্রবেশ নিষেধ করিয়াছেন দেখিয়া, আপাতঃ মনে করিয়া লন যে, বুঝি শঙ্কর ব্রহ্মসাধনে নিষ্কামকর্ম্মেরও নিষেধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শঙ্কর তাহা করেন নাই। গৃহী যে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে অধিকারী নহে, শঙ্করের তাৎপর্য্য তাহা নহে। কেবল যজ্ঞশীল, কাম্যকর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থের মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে

অধিকার নাই। কিন্তু যে গৃহী উপাসনাদি নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতেছেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞান জন্মিবে, এবং একবার এইরূপে জ্ঞান জন্মিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ ঘটিবে; সে অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্মেরও আর প্রবেশাধিকার নাই। কথাটা এই যে, শঙ্করাচার্য্য গৃহীকে সকাম যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতে একেবারে নিষেধ করিয়াছেন, কেন না, তাহাতে ব্রহ্ম লক্ষ্য হয় না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানার্থী গৃহী যদি উপাসনাদি নিষ্কামকর্ম্ম করিতে থাকেন, তবে ক্রমে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান যত পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, ততই চিত্তশুদ্ধি হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞান জন্মিল। জ্ঞান জন্মিবামাত্রই মুক্তি। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে বা মুক্তিতে নিষ্কাম কর্ম্মেরও আর প্রবেশাধিকার নাই, কেন না, তখন জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে। যখন গৃহীর এইরূপ চরম ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিল, তখন সে গৃহীতে ও পরিব্রাজকেতে কোনও পার্থক্য থাকে না। এই কথাই আমরা পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য-ভাষ্য হইতে দেখাইয়াছি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটী সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে। আমরা পাঠককে সেই স্থলটী দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। শঙ্করের তাৎপর্য্য ও মনের অভিপ্রায় এই ভাষ্যটীতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থলটী দেখিলে, আর এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না যে, শঙ্কর গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। স্থলটী বৃহদারণ্যকের পঞ্চম প্রপাঠকের তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্য। প্রথমতঃ বৈদিক সকাম কর্ম্মদ্বারা যে মোক্ষ বা নির্গুণ ব্রহ্মলাভ হইতে পারে না, ইহা দেখাইয়া শঙ্কর দেখাইতেছেন যে, নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারাও সেই চরম, অদ্বয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে না; কেবল জ্ঞান দ্বারাই এরূপ ব্রহ্ম বা মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব। অর্থাৎ উপরে আমরা শঙ্করের অভিপ্রায় যেরূপ বিবৃত করিয়া আসিলাম, চরমব্রহ্মজ্ঞানে সকাম বা নিষ্কাম কোনওরূপ কর্ম্মেরই প্রবেশ নাই। নিষ্কামকর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই কেন? শঙ্কর বলেন—

"অনারভ্যত্বান্মোক্ষস্য"।

মোক্ষ ত আর 'কার্য্য' নহে যে, কোনও সাধন দ্বারা তাহা লাভ করা যাইবে। পাঠক ভাষ্যের এই স্থলটী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। মোক্ষকে একবারে চরমব্রহ্ম জ্ঞানরূপে ধরিয়া লইয়া, শঙ্কর বিচারের প্রথম অংশে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জ্ঞানেরই একমাত্র ফল মোক্ষ। নিষ্কামকর্ম্মের ফল মোক্ষ হইতে পারে না। তবে নিষ্কামকর্ম্মের ফলে কি হয়? নিষ্কাম কর্ম্মের আচরণে "চিত্তশুদ্ধি" জন্মে। চিত্তশুদ্ধি হইলে কি হয়? চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞান জন্মিল, অমনি মুক্তি উপস্থিত হইল। অতএব নিষ্কামকর্ম্ম শঙ্করের মতে মুক্তির গৌণ কারণ হইতেছে। ইহার পরেই শঙ্কর দেখাইতেছেন যে, নিষ্কামকর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। অতএব, চিত্তশুদ্ধি যদি নিষ্কাম কর্ম্মের ফল হইল, এবং চিত্তশুদ্ধি হইলেই যদি জ্ঞান লাভ হয়, তবে গৃহীর নিষ্কামকর্ম্ম করিবার অধিকার থাকিল কি না? যদি থাকিল, তবে আর গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই এ কথা আইসে কিরূপে? আমরা শঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি:—

"নিরভিসন্ধে কর্ম্মণো বিদ্যাসংযুক্তস্য বিশিষ্ট কার্য্যান্তরারম্ভে ন কশ্চিৎ বিরোধঃ"।

যে কর্ম্মে কোন অভিসন্ধি নাই, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের আচরণে যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি না হউক্, তথাপি তদ্দ্বারা বিশিষ্ট একটী ফল পাওয়া যায়। সে ফলটী কি?

"আত্মসংস্কারার্থং নিত্যানি কর্ম্মাণি করোতি"।

আত্মসংস্কারই তাহার ফল। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে, চিত্ত সংস্কৃত হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে কি হয়? শঙ্কর বলেন:—

"সংস্কৃতশ্চ য আত্মযাজী তৈঃ কর্ম্মভিঃ সমং দ্রষ্টুং সমর্থো ভবতি। অস্যেহ বা জন্মান্তরে বা সমং আত্মদর্শনং উৎপদ্যতে।" ("সো হি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী সদনুষ্ঠানজনিতাপূর্ব্ববশাৎ পরিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সম্যক্‌ধীযুক্তো ভবতি"—আনন্দগিরি-টীকা)।

এইরূপে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; চিত্তশুদ্ধি হইলেই আত্মদর্শন উপস্থিত হয়।

"জ্ঞানযুক্তানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানোৎপত্তি-সাধনত্বপ্রদর্শনার্থং"।

অতএব নিষ্কামকর্ম্মে জ্ঞানোৎপত্তি হয় সুতরাং, যদিও জ্ঞানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির হেতু, তথাপি নিষ্কামকর্ম্ম যে গৌণভাবে মুক্তির হেতু, তাহা উত্তম বুঝা যাইতেছে। আনন্দগিরিও এইস্থলে তাহাই বলিতেছেন:—

"কর্ম্মভিঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ শ্রবণাদিবশাদৈক্যজ্ঞানং মুক্তিফলমুদেতি"।

এই স্থলেই, কিছুপরে শঙ্কর ইহা অপেক্ষাও অতি স্পষ্টতর ভাবে এ কথার মীমাংসা করিয়াছেন যথা:—

"যেষাং পুনর্নিত্যানি নিরভিসন্ধীনি "আত্মসংস্কারার্থনি" ক্রিয়ন্তে, তেষাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানি তানি। তেষাং উপকারকত্বাৎ মোক্ষসাধনান্যপি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি ন বিরুধ্যতে"।

অর্থাৎ যাঁহারা উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি হয় বলিয়া, সেই নিষ্কামকর্ম্মই মোক্ষের সাধন স্বরূপ।

পাঠক এই স্থলে একটী কথা দেখিবেন। শঙ্কর এই বিচারের প্রথমাংশেই একটা আপত্তি করিয়াছিলেন যে, মোক্ষসাধ্য বা "সংস্কারার্হ" নহে; সুতরাং উহার কোন প্রকার "সাধন" নাই। আবার এই স্থলে সেই শঙ্করই বলিতেছেন যে, "মোক্ষসাধনান্যপি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি ন বিরুধ্যতে"। অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মই মোক্ষের "সাধন"। এ কিরূপ কথা হইল? কিন্তু পাঠক, আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে। তাহা স্মরণ থাকিলে আর শঙ্করকে Inconsistent বা বিরোধী-সিদ্ধান্তকারী বলিয়া বলিতে পারিবেন না। যে স্থলে শঙ্কর মোক্ষকে একেবারে চরমব্রহ্মজ্ঞানরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই স্থলেই সেই মোক্ষের কোন সংস্কার হইতে পারে না,—উহার কোন সাধন নাই,—এই কথা বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্য এই যে, যখন চরমব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে, তখন আবার নিষ্কামকর্ম্ম কিসের? তখন কোনওরূপ কর্ম্মের তথায় প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্তু এ কথার ইহা অর্থ নহে যে, যদি ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মমাত্রেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল, তবে বুঝি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনেও নিষ্কামকর্ম্ম নিষিদ্ধ। আমরা প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, নিষ্কামকর্ম্মের আচরণ-মোক্ষের গৌণসাধন, কেন না, উহাতে আত্মার "সংস্কার" হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, নিষ্কামকর্ম্মের আচরণই গৃহীর কর্ত্তব্য। শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় এইরূপ কি না, পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই দিকে লক্ষ্য রাখিলেই, শঙ্করের "তস্মাৎ

মোক্ষার্থানি কর্ম্মানীতি সিদ্ধং” এ কথারও তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে।

অনেকে, এই তাৎপর্য্যের দিকে লক্ষ্য না রাখাতেই, যথাশ্রুত অর্থ করিয়া মনে করিয়া লন যে, ব্রহ্মজ্ঞানকে শঙ্কর কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এবং গৃহীর যখন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার নিবৃত্ত হয় না, তখন গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞানে আদৌ অধিকার নাই। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয়ও এই মহাভ্রমে পড়িয়াছেন।

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় “বেদান্ত পরিভাষার” যে মত দেখাইয়াছি, শঙ্করেরও মত তাহাই। গৃহী, নিষ্কামভাবে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহাকে কাম্য-বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং নিষ্কাম উপাসনাদি কর্ম্মের আচরণ করিতেই হইবে। এইরূপ আচরণ-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, তাঁহার তখন চরম-ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে। একথা শঙ্কর কেবল এস্থলে নহে, অতি স্পষ্টভাষায় তিনি ইহা বৃহদারণ্যকে জনকাখ্যায়িকাতেও বলিয়াছেন। সে স্থলটী এই :—

“যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি”। “যজ্ঞো দানং তপশ্চ পাবনানি মনীষিণাং। দ্রব্যযজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ সংস্কারার্থাঃ। সংস্কৃতস্য জ্ঞানোৎপত্তিরপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যত্যতো যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি। দানমপি পাপক্ষয়ত্বাৎ ধর্ম্ম-বৃদ্ধিহেতুত্বাচ্চ”।

পাঠক এ স্থলে দেখিবেন, যজ্ঞকে (নিষ্কামভাবে আচরিত) পর্য্যন্ত চিত্তসংস্কারক রূপে শঙ্কর বলিয়াছেন। আবার :—

“এবং কাম্যবর্জ্জিতং নিত্যং কর্ম্মজাতং সর্ব্বং আত্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ মোক্ষসাধনত্বং প্রতিপদ্যতে এবং কর্ম্মকাণ্ডেনাস্য একবাক্যতাবগতিঃ”।

এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ করিতে করিতে গৃহী “মুনি” হইয়া যান। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয় লক্ষ্য থাকিলে “কর্ম্মী” হইতে পারে বটে, কিন্তু যাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষ্য কেবল ব্রহ্মই, সে ব্যক্তি “মুনি” হইয়া যান।

“ঔপনিষদং পুরুষং বিদিত্বা মুনিরেব স্যাৎ, নতু কর্ম্মী”।

কথাটা এই যে, নিষ্কামকর্ম্মের যদি ব্রহ্মই লক্ষ্য হন, তবে তাহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ না ঘটিয়া পারে না। নিত্যকর্ম্মগুলি ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তির অভিসন্ধি করিয়াও, করা যাইতে পারে; কেবল এইরূপ অভিসন্ধি থাকিলে, সাধক “মুনি” হইতে পারে না। আমরা উপরে যে ভাষ্যবিচারের কথা বলিয়াছি, তাহাতেই সে কথা স্পষ্ট আছে। সে স্থলে শঙ্কর বলিতেছেন যে,—

“সাভিসন্ধীনাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং ব্রহ্মত্বাদীনি ফলানি। যেষাং পুর্নিত্যানি নিরভিসন্ধীনি আত্মনাং সংস্কারার্থানি ক্রিয়ন্তে, তেষাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানি তানি”।

অতএব যে নিষ্কামকর্ম্মের ব্রহ্মই লক্ষ্য তাহার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না।

অতএব এস্থলে যে উপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, “মুনির্ভবতি” এই ভাষ্যাংশের পরের অংশগুলি উদ্ধৃত করিলেই, উপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণিত হইত,—একথা উপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ ভুল। ভাষ্য হইতে আমরা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু পাঠক দেখিবেন, যাহাতে আগাগোড়া অর্থ ও অভিপ্রায় ঠিক্ থাকে, সেইরূপ ভাবেই আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। এবং যেরূপ অর্থ

আমরা করিয়াছি, যদি উপাধ্যায় মহাশয় তাহার "বিরোধী" কোন অংশ ভাষ্য হইতে দেখাইতে পারেন, তবে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

পরিশেষে আমরা আর একটী মাত্র কথা বলিয়া এই গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। উপাধ্যায় মহাশয় গীতাভাষ্যে যাহা বলেন নাই, এবারে সেই রূপ একটী নূতন কথা বলিতেছেন। গীতাভাষ্যে তিনি শঙ্করকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, ইহা আমরা পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় এখন বলিতেছেন যে, "শঙ্কর সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানে গৃহীর অধিকার দিয়াছেন; নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানে অধিকার দেন নাই।" উপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয়, আমাদের প্রতিবাদের প্ররোচনায় অনন্যোপায় হইয়াই এখন এই নূতন কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। নতুবা তাঁহার গীতাভাষ্যে তিনি এরূপ কথা বলেন নাই। কিন্তু একথা বলাতেও শঙ্করের উপরে আর একটী দোষ আসিয়া পড়িতেছে। উপাধ্যায় মহাশয়ের এখনকার কথায় বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ করিয়া ব্রহ্মধ্যান করা গীতার অভিপ্রায় নহে; অথচ শঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে সমস্ত কর্ম্মত্যাগেরই বিধি দিয়াছেন; অতএব শঙ্কর গীতার ব্রহ্মকে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েই আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; গৃহীর তাহাতে অধিকার নাই। উপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন কথাটীর তাৎপর্য্য এই। কিন্তু আমরা উপাধ্যায় মহাশয়ের এ সিদ্ধান্তের সহিতও একমত হইতে পারিতেছি না। শঙ্কর এরূপ সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম-ধ্যানের বিভেদ গৃহীর পক্ষে করেন নাই। শঙ্করের সর্ব্বস্থলেই অভিপ্রায় এই যে, গৃহী যদি ব্রহ্মধ্যান করিতে চান (সগুণই হউক্ বা নির্গুণই হউক্), তবে তাঁহাকে কাম্যকর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। কেবল তাঁহাকে উপাসনাদি নিষ্কামকর্ম্ম করিতে হইবে। এবং এইরূপে যখন গৃহীর চরম ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে, তখন সে গৃহী ও পরিব্রাজক একই কথা। সে অবস্থায় সেই নিষ্কাম-কর্ম্মও থাকিবে না, সুতরাং "ব্রহ্মসংস্থতা" জন্মিবে। আমাদের মতে, শঙ্করের ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে না। এখন দেখা যাউক, উপাধ্যায় মহাশয় যে এখন এই নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই বা কতদূর সঙ্গত।

উপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে, শঙ্কর, অন্য আশ্রমের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ প্রত্যবায়-সাধক বলিয়া, তত্তদাশ্রমস্থ ব্যক্তির "ব্রহ্ম-সংস্থতা" হইতে পারে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই নাকি কুল্লূক ভট্টের সিদ্ধান্তও, শঙ্করের সিদ্ধান্তের বিরোধী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, শঙ্কর কুল্লূকের বিরোধী সিদ্ধান্ত করেন নাই। "গৃহীর স্বাশ্রমানুষ্ঠিত কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়',—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, যে গৃহী কাম্যযজ্ঞাদিপরায়ণ, কেবল তাহারই সেই যজ্ঞাদি পরিত্যাগে প্রত্যবায় হয়; কেন না, তাহার তাহাতেই অধিকার। নতুবা যে গৃহী কাম্যযজ্ঞাদি না করিয়া, কেবল ব্রহ্মপ্রার্থী হইয়া নিষ্কামকর্ম্ম করিতেছেন, সে গৃহীর এরূপ প্রত্যবায় হইতে পারে না। পাঠক বৃহদারণ্যক ভাষ্যের একটী স্থল দেখুন :—

"কাম প্রতিষেধাৎ কাম্য প্রবৃত্তিনিরোধবৎ অদোষাৎ" (৬।৪।১২)।

এস্থলে আনন্দগিরির টীকা এই :—

"যথা ন কামী স্যাদিতি নিষেধাৎ "কস্যচিৎ" কামপ্রবৃত্তির্ভবতীতি এতাবতা ন "সর্ব্বান্" প্রতি কাম্যবিধি নিরুধ্যতে, তথা কস্যচিদাত্মজ্ঞানাৎ কর্ম্মবিধিনিরোধেঽপি ন সর্ব্বান্ প্রত্যসৌ নিরুদ্ধো ভবিষ্যতীতি পরিহরতি'।"

এস্থলে শঙ্করোক্তির তাৎপর্য্যটী বড়ই চমৎকার। এই ভাষ্যটী কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগ দেখাইবার জন্য লিখিত হইয়াছে। একটী পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্কর যাহা এস্থলে বলিয়াছেন, তাহাতেই গৃহী সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় আমরা পাইতেছি। তাঁহার এ স্থলের উত্তর হইতে আমরা পাইতেছি যে, সকল গৃহীই যে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিবে, তাহা নহে। যে সকল গৃহী কাম্যকর্ম্মের দোষ অবগত আছেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি না করিতেই অধিকারী। আমরা বুঝিতেছি যে, শঙ্করের অভিপ্রায় ও মত এই ছিল যে, যে গৃহী কাম্যকর্ম্মের দোষ অবগত আছেন, কাম্যকর্ম্মকে বন্ধনের হেতু বলিয়া জানেন, তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে না। সুতরাং সকল গৃহীই যে যজ্ঞাদি না করিলে প্রত্যবায়ভাক্ হইবেন, শঙ্কর এ কথা মানিতেন না। কাজেই কুল্লুকের সঙ্গে তাঁহার কোন বিরোধ নাই। পাঠক দয়া করিয়া বৃহদারণ্যক ভাষ্যের আর একটী স্থলও দেখুন।

"পুরুষমতি বৈচিত্র্যমপেক্ষ্য সাধ্যসাধন সম্বন্ধবিশেষান্ অনেকধোপদিশতি। তত্র পুরুষাঃ স্বয়মেব যথারুচি সাধনবিশেষেষু প্রবর্ত্তন্তে, শাস্ত্রন্তু সবিতৃপ্রদীপাদিবৎ উদাস্ত এব। যস্য যথাবভাসঃ, স তথারূপং পুরুষার্থং পশ্যতি, তদনুরূপানি সাধনানি উপাদিৎসতি।"

অর্থাৎ শাস্ত্র পথ দেখায় মাত্র ; মনুষ্য প্রবৃত্তি অনুসারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়। অতএব এস্থলের ভাষ্যেও আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্করের মত কত বড় উদার ছিল। তিনি নিষ্কাম ও সকাম সাধনে, সাধকের স্বাধীনতা উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। পাঠক এখন দেখিতেছেন যে, আমরা প্রথম সংখ্যায় "বেদান্ত পরিভাষার' যে সিদ্ধান্ত দেখাইয়াছি, তাহা এবং শঙ্করের সিদ্ধান্ত একইরূপ। গৃহী হইলেই যে তাহার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিতেই হইবে, একথা শঙ্করের অনুমোদিত নহে। কেবল শঙ্কর নহেন, অন্যান্য পুরাণ, সংহিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দুর অতি প্রাচীন শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রাদিতে—যাহা যজ্ঞাদির উপদেশ পূর্ণ—তাহাতেও সকলেরই পক্ষে যজ্ঞাদি "অবশ্যকর্ত্তব্য" বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। গৌতমধর্ম্মসূত্র অতি প্রাচীন পুস্তক। ইহা বৈদিককালের আচারাদি প্রবর্ত্তক গ্রন্থ। পাঠক সেই গৌতমসূত্রের ৮ম অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ সূত্রদ্বয় দেখুন্।

"যস্যৈতে চত্বারিংশৎ সংস্কারা ন চাষ্টাবাত্মগুণা ন স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যঞ্চগচ্ছতি।"

আবার :—

"যস্য তু খলু চত্বারিংশৎ সংস্কারানামেকদেশোঽপ্যষ্টাবাত্মগুণা অথ স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যঞ্চ গচ্ছতি"।

অর্থাৎ যাঁহারা গর্ভাধানাদি এবং দর্শপৌর্ণমাসাদি ৪০টী সংস্কারের একদেশমাত্রও অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু আত্মার ৮টী গুণ (দয়া, অস্পৃহা প্রভৃতি) যাঁহার আছে, তিনিই ব্রহ্মের সংযোগ পাইবেন। কথাটা এই যে, "যিনি নিত্য-অনুষ্ঠানগুলি মাত্র অনুষ্ঠান করেন, তিনি দয়াদি "অষ্টগুণ সম্পন্ন হইলেই সাযুজ্যসালুক্য লাভের অধিকারী হইবেন" (সামশ্রমীকৃত অনুবাদ)। সুতরাং

এই অতি প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থেও আমরা দেখিতেছি যে, সকলের পক্ষেই সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত হয় নাই। বরং সকাম যজ্ঞাদির নিন্দা করিয়া, কেবল নিত্য নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেরই বিধি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতও যে এইরূপই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়? অতএব গৌরবাবু যে বলেন যে, গৃহী হইলেই তাহার কর্ম্মে অধিকার নিবৃত্ত হয় না, একথা শাস্ত্রসঙ্গত নহে। তাহা হইলেই পাঠক এখন দেখিতেছেন যে, আমরা গৃহস্থাশ্রম সমুচিত বলিয়া মনুর যে শেষ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহা শঙ্করের মতে অসিদ্ধ হইতেছে না; অথচ উপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, শঙ্করের মতের সহিত ঐ বচনের ঐক্য নাই।

পরিশেষে উপাধ্যায় মহাশয় যে বলিতেছেন যে, শঙ্করমতে গৃহীর সগুণে অধিকার আছে, কিন্তু নির্গুণব্রহ্মে অধিকার নাই,—একথাও সঙ্গত নহে। কেন না, শঙ্করের theory অনুসারে সগুণ নির্গুণভেদ যে কথার কথামাত্র, তাহা বেদান্তদর্শনজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ, উপাধ্যায় মহাশয় ত শঙ্কর সম্বন্ধে এরূপ সগুণ নির্গুণভেদের কথা বলিতেই অধিকারী নহেন। কেন না, তিনি তাঁহার সমন্বয় ভাষ্যে নিজেই অতি সুন্দর যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শঙ্করের সগুণ ব্রহ্ম বাস্তবিক পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মই। "তদেবং বিবাদ কারণং বাঙ্মাত্রেণ পর্য্যবসন্নং" (সমন্বয় ভাষ্য, ৩৭০ পৃষ্ঠা)। শঙ্কর সম্বন্ধে যিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনিই আবার কেমন করিয়া বলিতে চান যে, শঙ্কর সগুণ ব্রহ্মে গৃহীর অধিকার রাখিয়াছেন, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে রাখেন নাই!!

বৃহদারণ্যকের ৪র্থ ব্রাহ্মণের ১০ম শ্লোক হইতে ২১ শ্লোক পর্য্যন্ত "প্রাণস্য প্রাণং চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদিরূপে ঘোরতর নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ২২ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া,—"অথৈবং উপযোগঃ কৃৎস্নস্য বেদস্য কামারাশি বর্জ্জিতস্য" ইহা দেখাইবার জন্য,—সেই নির্গুণকেই সগুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই নির্গুণ ব্রহ্মকেই নিত্যকর্ম্ম দ্বারা ধ্যানাদি করিবে (যজ্ঞেন দানেন তপসা ইত্যাদি), এবং এই নির্গুণ ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে ক্রমে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ হইবে (এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি, *i. e.* সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যসন্তীত্যর্থঃ")। পাঠক এই স্থলটীতে দেখিবেন, সগুণনির্গুণভেদ একেবারে রক্ষিত হয় নাই। এবং নিত্যকর্ম্ম দ্বারা এই নির্গুণকেই জানিতে হইবে এবং এই নির্গুণের জন্যই সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ পরিশেষে করিতে হইবে, ইহাই সমগ্র অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। শঙ্করের উপরে, গীতাভাষ্যে, গৌরবাবু যে অবিচার করিয়াছেন; সেই অবিচারের জন্যই, এখন যে তিনি সগুণ নির্গুণভেদের ব্যবস্থা করিতে চান, তাহা আমরা দেখিলাম একেবারেই অসম্ভব হইতেছে। তার পর পাঠক দেখিবেন, গীতার "একাকী" ইত্যাদি বলিয়া যে ব্রহ্মধ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে, উহা ধ্যান বিশেষ; ধ্যান মানসিক ক্রিয়া বিশেষ। সুতরাং মানসিক ক্রিয়ারূপ ধ্যানে ত পরিব্রাজকেরও অধিকার নাই। পরিব্রাজকাবস্থায় সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ বিহিত; সে অবস্থায় "উপাসনং এতৎপক্ষে ন বিহিতং;" তখন ধ্যানাদিক্রিয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং উপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এরূপ অর্থও হইতে পারে না।

বিষয়টী বড়ই গুরুতর; তাই আমরা এত বিস্তৃতভাবে গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে শঙ্করের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা দেখাইলাম। এবারে প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আগামীবারে উপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তরের অন্যান্য অংশগুলির বিচার করিয়া দেখিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বিজয়িনী-কাব্যম্। *

(সমালোচনা।)

সাহারা মরুভূমিতে কে আজ্ তুষার-শীতল বারি-রাশির সৃষ্টি করিয়া, আবার সেই বারি-রাশি দ্বারা নির্ঝরিণীর সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে আবার কাচ-স্বচ্ছ তরঙ্গমালার ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছ? অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত, ধূলিসঙ্কুল, প্রখর বায়ু-প্রবাহের পরিবর্ত্তে কে আজ্ পদ্মবনের সৌরভ-চোর-সমীরণকে,—হিমাচলের উপলখণ্ডে চিরোষিত-সমীরণকে,—বারবর্ণিনীদিগের আলুলায়িত কুন্তলরাশির সহিত ধীরে ধীরে ক্রীড়াকারী মনোমোহকর-সমীরণকে,—সন্তপ্ত-পথিকদিগের সন্তপ্ত-দেহ-প্রাণ-মন ও আত্মাতে নবজীবনের সঞ্চার করিতেছে? কে আজ্ সেই সীমারহিত সুদীর্ঘ মরুভূমিতে, সহকার তরুশ্রেণী রোপিত করিয়া উপবনের সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে আবার আতাম্রকি-সলয় দ্বারা স্তরে স্তরে মুকুলশ্রেণীর উদ্‌গম করাইয়া, সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিতেছে? কে আবার তাহাতে ভ্রমরগুঞ্জন ও কোকিলঝঙ্কারের প্রবর্ত্তনা করিয়া, শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তিনিবারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-পুটে অমৃত-সিঞ্চন করিতেছে? জানি না, এ মহাশক্তিশালী মনুষ্য কে? জানি না, এ ঐন্দ্রজালিক কোথা হইতে আসিয়া অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্য এই মহা ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়া, সন্তপ্ত জগৎকে হঠাৎ বিমোহিত করিতেছে? যে ভারত-রঙ্গভূমির বক্ষঃস্থলে নবরত্ন-উদ্ভাসিত আস্থান-মণ্ডপের মধ্যস্থলে,—মহামূল্য হীরকজালে ও মুক্তাদামে অলঙ্কৃত স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, উজ্জয়িনীরাজ ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য,—কালিদাস-দুহিতা কবিতা-সুন্দরীর বীণাঝঙ্কার শ্রবণ করিতেন এবং তাহার তালে তালে ছন্দোবন্ধের স্বর্গীয় নৃত্য বিলোকন করিয়া, চক্ষুর সার্থক্য সম্পাদন করিতেন;—সেই ভারতভূমিতে,—সেই রঙ্গভূমিতে—সে বীণাঝঙ্কার অনেক দিন নিবৃত্ত হইয়াছে! সে স্বর্গীয় নৃত্য মর্ত্ত্যভূমিতে আর নাই, স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে! এই রঙ্গভূমিতে গায়ক, নর্ত্তক, শ্রোতা, দর্শক কেহই নাই!! ভারত আজ মহাশ্মশানে পরিণত!! আজ এ মহাশ্মশানে, এ মহানিদ্রায় অভিভূত মহাদেশে, বহু যুগযুগান্তের পর কে আবার, নবীন-বীণাযন্ত্রের স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া, উচ্চ-গীতি-প্রবাহে ভারতবাসীকে, জাগরিত করিয়া, তাহাদিগের সহিত ইউরোপবাসি-সভ্য-

* সংস্কৃত মহাকাব্য—কাকিনা-রাজসভাপণ্ডিত শ্রীশ্রীধর বিদ্যালঙ্কার বিরচিত। মূল্য টাকা। গিরিশ বিদ্যারত্ন-প্রেসে মুদ্রিত।

জাতিকে পর্য্যন্ত যুগপৎ বিস্মিত করিয়া তুলিতেছে? আমরা বহুদিন কবিতা-সুন্দরীর সংস্কৃত-প্রচ্ছদ-ধারণ দেখি নাই। আজ সংস্কৃত-প্রচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বর্গ-রাজ্য হইতে ধীরে ধীরে কবিতাসুন্দরী মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করিয়া, তাহার স্বাভাবিক দেবভাবে,—তাহার স্বাভাবিক স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্যে,—সকলের মনে দেব-ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেছে? মর্ত্ত্যের বিজয়িনী, মহীয়সী মহিষী বিজয়িনী, ভারতবাসীর একমাত্র মাতৃকল্পা বিজয়িনী স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে স্বর্গ হইতে কবিতারূপিণী, "বিজয়িনী" মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছে। আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না! মানবরূপিণী বিজয়িনীর (Queen Victoria) শোক দুঃখ ভুলাইবার জন্য, এই কবিতা-রূপিণী "বিজয়িনী," অনেক কাজ করিবে; মানবের সন্তপ্ত-হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিতে একান্ত সমর্থা হইবে। এই বিজয়িনীকে দেখিয়া অনেকেই বিজয়িনী-দিদৃক্ষার ফল উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। বহুশতাব্দী পরেও, এই বিজয়িনী-কাব্য ভবিষ্যৎ মানববংশকে, নিজকে দেখাইয়া, সাম্রাজ্ঞী বিজয়িনীকে দেখাইবে।

কবি-শ্রীশ্বর-প্রসাদে মৃত-সংস্কৃত আজ অমৃতরূপে উপস্থিত। মেঘ-দূত দেখিলে বুঝা যায়, মহাকবি কালিদাস হিমালয় প্রান্তে বাস করিয়া, অতুলনীয় কবিত্বের অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আজ বিজয়িনীর কবিও, এই উত্তর-প্রদেশে বাস করিয়া, উপযুক্ত বর্ণ-পরম্পরায় বিজয়িনীর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। বিষয়ের উৎকর্ষে কবিতার উৎকর্ষ হয় না। শারদীয় মহোৎসবের সময়ে দুর্গা প্রতিমা অনেক কুম্ভকারেই প্রস্তুত করে, কিন্তু কৃষ্ণনগরের সুবিখ্যাত কুম্ভকারের হস্ত হইতে মাতৃদেবী যে ভাবে যে মূর্ত্তিতে নির্গত হয়েন, কৈ অন্যের ত সে ভাবে হয় না! রবি বর্ম্মার ছবি দেখিতে, তাহা দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিতে, সকলেই ইচ্ছুক। অন্য চিত্রকরেরাও লক্ষ্মী-সরস্বতী অঙ্কিত করেন, কিন্তু তেমন হয় না, সেরূপ জীবন্তভাব থাকে না। সৌভাগ্যবশতঃ সর্ব্বপ্রথমে একজন মহাপ্রতিভাশালী মহাকবির হস্তে এই কাব্য নির্ম্মাণের ভার ভগবান্ অর্পণ করিয়াছেন। তাই, আজ আমরা এই মহাকাব্য দেখিতে পাইলাম। অলঙ্কার শাস্ত্রের পারিভাষিক লক্ষণ খাটিতেছে বলিয়া, কেবল আমরা ইহাকে মহাকাব্য বলিতেছি না, বর্ত্তমানে ইহার তুল্য আর একখানি মহাকাব্য হয় নাই; অতীতেও এই ছন্দে পাদান্ত অনুপ্রাস লইয়া এরূপ সুবৃহৎ একখানি মহাকাব্য হয় নাই বলিয়া, কাব্যজগতে অতি শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ইহাকে আমরা মহাকাব্য বলিতেছি। যিনি লক্ষ-শ্লোকে ভারতের "বিক্রম-ভারতের" সৃষ্টি করিতে যাইয়া, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের যশোগ্রহণে সংকল্প করিয়াছিলেন; যিনি "কৌমার" কাব্যের সৃষ্টি করিয়া নীরস ব্যাকরণে কাব্যরসের সঞ্চার করিয়াছিলেন; যিনি পর্য্যায়ক্রমে চম্পু, নাটক, নানাবিধ শতক ও নানাবিধ কাব্য লিখিয়া, সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত-পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকটে "মহাকবি" বলিয়া পরিচিত রহিয়াছেন; তাঁহার পক্ষে "বিজয়িনী-কাব্যের" সৃষ্টি আশ্চর্য্যজনক নহে। একদিন কবি ক্ষেমীশ্বর চণ্ড-কৌশিক নাটকের সৃষ্টি করিয়া, এই উত্তরবঙ্গে রাজা মহীপালের মনস্তুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে, বর্ত্তমান

ও ভবিষ্যৎ মানবকুলের হৃদয়ে অমৃত-ধারার সেচন করিয়াছিলেন; আজ আবার এই উত্তর-বঙ্গে কবি শ্রীশ্বর, বিজয়িনী কাব্যের সৃষ্টি করিয়া, বিহারাধিপতি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মনস্তুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবকুলের হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছেন।

এই "বিজয়িনী-কাব্যের" বিখ্যাত কবি, এতগুলি সংস্কৃত কাব্য লিখিলেও, বর্ত্তমান কাব্য ও "হেমোদ্বাহ" কাব্য ভিন্ন, অন্য কাব্যগুলির সহিত মানবগণের সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই; কেন না, পাণ্ডিত্য-ব্যবসায়ী কবির সেরূপ অর্থের সদ্ভাব নাই। যাহা দ্বারা মুদ্রিত হইয়া পুস্তকগুলি জগতের সমক্ষে উপস্থিত হইবে।

বিজয়িনী-কাব্যের ভূমিকায়, "ধন-ত্রুটী-শোধভারা" বলিয়া কবি স্বয়ংই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে, সভ্যসমাজে শিক্ষিত মহারাজা রাজাদিগের নিকটে "বিজয়িনী" কাব্যের যেরূপ সমাদর দেখা যাইতেছে*, তাহাতে আশা করা যায়, কোনও না কোন রাজা মহারাজার অনুগ্রহে সে কাব্যগুলিও জগতে প্রচারিত হইবে।

কবি শ্রীশ্বর একবর্ষাবধি রুগ্ন ও শয্যা-শায়ী হইয়া, অন্নজল পরিত্যাগ করিয়াও, এই কাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাই আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয়। কবি এই দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শয়ন করিয়া, কাব্যখানি শেষ করিতে পারিবেন না বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন। মুদ্রিত এই কাব্য দেখিতে পাইবেন বলিয়া ত কখনই আশা করিতে পারেন নাই। ভগবৎপ্রসাদে আজ কবি রোগমুক্ত; আজ তিনি নিজ দুহিতা "বিজয়িনী"কে মুদ্রাযন্ত্রগৃহ হইতে সজ্জিত ও অলঙ্কৃত হইয়া বহির্গত হইয়াছে দেখিতেছেন। কবি রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া তাড়াতাড়ি পুস্তকের শেষ করিতে যাইয়া সর্ব্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী পাদান্ত্য অনুপ্রাসের যোজনা করিতে পারেন নাই; সর্ব্বত্র পূর্ব্ব-স্বর এক হয় নাই; সর্ব্বত্র স্বজাতীয় শকার, ষকার ও নকারের মিলন হয় নাই। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে পাঠক এই উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, অধিক স্থলেই আলঙ্কারিকদিগের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে, অতি অল্পস্থলেই এই নিয়মের ভঙ্গ দেখা যায়। প্রাচীন কবিরাও, একটী শ্লোক রচনায় শ্লেষালঙ্কার, অনুপ্রাস বা যমক দেখাইতে যাইয়া তালব্য শকারের সহিত দন্ত্য সকারের, বর্গীয় জকারের সহিত অন্তঃস্থ যকারের একত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। জন্মান্তরীণ শক্তি আছে বলিয়া, একটী বিখ্যাত কবিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, বাল্যকাল হইতে দেবভাষার অনুশীলন করিয়াছেন বলিয়া, রোগশয্যাশায়ী এই মহাত্মার মুখপদ্ম হইতে নির্ঝরের ন্যায় অনর্গলভাবে সুনির্গত শ্লোক-পরম্পরা দ্বারা এই মহাকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যে ইহা অসম্ভব। এই কবির ন্যায় শব্দ গ্রন্থন-কৌশল বুঝি আর জগতে বর্ত্তমানে হইল না বা হইবে না। আর অধিক বলিয়া প্রস্তাবের অঙ্গ বাড়াইব না; সহৃদয় ব্যক্তির উপরেই ইহার বিচার-ভার।

* মহীশুর, বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর, উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ এই মহাকাব্যের বহুবিধ খণ্ড ক্রয় করিয়া লইয়া, কবিকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অনেককলি পুস্তক লইয়া কবির পরিশ্রমের পুরস্কার করিয়াছেন। কোচবিহারাধিপতি মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় দিয়াছেন।

পরিশেষে আমরা এই কবির শব্দ-গ্রন্থন-শক্তি কিরূপ বিস্ময়কর, তাহা দেখাইবার জন্য, এই মহাকাব্য হইতে যদৃচ্ছা দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

"জগজ্জনানাং সহ দৃষ্টিপাতৈ,
স্তৈস্তৈ রুদারৈরপি শীতবাতৈঃ।
সমুদ্রকল্লোলঘটা প্রবাহা,
ববন্ধি যস্মিন্ নর-বারিবহাঃ॥

(১২ শ সর্গ)।

"যেয়ং শতাংশো রিব চারুহাস্যৈ,
স্তুঙ্গৈ স্তরঙ্গৈঃ প্রমদেব লাস্যৈঃ।
সমুদ্রমূর্ত্তে রহিরত্ন-হার-
রুদ্রস্য কণ্ঠং তরসা দধার॥

(১২শ সর্গ।)

সংবভূব বহু-নালিকধ্বনিঃ,
পারলৌকিক-বিধৌ তদধ্বনি।
হেষয়া দ্বিরদবৃংহিতৈঃ সমং,
চক্রয়া চ পরিকম্পয়ন্ মনঃ॥

(৬ষ্ঠ সর্গ)।

"বাদ্যোদ্যমে গর্জ্জদিশাবিলায়া,
মুখাম্বুজস্থস্তমনঃশিলায়াঃ।
কাপ্যাবিরাসীদ্ দ্যুতিরিন্দিরায়া,
বরস্য তস্যাপি বরাধবায়াঃ॥"

(৭ম সর্গ)।

"পুত্র-পৌত্রযুতয়া তথাংনয়া,
শোচ্যতামগতয়াপ্যদসয়া।
অভ্যধারি ভুবি কষ্টদা স্থিতি,
নষ্টরাগরস-কেশসংস্কৃতিঃ॥"

(৪র্থ সর্গ)।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

কুমার সম্ভব

"কুমার-সম্ভব" মহাকাব্য অতি উপাদেয় গ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্যে উহার স্থান অতি উচ্চ। রচনাপারিপাট্যে এবং ভাবের উৎকর্ষে এই গ্রন্থের কবিতাগুলি এমনই মনোমোদক যে, পড়িবার সময়ে জ্ঞান হয় অমৃতসাগরে প্রাণটা যেন নিমজ্জিত হইল। মহাকবি কালিদাসের কাব্যগুলির পরিচয় কাহারও নিকট বিশেষ করিয়া দিতে হয় না। স্বকীয় আভ্যন্তরিক গুণ সমূহে উহারা উহাদের স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তাই "কুমার-সম্ভব" সেই কালিদাসের কাব্যাবলীর মধ্যে এক খানি প্রধান কাব্য। সুতরাং, এ গ্রন্থখানি যে কিরূপ উপাদেয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমরা আজ এই মহাকাব্যখানি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। ইহাকে সমালোচনা বলিতে হয়, বলুন; কিন্তু বক্ষ্যমাণ কথাগুলি মহাকবির একজন প্রগাঢ় ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত।

অনেক গুলি সর্গে "কুমার-সম্ভব" মহাকাব্যখানি সমাপ্ত। একটা কিম্বদন্তী আছে, এ কাব্যখানির মাত্র সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত মহাকবি কালিদাসের বিরচিত।* সত্য মিথ্যা জানি না, এবং এ প্রবচনের মূলে কতখানি সত্য নিহিত আছে, তাহাও আমরা এ প্রস্তাবে বিচার করিব না; কিন্তু আমরা "কুমার-সম্ভবের" প্রথম সাত সর্গের মাত্র সমালোচনা করিব।

প্রবন্ধটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। প্রথম ভাগে আমরা "কুমার-সম্ভবের" প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিব। দ্বিতীয় ভাগে আমরা কাব্য-

* সম্ভবত মল্লিনাথ এই জন্যই "কুমার-সম্ভবের" মাত্র প্রথম সাত সর্গের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

খানির একটী সাধারণ সমালোচনা প্রদান করিব।

"কুমার-সম্ভবের" প্রধান চরিত্র দুইটী, মহাদেব এবং পার্ব্বতী। কিন্তু ইন্দ্র, রতি ও কাম,—ইঁহারাও বড় কম নহেন। সুতরাং আমরা এই পাঁচটী চরিত্রই বিশ্লেষণ করিব, এবং তাহাদিগের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কালিদাস পুরাণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া "কুমার-সম্ভব" রচনা করিয়াছেন। সুতরাং যাহাতে প্রধান প্রধান পৌরাণিক ঘটনা গুলির বিপর্য্যয় হয়, এরূপ কিছুই লিখিবার তাঁহার সাধ্য ছিল না। বিশেষতঃ কালিদাসের সময়ে সমাজে পুরাণ ইতিহাস বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। অতএব মূলে পৌরাণিক সত্য অবিকৃত রাখিয়া, পৌরাণিক সত্যকেই ভিত্তি করিয়া, কালিদাস তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে মূল ঘটনা ভাল কি মন্দ, তাহা আমাদের বিচার করিবার অধিকার নাই। সেই মূল ভিত্তির উপরে যে বিচিত্র সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতেই কবির শিল্প-নৈপুণ্য ও মৌলিকতা প্রকাশ, এবং ইহাই আমাদের সমালোচনার বিষয়।

ইন্দ্র স্বর্গের রাজা। কেবল স্বর্গের রাজা কেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—ত্রিলোকেরই তিনি অধীশ্বর। সুতরাং, তিনি খুব বড় একটা রাজনীতি-বিশারদ পুরুষ, সন্দেহ নাই। ত্রিলোকের উপরে যাঁহার অসীম আধিপত্য; সূর্য্য, বরুণ, প্রভঞ্জন প্রভৃতি মহারথিগণ যাঁহার আদেশ পালনে সতত তৎপর; তিনি যে কিরূপ সুদক্ষ রাজা, তাঁহার যে কি কুশাগ্রবুদ্ধি, তাহা বলিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। তারক, বৃত্র, দশানন প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত, দুর্জ্জয় দৈত্য ও রক্ষগণ যাঁহার চিরশত্রু, তিনি যে কত বড় নীতি-বিশারদ সম্রাট্, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। কালিদাসের "কুমার-সম্ভবে" সেই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষিত হইয়াছে কি? "কুমার-সম্ভব" পাঠ করিলে কি জ্ঞান হয় যে, ইন্দ্র বাস্তবিকই তাঁহার পদের উপযুক্ত ব্যক্তি, না কেবল ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিয়া অত বড় পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? দেখা যাউক।

দুর্দ্দান্ত তারকাসুরের অত্যাচারে সকল দেবগণই প্রপীড়িত। ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া সে না করিতেছে, এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। বহুযুদ্ধে দেবগণ কিছুতেই তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্র দেখিলেন, স্বয়ং পিতামহ যাহাকে অমোঘ বর দিয়াছেন, তাহাকে দমন করা অন্য কোন মহারথীর অসাধ্য। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, সেই সর্ব্বস্রষ্টা পিতামহই একমাত্র ইহার প্রতীকার করিতে সামর্থ্যবান্। তখন তিনি সমবেত দেবগণকে সঙ্গে করিয়া পদ্মযোনির নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং শ্রুতি-মধুর, মনোহর, চিত্তপ্রসাদক স্তবে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া বিমর্ষভাবে মৌনাবলম্বনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা দলবদ্ধ সমগ্র দেবগণের অকাল আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর দিবার জন্ত দেবরাজ গুরু বৃহস্পতিকে নেত্রদ্বারা ইঙ্গিত করিলেন। কেন? কথাগুলি ইন্দ্রের নিজের বলিলেই ত হইত? কিন্তু বৃহস্পতিকে ইঙ্গিত করিবার তাৎপর্য্য আছে, এবং এখানেই মহাকবির কৃতিত্ব।

তিনি বৃহস্পতিকে কথাটী মাত্র বলিলেন

না, কেবল একবার নেত্রদ্বারা ইঙ্গিত করিলেন। কেন? ইন্দ্র জানিতেন, দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতিতুল্য দ্বিতীয় বক্তা নাই। ঘটনা গুলি তিনি যে ভাবে ও যে ভাষায় বিবৃত করিতে পারিবেন, এমত আর কেহই পারিবে না। বিষয়ের উপযোগীতা অনুপযোগিতা না বুঝিয়া সর্ব্বত্রই দলের অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় পাণ্ডিত্য নাই। উপযুক্ত করে গুরুভার ন্যস্ত করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তিনি এ বিষয়ে নিজ অপেক্ষা বৃহস্পতিকে অধিকতর ক্ষমতাশালী জানিতেন, তাই তাঁহাকেই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ করিবার ইহা অপেক্ষা আরও একটী গুরুতর কারণ ছিল।

"তারকাসুরের আমার সহিত এতগুলি যুদ্ধ হইয়াছে, প্রত্যেক সংগ্রামেই আমি পরাজিত হইয়াছি। আমার প্রজাগণের উপর সে যে ভয়ানক উপদ্রব করিতেছে, তাহা নিবারণ করিবার শক্তি আমার বাহুতে নাই। সে জোর করিয়া আমার সমস্ত ভাল ভাল জিনিসগুলি অধিকার করিয়াছে। পাপিষ্ঠ ত্রিদিবের কুলবধূগণকে তাহার সেবাদাসী করিয়া রাখিয়াছে, এবং আমার সকল সুখের পথে কাঁটা দিয়াছে। অতএব সে যাহাতে জব্দ হয়, আপনি এমন উপায় করুন।"—ইন্দ্রের ন্যায় একজন দিকপালের মুখ হইতে এ কথাগুলি বাহির হইলে, তাঁহার ইন্দ্রত্ব কতদূর রক্ষিত হয়, তাহা বিন্দুমাত্রও চিন্তাসাপেক্ষ নহে। নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইলেও, মহৎ লোকেরা কখনও তাঁহাদের দৈন্য স্বীকার করিতে পারেন না; এতদপেক্ষা মৃত্যুও তাঁহাদের নিকট বাঞ্ছনীয়; তুমি আমি বলিব, ইহাতে বেশ একটু অহমিকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তা হউক্, কিন্তু বাস্তবজগতে ঘটনা এইরূপই হইয়া থাকে। এদিকে ব্যাপার ত এইরূপ, আবার কথাগুলি পদ্মযোনির কাণে না উঠিলেও প্রতীকারের সম্ভবানা নাই, তাহাও নিশ্চয়। সুতরাং এস্থলে ইন্দ্র যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ইহাতে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।

ইন্দ্র যখন পদ্মযোনির নিকট তারকাসুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় অবগত হইলেন, তখন তিনি চিন্তাকুল চিত্তে নিজসভায় চলিলেন। মহাদেবের ঔরসে পার্ব্বতীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদিত হইবে, সেই বীরই তারকের বধসাধনে উপযুক্ত। মহাদেব ত এখন বিপত্নীক ও কঠোর তপোনিরত। তবে উপায়? মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে হইবে,—ভাবিতেও দেবগণের প্রাণ শিহরে। এ ব্রহ্মাও নন, বিষ্ণু নন, এ সমাধি-মগ্ন শিব! দেবরাজ মনে মনে এক কৌশল স্থির করিলেন, এবং তৎসাধনোপায় কামকে স্মরণ করিয়া নিজ সভাস্থলে গিয়া বসিলেন।

চঞ্চল প্রকৃতির লোকের একটা বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। গম্ভীর প্রকৃতির লোক যাহা করিতে ইতস্ততঃ করে, দুইটী মিষ্টকথা বলিলে চঞ্চল-স্বভাব ব্যক্তি তাহাতে হাসিতে হাসিতে হস্তক্ষেপ করে। না জানি আজ কাহার মুখ দেখিয়া কামদেবের রজনী প্রভাত হইয়াছিল, কারণ স্বয়ং দেবরাজ তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন! সর্ব্ব দেবগণ সমক্ষে সভাস্থলে আসিয়া ইন্দ্রের পার্শ্বে "প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা" দাঁড়াইলেন। ইন্দ্র

কামকে ভাল করিয়া জানিতেন; কি কৌশলে দুইটী মিষ্ট-কথা বলিলে কামকে একেবারে জল করা যাইবে, তাহা তাঁহার বেশ জানা ছিল। কামদেব তাঁহার সমক্ষে আসিবামাত্র সিংহাসনের নিকট তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন। ইন্দ্র দেবরাজ, কাম তাঁহার এক তুচ্ছ ভৃত্য মাত্র, —তাহাকে আজ এত আদর কেন?

"প্রয়োজনা পেক্ষিতয়া প্রভূণাং
প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু॥" ১।৩

কামদেব সে আদরে গলিয়া গেলেন, এবং সভাস্থ অন্য কেহই শুনিতে না পায়, এরূপভাবে ইন্দ্রের কাণের নিকট মুখ লইয়া অনুচ্চস্বরে তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। কাম যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহার মুখেই শোভা পায়। তিনি তাঁহার ধনুকের সাহায্যে কোন্ কুলকামিনীর কি দুরবস্থা ঘটাইতে পারেন, বিশেষ বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক তাহা বিবৃত করিলেন। চঞ্চল প্রকৃতির ব্যক্তি কি না! বিশেষতঃ ইন্দ্রের সম্মানে তাঁহার চাঞ্চল্য আজ আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, তাই ততটা ঠিক ছিল না, ভিতরের খবরও জানিতেন না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, অন্যে পরে কা কথা,

"কুর্য্যাং হারস্যাপি পিণাকপাণে
ধৈর্য্যচ্যুতিম্" ১।৩

ইন্দ্র দেখিলেন, তিনি যে অবসর খুঁজিতেছিলেন, সে শুভ মুহূর্ত্ত স্বাগত। তিনি তখন কামকে আরও বাড়াইয়া বলিলেন,

"সর্ব্বং সখে ত্বয্যুপপন্নমেতদ্
উভে মমাস্ত্রে কুলিশং ভবাংশ্চ।
বজ্রং তপোবীর্য্য মহৎ সুকুণ্ঠং
ত্বং সর্ব্বতোগামি চ সাধকঞ্চ॥
অবৈমি তে সারমতঃ খলু ত্বাং
কার্য্যে গুরুণ্যাত্ম সমং নিযোক্ষ্যে।
ব্যাদিশ্যতে ভূধরতামবেক্ষ্য।
কৃষ্ণেণ দেহোদ্বহনায় শেষঃ॥
১২, ১৩।৩

ইহার পর আর টীকা করিবার আবশ্যক নাই। ইহার প্রতি ছত্রের, প্রতি কথার কৌশলে ইন্দ্রের চাতুরী প্রকাশ পাইতেছে। তৎপর, ইন্দ্র যে নিমিত্ত কামকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কৌশলে তাহা ব্যক্ত করিলেন। অবশেষে কামদেবের নব-সম্মান-গর্ব্ব-স্ফীত বক্ষকে আরও স্ফীত করিবার জন্য,—

"ঐরাবত সঙ্কালনকর্কশেন"
হস্তেন পস্পর্শ তদঙ্গমিন্দ্রঃ॥ ২২।৩

সাধ্য কি, ইহার পর কাম "না" বলিলেন! "যে আজ্ঞা" বলিয়া তিনি কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত তখনই প্রস্থান করিলেন।

একটা কথা আছে। যে কার্য্য সম্পাদন করিতে দিকপালগণ নিজেরা কেহই সাহস করিলেন না, একটী বিলাস-প্রিয়, চঞ্চল প্রকৃতি, বালক-বুদ্ধি ব্যক্তিকে ভুলাইয়া, সেই কার্য্য-সাধনে পাঠান কি ইন্দ্রের ন্যায় অত বড় ব্যক্তির উপযুক্ত কাজ হইয়াছিল? বলিয়াছি তো পূর্ব্বেই, পৌরাণিক সত্যকে ভিত্তি করিয়া তদুপরি শিল্পীকে তাঁহার সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। কবির পৌরাণিক সত্যের বিপর্য্যয় করিবার সাধ্য ছিল না বলিয়াই এমন হইয়াছে। এখন এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাপারটি যাহা হওয়া উচিত, তাহা হইয়াছে। আর একটি কথা এই, এ উপায় অবলম্বনে যে ভয়ানক শোচনীয় পরিণাম হইবে, তাহা দেবরাজ কিম্বা অন্য কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, কাম সর্ব্বত্র জয়ী নয়। এক হিসাবে কোন ত্রুটিই হইয়াছিল

না, বলিতে হইবে। কারণ, স্বয়ং ব্রহ্মাই তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন,

"উমারূপেণ তে যূয়ং সংযমস্তিমিতং মনঃ।
শম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুময়স্কান্তেন লৌহবৎ ॥"

৫৯।২.

তাহা হইলে এখন মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, মহাকবির মহাকাব্যে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।

বসন্ত রতি সমভিব্যহারে কামদেব অনতিবিলম্বে মহাদেবের তপোবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। এক জন সংযমীর চিত্তবিকার জন্মাইতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, বসন্ত তাহার "ষোড়শোপচারে" আয়োজন করিলেন। সকলই প্রস্তুত, এখন কেবল কাম মহাদেবের প্রতি তাঁহার অমোঘ শর নিক্ষেপের অবকাশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তপশ্চর্য্যারত পশুপতির তদানীন্তন "মনসাপ্যধৃষ্য" মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া স্মরের আর সাহস থাকিল না, তাঁহার বেপমান হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূম্যবলুণ্ঠিত হইল। পুণ্যের নিকট পাপ, সতের নিকট অসত এমন ভাবে আপনা-আপনিই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে! কামদেবের নিতান্ত মন্দ কপাল, তাই এমন সময়ে শিবার্চ্চনার নিমিত্ত পার্ব্বতী তথায় উপস্থিত হইলেন। পার্ব্বতীর অসাধারণ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া কামের বীর্য্যানল পুনরুদ্রিত হইল। উপযুক্ত অবকাশ বুঝিয়া সম্মোহন নামক বাণ ধনুকে সংযোজিত করিলেন। শরাসনে বাণ সংযোজিত করিয়াছিলেন মাত্র, সে শর আর তাঁহার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল না। পরিণাম যাহা হইয়াছিল, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। বিরক্তি সহকারে ত্রিলোচন তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, অমনই কাম ভস্মীভূত হইলেন! পবিত্রতার নিকট অপবিত্রতা এত সহজেই বিনষ্ট হয় বটে! সব ফুরাইল! আপনারা এখন ভাবিয়া দেখুন, ইহা হইতে কামের চিত্র আর কিছু স্ফুটতর হওয়া সম্ভব কি না?

রতি।

মহাদেবের প্রতি কাম বাণ নিক্ষেপ করিবেন,—একটা শোচনীয় পরিণাম হইবে, রতি পূর্ব্ব হইতেই আশঙ্কা করিতেছিলেন। সশঙ্কচিত্তে তিনি শিবের তপোবনে আসিলেন। পরিণাম যে এত শোচনীয় হইবে, তাহা রতিরও অগোচর ছিল। কামদেব ভস্মীভূত হইলেন, রতিও হতচৈতন্য হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত হইলেন। তার পর বিধাতা যখন তাঁহাকে অভিনব বৈধব্য-যন্ত্রণা অনুভব করাইবার নিমিত্ত তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন, তখন তিনি সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পতির জন্য বিলাপ করা ব্যতীত "কুমারসম্ভবে" রতির অন্য কোনও কার্য্যই নাই। সুতরাং নববৈধব্যযন্ত্রণাভিভূতা, শোকাকুলা কামিনীর বিলাপ যেরূপ হওয়া উচিত, রতির বিলাপ ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল কি না, ইহাই আমাদের দেখিতে হইবে। এবং এই বিলাপেই তাঁহার চরিত্র যতটুকু পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাই আমাদের সমালোচনার বিষয়ীভূত।

মূর্চ্ছার পূর্ব্বে রতি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার প্রাণেশ্বর ভস্মীভূত হইয়াছেন। তাই মূর্চ্ছাবসানে যখন তিনি "অয়ি জীবিতনাথ জীবসি" বলিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, এবং সম্মুখেই পতির কপোত গৌর ভস্মরাশি

দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনা বাজিল, বুঝিবা তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বিলাপেও তাহা সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত হয় নাই। তাঁহার সমস্ত হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই তাঁহার মুখ হইতে এই কথাগুলি বহির্গত হইল,—

"ক্বনু মাং ত্বদধীনজীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষত সেতুবন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥" ৬।৪

তখন মানময়ীর মনে হইল, অভিমান-ভরে তিনি যে সকল তিরস্কার করিয়াছিলেন, বুঝি বা সেই দুঃখেই কাম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! কখনও বা আবার মানময়ী রতি এ অবস্থায়ও অভিমানভরে পতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং
যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম্॥" ৯।৪

কাম নাই, অতএব ত্রিলোকের সমস্ত সুখই অন্তর্হিত হইয়াছে! উন্মাদিনী রতি তাই পতিকে পুনরাগমন করিয়া ত্রিলোকের সুখ-বিধানে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। মদন না করিতে পারিতেন, সংসারে এমন কোন্ কাজ ছিল? রতির চরণ-প্রসাধন কার্য্য সমাপ্ত না করিয়াই যে স্মর দেবকার্য্য সাধনে প্রস্থান করিয়াছিলেন! রতির সে মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল! আহা, কাম! রতি তোমার কত গুণ স্মরণ করিবে? প্রণয়রসের রসিক তুমি, রতির সহিত যে সকল রসালাপ করিতে, তাহা স্মরণ করিয়া অবলা কেমনে ধৈর্য্য ধরিবে?

এমন সময়ে কামের প্রিয় সহচর বসন্ত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রতির শোকাবেগ শতগুণে উছলিয়া উঠিল। বসন্তকে সম্বোধন করিয়া রতি যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। দেখ কাম, তোমার প্রিয় সুহৃৎ উপস্থিত। দয়িতার প্রতিই পুরুষের প্রেম চঞ্চল। বন্ধুর প্রতি যে প্রেম, তাহা ত বিচলিত হইবার নহে। তোমার সুহৃৎ উপস্থিত, অতএব তুমিও এস। হায়, হায়, রতির অদৃষ্টে এত ছিল!

"শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি
প্রতিপন্নংহি বিচেতনৈরপি॥" ৩১।৪

তথাপি রতি মরিল না! রতির আর বাঁচিয়া সুখ কি বল! দেখ বসন্ত, তুমি রতির ও কামের অনেক উপকার করিয়াছ। এখন তুমি তাহাদের আর একটী উপকার কর। পতিদেহভস্মে স্তনদ্বয় বিলেপিত করিয়া রতি অনলশয়নে শায়িত হইবে;—তুমি কৃপা করিয়া চিতাশয্যাটী রচনা করিয়া দেও। আর তাহার মৃত্যুকালের শেষ প্রার্থনা এই,

"পরলোকবিধৌ চ মাধব
স্মরমুদ্দিশ্য বিলোলপল্লবাঃ।
নিবপেঃ সহকার মঞ্জরীঃ
প্রিয়চূত প্রসবো হিতে সখা॥" ৩৮।৪

রতি এইরূপে মরণে কৃতসঙ্কল্পা হইলে, যে আকাশবাণী তাহাকে এ কার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত করে, তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই রতিবিলাপ লইয়া কোনও বন্ধুর সহিত আমার কিঞ্চিৎ মতান্তর হইয়াছিল। পতিবিয়োগবিধুরা কুলকামিনীর বিলাপ যেরূপ হওয়া উচিত, রতিবিলাপ সেরূপ হইয়াছে বলিয়া আমার বন্ধুর বিশ্বাস

নহে। কারণ উহা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট। তা ঠিক কথা। এই রতিবিলাপটী আজকালকার সহিত রুচিসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু কেবল নব্যজাতির আদর্শ ধরিয়া বিচার করিলে চলিবে না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১। কুলকামিনীর মুখে এরূপ বিলাপ ঠিক না হইতে পারে, কিন্তু রতির পক্ষে এ বিলাপ ঠিক হইয়াছিল কি না? বুক ভাঙ্গিয়া, প্রাণের মধ্যে শোকনির্ঝর উৎসারিত করিয়া নব বিধবার মুখে যে প্রলাপবাণী আইসে, তাহাতে কখনও কৃত্রিমতা সম্ভবে না। কাম কি ধরণের পতি, এবং রতি কি ধরণের স্ত্রী; এবং ত্রিলোকের পতিপত্নীর উপরে তাঁহারা কোন্ বিষয়ের অধিষ্ঠাতা দেব ও অধিষ্ঠাত্রীদেবী, তাহার একটা সংস্কার আমাদের অনেকের মনেই আছে। কামসহবাসে রতি যে ভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন, বৈধব্যাবস্থায় তাঁহার প্রলাপ তদনুযায়ী হইলেই কবির কৃতিত্ব, এ হিসাবে যে রতির প্রলাপ যথাযথ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২। রতিবিলাপ যদি কুরুচিপূর্ণই হইবে, তবে তাহাতে আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয় কেন? পাপে কাহারও সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয় না। তবে রতি-বিলাপে যে কেন আমাদের সহানুভূতি উদ্রিত হয়, তাহা আমার বন্ধুবরের ও তাঁহার মতানুযায়ী ব্যক্তিগণের ভাবিবার বিষয়।

৩। রুচির আদর্শ কি? আমরা জানি, সমাজ-ভেদে রুচি-ভেদ হইয়া থাকে। এক সমাজের রুচির আদর্শে অন্য সমাজের কার্য্যকলাপ সমালোচনা করা সর্ব্বত্র ঠিক নহে। আমাদের সমাজের রুচির আদর্শে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বিরচিত কালিদাসের গ্রন্থাবলী ত দূরে থাকুক, দুই শতাব্দী পূর্ব্বে যে বঙ্গ-সাহিত্যগুলি বিরচিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশগুলিই অপাঠ্য হইয়া পড়ে। স্নায়বীক-দৌর্ব্বল্য-পীড়িত যুবক যাহাতে কুরুচির আঘ্রাণ পাইয়া বাতাহত লতার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন, কালিদাসের সমাজে হয়ত কেহ তাহাতে কুরুচি দেখিতেন না।

উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে, বোধ করি, রতি-বিলাপে কেহই কুরুচির আঘ্রাণ পাইবেন না। সকলেই বলিবেন, উহা মহাকবির মহাকৃতিত্ব। উহাতে রতির রতিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুতরাং, কাব্যের হিসাবে রতি-চরিত্র দিব্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

পার্ব্বতী।

হিমালয়ের কন্যা উমা রূপে গুণে অনুপমা। রমণীর রূপ, গুণ ব্যাখ্যা করিবার আমাদের একটা সহজ উপায় আছে,—বলিলেই হইল, অমুক রমণী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, ইহাতে কেহ কিছু বুঝেন কি না বলিতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, উমার সম্বন্ধে এরূপ বলিলে তাঁহার রূপ গুণের কিছুই বিবৃত করা হইল না।

যাঁহার রূপ ব্যাখ্যা করিতে মহাকবির সমগ্র ভাব ও শব্দসাগর মন্থন করিতে হইয়াছে, এবং অবশেষে হাঁপাইয়া পড়িয়া বলিতে হইয়াছে,—

"সর্ব্বোপমা দ্রব্য-সমুচ্চয়েন
যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না-
দেকস্থ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়েব।"

তিনি যে কীদৃশী রূপবতী, তাহা এই উক্তি দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে। আবার তাঁহার এই শারীরিক সৌন্দর্য্য তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া স্ফুটতর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, হিমালয়ের কন্তা পার্ব্বতী রূপে গুণে অনুপমা।

হিমালয়ের এমন তনয়া পার্ব্বতীর ক্রমে সুষম যৌবন ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক যৌবনস্ফূর্ত্তিরও ত্রুটী রহিল না; তথাপি গিরিরাজ তাঁহার পরিণয় বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। কারণ নারদ এক দিন উমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে ইনি শিবের অঙ্ক-লক্ষ্মী হইবেন"। এদিকে শঙ্কর তাঁহার প্রথমা ভার্য্যার বিয়োগাবধি উৎকট তপস্তায় রত। এ অবস্থায় হিমবান্ কি করিয়া তাঁহার নিকট কন্তাদানের প্রস্তাব করিবেন? পাছে শিব তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করেন, নগেন্দ্রের এই ভয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া গিরিরাজ মনে মনে একটী কৌশল স্থির করিলেন। তপশ্চর্য্যারত শিবের সেবা করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণাধিকা দুহিতাকে তাঁহার আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। মনের অভিসন্ধি, তাঁহার কন্তার অনুপম রূপলাবণ্যে শিবের মন আকৃষ্ট হইবে। হিমবানের বড় ভুল হইল, স্ত্রীসৌন্দর্য্যে মন আকৃষ্ট হইবে মহাদেবের!

নগেন্দ্র-নন্দিনী কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই শঙ্করকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন, বুঝি বা এটী তাঁহার প্রাক্তনের সংস্কার বশতঃ! একদিন অকাল বাসন্তীকুসুমাভরণে সুসজ্জিতা হইয়া সখী সমভিব্যহারে তিনি শিবার্চ্চনা করিতে উপস্থিত হইলেন। সমাধি-নিরত শিবকে যথাবিধি প্রণিপাত করিয়া তাঁহার হস্তে পার্ব্বতী স্বীয় বহুযত্নাহৃত এক ছড়া-পুষ্করবীজমাল্য দিতে উদ্যতা হইলেন, ভক্তবৎসল শিবও তাহা গ্রহণ করিতে উপক্রম করিলেন, এমন সময়ে,

> "সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা
> ধনুষ্যামোঘং সমধত্ত বাণম্ ॥"
>
> ৬৬।৩

পার্ব্বতীর তখন অবস্থা এইরূপ,—

> "বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাব
> মঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বাল কদম্বকল্পৈঃ
> সাচী কৃতা চারুতরেণ তস্থৌ
> মুখেন পর্য্যস্ত বিলোচনেন ॥"
>
> ৬৮।৩

হরের তখন কি অবস্থা হইয়াছিল, আপনারা তাহা জানেন। অপূর্ব্ব জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভাবে সামান্ত ইন্দ্রিয় ক্ষোভ দমন করিয়া ক্রোধানলে কামকে ভস্মীভূত করিয়া, বিকট হুঙ্কার পূর্ব্বক ভূতগণসহ অনতিবিলম্বে কামিনী-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন! আর মর্ম্মাহতা পার্ব্বতী?

> "শৈলাত্মজাপি পিতুরুচ্ছিরসোঽভিলাষং
> ব্যর্থং সমর্থ্যললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
> সখ্যাঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা
> শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ ॥"
>
> ৭৫।৩

শিব-হৃদয়ে যে বাণ প্রবেশ করিতে পারিল না, পার্ব্বতীর হৃদয়ে তাহা আমূল বিদ্ধ হইল! এক খানি ভাঙ্গা হৃদয় লইয়া পার্ব্বতী তাঁহার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি মনে মনে আপনার অশেষ সৌন্দর্য্যরাশিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। যে রূপ দ্বারা প্রেমাস্পদ জনকে আকৃষ্ট করা যায় না, সে রূপ কি আর রূপ? যাহা হউক, যখন মহাদেবকে তিনি "অরূপহার্য্যং" বলিয়া

বুঝিলেন, তখন তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবের মন আকৃষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

স্নেহময়ী মাতার সনির্ব্বন্ধ নিষেধরাশি উপেক্ষিত করিয়া, উচ্চাশয় পিতার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, নগেন্দ্র নন্দিনী দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত কঠোর তপশ্চর্য্যা সাধনে জনসমাগম রহিত প্রদেশে গমন করিলেন। কিন্তু এমন কুসুমপেলব অঙ্গে তপস্যার কঠোরতা সহ্য হইবে কি? রাজার নন্দিনী উমা, উমার সুখ-পালিত দেহে তপস্যার ক্লেশ সহ্য হইবে কি? হউক, বা না হউক, কিন্তু—

"ক ইপ্সিতার্থ স্থির নিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥"

৫।৫

কণ্ঠ-বিলম্বিত বহুমূল্য হার ছিন্ন করিয়া দুকূল পরিবর্ত্তে বল্কল পরিধান করিয়া, চরণ-চুম্বিত মনোহর কেশপাশকে জটাবন্ধনে বদ্ধ করিয়া, সুখস্পর্শ রত্ন-মেখলার পরিবর্ত্তে কর্কশ মুঞ্জময়ী মেখলা নিতম্বদেশে ধারণ করিয়া, নগেন্দ্র-নন্দিনী তপস্বিনী সাজিলেন। কুশাঙ্কুরচ্ছেদনে কোমল করকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, কঠিন অক্ষবীজ গণিয়া, সমস্ত ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া, গৌরী তপশ্চর্য্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। তপোবনস্থিত তরুগণকে মাতৃস্নেহে পালন করিয়া মৃগযূথকে স্বোদরজাত সন্তান-স্নেহে লালন করিয়া, পার্ব্বতী নব জীবনধারণ আরম্ভ করিলেন। ধন্য তুমি সর্ব্বজয়ী প্রেম! ধন্য তোমার ক্ষমতা! ধন্য তোমার মহিমা!

এই সময়ে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের যশোভাতি দিগদিগন্তর বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বড় বড় যোগী ঋষিগণ আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপে পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। রমণী ও বয়ঃকনিষ্ঠা বলিয়া কেহই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন না। কারণ—

"ন ধর্ম্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষতে।"*

১৬।৫

কিন্তু এ কঠোর তপস্যায়ও যখন মহাদেবের মন আকৃষ্ট হইল না, তখন পার্ব্বতী কঠোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কঠোরতর তপশ্চর্য্যার ক্লেশ ও কোমল শরীরে সহ্য হইবে কি? তা' হইতে পারে, কারণ; পার্ব্বতীর দেহটী অতি আশ্চর্য্য উপাদানে নির্ম্মিত,

"ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতং
মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব ॥"

১৯।৫

শুষ্ক গলিত পত্র মাত্র আহার করিয়া, অবশেষে তদ্‌ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া, গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে প্রজ্জলিত হুতাশনের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া, পৌষ-শীতে নিশীথ সময়ে জলনিমজ্জিত রহিয়া, অনাস্তরণ ভূমিতলে শয়ান থাকিয়া, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের প্রতি দৃকপাত না করিয়া অনাবৃত স্থানে থাকিয়া পার্ব্বতী যে তপঃ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা "তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার।"

অবশেষে এক দিন অপর্ণার নিকট "শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা" এক ব্রহ্মচারী উপস্থিত হইলেন। নবাগত ব্রহ্মচারী বিশেষ বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক পার্ব্বতীর তপশ্চর্য্যার প্রশংসা করিয়া, তাঁহার তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত

* ভবভূতি ঐ কথা বলিয়াছেন,—
"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।"
ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন,—
ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পালিতং শিরঃ।
যো বা যুবাপ্যধীয়ানস্তংদেবা্যা স্থবিরং বিদুঃ ॥

হইবার কারণ জানিতে চাহিলেন। আগন্তুক যখন পার্ব্বতীর অনুজ্ঞাক্রমে তাঁহার সখী-মুখে অবগত হইলেন যে, শিবকে পতিত্বে পাইবার নিমিত্তই আপনার এই কঠোর তপশ্চর্য্যা, তখন তিনি নিরতিশয় বিরক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক মহাদেবের পরীবাদ করিতে আরাম্ভ করিলেন। শিবের বিদ্যা, বুদ্ধি, জাতি, ধন, মান, জ্ঞান, রূপ ইত্যাদির শতমুখে নিন্দা করিলেন। শ্মশানবাসী শিবের সহিত রাজনন্দিনী পার্ব্বতীর বিবাহ হইলে, তাঁহার কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহাও বুঝাইতে ক্রুটী করিলেন না। সেকি নিন্দা! তুমি আমি অত বড় ব্রহ্মচারীর মুখে শিবের নিন্দা শুনিলে শিবকে নিতান্ত একটা অপদার্থ মনে করিতাম, এবং তাহাকেই পাইবার নিমিত্ত এত কঠোরতা পাইয়াছি বলিয়া ঘোর অনুতাপ করিতাম, সন্দেহ নাই। কিন্তু পার্ব্বতীর কি হইল? তাঁহার স্থির মন বিন্দুমাত্রও টলিল না। পরন্তু, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার ভ্রূলতা আকুঞ্চিত হইল, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইল এবং অধর কম্পিত হইতে লাগিল।—কি, শিবের নিন্দা? তুমি যত বড় ব্রহ্মচারীই হও না কেন, শিবের নিন্দা? তপস্বিনী ব্রহ্মচারীর প্রতি কথাই খণ্ডন করিলেন, এবং অবশেষে ক্রোধাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

"অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া
"তথাবিদস্তাবদ শেষমস্ত সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
ন কামবৃত্তির্ব্বচনীয়মীক্ষতে॥"

৮২।৫।

ইহার পরেও যখন তিনি ব্রহ্মচারীর অধর কিঞ্চিৎ কম্পিত হইতে দেখিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, আগন্তুক বুঝি আবার শিবের নিন্দা করিবে! তখন তাঁহার সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আতিথ্য-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া সখীকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—

"নিবার্য্যতামালি! কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুণর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ সঃ পাপভাক্॥"

৮৩।৫

অথবা

"ইতো গমিস্যামি,"

যে কথা, সেই কাজ,

"চচাল বালা,"

কিরূপভাবে? ক্রোধাতিশয্য ও ত্বরাবশতঃ

"স্তনভিন্নবল্কলা।"

তখন,

"স্বরূপ মাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ
সমাললম্বে বৃষরাজকেতনঃ॥"

তখন পার্ব্বতীর কি অবস্থা?

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচল ব্যতিকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥

তখন শঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিলেন,—

"অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মিদাসঃ
ক্রীতস্তপোভিঃ।"

আর পার্ব্বতীর তখন চিত্তের ভাব কেমন?

"অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লেশমুৎসসর্জ্জ
ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে॥"

ইহার পর আর টীকা করা চলে না। কবির এ কৃতজ্ঞ, এ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কাহাকেও "জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া" বুঝাইতে হয় না। যে ইহা আপনা হইতে না বুঝিবে, তাহাকে কাহারও বুঝাইবার শক্তি নাই। সে মানুষ না, সে একটা হৃদয়বিহীন মৃৎপিণ্ড মাত্র।

ক্রমশঃ।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন।

মায়াবাদপরীক্ষা।*

বেদান্তের অদৃষ্ট ভাল, কেন না তার প্রতি ইংরেজীশিক্ষিতদেরও নজর পড়িয়াছে। নজর অনেক দিনই পড়িয়াছিল, এখন আরও বেশী পড়িয়াছে। পথও আর তেমন দুর্গম নাই। কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের ফেলোশিপ্ স্থাপিত হইয়া এই এক মহৎ কাজ হইয়াছে যে, অনেকেই এখন ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত বা ইংরেজী না জানিয়াও মোটামুটি ভারতীয় প্রায় সকল দর্শনের, বিশেষতঃ শাঙ্করদর্শনের উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। গত পাঁচ বৎসরের ফেলোর বক্তৃতায় যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এ দেশে তার তুলনা পাওয়া কিছু কঠিন। সে বক্তৃতা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের উপন্যাসমাত্র নয়। শুধু উপন্যাসে পাঁচ বৎসর লাগে না। আস্তিক নাস্তিক, ভারতীয় প্রায় সকল বিরোধী মত খণ্ডিত করিয়া তবে তাহাতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক দিকে যতদূর সম্ভব, তার অনেকটা পাইয়াছি। অনেকটা বলিতেছি, কেন না দুই একটা বিরোধী বাদ আরও বিস্তৃত রূপে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞাতির শত্রু জ্ঞাতি যেমন হয়, তেমন আর কেহ হয় না। শুদ্ধাদ্বৈতী শঙ্করেরও প্রধান শত্রু বিশিষ্টাদ্বৈতী রামানুজ। রামানুজের অনেক গ্রন্থ এখন প্রকাশিত হইয়াছে। শাঙ্করদর্শনের বিরুদ্ধে রামানুজের আপত্তিগুলি অতিস্পষ্টরূপে শ্রীভাষ্যে বিবৃত আছে। সেগুলি একে একে সমস্ত আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। রামানুজ খাড়া থাকিতে ভারতেও শঙ্করদিগ্বিজয় অপূর্ণ রহিয়া যায়। আর এককথা। কালক্রমে শাঙ্করদর্শনও পরিণাম লাভ করিয়াছিল, এমত আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। মূলসিদ্ধান্তে নয়—কিন্তু অবান্তরসিদ্ধান্ত ও যুক্তিপ্রণালীতে কচিৎ সংস্কার, কচিৎ পরিষ্কার, অনেক পরিপুষ্টি হইয়া থাকিবে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বসন্ধ্যায় শঙ্করের যৌবনোদয়। তার ৮০০ বৎসর পরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অপ্পয়দীক্ষিত জীবিত ছিলেন। আচার্য্যের গ্রন্থাবলী হইতে অপ্পয়দীক্ষিতকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের টীকা পর্য্যন্ত, এই ৮০০ বা ৯০০ বৎসরের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান বেদান্তগ্রন্থ এখন কলিকাতা, কাশী, পুনা, বোম্বাই, মহীশূর এবং মান্দ্রাজপ্রদেশের কুম্ভকোণম্ নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। এখন আর মসলার অভাব নাই। কিন্তু কারিকর চাই। গত পাঁচ বৎসরের ফেলো সে পরিণামধারা দেখান নাই। যে বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা এ কার্য্যে আবশ্যক, তা একাধারে তাঁরই ছিল। ভবিষ্যতে যিনি বেদান্তদর্শনের জীবনবৃত্ত লিখিবেন, তাঁহাকে এই পরিণামের ইতিহাস দেখাইতে হইবে। মোক্ষমূলরের বেদান্তবক্তৃতা বা ষড়্দর্শনীতে তাহা নাই। ডএসেন্প্রভৃতির জর্ম্মান্ গ্রন্থে আছে কি না, আমি বলিতে পারি না।

কিন্তু ঐ বক্তৃতার সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অভাব এই যে, উহা মহৈশ্বর্য্যশালী ইউরোপীয়দর্শনের সাহায্য পায় নাই। তা পাইলে অনেক অনাবশ্যক জঞ্জাল কাটিয়া যাইত। পক্ষান্তরে, অনেক ম্লান সিদ্ধান্ত উজ্জ্বল

* The Vedanta and Its Relation to Modern Thought. By Sitanath Tattvabhushan. Vol. I. B. M. Press, Calcutta.

হইত। নব্য ইউরোপের দার্শনিক প্রণালীও আমাদের প্রণালী হইতে উৎকৃষ্ট। সীতানাথ বাবুর গ্রন্থে পাঠক যে উৎকর্ষ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু শুধু সাহায্যের কথা কেন? যে জ্ঞানস্রোতঃ খ্রীষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল, যে স্রোতে কাণ্ট দর্শনের মহাপ্রপাত, হেগেলে যার সাগরসঙ্গম, এ কালে তার অবহেলা করিতে কাহারও অধিকার নাই। বিশেষতঃ যিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদপ্রতিষ্ঠায় সমুৎসুক, তাঁহাকে জর্ম্মান্ দর্শন তুচ্ছ করিলে চলিবে না। শঙ্করের এক প্রতিদ্বন্দী রামানুজ, আর এক প্রতিদ্বন্দী হেগেল্। হেগেল্‌দর্শন বর্ত্তমান থাকিতে নির্ব্বিশেষবাদের জয়াশা কোথায়?

সে কথাটাও বুঝিয়া দেখিতে বাকী আছে। সংস্কৃতে যাহা সাধ্য, গত পাঁচ বৎসরের শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলো তার অনেকটা করিয়াছেন। এ কাজটা ইংরেজীশিক্ষিতকে করিতে হইবে। জর্ম্মান্ দর্শনের জলদঙ্গারে শঙ্করের দর্শন পোড়াইয়া দেখিতে হইবে। একটা ইস্পার উস্পার হইয়া যাওয়া ভাল। ভিখারিণীও জানিয়া গিল্‌টী পরিতে চায় না। ভারতলক্ষ্মীকে গিল্‌টী পরাইব কেন? সীতানাথ বাবুর গ্রন্থে এই অগ্নিপরীক্ষা আছে। পরীক্ষকও হেগেলিয়ান্।

শাঙ্করদর্শনের বিরুদ্ধে সীতানাথ বাবুর আপত্তিগুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ঐ দর্শনের দুই একটা কথা স্মরণ করা আবশ্যক। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অত্যন্ত বিরুদ্ধ দুইটা ভাগে বিভক্ত দেখি। এক ভাগ অহম্, আমি, চিৎ বা আত্মা। আর এক ভাগ ইদম্, আমি-না, অচিৎ বা জড়। বলা বাহুল্য, এ 'আমি' শুধু প্রবন্ধকার নয়। তোমারও চিদংশ 'আমি', অচিদংশ 'আমি-না'। কিন্তু অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও চিদচিৎ অত্যন্ত অসংবদ্ধ নয়। আমি বিষয়ী, জড়বর্গ বিষয়। আমি জ্ঞাতা, জড়বর্গ আমার জ্ঞেয়। চিদচিতে সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল কিরূপে? চিদচিতের মিলনসম্ভাবনা কই?

একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি এই ফুলটী দেখিতেছি। প্রথম, কুসুমাণুপুঞ্জে একপ্রকার আণবস্পন্দন। পরে তার বেগে স্পন্দিত আকাশ, আকাশে তরঙ্গপরম্পরা। তার পরে রেটিনানামক চক্ষুর একটা পর্দ্দায় বিপর্য্যস্তপ্রতিবিম্বরূপে ঐ তরঙ্গপরম্পরার সম্পাত। পরে আবার তার বেগে তৈজসস্নায়ুর স্পন্দন এবং মস্তিষ্কের কক্ষা বিশেষে সেই স্পন্দনের সংক্রমণ। শেষ, মস্তিষ্কের ঐ কক্ষায় কতকগুলি আণব বিকার। অণুতে আরম্ভ, অণুতে শেষ। আগাগোড়া মাঝামাঝি সব জড়। তার পর? তার পর, ফুলজ্ঞান। কিন্তু জ্ঞান আর জড় নহে। মস্তিষ্কের আণব বিকারকে বুদ্ধি বলিতে হয় বল, কিন্তু জ্ঞান বলিতে পার না। কঠোপনিষদ্ভাষ্যে আচার্য্যও বলিয়াছেন—

বুদ্ধির্বুদ্ধিশব্দবাচ্যমধ্যবসায়াদ্যারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্।*

বুদ্ধি ভৌতিক। তাই কূটস্থদীপে আছে—

আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতৃত্বং নৈব জন্যতে।
তাদৃগ্বুদ্ধের্বিশেষঃ কো মৃদাদেঃ স্যাদ্বিকারিণঃ॥ †

জ্ঞান জড় নহে, চিদাভাস। কিন্তু জড় মস্তিষ্কের জড় পরিণাম হইতে এই অজড়

---

* ১।৩।১০।

† পঞ্চদশী, ৮।৮

চিদ্রূপী জ্ঞানের জন্ম হইল কিরূপে? না বুঝিয়া হাক্স্‌লি টিণ্ডাল্‌ অবাক্‌ হইয়াছিলেন। সূত্রভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরিও এক স্থানে * আশঙ্কা করিতেছেন—

অসংসর্গিত্বাদেব বিষয়বিশেষাসংসর্গে কুতস্তজ্জ্ঞানম্‌।

আত্মার সহিত যদি বিষয়বিশেষের সংসর্গ না ঘটে, তবে বিষয়বিশেষ প্রকাশিত হয় কিরূপে? শঙ্করাচার্য্যকৃত শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের † টীকায় স্বয়ম্প্রকাশযতির আশঙ্কা আরও পরিস্ফুট—

জড়স্য জগতঃ প্রত্যক্‌চৈতন্যেন সহ সংযোগাদ্যন্যতমসম্বন্ধাসম্ভবেন প্রতীচঃ সকাশাজ্জগদ্ভানং ন স্যাৎ।

প্রত্যগাত্মার সহিত জড় জগতের সংযোগ বা অন্য কোনও সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে বলিয়া প্রত্যগাত্মায় জগৎপ্রকাশ সিদ্ধ হইয়া উঠে না। অধ্যাসভাষ্যে যুষ্মদস্মদের যে "ইতরেতরভাবানুপপত্তি" কথিত হইয়াছে, তারও এক অভিপ্রায় এই বোধ হয়।

কিন্তু এ সকল অনর্থক সংশয় কেন? ফুল যে আমি দেখিতেছি, তাহাতে তো আর সংশয় নাই। চিৎ অচিৎকে জানিতেছে, এ তো সিদ্ধ অপরোক্ষ সত্য। তবে আর চিদচিতে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে বলি কিসে? জ্ঞানেই ত সব ব্যবধান লঙ্ঘিত হইতেছে। আর, এ যে আপনার রচিত জালে আপনি ধরা পড়িয়াছ। জড় তো জ্ঞানের কারণই নহে। যদি জড়ই জ্ঞানের কারণ হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, জড় আছে কি নাই? যদি নাই থাকে, তবে আর কারণ হইবে কে? আর যদি থাকে, তবে তার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে—জড়কে জানিতেছি, অতএব জড় আছে। [illegible] অর্থই তাই বটে। জড়ের অস্তিত্বও তবে জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। অতএব জ্ঞানকালের পূর্ব্বকালেও—জ্ঞানছাড়াও—একটা শুদ্ধ জড় আছে, এমত বলিতে পার না। জড় তবে জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। কিন্তু কারণকে কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া চাই। অতএব জড় জ্ঞানের কারণ নহে। যা লইয়া কার্য্যকারণশৃঙ্খলা গাঁথিয়াছ, সে শৃঙ্খলায় তারে বাঁধিবে কিরূপে? পরলোকগত অধ্যক্ষ কেয়ার্ডের গ্রন্থে এইরূপ একটা উত্তর আছে। কিন্তু উত্তরটা প্রাচীন।

জ্ঞানব্যতিরেকে জড়ও নাই, অতএব জড় জ্ঞানের কারণ নহে। কিন্তু চক্ষু বুজিলে আর আমি ফুলটী দেখিতে পাই না। ফুলের স্মৃতি থাকিতে পারে, কিন্তু ফুলের প্রত্যক্ষ থাকে না। ফুল আর চক্ষুর অন্তরালপথে কোনও অস্বচ্ছ দ্রব্য থাকিলে, আমি চক্ষু মেলিয়াও ফুলটী দেখিতে পাই না। যার চক্ষে ছানি পড়িয়াছে বা অন্য কোনও কারণে যার চক্ষুরিন্দ্রিয় অশক্ত, এক কথায় যে অন্ধ, সে অন্যাবধানে চক্ষু মেলিয়াও ফুলটী দেখিতে পায় না। পক্ষান্তরে, মনঃসংযুক্ত নির্দ্দোষ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত ফুলের সংযোগ ঘটিলে ফুলটী প্রত্যক্ষ হয়। এ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগের তাৎপর্য্য কি বলিয়াছি, কুসুমাণুর স্পন্দনবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া চরমে মস্তিষ্কের কক্ষাবিশেষে কতকগুলি আণব বিকার। এ সকলই জ্ঞানে আছে, জ্ঞানব্যতিরেকে ইহার কিছু নাই সত্য। কিন্তু এ সকলই যে জড় আমি-না, তাও আমি জ্ঞানেই

---

* ২।৩।১৮।

† এই মহাস্তোত্র মহীশূরে Bibliotheca Sanskrita নামক গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

জানিতেছি। আরও জানিতেছি যে, এই জড়সামগ্রী থাকিলে আমার ফুলপ্রত্যক্ষ হয়, এই জড়সামগ্রী না থাকিলে আমার ফুলপ্রত্যক্ষ হয় না। যে অব্যভিচারী অন্বয়ব্যতিরেকজ্ঞান কার্য্যকারণসম্বন্ধগ্রহের নিয়ামক এখানেও তাহা বিদ্যমান। তবে জড় আমার ফুলপ্রত্যক্ষের কারণ নয় কেন? কার্য্যকারণভাব তো হেগেলের হুকুমে ফিরিবে না।

কেয়ার্ডের গ্রন্থে আমি ইহার উত্তর পাই নাই। কিন্তু কথাটা তাঁর মনেও জাগিয়া থাকিবে। নহিলে ঐরূপ জ্ঞানের একটা কিছু কারণও ইঙ্গিত করিবেন কেন? এদেশী বিচারে একটা তুষ্যতুদুর্জ্জনন্যায় আছে। তার অর্থ, "এ তো আচ্ছা নাছোড়বান্দা! নে, তবে নে!" অনিচ্ছায়ও কিছু ছাড়িতে হয়। কেয়ার্ডও বলেন, * যদি কোনও অর্থে এমত বলা যায় যে মস্তিষ্ক-প্রভৃতি জীবিতদেহসংস্থান হইতে জ্ঞান অভিব্যক্ত হয়, তবে সে এইজন্য মাত্র যে আত্ম-চৈতন্যেই প্রথম যার স্ফুট বিকাশ দেখি, সেই স্বস্বরূপে পরাবৃত্তির অঙ্কুর ঐ দেহ-সংস্থানেও আছে। স্বস্বরূপে পরাবৃত্তি অর্থাৎ আমি-নাকে জানিয়া তার "বিধরণ" আমিতে ফিরিয়া আসা। কথাটা হেগেলের। বেদান্তীরা যাহাকে অহঙ্কার বা বিজ্ঞানময়কোশ বলেন, ইহা তার অসাধারণ লক্ষণ বটে। জীবিতদেহ সংস্থান বা প্রাণময়কোশেও ইহার অঙ্কুর আছে, কেয়ার্ডের ইঙ্গিতে তাই বোধ হয়। কিন্তু পাঠক দেখিবেন, এ ইঙ্গিতে উপস্থিতের উপকার নাই। আমার চৈতন্য আর আমার দেহসংস্থানের ঐ চিদঙ্কুর, এ দুই ভিন্ন না অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তবে আমার মস্তিষ্কের ফুলপ্রত্যক্ষে আমার ফুলপ্রত্যক্ষ হইবে কেন? তুমি সন্দেশ পাইলেই তো আমার সন্দেশ খাওয়া হয় না। আমি আর আমার মস্তিষ্কও এক নহে। এমনই একটা কল্পনার আর এক পিঠ্ দেখিয়া বাচস্পতিমিশ্র হাসিয়াছিলেন,

> তথা চৈকস্মিন্দেহে বহবশ্চেতয়েরন্। ন চ বহূনাং চেতনানামন্যোন্যাভিপ্রায়ানুবিধানসম্ভব ইত্যেক-পাশনিবদ্ধা ইব বহবো বিহঙ্গমা বিরুদ্ধদিক্‌ক্রিয়াভি-মুখাঃ সমর্থা অপি ন হস্তমাত্রমপি দেশমতিপতিতুমুৎ-সহন্তে! (১)

অধিকন্তু, আমার মস্তিষ্কের চৈতন্যই বা জড় ফুলটাকে জানিবে কিরূপে? পক্ষান্তরে যদি আমার চৈতন্য ও আমার দেহসংস্থানের চৈতন্য অভিন্ন হয়, তাহাতেও সেই এক সমস্যাই ফিরিয়া আসে। যে মুহূর্ত্তে দেহ-সংস্থানে 'আমি' স্বস্বরূপে পরাবৃত্ত, সেই মুহূর্ত্তেই আমার দেহসংস্থানও 'আমি-না' জড় অচিৎ। জীবিতদেহসংস্থানই 'আমি', এমত বলিতে পার না। জীবিতদেহসংস্থান প্রাণময়কোশ, জীবন বা প্রাণ বলিতে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস রক্তসঞ্চলন লালাপিত্তঘর্ম্ম-মূত্রাদিরসোদ্‌গম স্নায়ুমণ্ডলের প্রতিক্রিয়া-সামর্থ্য প্রভৃতি বুঝি। এ সব আমার হইতে পারে, কিন্তু 'আমি' এ সব নহি। এ সমস্ত প্রমাণমাত্রসিদ্ধ, কিন্তু সকল প্রমাণের আশ্রয় 'আমি' স্বয়ংসিদ্ধ। আমি চেতন, এ সকল জড়। জড়চেতনের অর্থই তাই। জড় অন্যাধীনপ্রকাশ, চেতন স্বপ্রকাশ। এ প্রভেদটা পাঠক ভুলিবেন না। তাই পঞ্চকোশবিবেকে আছে—

> পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
> বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ। (২)

* An Introduction to the Philosophy of Religion, New Edition, pp. 109-110.

(১) ভামতী, ৩।৩।৫৩

(২) পঞ্চদশী, ৩।৫।

প্রাণময়কোশ আত্মা নহে, কেননা তার চৈতন্য নাই। আবার সেই সংশয়, অচিৎ হইতে চিদ্রূপী জ্ঞানের জন্ম হইল কিরূপে?

প্রাণময় জড়ের মত প্রাণহীন জড়েও চৈতন্য কল্পনা করিয়া লাভ নাই।† ফুল চেতন বা স্বপ্রকাশ হইলেও আমি তাকে জানিতেছি কিরূপে? ফুলের চৈতন্য আর কিছু পিছন হইতে গুটি গুটি আসিয়া আমার চৈতন্যের চোক চাপিয়া ধরিয়া বলিবে না, "এই ফুল, আমি ফুল দেখিতেছি"! স্বয়ম্প্রকাশযতির কথা উদ্ধৃত করি—

কেচিত্তু বিষয়নিষ্ঠস্ফুরণেন ঘটাদিভানমিতি কথয়ন্তি। তদপি ন। বিষয়নিষ্ঠস্যাত্মনা সহ সম্বন্ধাভাবেনাহং জানামীতি সম্বন্ধপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ।

বিষয়স্থিত প্রকাশের সহিত আমার কোনও সংস্রব নাই বলিয়া, আমি জানিতেছি এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া উঠে না। সন্দেশ খাওয়ার কথাটা এখানেও স্মরণ করিলে ক্ষতি নাই। ফলে প্রাণময় হউক আর প্রাণহীন হউক, যাহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বহিরিন্দ্রিয়গ্রহণসাপেক্ষ, তাহা চিরদিনই জড়, চিরদিন জড়ই থাকিবে। কুসুমাণুতে চৈতন্যসত্তা আবিষ্কৃত হউক, তাহাতে কুসুমের রূপ গন্ধ স্পর্শ চেতন হইবে না। চৈতন্যের রূপ গন্ধ স্পর্শ নাই। চৈতন্য বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বহিরিন্দ্রিয়গ্রহণসাপেক্ষ নয়। চৈতন্য প্রমেয় নয়। যার অনুগ্রহে নিখিলপ্রমেয়সিদ্ধি, সে আবার প্রমেয় হইবে কার? "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" রূপ গন্ধ স্পর্শও তাই চেতন নয়, জড়। কেননা তাহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কুসুমাণুতে চৈতন্য কল্পনা করিয়াও এ জড়গুলাকে তাড়াইতে পারিবে কই?

কথাটা তবে এইরূপ দাঁড়াইতেছে। আমি ফুলটা দেখিতেছি, চিৎ জড়কে জানিতেছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু জানিতেছে বলিলেই সব ফুরাইল না। জানে কিরূপে? চিজ্জড়ে সংযোগাদি সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়সম্বন্ধই বা প্রতিষ্ঠিত হয় কিরূপে? প্রত্যক্ষ চিন্ময়। কিন্তু দেখিয়াছি, যে কারণসামগ্রী তার উৎপত্তিতে আবশ্যক, যা ছাড়া তার উৎপত্তি অসম্ভব, তাহা জড়মাত্র। জ্ঞানব্যতিরেকে জড়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও, জড়ের জড়ত্ব বা প্রত্যক্ষকারণত্ব তাহাতে উড়িয়া যায় না। চিজ্জড়ভেদ বা জড়ের প্রত্যক্ষকারণত্বও জ্ঞানেই আছে। এখন, জড় হইতে জড়ের উৎপত্তি বুঝা যায়। কুসুমাণুপুঞ্জের স্পন্দনবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আকাশতরঙ্গ, রেটিনায় প্রতিবিম্ব, তৈজসস্নায়ুর স্পন্দন, মস্তিষ্কের কক্ষাবিশেষে আণব বিকার, এ সকল বুঝিতে পারি, কেন না এ সকলই জড়। কিন্তু জড় মস্তিষ্কের জড় পরিণাম হইতে অত্যন্তবিরুদ্ধ এই অজড় চিদ্রূপী প্রত্যক্ষের জন্ম হয় কিরূপে? দেকার্ৎ, গএলিঙ্ক্স্, মাল্‌ব্রাঁশ্‌ বা লাইব্‌নিট্‌সের ঈশ্বরনামক জবরদস্ত মিস্ত্রীটাকে ডাকিয়া আনিয়া চিজ্জড়ে একটা পেরেক মারিয়া লইলে সহজে গোল চুকিয়া যায়। জড় হইতে স্বভাবতঃই চিৎ

† আমি বলিতে বাধ্য, সূত্রভাষ্যের এক স্থানে—২।১।৬—আচার্য্যও সমস্ত জগতের চেতনতা মানিয়া লইতেছেন। সমস্ত জগৎই চেতন। তবে কোথাও চৈতন্য অভিব্যক্ত, কোথাও অভিব্যক্ত নয়, প্রভেদ এই। কথাটায় লাইব্‌নিট্‌সের Monadology মনে পড়ে। কিন্তু টীকাকারেরা বুঝাইয়াছেন, ঐ ভাষ্য অভ্যুপগমমাত্র। আর পরমসিদ্ধান্ত হইলেও, পাঠক দেখিবেন, তাহা প্রত্যক্ষের কারণরূপে উপস্থিত নয়।

জন্মে মানিলে গোলই থাকে না। আর তা না হইলে একটা সদুত্তর চাই। বেদান্তে কি উত্তর আছে, আর এক বারে দেখিব।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। (২)

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, তাঁহার স্বনাম-খ্যাত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামক পুস্তকে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণ-গণের বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুতরাং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণের একটী বিবরণ উক্ত পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিদ্যানিধি-সংগৃহীত উক্ত বিবরণ কতদূর প্রামাণিক ও সমীচীন, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। সম্বন্ধ-নির্ণয়কার মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোক আছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী" ইত্যাদি। (১৩)

বর্ত্তমান সময়ে, কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও বৈদ্যবাটী, কালীঘাট, কলিকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে, কতিপয় মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা ২।৩ ও কেহ বা ৪।৫ পুরুষ, বাস করিতেছেন বটে; তথাপি তাঁহাদের মেদিনীপুর জেলাস্থ জাতি-বর্গ, অদ্যাপি তাঁহাদের মেদিনীপুর জেলাস্থ আদি বাসস্থানগ্রামে বাস করিতেছেন। মেদিনীপুর জেলা ব্যতীত "বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে" মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-গণের বাস থাকিলে তাঁহাদের সহিত মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণের, নিশ্চয়ই কুটুম্বিতা-সূত্রে, অথবা অন্য কোন কারণে, সংস্রব থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই প্রকার কোন সংস্রব অথবা বাঁকুড়া অঞ্চলে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের বাস সম্বন্ধে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কিছুমাত্র অবগত হওয়া যায় নাই। মেদিনীপুর জেলার বহির্ভাগে "মধ্যশ্রেণীয়" ব্রাহ্মণের নাম শ্রবণ করিলে অনেকেই বিস্মিত হইয়া থাকেন। সুতরাং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় যে ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ। বিদ্যানিধি মহাশয় "মধ্যশ্রেণীয়" ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ শ্রেণীবন্ধন কি কারণে ও কি প্রকারে হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথাঃ—"তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী অর্থাৎ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল ও সাতশতী প্রভৃতি বিপ্রগণ সঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, এই প্রকার শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহ সূত্রে সম্বন্ধ

(১৩) সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ৪।

হইলেন তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধ বংশের লোকেরা মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন। তদবধি তাঁহারা সমাজ মধ্যে মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাঁদিগের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। যজুর্ব্বেদী নিতান্ত বিরল প্রচার। * * * * * ইহাঁরা কহেন, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানদিগের মধ্যে যৎকালে সংগ্রাম হয়, তৎকালে ঐ প্রদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে সমর্থ হন নাই, এবং বিদেশীয়েরাও ঐ প্রদেশে আসিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক প্রকার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রেণীবন্ধন শৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট হয়, এবং সর্ব্বত্র বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, এবং সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। তৎকালে যাঁহারা শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্বান্, তেজস্বী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরম মান্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে এদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল প্রতাপ তপন অস্তমিত হইল। সর্ব্বদ্বারী বিবাহরূপ তদীয় কীর্ত্তি-কোকনদ ম্লান হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ এদেশে বিকীর্ণ থাকিলে, মধ্যশ্রেণীরই শোভা অধিক হইত, তখন সকলেই কহিত, আমরা বৈদিক। ইহাঁরাই কি এখনকার মত মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দিতে যাইতেন? কদাচ সম্ভব বোধ হয় না।" (১৪)

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ, কেবল মাত্র রাঢ়ীয় ও অল্পসংখ্যক বৈদিক (উৎকল) ব্রাহ্মণগণের সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে যে বারেন্দ্র, সাতশতী ও পশ্চিমাবিপ্রগণ, পরস্পর আদান প্রদান সূত্রে, কখনও প্রবেশ লাভ করে নাই, তাহা নিম্নলিখিত কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

(১) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের ভাদুড়ী, মৈত্র, সান্ন্যাল প্রভৃতি একশত গাঁইয়ের একটীও মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নাই। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংমিশ্রণে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত হইলে, নিশ্চয়ই প্রাগুক্ত বারেন্দ্র গাঁই সমূহের অন্ততঃ দুই একটী, শেষোক্ত সমাজে, বিদ্যমান থাকিত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ প্রচলিত। এমন কি, বারেন্দ্র শ্রেণীর এক গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ বা ঋগ্বেদী, কেহ বা সামবেদী এবম্প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-মাত্রই, পরিচয় প্রদান কালে আপনাদের সামবেদ এবং কৌথুমী শাখা এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে যে কেবল মাত্র সামবেদ প্রচলিত, ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান বারেন্দ্র ভূমি হইতে বহুদূরবর্ত্তী, রাঢ় ও উৎকল ভূমির মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভূভাগ মাত্র। সুতরাং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজগঠন সময়ে, উক্ত সমাজে, সুদূর বরেন্দ্র দেশ হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের প্রবেশ লাভের বিষয় উল্লেখ করা কেবল মাত্র অলৌকিক কল্পনা শক্তির পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। (১৫)

(১৪) সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ৫৪, ৫৮, ৫৯।

১৫। "বস্তুতঃ। বারেন্দ্রগণ মধ্যে ত্রিবেদের

(২) মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই পশ্চিমাবিপ্রগণের দোবে, চোবে, তেওয়ারি ও পাঁড়ে প্রভৃতি পদবী অথবা উপাধিবিশিষ্ট নহেন। পশ্চিমা ব্রাহ্মণ মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইলে অবশ্যই উক্ত সমাজের কাহারও না কাহারও দোবে, চোবে প্রভৃতি উপাধি থাকিত।

(৩) এক্ষণে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে সাতশতী ব্রাহ্মণ প্রকৃত লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে কিনা, তাহা আলোচিত হইয়াছে। মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃত-কৌশিক, গৌতম ও পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদের এইরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কালক্রমে আদান প্রদান সূত্রে তাঁহারা মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন, উক্ত গোত্র চতুষ্টয় সম্ভূত বিপ্রগণের কোনও গাঁই নাই, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যদিও উক্ত সমাজে কেবল মাত্র ২।৩ ঘর পিতাড়ী পদবী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কাশ্যপ গোত্র এবং তাঁহারা আদৌ রাঢ়ীয় ছিলেন, এই প্রকার পরিচয় দিয়া থাকেন। সম্বন্ধনির্ণয়কার সাতশতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি যথা;—"সাতশতীদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাপি অন্যের সহিত মিশিতে পারেন নাই, অথবা মিশিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহাদিগের পরিমাণ অতি অল্প। ইহাঁদিগের মধ্যে পিথুড়ী, বালথুবি, নানক-সাই (নালসী) জগাই, ভাগাই, যবগ্রামী, কাটানী গাঁই, আরথ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।"

সাতশতীগণ পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গ্রামীন হইতে পৃথক্, সুতরাং ইহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। * * * * * * কলিকাতার পিথুড়ী, ২৪ পরগণার জয়নগর, পলাবাড়ী ও কুটীগোদ অঞ্চলের পিথুড়ী, এবং হুগলীর শিয়াখালা পাতুল গ্রামের পিথুড়ীগণ ও সাতশতী পিথুড়ীরা পরাশর গোত্র সম্ভূত। এক গ্রামীনেরা পরস্পর জ্ঞাতি ভাবাপন্ন"

সম্বন্ধ নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৫২-৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে পরাশর গোত্রীয় সাতশতী পিথুড়ী এবং কাশ্যপ গোত্রীয় মধ্য-শ্রেণীয় পিতাড়ী যে এক ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। কিন্তু কি কারণে যে শেষোক্ত ব্রাহ্মণের পিতাড়ী পদবী হইয়াছে,

---

চর্চ্চা আছে। * * * * আরও দেখা যাইতেছে যে, বারেন্দ্রদিগের মধ্যেও এক গোত্রে এক বেদ নির্দ্দিষ্ট নাই। যখন তাহা নাই, তখন ঐ শ্রেণীতেও বেদ ভ্রংশ দোষ ঘটিয়াছে, ইহা কখনই অস্বীকার করিবার উপায়ান্তর দেখা যায় না। যথা;—বারেন্দ্র শ্রেণীর ভরদ্বাজ ও বাৎস্য গোত্রের কতকগুলি ঋগ্বেদী ও কতকগুলি সামবেদী। কাশ্যপ গোত্রের অধিকাংশ যজুর্ব্বেদী, অল্পাংশ সামবেদী, কতক ঋগ্বেদীও দেখা যায়। শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রায়শঃ সামবেদী, অত্যল্পাংশ ঋক্‌ ও যজুর্ব্বেদী"। সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বিতীয় সংস্করণ ৪৯৮—৪৯৯ পৃষ্ঠা দেখ।

"রাঢ়ীয় কুলে অধিকাংশ সামবেদী ব্রাহ্মণ, ইহা-তেই রাঢ়ীয় ঘটকেরা কহেন, আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের উক্তির সমর্থন জন্য প্রমাণও দর্শান। কিন্তু সেই প্রমাণের প্রতি সন্দেহ করিবার অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, প্রথমতঃ যদি এক সামবেদী ব্রাহ্মণই আদিশূর আনিয়া-ছিলেন, তাহা হইলে, বারেন্দ্র কুলে কেন ঋগ্বেদী যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগোচর হয়। বারেন্দ্র শ্রেণীতে ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প নহে"।

গৌড়-ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪৮ পৃষ্ঠা।

তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, সম্বন্ধ-নির্ণয়কার সাতশতী ব্রাহ্মণগণের কতকগুলি গাঁইয়ের (১৬) উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে উক্ত গাঁইসমূহের কোন একটী গাঁইবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দৃষ্টি-গোচর হয় না। সুতরাং যতদূর অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে সাতশতী ব্রাহ্মণ যে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সম্বন্ধনির্ণয়কার "রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল ও সাতশতী" বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইহাদের পরে আর একটী "প্রভৃতি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, সাতশতী, উৎকল, দাক্ষিণাত্য, বৈদিক ও পশ্চিমা ব্যতীত আর কি কি প্রকার ব্রাহ্মণ যে মধ্যশ্রেণীয় সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মগণের মধ্যে কোন্ বেদ প্রচলিত, এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহাদের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। যজুর্ব্বেদী নিতান্ত বিরল প্রচার।" কিন্তু উক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে ঋগ্বেদী অথবা যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের নাম গন্ধও নাই, তাহা পুনঃ পুনঃ লেখা বাহুল্য মাত্র। মুসলমান এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংগ্রামকালে মহারাষ্ট্রীয় আধিপত্যে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ গঠিত হইলে, নিশ্চয়ই এতদ্বিষয়ক কোনও প্রকার কিম্বদন্তী উক্ত সমাজের কাহারও না কাহারও মুখে অবগত হওয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত সমাজে মহারাষ্ট্রীয় সংস্রবের অথবা আধিপত্যের কিছুমাত্র চিহ্ন কখনও বিদ্যমান ছিল না এবং অদ্যাপিও নাই। যে মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপ, বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত যবনশ্রীকে প্রকম্পিত করিয়াছিল, যে মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণের (১৭) অত্যাচার শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া বঙ্গদেশের সামাজিক উন্নতির মূলে সামাজিক কুঠারাঘাত করিয়াছিল; সেই মহারাষ্ট্রীয় শক্তি যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ সম্পূর্ণরূপে অক্ষত রাখিয়া, মেদিনীপুর জেলায়, বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ হইতে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ লইয়া, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান সংঘটন করাইয়া, এক নূতন ব্রাহ্মণশ্রেণী সংগঠিত করিয়াছিল, ইহা কোনও ব্যক্তির নিকট সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের

১৬। "সাগাই সুরাই, নাল্সী বর্গাই হাঁসাই কাদাই ধাঁই।
বাঙ্গী বাণ্টুরী ধায়ী কাটানী কুশলোজ্জ্বল গাঁই॥
কাশ্যপ কাঞ্চারী বাতারি পিতারি নাতারি আর বেরু।
বাসরাই টুরুক ঝঝ্ঝর মুরুক, ফর্ফর কুন্দুক কেরল চেচরু॥
বাল্থুবী পুংসিক দীঘল গাঁই তাদাড়ীভট্টশালী করঞ্জ তাই।
আদিত্য কামদেবে, কোঁয়াড়ী পূর্ব্বদিকে সকলকে পাই॥
নগড়ি দগড়ি হামসে চাই কৌণ্ডিল্য বাপারি বাগুরাই।
বেলাড়ি আদি মিশে রাঢ়ী বারেন্দ্রে সাতশতী কমে যাই॥"
"মুলো পঞ্চাননের কৃত সারাবালীর কারিকা" সম্বন্ধনির্ণয় ২য় সংস্করণ পৃ ২৪৩।

(১৭) বোধ হয় ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বর্গীর হাঙ্গামার বিষয় অবগত আছেন। অদ্যাপি মেদিনীপুর জেলায়, বর্গীর হাঙ্গাম সংক্রান্ত গাথা প্রতিগৃহে গীত হইয়া থাকে।

অনেকেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের নামোল্লেখ না করিয়া বরং বল্লালসেন, দেবীবর, ও গঙ্গাধরের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বীয় অধিকার বৃদ্ধি এবং লুণ্ঠন ব্যপদেশে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিল। এবং এতন্নিবন্ধন তাহারা একস্থানে অধিক দিন ধরিয়া বাস করিয়া থাকিত না। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয় শক্তি কর্ত্তৃক মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজ-গঠন-সম্বন্ধে সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতার উক্তি সমীচীন বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যানিধিপ্রদত্ত মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ অধিকাংশই উক্ত সমাজের প্রকৃত অবস্থার বিপরীত।

"The Tribes and castes of Bengal" নামক পুস্তকে মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের একটী বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে বোধ হয়, উক্ত পুস্তকপ্রণেতা শ্রীযুক্ত রিজলী মহোদয়, স্বয়ং বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, কোন বিদ্বেষ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগৃহীত উক্ত বিবরণটী স্বীয় পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত রিজলী মহোদয় এতদ্দেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অবস্থাসম্বন্ধে স্বয়ং বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন। তিনি, পরের মুখে যাহা অবগত হইয়াছেন, অথবা অন্যে তাঁহাকে যাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সমাজ সম্বন্ধে "মণ্ডদোষী" প্রভৃতি কতকগুলি অলীক নিন্দাবাদ তাঁহার পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়ায় তাঁহার গবেষণাপূর্ণ পুস্তক হতাদরতার প্রশ্রয় দিতেছে মাত্র। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাবই দৃষ্টিগোচর হয়। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীয়ব্রাহ্মণের দোষকীর্ত্তন করিয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে যত্নবান হইয়া থাকেন। বাঙ্গালী জাতির এইরূপ বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইলে, এই বঙ্গদেশ, দুর্দ্দশা-রাহুর করালগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া, প্রাচীন আর্য্যগৌরবতপনের সুবিমল কিরণচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত হইবে, সন্দেহ নাই। রিজ্‌লী মহোদয়-প্রদত্ত বিবরণে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের পঞ্চগোত্র কিন্তু মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ আদৌ রাঢ়ীয় হইলে তাঁহাদের মধ্যে তদধিক গোত্র কেন আছে, এইরূপ আপত্তি আছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যেরূপ মধ্য-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে আপনাদের সংখ্যার ন্যূনতাবশতঃ কতিপয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেইরূপ পঞ্চগোত্রের বহির্ভূত সাতশতী ব্রাহ্মণও নানা কারণে রাঢ়ীয় সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা:—

(১) "বংশজ, গৌণকুলীন ও সপ্তশতী সম্প্রদায়ের কন্যা বিবাহ করিলে, এককালে কুলক্ষয় ও বংশজ ভাবাপত্তি ঘটে। ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর বংশজ কন্যা বিবাহ করেন; গঙ্গানন্দ-ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলুকজুরী কন্যা বিবাহ করেন। * * * * মুলুকজুড়ী, পঞ্চগোত্র-বহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়ের অন্তর্বর্ত্তী; * * * * * * *" বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ২৭।২৮।

(২) "পূর্ব্বকালে মুলুকজুড়ী, পিথুড়ী, কাশ্যপকাপ্পড়ী, সুরাই প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করিয়া রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীনগণ দোষাশ্রিত হন। তদবধি যে সকল ব্যক্তি

ঐ সকল গ্রামীণের সংস্পৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তদ্‌ভাবাপন্ন জ্ঞান করিয়া দূষিত করা হয়। তদনুসারে রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীনগণ-মধ্যে কয়েকটী থাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। * * * * * * * সাতশতীরা রাঢ়ী শ্রেণীর ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। * * * * *" * * * * সম্বন্ধ-নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ২৪৬।

সুতরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট পঞ্চেতর গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ নাই, এইরূপ অসার আপত্তি নিরাকৃত হইল। বিদ্বেষচক্ষে দৃষ্টি করিলে সকলেরই দোষোদ্‌ঘাটন করিতে পারা যায়। (১৮)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

"মধ্যশ্রেণী এই আখ্যা কেন হইল?"

মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে, বঙ্গদেশের তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এইজন্য তিনি, স্বীয় যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে, বেদজ্ঞ, আর্যপ্রতিভা-সম্পন্ন শ্রীহর্ষ প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ এদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। (১৯) রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং ভরদ্বাজ প্রভৃতি পঞ্চগোত্রসম্ভূত মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ উক্ত মনীষিপঞ্চকের সন্তান। আদিশূরের পরবর্ত্তী মহারাজ বল্লালসেনের রাজত্ব-সময়ে, কান্যকুব্জাগত দ্বিজ পঞ্চকের অনন্তরবংশীয়গণের বঙ্গদেশের, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস অনুসারে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সংজ্ঞা হইয়াছিল, যথা:—

"বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, আদিশূরের দৌহিত্র বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে কান্যকুব্জাগত দ্বিজ পঞ্চকের অধস্তন বংশাবলী দুই পৃথক্ সম্প্রদায়ে

(১৮) ডাক্তার হাণ্টার সাহেবও বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন যথা:—"ডাক্তার হণ্টার সাহেব "আনালস্ আব্ রুরাল বেঙ্গল" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডে রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রস্তাবে লিখিয়াছেন "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জাগত বিপ্রগণের বৈধপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশ। ডাক্তার হণ্টার বিদেশীয় লোক, তিনি রাঢ়ী বারেন্দ্রগণের কুল সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ঈর্ষাপরায়ণ অথবা অনভিজ্ঞ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াই বিশেষ অনুসন্ধান এবং বিবেচনা ব্যতিরেকে অপ্রকৃত তত্ত্ব আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন।"

গৌড়েব্রাহ্মণ দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ।৴

(১৯) "মহারাজাধিরাজ অশোক রাজার সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের লোপ পায়। এমন কি, এদেশ হইতে এককালে ব্রাহ্মণ্য রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদিশূরের যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাতশত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ছিল না। এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগের প্রভাবে এমন নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগের প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। ইহাঁদিগের মূর্খতা-নিবন্ধন রাজাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল। ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু উক্ত যাগসিদ্ধি বিষয়ে এককালে হতাশাস হইলেন না। তৎক্ষণাৎ (৯৯৯ সংবতে) কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন সচ্চরিত্র সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ, যজ্ঞনিপুণ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন।"

সম্বন্ধ-নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ ১৪।১৫।

আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীমিতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়য়ামাস। কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র।" বহুবিবাহ। ১৫

বংশ।	আধুনিক বাসস্থান।	গোত্র।	কে কিরূপ ঘরে কন্যাদান করিয়াছেন।
কাটানীগাঁই বা বংশ	বুনোন পরগণা, সেনহাটী	কাশ্যপ	ফুলে, খড়দা, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী এই চারি মেলে।
পিতুড়ী	কলিকাতা ২৪ পরগণা	পরাশর	বল্লভীমেলে।
ফর্ক্বরছত্রিকা	ভট্টাচার্য্য কামালপুর চাকদার নিকট (নদীয়া জেলা)।	কাশ্যপ	ফুলে,খড়দা,বল্লভী ও সর্ব্বানন্দীমেলে।
কাশ্যপ কাঞ্জাড়ী (রায় গোষ্ঠী)	শ্রীরামপুর, লকপুর (যশোহর)	এক্ষণে কাশ্যপ	প্রথমে খড়দা, পরে অন্য মেলে।
যবগ্রামী গোস্বামী	শিঙের কোণ, ভৈঁটে পালশীট, মাচ্ছর, নবগ্রাম প্রভৃতি স্থল।		
যবগ্রামী-রায়	লাড়ুগ্রাম (বর্দ্ধমান জিলা)	গৌতম	ফুলেমেলের রমণ ঠাকুরের সন্তান, উলায় নিবাস।
নালসী রায়	শিমলাগড় (হুগলী)	বশিষ্ঠ	ফুলেমেলের মুখোপাধ্যায়। ঐ
কড়ারী	পদ্মানদীর দক্ষিণ ধারে বিক্রমপুর (ঢাকা)	পরাশর	বেগের গাঙ্গুলিবংশে ও গঙ্গানন্দ চট্টো সন্তানের কোন কোন ঘরে।"

বিভক্ত হয়। যাঁহারা রাঢ়ে নিবাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় সংজ্ঞা ও যাঁহারা বরেন্দ্রভূমে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। বল্লাল নিজের শেষাবস্থায় ব্রাহ্মণাদির কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপিত করেন। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে ইহাও কথিত আছে যে, যৎকালে বল্লালসেন রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ করেন, তৎকালে সমস্ত বাঙ্গালায় কান্যকুব্জদিগের ১১০০ শত ঘর বসতি হইয়াছিল। এই এগার শত ঘরের মধ্যে রাঢ়ে ৬৫০ ও বরেন্দ্রভূমে ৪৫০ নির্দ্দিষ্ট হয়। রাঢ়-দেশবাসীগণ রাঢ়ী ও বরেন্দ্রভূমি-নিবাসীরা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।" সম্বন্ধ-নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ। ২৭২।২৭৩ পৃ।

"ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ
বল্লালসেন নৃপতি রজায়ত গুণোত্তরঃ॥
রাঢ়ায়াং গৌড়বারেন্দ্রসুহ্মবঙ্গোপাঙ্গকে।
অধিকারোঽভবত্তস্য বলবীর্য্য প্রভাবতঃ
কান্যকুব্জান্বয়ান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বা চাতিগুণোত্তরান্।
আদিশূরস্য নৃপতির্যশোমূর্ত্তী নিবস্থিতান।
আদিশূরস্থ যশসঃ পশ্চাদ্বর্ত্তি যশো মম।
যথা ভ্রমাৎ সঞ্জং গেহে তথৈব বিদধাম্যহম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূপালঃ কৃতবান্ শ্রেণীনির্ণয়ম্॥
স্থিতা রাঢ়দেশে দ্বিজ যে সমেতাঃ
কৃতা তেন রাঢ়ীয় সংজ্ঞা হিতেষাম্।
তথা গৌড়দেশস্থিতানাং দ্বিজানাম্
কৃতা তেন বারেন্দ্র সংজ্ঞা প্রসিদ্ধা॥
বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জী।"
গৌড়েব্রাহ্মণ দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ ৬২।৬৩

সুতরাং রাঢ় ও বরেন্দ্রদেশে বাস অনুসারে যে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের অধস্তন সন্তানবর্গের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সংজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। (২০)

(২০) "সেনবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বল্লালসেনই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ****। তিনি একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন, এবং বাঙ্গালাদেশ নিম্নলিখিত পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত করেন; ১ রাঢ়, ২ বারেন্দ্র, ৩ বাগড়ি, ৪ বঙ্গ, ৫ মিথিলা। *** বল্লালসেনের দেশবিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ হইয়াছে।" রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস।
পৃ ১১.১২

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বি,এল

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ।

মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য মুক্তি। মুক্তির তিনটী পথ—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, এবং ভক্তিযোগ। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই এক মাত্র সৎপদার্থ—বেদান্ত মতে এইরূপ অবিচ্ছেদ জ্ঞানই মুক্তি। সাংখ্য মতে, পুরুষ-প্রকৃতি-বিযুক্ত হইলেই, মুক্তি লাভ হয়। ভক্তি বশে উপাস্য দেবতার সহিত একাত্ম হওয়াই পুরাণ মতে মুক্তি। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন 'মুক্তি হবে কবে ?" "আমি যাব যবে"। উপরোক্ত মত সকলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। বেদে কর্ম্মযোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত, উপনিষদে জ্ঞানযোগের প্রাধান্য বিঘোষিত, পুরাণে ভক্তিযোগের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হই-

রাছে। গম্যস্থান তিনেরই এক, পথ তিনটী, পথপ্রদর্শকও তিনটী। সুতরাং প্রত্যেকে স্বীয় মতের গুণকীর্ত্তন, এবং প্রতিপক্ষের মতের দোষ কীর্ত্তন করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি, ইহারা পরস্পর-বিরোধী এবং নিরপেক্ষ নহে। আমি কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল বিবেচনা করি—তাহার পরিণাম চিন্তা করি; এই চিন্তা এবং বিবেচনা—জ্ঞান সাপেক্ষ। যাঁহারা সদাত্মা, তাঁহারা প্রলোভনকর্ত্তৃক বিজিত হন না, জ্ঞানের আদেশানুযায়ী কার্য্য করেন। যেখানে জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠিত হয়, সেখানে 'কর্ম্ম' এবং 'জ্ঞানের' সম্প্রীতি; যেখানে তদ্বিপরীত, সেখানে 'কর্ম্ম' এবং জ্ঞানের বিরোধ; কিন্তু কর্ম্ম এবং জ্ঞানের পরস্পর সাপেক্ষত্ব কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না। যখন প্রকৃত এবং পূর্ণজ্ঞান জন্মে, তখন মনুষ্য জীবন্মুক্ত; তখন কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না। কর্ম্ম যখন উপাস্য দেবতার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিযুক্ত, তখন কর্ম্মও ভক্তির মিলন, কর্ম্ম তখন ভক্তিপ্রণোদিত। ব্রহ্ম এক মাত্র সৎ পদার্থ; তাঁহার অর্চ্চনা, বন্দনা এবং উপাসনাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই তাহার মঙ্গল—এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে ভগবদ্ভক্তি আরম্ভ হয়। এখানে ভক্তি এবং জ্ঞানের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য। সৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়; নির্ম্মল চিত্ত ভক্তি এবং জ্ঞানের সহায়। সুতরাং কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ পরস্পর বিরোধী নহে। ইহারা পরস্পর বিরোধী না হইলেও, ইহাদের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। বেদে কর্ম্মের, উপনিষদে জ্ঞানের, এবং পুরাণে ভক্তির জয় গীত হইয়াছে। এইজন্য পূর্ব্বে কর্ম্ম, তৎপর জ্ঞান এবং সর্ব্বশেষে ভক্তির অবতারণা হইয়াছে—এইরূপ বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। ইহার সপক্ষে যুক্তি না আছে, এমত নহে; কিন্তু তাহা অকাট্য—এরূপ বলা যায় না। বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ ইহাদের কাল নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কালনির্দ্দেশ কল্পে যে সকল মতামত প্রকাশ হইয়াছে—তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। পণ্ডিত মোক্ষমুলর ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সুধীবর রমেশচন্দ্র প্রভৃতি খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে দুই সহস্র বৎসর হইতে চতুর্দ্দশ শত বৎসর পর্য্যন্ত কালকে বৈদিক কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'উপনিষদ' খ্রীষ্ট জন্মের ১১০০ একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়। ইহার পরে পুরাণ লিখিত হইয়াছে। উইলসন সাহেব এবং রমেশচন্দ্র উভয়েই খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর হইতে পৌরাণিক কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মতের সমীচীনতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ। বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে ইহা ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। বেদ এবং উপনিষদ উভয়ই শ্রুতি; পুরাণ স্মৃতির অন্তর্গত। বেদের অপর নাম পূর্ব্ব মীমাংসা, এবং উপনিষদের অপর নাম উত্তর মীমাংসা। উপনিষদ বেদের শেষ ভাগ বলিয়া উহাকে বেদান্ত বলে। পুরাণ যে ইহাদের পরে লিখিত, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটীর দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

নিগম কল্পত রোর্গলিতং ফলং
শুক মুখাদমৃত দ্রব সংযুতং

পিবত ভাগবত মালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা।
(শ্রীমদ্ভাগবৎ ১ম স্কন্ধ, ৩য় শ্লোক।

"হে রসিক ভাবুক বৃন্দ! বেদরূপ কল্পতরু হইতে চ্যুত এবং শুকদেব-মুখ-বিনিঃসৃত অমৃতরস-সংযুক্ত ভাগবৎ রস পৃথিবীতে মোক্ষ লাভ সময় পর্য্যন্ত সতত পান কর।" শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণ বিশেষ; উহা যে বেদের পরে লিখিত, তাহা উদ্ধৃত শ্লোক হইতে প্রমাণিত হইতেছে। কল্কিপুরাণে বুদ্ধদেবের অবতারত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং উহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে লিখিত। উপনিষদ বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে লিখিত। ইহা হইতে পুর্ব্বে বেদ, তৎপর উপনিষদ এবং তৎপর পুরাণ রচিত হইয়াছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না। ইহা মানিলে পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ, তৎপর জ্ঞানযোগ, এবং পরিশেষে ভক্তিযোগের অবতারণা হইয়াছে—ইহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে। হিন্দু শাস্ত্র বিবর্ত্তবাদের বিরোধী নহে। ধর্ম্মমতের ক্রমিক উৎকর্ষই স্বাভাবিক। তাহাতেও কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সমর্থিত হইবে।

কর্ম্মযোগ—বৈদিক সময়ে কর্ম্মের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। এই কর্ম্ম ক্রমে নিরর্থক যাগ যজ্ঞে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়াও তাহার অনুষ্ঠান করিলেই ফললাভ হয়—এ বিশ্বাসেরও অসদ্ভাব ছিল না। বৈদিক সময়ের লোক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিমোহিত হইয়া তাহারই অর্চ্চনা বন্দনা করিতে আরম্ভ করেন। তখন প্রকৃতির শক্তির প্রত্যেক বিকাশে ব্যক্তিত্ব (personality) আরোপিত হইত। প্রত্যেক শক্তিকে দেবতাবোধে পূজা অর্চ্চনা করা হইত। যাহা কিছু বৃহৎ, যাহা কিছু মহান্ এবং সুন্দর, তাহাকেই ভগবচ্ছক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ বলিয়া পূজা করার বিধান ছিল। আকাশ, জল, বায়ু, অগ্নি, ঊষা, চন্দ্র, সূর্য্য, সকলকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা অর্ঘ্য প্রদত্ত হইত। তরুণ-অরুণ-রঞ্জিত পূর্ব্বাকাশ, মৃদুমন্দ সমীর-হিল্লোল, বিহঙ্গনিচয়ের শ্রবণ-সুখকর কূজন, প্রস্ফুটিত কুসুমাবলী প্রভৃতি ঊষার চিরসহচর। এরূপ সৌন্দর্য্যের আধার ঊষাকে বন্দনা এবং পূজা করা বৈদিক সময়ের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়; বসুন্ধরা তাঁহার আলোক-স্নাত হইয়া কি অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করেন; সূর্য্য উদিত হইয়া নিদ্রিত জগৎকে জাগ্রত করে; সূর্য্যকিরণে বসুন্ধরার প্রভূত উপকার সাধিত হয়; তাই তাঁহার নাম সবিতা। ইন্দ্র আকাশাধিপতি; তাঁহার কৃপায় বৃষ্টি পতিত হইয়া বসুন্ধরাকে উর্ব্বরাশক্তি প্রদান করে। অগ্নি যজ্ঞধুম দেবতাদিগের নিকট বহন করে। বায়ু ও জল—মানুষের প্রাণ। বৈদিক সময়ে ইহাদের সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পূজা এবং অর্চ্চনা করা হইত। যাগ যজ্ঞ দেবতাদিগের তুষ্টি বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হইত;* নিষ্কামভাবে কোন যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত না। কামনা—ধন, মান, যশ। রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য, পুত্রাদি লাভের জন্যও যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। ঘৃত, মধু, দুগ্ধ,

"পুনরিহ বিধিকৃত-দেবধর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত নানাদর্শন সংঘৃণঃ।
সংসারকর্ম্মাত্যাগবিধিনা ব্রহ্মাভ্যাসবিলাস চাতুরীম।
প্রাকৃতিবিমাননামসম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতারস্তমসি॥"
(কল্কিপুরাণ)

সোমরস প্রভৃতি অর্চ্চনা করিলে আধ্যাত্মিক বিশেষ কি উন্নতি হয়, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ইহা ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ নহে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেবতা জ্ঞানে প্রাকৃতিক শক্তির অর্চ্চনা বিধান থাকিলেও উহা ব্রহ্মেরই বিশেষ বিশেষ বিকাশ, এই ভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাহা না হইলেও উহা যে ক্রমে গৌণভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বৈদিক সময়ের কর্ম্ম-যোগ—যাগ যজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভগবদর্চ্চনা অন্তরের কথা, উহা বাহ্যিক বিধানের দ্বারা সম্যক সাধিত হয় না। যে কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা জন্মে, তাহা নিষ্কাম সদনুষ্ঠান; একমাত্র যাগযজ্ঞের দ্বারা তাহা সংসাধিত হয় না। কর্ম্মের উদ্দেশ্য চিত্তের উৎকর্ষ সাধন—তাহা লাভ হইলে কালে মুক্তি হইবে; সুতরাং কর্ম্মযোগ মুক্তিলাভের গৌণ-উপায় মাত্র। বৈদিক সময়ে ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না। যাঁহারা যজন যাজন করিতেন—তাঁহারই ব্রাহ্মণ নামের বাচ্য হইয়াছিলেন—কালে উহাই শ্রেণীবিভাগের কারণ হইয়া উঠে। যাঁহারা যজন যাজন ক্রিয়াভিজ্ঞ, তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, নীতি, ধর্ম্ম বিষয়ে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। এই শ্রেষ্ঠত্বই ব্রাহ্মণ-দিগের সকল বিষয়ে নেতৃত্বের মূলীভূত কারণ। যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপাভিজ্ঞতা প্রাধান্য-প্রদায়ক এবং উপার্জ্জনেরও প্রকৃষ্ট পথ। এই প্রাধান্য এবং উপার্জ্জন পন্থা নিষ্কণ্টক রাখিবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কালে ইহা শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য, নৈতিক শৈথিল্যের সহিত মিশাইয়া গিয়াছিল। পোপদিগের চরিত্রই ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

কর্ম্মযোগ মুক্তির গৌণ উপায় হইলেও, ইহা আত্মোৎকর্ষ সাধনের একটী প্রধান উপায়। সংসারে সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে কর্ম্মে ব্যাপৃত, নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেহই বসিয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্মের অনুষ্ঠান যখন করিতেই হইবে, তখন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানই প্রশস্ত; উহার দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধিত, এবং সমুদায় মঙ্গল বিহিত হয়। অপর পক্ষে অসৎ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য স্বয়ং দুর্ব্বিনীত এবং সংসার কলুষিত হয়। সংসারে যে অশান্তির আর্ত্তনাদ সর্ব্বদা কর্ণগোচর হয়—তাহা অসৎ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। পৃথিবীতে সময় সময় সাধু-লোকের আবির্ভাব হওয়ায় সংসারে নরকের পরিণাম হইতে রক্ষা পাইতেছে। তাহাদের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব কখনও হয় না; তাহা হইলে নর-রাক্ষসের তাণ্ডব নৃত্যে সংসার এক ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইত। সাধুদিগের সদানুষ্ঠান দ্বারাই সেই ভয়াবহ পরিণাম হইতে সংসার সুরক্ষিত। অধিকাংশ লোক যে সকল অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা ব্যাপৃত, তাহা নীচতাপূর্ণ এবং স্বার্থ-বিজড়িত। তাহার দ্বারা নিজ নিজ জীবন কলঙ্কিত, সংসার ক্লিষ্ট। ঘোরসংসার-পরায়ণতা সৎকর্ম্মের পরিপন্থী। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য কর্ত্তব্য বোধে সংসারে কার্য্য করা বিধেয়; কিন্তু লক্ষ্য উচ্চে থাকা আবশ্যক, নচেৎ পতন অবশ্যম্ভাবী। 'পদ্মপত্রমিবাম্ভস'—এই ভাব মনে প্রবল রাখিয়া সংসারে কার্য্য করিলে আত্মোৎকর্ষের ব্যাঘাৎ হয় না। লোক-সেবা—এক পবিত্র ব্রত; কিন্তু তাহাকে যশ মান প্রভৃতি কামনা বিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। হাওয়ার্ড (Howard) কারাগার সংস্কার বিষয়ে

ফাদার ডেমিয়েন আর্ত্ত সেবায়, ম্যাট্‌সিনী স্বদেশের উদ্ধার-কল্পে, সেমুয়েল রোমিলী আইন বিধানের কঠোরতা অপনোদন হেতু, কসুথ স্বদেশের উন্নতি সাধনে, লুথার নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তদ্বারা সংসারের আদর্শ সহস্রগুণে উন্নীত, এবং কোটী কোটী নরনারীর মুক্তির পথ প্রসারিত হইয়াছে।

জল বায়ুর উপর মনুষ্যের আকার, গঠন, বর্ণ, প্রকৃতি, প্রভৃতি নির্ভর করে। শীত-প্রধান দেশের অধিবাসিগণ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের অধিবাসিগণ অপেক্ষা সবল, কর্ম্মঠ, এবং পটু। ইউরোপ মহাদেশ উত্তর-নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল মধ্যে অবস্থিত। ইহার অধিবাসিগণ এইকারণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ, বলিষ্ঠ, তেজবিশিষ্ট। ইহারা কর্ম্মপটু, ক্লেশসহিষ্ণু, সাহসী এবং স্থির-প্রতিজ্ঞ। এসিয়া মহাদেশের কতকাংশ কতকাংশ উষ্ণ মণ্ডল অন্তর্গত, ইহার জল বায়ু ইউরোপের অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। ভারতবর্ষের চারি ভাগের তিনভাগ উষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত, ইহা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ। ইহার অধিবাসিগণ ইউরোপের অধিবাসিগণ অপেক্ষা অসুস্থ, হীনবল, এবং অল্পায়ু। উষ্ণতাধিক্য হেতু ভারতবাসিগণ অপেক্ষাকৃত অপটু, অল্প ক্লেশ-সহিষ্ণু; উষ্ণতা অবসাদক এবং শিথিলতা উৎপাদক। সার কোমর পেথারাম অবসর গ্রহণ করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে একক্রমে বিংশতি বৎসর বাস করিলে, ইউরোপীয়গণ হীনবল এবং হীন-তেজ হইয়া পড়েন, এবং তাঁহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় এবং ষাট্ বৎসরের পর আর তাঁহাদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। জলবায়ু গুণে ইউরোপবাসিগণ ভারতবাসী অপেক্ষা কর্ম্মপটু। ইউরোপ মহাদেশ মধ্যে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলস এবং আয়রলণ্ডের জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর।" জলবায়ু এবং অন্যান্য কারণে ইউরোপে কর্ম্ম যোগের এবং ভারতবর্ষে জ্ঞান এবং ভক্তি যোগের আধিক্য পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছিল। সময়ে জ্ঞান চর্চ্চায় ও ইউরোপ পৃথিবীর শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছেন—একথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে। ইউরোপে যাহারা জীবিকা উপার্জ্জন হেতু সর্ব্বদা পরিশ্রমে নিযুক্ত, এবং সংসার-সংগ্রামে বদ্ধপরিবার, কেবল তাহাদিগকে কেন, যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভাবিতে হয় না এবং যাহারা অতুল বৈভবের অধিকারী, তাহাদিগের মধ্যেও অনেককে কর্ম্মযোগী বলা অত্যুক্তি নহে। ফেডরিক দি-গ্রেট, নেপোলিয়ন, বেকন, ক্রমওয়েল, লর্ড ব্রুহাম, কবডেন, পিল, পামারষ্টোন, ডিজ্‌রেলি, গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মযোগী ছিলেন। Review of Reviews পত্রিকার সম্পাদক ষ্টেড সাহেব দণ্ডায়মান অবস্থায় লিখিবার কার্য্য করিয়া থাকেন। আমাদের বড়লাট লর্ড কার্জ্জন দৈনিক ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ভারতবাসী, বিশেষ বাঙ্গালী অল্প বয়সেই অজীর্ণ (Dyspepsia) ম্যালেরিয়া এবং বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া, জীবলীলা সম্বরণ করেন। কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। কর্ম্ম করিবার যে সামান্য ক্ষমতা থাকে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের জীবন-সংগ্রামে ব্যয়িত হইয়া যায়; পরার্থ-চিন্তা করিবার তাহার অবসর থাকে না। প্রাচীন-কালে জীবিকার জন্য ভারতবাসীকে ভাবিতে হইত না। জীবিকার জন্য যে সকল বস্তুর

প্রয়োজন, তৎকালে তাহা এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং এত সহজ-লভ্য ছিল যে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাহাকেও বিব্রত হইতে হইত না। এইজন্য ভারতবর্ষে তৎকালে কর্মযোগের হ্রাস এবং জ্ঞান এবং ভক্তি যোগের আধিক্য ছিল। ভগবচ্চিন্তার বিঘ্ন, অত্যন্ত সংসার-পরায়ণতা; জীবন-সংগ্রাম গুরুতর হইলে সংসার-পরায়ণতার আধিক্য হয়। দেহমন তাহাতেই নিযুক্ত এবং যশাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইলে জ্ঞানচর্চা ভক্তিভাব কোথা হইতে আসিবে? প্রাচীন ভারতবর্ষে সংসার চিন্তার অত্যন্ত প্রয়োজনাভাব হেতু জ্ঞান এবং ভক্তির বিশেষ বিকাশ দেখা গিয়াছিল। যে দেশের, যে জাতির, যে প্রকৃতি আবহমান কাল চলিয়া আসে, কারণ বিপর্য্যয়-হেতু তাহার কথঞ্চিত পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, ভিত্তি বিলোড়িত হয় না। সেইজন্য এখনও ভারতবাসীর জ্ঞান-পিপাসা এবং ভক্তিভাব অপেক্ষাকৃত প্রবল। ইউরোপে একদিকে যেমন লোকসেবা, স্বদেশ-হিতৈষণা সদনুষ্ঠান প্রভৃতির ক্রটী নাই, অপরদিকে কঠোর জীবন-সংগ্রাম এবং প্রবল-ধন লালসা হেতু পরার্থ-চিন্তা অনেকেরই পক্ষে গৌণ বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এ ইউরোপে সংসার-পরায়ণতার আধিক্য; সুতরাং ভক্তি এবং জ্ঞানের অল্পতা। ইউরোপে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সর্ব্বদা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত ঈশ্বর চিন্তা করিবার সময় পান না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে কর্ম্মযোগের আধিক্য দেখা যায়। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য এই কর্ম্মযোগের অধিকতর বিকাশ, সুতরাং ইহা জ্ঞানচর্চা এবং ভক্তিবিকাশের তাদৃশ অনুকূল নহে। ভারতবর্ষ এক সময় সুজলা সুফলা-শস্যশ্যামলা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখন যে তাহার উর্ব্বরা শক্তির হ্রাস হইয়াছে, বৎসর বৎসর যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাই তাহার প্রমাণ। স্থানীয় কারণ যাহাই হউক না কেন, গুরুতর পাপ ভিন্ন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুরিত দ্বারা কখন কোন দেশ প্রপীড়িত হয় না, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস। এই দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ অধিকতর ধনশালী বিদেশীয় বণিকদিগের প্রতিযোগিতায় অনেক শিল্প-ব্যবসা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে জীবন-সংগ্রাম বর্দ্ধিত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি! জীবিকা নির্ব্বাহ স্বল্পায়াসসাধ্য হইলে যেমন জ্ঞানালোচনা এবং ভক্তি বিকাশের পথ সুগম হয়; তেমন, যাহারা এই অবকাশের যথাযথ ব্যবহার না করেন, তাহারা অলসতা রূপ গুরুতর পাপে নিজ জীবন এবং সংসারকে কলুষিত করেন। তাহাদের পক্ষে কর্ম্মাধিক্য মঙ্গলের নিদান। সংসারে জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অধিক নহে; ভক্তিমান লোকের সংখ্যা তদপেক্ষা অল্প। সুতরাং কর্ম্মযোগী লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে যে জগতের অশেষ হিতকারী হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

জ্ঞানযোগ—বৈদিক সময়ে যেরূপ কর্ম্মযোগের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল, ঔপনিষদিক সময়ে সেইরূপ জ্ঞানযোগের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল। বৈদিক সময়ে উচ্চলক্ষ্য-ভ্রষ্ট বাহ্যিক যাগযজ্ঞের আধিক্য হেতু ব্রহ্মজ্ঞান গৌণ বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল; উপনিষদ নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানকেই মুখ্য এবং একমাত্র অবলম্ব্য বলিয়া স্থির করিলেন। উপনিষদের যে অংশ বেদান্ত নামে পরিচিত, ঋষিবাদরায়ণ তাহার প্রণেতা। তিনি

বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন করেন। অষ্টম শতাব্দীতে মনীষী শঙ্করাচার্য্য তাহার টীকা করেন। বেদান্ত উপপাদ্য বিষয় এই, ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ, জগৎ মিথ্যা। অবিদ্যা হেতু জগৎকে সৎপদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়; প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে, জগৎ মায়া ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। রজ্জুকে ভ্রমবশতঃ সর্প বলিয়া বোধ হয়; যখন ভ্রম বিদূরিত হয়, তখন রজ্জুকে রজ্জুই মনে হয়, সর্প জ্ঞান তাহাতে আরোপিত হয় না। শঙ্করাচার্য্য ঋষিবাদরায়ণ প্রণীত বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু রামানুজ তদবলম্বনে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদী আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে জগৎ মিথ্যা-অবিদ্যা সম্ভূত, তথাপি তিনি, ব্যবহারার্থং জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, ক্রমে তাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে রামানুজের মত অপেক্ষাকৃত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম এবং আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না; রামানুজের মতে জীবাত্মা এবং ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেও জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য বিদূরিত হয় না। শঙ্কর মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ। শঙ্কর কার্য্য কারণের পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে আত্মা এবং ব্রহ্ম এক পদার্থ, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। আধার ভেদে একই পদার্থ, ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে হয়; এইজন্য জীবাত্মা, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। যে আকাশ জগদ্ব্যাপী, তাহাও আধার ভেদে ভিন্ন [illegible] ধারণ করে, কিন্তু তাহা ভিন্ন পদার্থ [illegible] নদী [illegible] পর্য্যন্ত সমুদ্রে প[illegible] [illegible] তাহাদের জল এবং স[illegible] [illegible] বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু সমুদ্রের [illegible] মিশাইয়া গেলে তাহারা একাত্ম হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রকৃত জ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত তাহার আত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, এইরূপ জ্ঞান হয়; যখন প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তখন ব্রহ্ম এবং আত্মা একই পদার্থ, ইহা উপলব্ধি হয়। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং বিগ্রহাদি পূজা করিতেন। পূর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সদনুষ্ঠান, উপাসনা, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি করিবার তিনি উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ণজ্ঞান হইলেও জীবন্মুক্ত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা সম্ভব। সে অবস্থা সুখ-দুঃখের অতীত; তখন পাপপুণ্য, সদসৎ জ্ঞান থাকে না। কেবল উপনিষদ কেন, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞান নামের বাচ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সকল বিদ্যার, সকল জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। ইহা বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। ইউরোপে জ্ঞানের এরূপ কোন বিশেষ অর্থ নাই। জ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের যে মত, তাহা গ্রহণ করিলে, মিল, স্পেনসার, কোমৎ, হিউম, প্রভৃতি ধীমান মহাত্মাগণকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা অসঙ্গত। কেননা, তাঁহারা কাঞ্চন ছাড়িয়া কাঁচে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। সংসারের কোন পদার্থই স্থায়ী নহে, সকল পদার্থই ধ্বংসশীল। বিজ্ঞানমতে কোন পদার্থেরই ধ্বংস হয় না; কিন্তু দ্রব্যের মৌলিক রূপান্তরকে ফলিতার্থে ধ্বংস

বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ, তাঁহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, রূপান্তর নাই। সুতরাং সেই নিত্য পদার্থের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান। জ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ হইলে, আত্মাই ব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি,' এই জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। ইহা হইতেও উচ্চ অবস্থা 'সোঽহং' কিন্তু ইহাতে কিরূপে দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ নিরাকৃত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দ্বৈতভাবের সাহায্য ভিন্ন অদ্বৈতভাব কখনও উপলব্ধি হয় না। শঙ্করাচার্য্য যে 'ব্যবহারার্থং' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, দ্বৈতভাবকে তিনিও সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য পদার্থ, অন্য সকল পদার্থ অনিত্য, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে পার্থিব সকল পদার্থের প্রতি বিরাগ জন্মে; ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রতি মনুষ্য নীতস্পৃহ হয়। এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ সুগম হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্যরূপ কেবল বিকল্প, তদ্দ্বারা মতোৎকর্ষ সাধিত হয় না, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু যে কোন বিষয়েরই হউক, শুদ্ধ জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে তাহা দ্বারা চিত্তবিকৃতি দূর হয়, আত্মোৎকর্ষ সাধন পক্ষে তাহা সহায়তা করে। ভগবান্ আত্মারূপে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, সুতরাং যে বিষয়েরই জ্ঞান পরিস্ফুট হয়, তাহাই গৌণভাবে ভগবৎজ্ঞান লাভের সোপান। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন মহাত্মা জগতের মূলে যে এক চিচ্ছক্তি আছে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহারা আজীবন জ্ঞানানুশীলনে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত্রবল, নৈতিকোৎকর্ষ, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের কথা স্মরণ করিলে, তাঁহারা মুক্তি পথে অগ্রসর হন নাই, একথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংশয়বাদী, কেহ প্রত্যক্ষবাদী, কেহ বা নাস্তিক; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠে অনেকের নবজীবন লাভ হইয়াছে, সংশয় এবং নাস্তিকতা বিদূরিত হইয়াছে। মহামতি বেকন বলিয়াছেন, নাস্তিকতা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। সকল বিষয় যুক্তি বলে যাঁহারা মীমাংসা করিতে চাহেন, তাঁহারা সংশয়বাদে বা নাস্তিকতায় আসিয়া উপনীত হয়েন; কিন্তু তাঁহাদের নাস্তিকতা অনেক সময় আস্তিকতার নামান্তর মাত্র। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ বলেন, জগতের মূলে এক শক্তি (power) আছে; কেহ বলেন বল (force), কেহ বলেন জীবনী-শক্তি, কিন্তু তাঁহারা ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা কি প্রকারান্তরে ঈশ্বর মানিতেছেন না? আত্মাই ব্রহ্ম বা জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, এই জ্ঞান না হইলেও অন্যান্য বিষয় চিন্তাদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইতে পারে, এবং যথার্থ জ্ঞান যত বর্দ্ধিত হইবে, চিত্ত তত নির্ম্মল হইবে। এরূপ জ্ঞান দ্বারা পাপ বর্জ্জিত হওয়া অসম্ভব নয়, চিত্ত সম্পূর্ণ পাপ বর্জ্জিত হইলে মুক্তির আর বাকী কি রহিল? প্রকৃত জ্ঞান, পুস্তক পাঠ এবং শিক্ষালাভ ভিন্নও হইতে পারে। এই বিশ্ব সংসার এক বিরাট বেদ, জ্ঞানপিপাসু হইয়া তত্ত্বচিন্তা করিতে থাক, তত্ত্বজ্ঞান তোমার লাভ হইবে। কিন্তু এইরূপ চিন্তাদ্বারা জ্ঞান লাভ হইলেও শিক্ষা জ্ঞানার্জ্জনের বিশেষ সহায়। জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অতি অল্প, ভক্তিমান

লোকের সংখ্যা তদপেক্ষা কম। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে, যত বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। ক্যানেডায় (Canada) লোক সংখ্যানুপাতে শতকরা ২২.৭টী বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে; সুইজরলণ্ডে ২০.৬; যুক্তরাজ্যে ২০.০২; গ্রেটব্রিটনে (Great Britain) ১৮.২; জারমেনিতে ১৫.৪; ফরাসিদেশে ১৪.৪; জাপানে ৯.৩; ইটালীতে ৮.০৭ রুসিয়ায় ৩.৫; ভারতবর্ষে ১.৫। ইহাতে দেখা যায়, পৃথিবী শিক্ষা বিষয়ে এখনও পশ্চাৎপদ; সুতরাং জ্ঞান বিষয়েও প্রায় তদ্রূপ, ইহা বলা অন্যায় হইবে না। যে জ্ঞান বিদ্যালয়াদিতে লাভ হয়, তাহা প্রায়শঃ অর্থকরী বিষয়ে পরিচালিত হওয়ায় অনেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট; তাঁহারা যে সামান্য জ্ঞান সঞ্চয় করেন, তাহাও আলোচনাভাবে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া যায়—তাহাদের আচার ব্যবহার-জ্ঞান-লাভ-জনিত-কোনরূপ বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানের জন্য জ্ঞানানুশীলন করিয়াছেন—উচ্চতর আদর্শের প্রতি যাঁহাদের লক্ষ্য আছে—তাঁহারাই জ্ঞানানুশীলন এবং জ্ঞান বিতরণ করিয়া জগতের হিত সাধন করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করা যেমন প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য, অন্যকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। যিনি আত্মজ্ঞান লাভে সর্ব্বদা ব্যাপৃত না থাকিয়া সময় সময় যথাসাধ্য অন্যকে আত্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করেন, তাঁহার মুক্তিলাভ অপেক্ষা-কৃত দূরবর্ত্তী হইলেও, অন্যের মুক্তিলাভের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন বলিয়া জগৎ তাঁহার নিকট অধিকতর ঋণী এবং তিনিই ভগবদ্‌-কৃপা লাভের অধিকতর যোগ্য পাত্র। সকলেরই কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত; কিন্তু সংসারে সকলে কর্ত্তব্যপরায়ন নহেন। একে অন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইবে,—ইহা যেন ঈশ্বর-পরিচালিত বিশ্বসংসারের অমোঘ নিয়ম। মনুষ্য সান্ত, ব্রহ্ম অনন্ত। সান্ত জীবের পক্ষে অনন্তের জ্ঞানলাভ করা কিরূপে সম্ভব? মনুষ্য সান্ত হইলেও তাহার অনন্তের প্রতি শাশ্বত কামনা রহিয়াছে। আত্মা সেই অনন্তের ছায়া,—জ্ঞানালোক সম্যক দীপ্ত হইলে উহা কায়া প্রাপ্ত হয়। অনন্তের জ্ঞানলাভ করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হইলে তদাকাঙ্ক্ষা মনুষ্য হৃদয়ে প্রবল হইত না। ইউরোপীয়গণ জ্ঞানানু-শীলনে বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে—স্বীকার করি, কিন্তু তাহারা সংসারকেই একমাত্র জীবনোদ্দেশ্য সাধনের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র মনে করে, এই জন্য তাহারা সাংসারিক উন্নতিলাভের জন্যই সমধিক লালায়িত এবং সচেষ্ট। তাহারা পরকাল মানিলেও, তাহার জন্য যে কোন-রূপ বিশেষ উপযোগীতা লাভ করা আবশ্যক, তাহা তাহাদের মধ্যে অল্প লোকে মনে করে। ভৌতিকতায় তাহারা এতদূর নিমগ্ন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাহাদের মধ্যে সম্যক বিকসিত হইতে পারে না। স্থূলদর্শী যেমন ভৌতিক সভ্যতার বাহিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়েন, সূক্ষ্মদর্শী ইহার আভ্যন্ত-রীন বিকট দৃশ্য দেখিয়া তেমনই স্তম্ভিত এবং ক্ষুব্ধ। বর্ত্তমান সময়ের ভৌতিক সভ্যতা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুকূল নহে

অসমান ধন বিভাগ হেতু এক শ্রেণীর লোক যেমন দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত, অপর এক শ্রেণী তেমনই ধন-মদে গর্ব্বিত। এক দিকে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব, অপর দিকে প্রবল ধন-লালসা এবং বিলাসিতা—উভয়ই প্রকৃত জ্ঞানলাভের অন্তরায়। কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ মোক্ষলাভের উৎকৃষ্ট উপায় হইলেও, জ্ঞান-পথ কঠিন, শুষ্ক, নীরস এবং বন্ধুর। বেদান্তদর্শনে যে জ্ঞানের বিষয় অবতারিত, তাহার অনুশীলন ইউরোপে বিরল হইলেও, কোন কোন মহাত্মা যে সেই পথের পথিক হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবিবর টেনিসন (Tennyson) লিখিত অনেক স্থলে "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। সমগ্র জগৎ বিশ্বাত্মায় অনুপ্রাণিত এবং পরিব্যাপ্ত, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ (Wordsworth) ইহা বিশ্বাস করিতেন। "There is but one soul and that soul is God". সেকসপিয়রের (Shakespeare) মানস-দর্পণে প্রতিভাত হয় নাই, এরূপ তত্ত্ব জগতে বিরল। "There is nothing good or bad but thinking makes it so" তাঁহার লিখিত এই বাক্যে এক গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। যে অবস্থায় মনুষ্য সুখ দুঃখের, পাপ পুণ্যের অতীত—সেই জীবন্মুক্ত অবস্থা উঁহাতে উপলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ভক্তিযোগ—বাহ্যিক যাগ যজ্ঞের আধিক্যবশতঃ বৈদিক সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান গৌণবিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। ঔপনিষদিক নির্ম্মল এবং শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শিত হয়—কিন্তু তাহাও নীরস, এবং সাধারণের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্লভ্য। পুরাণ ভক্তির অমৃতবারি অভিসিঞ্চিত করিয়া সেই জ্ঞানকে সরস, সহজলভ্য করিয়াছেন। ভক্তি কি? শাণ্ডিল্য বলেন—"সা পুরানুরক্তিরিশ্বরে" ঈশ্বরের ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি। শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন এবং দেবোপম চরিত্রে ঐকান্ত অনুরাগ মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক; তাহাও ভক্তি নামের বাচ্য; নিষ্কলঙ্ক এবং পাপবর্জ্জিত হইলে, তাহাও মুক্তির সোপান, কেন না, প্রকৃত প্রেম অনন্তের ছায়া। সকলেরই মুক্তিলাভে অধিকার আছে; কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ দ্বারা তাহা আয়ত্ত করা সাধকের পক্ষে কঠিন, কিন্তু ভক্তিপথ—ঋজু, সরল, সরস, এবং সুধাসিক্ত। জ্ঞানের উচ্চ সোপানে আরূঢ় হইলে আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অল্পের ভাগ্যেই ঘটে। পথ নীরস এবং বন্ধুর বলিয়া তাহার আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু উন্মেষ হইতে পূর্ণতা পর্য্যন্ত সকল পথই অমৃতময়। যেখানে প্রাণের ব্যাকুলতা, ব্যগ্রতা, অনুরাগের ঐকান্তিকতা, ভাবাবেশ—সেখানেই ভগবান সহজলভ্য এবং অনায়াস-জ্ঞেয়। অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই, গভীর জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন নাই, চাই কেবল প্রাণের টান, হৃদয়ের আবেগ, অন্তরের নিগূঢ় প্রেম। জীবজগতের রীতিও এইরূপ। পুত্র কর্ত্তব্য-নিরত জ্ঞানালোচনায় ব্রতী, পিতার যথোচিত সাহায্য করেন, কিন্তু পিতার প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি নাই; পিতা তাহার ব্যবহারে কথঞ্চিত সন্তুষ্ট হইলেও তাহার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ নাই—তাহাকে তাদৃশ স্নেহ করেন না। পিতা-পুত্রের-সম্বন্ধের নৈকট্য তাহাদিগের মধ্যে সম্যক স্থাপিত হয় নাই; তাহারা আপন হইয়াও পর। অপর পক্ষে

পুত্র নির্গুণ, অকৃতী, মূর্খ, কিন্তু পিতার প্রতি তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ; সে ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছে। পিতা তাহার মূর্খতা, অকৃতীত্ব সকলই ভুলিয়া তাহাকেই স্নেহালিঙ্গন করেন। যেখানে প্রকৃত অনুরাগ, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিদান, ইহা আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্মত।* অনুরাগ দূরত্বকে নৈকট্যে, বক্রকে সরলে, নীরসকে সরসে পরিণত করে। কর্ম্ম এবং জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগের বিরোধী নহে ; প্রত্যুত তাহারা পরস্পর সহৃদ। সদনুষ্ঠান এবং প্রকৃত জ্ঞান ভক্তির পরম সহায়। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক সূত্রে আবদ্ধ ; তথাপি উভয়ের মধ্যে অন্তর অনেক। ভক্তি স্পর্শে প্রাণের টানে উহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়। অনুরাগের ঐকান্তিকতা উপস্থিত হইলে, পরস্পর মিলিত হয়। অনুরাগের মৃদু আঘাতে (স্পর্শে) সেই তন্ত্রীর উভয় দিক অনুরণিত হয় ; তাহাতে পরস্পর মুগ্ধ, ক্রমে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইয়া উভয় মিলিয়া একাত্ম হয়। ইহাই মুক্তি।

ঈশ্বরানুরাগ দুইরূপে সম্ভব। বিশ্বজগতে তিনি ব্যাপ্ত ; সমগ্র জগৎ তাঁহারই সত্ত্বায় অনুপ্রাণিত, তাঁহাতে অনুরাগ বা তাঁহার বিশেষ বিকাশে অনুরাগ। সমগ্র জগতে তিনি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভাবে রহিয়াছেন, তাঁহাতে অনুরাগ কেন্দ্রীভূত হইতে পারে না, তাঁহারা বিশেষ বিকাশেই অনুরাগের ঐকান্তিকতা সম্ভব। নির্গুণ, নির্বিকল্প, ব্যাপ্ত ব্রহ্ম অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্মের বিশেষ আবির্ভাবে অনুরাগের অধিক বিকাশের সম্ভাবনা। তাই পুরাণ অবতারবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। আমি শুনিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গ পরম ভক্ত, তাঁহার জীবন অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আমার ভক্তির সূচনা হইল ; কিন্তু তিনি কখন আমার নয়নগোচর হন্ নাই। যাঁহার গুণগ্রাম শুনিয়াই প্রাণ আকুল ; তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলে কি আনন্দ হইত! যদি তাঁহার একখানা প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, প্রাণের অনুরাগ একেবারে শত গুণ বর্দ্ধিত হয় ; যদি তাঁহাকে সশরীরে দেখিতে পাই, নয়ন এবং মন তাঁহাতেই মুগ্ধ এবং লিপ্ত হইয়া থাকিবে, আর ফিরিবে না। হৃদয় ভক্তি এবং প্রেমে পরিপ্লুত হইবে। বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মাপেক্ষা, ব্রহ্মের বিশেষ আবির্ভাবে যে ভাবাবেশ অধিকতর হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কর্ম্ম যেরূপ সকাম ও নিষ্কাম, ভক্তিও সেইরূপ হেতুকী এবং অহেতুকী। হেতুকী ভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তি নহে ; তাহাতে স্বার্থ নীচাকাঙ্ক্ষা জড়িত রহিয়াছে। শাস্ত্রকারগণ ভক্তিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা ভয় হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা আর্ত্ত। যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত তাহারা জিজ্ঞাসু। যাঁহারা ইহলোকে বা পরলোকে কোন ঈপ্সিত বস্তু লাভের আশায় ঈশ্বরোপাসনা করেন, তাঁহারা অর্থপ্রার্থী। এই শ্রেণীর ভক্তি হেতুকী, শাণ্ডিল্য উহাকে গৌণ ভক্তি নাম দিয়াছেন। সর্ব্বকামবিবর্জ্জিত হইয়া যাঁহারা ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন, তাঁহাতেই যাঁহাদের প্রীতি, তাঁহাকে লাভ করাই যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহারা জ্ঞানী ; শাণ্ডিল্য এইরূপ ভক্তিকে মুখ্য ভক্তি নাম দিয়াছেন।

পুরাণে ভগবানের 'সাকারত্ব' স্বীকৃত

* Like attracts like." Trine.

হইয়াছে। সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, পাপী এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত দিগের জন্য ভগবান ধরাধামে সময় সময় অবতীর্ণ হয়েন। ইহাতে প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইতেছে যে, ভগবান স্বতঃই নিরাকার; কেবল জগতের হিতের জন্য সময় সময় নররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। ভগবান সাকার ভাবে জগতে যে অপূর্ব্ব লীলা করিয়াছেন, তাহার মাধুর্য্যে এখনও জগৎ মুগ্ধ। যুগযুগান্তর অতীত হইল, কিন্তু রামনাম, কৃষ্ণনাম পুরাণ হইল না। এখনও শত শত নরনারী ঐ নামে মন্ত্রমুগ্ধ। পুরাণ মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিগ্রন্থ, তন্মধ্যে দশম এবং একাদশ স্কন্ধ অতি মধুর। উহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবলী বর্ণিত হইয়াছে। রাসলীলা প্রভৃতি যে সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাঁহার নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, আদর্শ চরিত্রে কেহ কেহ দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যে তিনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি তখন অষ্টম বর্ষীয় বালক ছিলেন। বিকৃত-রুচি গ্রন্থকারগণ রসপুষ্টির জন্য তাঁহার অতি পবিত্র ব্যবহার গুলিকে এরূপ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন যে, তাহাতে মতভেদ হইবারই সম্ভাবনা। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, কোন দুশ্চরিত্র লোক যুগযুগান্তর ঈশ্বর ভাবে পূজিত এবং আরাধিত হইতে পারে না। এখনও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত সংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অনুকূল মত প্রকাশিত হওয়ায় তাহা কথঞ্চিত পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু প্রচলিত কুসংস্কার হেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মসমাজে আদর্শরূপে উপস্থিত করা বিধেয় মনে করেন নাই। আনি বেশান্ত (Annie Besant) শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ইহা তিনি তাঁহার লিখিত কৃষ্ণচরিত্রে স্বীকার করিয়াছেন। গৌরগোবিন্দ বাবুও শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন; তাঁহার প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' পাঠে এইরূপ মনে হয়। সুতরাং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি যদি তদজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলে, আশা করি, তাহাতে পাঠকের ধর্ম্ম-চ্যুতি হইবে না। সাহিত্য সমাজ, মানবচরিত্র এবং ধর্ম্মভাবের দর্পণ। কল্পনার যতই অতিরঞ্জন তাহাতে থাকুক না কেন, চিত্রের মূল অবয়বের কিছুতেই অপলাপ হয় না। গ্রন্থকার যতই চেষ্টা করুন না কেন, সমাজের ভাব, রীতি, নীতি অজ্ঞাতসারে তাহার যে মানসিক উপাদান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কিছুতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারিবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে ভক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল বলিয়াই গোস্বামী শাস্ত্রে ভক্তি এবং প্রেমরসের এরূপ আধিক্য। ইহা স্বীকার করিলে, একথা বলা যাইতে পারে যে, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে, এবং শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে, প্রেমভক্তির যে অপার্থিব চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, জগতে তাহা অতুলনীয়। কেবল মনুষ্য নহে, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, পর্ব্বত, নদী সে প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। প্রেম-ভক্তির সাময়িক উচ্ছ্বাস অনেকে দেখিয়াছেন; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আত্মবিস্মৃতি, বিহ্বলতা, আত্মহারা-ভাব,

দর্শন কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে? নিমাই পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, অদ্বিতীয়; এবং বিকৃত-মস্তিষ্ক বা কপট নহেন; তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, বাহ্যজ্ঞান নাই, ভাবের হ্রাস নাই। পাঠক, একবার এই দৃশ্য স্মৃতিপটে অঙ্কিত করুন এবং ভাবুন, ভক্তি কি পদার্থ! কিশোর বয়সে মাতা দারা বন্ধু প্রভৃতি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কাঙ্গাল বেশে পথে পথে ফিরিতে লাগিলেন, মুখে 'যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ'। পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করিয়া দুঃখহারী পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাকিতে লাগিলেন, বিশ্বাস তিনি দুঃখ দূর করিবেন; এমন ভক্তি এবং বিশ্বাস যেখানে, সেখান হইতে ভগবান কি আর দূরে থাকিতে পারেন! প্রহ্লাদ অনলে এবং সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইলেন; বিষ ভক্ষণ করিলেন, হস্তির পদতলে নিষ্পেষিত হইলেন। তিনি ভক্তি-বলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্ম জগৎময়, অনলে অনিলে, অস্ত্রে শস্ত্রে, জলে স্থলে, এই জ্ঞানে তিনি সকল বিপন্মুক্ত হইলেন। ভগবদকৃপায় 'অনলের দাহিকা শক্তি লুপ্ত, বিষ অমৃতে পরিণত হইল; অস্ত্র স্বয়ং-ভগ্ন, অতলস্পর্শ সমুদ্রজলে তিনি ভাসমান! শুকদেব নারদ প্রভৃতি প্রশান্তচিত্তে জগতের কারণ-কারণ ভগবানের ধ্যান করিতেন। বীণার বিনোদ ঝঙ্কারে তন্ময় হইয়া, আত্মা এবং ব্রহ্মের একত্ব অনুভব করিতেন, ভাব—স্থির, ধীর, গম্ভীর! পথে চলিতেছেন, কেবল সেই আত্মলয়-সাধক ঝঙ্কার! 'ঢলে ঢলে চলে যায়, মুখে কৃষ্ণগুণ গায়।' ইহা ভক্তির শান্তভাব। দেবকী কারাগারের বন্ধন যন্ত্রণা 'আয় কৃষ্ণধন' বলিয়া ভুলিতেছেন! যশোদা ক্ষীর সর নবনী লইয়া তাঁহার অঞ্চলের ধন গোপাল গোপাল বলিয়া ডাকিতেছেন, এবং কাঁদিতেছেন, 'আয়রে প্রাণ বাপরে, মারে দেখা দেরে মাখন চোরা' 'চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ' 'এজীবনের বল, সম্বল নীলকান্তমণি'। যশোদার নিকট দেবকীর স্নেহ হীনপ্রভ! কৃষ্ণ মা বলিয়া ডাকিলে, যশোদার স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিত হইত। তাঁহার অপার স্নেহ দেখিয়া দেবকী নির্বাক! ইহা ভক্তির বাৎসল্য ভাব। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণের সখা; তাঁহাকে রাখালরাজা সাজাইয়া গোচারণে বহির্গত হইতেন। কৃষ্ণ যে হইতে মথুরায় গিয়াছেন, সে হইতে তাহারা জীবন্মৃত হইয়াছে। কখন বলিতেছে, 'কানাই বিনে, বৃন্দাবনে, দুর্ব্বলের কি আছে বল', কখন 'দিব তোর চাঁদ বদনে যে ফল মিষ্ট পাই, তুমি মরিলে বাঁচাতে পার তাইত তোমার সঙ্গ চাই' 'আয়রে কানাই কাঁধে আয়, তোর পায়ের ধূলা মাখুক গায়'। ইহা ভক্তের সখ্য ভাব। গোপীগণের একমাত্র বাসনা—যুগল-মিলন দর্শন। অক্রূর যখন কৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় লইয়া যাইতেছেন, তখন গোপীগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন 'অক্রূর রথ ধীরে চালাও, আমরা, শব হইয়া রথের বামপার্শ্বে পড়িয়া থাকিব, তাহাতে শ্যামের মঙ্গল হইবে'। তাঁহারা বলিতেছেন, 'বাঁশী অন্যের বাজে কাণের কাছে, ব্রজবাসীর বাজে হৃদয় মাঝে;' 'সবাকার কৃষ্ণজীবন, শ্রীরাধিকার কৃষ্ণজীবন, রাই যে মোদের জীবনের জীবন'। রাধিকা যখন মৃতপ্রায়, তখন সখীগণ আর্ত্তনাদ করিতেছেন, "কৃষ্ণ বিচ্ছেদ-সাগরে, তরিবার আশা করে, ছিলেন রাই তরণী ধরে, সে তরি ডুবিল'।

যুগল-মিলন দর্শন করে বলিতেছে, 'কোটী-নেত্র যদি দিত জড় বিধি, দেখিতাম এরূপ বসে নিরবধি, বিধি তায় অবিধি করেছে।' 'যদি দিলে দুনয়ন, তাঁহা ক্ষণ ক্ষণ পলকে পতন ঘটায়ে রেখেছে।' ইহা ভক্তির দাস্য ভাব। রাধার ভক্তি, স্বর্গীয় পারিজাত-কুসুম, তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎ কৃষ্ণময়—নবীন নীরদে কৃষ্ণ, তামালের শ্যামল পল্লবে কৃষ্ণ, ইন্দ্রধনুতে কৃষ্ণের শিখিপুচ্ছ, নভোমণ্ডলের নীলিমায় কৃষ্ণ, স্রোতস্বিনীর সলিলে কৃষ্ণ, নবদূর্ব্বাদলে কৃষ্ণ, নব কিশলয়ে কৃষ্ণ, আবার নয়ন মুদিলে অন্তরেও কৃষ্ণ! কৃষ্ণের জন্য এত কষ্ট, তথাপি চাতকিনী যেমন মেঘের পানেই চাহিয়া থাকে, রাধাও তদ্রূপ। একবার ভাবেন, আর ওরূপ ভাবিব না, কিন্তু মন মানেনা, এক কর্ণ বলে 'আমি কৃষ্ণ নাম শুনিব, আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে রব'। মরিয়াও যেন কৃষ্ণের সহিত মিলন হয়,—'দেহদাহন করনা দহন দাহে, ভাসা'ওনা কেহ যমুনা প্রবাহে, * * * সব সহচরী বাহুদুটী ধরি বান্ধিও তমাল ডালে'; 'যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে গো আমার পরাণ হরি, বঁধুর শ্রীঅঙ্গ সমীর, পরশে শরীর, জুড়াইব সেই কালে'। রাধার প্রেম সম্বন্ধে গোপীগণ বলিয়াছেন 'জম্বুনদ হেম সম যেই প্রেম' 'প্রতিকূল ভাবে যা বলি তা বলি, কভু তুল্য নহে রাধা চন্দ্রাবলী'। ইহা ভক্তির মধুর ভাব। ভগবান ভক্তাধীন, তাঁহার জন্য যে ব্যাকুল, তিনিও তাঁহার জন্য ব্যাকুল; কৃষ্ণ বলেন, আমার 'মনের বাসনা রাধা-উপাসনা, আমার শ্রবণের বাসনা রাধা নাম শোনা, না শুনিলে মরিবে মুরলী'। এরূপ প্রাণজুড়ান কথা, এত ভাব, এরূপ অনুরাগ আর কোন জাতীয় সাহিত্যে বা ধর্ম্ম পুস্তকে আছে? খ্রীষ্টের দীন ভাব, তাঁহার প্রেম, তাঁহার উপদেশাবলী অতীব মনোজ্ঞ, কিন্তু এরূপ প্রাণস্পর্শ কথা এবং ভাবাবেশ বাইবেলে নাই। পাঠক যদি ইহাকে কল্পনা বলিতে চাও বল, কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে কল্পনা-সরসীতে কৃষ্ণকমল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহার তুলনা জগতে নাই।

ভগবানকে অর্চ্চনা করিবার যত উপায়, তন্মধ্যে ভক্তি সর্ব্বপ্রধান,—ভক্ত তাঁহার অতি প্রিয়। গীতায় তিনি বলিয়াছেন, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে তাঁহার শরণ লইবে, তিনি তাহাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। প্রভাস-যজ্ঞে ভক্তির জয় বিঘোষিত হইয়াছিল,—সর্ব্বসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ, যশোদা, গোপীগণ এবং রাখালগণকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রভাসযজ্ঞে ভূলোক, দ্যুলোক, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অন্য সকলকে কৃষ্ণ পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবন-বাসীদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, যেখানে ব্যাহিক রীতিনীতির কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটী হইলে নিমন্ত্রণ রক্ষিত হইবে না, সেখানে পত্রাদি দেওয়া আবশ্যক; যাঁহারা প্রাণের টানে চলিয়া আসিবেন, সেখানে পত্র না দিলেও দোষ হইবে না। একটু পরীক্ষা করাও যেন তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল! নারদ যখন যশোদা প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করিতে গিয়াছেন, তখন বৃন্দাবন-বাসীগণ কৃষ্ণ বিরহে মৃতপ্রায়—'কাঁদিতে কাঁদিতে নয়ন গেছে, তোমায় দেখবে বলে (তাদের) প্রাণ আছে'। নারদ যশো-

দাকে বলিতেছেন, কুরুক্ষেত্র পরম তীর্থ, সেখানে যাইলে ধর্ম্ম হয়, তদুত্তরে যশোদা বলেন—'তবে তীর্থ-ধর্ম্ম মানি, যদি পাই আমার নীলমণি'। সকলে যজ্ঞস্থলে একত্রিত, কৃষ্ণ যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন। নন্দ, যশোদা, গোপীগণ, রাধা, রাখালগণ গোবৎসসহ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। দৌবারিক তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। যশোদা প্রভৃতি ভাবিতে লাগিলেন যে, এত ক্লেশ সহ্য করিয়া আসিয়া যদি কৃষ্ণের দর্শন না পান, তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। এই ভাবিয়া প্রথমে রাখালগণ "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কৃষ্ণের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল; তিনি চঞ্চল হইলেন, মন্ত্র ভুলিয়া গেলেন; কিন্তু বাহিরে আসিলেন না। তখন শেষ চেষ্টা আরম্ভ হইল; যশোদা গোপাল গোপাল বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, অমনি কৃষ্ণের দুনয়নে বারিধারা অবিরল ধারে ঝরিতে লাগিল; কৃষ্ণ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করিয়া বহির্গমনে উদ্যত, দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত এবং বিস্মিত; যখন দেখিলেন, কৃষ্ণ যশোদার পদে বিলুণ্ঠিত, তখন সকলে নির্বাক! আজ বৃন্দাবনবাসীগণ সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। আজ ভক্তির জয় অদাম্ভভাষায় জগতে বিঘোষিত হইল! ভক্তগণ ধন্য হইলেন। বৃন্দাবন কৃষ্ণের নিকট কত প্রিয়, তাহা তাঁহার মথুরা অবস্থান কালীন প্রাণের উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত—'আমার বৃন্দাবন মনে পলো; রাজপদ তুচ্ছ হলো, কোথা রলো, প্রাণের কিশোরী। * * * কোথা মা যশোদা, পিতা নন্দ, কোথা সে সব সখাবৃন্দ, সে আনন্দ রয়েছি পাসরি।' বৃন্দাবনবাসীর ভক্তি এবং বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ প্রেম জগতে অতুলনীয়, তাই কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ত্রৈলক্য পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী
তত্রৈব গোপিকা ধন্যা যত্র রাধা বিধায়ম"

মন্দাকিনীর নির্ম্মল সলিল সদৃশ ভক্তির পবিত্র অমৃতধারা শুষ্ক নীরস মানব-হৃদয়কে সরস এবং সঞ্জীবিত করে। ইহার আদি, অন্ত, মধ্য, মুকুল, কোরক, কুসুম সকলই সুন্দর এবং মনোরম। ইহার পবিত্র সমীর গাত্রে লাগিলে পাপী পূত হয় এবং নবজীবন লাভ করে; অচিরাৎ তাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়, এবং হৃদয় বিমলানন্দে পরিপ্লুত হয়। তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী", প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা
সমস্ত জগতাং মূলে যস্য ভক্তি স্থিরাত্বয়ি"

শ্রীকুলচন্দ্ররায়চৌধুরী

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

"মধ্যশ্রেণী" এই আখ্যা কেন হইল

মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে, বঙ্গদেশের তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এইজন্য তিনি, স্বীয় যজ্ঞসম্পাদনার্থ, কান্যকুব্জ হইতে, বেদজ্ঞ ও অর্য্যপ্রতিভাসম্পন্ন শ্রীহর্ষপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ এদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। (১) রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং ভরদ্বাজ প্রভৃতি পঞ্চগত্র-সম্ভূত মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণ, উক্ত মণীষিপঞ্চকের সন্তান। আদিশূরের পরবর্ত্তী মহারাজ বল্লালসেনের রাজত্বসময়ে, কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের অনন্তর বংশীয়গণের, বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস অনুসারে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সংজ্ঞা হইয়াছিল যথাঃ—

"বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, আদিশূরের দৌহিত্রবংশের অধস্তন সপ্তমপুরুষ মহারাজ বল্লালসেনের সময় কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের অধস্তন বংশাবলী দুই পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। যাঁহারা রাঢ়ে নিবাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় সংজ্ঞা ও যাঁহারা বরেন্দ্রভূমে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। বল্লাল নিজের শেষাবস্থায় ব্রাহ্মণাদির কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে ইহাও কথিত আছে যে, যৎকালে বল্লালসেন রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ করেন, তৎকালে সমস্ত বাঙ্গালায় কান্যকুব্জদিগের ১১০০ শত ঘর বসতি হইয়াছিল। এই এগার শত ঘরের মধ্যে রাঢ়ে ৬৫০ ও বরেন্দ্রভূমে ৪৫০ নির্দ্দিষ্ট হয়। রাঢ়দেশ-বাসিগণ রাঢ়ী ও বরেন্দ্রভূমি-নিবাসীরা বারেন্দ্রসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।"

সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ, ২১২-২১৩।

"ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ।
বল্লালসেন নৃপতি রজায়ত গুণোত্তরঃ॥

---

(১) "মহারাজাধিরাজ অশোক রাজার সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান লোপ পায়। এমন কি, এদেশ হইতে এককালে ব্রাহ্মণ্য রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও সমস্ত বঙ্গদেশমধ্যে সাতশত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ছিল না। এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণ-গণ বৌদ্ধদিগের প্রভাবে এমন নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টিযাগের প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। ইঁহাদিগের মূর্খতা নিবন্ধন রাজাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল। ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু উক্ত যাগসিদ্ধি বিষয়ে এককালে হতাশ্বাস হইলেন না; তৎক্ষণাৎ (৯৯৯ সংবতে) কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চগোত্রে পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, যজ্ঞনিপুণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন।" সম্বন্ধনির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৪।১৫

"আদিশূরো নবনবত্যধিক নবশতীশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানায়য়ামাস। কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র।" বহুবিবাহ পৃ ১৫।

রাঢ়ায়াং গৌড়-বারেন্দ্র-স্বঙ্গ-বঙ্গোপবঙ্গকে।
অধিকারোঽভবত্তস্য বলবীর্য্য প্রভাবতঃ॥
কান্যকুব্জান্বয়ান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বা চাভিগুণোত্তরান্।
আদিশূরস্য নৃপতের্যশোমূর্ত্তীনিবাঙ্কিতান্॥
আদিশূরস্য সমাসঃ পশ্চাদ্বর্ত্তিযশো মম।
যথা ভ্রম্যাৎ সতাং গেহে তথৈব বিদধাম্যহম্॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূপালঃ কৃতবান্ শ্রেণীনির্ণয়ম্।
স্থিতা রাঢ়দেশে দ্বিজা যে সমেতাঃ
কৃতা তেন রাঢ়ীয়সংজ্ঞা হিতেষাম্।
তথা গৌড়দেশস্থিতানাং দ্বিজানাং
কৃতা তেন বারেন্দ্রসংজ্ঞা-প্রসিদ্ধা॥

বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জী।"

গৌড়েব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ ৬২-৬৩

সুতরাং রাঢ় ও বরেন্দ্র দেশে বাস অনুসারে যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-গণের অধস্তন সন্তানবর্গের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সংজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। (২) এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রচলিত যে কিম্বদন্তীগুলির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, যেরূপ রাঢ় ও বারেন্দ্র দেশে বাসনিবন্ধন "রাঢ়ীয়" ও "বারেন্দ্র" শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তদ্রূপ মধ্যম শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষগণ, রাঢ়ীয় শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বঙ্গ ও রাঢ় এবং উৎকলদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস বশতঃ, আপনাদিগকে "মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ-গঠনের সময়, মেদিনীপুর জেলার যে যে স্থলে তাঁহাদের বাস ছিল, তাঁহারা রাঢ় অথবা বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যাদেশের মধ্যবর্ত্তী তত্তৎস্থলের "মধ্যদেশে" এই সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। এই জন্যই উক্ত সমাজে "মধ্যদেশে" বাসপ্রযুক্ত "মধ্যশ্রেণী" সংজ্ঞা হইয়াছে, এবম্বিধ কিম্বদন্তী অদ্যাপি প্রচলিত আছে। বোধ হয়, রাঢ়ীয় অনুকরণেই মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদের শ্রেণীর নামকরণ করিয়াছিলেন। যখন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের পরিচয়ের জন্য গ্রামের অথবা গাঁই উচ্চারিত হইয়া থাকে, যখন তাঁহাদেরই অধস্তন সন্ততিবর্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তত্তৎদেশের নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তখন মধ্যদেশে বাস অনুসারে "মধ্যশ্রেণী" এই নামকরণ যে কোন মতেই অসঙ্গত হয় নাই, ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জনৈক প্রাচীন মধ্যশ্রেণীয় অধ্যাপকের নিকট "মধ্যদেশ" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অবগত হইয়াছি যথা :—

"রূপনারায়ণা-দক্ষিণাংশে স্বর্ণরেখোত্তরস্থ চ।
মধ্যদেশঃ সমাখ্যাতঃ যত্র তাম্রধ্বজোনৃপঃ॥"

তিনি বলেন "মধ্যদেশের" প্রমাণ স্বরূপ উক্ত শ্লোকটী মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে, বহুদিন হইতে শ্রুতি হওয়া যাইতেছে। উক্ত শ্লোকটী যে কোনও পুরাণের অন্তর্গত নহে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং উহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সুধীগণ বিচার করিবেন।

রাঢ়ীয় ঘটকগ্রন্থেও "মধ্যদেশের" উল্লেখ আছে। মহেশ্বর, তৎকৃত নির্দ্দোষ-

(২) "সেনবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বল্লালসেনই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। * * * তিনি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন এবং বাঙ্গালাদেশ নিম্নলিখিত পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত করেন; ১ রাঢ়, ২ বারেন্দ্র, ৩ বাগড়ি, ৪ বঙ্গ, ৫ মিথিলা। * * বল্লালসেনের বিভাগ অনুসারে ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ হইয়াছে।" রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস। পৃ ১১-১২

কুল-পঞ্জিকায়, উহার একাধিকবার প্রয়োগ করিয়াছেন যথা :—

"অধস্তনবংশে শাণ্ডিল্য-গোত্রের বর্ণনস্থলে মহেশ্বরের নির্দ্দোষ-কুল-পঞ্জিকায় অধস্তন পুরুষে শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে বিশেষরূপ লিখিত আছে। ভরদ্বাজ গোত্র বর্ণনস্থলে মহেশ্বর বচন—

শ্রীহর্ষান্বয়সম্ভূতো দেবগর্ভ ইতিস্মৃতঃ।
চত্বারস্তস্য সঞ্জাতাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ॥
জনকো দিব্যসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
দিব্যসিংহো মধ্যদেশী রাঢ়ীয়া জনকাদয়ঃ॥

বাৎস্যগোত্র-বর্ণনস্থলে মহেশ্বর বচন—

বেদগর্ভস্ততো জাতস্তস্মাদ্বিষ্ণুরুদারধীঃ।
ভস্মাচ্ছন্নশিশর্ম্মা চ ততোঽভূৎকোলনামকঃ॥
কোলপুত্রাবিমৌজাতৌ নাম্নাধীরধুরন্ধরৌ।
ধুরন্ধরো দাক্ষিণাত্যো রাঢ়ীয়ো ধীরসংজ্ঞকঃ॥
কাশ্যপে তুমলাদেবঃ সাবর্ণৌ প্রথিতোভৃগুঃ।
তে দ্বে মিত্রে মধ্যদেশ জগ্মতুঃ স্বেচ্ছয়াস্বয়ম্॥

সম্বন্ধ-নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ, ৪৮৬।

উদ্ধৃত বচন সমূহে "মধ্যদেশ" অর্থে স্থান বিশেষ বুঝাইতেছে। যদিও কোন্ স্থানের নাম "মধ্যদেশ" তাহার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে না বটে, কিন্তু "দাক্ষিণাত্য", "রাঢ়ীয়" এবং "মধ্যদেশী" এই পৃথগর্থবোধক বাক্যত্রয়ের দ্বারা পৃথক্ স্থানত্রয়ের নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং "মধ্যদেশ" যে রাঢ়দেশ হইতে কোন পৃথক্ স্থানের নাম, তাহা বোধগম্য হইতেছে।

সম্বন্ধনির্ণয়কার, মহেশ্বর বচন উদ্ধৃত করিয়া পুনশ্চ লিখিয়াছেন:—

"ভরদ্বাজ গোত্রে—

শ্রীহর্ষান্বয়সম্ভূতো দেবগর্ভইতিস্মৃতঃ।
মধ্যদেশীয়াঃ সঞ্জাতাঃ পুত্রাস্তস্যগুণান্বিতাঃ॥
জনকো দিব্যসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
বেদগর্ভসুতা এতে সর্ব্বেবিখ্যাতপৌরুষাঃ॥

মহেশ্বর।,

শ্রীহর্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শত ডিংসাই, তৎপুত্র বেদগর্ভ (ভরদ্বাজ গোত্র) তৎপুত্র দিব্যসিংহ, ইনি মধ্যদেশী।

দিব্যসিংহো মধ্যদেশী রাঢ়ীয়াজনকাদয়ঃ।"

সম্বন্ধ-নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ,
পৃ ৫০৭-৫০৮।

এস্থলে সম্বন্ধ-নির্ণয়কার "দিব্যসিংহ, ইনি মধ্যদেশী" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত পুস্তকের বর্ণমালানুসারি সূচী পত্রের ৬০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ৫৪
ঐ বিশেষ বিবরণ ও
শ্রেণীবিভাগ ৪৮৬। ৫০৭।"

সুতরাং সম্বন্ধনির্ণয়ের এই উভয় স্থলের লিখার তাৎপর্য্য এই, বোধ হয় যে, প্রাগুক্ত "মধ্যদেশী" দিব্যসিংহ অথবা তাঁহার অধস্তন সন্তানবর্গ, মধ্যদেশে বাস বশতঃ, কালক্রমে "মধ্যশ্রেণী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, নির্দ্দোষকুল পঞ্জিকার বচন উদ্ধৃত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথাঃ—

"শ্রীহর্ষ
|
অরব
|
শত
|
বেদগর্ভ
|
দিব্য-সিংহ (মধ্য-শ্রেণী।)

বিশ্বকোষ। পৃ ৩৩৬।"

"জনকো দিব্যসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
বেদগর্ভসুতা এতে সর্ব্বে বিখ্যাত পৌরুষাঃ॥
দিব্যসিংহোমধ্যদেশী।"

বিশ্বকোষ পৃ ৩২০।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ত্তমান

মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থলেই, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ-গঠনের পূর্ব্ব হইতেই রাঢ়ীয় অথবা রাঢ়ীয় গাঁই ও গোত্র-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-গণের বাস ছিল। তাঁহাদের বাস মেদিনীপুর জেলার কোন কোন পরগণায় ছিল, তাহা নির্ণীত হইলে ঐ সকল পরগণা বঙ্গ অথবা রাঢ় এবং উৎকল ভূমির মধ্যবর্ত্তী এবং প্রকৃত "মধ্যদেশ" আখ্যার যোগ্য কি না, তাহা অবধারিত হইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত সমাজ-গঠনের সময় ঠিক কোন কোন পরগণায় তাঁহাদের বাস ছিল, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। মেদিনীপুর জেলার নিম্নলিখিত পরগণায়, বহুদিন হইতে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণের বাস রহিয়াছে—যথা—

ময়না, সবঙ্গ, তমোলুক, খান্দার, কেদার, কাশীজোড়া, ভঞ্জভূম (পাথরা), কুতুবপুর, সাহাপুর, বলরামপুর, কাজলাগড়, চন্দ্রকোণা, খড়্গাপুর, নারায়ণগড়, অমর্সি, চেঁকিয়া, দোরো, মহিষাদল, গুমগড়, অরঙ্গানগর, জলামুঠা, সুজামুঠা, ভূঞ্যা-মুঠা, ব্রাহ্মণভূম, চেতুয়া, বরদা, জাহানাবাজ, ঘায়ড়া ও তুরকা।

এক্ষণে নিম্নলিখিত কারণে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে, "মধ্যশ্রেণী" গঠনের পূর্ব্ব হইতে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের তাৎকালিক পূর্ব্বপুরুষেরা, উল্লিখিত অধি-কাংশ পরগণায় বাস করিতেন।

(১) কিম্বদন্তী আছে যে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের গঠন-কর্ত্তা গঙ্গাধরের পৈত্রিক বাস সবঙ্গ পরগণার কেরুড় গ্রামে ছিল। তৎপরে তিনি এবং তাঁহার সহো-দরগণ উক্ত পরগণার মুয়াড় গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত মুয়াড় গ্রাম হইতেই, ভেমুয়ার ভট্টাচার্য্যগণের আদি পুরুষ ময়নাপরগণার ভেমুয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি মুয়াড়ের "ভট্ট-মুখুয্যে" (৪) অথবা ভট্টা-চার্য্যগণ আপনাদিগকে গঙ্গাধরের বংশ বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করেন।

(২) চাঁপাডালির ভট্টাচার্য্যগণের আদি-পুরুষ কামদেব ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ-গণের বাস "বান্যা" গ্রামে ছিল। তথা হইতে তাঁহারা খান্দার পরগণার ভদ্রকালী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে কাশীজোড়ার রাজা, ভদ্রকালী গ্রাম হইতে কামদেব ভট্টাচার্য্যকে আনয়ন করিয়া, কাশীজোড়া পরগণার চাঁপাডালি গ্রামে, বাস করাইয়াছিলেন।

(৩) মধ্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজে, বহুদিন হইতে, "বাইশী ক্রিয়ার" প্রথা আছে। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের সময় সমগ্র মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ নিমন্ত্রণ করার নাম "বাইশী ক্রিয়া"। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের পরেই, তাৎকালিক মধ্যশ্রেণীয়গণ যে দ্বাবিংশতি পরগণায় বাস করিতেন, তাহা নির্ণীত হইয়াছিল। সুতরাং উক্ত সমাজ-গঠনের সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ যে প্রাগুক্ত পরগণা সমূহের মধ্যে ন্যূনাধিক দ্বাবিংশতি পরগণায় বাস করিতেন, এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

---

(৪) মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায়গণ আপনাদিগকে "ভট্ট মুখুয্যে' কহিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্য কাশ্যপ গোত্রে "ভট্ট" গ্রামীণেরা কেবল মাত্র "ভট্ট" পদবীতেই পরিচিত।

প্রকৃত প্রস্তাবে উল্লিখিত পরগণাগুলি অথবা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই প্রকৃত রাঢ় দেশের অন্তর্গত নহে। মুসলমান-রাজত্বকালেও, মেদিনীপুর প্রদেশ, বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত না হইয়া একটী স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া পরিগণিত হইত কিন্তু যখন উহা উড়িষ্যাধিপতির শাসনাধীন হইত, তখন, একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ স্বরূপে উড়িষ্যারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বঙ্গদেশ, মেদিনীপুর ও উৎকল ভূমির সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যথা :—

"মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া,
বাঙ্গালার সীমা নেড়া দেউল দেখিয়া।
এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণ গড়ে,
দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে॥"

মানসিংহ পৃ ৩৫২

ইহা দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে, মেদিনীপুর প্রদেশ বাঙ্গালা ও উৎকলভূমির মধ্যবর্ত্তী স্থান। দাঁতন মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলার সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং বালেশ্বর উড়িষ্যা বিভাগের অন্তঃপাতী একটী জেলা। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার নির্দ্দিষ্ট সীমা এই—"পূর্ব্ব, হুগলী ও হাবড়া জেলা এবং হুগলী নদী। দক্ষিণ, বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ পশ্চিম, বালেশ্বর জেলা। পশ্চিম, ময়ূরভঞ্জ করদ রাজ্য। উত্তর পশ্চিম, পুরুলিয়া ও মানভূম জেলা।" (৫) এবং ইহার স্বাভাবিক সীমা—"রাজমহল ও শীলাবতী বা শিলাই নদী। পূর্ব্ব, রূপনারায়ণ ও গঙ্গা নদী। দক্ষিণ, বঙ্গোপসাগর। পশ্চিম, সুবর্ণরেখা নদী ও ঘাটশিলা ও শিলদার পর্ব্বত।" (৬) সুবর্ণরেখা নদী মেদিনীপুর জেলা ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রধান সীমা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। মধ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, "পার হলে কেলে ঘাই, ব্রাহ্মণের বাস নাই" এই কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। কেলেঘাই নদী মেদিনীপুর জেলার থান্দার, সবঙ্গ ও ময়না প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাংসাবতীর সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্বসীমা রূপনারায়ণ নদ। ইহাকে বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত হুগলী জেলা হইতে নানা কারণে পৃথক করিয়া দিতেছে। রূপনারায়ণ নদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী হুগলী জেলার অন্তঃপাতী উলুবেড়িয়া সব্‌ডিভিজনের অন্তর্গত মণ্ডল ঘাট পরগণার লোকের ভাষা, উক্ত নদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমোলুক সব্‌ডিভিজনের লোকের ভাষা হইতে, অনেকাংশেই স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থলের ভাষা কিঞ্চিৎ উৎকল-মিশ্রিত বাঙ্গালা বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলার যে যে অংশ উড়িষ্যা বিভাগের প্রান্তভাগে অবস্থিত, তত্তৎস্থলের লোকের কথায় উৎকল ভাষার অধিকতর প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল সব্‌ডিভিজনের (উপরিভাগ) প্রায় অর্দ্ধাংশ হুগলী জেলার প্রান্তভাগে অবস্থিত। ঘাঁটাল সব্‌ডিবিজনের উক্ত অংশ পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল এবং উহার ভাষা কিয়ৎপরিমাণে "রেঢ়ো" অথবা "রাঢ়" দেশবাসিগণের ভাষার ন্যায় বলা যাইতে পারে।

(৫) মেদিনীপুর ইতিহাস—১ম পৃ। (দ্বিতীয় খণ্ড)।
(৬) মেদিনীপুর ইতিহাস—১ম পৃ। (দ্বিতীয় খণ্ড)।

যদিও কাহারও মতে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের অধিকাংশ লইয়াই "রাঢ়" দেশ, কিন্তু উক্ত বিভাগের অন্তর্গত বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও বীরভূম জেলার ভাষার সহিত মেদিনীপুর জেলার ভাষার যে অনেক পার্থক্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। (৭)

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ খানা-কুলকৃষ্ণনগর গ্রামের নিকট "বঢ়া" নামক একটী খাল আছে। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর পশ্চিম সীমার অনতিদূরেই উক্ত খালটী অবস্থিত। কিম্বদন্তী আছে যে, উহা পূর্ব্বে একটী বিস্তীর্ণ নদী ছিল। উহার উভয় পার্শ্বের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টি-গোচর করিলে উহা যে পূর্ব্বে নদী ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে প্রমাণিত হয়। উহার যে পার মেদিনীপুর জেলার দিকে অবস্থিত, সেই পারের লোক উহার বিপরীত পারের লোকদিগকে "রেঢ়ো" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে এবং উক্ত উভয় পারের লোকের কথঞ্চিত ভাষাগত পার্থক্যও অদ্যাপি লক্ষিত হয়। আমার বোধ হয়, এই "রাঢ়ই" পূর্ব্বকালে, বর্ত্তমান মেদিনীপুর প্রদেশের দিকে, রাঢ়দেশের শেষ সীমা ছিল। এবং ঐ "রঢ়া" হইতেই রাঢ় দেশের নাম-করণ হইয়াছিল। উল্লিখিত অবস্থা-সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কি ভাষা, কি স্বাভাবিক সীমা, সকল বিষয়েই (৮) বর্ত্তমান মেদিনী-পুর জেলার অধিকাংশ স্থল উৎকল ও বাঙ্গালা দেশের মধ্যবর্ত্তী একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ভূভাগ মাত্র। মনে হয়, প্রকৃতিই যেন এই ক্ষুদ্র স্থলকে, দুই অতি বৃহৎ-ভূভাগের মধ্যে মধ্যে, স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণসমাজ সৃষ্টির পরে ভেমুয়া, মুয়াড়, পিণ্ডরুই, (৯) ভোগ-দণ্ড, চাঁপাডালি, গোকুলনগর ও পীতপুর প্রভৃতি যে যে স্থল, বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যের জন্য উক্ত সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তত্তৎস্থলের বর্ত্তমান ভৌগোলিক অবস্থান পর্য্যালোচনা করিলে ঐ সকল গ্রাম যে কখনও "রাঢ়" অথবা বাঙ্গালা এবং উৎকল দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে।

মেদিনীপুর প্রদেশ বা তাহার অধিকাংশ গঙ্গা ও রাঢ় দেশের সন্নিহিত ছিল এবং কখনও রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। গঙ্গাবংশীয় পরাক্রান্ত নরপতি অনন্ত বর্ম্মা "গঙ্গারাঢ়ী" অঞ্চলে অর্থাৎ গঙ্গা ও রাঢ় দেশের সন্নিহিত তমোলুক ও মেদিনীপুর

(৭) "বাঙ্গালার যে ভাগ ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ তাহার নাম রাঢ় দেশ; * * * * কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, প্রধানতঃ রাঢ় লইয়াই বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ।

৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ—১১।

(৮) মেদিনীপুর জেলার অনেকাংশে আমলী অথবা বিলায়তী সন প্রচলিত; এবং অবশিষ্ট স্থলে বাঙ্গালা সন প্রচলিত আছে। আমলী সন, প্রত্যেক বৎসর, ভাদ্র কি আশ্বিন মাসের ইন্দ্রদ্বাদশীর দিনে আরম্ভ হয়। ইহাতেই বোধ হয়, মেদিনীপুর প্রদেশ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যাদেশের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া, উহাতে উক্ত উভয় দেশের অনুকরণে, সন সকল প্রচলিত রহিয়াছে।

(৯) কথিত আছে যে, এই পিণ্ডরুই গ্রামে, গঙ্গাধর, মেদিনীপুর প্রদেশস্থ তাৎকালিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে সমবেত করিয়া, ঘটকাঘাত অথবা দেবীবর ঘটকের সহিত বিরোধ বশতঃ, 'রাঢ়ীয়' শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন।

প্রদেশে একাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আধিপত্য বিস্তার করেন (১০)

মেদিনীপুর প্রদেশ, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা দেশের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায়, উড়িষ্যারাজ্যের শাসনাধীন সময়ে উড়িষ্যারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইত এবং বঙ্গেশ্বরের শাসনাধীন সময়ে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হইত। (১১) কিন্তু যখন যে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন, ইহা চির দিন একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। (১২)। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরকাসিম খাঁ যখন বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের সহিত মেদিনীপুর ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন, তখন বাঁকুড়া এবং হুগলি বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু মেদিনীপুর একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। (১৩) সুতরাং মেদিনীপুর অঞ্চলের যে যে স্থলে মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বাপর বাস আছে, তত্তৎস্থলের ভাষা ও ভৌগোলিক অবস্থিতির বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐ সকল স্থান যে, প্রকৃত রাঢ় এবং উৎকলদেশের অন্তর্গত নহে, অথচ উক্ত উভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভূভাগ মাত্র, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ইতিহাসও মেদিনীপুর অঞ্চলকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। অতএব যে স্থান বাঙ্গালা ও রাঢ় এবং উৎকল দেশের মধ্যবর্ত্তী, সেই স্থানের "মধ্যদেশ" এই নামকরণ

(১০) "An inscription procured, since Mr. Stirling wrote, by Mr. Colvin, shews that Choranga was not the founder of Gangavansa family, but that the first who came into Kalinga was Ananta Varma also called Kolahala, sovereign of Ganga Rarhi—the low country on the right bank of the Ganges or Tumlook and Midnapur; this occurred at the end of the eleventh century of our era &c."

Page. CXXXVIII. Wilson's Preface to Mackenzie Collection.

"পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য উইলসন সাহেব ম্যাকেঞ্জি-সংগ্রহের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে, কলভিন সাহেব যে অনুশাসন পত্র প্রাপ্ত হন, তদ্দৃষ্টে নির্ণীত হয় যে, চোরঙ্গ গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ নহেন ; যিনি কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন, তাঁহার নাম অনন্ত বর্ম্মা বা কোলাহল, তিনি গঙ্গারাঢ়ী অর্থাৎ গঙ্গা-সন্নিহিত তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। * * *"

বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৩ ও ২৩৪।

(১১) "I mentioned Mahall Mandalghat at the confluence of the Rupnarain and the Hughli as the southwest frontier of Bengal. The Districts of Midnapore and Hughli (south-east of Midnapore) were therefore excluded. These belonged to the Kingdom of Orissa till A. H. 775 or A. D. 1567, when Saliman, King of Bengal, and his general Kalapahar defeated Mukund Dev, the last Gazapoti." G. H. B.

"দক্ষিণ পশ্চিমে মেদিনীপুর ও হিজলী ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উক্ত বৎসর হিন্দু সেনাপতি কালাপাহাড়ের প্রভাবে তাহা উৎকল সহ বঙ্গেশ সুলেমান সাহেবের হস্তগত হয়।"

বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৩৩-২৩৪

(১২) "At the date of the grant of the Dewani in 1765 and until the year 1803. Orissa included only the district of Midnapore and a part of Hughli ;—the tract of country between the Suvarnarekha and the Rupanarayana.

* * * *

The tract consisting of Balasore, Cuttack and Puri and the hilly country known as the Tributary Mahals (Rajwara), held by chiefs called Khandaits, was Orissa proper, and has since 1804 been named Orissa, while Midnapore, now included within the Commissionership of Burdwan, became a part of Bengal proper." The Land-Law of Bengal p. p. 408-409.

(১৩) "Many changes have taken place in the jurisdiction of the District of Burdwan, when it was ceded to the English in 1760 by Mirkasim Khan, together with Midnapore and Chittagong, it comprised in addition to the present District known as Burdwan, Those of Bankura and Hughli ; and third part of Birbhum. Bankura and Hughli were afterwards made separate distficts and after a number of transfers to and from the adjoining district the present area of Burdwan was finally settled in 1872."

The Imperial Gazetteer of India Vol I. p. 424.

অসঙ্গত নহে ; এবং সেই স্থানে বাস অনুসারে ব্রাহ্মণগণের "মধ্যশ্রেণী" এই আখ্যা অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া যাঁহারা কিছু কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহারাও উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। (১৪)

শ্রীমন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী।

(১৪) (ক) বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যস্থল মধ্যদেশ বলিয়া খ্যাত। এতদ্দেশবাসী মৌলিক ব্রাহ্মণ নিচয় মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যেরূপ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, সম্ভবতঃ মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণও তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। ইহাও সম্ভবপর যে, পঞ্চগোত্রস্থ মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরই শাখামাত্র। দেশ বিশেষে বাসের জন্য তাঁহাদের পরিচয়ের সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বঙ্গে সামাজিকতা, পৃ ৫২-৫৩।"

(খ) "মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে রাঢ়ীয় শ্রেণীর একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শাখা বলা অসঙ্গত নহে। যে কারণে ইহাঁরা উক্ত শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি এইঃ যৎকালে দেবীবর ঘটক শ্রেণীর মেলবন্ধ করেন, সেই সময়ে মেদিনীপুর-বাসী রাঢ়ীয়গণ তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া এক পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়াছিলেন। এবং মেদিনীপুর জেলা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী দেশ ও সেই মধ্যদেশে তাঁহাদিগের বাস নিবন্ধন তাঁহারা "মধ্য-শ্রেণী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।"

মেদিনীপুর ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ১১-১২।

বিক্রমপুরে বসন্ত

বউনাগাছে ফুল ফুটেছে, আগড়া গাছে খোটা,
মান্দারগাছে আগুনের বাড়ী, সারা উঠান ওটা!
সারি সারি গাছ শুপারি শিরে কাঁখান ডাল,
শুষ্কদেহ সন্ন্যাসীদের মাথায় জটাজাল!
বিনাফুলে ফল ধরেছে যজ্ঞডুমুর গাছে,
কুন্তী দেবীর কোল যুড়িয়া শত কর্ণ আছে।
কিম্বা গাছের কাল বসন্তে খুব ধরেনি গায়,
সারা গায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচছে মলয় বায়!
অথবা সে "ধনাসনার" গোদের যেন বীচি,
ঠিক বুঝিনা কোন্‌টা যেন বক্‌ছি মিছামিছি।
কোন্ নারী সন্ন্যাসী হ'ল, বেত্রবনে তার
পাণ্ডবের গাণ্ডীবের মত, রেখে আখি ঠার!
ডাঙ্গায় মরে খেজুর ভায়া গলায় কল্‌সী বেঁধে,
মান ভাঙ্গে না প্রাণ প্রেয়সী রাত্ পোহায় সে কেঁদে
থোপা থোপা থোপা থোপা ঝুল্‌ছে কচি আম,
বিরহিণী নারীর যেন নূতন মনস্কাম।
গাবের গাছে নূতন পাতা সিন্দুর চেয়ে লাল,
প্রেমের যেমন শেষটা কাল, কষ্‌টে ভরে গাল!
মটকিলা পিট্‌কিলা ছিটকী সবার নূতন পাতা,
নূতন বছর আস্‌ছে বলে খুল্‌ছে নূতন খাতা!
তেঁতুল গাছে পাকা তেঁতুল ঝুলছে মন্দ বাতে,
তেলী শুঁড়ি বৈরাগীর যেন মালার থলি হাতে।
বোয়াইল গাছে বোয়াইল ঝোলে এক বোঁটাতে কত,
হিন্দুস্থানী বাজ রাজাদের 'কোঁচা রাণীর' মত!
কাকের শব্দে কোকিল জব্দ, কাকের কাকা খালি,
ননদের যেন চির সনদ বউকে দিচ্ছে গালি।
চাল ধুইতে, ভাত রাঁধিতে, ঠাকুর ঘরে গেলে,
নৈবেদ্যের কলাটী আগে কাকে খেয়ে ফেলে।
হাড়গিলে শকুন চিলে মাথার উপর উড়ে,
যেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিররা যাচ্ছে স্বর্গপুরে।
তাই দেখিয়া কাতর হিয়া কুকুর সে ডাকে,
সমধর্ম্মী স্বর্গে যায় তাই নিন্দে বিধাতাকে।
হেথা, গীতের মালিক পেচা সালিক তারে পেয়ে ভয়,
দেশ ছাড়িয়া দয়েল শ্যামা গেছে মনে লয়।
ডাহুক ডাকে "আগুক আগে' আমার কাছে কে,
হাইরাকুড়ি ঝাইরা মাথা বল্‌ছে নে—নে—নে।

পথের ধারে খালের পারে বিষ্ঠা বিক্ষেপণ,
প্রলয় ভেবে পলায়ে যায় মলয় সমীরণ।
অলি মাছি নাই এদেশে গুয়ের মাছি উড়ে,
ভ্রমর গিয়ে গেল্‌ছে প্রিয় অমর দেবপুরে।
কোথায় সে কুরঙ্গ রঙ্গ কোথা কুরঙ্গিনী,
নারীর নয়নে শুধু একটু একটু চিনি।
পুষ্পবিনে পুষ্পশর কোথা পাবে আর,
তাই, রমণী দিয়েছে কামে নিজের আঁখি ঠার।
বাড়ীর পাশে থানা খন্দ অন্ধ দাম দলে,
তাইতে বাঁধা পায়খানাটী পূর্ণ পচামলে!
ছেলে আছে হিজল গাছে বাঁশের সিঁড়ি লাগা
মেয়ে বুড়ো বউঝিদের সে গাছের আগে হাগা!
নরকের শড়কের মত মাঝে তাহার আইল,
এই পথেই যাচ্ছি যাব আজ্‌কে আবার কাইল।
কল্‌মীশাকে হেলেঞ্চাতে পানায় পুকুরভরা,
বিধবা রমণীর মত বেঁচে থেকে মরা।
পানিকাউড় গউর প্রেমে ডুব্‌ছে তাহে বুঝি,
অহিংসা পরমধর্ম্ম বেড়ায় খুজি খুজি।
মোটা মোটা তিলক ফোটা পিপির শিরে শোভে,
বকে নিছে সখের ধর্ম্ম বাবুর মত লোভে।
"গেঁতর—গেঁতর"—সন্ধ্যাকালে কাণ পাতা না যায়,
অঙ্গ বঙ্গে কঙ্গরেসের বেঙ্গ-বক্তৃতায়।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় চল্‌ছে টিয়া মাঠের পানে ধায়,
নমাজ পড়তে সমাজ ঘরে সেমিজ পরে' পায়!
পাতার তলে জোনাক জ্বলে মধুর তত নয়,
বধূর অঞ্চলের দীপ সে মধুর অতিশয়!
ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারতি শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
পতির ঘরে প্রদীপ জ্বলে নীরব প্রেমে লাজে।
চাকরে পুরুষ যারা, তাদের শূন্য খালি বাড়ী,
হাহা হুহুর রাজ্যে করে আহা উহু নারী!
পরদাহীনা মরদা মেয়ে পদ্মা নদীর প্রায়,
ঠৈরাণদিদী বেড়ান আশে বাবুর বাড়ী যায়!
বাড়ী বাড়ী বৈঠক তাহার, পাড়ায় পাড়ায় হাট,
এম্‌নি তিনি রায়বাঘিনী দেখ্‌লে সবাই কাঠ!
কথার চোটে আগুন্ ওঠে ডিনামাইটের মত,
মানুষ ত সে দূরের কথা—পাহাড় উড়ায় কত!

কিবা পুরুষ কিবা নারী সবাই করে ভয়,
ফেলে দাড়ী নারদ নারী, এম্‌নি মনে লয়!
কন্দলে আনন্দ বড় তা ছাড়া সে নাই,
মান্দার গাছে আন্দার রেতে লড়াই করে তাই!
বউয়ের কথা ঝিকে বলে, ভাইয়ের কথা বোনে,
বাপের কথা মাকে বলে পুতে যাতে শোনে!
ঘরের কথা পরে বলে, পরের কথা হাটে,
হাটের কথা ঘাটে বলে, ঘাটের কথা মাঠে!
যাবৎ নাহি বলে তাবৎ পেট ফাঁপিয়া মরে,
বিশূচিকা রোগীর মত ধড় ফড়ানি করে!
ভাল কথার মন্দ অর্থে বিষম মল্লিনাথ,
গন্ধে তাহার বন্ধ্যা নারীর হয় যে গর্ভপাত!
সত্য হৌক আর মিথ্যা হৌক, তার কথায় দিলে সায়,
মণ্ডামার্ক তাহার কাছে সার্টীফিকেট পায়!
বিপরীতে গণ্ডমূর্খ বাখানিয়া তারে,
ফিরি করে' ফিরেন তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে!
বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপনে কাজ কি আমার ভাই,—
বিশ্ব ঘোষা এমন ঘোষা ত্রিভুবনে নাই!
সকল দুখের মধ্যে দিছে এই সুবিধা বিধি,
বিনা পয়সার বিজ্ঞাপন সে আমার ঠৈরাণদিদী!
পেট টা ওচা নাকটী বোচা, রূপের নাহি সীমা,
ঠাকুরদাদার প্রেমের আমার পুরাণ লোয়াজিমা!
ঠাকুরদাদা স্বর্গে গেছেন তারে বদল দিয়া,
আমার বুকের শান্তি, আমার চখের নিদ্রা নিয়া!
বিনিময় সূত্রে আমি পাইয়াছি তারে,
ব্রহ্মরক্ষ বিঁধি তিনি আছেন মজ্জা হাড়ে!
অইসে আসে উর্দ্ধশ্বাসে আঁচল উড়ে বাতে,
ভয়ঙ্করী রণতরী পাইল পেয়েছে তাতে!
কিম্বা সতী ধুমাবতী দেখা যাচ্ছে দূরে,
মাথার উপর কাউয়াগুলা কাকা করে উড়ে!
কল্পনা সতিনী তার এরূপ দেখিয়া ভাগে,
যেমন, ইন্দুর ডরায় বিড়াল দেখে, গরু ডরায় বাঘে!
কম্প দিয়ে থাম্‌ছে কলম ঝম্প দেখে ত্রাস,
এখন, ঠৈরাণদিদীর সঙ্গে কল্পি বসন্ত-বিলাস!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কুমার-সম্ভব (২)

পার্ব্বতীর পরীক্ষা শেষ হইল। এখন পাঠক, তুমি কি মনে করিতেছ, গৌরী তখনই চিরবাঞ্ছিত দয়িতের অঙ্কশায়িনী হইলেন? তুমি পূর্ব্বেই জানিয়াছ, শৈলজা পিতার অভিলাষ পূর্ণ করিতে কিরূপে যত্নবতী। এখন তিনি সখীদ্বারা মহাদেবকে বলাইলেন,

"দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তামিতি,"

দেবাদিদেব মহাদেবকে কন্যা দান করিবার যে অতুল সম্মান, হিমালয় যাহাতে সেরূপ যশঃমণ্ডিত হইতে পারেন, তন্নিমিত্ত-স্নেহময়ী তনয়ার কি যত্ন, কি আকাঙ্ক্ষা!

পার্ব্বতী সম্বন্ধে আমরা একটী মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিব। একটী মাত্র শ্লোকের দ্বারা মহাকবি গৌরীচরিত্র আরও কত মনোহর ও সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বভাবতই আমরা এরূপ মনে করিতে পারি, এতকাল পর্য্যন্ত যে রমণী কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, বুঝি বা সাধ্বী অবলা-সুলভ চাপল্য ও লজ্জা—যাহা অবলাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য—বুঝি বা সে চাপল্য ও লজ্জা পার্ব্বতীর মন হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে! বুঝি বা তাঁহার মনটী এখন শুষ্ক কাষ্ঠসম! বাস্তবিক পার্ব্বতীর মন যদি এখন এইরূপই হইত, তবে কখনই আমরা তাঁহাতে এতদূর আকৃষ্ট হইতাম না। কিন্তু মহাকবি একটী মাত্র কৌশল দ্বারা তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যময়ী করিয়া তুলিয়াছেন। সপ্তর্ষিগণ আসিয়া পার্ব্বতীর সমক্ষে, হিমালয়ের নিকট শিবের সহিত পরিণয় প্রস্তাব করিলেন। তখন "অধোমুখী

লীলা কমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী।" ৮৪।৬

পাঠকের কি তখন Lady of the Lake এর প্রায় তদবস্থিতা Ellen কে মনে পড়ে না?

"Like summer rose,
That brighter in the dew-drop glows,
The bashful maiden's cheek appeared,
For Douglas spoke, and Malcolm heard.
The flush of shame faced joy to hide,
The hounds, the hawk, her cares divide :"
II, 24.

পার্ব্বতী-চরিত্রাঙ্কনে কালিদাস যে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ চিত্রের এমনই মনোহারিত্ব যে, যে ইহা দেখিবে, সে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে! চিত্রটী এমনি স্নিগ্ধ, শান্ত, পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর যে, ইহাকে প্রাচীন যোগী ঋষিদের পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরস্থিত একটী পুণ্যপুঞ্জময় তপোবনের সহিত তুলনা দিতে ইচ্ছা হয়।

মহাদেব।

মহাদেব সম্বন্ধে কাহার কিরূপ সংস্কার আছে, জানি না। কিন্তু আমি যখন পুরাণোক্ত মহাদেবের বিষয় আলোচনা করি, তখন অতবড় রূপবান্ ও জ্ঞানবান পুরুষ আর কল্পনা করিতে পারি না। অতবড় তেজস্বী, জ্ঞানী, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ আর একটী উপস্থিত হয় না। তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভবভূতির সেই চিরস্মরণীয়া উক্তিটী আমার মনে পড়ে,

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহহি-
বিজ্ঞাতুমর্হতি।"

যাহা হউক, "কুমার-সম্ভব" আমরা যেরূপ অবস্থায় দেখিতে পাই, এখন তাহারই আলোচনা করিব।

দেবকার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য কামদেব মহাদেবের তপোবনে অকালে বসন্ত সঞ্চারের দ্বারা তথায় উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনও তিনি সেই ধ্যানমগ্ন মহাদেবকে দেখেন নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মদন সেই সমাধি-নিশ্চল যোগীশ্বরকে দেখিলেন, সেইক্ষণই—

স্মরস্তথাভূতময়ুগ্মনেত্রং
পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যম্।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বস সন্নহস্তঃ
স্রস্তংশরং চাপমপি স্বহস্তাৎ॥

৫১।৩

একি স্মর! তুমি না বড় স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলে, "কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণে র্ধৈর্য্যচ্যুতিম্"? এখন সে কথা রহিল কোথায়? তাঁহাকে জয় করা ত দূরের কথা, তাঁহাকে দেখিয়াই মৃতপ্রায়? কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। চিরকাল ইন্দ্রিয়জিতদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়া তোমার সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল, স্বশক্তিতে তোমার অপরিমিত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাই তুচ্ছ জ্ঞানে হরকেও তুমি অনায়াসে জয় করিতে চাহিয়াছিলে! কিন্তু এখন দেখিলে সে হরকে, সে হর যে তোমার "মনসাপ্যধৃষ্যঃ!" পুণ্যের দর্শনও পাপ সহ্য করিতে পারে না, আলোক দর্শনে অন্ধকার দ্রুতগতিতে লয় হয়!

সমাধি-মগ্ন মহাদেবের শিল্পচতুর মহাকবি যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সাহিত্য-জগতে উহা সুদুর্লভ। তদবস্থ মহাদেবের ফটো কিম্বা তৈলচিত্র কখনও উহা হইতে উজ্জ্বল হইতে পারে না। ইচ্ছা করে, সম্পূর্ণ চিত্রটী পাঠক মহাশয়ের সমক্ষে উপস্থিত করি। কিন্তু আমরা যে ইচ্ছা সংযত করিলাম। পাঠক মহাশয়, মূলগ্রন্থে চিত্রটীর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। আপনার প্রাণ পুলকিত হইবে।

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ
মপামিবা ধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা
ন্নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ ৪৮।৩

এ হেন সমাধিমগ্ন মহাদেব যখন—

"যোগাৎ সচান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং
দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপররাম॥" ৫৮।৩

তখন নন্দী আসিয়া প্রণাম করিয়া নিবেদিল যে, তাঁহার অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত পার্ব্বতী দ্বারে উপস্থিত। তাঁহাকে অভ্যন্তরে আনিবার জন্য মহাদেব নন্দীকে ভ্রূভঙ্গী দ্বারা সঙ্কেত করিলেন। অধিক কথা বলা তাঁহার অভ্যাস নহে, সুতরাং কোনও বাক্য ব্যয় না করিয়া ভ্রূভঙ্গী দ্বারা অনুমতি প্রদান করিলেন। পার্ব্বতীর হস্ত হইতে তিনি যখন এক ছড়া পদ্ম-বীজের মালা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, তখন অবসর বুঝিয়া কাম উভয়কে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ধনুকে শর যোজনা করিলেন। গৌরীর পক্ষে ইহার পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। মহাদেবের চিত্তও যে ঈষৎ চঞ্চল না হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই তিনি স্বীয় অপূর্ব্ব জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভাবে সেই সামান্য ইন্দ্রিয় ক্ষোভ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত করিলেন। এবং কেন তাঁহার অকস্মাৎ এরূপ চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

এখানেই মহাকবির মহাকৃতিত্ব। যদি এস্থলে মদনের ধনুকে শরসংযোগ হেতু মহাদেবের কিছুমাত্র চাঞ্চল্য না হইত, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতাম বটে; কিন্তু একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের অধিক ভালবাসিতাম কিনা, বলিতে পারি না। সামান্য চিত্তবিকার জন্মিবার পরমুহূর্ত্তেই যে তিনি তাহা সংযত করিতে পারিয়াছিলেন, এ দৃশ্য দেখিলে আমার হৃদয় স্বতঃই ভক্তি চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া সেই যোগীশ্বরের চরণে লুটিয়া পড়ে! নিতান্তই যেন তাঁহার চরণ-রেণুতলে পড়িয়া থাকিতে মানুষের সাধ হয়!

তখন মহাদেব দেখিলেন, স্মর তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তপশ্চর্য্যার বিঘ্ন ঘটায় তিনি অতিশয় রুষ্ট হইলেন। ভ্রূভঙ্গী হেতু তাঁহার মুখমণ্ডল বিকট আকার ধারণ করিল; এবং পাপ বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত সহসা তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে প্রচণ্ড উদ্গতশিখ হুতাসন বহির্গত হইয়া দ্রুত বেগে ছুটিল। অন্তরালে থাকিয়া দেবগণ সকলই দেখিতেছিলেন। সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত জানিয়া, তাঁহারা কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,

"ক্রোধং প্রভো সংহর, সংহর।"

কিন্তু তাঁহাদের সে কাতর প্রার্থনা শিব-কর্ণে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই—

"সবহ্নির্ভব নেত্র জন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার। ৭২।৩

সে নয়নোদ্গত অনলের বেগ কি ভয়ানক! রতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, পার্ব্বতী ত্রাসে কাঁপিতে লাগিলেন, শঙ্কর তখনই স্ত্রী সন্নিকর্ষ ত্যাগ করিয়া ভূতগণ সহ যে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন! মুহূর্ত্তের মধ্যে এতগুলি ব্যাপার হইয়া গেল!

"স্ত্রী সন্নিকর্ষং পরিহর্ত্তুমিচ্ছ
ন্নন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ।" ৭৪।৩

এস্থলে "স্ত্রী সন্নিকর্ষং পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্" কথাটী মহাদেবের চরিত্র যেন অধিকতর মনোহর করিয়াছে, তাঁহাকে যেন আরও আমাদের আপনার করিয়া তুলিয়াছে! অতবড় ব্রহ্মচারী, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়ত্বের এখনই আমরা অদ্ভুত পরিচয় পাইলাম, তিনিও এত সাবধান!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাদেবের বিষয় যখন আমি চিন্তা করি, তখন ভবভূতির সেই মহাবাক্যটী আমার মনে হয়—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

কেন এ মহাপুরুষের হৃদয় বজ্র হইতেও কঠোর, তাহা আপনারা দেখিলেন। আবার এ হৃদয় কেমন করিয়া কুসুম হইতেও মৃদু, তাহাই এখন দেখাইব।

ইহার পর মহাদেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার পঞ্চম সর্গে,—তখন পার্ব্বতী তাঁহাকে তপোবনে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীর ছদ্ম বেশে আপনার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, কৌশলে মহাদেব তাঁহার প্রেমের স্থিরতা ও গভীরতা পরীক্ষা করিলেন। প্রথমে গৌরীর রূপগুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া তৎপর তাঁহার তপশ্চর্য্যার কারণ জানিতে চাহিলেন। তিনি পার্ব্বতীর ক্লেশে অতিশয় সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, এবং অবশেষে তাঁহাকে এই বলিয়া পরম আপ্যায়িত করিলেন,

"মমাপি পূর্ব্বাশ্রমসঞ্চিতং তপঃ
তদর্দ্ধভাগেন লভস্ব কাঙ্খিতম্।"

তৎপরে পার্ব্বতীর তপশ্চর্য্যার কারণ অবগত হইয়া মহা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং শিবের ভয়ানক নিন্দা

করিলেন। এ অসাধু সঙ্কল্প হইতে পার্ব্বতীকে নিবৃত্ত করিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, পার্ব্বতীর দৃঢ় মন কিছুতেই টলিল না, তখন তিনি নিজরূপ ধারণ করিয়া গৌরীর সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন! মহেশ্বরের মহালীলা সমাপ্ত হইল!

এখানে একটা কথা বলিবার আছে। আমি কোন প্রবীণ অধ্যাপককে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, গৌরীর সহিত আলাপ করিতে করিতে মহেশ্বর এমন কোন কোন কথা বলিয়াছিলেন, যাহা সর্ব্বথা রুচি-বিগর্হিত। পতি পত্নীর নিকট ব্যতীত, কোন পুরুষই অন্য কোনও কামিনীর নিকট সে সব কথা বলিতে পারে না। অধ্যাপক মহাশয়কে আমরা কোন দোষ দিতে পারি না। আমাদের রুচি আজকাল এমন সংযত ও সংস্কৃত হইয়াছে যে, আমাদের পিতৃ পিতামহোদয়গণ যে বিষয়ে পবিত্র ও অকপট চিত্তে আলাপ করিতে পারিতেন, আমরা দূর হইতেই তাহাতে কুরুচির ঘ্রাণ পাইয়া উন্মত্তপ্রায় হই। আমাদের এ ভাবটা য়ুরোপ হইতে আমদানী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু নৈতিক জীবনে আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ হইতে উন্নত কি অবনত, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

একটী কথা আমাদের মনে রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়,—যাঁহারা ধর্ম্ম জীবনে অতিশয় উন্নত, তাঁহারা অনুন্নত ও সঙ্কীর্ণ-চেতা আমাদের ন্যায় যত্র তত্র পাপ দর্শন করেন না। পাপ ত মনের বিকার মাত্র, নহিলে পাপ বলিতে আর কি আছে? যাহার মনে যে পরিমাণ অপবিত্রতা আছে, সে বহির্জ্জগতে স্বাভাবিকতায়ও সেই পরিমাণ অপবিত্রতা দেখে। যাঁহার মন সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি বহির্জ্জগতের স্বাভাবিকতায় কিছুমাত্র পাপ দেখেন না। জলক্রীড়াসক্তা রমণীগণের নিকট পর পর ব্যাসদেব ও শুকদেবের আগমন-কাহিনীই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অন্ততঃ একটুকুও আমাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, মহাদেব ত জানিতেন, পার্ব্বতীই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী। সামাজিক নিয়মানুসারে এখনও মন্ত্র-পূতা নহেন বটে, কিন্তু তপো প্রভাবে তাঁহারা উভয়ে যে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সমাজিক মন্ত্র পাঠের বিশেষ আবশ্যক ছিল না। আর্য্য বিবাহের যে উদ্দেশ্য,—ধর্ম্মজীবনে দম্পতীর মানসিক একীকরণ, তপোবলে তাহা তাঁহাদের ইতি-পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল। যদি কেহ বলেন, তবে কেন তাঁহারা আবার সামাজিক নিয়মানুসারে বৈবাহিক মন্ত্রাদি পাঠ করিলেন? তদুত্তরে স্বয়ং ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

> কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
> লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
> যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষুলোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
> যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
> উৎসীদেয়ুরিমে লোকানকুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।
> সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
> সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
> কুর্য্যাদ্বিদ্বাং স্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥
>
> তৃতীয় অধ্যায়।

প্রকৃতই যদি মহাদেবের কথাগুলি

রুচি-বিগর্হিত কুৎসিৎ ভাবাপন্ন হইত, তাহা হইলে পার্ব্বতীর ন্যায় তপোপ্রভা-মণ্ডিতা ব্রহ্মচারিণী কি সহজে তাঁহাকে ছাড়িতেন ? এসব কথা না ভাবিয়া যাঁহারা স্ব স্ব রুচি অনুসারে মহেশ্বরের কথাগুলিতে দোষ দর্শন করেন, তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তবে একজন প্রবীণ অধ্যাপকের মুখে এ আপত্তিটী শুনিয়াছিলাম বলিয়া এতগুলি কথা বলিলাম।

মহাদেবের বিবাহ করিবার কারণ কি, শ্মশানবাসী শিবের গৃহী হইবার কারণ কি, এখন তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কেহ মনে করিবেন না, তিনি পার্ব্বতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যদি রূপে মুগ্ধ হইবার পাত্র হইতেন, তবে কামও ভস্মীভূত হইতেন না, পার্ব্বতীরও এত কঠোর তপস্যা করিতে হইত না। পার্ব্বতী যদি অত সুন্দরী না হইয়া, যদি একটী কদাকার "লুব্জদেহ কুব্জপৃষ্ঠ" রমণীও হইতেন, তাহা হইলেও মহাদেব তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতেন, সন্দেহ নাই ; কারণ, মহেশ্বর পার্ব্বতীর গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কেহই তাঁহাকে এ বিষয়ে পূর্ব্বে চিনিতে পারেন নাই। স্বয়ং পদ্মযোনি যে বলিয়াছিলেন,—

"পরিচ্ছিন্ন প্রভাবর্দ্ধির্ন ময়া নচ বিষ্ণুনা"

তাহা ঠিক কথা। মহেশ্বরের মহিমা যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন, তবে কখনই তিনি দেবগণকে উপদেশ দিতেন না,

উমারূপেণ তে যুয়ং সংযমস্তিমিতং মনঃ।
শম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুময়স্কান্তেন লৌহবৎ॥

এ বিষয়ে স্বয়ং ব্রহ্মারই যখন এই ভয়ানক ভ্রান্তি হইয়াছিল, তখন অন্যান্য দেবগণের, হিমালয়ের এবং পার্ব্বতীরও যে ভ্রান্তি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ! শিব গৌরীর গুণেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহার বিবাহ করিবার আরও একটী কারণ ছিল। ত্রিলোকের মঙ্গল সাধন করিবার জন্যই তিনি দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সপ্তর্ষিদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন,

"বিদিতং বো যথা স্বার্থা নমে কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ।
ননুমূর্ত্তিভিরষ্টাভিরিত্থম্ভূতোহস্মি সূচিতঃ॥
সোঽহং তৃষ্ণাতুরৈর্বৃষ্টিং বিদ্যুতানিব চাতকৈঃ।
অরিবিপ্রকৃতৈর্দেবৈঃ প্রসূতিং প্রতিযাচিতঃ॥
অতঃ আহর্ত্তুমিচ্ছামি পার্ব্বতীমাত্মজন্মনে।
উৎপত্তয়ে হবির্ভোক্তুর্যজমান ইবারণিম্॥"

২৭, ২৭, ২৮। ৭

ত্রিদিবে শান্তি স্থাপিত হইলে, ত্রিলোকে শান্তি স্থাপিত হইবে। স্বর্গ রক্ষিত হইলে, ত্রিলোক রক্ষিত হইবে। সুতরাং ত্রিলোকের উদ্ধারের নিমিত্তই যে মহেশ্বর পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

আর আর কথা।

"রঘুবংশের" ন্যায় "কুমার-সম্ভবের" গল্পে কোন জটিলতা নাই। "কুমার-সম্ভবের" গল্পটী অতি সরল। কেবল এই দিক দিয়া বিচার করিলে, সংস্কৃত সাহিত্যে "কুমার-সম্ভবের" স্থান উচ্চ হইবে, আমাদের এরূপ ভরসা নাই। কিন্তু ইহার কতকগুলি অনন্যসাধারণ কাব্যোপযোগী গুণ আছে, এবং তজ্জন্যই সাহিত্য-সমাজে "কুমার-সম্ভবের" এত প্রতিষ্ঠা।

"কুমার-সম্ভবের" গল্পের গতি বড় মন্থর। বর্ণনাই অধিক। কিন্তু সে বর্ণনাগুলি

এমনই চিত্তহারক যে, পড়িবার সময়ে গল্পের গতি-মন্থরতা অনুভব করিতে পারা যায় না। এবং সে বিষয়ে ভাবিবার অবকাশ থাকে না, ভাবিবার প্রবৃত্তিও হয় না।

কাব্যের গল্প সরল হউক, তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই, যদি সে গল্প আমাদের মনের ঔৎসুক্য উদ্দীপিত করিতে পারে। গল্পের গতি মন্থর হউক, ক্ষতি নাই, যদি সে গতি-মন্থরতা বর্ণনার চমৎকারিত্বে আমাদের অনুভব করিতে না হয়। কিন্তু সে কাব্যে যদি বিচিত্রতা না থাকে, তবে সে দোষ ঢাকিবার উপায় নাই। "কুমার-সম্ভব" মহাকাব্যে বৈচিত্র্য যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। যাঁহাদের সংস্কার আছে, কাব্যের বৈচিত্র্য বলিতে কাব্যের গল্পের বা Plot এর বৈচিত্র্য বুঝায়, তাঁহারা আমাদের কথায় বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু কাব্যের গল্পেও যেমন বৈচিত্র্য দেখান যায়, কাব্যের বর্ণনায়, ঔৎসুক্যোদ্দীপকতায় এবং আরও অনেক বিষয়ে সেইরূপ বৈচিত্র্য দেখান যায়।

"কুমার-সম্ভবের" গল্পে মোটেই বৈচিত্র্য নাই, আমরা এমন কথা বলি না। ছদ্মবেশী মহাদেবের পার্ব্বতীর নিকট আগমন ও তাঁহার মন পরীক্ষা, সপ্তর্ষিগণের হিমালয়ের নিকট মহাদেবের সহিত গৌরীর বিবাহ প্রস্তাব করণ সময়ে অধোমুখী গৌরীর লীলা, কমল পত্র গণনা প্রভৃতি কুমার-সম্ভবের গল্পেও কিছু কিছু বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তাহা সংখ্যায় অতি অল্প।

"কুমার-সম্ভবের" গল্পে বৈচিত্র্য অধিক পরিমাণে নাই,—এ জন্ত আমরা কিন্তু মহা কবিকে দুই একটী কথা না শুনাইয়া পারিব না। যদি কেহ মহা কবির পক্ষাবলম্বন করিয়া বলেন যে, তাঁহার সময়ে সমাজে পুরাণ ইতিহাস বলিয়াই বিশ্বস্ত হইত, সুতরাং যে কাব্য পুরাণ বা ইতিহাস মূলক, তাহাতে কাব্যকারের কল্পনা-প্রসূত বিচিত্র ঘটনাবলী সন্নিবিষ্ট করিবার অধিকার ছিল কি? তদুত্তরে আমরা বলিব যে, কালিদাস "শকুন্তলায়" ও তো অনেক সময়ে পুরাণের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া স্বীয় কল্পনা-প্রসূত বিচিত্র ঘটনাবলীর সমাবেশ করিয়াছেন, উহাতে কেহই দোষ দর্শন করেন নাই; পরন্তু উহা সম্যক্ লোক-মনোরঞ্জনকর হইয়াছে। পুরাণে দুই শ্রেণীর ঘটনা থাকে,—যাহা বাস্তব জগতে ঘটিয়াছে, এবং যাহা শুদ্ধ কল্পনা-প্রসূত। প্রথম শ্রেণীর ঘটনাবলীই প্রকৃত পক্ষে ঐতিহাসিক। যে সকল কাব্য এই শ্রেণীর ঘটনা-মূলক, তন্মধ্যে কাল্পনিক ঘটনাবলী অনুপ্রবিষ্ট করিতে সময়ে সময়ে সঙ্কোচ বোধ হয় বটে; কিন্তু উহাও যদি কাব্যকারের কর্ম্মজগৎ হইতে দূরে কিম্বা ঊর্দ্ধে গ্রথিত থাকে, তবে বুঝিয়া সুঝিয়া তন্মধ্যেও কাল্পনিক ঘটনাবলীর সমাবেশ করা যায়। "রঘুবংশ" এই শ্রেণীর ঘটনা-মূলক কাব্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বর্গ পাতাল প্রভৃতি বিষয়াত্মক, পুরাণোক্ত যে শ্রেণীর ঘটনাবলী কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই, যাহারা মানবের কল্পনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তন্মধ্যে যদি কেহ কোন শিল্প-নিপুণ কবি লোক-শিক্ষাপ্রদ কাল্পনিক ঘটনাবলীর সন্নিবেশ করিতে পারেন, তবে ক্ষতি কি? "শকুন্তলায়" উল্লিখিত দুই শ্রেণীর ঘটনাবলীই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, যে কাব্যে মহাকবি অবাধে কাল্পনিক বিচিত্র ঘটনা-রাশির সন্নিবেশ করিতে পারিতেন, তাহাতে তিনি এরূপ করেন

নাই। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়, সন্দেহ নাই।

কিন্তু "কুমার-সম্ভবে" অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। কালিদাসের প্রধান প্রধান সকল কাব্যেই প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট প্রাকৃত বর্ণনের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। "কুমার-সম্ভবেও" এই প্রকারের বর্ণনা যথেষ্ট আছে। উজ্জ্বল নক্ষত্র-খচিত নীলনভের ন্যায় এই মহাকাব্য খানি চিত্ত-প্রসাদক চমৎকার প্রাকৃত বর্ণনে পূর্ণ। হিমালয় বর্ণন, পার্ব্বতীর রূপ-বর্ণন, অকাল বসন্ত-বর্ণন প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট প্রাকৃত বর্ণনাগুলি কাহার প্রাণে না অমৃত নির্ঝর উৎসারিত করে, তাহা বলিতে পারি না। কালিদাসের প্রাকৃত বর্ণনের একটী বিশেষ গুণ এই যে, উহা কখনই বিরক্তিজনক নহে। পরন্তু উহা সর্ব্বত্রই বিমল সুখ-প্রদ। যে সুখে অবসাদ কিম্বা অপবিত্রতা নাই, উহা সর্ব্বত্রই স্নিগ্ধ, শান্তিরসাশ্রিত। কালিদাস একই বর্ণনা কখনও পর পর দুইবার শুনান না। ব্রহ্মাণ্ড যত বড়, তাঁহার কল্পনাও তত বড়। সুতরাং পৌনরুক্ত্য দোষে তাঁহার কাব্য কদাচিৎ দুষ্ট। তাঁহার কল্পনা-শক্তির একটী বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, উহা অভিজ্ঞতা ভিত্তির উপর দৃঢ় সংস্থাপিত। আমাদের এ কথাটী সম্ভবতঃ অনেকের নিকট কেমন কেমন বোধ হইতেছে। সুতরাং কথাটী পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। অনেকে পর্ব্বত না দেখিয়া সুদীর্ঘ হিমালয় বর্ণন করেন। সমুদ্র না দেখিয়া সহস্র শ্লোক-পরিমিত সমুদ্র-বর্ণন করেন। যোগ-শাস্ত্রে যাঁহার কোন অভিজ্ঞতা নাই, তিনি যোগীর বর্ণনা করেন। কালিদাস এ শ্রেণীর কবি নহেন। তাঁহার বর্ণনাগুলি পড়িলে বুঝা যায়, বর্ণিত বিষয়ের প্রকৃত অভিজ্ঞতা তাঁহার যথেষ্ট আছে। [illegible] বলিতে পারি, যিনি হিমালয় না দেখিয়াছেন, তিনি অমন মনোমোদক হিমালয়-বর্ণন [illegible] পারেন না। যিনি যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াছেন, তিনি সমাধি-নিশ্চল মহাদেবের অমন হৃদয়-গ্রাহী বর্ণনা করিতে পারেন না। জ্যোতিষ, দর্শন, বিজ্ঞান, স্মৃতি, ইতিহাস, ভূগোল,—কোন শাস্ত্রে যে কালিদাসের জ্ঞান ছিল না, তাহা বলিতে পারি না। এই সকল শাস্ত্রে আমাদের মহাকবির যে কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা তাহার অমৃত-ময় অমর কাব্যগুলি যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছে।

"কুমার-সম্ভবের" ব্যক্তিগত বক্তৃতাগুলি এমনই যথাযোগ্য-পদ-বিন্যস্ত ও এমনই কৌশলের সহিত কথিত যে, পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভৃত্যতুল্য কাম,—দেবরাজের তাহাকে নিজ সিংহাসনের নিকট আসন-প্রদান, তাহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন, স্বীয় বজ্র হইতে তাহার ধনুকের মহিমা-বর্ণন, তাহার শরীরে হস্তস্পর্শ দ্বারা তাহার সম্মান-বর্দ্ধন;—গৌরব-স্ফীত কামের নিজ-ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা-বর্ণন; ছদ্মবেশী শিবের পার্ব্বতীর নিকট আত্মনিন্দা, পার্ব্বতীর ক্রোধ, সপ্তর্ষিগণের ঘটকতা প্রভৃতি বিষয়ে চমৎকার হৃদয়গ্রাহী বৈচিত্র্য আছে। তাহা কেমন করিয়া বলিব! তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই।

কুমার-সম্ভবের গল্পের গতি অতি মন্থর বলিয়াছি। কাব্যোল্লিখিত ঘটনাগুলি ঘটিতেও অনেক কাল লাগিয়াছিল। "রত্নাবলীর" ঘটনাগুলির ন্যায় কুমার-সম্ভবের ঘটনাগুলি দুইরাত্রি একদিনে একই স্থানে সমাপ্ত হইয়াছিল না। এই কাব্যের ঘটনা-

বর্ণীয় স্থান ব্রহ্মলোক, স্বর্গলোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং হিমাচল। উহাতে সুরাসুর উভয়ের কাহিনী আছে। উহাতে উমার জন্ম হইতে যৌবন পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে মহাদেবের বহুবর্ষব্যাপী তপশ্চর্য্যার কথা আছে। এ সকল ঘটনা ঘটিতে অনেক সময়ই লাগিয়াছিল। সুতরাং এত কাহিনী যে কাব্যে স্থান পাইয়াছে, তাহার গতি যদি মন্থর হইয়া থাকে, তাহা তত দূষণীয় নাও হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "কুমার-সম্ভব" পুরাণমূলক কাব্য। "শিব-পুরাণ, "মাহিষ্যপুরাণ" এবং অশ্বঘোষ-কৃত "বুদ্ধ-চরিত" হইতে কালিদাস কুমার-সম্ভবের উপকরণ আহরণ করিয়াছেন। এই উপকরণ-রাশি আহরণ করিতে কালিদাস বিশেষ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। "কুমার-সম্ভবের" অনেকগুলি স্থান উল্লিখিত গ্রন্থগুলির স্থল বিশেষের প্রতিধ্বনি মাত্র। "কুমার-সম্ভবের" দ্বিতীয় সর্গে দেবগণ পদ্মযোনির যে স্তব করিয়াছেন, উহা পুরাণোক্ত স্তবের প্রায় নকল মাত্র। উল্লিখিত গ্রন্থগুলির নিকট কালিদাস কতদূর ঋণী, তাহা পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী এম্, এ, মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত কুমার-সম্ভবের অবতরণিকায় দেখাইয়াছেন। সম্ভবতঃ কুমার-সম্ভব কালিদাসের প্রাথমিক রচনার অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক রচনা বলিয়াই তিনি পুরাণ হইতে এত অধিক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—

"It seems that being a novice in the art he was not yet fully confident of his powers; and therefore sought help from sources which were then accepted as authorities. Taking into consideration a long with this, the legendary account that the poet promised to his wife to compose three poems beginning with each of the words of the sentence "অস্তি কশ্চিদ্ বাগবিশেষঃ" the Kumarasambhava appears to be the maiden production of the poet."

"কুমার-সম্ভব" মহাকাব্যে অনেকগুলি নাটকোপযোগী গুণ আছে। এই নিমিত্ত "কাদম্বরী"-রচয়িতা কবিবর বাণভট্ট নাটকাকারে পরিণত করিয়াছিলেন। "কুমার-সম্ভবের" তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গকে দুই খানি ক্ষুদ্র খণ্ড নাটিকা বলিলেও হয়। নাটকাকারে লিখিত হইলে, উহা অধিকতর সুন্দর হইত না। উক্ত দুই সর্গ পড়িবার সময়ে আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি এমনই সতেজ ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, আমাদের কল্পনা শক্তি এমনই উত্তেজিত হয়, যেন জ্ঞান হয়, প্রকৃতই আমরা কোন অভিনয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভে ইন্দ্র ও কামের যে কথোপকথন হইয়াছিল, উহাকে নাটক ব্যতীত আর কি বলিব? দূরে কাম দেহ ভঙ্গ করিয়া শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান, উর্দ্ধে স্বর্গ হইতে দেবগণ তারস্বরে "ক্রোধং প্রভো সংহর, সংহর" বলিয়া কাতর ভাবে চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদের করুণ প্রার্থনা শিব-কর্ণে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বেদিকা-পরিস্থিত হরের রোষ-কষায়িত তৃতীয় লোচনোদ্গত কালানল কামকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত, আবার সেই ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, দীপ্ত জটাধারী ব্রহ্মচারীর চরণ প্রান্তে নবানুরাগ-লজ্জাভিভূতা প্রফুল্ল-নয়না সাচীকৃতবদনা ষোড়শী গৌরী!—সকলই এক মুহূর্ত্তে, একই চক্ষুর নিমিষে! বল দেখি, নাটক আর কাহাকে বলে? ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারীর শিব-নিন্দা, গৌরীর ক্রোধাভি-

শয্যা, ব্রহ্মচারীর অধরোষ্ঠ কম্পন, তদ্দর্শনে রুষ্টতরা পার্ব্বতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ও তৎস্থান হইতে গমনোদ্যততা, শিবের স্বরূপ ধারণ, তপঃক্লিষ্টা অপর্ণার প্রেম-লজ্জা-এবং-আরও কত-কিজন্য "ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা," শিবের পার্ব্বতীকে আলিঙ্গন,—ইহা অপেক্ষা সুন্দর অভিনয় কেহ কুত্রাপি দেখিয়াছ কি? "কুমার-সম্ভব" কাব্যখানি যে বিশেষ ভাবে নাটকীয় গুণ-বিশিষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"কুমার-সম্ভবের" কবিত্বের কথা বলিতে গেলে প্রবন্ধ-কলেবর অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে বিস্তর কথা বলিবার আছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার বাসনা রহিল।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (১০)

প্রাচীন আচার ব্যবহার। *

পরমায়ু।—মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু পরমায়ু। ইহা পূর্ব্বের লোকেরা সুদীর্ঘকাল স্বাস্থ্যের সহিত সম্ভোগ করিতেন। "অশীতিপর বৃদ্ধ" কথাটী এখন যেন প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে যে সকল লোকের নাম আসিয়া পড়ে, তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেই আশী বৎসরের নিম্নে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ৯০।১০০ এবং তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক লোকেরও অভাব ছিল না। বৃদ্ধেরা কেবল বাস করিতেন না, বিলক্ষণ কায়িক পরিশ্রম করিতেন। তাঁহারা ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইলে অনেকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতেন। শুনা যায়, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা ৬৪ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন এবং তাঁহার ৬৬ বৎসর বয়সে জগন্নাথের জন্ম হয়। বঙ্গের গৌরব পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১১১ বৎসর জীবিত থাকিয়া নিয়মিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বেও তিনি ৪।৫ ক্রোশ পথ চলিতে পারিতেন। তিনিও ৬২ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হন। অনেক লোকে তাঁহাকেও পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি, পুত্র পৌত্রাদি বর্ত্তমানে, কি জন্য বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিবেন, সুতরাং কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। এখন ট্রাম ও ভাড়াটিয়া গাড়ীর কৃপায় অধিকাংশ লোকে হাঁটিতে ভুলিয়া গিয়া বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। তখন মহাধনাঢ্যব্যক্তি ভিন্ন কেহ পাল্কী চড়িতে পারিতেন না, কারণ নবাবের অনুমতি ব্যতীত কাহারও পাল্কী রাখিবার সাধ্য ছিল না। ছক্কর নামক এক প্রকার দড়িতে ঝুলান গাড়ী কোন কোন বড়মানুষের থাকিত, কিন্তু এখনকার মত পথের সুবিধা না থাকায় গাড়ী বহুদূর যাইতে পারিত না।

* গত ১০ই চৈত্র "সাহিত্যপরিষদে" পঠিত প্রবন্ধ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

মধ্যে মধ্যে পয়ঃপ্রণালী রাস্তাকে গভীর-রূপে দ্বিখণ্ড করিয়া রাখিত এবং একখানি সামান্য তক্তা বা সামান্য রকম বাঁশের পোলের সাহায্যে লোকে গতিবিধি করিত। সুতরাং কি ধনী কি নির্ধন, সকলকেই পদ-ব্রজে গমনাগমন করিতে হইত। ১০।১২ ক্রোশ পথকে তাঁহারা দৃক্‌পাত করিতেন না।

এখন যদি দুই চারিজন আশী বৎসরের অধিক-বয়স্ক লোক দেখা যায়, তাঁহাদের চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ শক্তিহীন, আহার এক-কালে নাই বলিলেও হয়, কোন রকমে পরের সেবায় জীবিত আছেন। শতাধিক বর্ষ জীবন ধারণ, কখন কখন সংবাদ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আর ২৫ বৎসর পরে শত বৎসর পরমায়ু উপন্যাসের কথা এবং আশী বৎসর পরমায়ু আশ্চর্য্যের ব্যাপার হইবে বলিয়াই অনুমান করা যায়। পূর্ব্বের জলবায়ু এখনকার অপেক্ষা ভাল ছিল, ইহাই পরমায়ু হ্রাস বৃদ্ধির কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই জল বায়ুর দূষিতাবস্থার কারণ দেখিতে গেলে বুঝা যায়, পূর্ব্বে নদী নালা খাল বিল অনেক ছিল, কালে সেই সমস্ত মজিয়া ভরাট হইয়া উঠায়, জলপ্রণালী বন্ধ হইয়া জল বায়ুকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। ম্যালেরিয়া-কমিশনে স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ও এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমস্ত চিকিৎসকেরাই তাঁহার এই মত পোষণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টকেও উহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। যখন নদী নালা প্রবা-হিত ছিল, তখন প্রায় প্রতিবৎসর বাণ আসিয়া অনেক স্থানকে ধৌত করিয়া আবর্জ্জনারাশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিত। এখন তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক গ্রাম বা নগরের আবর্জ্জনা নিকটস্থ আবদ্ধ খাল বিল বা পুষ্করিণীতে পচিয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। অনেকে, বিশেষতঃ ইংরাজেরা অনুমান করেন যে, কলিকাতা চিরকালই অস্বাস্থ্যকর স্থান। জব চার্ণক এই স্থানকে মনোনীত করায় তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার প্রমাণই তাঁহারা দেখিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের অনুমান বিভিন্ন, চার্ণক হিজলি প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া যে প্রকার ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে জল বায়ুর দোষ গুণ বুঝিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা জন্মে নাই, ইহা কেমন করিয়া বলিব। কলিকাতার পূর্ব্বদিকস্থ বাদাকেই তাঁহারা সকল দোষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অষ্টাদশ শতা-ব্দীর প্রথমকালে বাদা কলিকাতার পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত আসিত, সেই জন্য বর্ষাকাল এত পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইত।" এটী কিন্তু বিপরীত কথা হইল; বর্ষাকালে বাদা কলিকাতার পার্শ্বে আসিয়া উহার সমস্ত আবর্জ্জনা ধুইয়া লইয়া যাইত, তাহাতে উপ-কার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা কি। বাদা পূর্ব্বে গভীর এবং প্রবাহযুক্ত ছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে উহা অনেক পরিমাণে উচ্চ হইয়া প্রবাহ-হীন হওয়াই যদি অস্বাস্থ্যের কারণ হইত, তাহা হইলে এখন আরও উচ্চ, শুষ্ক এবং প্রবাহশূন্য হইয়া অধিকতর দূষিত বায়ু দ্বারা সমগ্র নগরীকে কোন্ দিন ধ্বংস করিয়া ফেলিত। অন্তত বাদার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি জনশূন্য হইত। ইংরাজদিগের প্রথম আমলে এ প্রদেশ যে প্রকার অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল, পূর্ব্বাবধি সে প্রকার থাকিলে

ভবানীপুর, গোবিন্দপুর, সুতানুটী, বাগুয়া চিৎপুর, শিয়ালদহ এবং সারপল্লী (সুড়া) প্রভৃতি গ্রাম সকল বাদার ধারে স্থাপিত হইয়া বৰ্দ্ধিষ্ণু হইতে কখনই পারিত না।

জবচার্ণক এখানে শত শত বার আগমন করিয়াছিলেন, সমস্ত হাট বাজার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেন, বৈঠকখানার বৃহৎ তরুতলে বিশ্রামকালে ব্যাপারীদিগের গতিবিধি সন্দর্শন করিতেন। স্থানকে অস্বাস্থ্যকর দেখিলে তিনি কিছুতেই এখানে কুঠি স্থাপন করিতেন না। সহর নির্ম্মাণে শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্তে অমনোযোগী হওয়াই এই সৰ্ব্বনাশের কারণ। চার্ণক সাহেব ১৮৮৬ খ্রীঃ কলিকাতায় কুঠি প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসলমান, আর্ম্মানী প্রভৃতি সহযোগী ব্যবসায়ী, দাদনী, দালাল, গোমস্তা, পিয়াদা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে এখানে কোম্পানির কারবার উন্নত হওয়ায় উহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায়, তাহারা সপরিবারে বাস করিবার জন্য সাহেবের নিকট ভূমি প্রার্থনা করিতে লাগিল। ১৬৯০ খ্রীঃ জব চার্ণক বুঝিলেন যে, অনেক লোক এখানে আসিয়া বাস করিতে চায়, ইহাতে কোম্পানির সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই, সুতরাং তিনি তাহাদিগকে যাহার যেখানে ইচ্ছা, কোম্পানির এলাকা মধ্যে পতিত জমী লইয়া গৃহনির্ম্মাণে অনুমতি দান করিলেন। উক্ত আদেশ প্রচার মাত্র দলে দলে লোক সহর মধ্যে আসিয়া যাহার যেখানে ইচ্ছা সুবিধামত পরিমাণে জমী লইয়া বসিল। চারিদিকে পগাড় বাঁধিয়া নিম্নভূমিকে উচ্চ করিল। খাল বিলের অংশ লইয়া তাহার উভয় পার্শ্ব বাঁধিয়া বড় বড় দীঘি প্রস্তুত করিল, উভয় দিকের মাটী তুলিয়া যাতায়াতের রাস্তা প্রস্তুত করিল। এই সকল কার্য্যে শীঘ্র শীঘ্র সুন্দর সহর নির্ম্মাণ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সাহেবেরা আনন্দে পূর্ণ হইতে লাগিলেন। তাঁহারাও চারিদিকে খাল নালা বন্ধ করিয়া সরকারী রাস্তা নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। এখন পথে জল দাঁড়াইলে আমাদের কতই না কষ্ট হয়, তখন প্রণালী সকল বন্ধ হওয়ায় বর্ষাকাল কেবল রাস্তা নহে, লোকের বাগান উঠান, এমন কি, অনেক নীচু ঘরগুলি পর্য্যন্ত কয়েক মাস জলা ভূমির ন্যায় হইয়া যাইত।

এই ব্যাপারে কেবল যে জল নিকাশের পথগুলি আবদ্ধ হইয়া সহরে জল দাঁড়াইতে লাগিল, তাহা নহে, অসংখ্য অধিবাসীর পরিত্যক্ত জঞ্জাল, মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুদিগের মলমূত্র, গৃহপালিত পশুদিগের ও অসহায় দরিদ্র লোকের মৃত দেহ পর্য্যন্ত ঐ আবদ্ধ জলে এমন পচিতে লাগিল যে, বর্ষাকালেও সে সমস্ত আবর্জ্জনা কোম্পানির সীমার বাহিরে যাইতে পারিত না। ১০।১৫ বৎসর এই ভাবে বাস করিতে করিতে সংক্রামক জ্বর বসন্ত প্রভৃতির ভীষণ সংক্রমণ আরম্ভ হইল। মৃত্যুর আধিক্য দেখিয়া সাহেবদের চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, এই সকল বদ্ধ জলই যখন পীড়ার কারণ, তখন ঐরূপ জলাশয় গুলি বুজাইয়া দিলেই আপদ চুকিয়া যাইবে। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাউন্সিল হইতে আবর্জ্জনা-পূর্ণ জলাশয়গুলি বুজাইবার আদেশ হওয়ায়, সহরবাসিদিগের পরিত্যক্ত জঞ্জাল দ্বারা ঐ কার্য্য আরম্ভ হইল। হিতে বিপরীত হইল, তাঁহাদের অবিবেচনার দোষে বহুসংখ্যক নর নারী, ইংরাজ বাঙ্গালী,

প্রতি বৎসর মরিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় হইতে কলিকাতা পল্লীগ্রামের লোকের নিকট জমালয় সদৃশ বলিয়া কথিত হইতে লাগিল। এখানে আসিলে লোণা ধরিত, অধিকাংশ লোক শোণিত রোগের দৌর্ব্বল্যে প্রাণত্যাগ করিত। তদ্ভিন্ন, জ্বর, রক্তামাশয়, ওলাউঠা, পিত্তজ্বর, অম্লশূল, অক্তৎ বৃদ্ধি প্রভৃতি শক্ট রোগে প্রতি বৎসর, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে শত শত লোক মারা যাইত। চলিত প্রবাদে বলে, "ভাদ্রমাসে জমের চারি দ্বার খোলা" কারণ ঐ সময় মৃতদের এত ভীড় হইত যে, চারিদিকের দ্বার না খুলিলে তাহাদের প্রবেশ কালে অত্যন্ত ঠেলাঠেলি মারামারি হইত। ইংরাজেরা প্রতি বৎসর ১৫ই নবেম্বর "সে বৎসরের মতন বাঁচিয়া গেলেন" ভাবিয়া একটী উৎসব করিয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা ও আমোদ প্রমোদ করিতেন। প্রায় ৫০ বৎসর পরে সাহেবেরা বুঝিলেন, সহরের জল নিকাশ হওয়া উচিত, তখন অল্পে অল্পে রাস্তার পার্শ্বে নর্দ্দামা খনন এবং মধ্যে মধ্যে কতকগুলি সাঁকো নির্ম্মাণ করা হইল। ১৫০ বৎসর পরে রোগের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, রীতিমত জল নিকাশ, জঞ্জাল পরিষ্কার, মিষ্টজল সরবরাহ, এবং দেশীয়দিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের উপযোগীতা অনুভূত হইল। জঞ্জাল দিয়া জলাশয় ভরাট করাটা যে কি সর্ব্বনাশের ব্যাপার, তখনও সাহেবেরা তাহা বুঝেন নাই, অবাধে সমস্ত সহরের নিম্নভাগ জঞ্জাল দিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সৃষ্টির পর ঐকার্য্য ক্রমে বন্ধ হইয়াছে।

কলিকাতার সীমার বাহিরে তত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, যত এই সব নির্ম্মিত সহরে দেখা যাইত। কলিকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরের গ্রামগুলি এমন স্বাস্থ্যকর ছিল যে, পূর্ব্বের সাহেব ও সহরের বাবুরা তথায় বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেন। সুখসাগর প্রভৃতি স্থানের পূর্ব্ব বর্ণনা ও তথায় গবর্ণর প্রভৃতির আমোদ প্রমোদের কথা পাঠ করিলে, এখনকার সিমলা ও দার্জ্জিলিং পর্ব্বতের ন্যায় আদরের স্থান ছিল বলিয়া বুঝা যায়। আর এখন চারিদিকে জলপ্রণালী বন্ধ হওয়ায় গঙ্গার উভয় পার্শ্বের অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে হয়। এখন কলিকাতা মধ্য সময়ের সহিত তুলনায় স্বর্গ বলিলে বলা যায়, তত্রচ পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন অকাল মৃত্যু এত দেখা যায় কেন? তাহার উত্তর দিতে হইলে, জল বায়ুর দোষ দিলে চলিবে কেন। পূর্ব্বের আচার ব্যবহারের গুণে তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইতেন, ইহাই বলিতে হয়।

স্নান আহ্নিক।—পিতামহদিগের প্রত্যেক আচরণ ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁহাদের অনেকেই অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন। পঞ্চকন্যা স্মরণ, দেব বন্দনা-পাঠ প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া শয্যা হইতে অবতরণ করিতেন। কোন কোন মাতৃভক্তের কথা শুনা গিয়াছে, তাঁহারা শয্যা হইতে নামিবার পূর্ব্বে মা মা বলিয়া ডাকিতেন, মা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া চক্ষু মেলিয়া অগ্রে তাঁহার মুখ দেখিতেন। তাঁহারা শয্যা হইতে উঠিয়া অগ্রে গৃহ দেবতার দ্বারে, পরে তুলসী তলায়, গোশালায় প্রণাম করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেন। অনেকেই সর্ষপ তৈল মাখিয়া

প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিতেন। যাঁহারা গঙ্গা হইতে কিছু দূরে বাস করিতেন, অথচ কার্য্যের ব্যস্ততায় সময় দিতে পারিতেন না, তাঁহারা নিকটস্থ বড় বড় পুষ্করণীতে অবগাহন করিতেন। বড় বড় পুষ্করণী তখন প্রতি পল্লীতেই ছিল। ডুব দিয়া উঠিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতেন, 'মহিম্ন' স্তব ও গঙ্গার বন্দনা পড়িতেন। বালার্ক ও সন্ধ্যাদীপ সকলেরই অবশ্য প্রণম্য ছিল। অবগাহন-স্নান স্বাস্থ্যের একটী বিশেষ লক্ষণ, বিশেষতঃ প্রত্যুষে গঙ্গা স্নানের উপকারিতা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ইহাতে যে কেবল দেহ হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহা নহে, সহজে রোগাক্রমণ করিতে দেয় না। কারণ ইহাতে প্রাতঃকালের নির্ম্মল বায়ু সেবন ও পদচালনা হইয়া থাকে, তদ্বারা মন প্রফুল্ল হয় এবং শরীরের জড়তা দূর হয়, সমস্ত দিন অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারা যায়। তাঁহারা স্নানান্তে অনেকে পুষ্প চয়ন করিতেন, কেহ বা অপরের আনীত ফুলে পূজা করিতে বসিতেন। প্রত্যেক বয়স্থ ব্যক্তিকে পূজা করিতেই হইত। বিবাহের পর দীক্ষা, দীক্ষিত ব্যক্তির ইষ্টদেবতার নিত্য পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করা মহাপাপ। এই পাপীকে ভ্রষ্টাচারী বলিয়া সকলে ঘৃণা করিত। যাঁহারা বিষ্ণু মন্ত্রের উপাসক, তাঁহাদিগকে তুলসীর মালা, যাঁহারা শাক্ত তাঁহাদিগকে রুদ্রাক্ষের মালা ফিরাইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে হইত। প্রথমত গঙ্গাস্নানে, তৎপরে বহুক্ষণ পুষ্প চন্দন লইয়া পূজা ও ভগবানে আত্ম সমর্পণ, তাঁহার নাম গান প্রভৃতিতে দেহ ও মন উভয়ই সুস্থ হইত, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের স্নান আহ্নিক দীর্ঘায়ুর একটী কারণ।

ব্যায়াম।—অধিকাংশ যুবক ব্যায়াম-প্রিয় ছিলেন, কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম যেন করিতেই হইবে। কুস্তী বা মল্লযুদ্ধটী অনেকের প্রিয় ছিল, তদ্ভিন্ন লাঠী খেলা, তীর ধনুক বা গুলি ধনুক, তরবারী খেলা, অশ্বারোহণ, নৌকা চালন, সন্তরণ, ধাবন, কপাটী প্রভৃতি ক্রীড়া তাঁহাদের দেহের জড়তা দূর করিয়া সবল এবং দীর্ঘজীবী করিত। সেই "ভেতো বাঙ্গালী"-দিগের দেহে বলশক্তি কম ছিল না। আশানন্দ ঢেঁকীর গল্প অনেকেই জানেন। তিনি দুই হাতে দুইটী ঢেঁকী ঘুরাইয়া দস্যুদলে পতিত হইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, একদিন আপনার প্রভুর এক থলে টাকা লইয়া ডুমুরদহের মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন, সে কালে পথে একাকী টাকা লইয়া কেহই চলিতে সাহস করিত না, বিশেষত ডুমুরদহ সুবিখ্যাত দস্যুদিগের স্থান ছিল, মহাবল আশানন্দের তাহাতে ভয় কি? মধ্যাহ্ন কালে ক্ষুধাবোধ হওয়ায় কিছু চুড়া লইয়া এক পুষ্করণীর ঘাটে ভিজাইয়া আহার করিতেছিলেন, নিকটে টাকার থলি পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় দুইজন দস্যু লাঠী লইয়া উপস্থিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কি জন্য আসিয়াছিস্?" উত্তর হইল, "এ কোন জায়গা জানিস্ না, এখান হইতে টাকা লইয়া ঘরে যাইতে চাস।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা আমায় খাইতে দে এখন ছুঁইস না।" "ভাল শীঘ্র খাইয়া নে।" আহারান্তে আশানন্দ পুষ্করণীতে আচমন ও জলপান করিতে নামিলেন, টাকা ও দস্যুরা ঘাটের উপরে রহিল, উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা

কি শুধু টাকা চাস, না আমাকে মারিয়া টাকা লইয়া যাইতে চাস" "তোর মরিতে যখন এত সাধ, তখন তাই ভাল" বলিয়া দস্যুরা তাঁহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে দুই দশঘা লাঠী প্রহার করিল, তিনি "তোদের মারা হয়েছে ত এখন দেখ" বলিয়া টাকার তোড়াটী কাঁধে তুলিয়া দুইজন দস্যুকে দুই হাতে ধরিলেন, দুই বগলে দুইজনকে চাপিয়া ধরিয়া তথা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে স্বস্থানে গিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া দেখেন, উভয়েই মৃতপ্রায় মূর্চ্ছিত, মুখে জল দিয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

আহীরিটোলার শঙ্কর হলাদার অত্যন্ত বলবান ছিলেন, স্থূলাকার স্তম্ভ বাহুরতাল ঠুকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, কখন লাঠি লইয়া পথে বাহির হইতেন না, যদি কেহ বলিত, মহাশয় শুধু হাতে পথে বাহির হন, যদি কেহ দাঙ্গা করিতে আসে, কি দিয়া আত্মরক্ষা করিবেন, তদুত্তরে বলিতেন, "পথে অনেক গাড়ী যাতায়াত করে, তাহা না পাইলে দাঙ্গাকারীদিগের একজনকে ঘুরাইয়া লাঠির কাজ সারিব।"

কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাসে দেখা যায়, রাজা রামকৃষ্ণ মহাবীর ছিলেন। একদিন নদীতে সন্তরণ কালে একখানি ৩২ দাঁড়ের বজরা এমনি ধরিয়া রাখিয়াছিলেন যে, চালকেরা সহস্র চেষ্টা করিয়া বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। একদিন একটী বন্য মহিষের সহিত যুদ্ধ করিয়া উভয় হস্তে তাহার শৃঙ্গ দুইটী সমূলে উৎপাটন করিয়া মুষ্টাঘাতে তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। দেশ বিদেশের মল্লেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিত, কিন্তু কেহই পরাজিত না হইয়া ফেরে নাই। জনৈক ফৌজদার মল্লযুদ্ধে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, তিনিও একদিন আসিলেন, রামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে একটী পাঁচ বৎসরের আম্রতরু উভয় হস্তে ধরিয়া উৎপাটন করায় ফৌজদার আর যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। একদিন রামকৃষ্ণ একটী সবলকায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উভয় জানুদ্বারা তাহাকে এমন চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে, অশ্বের পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হওয়ায় সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। উহঁার পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের পুত্র গোপীমোহনও বিলক্ষণ বলশালী ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহারা পিতা পুত্রে যখন ঢাকায় কারাবদ্ধ ছিলেন, তখন একদিন হস্তী দ্বারা নদী হইতে একখানি বৃহদাকার প্রস্তর উত্তোলিত হইতেছিল, প্রস্তরের গুরুত্ব হেতু হস্তী বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অপারক হইলে গোপীমোহন তাহা তুলিয়া দেন। নবাব তাঁহার এই কার্য্যে আশ্চর্য্য ও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন।

পূর্ব্বে অনেক ভদ্রলোক বন্যজন্তু শীকারে অভ্যস্থ ছিলেন, বন্দুকের অপ্রাচুর্য্য হেতু তরবার, বর্ষা, তীর ধনু এবং লাঠির দ্বারাই তাঁহারা ব্যাঘ্রাদি শীকার করিতেন। সে সময়ে অনেক ভদ্রলোক রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হরিনাভীর দেববংশের আদিপুরুষ রুদ্ররাম দেব গৌরের সেনাপতি ছিলেন। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতিদিগের মধ্যেও অনেকগুলি ভদ্রলোকের নাম পাওয়া যায়। মুর্সিদাবাদের নবাবদিগেরও অনেক বাঙ্গালী সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তাহার পর কেন যে ভদ্রলোকেরা উক্ত বিদ্যা পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। যদি যুদ্ধ শিক্ষার প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে বর্গী, মগ, ও পর্টুগীজদিগের দৌরাত্ম্যে এ প্রদেশ কখনই দুর্দ্দশাপন্ন হইত না। পলাশী যুদ্ধ কালে ক্লাইব সাহেব একদল বাঙ্গালী সৈন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে ভদ্রলোক থাকিলে কালী বাগ্দী ও হরিহাস দাস কখন সেনাপতি হইত না। সেকালের অবলারাও এখনকার মত দুর্ব্বলা ভীরু ছিলেন না, খড়্গ হস্তে লইয়া দস্যু তাড়াইয়াছেন, এমন অনেক কালী অবলার গল্প শুনা যায়।

ভোজন।—এখনকার অপেক্ষা তখন ভোজন কার্য্য সাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবে সম্পন্ন হইত। তাঁহারা নিজেরা যে বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বিজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিলে পাপ হইবে, এই বিশ্বাসে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যে যে তিথিতে যে যে খাদ্য নিষেধ্য, তাহা ভোজন করিতেন না। কুষ্মাণ্ড, বেগুণ, কুলীবেগুণ, লাউ, পটোল, মূলা, বেল, নিম্ব, তাল, নারিকেল, কলমীশাক, পুঁই শাক, তাল, মাষকলাই, সর্ষপতৈল, মৎস্য ও মাংস বৎসরের অনেক দিন পরিত্যাগ করিতে হইত। একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতিতে অনেকে অন্ন ভোজন করিতেন না। পূর্ব্বে মাংস ভোজন বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, মেষ, ছাগ, হরিণ, শশক, সজারু, হংস, কপোত, ঘুঘু প্রভৃতি বন্য পক্ষীর মাংস ভোজন প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতে মাংস ভোজন এক প্রকার রহিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদিও শাক্তেরা তখনও ছাগ মাংস ভোজন করিতেন, কিন্তু দেবোৎসর্গীত না হইলে তাহাকে বৃথা মাংস বলিয়া নিষ্ঠাবানেরা ঘৃণা করিতেন। মাংস ভোজন হ্রাস হওয়ার কালে গব্যের দ্বারা তাঁহারা উহার অভাব পূরণ করিতেন। দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখন ও ঘৃত, মাংস অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইতেন। চাউল, ডাইল, তরকারি, ফল মূল, এবং মৎস্য ও গব্য প্রবাসী ভিন্ন গৃহস্থদিগকে প্রায়ই ক্রয় করিতে হইত না। তখন অর্থ মহার্ঘ থাকিলেও খাদ্যদ্রব্যাদি তদনুসারে অনেক সুলভ ছিল। তাহার প্রধান কারণ, গৃহস্থদিগকে আহারীয় বস্তু প্রায় ক্রয় করিবার আবশ্যক হইত না। "খেতের বেগুণ বিলের মাছ তাই খেয়ে খেয়ে ভোঁদর নাচ।" বাস্তবিক তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ধান জমী এবং বাগান বিল বা পুষ্করিণী ছিল, প্রত্যেক গৃহস্থই গরু পোষিতেন। উঠানে মরাই বাঁধা ধান, বাগানে ফলমূল তরিতরকারি, পুষ্করিণী বিলে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য থাকিতে বাজারে যাইবেন কেন? তৈল আর লবণই হাটে কিনিতে হইত, অনেকে আবার কলুকে সরিষা দিয়া তৈল ভাঙ্গাইয়া লইতেন, দরিদ্র লোকেরা লবণের পরিবর্ত্তে কলাগাছের ক্ষার ব্যবহার করিত। লবণও এখনকার মত মহার্ঘ ছিল না, এখন প্রতি মণে রাজা ২॥০ টাকা বিশেষ অনুগ্রহ হইলে ২৲ টাকা মাসুল লন, তা ছাড়া বিদেশীয় লবণ-ব্যবসায়ীদিগের মূল্য ও জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি খরচা আছে, কাজেই প্রায় ছয় পয়সায় এক সের লবণ ক্রয় করিতে হয়। তখনও রাজা লবণের কর লইতেন বটে,

তাহা এত কম যে, এক পয়সার কম সের বিক্রয় হইত। এই সস্তার কালেও গরিবলোক এত ছিল যে, তাহাদের অন্নের ব্যঞ্জন যুটিত না, সামান্য কলমী হিংচা, সজিনা প্রভৃতি শাক সিদ্ধ করিয়া লইতেন। এক চড়া তেঁতুল একটা লঙ্কা ও লবণ হইলে আর কিছুর আবশ্যক অনেকের থাকিত না। অনেকে কেবল ফেন দিয়া ভাত খাইতেন। এইরূপ অবস্থাই যে দারিদ্র্যের চিহ্ন, তাহা কি প্রকারে বলিব, বাসগৃহের পার্শ্বে দুই চারি রকম তরকারির গাছ রোপণ করা ত ব্যয়সাধ্য নহে, তাঁহারা উহার অভাব বোধ করিতেন না, ইহাই আসল কথা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় একদিন রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নামক দরিদ্র মহাপণ্ডিতকে কিছু দান করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পর্ণকুটীরে গিয়া পণ্ডিতের অভাব কি জিজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিত উহা ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মনে করিয়া তদনুরূপ উত্তর দান করিলেন। যখন বুঝিলেন, উাঁহার সাংসারিক অভাবের কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ঐ যে তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার পত্র লইয়া ব্রাহ্মণী এমন উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন যে, আমি অতি পরিতোষের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া থাকি, আমার সংসারে কোন অভাব নাই। ইহাতে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত কতদূর লোভশূন্য ছিলেন, একদিকে যেমন তাহা বুঝা যাইতেছে, অপরদিকে তেমনি তখনকার লোকে সামান্যে কেমন সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহাও জানিতে পারিতেছি।

তাঁহারা ভোজনে যেমন, হজমেও তেমনি পটু ছিলেন। এখনকার মত তৈল ঘৃতে তখন ভেজাল চলিত না। এখনকার মত শত শত মিঠাই মিষ্টান্ন তখন আবিষ্কার হয় নাই। মুড়ী মুড়কী, চুড়া চুড়াভাজা, চালভাজা, নানাবিধ কলাই ভাজা, তেলেভাজা বেগুনী ফুলারী বড়া প্রভৃতি উপাদেয় জলযোগের খাদ্য ছিল। মুড়কির মোয়া মিঠাইয়ের কার্য্য করিত। মাহেশের ঘাটে মুকুন্দ নামক এক জন লোক মুড়কির সহিত বিবিধ প্রকারে মসলা মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মোয়া প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা অতি উপাদেয় হওয়ায় "মুকুন্দ মোয়া" বলিয়া আজিও আদরে বিক্রীত হইয়া নির্ম্মাতার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সে সময় দেশ বিদেশে উহার এত সুখ্যাতি প্রচার হইয়াছিল যে, বিলাসী মানুষের কথা দূরে থাকুক, পুরীর জগন্নাথ দেব পর্য্যন্ত তাহার লোভে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাস্নানের ছলে মাহেশে আসিয়া কৌড়ি অভাবে হাতের সোনার বালা বন্ধক রাখিয়া মুকুন্দ ময়রার নিকট হইতে মোয়া খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ধনে খালির খইচুর আবিষ্কৃত হইয়া মুকুন্দ মোয়াকে হারাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে খর্জ্জুর গুড় নানা আকারে ঢালাই হইয়া সন্দেশ নামে ব্যবহৃত হইত, চিনি আবিষ্কৃত হইলে মিষ্টান্ন-জগতে খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমে জনাই গ্রামে নারিকেলের সহিত পাক হইয়া রসকরা নামে প্রচারিত হইল। রসকরার নিকট খইচুর হার মানিল, ক্রমে ক্রমে নারিকেল সন্দেশ, চন্দ্রপুলী, ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্ষীরপুলি প্রভৃতির প্রধান হইতে লাগিল। ছানা অনেক পরে প্রস্তুত হইয়া মিষ্টান্নকে তৃতীয় স্বর্গে উন্নত করিয়াছে। সাধারণত মুড়ীই নিত্য জলযোগ হইত, উদর পূর্ণ করিয়া

মুড়ী চর্ব্বণান্তে খানিকটা গুড় খাইয়া জল পান করিতেন। এই জন্য কোন প্রণালী পূজান্তে বা অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে অবশ্য পালনীয়। বালক বালিকারা তিন চারি বার অন্নভোজন করিত। প্রাতঃকালে গৃহিণীরা বাসী কাপড়ে উঠানে একটা উনন জ্বালিয়া স্বতন্ত্র হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া দিতেন, সিদ্ধ হইলে তাহাতে একটু লবণ দিয়া ফেন সমেত বালক বালিকারা রাখাল বালক শুদ্ধ ঐ অন্ন ভোজন করিত। দুই এক ঘণ্টা পরে বাটীতেই মুড়ী ভাজা হইলে, বালক বালিকারা ভাত খাইয়াছে বলিয়া ইহাতেও বঞ্চিত হইত না। ব্যায়ামকারী যুবকেরা ব্যায়ামান্তে স্বেচ্ছামত কাঁচাছোলা কাঁচা দুধ খাইতেন।

তাঁহারা স্নান আহ্নিকের পর জলযোগ করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মে গমন করিতেন এবং মধ্যাহ্নে আসিয়া আহার করিতেন। ভাত ডাল শুক্ত মাছের ঝোল ভাজা চড়চড়ি ডানালা ও অম্বল বড় মানুষের নিত্য ভোজ্য। কি বড় মানুষ কি মধ্যবিত্ত, সকলেই প্রথম অন্নে ঘৃত, শেষ দুগ্ধ পানে আহার সমাপ্ত করিতেন। এই দুগ্ধাভাবই আমাদের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। অনেক সাত্ত্বিক হিন্দু স্বপাকভোজী ও হবিষ্যাসী ছিলেন, অনেকে একাহারী ছিলেন। এক সূর্য্যে দুইবার পূর্ণ ভোজন ঘৃণিত আচার বলিয়া কথিত হইত। পূর্ব্বে প্রকাণ্ড ভোজও অতি সামান্য রকমে সম্পন্ন হইত। আমার জননী বলিয়াছিলেন, পানিহাটী গ্রামে তাঁহার মাতুলের বিবাহে সাত দিন ধরিয়া ভোজ হইয়াছিল, একদিন দুই রকম ডাল "দেওড়" (দোআড়া বা দুইবার) দিয়াছিল। দহি মাখা ভাত প্রকাণ্ড ভোজে মাছ দিয়া খাইবার রীতি ছিল, নিমন্ত্রিতের পূর্ব্ব হইতে মাছগুলি পাতের এক পার্শ্বে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। একদিন দধির পশ্চাতে মুণ্ডি পরিবেশন হইতেছে দেখিয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত মাছগুলি লোকেরা আড়ে গিলিতে লাগিল, আর একদিন আহারান্তে সকলে লবঙ্গ বিঁধা পানের খিলি পাইয়াছিল। এই ঘোর ঘটার ভোজের কথা নিকটস্থ গ্রাম গুলিতে কিছুকাল গল্পের বিষয় হইয়াছিল। ইহা ৬০। ৭০ বৎসরের কথা। আমার এক বন্ধু গল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার পিশী ঠাকুরাণীর বিবাহে লুচী চিনি হইয়াছিল। অন্যান্য ভদ্রলোকে সে সময় দহি চুড়া দ্বারা বরযাত্র পরিতোষ করিতেন। লুচী চিনি দেখিয়া বরযাত্রীদের মনে কি প্রকার আনন্দ হইল, পাঠক বুঝিয়া লউন। বরযাত্রীরা এই আদরের বিনিময়ে চিনি অপচয় করিতে লাগিলেন, কেহ আসনের নিম্নে কেহ পাতের নিম্নে রাখিতে লাগিলেন, অনেকেই জলের ঘটিতে চিনি গুলিয়া খাইতেছিলেন। অভিপ্রায়, চিনির অসংকুলান হইলে কন্যাকর্ত্তার লুচী চিনি খাওয়ানের দর্প চূর্ণ হইবে। এদিকে কন্যাকর্ত্তা এই অত্যাচার দেখিয়া আট দশটা বস্তা মাটী পূর্ণ করিয়া মুখ সিলাই করাইলেন, বাহিরে আসিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেন এক একটী ধামা করিয়া চিনি আনিতেছ, গোটাকতক বস্তা আনিয়া উঠানে ফেল। অমনি মাটীর বস্তাগুলি আসিয়া পড়িল, তৎসঙ্গে একটী চিনির বস্তাও ছিল। অগ্রে সেই চিনির বস্তাটী খুলিয়া চিনি বাহির করিবা মাত্র বরযাত্রীরা বুঝিলেন, ইহাঁকে আর অপ্রস্তুত করিতে পারিব না, তখন তাঁহারা অপচয়ে ক্ষান্ত হইলেন।

গৃহে নূতন জামাতা বা বিশেষ কুটুম্ব আসিলে, গৃহিণীরা অনেক প্রকার রন্ধনের বাহাদুরী দেখাইতেন। অনেক রমক ডাল, শুক্ত, ডালনা, ঘণ্ট, ভাজা, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু বৃহৎ ভোজে তাহা সম্ভব নহে, তাহাতে দুই এক প্রকারের ডাল, এক রকম শুক্ত, দুই তিন প্রকার ভাজা, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, ল্যাবড়া (ছেঁচড়া) মাছের ঝোল, অম্বল, এক প্রকার পায়স, কলার বড়া, পাক করিলেই যথেষ্ট হইত। নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ, বিশেষতঃ বিক্রমপুরের মহিলারা অতি সামান্য তরকারি হইতে এত বিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া থাকেন যে, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না।

এখন কলিকাতার বাজারে যত প্রকার তরকারী দেখা যায়, পূর্ব্বে তত রকম ছিল না। বিশেষতঃ শীতকালে নানাবিধ নূতন তরকারিতে বাজার পরিপূর্ণ দেখিতে পাই, তখন পালমশাক, মূলা ও সিম ভিন্ন শীতকালের অন্য বিধ বিশেষ কোন তরকারি ছিল না। এখন গোল আলু লোকের প্রধান তরকারি হইয়াছে, পিতামহেরা উহার নাম গন্ধ জানিতেন না। এমন কি, ১৭৬৮ খ্রীঃ টাভোরিনাস নামক ভ্রমণকারী কলিকাতার বাজারের যে সকল তরকারির তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বাঁধাকপি ও কড়াই সুটীর উল্লেখ আছে, কিন্তু আলুর নাম নাই। কোন প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও আলুর নাম দেখি নাই। সম্ভবত আলের মধ্যে জন্মে বলিয়াই ইহার নাম "আলু" হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমরা আমাদের দেশীয় কন্দ জাতীয় মাত্রকেই আলু উপাধি দিয়াছি, যথা রাঙ্গা আলু, শাঁক আলু, চুবড়ী আলু, গরান আলু প্রভৃতি।

এখনকার অপেক্ষা তাঁহারা অনেক অধিক আহার করিতেন। শ্রমজীবীদিগের কথা বলিতেছি না, ভদ্রলোকের ঘরে এক কুনকে চাউলের অন্ন সাধারণের ভোজ্য। অনেক বড় লোক, এমন কি, রাজা জমীদার-দিগের মধ্যেও বিস্তর বহু ভোজীর নাম শুনা যায়। একটী কাঁঠাল বা একটী বৃহৎ ছাগলের মাংস একাকী শেষ করিতেন, এমন গল্পের অভাব নাই। পৌষপার্ব্বণ ও অরন্ধনের সময় ভোজনের পরীক্ষা হইত। বড় বড় সিদ্ধপিঠা ও আস্কেগুলি যখন চর্ব্বণ করি-তেন, তখন তাঁহাদের মুখভঙ্গিমা দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিত। অরন্ধনে এত পর্য্যুসিতান্ন আহার করিতেন যে, গৃহিণীরা কেবল পাথরের থোরা বহিয়া পরিশ্রান্ত হইতেন না, পাছে অকুলান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে মনসা দেবীর পূজা মানি-তেন। অপরাপর সাধারণ ভোজেও অনেকে ভোজনের পারদর্শীতা দেখাইয়া বিখ্যাত হইতেন। কেহ বা দুই তোলা ডাল খাইয়া ফেলিলেন, কেহ বা দশটা বড় কাতলা মাছের মাথা সুন্দররূপে চর্ব্বণ করিয়া সকলের সঙ্গে আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন, কেহবা এক থোরা অন্ন চুমুক দিয়া শেষ করিরেন, বা এক তোলো পায়স একাকী আহার করিলেন। এক ব্রাহ্মণের গৃহে সরস্বতী পূজায় একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবাকে ১০।১২ জন লোকের খেচরান্ন একাকী খাইতে দেখিয়াছি।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটু নিদ্রা দেওয়া ছিল। অপরাহ্নে গাত্রোত্থান করিয়া কিছু ফল মূল জলযোগান্তে আবার কার্য্য

স্থানে যাইতে হইত। এক প্রহর রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্নের ন্যায় ভোজন হইত। কলিকাতার বাবুলোকের মধ্যে অনেকে রুটী ছোলার ডাল বেগুণ ভাজা ও ঘণ্ট ভোজন করিয়া দুগ্ধ পান করিতেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

দিন যায়

দিন যায়,—কাহারও কোন কথা,—সুখ দুঃখ, সম্পদ বা বিপদ, মিলন বা বিচ্ছেদ, স্বাস্থ্য বা রোগ, এ সকলের কোন কথা শুনিবার জন্যই অপেক্ষা করে না। দিন যাইয়া যাইয়া ভ্রূণকে শিশুত্বে, শিশুকে বালকত্বে, বালককে যুবকত্বে, যুবককে বৃদ্ধত্বে, বৃদ্ধকে মৃত্যুতে পৌঁছাইয়া দিয়া কোথায়, কে জানে, অবিরত চলিয়া যাইতেছে। রাজার ঘরে কত সুখ শান্তি পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে, বৃদ্ধ রাজাকে তবুও ত ঐ নিষ্ঠুর দিন মৃত্যুতে ডুবাইয়া দিল! ধনী যুবকের ঘরে মিলনের, উত্তেজনার, আস্ফালনের কত কত সুখ ও তৃপ্তি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু তবুও ত ঐ দিন যুবককে টানিয়া লইয়া নির্ব্বাণ-নিরঞ্জনার তটে নিস্তেজ নিবৃত্তিরূপ বার্দ্ধক্যে পৌঁছাইয়া দিল! হায় রে কাল, সত্যই তোর মত নিষ্ঠুর আর কেহই নাই!!

আমি বৎসরান্তে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম,—আর কত দিন এমনই করিয়া অচেনা-পথে, অদৃষ্ট-উদ্দেশ্যের দিকে ছুটিতে থাকিব? আমার কোন সাধনারই পরিসমাপ্তি বা তৃপ্তি ঘটিল না,—শেষ করিতে না করিতে দিন আমাকে টানিয়া টানিয়া অন্য অদৃষ্ট-লক্ষ্যের দিকেই লইয়া যাইতেছে। সায়ংকালে মনে করি, আজ যাহা হইল না, কাল তাহা করিব; প্রাতে মনে করি, কল্যকার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি অগ্রে শেষ করি। এইরূপ ভাবিয়া নিত্যকর্ম্মের পথে অবিশ্রান্ত ছুটিতে থাকি, কিন্তু সায়ংকালে আবার ভাবিয়া দেখি, কত কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে;—কত ভাল কথা বলা হয় নাই,—কত রোগীর সেবা করা হয় নাই,—কত দরিদ্রের অভাব বিমোচিত হয় নাই—কত কত কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। আবার সায়ংকালে প্রতিজ্ঞা—আবার পর প্রত্যূষে কার্য্যারম্ভ—কিন্তু হিসাবের সময় দেখি,—তবুও ত কত কত কাজ বাকী! এইরূপ করিয়া করিয়া এখন বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপস্থিত;—কিন্তু কর্ত্তব্যের বাকী আর শেষ হইল কই? এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় খাটিতে পারি না—এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে বা বলিতে, করিতে বা সাধিতে, ভাবিতে বা মজিতে পারি না,—কিন্তু আমার সব কর্ত্তব্যই অসমাপ্ত। কত দিন আসিল, কত দিন যাইল,—এখন দেখিতেছি, সে যেন ক্রমে ক্রমে কর্ত্তব্যের বাকী বোঝাই আমার মস্তকে চাপাইয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন করিয়া গুরুভার আর কি বহন করা যায়!!

গত বৎসর দুঃখ কষ্ট সহিয়া,—অভাব-স্মরণে ক্লিষ্ট, দুঃখ দারিদ্র্যে জীর্ণ, পাপ-দহনে শীর্ণ, শোকতাপে অবসন্ন হইয়া ভাবিয়াছিলাম, এই বৎসরটা হয় ত সুখেই কাটাইতে পারিব। সাধুরা বলেন, দুঃখের পরে সুখ, রোগের পরে স্বাস্থ্য, পাপের পরে

পুণ্যের মুখ দেখা যায়। তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া ভাবিয়াছিলাম,—এত দুঃখ কষ্ট সহিয়াছি, এই বৎসরটা হয় ত একটু সুখেই যাইবে। কিন্তু এখন বৎসর শেষে দেখিতেছি, সবই মিথ্যা হইল, আমি দিন দিনই যেন অভাবের স্বভাব প্রাপ্ত হইতেছি,—আমার দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক, হাহাকার তাড়না আর ঘুচিল না! আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে!

বন্ধু, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে কখনও কৃপণতা করিয়াছ কি?—তুমি কতবার বলিয়াছ, ভারত আবার জাগিবে—পুণ্য পবিত্রতায় আবার মাতিবে;—এই বঙ্গভূমি প্রতিভায় আবার উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু কই ভারত জাগিল? প্রপীড়িতের আর্ত্তনাদ, দুঃখীর মর্ম্মবেদনা, বিপন্নের নিরাশ-ক্রন্দন কই থামিল? কই ভারতের আপামর-সাধারণ পুণ্য পবিত্রতায় ভূষিত হইল? কই—একতা, মিলন, সদ্ভাব সকলকে শ্রীধামে প্রতিষ্ঠিত করিল? বন্ধু, আর বৃথা আশার কথা বলিও না। ভারত আসন্নমৃত্যু গ্রাসে, আর বৃথা আশার আকাশকুসুম-বাণী ঢালিও না। দিনে দিনে ভারত যে আরো পতনের পথে চলিয়াছে, চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখ।

মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কুসংস্কার, জাল,-জুয়া-চুরি, চুরি ডাকাতি, ব্যভিচার পরপীড়ন, মদ্যপান ঘুষগ্রহণ, প্রথমে প্রথমে সভ্যতার বিমল উষায় তত বেশী ভারতকে আক্রমণ করিতে পারিয়াছিল না; কিন্তু দেখিতে না দেখিতে, ৭০, ৮০ বৎসরের মধ্যে, এখন, প্লেগ মহামারীর ন্যায়, ভারতকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এখন কাহাকে কি বলিব? সহানুভূতি প্রকাশের আর স্থানও মিলে না;—সকলেই একদশাগ্রস্ত। সত্য, পবিত্রতা, পুণ্য,—দীনে দয়া, ক্ষীণে আশ্বাস, রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা, এখন সব কর্ম্মনাশার জলে ভাসিয়া গিয়াছে;—দিনে দিনে ভারত যেন পতন-বৈতরণীর তীরে উপস্থিত। আর কি অবশিষ্ট আছে, বন্ধু, তুমি বল? অনেক হাটিয়া, অনেক খাটিয়া, অনেক দেখিয়া একদিন পরিশ্রান্ত হইয়া হিসাব গণনা করিতে বসিয়াছিলাম। আমি আমার কর্ত্তব্যের বাকী যায় দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। মর্ম্মাহত হইয়া ইহাঁর দিকে, তাঁহার দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কই, কাহারও মুখ প্রসন্ন দেখিলাম না। কর্ম্মীর দল খাটিয়া খাটিয়া এখন হতাশ হইয়া পড়িতেছেন! একজাতিত্ব-গঠন ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির সোপান; কিন্তু কই জাতিত্ব গঠিত হইল? গবর্ণমেণ্টের ভেদ-নীতি সর্ব্বত্র এমনভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য যে একতার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল, রিজলি সাহেবের কটাক্ষপাতে তাহা অতি সুদূরে চলিয়া যাইতেছে;—হিন্দু মুসলমানে একটু সদ্ভাব স্থাপিত হইতেছিল, আবার, আবার সম্মান-প্রাপ্তির কু-আশায় বিবাদের বীজ রোপণ করিতেছে। চরিত্রের ভিত্তিতে ভারত-উন্নতি-সৌধের চূড়া উড্ডীন হইবে, শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কই এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর চরিত্র গঠিত হইল? সত্যে অনাস্থা, পবিত্রতায় অশ্রদ্ধা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান,—শিথিল-বিবেক পুরুষ সিংহ-কুল দিন দিন কেমন শ্রীহীন হইয়া উঠিতেছেন। মহারথীগণের চেষ্টার সুফল ফলিল কই? জোর যার মুলুক তার, এই দুর্নীতির পরাক্রম প্রশমিত হইল কই? দুর্ব্বলের পীড়ন

থামিল কই? শ্বেতাঙ্গের অত্যাচার দিন দিন যে অপ্রতিহত প্রভাবে বাড়িয়া চলিল! গবর্ণমেণ্ট উপাধির-বৃথা-চটকে মন ভুলাইয়া, ইহাঁকে তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়া, দিগ্বিজয়ী নীতিতে অধীনতা ও দাসত্ব শৃঙ্খলে যে দৃঢ় রূপে সকলকে বাঁধিয়া ফেলিলেন! কই, কই প্রকৃত হিতৈষীদলের পরিপুষ্টি কোথায়? গবর্ণমেণ্ট কতক হিতৈষীকে কিনিয়া লইলেন, স্বার্থ কতককে, দুর্নীতি কতককে,—পরশ্রী-কাতরতা কতককে, এবং বিদ্বেষ কতককে কিনিয়া লইল;—এখন দলে দলে, ঘরে ঘরে বিবাদ বিসম্বাদ দুর্জ্জয় প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। এই ত অবস্থা—এ জাতির দাসত্বের মমতা কখন ঘুচিবে কি?

একজাতিত্ব গঠনের মূল প্রেম। প্রেমের প্রধান সহচর, সহানুভূতি। প্রেমের প্রধান শত্রু, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষ। সহানুভূতির বাজার এই ভারতে দিন দিন মহার্ঘ হইতেছে না কি? একজন শ্বেতাঙ্গের নিকট কেহ নিপীড়িত হউক, দশজন দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিবে;—একজন স্বদেশী ভ্রাতা কোনরূপে অপদস্থ হইলে শতজন উল্লাসের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিবে; এই ত অবস্থা! কাহাকে কে ভাল চক্ষে দেখে বল ত? কোন দুইজন প্রবীণ গ্রন্থকার বা বক্তা, সম্পাদক বা প্রচারকের মধ্যে সদ্ভাব দেখিয়াছ কি? একজনের প্রশংসা অন্যের নিকট কর, দেখিবে, তোমাকে কত কথা শুনিতে হইবে। প্রেম কোথায়? সহানুভূতি কোথায়? পরস্পরের নিকট পরস্পরের আদর কোথায়? প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে, প্রেমের এই শিক্ষা কোথায়? সকলের চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হও, এক বিন্দু চক্ষের জল কোথাও পাইবে না! ভিক্ষার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কর, দশ টাকা পাইবে না! অন্যের উপকারের জন্য যে টাকা ঘরের বাহির করিয়াছ, তাহা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা কর, অপদস্থ হইয়া, গালাগালি খাইয়া, তোমাকে নিরস্ত হইতে হইবে! ভারতবর্ষটা যেন নির্ম্মমতার অনুর্ব্বর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে! প্রেম, সহানুভূতি, এ সকল যেন এখন বাতুলের প্রলাপ। লোকেরা বলে, জীবন-সংগ্রামের তীব্র উত্তেজনায় ঐ সকল এখন কোন্ দেশে বিতাড়িত হইয়াছে, কে জানে? এইরূপ অবস্থার মধ্যে আর কি দাঁড়াইয়া থাকা যায়? দাঁড়াইবার উপায়ও নাই। দিন, ঐ নিষ্ঠুর দিন ক্রমাগত মানুষকে লইয়া যাইতেছে। উন্নতির পথে কি? না, তাহা নয়। দাঁড়াইবার যখন যো নাই;—উন্নতির যখন দ্বার রুদ্ধ;—তখন অবনতি অনিবার্য্য। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার ভারতকে পতনের পথে, বুঝি বা, যাইতে হইল! দিন যায়,—কই কেহ ত দেশ রক্ষা করিতে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া জীবন পাত করিল না!! এদেশকে জাগাইতে হইলে আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত বীরের জীবনবলির আবশ্যক। কই, একজন ম্যাট্‌সিনি, একজন পার্কার, বা একজন কসুথ এদেশে উত্থিত হইল কই? সত্য সাক্ষী, চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী, পরার্থপর আত্মত্যাগ-মন্ত্র-দীক্ষিত পুণ্য-শ্লোক লোকের অভ্যুদয় হইলে এদেশ জাগিয়া আবার এমন করিয়া পতনের মুখে ধাবিত হইত না। বুঝি বা গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল নীতির সহিত সংগ্রাম করিয়া এই জাতির আর অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই। বুঝি বা, পতন অনিবার্য্য।

পতনের কাহিনীর নিগূঢ় ইতিহাস লিখিবার জন্য আমাদের ন্যায় যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও আর অধিক দিন টিকিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। একদিকে সহানুভূতির অভাব, অপর দিকে সিডিশন আইনের নির্ম্মম শাসন-ভ্রূকুটী! বুঝি বা সব অচিরে একদশাগ্রস্ত হইবে;—বুঝি বা দিন দিন পরিতুষ্ট-দাসদলের অভ্যুদয়েই ভারত গৌরবান্বিত হইবে! বুঝি বা, সকল উন্নতির প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও কেহ আর কোন কথা বলিবে না!! হা ঈশ্বর, এইরূপই কি তোমার বিধান?

'সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত'—প্রতিবাদ।

(১)

গত ফাল্গুনের 'নব্যভারতে' অনৈক লেখক 'সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মত' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, ভাস্করাচার্য্যের মতে সূর্য্য সচল ও পৃথিবী অচলা; কিন্তু আধুনিক ইংরাজী মতে সূর্য্য অচল ও পৃথিবী সচলা। লেখক ভাস্করাচার্য্যের মতের অনুকূলে কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কোন্ পক্ষীয় যুক্তি অধিক বলবতী, পাঠকগণের উপর তাহার মীমাংসার ভার দিয়াছেন।

লেখক, বোধ হয়, সম্যক্ অবগত নহেন যে, আধুনিক ইংরাজী মতে সূর্য্য অচল নহে; উহা প্রায় ২৫ দিনে স্বীয় পরিধি পরিবেষ্টন করে এবং মহাশূন্যেও উহা পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যাহা হউক, বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়, পৃথিবী অচলা কি সচলা।

পৃথিবীর চলচ্ছক্তির-প্রমাণাদি লেখক চাহেন না; তিনি চাহেন, কেবল তাঁহার যুক্তি-খণ্ডন। সুতরাং সে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক।

বায়ুমণ্ডলও পৃথিবীর সহিত নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, এই বৃত্তান্ত মানিলে তাঁহার প্রথমোক্ত যুক্তি গুলির খণ্ডন হইয়া যায়। সুখের বিষয়, ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার জিজ্ঞাস্য, বায়ুমণ্ডলও যদি পৃথিবীর ন্যায় নিয়ত পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে পক্ষিগণ অথবা নিক্ষিপ্ত তীর বায়ুমণ্ডলের বিপরীত দিকে কিরূপে অগ্রসর হয়,—কিরূপে অল্প শক্তিযুক্ত পক্ষী ও তীর, বায়ুমণ্ডলের ভীষণ বেগকে পরাভূত করিয়া বিপরীত দিকে গমন করিতে সক্ষম হয়। আমরা সংক্ষেপে ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

পক্ষী ও তীর বায়ুমণ্ডলের বেগকে পরাভূত করিয়া বিপরীত দিকে যায় না, বায়ুমণ্ডলের পরিভ্রমণের দিকেই যায়। শূন্যে অবস্থিত অন্যান্য পদার্থ সকল যৎকালে বায়ুমণ্ডলের বেগ দ্বারা গতিশীল হয়, পক্ষী ও তীর তৎকালে বায়ুমণ্ডলের বেগ ব্যতীত আর একটী বিপরীতগামী বেগ-যুক্ত থাকে, এইজন্য উহাদের উপর বায়ুমণ্ডলের যে বেগ থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত-কম হইয়া যায়। সুতরাং পক্ষী ও তীর অন্যান্য পদার্থের ন্যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বেগে বায়ুমণ্ডলের পরিভ্রমণের দিকেই গমন করে। অন্যান্য পদার্থের গতি বুঝিতে পারা যায় না, সেই জন্য অপেক্ষাকৃত লঘুগতি-সম্পন্ন তীর

ও পক্ষীর বিপরীত গতির অনুভব হয়।

তীরাদির বিপরীত দিকে গমন করিবার শক্তি থাকিলে, যে সময়ে পৃথিবী পৃষ্ঠস্থ যে স্থান হইতে উহারা গতি প্রাপ্ত হইত, গতি শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহারা সে স্থান হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িত। উদাহরণ স্বরূপ তীরের শূন্যাবস্থান কাল ১৫ সেকেণ্ড ধরিলে, ঐ সময়ের মধ্যে ভূপৃষ্ঠস্থ শর নিক্ষেপ স্থান ও বায়ুমণ্ডল প্রায় দুই ক্রোশ অগ্রসর হয়, তীরের গতিও যদি ঐ সময় মধ্যে $\frac{1}{6}$ ক্রোশ ধরা যায়, আর তীর যদি বিপরীত গামী হয়, তাহা হইলে ঐ সময় মধ্যে তীর নিক্ষেপ স্থান হইতে তীরটী ($2+\frac{1}{6}$) $2\frac{1}{6}$ ক্রোশ দূরে সরিয়া পড়ে, কিন্তু তাহা কখনই পরীক্ষিত সত্যের মধ্যে গণ্য হইবে না।

লেখকের প্রদর্শিত অন্যান্য উদাহরণ একই যুক্তিরই বিভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থল মাত্র। সুতরাং তাহার পৃথক মীমাংসার প্রয়োজন নাই।

লেখকের একটী বিষয় বুঝা উচিত ছিল যে, এত সহজ একটী আপত্তি খণ্ডন না করিয়া যে আধুনিক মত সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর এরূপ একটী আপত্তি মীমাংসার জন্য বাগাড়ম্বর সহ মাসিক পত্রিকা খানির ৪ পৃষ্ঠা অবরোধ না করিয়া কোন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য চাহিলেই ভাল হইত।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টরাজ।

(২)

আমরা স্বীকার করি, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইউরোপীয় গ্যালিলিও, কোপার নিকাস প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের বহু পূর্ব্বে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় মত ও অনুকূল প্রমাণাদি স্বীয় গোলাধ্যায় গ্রন্থে বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের মত যে একেবারে অখণ্ডনীয়, একথা সাহস করিয়া বলা যায় না। যুক্তির মুখে কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, যথার্থ প্রমাণিত হইবে।

পৃথিবীর আহ্নিকগতিতে দিবারাত্রি ও বার্ষিকগতি হেতু বর্ষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; তদনুসারে ভূভাগের উপর ঋতু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এস্থলে পৃথিবী মেরুদণ্ডের উপর প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় কক্ষ আবর্ত্তন করিতে করিতে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে এ ইহার অনুকূলে প্রচুর প্রমাণ আছে; সুতরাং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই স্বীকার করিবেন, পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রবল বেগে বিঘূর্ণিত হইতেছে। অতএব এস্থলে পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রয়োজনীয় হইতেছে না; কেবল মীমাংসাপ্রার্থী ভাস্করাচার্য্যের যে কারণ সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যথার্থ কি না, তাহারই মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য বলিতেছেন, সূর্য্য সচল এবং অবনী অচলা। সূর্য্য সচল, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি; কারণ আমাদিগের অবনীমণ্ডল চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলের সহিত এবং মঙ্গল বুধাদি সমকেন্দ্রী গ্রহগণ যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সেই সূর্য্য এবং অন্যান্য সৌর

জগতের কেন্দ্রীভূত, তদনুরূপ বহু সূর্য্য আবার এই বৃহত্তর সূর্য্যকে পরিক্রমণ করিতেছে, আবার এই বৃহত্তর সূর্য্য অন্য এক বৃহত্তম সূর্য্যকে আবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপ কত কোটী সূর্য্য এই অনন্ত আকাশের অনন্ত আলয়ে অবিরত ঘূর্ণায়মান থাকিয়া বিশ্ব-পাতা বিধাতার নিয়ম পালন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তবে পৃথিব্যাদি সমকেন্দ্রী গ্রহগণের তুলনায় জগৎপ্রসবিতা ভাস্করকে নিশ্চল ধরিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত।

পৃথিবীর অচলতা প্রমাণ জন্য ভাস্করের প্রথম যুক্তি;—পৃথিবী যদি সচলা হয়, এবং কল্পিত মেরুদণ্ডের উপর অবস্থিত থাকিয়া প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার কক্ষ আবর্ত্তন করে, তাহা হইলে এরূপ প্রবলবেগে বিঘূর্ণজন্য ভূতলস্থ মঠ মন্দির প্রাসাদাদি প্রতিক্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইত, সন্দেহ নাই। এই যুক্তির অসারতা প্রতি-পাদন হেতু নিম্নে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। দৃষ্টান্তটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুধাবন করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে, উপর্য্যুক্ত যুক্তিটী ভ্রান্ত কি না। পাঠক মহাশয়, মনে করুন, আপনি দ্রুতগতিশালী একখানি বাস্পীয় শকটের একটী কামরায় উপবিষ্ট আছেন, এবং আপনার পার্শ্বে আরও লোকজন ও তাহাদের মাল পত্রাদি আছে। এস্থলে ভাস্করাচার্য্যের মত যে বাস্পীয় শকটের অতি দ্রুতগতি নিবন্ধন আপনি, আপনার পার্শ্বস্থিত বন্ধুগণ ও মাল পত্রাদি সমস্তই একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। পাঠক মহাশয়, এই সময় ভাস্কর পণ্ডিতের যুক্তিটী হৃদয়ঙ্গম করুন, এবং উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আপনি চূর্ণীকৃত হইয়াছেন কি না। যদি চূর্ণ না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না যে, ভাস্কর ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং স্পষ্ট বলিবেন যে, বাস্পীয় শকট যেরূপ আরোহিগণ ও তাহাদের দ্রব্যাদি লইয়া প্রবলবেগে ধাবমান হইতেছে, সেইরূপ, অবনীমণ্ডল তুঙ্গ শৃঙ্গ পর্ব্বত, উচ্চচূড় মহীরুহ ও যাবতীয় জীবজন্তুগণ লইয়া অবিরত অতীব প্রচণ্ডবেগে চালিত হইতেছে।

মোট কথা, ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে কোন বস্তু কোন বস্তুর দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে পারে না। এস্থলে ভাস্করের ধারণা, পৃথিবী সচলা হইলে তৎপৃষ্ঠস্থ স্থাবর জঙ্গমাদি ভূমণ্ডল-বেষ্টনকারী বায়ুরাশি দ্বারা আহত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। কিন্তু পৃথিবী গতিশীল হইলে, তদাকৃষ্ট বায়ুরাশিও যে গমনশীল হইবে, একথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। পৃথিবীর সহিত যদি বায়ুমণ্ডলও চালিত হইল, তবে ঘাত প্রতিঘাতের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনাই বা কোথায়?

প্রথম যুক্তির ভ্রান্তি প্রমাণ করিতে দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। একটী বৃহৎ গোলাকার মৃৎ পাত্রের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা রাখিয়া যদি পাত্রটীকে প্রবলবেগে ঘূর্ণিত করা যায়, তাহা হইলে, দেখা যায়, পিপীলিকাটী চূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, স্বস্থান-ভ্রষ্টও হয় না; পরন্তু আমরা যেরূপ পৃথিবী-তলে ভ্রমণ করিয়া থাকি, সেইরূপ পিপীলি-কাটীও সাচ্ছন্দ্যের সহিত মৃৎপাত্রের গাত্র অবলম্বন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে; এবং মৃৎপাত্রের গাত্রস্থিত কিঞ্চিদুচ্চ স্থানাদিরও কোন অনিষ্ট হয় না। পৃথিবীর

সহিত তুলনায় উচ্চ পর্ব্বতাদি তৃণতুল্য; এবং মনুষ্যগণ যে কত সামান্য, তাহা অনুভব করা দুরূহ। অতএব পৃথিবীর সচলতা হেতু আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলিসাৎ হইব, ইহা কথনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

ভাস্করের দ্বিতীয় যুক্তি :—অবিরত বসুধা চালিত হইলে মনুষ্য পশ্বাদি একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করা দূরে থাকুক, স্থির হইয়া দাঁড়াইতেও সক্ষম হইত না। এ যুক্তিটী যে ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা উল্লিখিত ১ম ও ২য় উভয় দৃষ্টান্তের দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। বর্ত্তমান কালে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করেন নাই, এরূপ লোক অত্যল্পই পরিদৃষ্ট হওয়া থাকে; সুতরাং প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, চলদ্বাষ্পীয় শকটের অভ্যন্তরস্থ কোন কামরার এক বেঞ্চ হইতে অপর বেঞ্চে যাওয়া, কিম্বা কামরার ভিতর দণ্ডায়মান থাকা সম্ভবপর। ইহা অধিকাংশ লোক দ্বারা পরীক্ষিত; সুতরাং অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। অতএব প্রমাণিত হইল, ভাস্করের ২য় যুক্তি ভ্রান্ত।

ভাস্করের তৃতীয় যুক্তি :—ভূকম্পন জন্য প্রবল জলকম্প বশতঃ নদ নদীর স্রোত—জোয়ার, ভাটা প্রভৃতি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। মীমাংসা-প্রার্থী মহাশয় পৃথিবীর নিশ্চলতার অনুকূল মত বজায় রাখিবার জন্য বিগত ৩০শে জুনের ভূমিকম্প দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। চিন্তা করিয়াছেন যে, যখন গত ৩০শে জুনের সামান্য ভূকম্পনে বহু বৃক্ষ প্রাসাদাদি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন ধরিত্রী সচলা হইলে, ইহার প্রবল চঞ্চালন বেগ বশতঃ প্রতিনিয়তই অট্টালিকাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকূলে নিম্নলিখিত যুক্তিটী যথেষ্ট হইবে। পৃথিবী প্রতিনিয়ত সমভাবে একই দিকে চালিত হইতেছে। কোন কারণ বশতঃ অকস্মাৎ এই সঞ্চালনের বৈষম্য ঘটিলেই ভূতলস্থিত যাবতীয় পদার্থ কম্পিত হইয়া উঠে, এবং উচ্চ প্রাসাদাদি ভূতলশায়ী হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলোদর-জাত বাষ্পের বহ্বায়তন হেতু পৃথিবীর যে কম্পন হয়, তাহা মেদিনীর গতির সহিত যথাযথ ঐক্য রাখিয়া একই দিকে হইবে, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই—উত্তরদক্ষিণে, পূর্ব্বপশ্চিমে, অথবা উত্তরপশ্চিমে হইবে, তাহার ঠিক নাই—সকল দিক ব্যাপিয়াই হইতে পারে। বসুন্ধরা কিন্তু পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক্ গমনে আপন কক্ষ আবর্ত্তন করিতেছে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কম্পন পৃথিবীর গতির সাম্য নষ্ট করে। সেই নিমিত্তই ভূধর শৃঙ্গ, অট্টালিকা, উচ্চ বৃক্ষাদি ধরাতলশায়ী হয়। বাষ্পীয় শকট মৃদুগতি হইতে একেবারে হঠাৎ প্রবল গতি প্রাপ্ত হইলে, তদভ্যন্তরস্থ আরোহিগণ কম্পিত হইয়া উঠে; পরন্তু ভূমিকম্প—সচরাচর লোকে যাহা বুঝে, একেবারে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থানে হয় না। যে স্থানে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ বাষ্পের বহ্বায়তন হেতু বহির্গমন চেষ্টা হয়, তদুপরিস্থ ও তৎসন্নিহিত স্থানেই ভূকম্পন অনুভূত হয়। বাষ্পীয় শকটেরও অভ্যন্তরস্থ কোন একটী কামরায় একখানি বেঞ্চ কম্পিত হইলে তদুপরিস্থিত ও তাহার অতি সন্নিহিত আরোহী এবং দ্রব্যাদি কম্পিত হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কথনই বলিতে পারি না, যখন সামান্য বেঞ্চের প্রকম্পনে তৎসন্নিহিত দ্রব্যাদির কম্পন উৎপাদিত হয়, তখন

বাষ্পীয় শকটের প্রবলতর বেগ হেতু শকটস্থ আরোহিগণ ও দ্রব্যাদি কম্পিত এবং স্বস্থান-চ্যুত হইবে।

ভাস্করের চতুর্থ যুক্তি :—পৃথিবী সচলা হইলে উচ্চতম শৈলশৃঙ্গ হইতে নিক্ষিপ্ত কোন গুরুভার পদার্থ কখনই পর্ব্বত-পদ দেশে পতিত হইত না। যদি বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে কদম্ব কেশরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া না থাকিত এবং পৃথিবীর গতিতে গতি-বিশিষ্ট না হইত, তাহা হইলে ভাস্করের যুক্তিটী খাটিত। ভাস্করের প্রমাণোল্লিখিত গুরুভার পদার্থ পর্ব্বত মূলে নিপতিত হয়, তাহার কারণ এই যে, ভূপৃষ্ঠলগ্ন পর্ব্বতটী যে বেগে যে দিকে প্রধাবিত হইতেছে, পৃথিবীর গতিতে গতিপ্রাপ্ত ভূমণ্ডল-বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলে নিমজ্জমান নিক্ষিপ্ত গুরুভার পদার্থটীও সেই বেগে সেই দিকে সঞ্চালিত হইতেছে; সুতরাং বস্তুটী পর্ব্বত মূলে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চম যুক্তি :—কলিকাতার প্রেসিডেন্সি-কলেজ হইতে পূর্ব্বদিকস্থিত আলবার্ট কলেজ লক্ষ্য করিয়া একখানি লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল। ভাস্করাচার্য্যের মতে, অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য বলেন যে, পৃথিবী সচলা হইলে ঐ লোষ্ট্র কখনই আলবার্ট কলেজে পৌঁছিতে পারিবে না; অনেক পিছাইয়া পড়িবে। আমরা বলি, এটী ভাস্করের ভ্রান্তি। কারণ, পৃথিবী যেমন অবিরত চালিত হইতেছে, তৎসঙ্গে বায়ুমণ্ডলও নিয়ত চালিত হইতেছে। সুতরাং পৃথিবীর গতি ভূমি-সংলগ্ন লক্ষ্য বস্তুতে ও বায়ুমণ্ডলে নিমগ্ন নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রে সর্ব্বদাই সাধারণ বহিতেছে; এস্থলে লোষ্ট্রে প্রদত্ত শক্তি মাত্রই কার্য্যকারী হইল। অতএব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা কোথায়! যদি লক্ষ্য ও লোষ্ট্রের মধ্যে কিছুরই ব্যবধান না থাকিত, অর্থাৎ শূন্য হইত, তাহা হইলে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হওয়া সম্ভবপর হইতে পারিত।

ষষ্ঠ যুক্তি :—পৃথিবী সচলা হইলে একই নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুই তিন ঘণ্টাব্যাপী বারিবর্ষণ অসম্ভব। একথাও ভ্রান্তি মূলক। মেঘরাশি বায়ুমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী। ধরার গতিতে বায়ুর গতি; বায়ুর গতিতে মেঘের গতি। ধরা যেমন ঘুরিতেছে, মেঘও তৎসঙ্গে চলিতেছে; সুতরাং একই নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুই তিন ঘণ্টাব্যাপী বারিবর্ষণ অসম্ভব নহে।

বিহঙ্গমগণের ব্যোমমার্গে অধিকক্ষণ বিচরণের পর পুনঃ কুলায় প্রাপ্তি উল্লিখিত কারণ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে। পৃথিবী শাখিশাখা সংলগ্ন বিহঙ্গম নীড়-নিচয় লইয়া নিয়ত ঘুরিতেছে; বায়ুমণ্ডলও তৎসঙ্গে উড্ডীয়মান খেচর কুলকে লইয়া অবিরত বিঘূর্ণিত হইতেছে; সুতরাং পৃথিবীর গতি উড্ডীয়মান বিহঙ্গের ও তাহার স্বীয় কুলায়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবহিত দূরত্বের কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে না, যে পরিবর্ত্তন সচরাচর পরিলক্ষিত হয়, তাহা পক্ষীরই আত্মজাত। অতএব বিহঙ্গমগণ ইচ্ছানুসারে স্বকুলায় প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহা প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে "মীমাংসা-প্রার্থীর" মতে ভাস্করের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ যুক্তি গুলির ভ্রান্তি বিকাশ কারণ তাঁহার অনুকূল; কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহা তাঁহার যুক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। উক্ত মহোদয় বলিতেছেন, পৃথিবীর সঙ্গে বায়ুমণ্ডল বিঘূর্ণিত হইলে বিমান-বিহারী বিহঙ্গ-নিবহ স্রোতে নিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণায়মান হইত। এ স্থলে তৎ-প্রদর্শিত ভাস্করের ১ম যুক্তির ভ্রমোদ্ঘাটন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই

যথেষ্ট হইবে। আমরা কি গম্যমান বাষ্পীয় শকটের কামরার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে পারি না? সেইরূপ পৃথিবী সচলা হইলেও বাষ্পীয় শকটারোহিদিগের ন্যায় খেচর সমূহ শূন্যমার্গে অনায়াসে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

এইবারে আমরা মীমাংসা-প্রার্থী মহাশয়ের শেষ যুক্তিটীর ভ্রান্তি বিকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। মীমাংসা-প্রার্থী মহাশয় বলিতেছেন, ধরণী চলচ্ছক্তি-বিশিষ্টা হইলে বায়ু অপেক্ষা লঘু পদার্থ মাত্রেই, পৃথিবী যেদিকে চালিত হইতেছে—অর্থাৎ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে, তাহার বিপরীত দিকে যাইতে কদাপি সমর্থ হইত না। এইটীও উক্ত বাষ্পীয় শকটের উদাহরণ দ্বারা প্রমাণিত হইবে। শকট খানি দ্রুতবেগে পূর্ব্বদিকে চলিতেছে। একজন লোক ইঞ্জিনের ঘর হইতে গাড়ীর পর গাড়ী ধরিয়া গার্ডের কামরায় আসিতেছে। শকটের গতি সত্ত্বেও তদুপরিস্থ লোকটী কি বিপরীত দিক গমনে সমর্থ নয়? তবে তাহার পশ্চিম দিকে গমন সত্ত্বেও সে ক্রমাগত পূর্ব্বদিকেই চালিত হইতেছে; তাহার গতি শকটের গতির তুলনায় অতি সামান্য। সেইরূপ আমরা ভূপৃষ্ঠে ধূম, বাষ্প প্রভৃতিকে নানাদিগ্‌বাহী দেখি; বস্তুতঃ ধূম, বাষ্প প্রভৃতি লঘু পদার্থের গতি পৃথিবীর গতির সহিত তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া, তাহাদের নানাদিগভিগামিত্ব সত্ত্বেও, ক্রমাগত তাহারা পূর্ব্বদিকে প্রবল বেগে প্রধাবিত হইতেছে।

অতএব ভাস্করের যুক্তিগুলি যে যথার্থ নহে, এ প্রবন্ধে তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। সুতরাং ধরিত্রীকে আর আমরা নিশ্চলা বলিতে পারি না।

শ্রীহরিতোষ দত্ত

(৩)

মহাত্মা আর্য্যভট্টের মত এই যে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডল ৯০ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত থাকিয়া পৃথিবীর আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠে দৃঢ়মূল হইয়া, পৃথিবীর সমবেগে পূর্ব্বাভিমুখে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান আছে, ভূপৃষ্ঠে কি অন্তরীক্ষে সেই বায়ুমণ্ডলাভ্যন্তরে ভূচর খেচরাদি যাবতীয় পদার্থ পূর্ব্ব দিকে নিয়ত পৃথিবীর সমবেগশীল বটে। এই বায়ুসাগরে নিমগ্ন কোন পদার্থই এই গতির বহির্ভূত নহে; পদার্থ সমূহ এই অবস্থাধীন থাকিয়া অন্যান্য শক্তি প্রয়োগে ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এপ্রযুক্ত ভূপৃষ্ঠস্থ অট্টালিকা প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে না, কখন কখন হঠাৎ প্রবল ভূকম্পন কি ঝঞ্ঝা বাতের শক্তিতে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত হইয়া থাকে; পাখীগণ কুলায় ত্যাগ করিয়া নিজ শক্তিতে অন্যত্র গমনকালে তাহাদের কুলায় যেমন পৃথিবীর সহিত পূর্ব্ব দিকে চলে, সেই পাখীরাও তদ্রূপ পূর্ব্ব দিকে পৃথিবীর সমবেগে চলনশীল থাকিয়া গমন করিতে থাকে, সুতরাং পাখী নিজ বলে যতদূর যায়, ততদূর হইতেই প্রত্যাগতি দ্বারা অনায়াসে নিজ কুলায় প্রাপ্ত হয়। কোন একখণ্ড মেঘ বর্ষিত হওয়ার সময়েও পৃথিবীর সমবেগে পূর্ব্বদিকে গমনশীল, সুতরাং প্রথমে ভূপৃষ্ঠের যে ক্ষেত্রে বর্ষণ করে, বর্ষণকাল পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রেই বারি বর্ষিত হয়, তবে কখন কখন প্রবল বায়ুর শক্তিতে ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আর একটী কথা প্রকাশ করিতেছি; কথাটী এই—একটী কদম্বকুসুম লইয়া উহার গ্রন্থির ঠিক মধ্যে ভেদ করিয়া একটী শলাকা বিদ্ধ করত ঐ

কুসুমের গ্রন্থীকে পৃথিবী, কেশরকে বায়ুমণ্ডল, এবং কুসুমস্থ কীটাণুগণকে ভূচর খেচর প্রাণী কল্পনা করিলে এবং ঐ শলাকাটী ধরিয়া লাটিমের ন্যায় প্রবল বেগে ঘুরাইলে ঐ গ্রন্থি যেরূপ বেগে ঘুরিবে, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ কেশররাশিও সেইরূপ বেগেই গ্রন্থির ঘূর্ণনাভিমুখে ঘুরিতে থাকিবে এবং গ্রন্থিস্থ ও কেশরস্থ কীটাণুপুঞ্জও তৎসমবেগে তদভিমুখে ঘুরিতে থাকিয়া, তাহাদের ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ যাতায়াতও করিতে থাকিবে; একটী কীটাণু এক কেশরাগ্র হইতে ক্রমে হাটিয়া অপর কেশরে যাইতে যত সময় লাগিবে, পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগত হইতেও ঠিক তত সময়ই লাগিবে; যেমন চলন্ত জাহাজের মধ্যস্থল হইতে অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগে যাইতে তুল্য সময়ই লাগে।

চলন্ত যানস্থিত ব্যক্তিগণ যানের একই দিকে তৎসমবেগগামী থাকিয়া অক্লেশে ইচ্ছানুসারে যানের অগ্রভাগ হইতে পশ্চাদ্ভাগে যত সময়ে যাইতেছে, পুন তত সময়েই, আবার পূর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হইতেছে।

কোন কোন জাহাজে জলতোলার কলের চুঙ্গির উপরিস্থ বক্র মুখের নিম্ন ভাগে চালনীবৎ এক প্রকার বহুছিদ্র-বিশিষ্ট পাত্র থাকে। চড়নদারগণ তাহার নীচে স্নান করিতে বসিলে ঐ বহু-ছিদ্র-পাত্র হইতে তাহাদের উপর অনবরত বৃষ্টির জলের ন্যায় ধারা পড়িতে থাকে। যতক্ষণ না স্নান হয়, ততক্ষণ জলধারা পড়িতে থাকে। ঐ চলন্ত জাহাজকে পৃথিবী, আর সেই বহু-ছিদ্র পাত্রকে মেঘ এবং স্নাত ব্যক্তির আসনকে ভূপৃষ্ঠস্থক্ষেত্র কল্পনা করিলেই সংশয়চ্ছেদ সম্ভব। পর্ব্বত শৃঙ্গচ্যুত প্রস্তর খণ্ডও এই কারণ প্রযুক্তই পর্ব্বতের পাদমূলে ভিন্ন বহুদূরে সরিয়া পড়ে না।

বায়ুবেগে যেমন দীপশিখাগ্র বায়ুর অনুকূলে হেলিয়া থাকে, সূর্য্যের আকর্ষণে, সেইরূপ, বায়ুর শীখাগ্র পশ্চিমে হেলিয়া স্রোত বহিবার সম্ভব, ইহাও একটী প্রশ্ন হইতে পারে; এতন্মীমাংশায় এই মাত্র উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, সমুদ্র জলের উপর সূর্য্য ও চন্দ্রের যেরূপ শক্তি প্রযুক্ত, বায়ু সাগরের উপরও সেইরূপ। বহুল বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর আহ্নিকগতি সম্বন্ধে মীমাংসা-প্রার্থীর আপত্তি থাকিলে জানিতে ইচ্ছুক। বাস্তবিক রাশিচক্রই ঘূর্ণিত হউক বা পৃথিবীই ঘূর্ণিত হউক, গণনায় একই ফল; আমি তৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না দর্শাইয়া, মীমাংশা-প্রার্থীর লিখিত পৃথিবীর আহ্নিক গতির যাথার্থ্যের বিরুদ্ধ যুক্তিকয়টী কতদূর সারগর্ভ, কেবল তৎসম্বন্ধেই যাহা কিছু লিখিলাম।

শ্রীনবীনচন্দ্র ভদ্র

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৫১। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়,—ডাক্তার শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল,‌ এম, এস প্রণীত। গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। কিন্তু কেবল তাহা তাঁহার গৌরবের জিনিস নয়; তিনি একজন সাধক ব্যক্তি, বা তা লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বহুদিনের পরীক্ষার দ্বারা তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এই পুস্তকে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষার সংস্কারকার্য্যেও তিনি ব্রতী। সরল ভাষা তাঁহার সাহচর্য্যে সুন্দররূপ ধারণ করিয়াছে।

৫২। জীবনের যুদ্ধ। শ্রীমতিলাল দত্ত, বি-এ প্রণীত, মূল্য ৫০, অন্নপূর্ণা প্রেস, পুরুলিয়া। নামেই পুস্তকের বিষয় বুঝা যায়। সংসারে বাস করার অন্য অর্থ, জীবনের যুদ্ধ। গ্রন্থকার ভাব ও ভক্তির সহিত গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের বৈতালিক গীত যেন আমাদের হৃদয়ের কথা:—

"ধূলো খেলা করতে এসে, চোখে ধূলো দিয়ে থাকি,
আঁধার দেখে চৌদিকে মা, ভয়ে তোরে ডাকিতেছি।
কথা কয়ে বলে দে মা! কোন্ দিকে মা আছ তুমি,
মা মা বলে ডেকে ডেকে, চারিদিকে ঘুরছি আমি।"

৫৩। তেজোময়ী। মিলনান্তক নাটক, শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥৵০, মাদারিপুর শান্তি যন্ত্র। বুন্দেলের রাজা ভীমসিংহের পুত্র অরবিন্দ ও পালিতা কন্যা তেজোময়ীর প্রণয়ের কথা এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অরবিন্দের মনের ভাব ছিল,—"ও কথা বলো না

সখে নিকটে আমার। ভগ্নীসমা তেজ
ইন্দ্রিয়লালসার যোগ্য নহে কদাচন।"

কিন্তু রাজা রাণীর ছলনায় অরবিন্দ ভুলক্রমে বিবাহ করেন; শেষে বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়া দেশান্তরিত হন। তেজোময়ীও সন্ন্যাসিনী হইয়া তাঁহার অনুগমন করেন, শেষে অলক্ষিতে থাকিয়া অরবিন্দের মন পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হন। ইহাই নাটকের বিষয়। কি উদ্দেশ্যে এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে, বুঝিলাম না। এরূপ বিবাহ সমাজে প্রচলিত হওয়া কদাচ উচিত নহে।

৫৪। সমাজতত্ত্ব। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, প্রণীত, মূল্য ১৲০, ভিক্টোরিয়া প্রেস। পূর্ণ বাবু একজন চিন্তাশীল সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। এই পুস্তকের বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর পরিণাম প্রভৃতি প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, পাঠকগণ পূর্ণবাবুর গবেষণা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। নব্যভারতে কোন কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া, বিস্তৃত সমালোচনা করিতে আমরা সঙ্কুচিত। তিনি তাঁহার পক্ষের কথা সকল সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। সকলের গ্রন্থখানি একবার পড়িয়া দেখা উচিত।

৫৫। ধবলেশ্বর। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। শ্রীনগেন্দ্রবালা সরস্বতী বিরচিত, নিউ-স্কুলবুক প্রেস। ধবলেশ্বরের দৃশ্য দর্শনে পুলকিত হইয়া কবি এই পুস্তক লিখিয়াছেন। কোন বিশেষত্ব নাই।

৫৬। কুলকন্যার দ্বিরাগমন। শ্রীবিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।০। ভিক্টোরিয়া প্রেস। মহিলাদের প্রতি অনেক উপদেশ আছে। বিষ্ণুরাম বাবুর "গীতমালা" বঙ্গ ভাষার অমরকীর্ত্তি। দ্বিরাগমন সমাজে একটী বিষয়;—এই উপলক্ষে গ্রন্থকার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলাম।

৫৭। ভরতবংশ-কাব্য। শ্রীজগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ১।০, সাম্যযন্ত্র। গ্রন্থকারের লেখার একটু নমুনাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, কাব্য লেখায় তিনি কতদূর অধিকারী।

"অসিতবরণি শ্যামা পদযুগ স্মরি,
বিস্মৃত বিলুপ্তপ্রায় আর্য্য গুণগান,
গাইতে মোহের ছলে আপনা পাসরি
বাসনা, পূরহ সাধ কর কৃপাদান।